বিষয়।	পত্রা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৬২

[ন]লিনী নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে সম্মতি [মন]কে বুঝাইতে লাগিল, 'আমার পক্ষে [সৌভা]গ্যের বিষয় হইয়াছে।' মনে মনে [জোর] করিয়া বলিল, "আমার পুরাতন [সম্বন্ধ ক্ষ]য় হইয়া গেছে—আমার জীবনের [চারিদি]কে বেষ্টন করিয়া যে ঝড়ের মেঘ উঠিয়াছিল, তাহা একেবারে কাটিয়া [গেছে]। এখন আমি স্বাধীন, আমার অতীত-[কালের] অবিশ্রাম আক্রমণ হইতে নির্ম্মুক্ত।" [এই] কথা বারংবার বলিয়া সে একটা বৃহৎ [বৈরাগ্যে]র-আনন্দ অনুভব করিল। শ্মশানে [মৃ]ত্যুর পর এই প্রকাণ্ড সংসার তাহা[র] [অসার]তার পরিহার করিয়া যখন খেলার মত দেখা দেয়, তখন কিছুকালের মত মন লঘু হইয়া যায়—হেমনলিনীর ঠিক অবস্থা হইল—সে নিজের জীবনের [একটা অধ্যায়]ের নিঃশেষ-অবসান-জনিত শান্তি [অনুভব ক]রিল।

[বাড়ি]তে ফিরিয়া-আসিয়া হেমনলিনী [ভাবিল], "মা যদি থাকিতেন, তবে উঁহাকে আমার এই আনন্দের কথা বলিয়া [সুখী] [করি]তে করিতাম—বাবাকে কেমন করিয়া [আমি কথা]টা বলিব!"

শরীর দুর্ব্বল বলিয়া আজ অন্নদাবাবু যখন সকাল-সকাল শুইতে গেলেন—তখন হেমনলিনী একখানি খাতা বাহির করিয়া রাত্রে তাহার নির্জ্জন শয়নগৃহে টেবিলের উপর লিখিতে লাগিল—"আমি মৃত্যুজালে জড়াইয়া-পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর আবার যে একদিন আমাকে নূতন জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা আমি মনেও করিতে পারিতাম না। আজ তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি কোনোমতেই যে সৌভাগ্যের উপযুক্ত নই, তাহাই লাভ করিতেছি। ঈশ্বর আমাকে তাহাই চিরজীবন রক্ষা করিবার জন্য বলদান করুন। যাঁহার জীবনের সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্রজীবন মিলিত হইতে চলিল, তিনি আমাকে সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণতা দিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় জানি; সেই পরিপূর্ণতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমি যেন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

তাহার পরে খাতা বন্ধ করিয়া হেম-নলিনী সেই নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে নিস্তব্ধ

অন্নদাবাবু কহিলেন—"নলিনাক্ষের মার ওখানে আমার আর হেমের নিমন্ত্রণ আছে। যোগেন্দ্র, তোমার তা হইলে এখানেই আহারের—"

যোগেন্দ্র কহিল—"না না! আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নাই। আমি রমেশকে সঙ্গে লইয়া এখানকার কোনো হোটেলে খাওয়াদাওয়া করিয়া লইব। সন্ধ্যার মধ্যে তোমরা ফিরিবে ত? তখনি আমরা আসিব।"

অন্নদাবাবু কোনোমতেই রমেশের প্রতি কোনোপ্রকার শিষ্টসম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমেশও এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া যাইবার সময় অন্নদাবাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

৬৩

ক্ষেমঙ্করী কমলাকে গিয়া কহিলেন—"মা, কাল হেমকে আর তার বাপকে দুপুরবেলায় এখানে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করা গেছে। কিরকম আয়োজনটা করা যায় বল দেখি? বেয়াইকে এমন করিয়া খাওয়ান দরকার যে, তিনি যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে, এখানে তাঁহার মেয়েটির খাওয়ার কষ্ট হইবে না। কি বল মা? তা, তোমার যেরকম রান্নার হাত, অপযশ হইবে না, তা জানি। আমার ছেলে আজ পর্য্যন্ত কোনো রান্না খাইয়া কোনোদিন ভালমন্দ কিছুই বলে নাই—কাল তোমার রান্নার প্রশংসা আহার মুখে ধরে না মা! কিন্তু তোমার মুখখানি আজ বড় শুক্‌নো দেখাইতেছে যে? শরীর কি ভাল নাই?"

মলিন মুখে একটুখানি হাসি আনিয়া কমলা কহিল—"বেশ আছি মা।"

ক্ষেমঙ্করী মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"না না, বোধ করি তোমার মন কেমন করিতেছে। তা ত করিতেই পারে; সেজন্যে লজ্জা কিসের! আমাকে পর ভাবিয়ো না মা! আমি তোমাকে আপন মেয়ের মতই দেখি—এখানে যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয়, বা তুমি আপনার লোক কাহাকেও দেখিতে চাও ত আমাকে না বলিলে চলিবে কেন?"

কমলা ব্যগ্র হইয়া কহিল—"না মা, তোমার সেবা করিতে পারিলে আমি আর কিছুই চাই না।"

ক্ষেমঙ্করী সে কথায় কান না দিয়া কহিলেন—"না হয় কিছুদিনের জন্য তোমার খুড়ার বাড়ীতে গিয়া থাক, তার পরে যখন ইচ্ছা হয়, আবার আসিবে।"

কমলা অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল, "মা, আমি যতক্ষণ তোমার কাছে আছি, সংসারে কাহারো জন্য ভাবি না। আমি যদি কখনো তোমার পায়ে অপরাধ করি, আমাকে তুমি যেমন খুসি শাস্তি দিয়ো, কিন্তু একদিনের জন্যও দূরে পাঠাইয়ো না!"

ক্ষেমঙ্করী কমলার দক্ষিণ কপোলে দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "তাই ত বলি মা, আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে নহিলে দেখিবামাত্র এমন বন্ধন কি করিয়া হয়! তা যাও মা, সকালসকাল শুইতে যাও! সমস্তদিন ত একদণ্ড বসিয়া থাকিতে জান না!"

কমলা তাহার শয়নগৃহে গিয়া দ্বার বন্ধ

য়িয়া দীপ নিবাইয়া অন্ধকারে মাটির উপরে য়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া, অনেকক্ষণ বিয়া, এই কথা সে মনে বুঝিল, "কপালের াবে যাঁহার উপরে আমার অধিকার হারাই- ছি, তাঁহাকে আজি আগ্‌লাইয়া বসিয়া কিব, এ কেমন করিয়া হয়! সমস্তই ছাড়ি- র জন্ম মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে— বল সেবা করিবার সুযোগটুকু, যেমন রিয়া হোক্‌, প্রাণপণে বাঁচাইয়া চলিব। বান্‌ করুন, সেটুকু যেন হাসিমুখে করিতে রি—তাহার বেশি আর কিছুতে যেন দৃষ্টি দিই। অনেক দুঃখে যেটুকু পাইয়াছি, টুকুও যদি প্রসন্নমনে না লইতে পারি, মুখ ভার করি; তবে সবটুকুই হারাইতে বে।"

এই বুঝিয়া একাগ্রমনে বারবার করিয়া সঙ্কল্প করিতে লাগিল, "আমি কাল হইতে ন কোনো দুঃখকে মনে স্থান না দিই, যেন কমুহূর্ত্ত মুখ বিরস না করি, যাহা আশার তীত তাহার জন্ম যেন কোনো কামনা নের মধ্যে না থাকে! কেবল সেবা করিব, দিন জীবন আছে কেবল সেবা করিব, ার কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।"

তাহার পরে কমলা শুইতে গেল। পাশ-ওপাশ করিতে করিতে ঘুমাইয়া ড়ল। রাত্রে দুইতিনবার ঘুম ভাঙিয়া ল। ভাঙিবামাত্রই সে মন্ত্রের মত আওড়াইতে লাগিল, "আমি কিছুই চাহিব , চাহিব না, চাহিব না।" ভোরের বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়াই জোড়হাত রিয়া বসিল, এবং সমস্ত চিত্ত প্রয়োগ করিয়া হিল—"আমি আজন্মকাল তোমার সেবা করিব, আর কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।"

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া, বাসি কাপড় ছাড়িয়া, নলিনাক্ষের সেই ক্ষুদ্র উপাসনাঘরের মধ্যে গেল; নিজের আঁচলটি দিয়া সমস্ত ঘর মুছিয়া পরিষ্কার করিল এবং যথাস্থানে আসনটি বিছাইয়া-রাখিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাস্নান করিতে গেল। আজকাল নলিনাক্ষের [illegible] অনুরোধে ক্ষেমঙ্করী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিতে যাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই উমেশকেই এই দুঃসহ শীতের ভোরে কমলার সহিত স্নানে যাইতে হইল।

স্নান হইতে ফিরিয়া-আসিয়া কমলা ক্ষেমঙ্করীকে প্রফুল্লমুখে প্রণাম করিল। তিনি তখন স্নানে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। কমলাকে কহিলেন, "এত ভোরে কেন নাহিতে গেলে? আমার সঙ্গে গেলেই ত হইত।"

কমলা কহিল, "আজ যে কাজ আছে মা। কাল সন্ধ্যাবেলায় যে তরকারি আনানো হইয়াছে, তাহাই কুটিয়া রাখি—আর যা-কিছু বাজার করা বাকি আছে, উমেশ সকাল-সকাল সারিয়া আসুক্‌।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"বেশ বুদ্ধি ঠাওরাই-য়াছ মা। বেয়াই যেম্‌নি আসিবেন, অম্‌নি খাবার প্রস্তুত পাইবেন।"

এমন-সময় নলিনাক্ষ বাহির হইয়া আসিবামাত্র কমলা ভিজা চুলের উপর তাড়া-তাড়ি ঘোমটা টানিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ কহিল—"মা, আজই তুমি স্নান করিতে চলিলে? সবে কাল একটু ভাল ছিলে।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"নলিন, তোর ডাক্তারি রাখ্! সকালবেলায় গঙ্গাস্নান না করিলেও লোকে অমর হয় না। তুই এখন বাহির হইতেছিস্ বুঝি? একটু সকাল-সকাল ফিরিস্।"

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা?"

ক্ষেমঙ্করী। কাল তোকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—আজ অন্নদাবাবু তোকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন।

নলিনাক্ষ। আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন? কেন, হঠাৎ আমার উপরে এত বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন যে? তাঁর সঙ্গে ত রোজই আমার দেখা হয়।

ক্ষেমঙ্করী। আমি যে কাল হেমনলিনীকে একজোড়া বালা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলাম—এখন অন্নদাবাবু তোকে না করিলে চলিবে কেন? যা হোক্, ফিরিতে দেরি করিস্ নে—তাঁরা এখানেই খাইবেন।

এই বলিয়া ক্ষেমঙ্করী স্নান করিতে গেলেন। নলিনাক্ষ মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল।

৬৪

হেমনলিনী রমেশের নিকট হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। প্রথম আবেগটা শান্ত হইবামাত্র একটা লজ্জা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।—"কেন আমি রমেশবাবুর সঙ্গে সহজভাবে দেখা করিতে পারিলাম না? কেন শিষ্টাচারের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এমন অদ্ভুত দুর্ব্বলতা দেখাইলাম? নিজের শক্তির উপরে কোনোকালেই কি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিব না? যাহা আশা করি না, তাহাই হঠাৎ কেন আমার মধ্য হইতে এমন অশোভনভাবে দেখা দেয়? রমেশবাবুর সঙ্গে ত আমার এখন কোনো সম্বন্ধ নাই, তবে কেন তাঁহার সাক্ষাৎকার আমি শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না? বিশ্বাস নাই, কিছুই বিশ্বাস নাই! এমন করিয়া টলমল্ করিতে আর পারি না।"

এই বলিয়া সে জোর করিয়া উঠিয়া-পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল, বাহির হইয়া আসিল—মনে মনে কহিল, "আমি পলায়ন করিব না, আমি জয় করিব।" পুনর্ব্বার রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। হঠাৎ কি মনে পড়িল। আবার সে ঘরের মধ্যে গেল। তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ক্ষেমঙ্করীর প্রদত্ত বালাজোড়া বাহির করিয়া পরিল—এবং অস্ত্র পরিয়া যুদ্ধে যাইবার মত সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া মাথা তুলিয়া বাগানের দিকে চলিল।

অন্নদাবাবু আসিয়া কহিলেন—"হেম, তুমি কোথায় চলিয়াছ?"

হেমনলিনী কহিল—"রমেশবাবু নাই—দাদা নাই?"

অন্নদা। না, তাঁহারা চলিয়া গেছেন।

আশু আত্মপরীক্ষাসম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হেমনলিনী আরামবোধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"এখন তবে—"

হেমনলিনী কহিল—"হাঁ বাবা, আমি চলিলাম—আমার স্নান করিয়া আসিতে দেরি হইবে না, তুমি গাড়ি ডাকিতে বলিয়া দাও।"

এইরূপে হেমনলিনী নিমন্ত্রণে যাইবা...

জন্য হঠাৎ তাহার স্বভাববিরুদ্ধ অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিল। এই উৎসাহের আতিশয্যে অন্নদাবাবু ভুলিলেন না, তাঁহার মন আরো উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সজ্জিত হইয়া আসিয়া কহিল—"বাবা, গাড়ি আসিয়াছে কি?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "না, এখনো আসে নাই।"

ততক্ষণ হেমনলিনী বাগানের রাস্তায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্নদাবাবু বারান্দায় বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাড়ী গিয়া পৌঁছিলেন, বেলা তখন সাড়ে দশটার অধিক হইবে না। তখনো নলিনাক্ষ কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই অন্নদাবাবুর অভ্যর্থনাভার ক্ষেমঙ্করীকেই লইতে হইল।

ক্ষেমঙ্করী অন্নদাবাবুর শরীর ও সংসারের নানা কথা লইয়া প্রশ্ন ও আলোচনা উত্থাপিত করিলেন—মাঝে মাঝে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাঁহার কটাক্ষ ধাবিত হইল। সে মুখে কোনো উৎসাহের লক্ষণ নাই কেন? আসন্ন শুভঘটনার সম্ভাবনা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণরশ্মিচ্ছটার মত তাহার মুখে দীপ্তিবিকাশ করে নাই ত! বরঞ্চ হেমনলিনীর অন্যমনস্ক দৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ভাবনার অন্ধকার যেন দেখা যাইতেছিল।

অল্পেই ক্ষেমঙ্করীকে আঘাত করে। হেমনলিনীর এইরূপ ম্লানভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মন দমিয়া গেল। "নলিনের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই শিক্ষামদমত্তা মেয়েটি আমার নলিনকে কি তাঁহার যোগ্য বলিয়াই মনে করিতেছেন না? এত চিন্তা, এত বিধাই বা কিসের জন্য? আমারই দোষ। বুড়া হইয়া গেলাম, তবু ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। যেমনি ইচ্ছা হইল, অমনি আর সবুর সহিল না। বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে নলিনের বিবাহ স্থির করিলাম, অথচ তাহাকে ভাল করিয়া চিনিবার চেষ্টাও করিলাম না। হায় হায়, চিনিয়া দেখিবার মত সময় যে হাতে নাই—এখন সংসারের সব কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া যাইবার জন্য তলব আসিয়াছে।"

অন্নদাবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ক্ষেমঙ্করীর মনের ভিতরে ভিতরে এই সমস্ত চিন্তা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কথাবার্ত্তা কহা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি অন্নদাবাবুকে কহিলেন,—"দেখুন, বিবাহের সম্বন্ধে বেশি তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই। এঁদের দুজনেরই বয়স হইয়াছে, এখন এঁরা নিজেরাই বিচার করিয়া কাজ করিবেন, আমাদের তাগিদ দেওয়াটা ভাল হইতেছে না। হেমের মনের ভাব আমি অবশ্য বুঝি না—কিন্তু আমি নলিনের কথা বলিতে পারি, সে এখনো মন স্থির করিতে পারে নাই।"

এ কথাটা ক্ষেমঙ্করী হেমনলিনীকে বিশেষ করিয়া শুনাইবার জন্যই বলিলেন। হেমনলিনী অপ্রসন্নমনে চিন্তা করিতেছে, আর তাঁর ছেলেই যে বিবাহের প্রস্তাবে একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, এ ধারণা তিনি অপর পক্ষের মনে জন্মিতে দিতে পারেন না।

হেমনলিনী আজ এখানে আসিবার সময় খুব একটা চেষ্টাকৃত উৎসাহ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল—সেইজন্ত তাহার বিপরীত ফল হইল। ক্ষণিক উত্তেজনা একটা গভীর অবসাদের মধ্যে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন ক্ষেমঙ্করীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ তাহার মনকে একটা আশঙ্কা আক্রমণ করিয়া ধরিল,—যে নূতন জীবন-যাত্রার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার সম্মুখে অতিদূর-বিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সে মনে করিতে লাগিল, "এত-বড় একটা নূতন আরম্ভের উপযুক্ত আমার বল কোথায়, সাহস কোথায়—নিজের উপরে যাহার আস্থা নাই, সে এত-বড় দুরূহ ভার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে কি ভরসায়? আমি জানি, আমার ইহাতে লাভ আছে, যেরূপ আশ্রয়ের আমার প্রয়োজন, তাহা আমি এখানে পাইব। কিন্তু আমি কি কেবল লাভ করিতেই আসিয়াছি, আমাকে কিছু দিতে হইবে না? দিবার মত সম্বল আমার কি আছে?"

সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় যখন ক্ষেমঙ্করী বিবাহের প্রস্তাবটাকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলেন, তখন হেমনলিনীর মনে দুই বিপরীত-ভাবের উদয় হইল। বিবাহবন্ধনের মধ্যে শীঘ্র ধরা দিয়া নিজের সংশয়দোলায়িত দুর্ব্বল অবস্থা হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা তাহার থাকাতে, প্রস্তাবটাকে সে অনতিবিলম্বে পাকা করিয়া ফেলিতে চায়—অথচ প্রস্তাবটা চাপা পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া উপস্থিতমত সে একটা আরামও পাইল।

ক্ষেমঙ্করী কথাটা বলিয়াই হেমনলিনীর মুখের ভাব কটাক্ষপাতের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন এতক্ষণ-পরে হেমনলিনীর মুখের উপরে একটা শান্তির স্নিগ্ধতা অবতীর্ণ হইল। তাহাতে তাঁহার মনটা তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিলেন, "আমার নলিনকে আমি এত সস্তায় বিলাইয়া দিতে বসিয়াছিলাম!"—নলিনাক্ষ আজ যে আসিতে দেরি করিতেছে, ইহাতে তিনি খুসি হইলেন। হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"দেখেছ নলিনের আক্কেল! তোমরা আজ এখানে আসিবে সে জানে, তবু তাহার দেখা নাই! আজ না হয় কাজ কিছু কমই করিত! এই ত আমার একটু ব্যামো হলেই সে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া বাড়ীতেই থাকে—তাহাতে এতই কি লোক্‌সান হয়!"

এই বলিয়া আহারের আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিবার উপলক্ষ্যে কিছু-ক্ষণের ছুটি লইয়া ক্ষেমঙ্করী উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, হেমনলিনীকে তিনি কমলার উপর ভিড়াইয়া দিয়া নিরীহ বৃদ্ধটিকে লইয়াই কথাবার্ত্তা কহিবেন।

তিনি দেখিলেন, প্রস্তুত অন্ন মৃদু আগুনের আঁচে বসাইয়া রাখিয়া কমলা রান্নাঘরের এককোণে চুপটি করিয়া এমন গভীরভাবে কি-একটা ভাবিতেছিল যে, ক্ষেমঙ্করীর হঠাৎ আবির্ভাবে সে একেবারে চমকিয়া উঠিল।

পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"ওমা, আমি বলি, তুমি বুঝি রান্নার কাজে ভারি ব্যস্ত হইয়া আছ!"

কমলা কহিল, "রান্না সমস্ত সারা হইয়া গেছে মা!"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"তা, এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন মা? অন্নদাবাবু বুড়োমানুষ, তাঁর সাম্‌নে বাহির হইতে লজ্জা কি? হেম আসিয়াছেন, তাহাকে তোমার ঘরে ডাকিয়া-লইয়া একটু গল্পসল্প কর্'সে। আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে বসাইয়া-রাখিয়া তাহাকে দুঃখ দিব কেন?"

হেমনলিনীর নিকট হইতে প্রত্যাহত হইয়া কমলার প্রতি ক্ষেমঙ্করীর স্নেহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

কমলা সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "মা, আমি তাঁর সঙ্গে কি গল্প করিব! তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই জানি না।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"সে কি কথা! তুমি কাহারো চেয়ে কম নও মা! লেখাপড়া শিখিয়া যিনি আপনাকে যত বড়ই মনে করুন, তোমার চেয়ে বেশি আদর পাইবার যোগ্য কয়জন আছে? বই পড়িলে সকলেই বিদ্বান্ হইতে পারে, কিন্তু তোমার মত অমন লক্ষ্মীটি হওয়া কি সকলের সাধ্য? এস মা, এস! কিন্তু তোমার এ বেশে চলিবে না। তোমার উপযুক্ত সাজে তোমাকে আজ সাজাইব।"

সকল দিকেই ক্ষেমঙ্করী আজ হেম-নলিনীর গর্ব্ব খাট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রূপেও তিনি তাহাকে এই অল্পশিক্ষিতা মেয়েটির কাছে ম্লান করিতে চান। কমলা আপত্তি করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাকে ক্ষেমঙ্করী নিপুণহস্তে মনের মত করিয়া সাজাইয়া দিলেন, ফিরোজারঙের রেশ্‌মি শাড়ী পরাইলেন, নূতন ফ্যাশানের খোঁপা রচনা করিলেন—বারবার কমলার মুখ এদিকে ফিরাইয়া ওদিকে ফিরাইয়া দেখিলেন এবং মুগ্ধচিত্তে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন—"আহা, এ রূপ রাজার ঘরে মানাইত!"

কমলা মাঝে মাঝে কহিল—"মা, উঁহারা একলা বসিয়া আছেন—দেরি হইয়া যাই-তেছে!"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"তা, হোক্ দেরি! আজ আমি তোমাকে না সাজাইয়া যাইব না।"

সাজ সারা হইলে তিনি কমলাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন—"এস এস মা—লজ্জা করিয়ো না! তোমাকে দেখিয়া কালেজে-পড়া বিদুষী রূপসীরা লজ্জা পাইবেন, তুমি সকলের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পার।"

এই বলিয়া যে ঘরে অন্নদাবাবুরা বসিয়া-ছিলেন, সেই ঘরে ক্ষেমঙ্করী জোর করিয়া কমলাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, নলিনাক্ষ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। কমলা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু ক্ষেমঙ্করী তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন—কহিলেন, "লজ্জা কি মা, লজ্জা কিসের! সব আপনার লোক!"

কমলার রূপে এবং সজ্জায় ক্ষেমঙ্করী নিজের মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিতে-ছিলেন—তাহাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত

হউক্‌, এই তাঁহার ইচ্ছা। পুত্রাভিমানিনী জননী তাঁহার নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া আজ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ নলিনাক্ষের কাছেও হেমনলিনীকে খর্ব্ব করিতে পারিলে তিনি খুসি হন।

কমলাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হেমনলিনী প্রথমদিন যখন তাহার পরিচয়লাভ করিয়াছিল, তখন কমলার সাজসজ্জা কিছুই ছিল না—সে মলিনভাবে সঙ্কুচিত হইয়া একধারে বসিয়া ছিল, তাও বেশিক্ষণ ছিল না। তাহাকে সেদিন ভাল করিয়া দেখাই হয় নাই! আজ মুহূর্ত্তকাল সে বিস্মিত হইয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জিতা কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার পাশে বসাইল।

ক্ষেমঙ্করী বুঝিলেন, তিনি জয়লাভ করিয়াছেন—উপস্থিতসভায় সকলকেই মনে মনে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এমন রূপ দৈবপ্রসাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তিনি কমলাকে কহিলেন—"যাও'ত মা, তুমি হেমকে তোমার ঘরে লইয়া গল্পসল্প কর'গে যাও। আমি ততক্ষণ খাবার জোগাড় করিগে!"

কমলার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "হেমনলিনীর আমাকে কেমন লাগিবে কে জানে!"

এই হেমনলিনী একদিন এই ঘরের বধূ হইয়া আসিবে, কর্ত্রী হইয়া উঠিবে—ইহার ভ্রূকুটিকে কমলা উপেক্ষা করিতে পারে না। এ বাড়ীর গৃহিণীপদ তাহারই ছিল, কিন্তু সে কথা সে মনেও আনিতে চায় না—ঈর্ষাকে সে কোনোমতেই অন্তরে স্থান দিবে না,—তাহার কোনো দাবী নাই। তাই হেমনলিনীর সঙ্গে যাইবার সময় তাহার পা কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।

হেমনলিনী আস্তে আস্তে কমলাকে কহিল, "তোমার সব কথা আমি মা'র কাছে শুনিয়াছি। শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। তুমি আমাকে তোমার বোনের মত দেখিয়ো ভাই। তোমার কি বোন্‌ কেহ আছে?"

কমলা হেমনলিনীর সস্নেহ সকরুণ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া কহিল—"আমার আপন বোন্‌ কেহ নাই, আমার একটি খুড়তুতো বোন্‌ আছে।"

হেমনলিনী কহিল, "ভাই, আমার বোন্‌ কেহ নাই। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার মা মারা গেছেন। কতবার কত সুখ-দুঃখের সময় ভাবিয়াছি, 'মা ত নাই, তবু যদি আমার একটি বোন্‌ থাকিত!' ছেলেবেলা হইতে সব কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন খুলিয়া কোনো কথা বলিতেই পারি না। লোকে মনে করে, আমার ভারি দেমাক—কিন্তু তুমি ভাই এমন কথা কখনো মনে করিয়ো না! আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে!"

কমলার মন হইতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল—সে কহিল—"দিদি, আমাকে কি তোমার ভাল লাগিবে? আমাকে ত তুমি জান না, আমি ভারি মূর্খ!"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল—"আমাকে যখন তুমি ভাল করিয়া জানিবে, দেখিবে, আমিও ঘোর মূর্খ! আমি কেবল গোটাকতক

বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি, আর কিছুই জানি না। তাই আমি তোমাকে বলি, যদি আমার এ-বাড়ীতে আসা হয়, তুমি আমাকে কখনো ছাড়িয়ো না ভাই। কোনোদিন সংসারের ভার আমার একলার হাতে পড়িয়াছে মনে করিলে আমার ভয় হয়।”

কমলা শিশুর মত সরলচিত্তে কহিল—“ভার তুমি সমস্ত আমার উপর দিয়ো। আমি ছেলেবেলা হইতে কাজ করিয়া আসিয়াছি, আমি কোনো ভার লইতে ভয় করি না। আমরা দুইবোনে মিলিয়া সংসার চালাইব,—তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।”

হেমনলিনী কহিল—“আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামীকে ত তুমি ভাল করিয়া দেখ নাই, তাঁহাকে তোমার মনে পড়ে?”

কমলা কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল—“স্বামীকে যে মনে করিতে হয়, তাহা আমি জানিতাম না দিদি! খুড়ার বাড়ীতে যখন আসিলাম, তখন আমার খুড়তুতো-বোন্ শৈলদিদির সঙ্গে আমার ভাল করিয়া পরিচয় হইল। তিনি তাঁহার স্বামীকে যেরকম করিয়া সেবা করেন, তাহা চক্ষে দেখিয়া আমার প্রথম চৈতন্য জন্মিল। আমি যে-স্বামীকে কখনো দেখি নাই বলিলেই হয়, আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে যে কেমন করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবান্ আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন—এখন আমার স্বামী আমার মনের সুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন—তিনি আমাকে গ্রহণ না-ই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।”

কমলার এই ভক্তিসিঞ্চিত কথাকয়টি শুনিয়া হেমনলিনীর অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া গেল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—“তোমার কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অম্‌নি করিয়া পাওয়াই পাওয়া। আর সমস্ত পাওয়া লোভের পাওয়া—তাহা নষ্ট হইয়া যায়, বিকৃত হইয়া যায়। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যেরকম যথার্থভাবে পাইয়াছ, অম্‌নি করিয়া মানুষকে পাওয়া ভগবান্‌কেই পাওয়া। আগে আমি এ সমস্ত কিছুই বুঝিতাম না, তখন মন বড় সঙ্কীর্ণ ছিল। এখন আমার গুরুর কাছ হইতে শিখিয়াছি এবং অন্তরের মধ্যেও নানারূপে জানিয়াছি, পৃথিবীতে যাহা-কিছু ঠিক-মত করিয়া পাইব, তাহাতে তাঁহাকেই পাইব।”

কমলা এ কথা সম্পূর্ণ বুঝিল কি না, বলা যায় না;—সে হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া রহিল,—খানিক বাদে কহিল—“তুমি যাহা বলিতেছ দিদি, তা সত্যই হইবে। আমি মনে কোনো দুঃখ আসিতে দিই না—আমি ভালই আছি ভাই। আমি যেটুকু পাইয়াছি, তাই আমার লাভ।”

হেমনলিনী কমলার হাত নিজের হাতে তুলিয়া-লইয়া কহিল—“যখন ত্যাগ এবং লাভ একেবারে সমান হইয়া যায়, তখনই তাহা যথার্থ লাভ, এই কথা আমার গুরু বলেন। তখন আর ভয় নাই, দুঃখ নাই, ঈর্ষা নাই। এ কথা আমি মনে ধারণা করিবার চেষ্টা করি—তোমাকে দেখিয়া আমার এই ধারণা যেন আজ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল,—সুন্দর হইয়া উঠিল। সত্য বলিতেছি বোন্, তোমার মত

অমনি সমস্ত নিবেদন করিয়া-দিয়া যে সার্থকতা, তাহাই যদি আমার ঘটে, তবে আমি ধন্য হইব।"

কমলা কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল—"কেন দিদি, তুমি ত সবই পাইবে, তোমার ত কোনো অভাবই থাকিবে না।"

হেমনলিনী কহিল—"যেটুকু পাইবার মত পাওয়া, সেটুকু পাইয়াই যেন সুখী হইতে পারি—তার চেয়ে বেশি যতটুকুই পাওয়া যায়, তার অনেক ভার, অনেক দুঃখ। আমার মুখে এ সব কথা তোমার আশ্চর্য্য লাগিবে—আমার নিজেরও আশ্চর্য্য লাগে—কিন্তু এ সব কথা ঈশ্বর আমাকে ভাবাইতেছেন। জান না বোন্, আজ আমার মনে কি ভার চাপিয়া ছিল—তোমাকে পাইয়া আমার হৃদয় হাল্‌কা হইল—আমি বল পাইলাম—তাই আমি এত বকিতেছি। আমি কখনো কথা কহিতে পারি না—তুমি কেমন করিয়া আমার সব কথা টানিয়া লইতেছ ভাই?"

ক্রমশ।

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।*

অদ্য বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্ এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে সর্ব্বপ্রথমে সম্ভাষণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের কোন্‌খানে যোগ, সে কথা হয় ত তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আরো একটি প্রশ্ন তাঁহাদের মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি—তাঁহারা বলিতে পারেন, আমার মত উপাধিবিহীন লোকের উপরেই বা সম্ভাষণের ভার পড়ে কেন?

আজকাল বাংলাভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে যে স্থানটি বোঝায়, সেখানে কোনোদিন আমার কোনো গতিবিধি ছিল না। জননী বীণাপাণির পদ্মবনটির প্রতি শিশুকাল হইতেই আমার লোভ ছিল, তোমরা লোকমুখে তাহা শুনিয়া থাকিবে; কিন্তু তাঁহার কমলসরোবরের তীরে শুক্লমশায়-অধিরাজিত যে বেত্রবনটা কণ্টকিত হইয়া আছে, সেটাকে আমি অত্যন্ত বেশি ডরাইতাম। কি উপায়ে, তীরস্থ না হইয়াও, একেবারে মাতার মধুগন্ধ পদ্মকেশরের মধ্যে মনের সাধে লুটাইয়া আসিতে পারি, সেই আমার একমাত্র চিন্তা ছিল। এইরূপে গুরুমশায়কে এবং নিজেকে আমি ফাঁকি দিয়াছি। সে সকল লজ্জার কথা বিস্তারিত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে সহজে যে

* গত ১৭ই চৈত্র ক্লাসিক্ রঙ্গমঞ্চে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্তৃক পঠিত।

অর্থ বোঝায়, তাহার দোহাই দিয়া আমি কিঞ্চিৎ ভরসা পাইতে পারি। সেই key-book-সহায়বর্জ্জিত মহাবিদ্যালয়ে আমি সাধ্যমত ফাঁকি দিই নাই। অন্তত সেই বিদ্যালয়ে পড়িবার অবকাশ তোমাদের চেয়ে আমি বেশি পাইয়াছি। কারণ, আর কিছু না হউক, তোমাদের চেয়ে আমার বয়স বেশি, সে কথা তোমাদিগকে বিনা ঈর্ষায় স্বীকার করিতে হইবে। বিধাতার কৃপায়, বয়সে বড় হইবার জন্ম বিশেষ কোনো সাধনার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তবু বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেয়ে চল্লিশ উত্তীর্ণ হইতে কম চোখের জল ফেলিতে হয় না এবং ইচ্ছা করি আর না করি, শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিতে হয়। সেই বয়োজ্যেষ্ঠতার স্পর্দ্ধায় আমি নববিদ্যালাভের গৌরবে দীপ্যমান তোমাদিগকে সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইয়াছি।

এখন আর একটা কথা, ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের যোগ কোথায়?—যোগ আছে। সেই যোগ অনুভব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অদ্যকার এই সভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা সকলেই জান, আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায়, তাহার স্থানে স্থানে তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এবং অপর অংশে জ্যোতির্বাষ্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—কিন্তু সংহত-অসংহত সমস্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ। আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ম্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎকে তাহারই একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে, ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্বাষ্পের মত বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই দুই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি, পঞ্চাশবছর পূর্ব্বে তাহা মুখে আনিবার জো ছিল না। তখন ইংরেজিশিক্ষামদে উন্মত্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈন্যকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয়সাহিত্যকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখানকার ব্যবধানরেখা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখনো ইংরেজিরচনা ও ইংরেজিবক্তৃতার খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন কি, যাঁহারা বাংলাসাহিত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেন, তাঁহারা ইংরেজিমাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না, তখন কেহ বা বাংলার মিল্‌টন্‌, কেহ বা বাংলার বায়রন্‌, কেহ বা বাংলার স্কট্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক্ বলিলে

আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারো সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না ; কারণ, গ্যারিক্ যখন নষ্টলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।

কিন্তু প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক। কারণ, বাংলায় বায়রন্-স্কটের সুদূর সাদৃশ্য যে মিলিতে পারে, এ কথা ইংরেজি-ওয়ালার পক্ষে স্বীকার করা তখনকার দিনের একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

এখনকার তৃতীয় অবস্থায় ঐ ইংরেজি-উপাধিগুলার কুয়াশা কাটিয়া-গিয়া বাংলা-সাহিত্য আর কাহারো সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের যথার্থ সম্মান ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে।

ইহার কারণ, বাংলাসাহিত্য ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ অনুভব করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুমশায়ের অপরিমিত শাসন হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া আসিতেছে। একদিন গেছে, যখন আমাদের শিক্ষিতলোকেরা ইংরেজিপুঁথির প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরেজিগ্রস্ততা এতদূর পর্য্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি বিধিবিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া জামাইষষ্ঠী ফিরাইয়া দিয়াছে এবং আত্মীয় করিয়া বান্ধবের গায়ে আবির-লেপনকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছে,—এত-বড় শিক্ষিত-মূর্খতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এ রোগের সমস্ত উপসর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দ্বারে ধরা না দিয়া নিজে সন্ধান করিতে, নিজে যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন কি, পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও সাহস হয়।

নিজের মধ্যে এই যে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি, যে অনুভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, ইহা কোনো-একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকলদিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজে, সর্ব্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমস্তই আমরা খৃষ্টান পাদ্রির চোখে দেখিতাম—পাদ্রির কষ্টিপাথরে কোন্‌টাতে কিরকম দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের সমস্ত জিনিষকে বিচার করিতে হইত।

প্রথম-প্রথম সে বিচারে দেশের কোনো জিনিষেরই মূল্য ছিল না। তার পরে মাঝে আর একটু ভাল লক্ষণ দেখা দিল। তখন আমরা বিলিতি গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের দেশে যা-কিছু গৌরবের বিষয় আছে, আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল;—আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন ছিল, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং ঋষিরা জানিতেন সূর্য্যালোকে গাছপালা অক্সিজেন্-নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সেইজন্যই প্রাতঃ-

কালে পূজার পুষ্পচয়নের বিধান হইয়াছে। এ কথা বলিবার সাহস ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং ফাঁকি দিয়া অক্সিজেন্‌বাষ্প গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্ম্মল প্রত্যুষে সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে সুন্দরভাবে দেবতার সেবায় লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনো এ ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ কথা এখনো সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই যে, পাদ্রির কষ্টি-পাথরে যাহা উজ্জ্বল দাগ দেয়, তাহা মূল্যবান্ হইতে পারে, কিন্তু জগতে সোনাই ত এক-মাত্র মূল্যবান্ পদার্থ নয়;—পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান্ জিনিষও জগতে আছে। যাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজকাল অল্প অল্প করিয়া এ কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদ্রির বিচারে যাহা নিন্দনীয়, বিলাতের বিধানে যাহা গর্হিত, আমাদের দিক্ হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা যাহাকে পলিটিক্স্ বলি, তাহার মধ্যেও এই ভাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে যাহা সাধুনয় প্রসাদভিক্ষা ছিল, দ্বিতীয় অবস্থাতে তাহার ঝুলি খসে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্যরকম হইয়া গেছে—ভিক্ষু-কতা যতদূর পর্য্যন্ত উদ্ধত স্পর্দ্ধার আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা করিয়াছে। আমা-দের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতী রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেষ্টা করিতেছি। এ কথা বলিতে সুরু করিয়াছি যে, হাতজোড় করিয়াই ভিক্ষা করি, আর চোখ রাঙাইয়াই ভিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না—দেশের জন্য স্বাধীনশক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি, তাহাতে দুইদিকে লাভ—এক ত ফললাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফললাভের চেয়ে বেশি বই কম নয়—সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদের দেশের গুরু বলিয়াছেন, ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া কর্ম্ম করিবে। ভিক্ষার অগৌরব এই যে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সার্থকতা, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহাই হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক্ দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন-শক্তির গৌরব অনুভব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি—সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্স পর্য্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্ব্বে ইংরেজিশিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন-নবীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন তাহার উল্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা-বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজিবিশ্ববিদ্যা-

লয়ের ছাত্রদিগকেও স্থাপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, সেখান হইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছা-সমাগত সেবকদের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন।

পূর্ব্বে এমন দিন ছিল, যখন এই ইংরেজি-পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি মিলিত না। বাড়ী আসিতাম, সেখানেও পাঠ-শালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজিকাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি-বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক্, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া ত শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট্‌খেলাতেও না হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব, ওটা মাটির প্রদীপ? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় ত সে দোষ কার্? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনি হোক্ না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক্, যখন আনন্দের দিন আসিবে, তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহে ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার কেন্দ্রে আসিয়াছি। আজ সাহিত্যপরিষদ্ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কলেজক্লাস্ হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট্‌ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটিই জ্বলিতেছে। সেখানে আয়োজন খুব বেশি নাই—কিন্তু তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে শ্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্তদিন যিনি পথ তাকা-ইয়া বসিয়া আছেন, আয়োজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে? তিনি এইমাত্র জানেন যে, তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি, তোমাদের এক-মাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালব্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে—সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্ আজ তোমা-দিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

যে ব্যাপারের মধ্যে উদ্যোগের সহিত নিবিষ্ট থাকিতে হয়, সেটা উপস্থিতমত মানু-ষের কাছে অত্যন্ত বেশি বড় না হইয়া থাকিতে পারে না। ঘরে যদি বিবাহ থাকে, তবে পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ ব্যাপার তাহার কাছে ছায়ার মত হইয়া যায়। তেম্নি পরীক্ষা দিবার কাণ্ডটি ছাত্রদের পক্ষে রুষজাপানের যুদ্ধের চেয়ে গুরুতর।

কিন্তু কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে, তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে

না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে।

অন্ত দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে, বিদ্যাশিক্ষা কালক্রমে কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কি করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্য্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি—আমার অনুনয়, বাঙালী ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীনশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন—যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তি-প্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে পারিবে!

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজিবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিষ আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ

আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্ব্বল হইবেই। যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে, যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয়, তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে-বাহিরে নানাস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কি জিনিষ, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্ম্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্ব্বক, অভিনিবেশপূর্ব্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্ম্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন, দূরদেশের ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় বই পড়িয়ামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না। এমন কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অদ্ভুতপূর্ব্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম্ম, সমাজ, এমন কি, সাহিত্য সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জ্জিত হইলে আমাদের

মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ নানাপ্রকার অসঙ্গত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এতকাল গেল, তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত-অনুকরণ-মূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে, আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না,—আমাদের দেশ যে কিরূপ, তাহা সন্ধানপূর্ব্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা-তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত প্যাট্রিয়ট্‌ ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চাল-চিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন—শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিয়টিজ্‌মের অর্থ বুঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মত ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্‌ আপনার আলোচ্যবিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন্‌। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিক্‌কে, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চ্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চ্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষদ্‌ সার্থকতালাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুইএকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা

সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণসংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলা-দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। বাংলার উচ্চারণবিধি এবং অপভ্রংশের কি নিয়ম অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত মূলশব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে সমস্ত উপভাষার মধ্যে রূপান্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। বাংলা কারকচিহ্নগুলির মূল কোথায়, তাহা সহজে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বাংলা কর্ম্ম-কারকে "কে" "রে" বা "এ" বিভক্তি, সম্বন্ধের "র"বিভক্তি কোথা হইতে আসিল, তাহা সন্ধান করিবার বিষয়। কোনো কোনো ইংরেজপণ্ডিত বলেন, এই বিভক্তি-গুলি আদিম অনার্য্যভাষার চিহ্ন, সংস্কৃত-ভাষার সহিত ইহাদের যোগ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু এই তর্কের মীমাংসা যে পর্য্যন্ত না বিদেশী পণ্ডিতেরা করিয়া দিবেন, সে পর্য্যন্ত কি আমরা স্তব্ধ হইয়া থাকিব? বাংলার কর্ম্মকারক ও সম্বন্ধের বহুবচনের রূপটি একটি সমস্যা। "দিগকে" ও "দিগের" কোথা হইতে আসিল? আমাদের বিচিত্র উপভাষার অরণ্যের মধ্যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

যদি যথেষ্টপরিমাণে ইচ্ছুক ছাত্র পাওয়া যায় এবং এইপ্রকার ভাষার তথ্য সন্ধান করা, সংগ্রহ করা, শ্রেণীবিন্যাস করা ও তত্ত্বনির্ণয় করার কাজে পরিষদের কোনো উপযুক্ত পণ্ডিতসভ্য তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ছাত্রদের শিক্ষা, পরিষদের কর্ত্তব্য-সম্পাদন ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, সমস্ত একসঙ্গে হইতে পারে।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃতলোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত-লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দ-চরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্ত্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক্ না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানায়ই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ

যদি বঙ্গ প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnologyর বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত্ত, পোদ্-বাগ্দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্ম আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথিসম্বন্ধে আমাদের কত-বড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত-বড় মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদি-নিকেতনে একবার যদি জড়ত্বত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশী-দের সমস্ত খোঁজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্ব্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া, গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য-বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য-পরিষদ্ নিজের কর্ত্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্ম্ম-শালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্ম আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্র-গণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূরকালের কথা বোঝায়, এত-বড় প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না—কিন্তু আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্ত্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্ত্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্ত্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীন-তন্ত্র লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে খোঁটা দিতে বসেন—তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চস্মাচোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি, তাহা যথার্থ কি না, তাহার বিচারক একা আমি

নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভাল কি মন্দ, তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে—কিন্তু ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ-এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কি চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন সকল সঙ্কল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে না—এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি, তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা,—বালকেরা,—সকলেই যে একবয়সী ছিলাম, তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্ককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথের যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি?

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল; কর্ম্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃ-মাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেম্‌নি আশা-উৎসাহ-মাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাতপা ছুঁড়িতে থাকে,—তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে—কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে, তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্পবয়সের উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে, উদ্দামভাবে চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল

—তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া-পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল, অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথমবয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই —লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্য্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়্‌রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবাল্‌ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজ্‌মের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম—এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চোখে ধূলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

"আইডিয়া" যত বড়ই হৌক্, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক্, দীন হউক্, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে, হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণসুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র —কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লিতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্যভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরাণিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্দ্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে ত অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হৌক্, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মত বাহির হইলাম, ভিখারীর মত পরের

দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ,—নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দ্দিষ্ট—এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিটখাম্বাজরাগিণীতে যতই মর্ম্মভেদী হউক না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝঙ্কারমধুর বেতনটি মিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এম্‌নি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে, সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরী স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিনশেষ করে—একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্যনির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সঙ্কল্পকল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া শিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়ই হৌক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবেই।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহঙ্কারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালসজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মুক্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুদ্ধ বড়জিনিষ কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোট মুখে বড় কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোট কাজ সুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না; স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চ্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চ্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে কি, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও ত ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মত পক্ককেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ-আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনের যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাতসূর্য্যরশ্মিনির্ম্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ব্বিচারে আত্মবিসর্জ্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র-

বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—নিজের ব্যবসায়ের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে;—আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমরমহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মত বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্ম্মের পথে। কর্ম্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে—কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতে হয়;—এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নতব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ ত সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই;—দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই—প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্ব্বেই বসাইয়াছেন, সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ—আর আজ সাহিত্য-পরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন, তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে—সে আহ্বান দেশের "উৎসবে ব্যসনে চৈব," কিন্তু "রাজদ্বারে শ্মশানে চ" নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না?—সাহিত্যপরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি—দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহনখ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না—সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবক-

দের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্ম্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক কর। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্ম্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষ্যের অভাব নাই, সেজন্ত গবর্মেণ্টের কোনো আইনপাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধদ্বারের কাছে অনন্তকর্ম্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্তক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্যবিষয়সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা ত শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশীভাষার ব্যাকরণ চর্চ্চা কর, অভিধান সঙ্কলন কর, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ কর। এই সামান্ত প্রস্তাবের অবতারণার জন্ত এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসঙ্গত হইয়াছে। হইয়াছে তাহা স্বীকার করি—কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসঙ্গত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্ত দেশবিদেশের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া তিনি কূলকিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যত্ন করিয়া বুঝাইতে হয়—আগে দেখ তোমার ছেলেটা কোথায় আছে, কি করিতেছে, সে পাতকুয়ায় পড়িল, কি আল্‌পিন্‌ গিলিয়া বসিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, কি শীত করিতেছে? এ সব কথা সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্তু যদি দুর্দ্দৈবক্রমে বিশেষস্থলে বলা আবশ্তক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্ত বক্তৃতা কর, সভা কর, তর্ক কর, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জান ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা কর, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্ত্তব্যসম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্ত কথা বলিতে যদি অসামান্ত বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জ্জনা করিতে হইবে। বস্তুত সকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে, তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না—সূর্য্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না—অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্‌ঝটিকার মাঝে মাঝে ঐ যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে—সূর্য্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মত আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিনচারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে—আর ভয় নাই—আমাদের রাজপথ গৃহদ্বারের সম্মুখেই অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—তখন দিগ্‌দিগন্তরে দশজনে মিলিয়া দশপ্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতণ্ডা করিতে হইবে না—তখন সকলে আপনআপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ

নির্ব্বাচন করিয়া, তর্কসভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব—তখন নিকটের কাজকে দূর বলিয়া মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেইজন্য, পরিষদের অন্তকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর—তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননি, সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীর-প্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তান-দের পদধ্বনি ঐ শুনা যাইতেছে,—এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো-বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্গদ আশীর্ব্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।

ভট্টাচার্য্যমহাশয়।

সিপাহীবিদ্রোহের কিছুদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপের শ্যামাপদ শিরোমণি মহাশয় প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। চৈত্রসংক্রান্তির আর বড় দেরি নাই, গ্রামে গ্রামে গাজনের উৎসববাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রি গৌরীপুরগ্রামে কুটুম্বগৃহে যাপন করিয়া প্রত্যূষে তিনি আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সঙ্গে একজনমাত্র ভার-বাহী, খড়িনদীর ধারে পৌঁছিতে বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইল। রাজপুরের ঘাটের উপর ক্ষুদ্র আম্রবাটিকা দেখিয়া তিনি বিশ্রাম ও স্নানা-দির জন্য উপবেশন করিলেন। নিকটে কোথাও গ্রাম নাই; বিরলবিটপী, কদাচিৎ সুপক্করবিশস্যক্ষেত্রখচিত প্রান্তর চারি-দিকে ধূ ধূ করিতেছে। বিকশিত-চূতমুকুল-পরিমল-লোভে দলে দলে সমাগত মৌমাছি-ভ্রমরের গুঞ্জনরব ছাড়া আর কোন শব্দ সেখানে শোনা যাইতেছিল না। কেবল দূরে গ্রামপ্রান্তে অরুণপুষ্পিত যে দীর্ঘ শাল্মলীতরুযুগল আকাশ চুম্বন করিতেছে, তাহাদের শাখান্তরাল হইতে কখন-কখন কুঞ্জনবৃত কোকিলের অস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি ঈষৎ বায়ুহিল্লোলে প্রহত হইতেছিল।

শিরোমণিমহাশয় সাধারণত তাঁহার কৌলিক ভট্টাচার্য্যনামে পরিচিত। বড় বড় পণ্ডিতবিদায়সভায় নিমন্ত্রণরক্ষা উপলক্ষে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিপত্তি। তা ছাড়া, শিষ্যসেবকও অনেকগুলি। কিন্তু চালচলনে চিরদিন তিনি গরিব। একমাত্র ভারবাহী মাধবদাসকে সহায় করিয়া পদব্রজে

বৎসরের মধ্যে ছয়সাতমাস বাঙ্‌লা পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন, তাহাতে ক্লেশ কি অমর্য্যাদা অনুভব করিতেন না।

মাধব পেটারি হইতে ডাবাহুঁকা বাহির করিয়া তাহাতে জল পুরিল এবং একছিলিম তামাক সাজিয়া প্রভুকে সেবন করিতে দিবার পূর্ব্বে নল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটি আম্রশাখা ভাঙিতে উদ্যত হইল। শিরোমণি ইহা নিবারণ করিলেন। তন্ময় হইয়া তিনি প্রস্ফুটিত মুকুলস্তবকের শোভা এবং তাহাতে প্রমত্ত মধুপকুলের সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতেছিলেন।

এমন সময়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক নদীর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রায় সকলেরই কক্ষে পিত্তলকলস এবং অধিকাংশের হাতে রূপার পৈঁছা ও খাড়ু। দুইটি প্রৌঢ়া বিধবার নেতৃত্বে অবগুণ্ঠনবতী গ্রামবধূর দল অবগাহন ও পানীয় জল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে দেখিয়া সহজেই তাহারা সঙ্কুচিত হইল এবং উত্তপ্ত নদীসৈকত ভাঙিয়া দূরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিয়া তিনি কিছু ব্যস্ত হইলেন। মাধবদাস প্রভুর নির্দ্দেশমত ছুটিয়া আসিল এবং বলিয়া গেল, "মাসকল, ঠাকুর ইচ্ছা করেন এইখানেই তোমরা চান্ কর, তিনি আড়ালে যাচ্চেন।" তখন শিরোমণি পেটারি ও বস্ত্রাদি সেইখানে রাখিয়া মাধবদাসসঙ্গে মেয়েদের দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইয়া গেলেন।

তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া তাহারা পূর্ণকুম্ভকক্ষে ঘাট হইতে উঠিল, কিন্তু চলিয়া না গিয়া ঠাকুরের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, সম্ভবত মেয়েগুলি তাঁহার দ্রব্যাদি অরক্ষিতাবস্থায় ফেলিয়া যাইতে ইতস্তত করিতেছে। কাজেই তাঁহাকে সেখানে ফিরিতে হইল। কিন্তু তথাপি তাহারা সেই-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, অনেকে কেবল আপন-আপন অবগুণ্ঠনের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিল। তখন তাঁহার কাছে তাহাদের অবশ্য কিছু প্রার্থনীয় আছে অনুমান করিয়া শিরোমণিমহাশয় মহিলাদের সম্মুখীন হইলেন।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কারা পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ়া দুইজন কক্ষের কলস হইতে কিছু কিছু জল মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর পূর্ণকুম্ভ-দুইটি রাখিল এবং ঠাকুরকে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তখন উভয়েই করজোড়ে প্রার্থনা করিল, আজ মধ্যাহ্নে, তাঁহাকে তাহাদের গৃহে পদধূলি দিতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণীর কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, বাসন্তী-পূজার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিবেন। এবার অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রস্নানে যাইবার মানসে তিনি স্বামীর প্রবাসযাত্রা নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। শিরোমণিমহাশয় অন্নপূর্ণা-পূজার ব্যবস্থা করিয়া সে আব্দার থামাইয়া যান। অতএব পথে আর একদিনও দেরি করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না।

সে কথা মেয়েদের সংক্ষেপে বলিয়া শিরোমণি সুধাইলেন, তাহাদের গ্রাম কতদূর এবং কি পর্ব্বোপলক্ষে আজ নদীস্নানে আসা হইয়াছে।

উত্তরে শুনিলেন যে, রাজপুরগ্রামেই তাহাদের বাস, প্রায় আধক্রোশ হাঁটিয়া প্রত্যহ দুইটি বেলা পানীয়জলসংগ্রহার্থ এইখানে সকলকে আসিতে হয়। কেন না, গ্রামের প্রাচীন দীর্ঘিকা ফাল্গুনমাসেই শুকাইয়া গিয়াছে, এবং দুইবৎসর হইতে এইরূপ জলকষ্ট যাইতেছে। সরিকী বিবাদে গ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদারদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাঁহারা কোন প্রতীকার করিতে পারেন না, তাঁহাদের মেয়েছেলেরা পর্য্যন্ত প্রত্যূষে এখানে আসিয়া স্নানাদি করিয়া যান। রাজপুরে বরং ১৪টা ডোবা আছে, নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামগুলিতে তাহাও নাই।

নতনয়না প্রৌঢ়াদের মুখে জলকষ্টের এই কাহিনী শুনিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণ করুণার্দ্র হইলেন। সহসা চিত্ত স্থির করিয়া বলিলেন, "মাসকল, আজ তোমরা ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের নিমন্ত্রণ আমার মনে রহিল। বৈশাখের শেষে আমি তোমাদের দেখা দিব।"

মহিলারা চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য স্নানাহ্নিক শেষ করিলেন, এমনসময় দূরের ঢক্কানিনাদ ক্রমশ নিকটতর হইল। তখন গাজনের সন্ন্যাসীরা দলে দলে বেত্রদণ্ডহস্তে নাচিতে নাচিতে নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের সকলেরই অঙ্গে স্ত্রীজনোচিত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার এবং সকলের সমবেত কণ্ঠে "জয় শিবশম্ভু" ঘন ঘন উচ্চারিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

সন্ন্যাসীদের স্নান শেষ হইলে কেহ একজন দ্রুতপদে আম্রবাটিকায় আসিল এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শিরোমণিমহাশয়ের সম্মুখে দুইটি কচিডাব স্থাপন করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন যে, মেয়েরা বাটী পৌঁছিয়াই তাঁহার জন্য ভক্তির এই উপহার পাঠাইয়াছে। ব্রাহ্মণ হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িল।

সন্ন্যাসীদের তিনি নিকটে ডাকাইলেন। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, রাজপুরের মাঠে, গ্রামের অদূরে অথচ বাহিরে যে পরিষ্কার ভূমিখণ্ড আছে, তথায় একটি দীঘি কাটাইয়া দিলে ৫।৭খানি গ্রামের লোকে জল খাইয়া বাঁচিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভূমিখণ্ড যাহার লাখেরাজ সম্পত্তি, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসিদলে উপস্থিত ছিল। পঞ্চাশ-টাকা মূল্যে সে জমিটুকু ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল। হিসাব করিয়া শিরোমণিমহাশয় দেখিলেন, ন্যূনাধিক দেড়সহস্র মুদ্রায় কার্য্যটি সম্পন্ন হইবে।

তখন সেই সমবেত সন্ন্যাসিদল হইতে পাঁচ গ্রামের পাঁচজন প্রধান লোক নির্ব্বাচন করিয়া তিনি একটি পঞ্চায়েৎ গঠন করিলেন। পেটারি হইতে তুলাট কাগজ ও লেখনী বাহির করিলেন, মাধব লাক্ষারসে কালী প্রস্তুত করিয়া দিল। জমিদারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ যিনি, তাঁহার নাম জানিয়া লইয়া শিরোমণি তাঁহাকে সংক্ষেপে একখানি পত্র লিখিলেন,—তাঁহার সহায়তায় পঞ্চাইতেরা যেন আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার মধ্যে পুষ্করিণীখনন শেষ করে। কেন না, সেইদিন সস্ত্রীক রাজপুরে আসিয়া তিনি উহা উৎসর্গ করিয়া যাইবেন।

পেটারির ভিতর ক্ষুদ্র কাঠের বাক্সে

স্বর্ণরৌপ্যমুদ্রার প্রায় দেড়হাজার টাকাই এবার শিরোমণিমহাশয় জমা করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই অর্থে গৃহিণীর নিকট বহুদিনের প্রতিশ্রুতিরক্ষা অর্থাৎ সস্ত্রীক তীর্থদর্শন এবং ভবিষ্যতের অন্নসংস্থানের জন্ত একটা ভাল জোৎ খরিদ করিবেন। কিন্তু সে কথা আর মনে ঠাঁই দিলেন না। গণিয়া টাকাগুলি পঞ্চাইতের প্রধান ব্যক্তির হাতে দিলেন এবং প্রয়োজন হইলে আরও সাহায্য পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

লোকগুলি আশ্চর্য্য হইয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য দেখিল। সকলে একবাক্যে অনুরোধ করিল, তিনি নিজে গ্রামে পদার্পণ করিয়া জমিদারের হস্তে এই অর্থ দিলে ভাল হইত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিলেন;—"বাপুসকল, তোমাদের নিজের কাজ, ধর্ম্ম ভেবে তোমরা করিবে। জমিদারমহাশয়কে চিঠি দিলাম—নহিলে তিনি অভিমান করিয়া তোমাদের কার্য্যে বাধা দিলেও দিতে পারেন।" সন্ন্যাসীরা পরস্পর মুক্তকণ্ঠে "শিবশম্ভু"র জয়রবের সহিত শিরোমণিমহাশয়ের নাম সংযোগ করিতে করিতে গাজনতলায় ফিরিয়া গেল। তখন আর দেরিমাত্র না করিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার দানের কথা পাঁচখানি গ্রামের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণ তিনি বাঁকাপথে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন—লোকে দেখিতে না পায়! সকলে বলাবলি করিল, "কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন।"

যথাসময়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেন। এবার গৃহিণী তীর্থদর্শনের আশায় অতিশয় উৎসাহান্বিতা ছিলেন; সেই উৎসাহের আবেগ তিনি অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই—প্রথম সাক্ষাতে কুশলাদিজিজ্ঞাসার আদানপ্রদানের পরই গৃহিণী সত্বর তীর্থে যাইবার দিন স্থির করিবার আবেদন কর্ত্তাটির নিকট পেশ করিলেন। কর্ত্তা তাহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু চাপাহাসি হাসিলেন—সে হাসি যে উৎসাহসূচক নহে, তাহা গৃহিণীর বুঝিতে বাকি রহিল না। সহসা কোথা হইতে শরতের মেঘের মত রাগ ও অভিমানের কালো ছায়া গৃহিণীর মুখচন্দ্রমা আবৃত করিয়া দিল, বুঝিয়া কর্ত্তা উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন; রামপ্রসাদী সুরে তিনি বলিলেন—

> "কাজ কিরে মোর কাশী!
> ঘরে বসে দেখবো আমি গয়া গঙ্গা বারাণসী।
> আমার কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশিরাশি।"

ইত্যাদি।

ইহাতে সহধর্ম্মিণীর রাগ-অভিমান কমিল না, বরং বাড়িল। তখন ভট্টাচার্য্যমহাশয় অগত্যা রাজপুরের নূতন-পুষ্করিণী-খননের ও সেজন্ত রিক্তহস্ততার কথা গৃহিণীকে শুনাইলেন। এ সংবাদে যেন আগুনে জল পড়িল, রাগ-রোষ সব চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণী পরমানন্দ লাভ করিলেন, পরে যথাকালে স্বামীর সঙ্গে রাজপুরে উপনীত হইয়া সেই মেয়েদের দেখা দিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় জলাশয় উৎসর্গ করা হইল।

ইহার তিনবৎসর পরে জমিদারমহাশয়েরা নূতন দীর্ঘিকার চারিটি রোহিতমৎস্য

ধরাইয়া শিরোমণিমহাশয়কে উপহার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বাহকটিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া মৎস্যের মূল্যস্বরূপ কয়েকটি মুদ্রা তাহার সঙ্গে ফেরৎ পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, উহা পুষ্করিণীর সংস্কারকার্য্যে ব্যয় হইবে।

রাজপুরগ্রামে আজও সেই পুষ্করিণী আছে—তাহা 'ভট্টাচার্য্যপুকুর' বলিয়াই খ্যাত। গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের শত শত নরনারী স্নানের ও পানের জন্য সেই জলই ব্যবহার করে। সে অঞ্চলে আর দ্বিতীয় পুষ্করিণী নাই—কিন্তু সংস্কার-অভাবে সে পুষ্করিণীটিরও অবস্থা শোচনীয়, বারমাস ব্যবহারের উপযুক্ত জল থাকে না, তবু সেদিকের লোকের ভরসা সেই 'ভট্টাচার্য্যপুষ্করিণী।'

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ।

গত চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে 'রঘুবংশ'নামক প্রবন্ধে রঘুবংশের অন্তর্ভুক্ত দিলীপের উপাখ্যানের মূল কোথায়, এই প্রশ্ন উত্থাপিত ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের অন্তর্গত ঋতম্ভরের উপাখ্যান উহার মূল হইতেও পারে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

প্রবন্ধের লেখক বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে প্রবন্ধসম্বন্ধে আমার মন্তব্যপ্রকাশের অবকাশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন ও তন্নিমিত্ত কয়েকখানি মুদ্রিত পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

বহুদিন হইতে আমার জানা ছিল, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম অংশটা অর্থাৎ প্রথম আটসর্গের বর্ণিত বৃত্তান্তসমুদয় রহিয়াছে। আমার খুল্লপিতামহের সংগৃহীত হাতে-লেখা পুরাণসমূহের মধ্যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড একখানি রহিয়াছে। ঐ পুঁথিখানি আমার ঐ বিশ্বাসের অবলম্বন।

এই পাতালখণ্ডের প্রায় আরম্ভেই সূর্য্যবংশবর্ণনা। ভগবান্ শেষ বক্তা, ঋষি বাৎস্যায়ন শ্রোতা। চতুর্থ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনু হইতে খট্টাঙ্গ পর্য্যন্ত রাজগণের কথা। পঞ্চমে দিলীপের কথার আরম্ভ ও একাদশে অজের স্বর্গারোহণ। পাতালখণ্ডের এই সাতটি অধ্যায়, আর কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম আটসর্গ,—এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, একে অন্যের নিকট ঋণী, তাহার কোন সংশয় থাকে না।

নমুনাস্বরূপ গোটাকতক শ্লোক এখন এখান হইতে তুলিয়া দেখাইব। পাতালখণ্ডের শ্লোক তুলিব—রঘুবংশ হইতে তুলিবার প্রয়োজন নাই।

দিলীপস্তু মহাভাগঃ সর্ব্বসদ্‌গুণভূষিতঃ।
মহোরস্কো মহাপ্রাণো মহাস্কন্ধো মহাভুজঃ॥

* * *

কন্যাং মগধরাজস্য নাম্না বিপ্র সুদক্ষিণাম্।
উপযেমে মহাশীলাং পতিব্রতপরায়ণাম্॥

* * *

দম্পতী রথমাস্থায় বৃদ্ধসারথিসংহিতম্।
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ সায়ং শিষ্যগণৈর্বৃতম্॥

* * *

স্কন্ধাসক্তসমিদ্দর্ভৈঃ প্রত্যায়াতৈর্বনান্তরাৎ।
শিষ্যৈঃ প্রপূজ্যমানঞ্চ সায়ং সন্ধ্যার্থিভির্দ্ধ্রুতম্॥

* * *

মুনিকন্যাগণৈঃ সিচ্য তরুমূলানি সর্ব্বতঃ।
বিশ্রামার্থং নিবদ্ধৈশ্চ পরিস্কঃ পরিশোভিতম্॥

* * *

এষা ব্রহ্মংস্তব বধূর্ভার্য্যা মম সুদক্ষিণা।
ন ধারয়তি যদ্‌গর্ভং তেন দুঃখং * *॥

* * *

মত্তোহথ দুর্লভঃ পিণ্ডঃ পূর্ব্বেষাং পরমেব হি।
বংশবিচ্ছেদকর্ত্তাহং পিতৃণাং দুঃখকারণম্॥

*

অথামুং বোধয়ামাস সন্ততিস্তম্ভকারণম্॥

* * *

সুদক্ষিণামৃতুস্নাতাং স্মৃত্বা ত্বাতত্বরাধিকঃ।
বিলোকিতঃ সুরভ্যা ত্বং কল্পতর্ব্বধ্রিসংস্থয়া॥

* * *

শাপস্তু ন শ্রুতো রাজন্ ত্বয়া সারথিনাপি ন।
কূজৎসু রথচক্রেষু নদৎসু দিগিভেষু চ॥

* * *

নাম্নি কীর্ত্তিত এবাসৌ ধদায়াতি সুমঙ্গলা।
তৎ সিদ্ধিং তব রাজেন্দ্র বেদ্মি হস্তগতামিব॥

* * *

পশ্চাত্তামনুগচ্ছেথা অনুস্থিতৈরপি স্থিতাম্।
নিষণ্নাং নিষীদেথাঃ পিবন্ত্যাঞ্চ জলং পিবেঃ॥

* * *

নিবর্ত্ত্য ভৃত্যবর্গঞ্চ ততো রাজা সুদক্ষিণাম্।
প্রত্যাবর্ত্ত্য স একাকী ধেনুমন্বগমদ্‌বলী॥

* * *

অন্যেদ্যুঃ সা বসিষ্ঠস্য হোমধেনুর্মহীপতেঃ।
ব্রতদার্ঢ্যং পরীক্ষন্তী প্রবিবেশ হিমালয়ম্॥

নন্ত্বীয়ং সুরভের্ধেনুর্ন প্রধৃষ্যা হি হিংসকৈঃ।
ইতি বিশ্বাসবান্ রাজা শোভামৈক্ষত ভূভৃতঃ॥

* * *

অদহৃত স্বতেজোভিঃ স্বয়মেব স ভূপতিঃ।
চিত্রার্পিতইবাতিষ্ঠচ্চাপার্পিতকরস্তদা॥

* * *

ভৃত্যোহহং দেবদেবস্য গৌরীভর্ত্তুঃ পিনাকিনঃ।
কুম্ভোদরোহস্মি বিখ্যাতো ভবান্যাশ্চ প্রিয়ঃ সদা॥

* * *

দেবদারুরয়ং দেব্যা স্বয়ং যত্নৈরুপার্জ্জিতঃ।
স্তন্যেন পয়সা স্কন্দপীতশেষেণ বর্দ্ধিতঃ॥

* * *

মদীয়েন শরীরেণ স্বাহারমতিবর্ত্তয়।
দিনাবসানক্ষুধিতবৎসামেনাং বিমুঞ্চ গাম্॥

* * *

যদিয়ং ভবতাক্রান্তা কাতরা মাং নিরীক্ষতে।
সাশ্রুপাতং ততঃ সিংহ হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে॥

ক্ষতাৎ ত্রাণাৎ ক্ষত্রশব্দো বিমুখস্য ততো মম।
কিং জীবনেন তৎ সিংহ কীর্ত্তিলোপাস্মৃতির্বরা॥

* * *

কৃপালুর্ভব তত্ত্বং মে যশো দেহি মহত্তরম্।
ত্যজৈনাং মচ্ছরীরেণ মৃগেন্দ্র কুরু পারণাম্॥

* * *

পীত্বা সুদক্ষিণাপ্যেতৎ পীতশেষং প্রদাস্যতি।
ভবিষ্যতি কুমারস্তে বংশকর্ত্তা মহীপতিঃ॥

* * *

অথামন্ত্র্য মহাত্মানং বসিষ্ঠং যমিনাং বরম্।
স্বং পুরং প্রয়য়ৌ যানমারুহ্য স্বগণৈর্বৃতঃ॥

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই যথেষ্ট। তৎপরে রঘুর জন্ম, অশ্বমেধে অশ্বহারী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ, রাজ্য-

প্রাপ্তি ও দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়ের সবিশেষ বর্ণনা নাই), সর্ব্বস্বদক্ষিণ-যজ্ঞসমাপ্তি, কৌৎসাগমন, অজের জন্ম, অজের বিবাহার্থ যাত্রা, পথে হস্তিবধ, ইন্দুমতীস্বয়ংবর (সভাবর্ণনা নাই), রাজাদের সহিত যুদ্ধ, রাজ্যশাসন, ইন্দুমতীর মৃত্যু ও অজবিলাপ।

কালিদাস গ্রন্থারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বসূরিদের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন। রামকথা ভিন্ন পূর্ব্বকালীন বা পরকালীন রঘুবংশবর্ণনার মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না। অথচ কালিদাসের কাব্যের কোন পৌরাণিক মূল ছিল। সে মূল কোথায়?

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে যখন অজবিলাপ পর্য্যন্ত সকল কথাই পাওয়া যাইতেছে, তখন স্বতই মনে হইবে, মূল এইখানে। কিন্তু কেবল একখানা পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

পাতালখণ্ডের পুঁথি বোম্বাইয়ে, পুনায় ও কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে। কলিকাতায় কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের ও বঙ্গবাসীর প্রকাশিত পাতালখণ্ড আছে। আনন্দাশ্রমের বহি দেখি নাই। অন্য তিনখানিতেই ঠিক্ এই অংশটিরই অভাব।

এই সংস্করণগুলি কোন্ কোন্ পুঁথি দেখিয়া প্রকাশ করা হইল, তাহা প্রকাশকেরা লেখা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কলিকাতায় সংস্করণদুইখানি একরূপ। বোম্বাইএর সহিত ইহাদের কিছু তফাত আছে। আমার পুঁথির ১—৩ অধ্যায় ভূমিকা, ৪ অধ্যায়ে ব্রহ্ম হইতে খট্বাঙ্গ, ৫—১১ অধ্যায়ে দিলীপ হইতে অজ, ১২—২৮ অধ্যায়ে দশরথ হইতে রামের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত। আমার পুঁথির যাহা ২৯ অধ্যায়, বোম্বাইযন্ত্রের পুস্তকের ও বঙ্গবাসীর পুস্তকের তাহা প্রথম অধ্যায়। এইস্থলে রামের অশ্বমেধযজ্ঞের কথায় পুনরায় সবিস্তারে আরম্ভ। এই অশ্বমেধের বর্ণনা আমার পুঁথিতে ২৯—৯৬, বোম্বাইপুস্তকে ১—৬৮ ও বঙ্গবাসীর পুস্তকে ১—৩৭ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। কাজেই মনে হইতে পারে, আমার পুঁথিতে রঘুবংশের যে বর্ণনাটুকু আছে, অর্থাৎ উহার প্রথম ২৮অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। বলা আবশ্যক, আমার পুঁথির কাগজ দেখিয়া উহার বয়স খুব অধিক বোধ হয় না। ১০০ বৎসরের কমই হইবে।

তিন পুস্তকেই রামের অশ্বমেধবর্ণনা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে। বাৎস্যায়ন শেষকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সূর্য্যবংশের রাজাদের কথা ত শুনিলাম, তন্মধ্যে রামের অশ্বমেধের কথাও সংক্ষেপে শুনিলাম, এখন ঐ অশ্বমেধের কাহিনী সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, রঘুবংশের বর্ণনা কেবল আমার পুঁথির নিজস্ব নহে। উহা সম্ভবত অন্য পুস্তকেরও পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডে অর্থাৎ স্বর্গখণ্ডে আছে। পাতালখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গখণ্ড। স্বর্গখণ্ডের পুস্তক খুঁজিবার আমার সময় হয় নাই। পাঠকেরা কেহ অনুগ্রহ করিয়া স্বর্গখণ্ডের শেষভাগে রঘুবংশবর্ণনা আছে কি না, সন্ধান দিলে বাধিত হইব।

ফল কথা, পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের মুদ্রিত

বা হস্তলিখিত পুস্তক না দেখিয়া মীমাংসা চলে না। রঘুবংশের বিবরণ আমার পুঁথিতে পাতালখণ্ডের আরম্ভে, অন্য পুস্তকে স্বর্গ-খণ্ডের শেষে থাকিলে, উহাকে পদ্মপুরাণ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিবার উপায় থাকে না। ধরিয়া লইলাম, উহা পদ্মপুরাণের অন্তর্গত।

আর এই বর্ণনা যদি পদ্মপুরাণের অন্তর্গত হয়, তবে কালিদাসের দিলীপকর্ত্তৃক গোসেবা-ঘটিত উপাখ্যানের মূল সন্ধানের জন্য ঋতন্তরের উপাখ্যানের আশ্রয় লইতে হয় না। কেন না, ঋতন্তরের উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের উপাখ্যানের সাদৃশ্য যৎসামান্যমাত্র।

এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রবন্ধলেখক পদ্মপুরাণের আর এক জায়গায় ঐ গোসেবার বৃত্তান্ত আমাকে দেখাইয়াছেন। বোম্বাইসংস্করণ ও কলিকাতার কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের সংস্করণ, উভয়ত্র পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডমধ্যে এক জায়গায় দিলীপকৃত গোসেবার কথা বর্ণিত দেখিলাম। সেখানে সূর্য্যবংশবর্ণনা নাই, তবে পুত্রপ্রাপ্তির উপায়নির্দ্দেশে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, দিলীপ নামে সূর্য্যবংশে এক রাজা ছিলেন, তিনি গোসেবা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমগমন, গোসেবা, মায়া-সিংহদর্শন ও বরলাভে পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানটুকুর ভাষার সহিতও কালিদাসের ভাষার খুব সাদৃশ্য। আমার পাতালখণ্ডের ভাষা, এই উত্তরখণ্ডের ভাষা ও কালিদাসের ভাষা, পরস্পরে এত মিল যে, একটাকে অন্যটার paraphrase বলা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন, কালিদাসের রঘুবংশ সম্মুখে রাখিয়া কোন মহাত্মা পাতালখণ্ডে দিলীপ হইতে অজ-বিলাপ পর্য্যন্ত বসাইয়া দিয়াছেন এবং আর কোন মহাত্মা উত্তরখণ্ডে দিলীপের গোসেবা-ঘটিত উপাখ্যানটুকু বসাইয়া দিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়।

এখন এই গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়, কে কাহার নিকট ঋণী? কালিদাস পদ্ম-পুরাণ হইতে লইয়াছেন, বা পদ্মপুরাণ-লেখক কালিদাস হইতে লইয়াছেন? ইহার মীমাংসা আমার অসাধ্য। এ দেশের পণ্ডিতেরা দ্বিধাহীন হইয়া বলিবেন, কালি-দাসই ঋণী; সাহেবদল তেমনই নিঃসঙ্কোচে বলিবেন, পদ্মপুরাণই ঋণী।

মীমাংসা আমার অসাধ্য; তবে এ প্রসঙ্গে দুটা কথা বলিয়া ফেলিতেও চাই। পদ্ম-পুরাণ পাতালখণ্ডের আগাগোড়া উল্টাইয়া দেখিয়াছি। রামাশ্বমেধকথার পর কৃষ্ণ-কথার আরম্ভ। উহা বাঙ্গলার ছাপা পুঁথি, বোম্বাইয়ের ছাপা পুঁথি ও আমার হাতে-লেখা পুঁথি, তিনেই রহিয়াছে। কৃষ্ণকথা-মধ্যে বৃন্দাবনমণ্ডলের যে বর্ণনা দেখিলাম, শ্রীরাধিকার সখীগণের যে বর্ণনা দেখিলাম, গোপীভাবে কৃষ্ণভজনার যে মাহাত্ম্য দেখিলাম, তাহাতে এই বর্ত্তমান পাতালখণ্ড যে কালিদাসের বহুপরবর্ত্তী, তাহাতে সংশয় করা বড়ই দুঃসাহসের কাজ। আমার অত সাহস নাই। আমি আধুনিক পদ্মপুরাণের ভাষা কালিদাসের অনুকরণ স্বীকার করিতে সম্মত আছি।

তবে কালিদাসের পূর্ব্বেও যে পদ্মপুরাণ ছিল না, তাহা বলিতেও আমার সাহস হয়

না। পুরাণশাস্ত্র বৈদিককাল হইতেই আছে। পদ্মপুরাণও কালিদাসের বহুপূর্ব্ব-বর্ত্তী কাল হইতেও বর্ত্তমান থাকাই সঙ্গত ও সম্ভব। কালিদাস পৌরাণিক মূল হইতেই যখন 'রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন, তখন সেই আদি 'পদ্মপুরাণের সেই অংশটুকুও আধুনিক পদ্মপুরাণে পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব? বর্ত্তমান পদ্মপুরাণের কৃষ্ণকথা বা অন্যান্য অংশ অর্ব্বাচীন হইয়াও সূর্য্যবংশকথাটুকু প্রাচীন হইতে পারে। এ সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে আমি অক্ষম। এই অক্ষমতা স্বীকার করিয়া আমার এই নিতান্ত অনধিকার-চর্চ্চার উপসংহার করিলাম।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রঘুবংশ।

মূলপ্রবন্ধলেখকের বক্তব্য।

আমার প্রবন্ধটি খস্‌ড়া-অবস্থায় কয়েকজন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলাম। তাঁহারা কলেজে সংস্কৃতসাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তাঁহারা কেহ কেহ বলিলেন—"দিলীপ ও সুদক্ষিণার গোসেবা ও পুত্রলাভের বৃত্তান্ত পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে আছে। সেই বৃত্তান্তের সহিত রঘুবংশের প্রথম দুই সর্গে বর্ণিত বিষয়ের বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। একটি যে অপরটি হইতে লওয়া, ইহা নিঃসন্দেহ। পক্ষান্তরে, খণ্ডদ্বয়ের বৃত্তান্তের সহিত রঘুবংশের সম্বন্ধ অত্যন্ত দূর।" ইহার পরে পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ড তাঁহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থ ও আমার অবলম্বিত 'পদ্মপুরাণ —পাতালখণ্ড' এবং আমার প্রবন্ধটি পরম-শ্রদ্ধাভাজন সুপণ্ডিত সুলেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আর একটা নূতন কথা পাইলাম—রঘুবংশের প্রথম আটসর্গে বর্ণিত সমস্ত বৃত্তান্তই অর্থাৎ দিলীপ হইতে অজ পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত তাঁহার বাটীতে রক্ষিত একখানি 'পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড' পুঁথিতে আছে, এবং সেই পৌরাণিক বিবরণের সহিত রঘু-বংশের কয়েক সর্গের আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনার ফল পাঠকবর্গ উপরিমুদ্রিত-প্রবন্ধাকারে পাইয়াছেন। রামেন্দ্রবাবু নিজে সাহিত্যক্ষেত্রে নানা-কার্য্যে ব্যস্ত, এ অবস্থায়ও যে তিনি আমার অনুরোধে মূলপ্রবন্ধের ত্রুটিসংশোধনকল্পে তাঁহার মহামূল্য সময় এবং তাঁহার সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার মন্তব্য গতমাসেই লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে চৈত্রের বঙ্গদর্শনে মূলপ্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় নাই।

যে কয়খানি মুদ্রিত-অমুদ্রিত পদ্মপুরাণ

দেখা গেল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ অসঙ্গতি রহিয়াছে। সম্ভবত যেখানি যত পরের সঙ্কলন, সেখানিতে তত নূতন জিনিষের সমাবেশ হইয়াছে। এ অবস্থায় ইহার কোন্‌খানি কালিদাসের পূর্ব্বের, কোন্‌খানি কালিদাসের পরের, অথবা সবগুলিই কালিদাসের পূর্ব্বের বা পরের কি না, এ সমস্তার বিচার করা কঠিন। মূলপ্রবন্ধে, কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ঋতম্ভরের উপাখ্যানটিকে অত্যন্ত কাঁচা (crude) বিবেচনা করিয়া, সেটি কালিদাসের পূর্ব্বে রচিত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। দিলীপ ও সুদক্ষিণার বৃত্তান্ত অন্যান্য পদ্মপুরাণে যেরূপ দেখিলাম, সেগুলিসম্বন্ধে এরূপ মতপ্রকাশ দুরূহ। সেগুলিতে কালিদাস-বর্ণিত প্রায় সকল বৃত্তান্তই রহিয়াছে, কবিত্বেরও অভাব নাই। কাজেই সেগুলিকে কালিদাসের পূর্ব্বের বলিলে কালিদাসের আর বড় মাহাত্ম্য থাকে না। পক্ষান্তরে, সেগুলিকে কালিদাসের অনুকরণে রচিত বলিতে গেলেও কথাটা ঠিক সঙ্গত হয় কি ?

পুরাণ ও কাব্যনাটকের পৌর্ব্বাপর্য্য-বিচারকালে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। শকুন্তলা, উত্তরচরিত, রঘুবংশ প্রভৃতিতে রামায়ণ ও মহাভারতের বিরোধী অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় ; এগুলির মূল কোথায় ? আমরা ইংরেজী শিখিয়া শেক্‌স্‌পীয়রের প্রণালী দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ সকল কবিকল্পনাপ্রসূত। ইহাতে কবিকে খুব বড় করা হয় বটে, কিন্তু ইহাই কি ঠিক ? শেক্‌স্‌পীয়র যে সকল গল্প অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই সেখানে কবি যাহা-খুসি করিতে পারেন, তাঁহার প্রতিভার উদ্দামগতিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু ধর্ম্মসাহিত্যে ঐ প্রণালী খাটে না। আমরা দেখিতে পাই, মিল্‌টন্ তাঁহার মহাকাব্যে স্থলে স্থলে বাইবেলবিরোধী বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; কিন্তু সূক্ষ্ম সমালোচকগণ দেখাইয়াছেন যে, সেগুলি য়িহুদীধর্ম্মের ভাষ্যকার Rabbiদিগের ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের ভাষ্যকার Fathersদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, ইংরেজ-কবির স্বকপোলকল্পিত নহে। প্রাচীন গ্রীক্‌সাহিত্যেও দেখিতে পাই, সফোক্লীজ্ (Sophocles) প্রভৃতি নাটককারেরা যে সমস্ত পৌরাণিক গল্প নাট্যাকারে রচিত করিয়াছেন, সেগুলির মূল গ্রীক্ mythology হইতে গৃহীত। যেখানে সর্ব্বজনবিদিত বৃত্তান্ত (version) পরিহার করিয়াছেন, সেখানেও দেখা যায় যে, তাঁহাদের সুবিধার জন্য যেভাবে গল্পটি লইয়াছেন, তাহাও mythologyতে আছে, তবে সেটা সর্ব্বজনবিদিত নহে। অতএব, হিন্দুকবিরাও যখন রামসীতার পুনর্ম্মিলন, দুর্ব্বাসার শাপ প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতবিরোধী বৃত্তান্ত কাব্যনাটকে সংযোজনা করেন, তখন সেগুলি কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া বলা ঠিক নহে। দিলীপ হইতে অজ পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় রাজগণের কোন বিবরণ পুরাণে না থাকিলে, কালিদাস যে নিজে সমস্ত উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহা বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কবি হয় ত পৌরাণিক ভিত্তির উপর কারিকুরি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একেবারে শূন্যের উপর নির্ম্মাণ করেন নাই। আমাদের দেশের একটা প্রচলিত সংস্কার আছে যে, পুরাণগুলি কালিদাসাদির কাব্যনাটকের পূর্ব্বে রচিত। এরূপ একটা প্রচলিত বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হইতে পারে, আমার ত এরূপ বিবেচনা হয় না। সম্ভবত ব্যাপার কতকটা এইরূপ :—কাব্যনাটকের পূর্ব্বে পুরাণ ছিল, এবং সেই সকল পুরাণ হইতে কবিগণ উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার উপর কারিকুরি করিয়াছেন। কোনরূপ বিপ্লবে প্রাচীন পুরাণগুলি লোপ পাইয়াছে। পরে পুরাণগুলির নব সংস্করণে সুকবির কাব্য হইতে গৃহীত শ্লোকমালা অথবা তদনুকরণে রচিত শ্লোকমালা মূলশ্লোকগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে; রচনাটা আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মূলবৃত্তান্তটি পরম্পরাগত, অতএব অবিকৃত। অনেকের অনুমান, মনুসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতিসংহিতার সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছে। পুরাণসম্বন্ধেও এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, কালিদাসবর্ণিত বৃত্তান্ত পদ্মপুরাণে রহিয়াছে, এ বিষয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তজ্জন্য রামেন্দ্রবাবু ও সংস্কৃতসাহিত্যের অধ্যাপক আমার কয়েকজন বন্ধু সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। আর যখন আমার মূলপ্রবন্ধের আলোচনাপ্রসঙ্গে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইল, তখন আমিও নিজেকে 'নিমিত্তমাত্র' মনে করিয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্ব অনুভব না করিতেছি, এমন নহে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিবঙ্কুর।

৬

এক্ষণে তিনসহস্র ব্রাহ্মণ মহারাজের নিমন্ত্রিত অতিথি। উঁহারা উচ্চবর্ণের জন্য রক্ষিত সেই ঘেরের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং উঁহাদের সমাগমে পবিত্র পুষ্করিণীগুলিও সমাচ্ছন্ন। উঁহারা চতুর্দ্দিকের গ্রামপল্লী ও আরণ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছেন, ফলমূলশস্যাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করেন, পার্থিববিষয়ের প্রতি বীতরাগ এবং রহস্যময় ধ্যানধারণায় দিবারাত্রি নিমগ্ন। একটা যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। এই যজ্ঞ ১৫ দিন ধরিয়া চলিবে এবং ইহা ৬বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে, কোন পার্শ্ববর্ত্তী দেশ জয় করিবার জন্য যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধকালে ঐ ভূমিতে যে রক্তপাত হয়, তাহারি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই ব্রাহ্মণেরা সুদীর্ঘ প্রার্থনামন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। অগণিত বৎসর অতীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছুই

আসে যায় না। সেই রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এখনো ভগবানের নিকট উচ্চকণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইবে, তূরীভেরী বাজাইতে হইবে, পবিত্র শঙ্খধ্বনি করিতে হইবে। রাজচিহ্নস্বরূপ এই শঙ্খ, ত্রিবন্দ্রম-অধিপতির ছত্রচামরাদিতে অঙ্কিত।

পাণ্ডবদিগের প্রতিমূর্ত্তি—ত্রিশকূট উচ্চ, মস্তকের উপর কিরণমণ্ডল বিরাজিত, ভীষণদর্শন; উহাদের রোষকষায়িত নেত্রের রুদ্রদৃষ্টি মানবগণের উপর নিপতিত। এই উৎসব উপলক্ষে, উহাদিগকে মন্দিরের গুপ্ত-কক্ষ হইতে বাহির করিয়া, রসারসি দিয়া, বহু আয়াসে মন্দিরের মুক্তপ্রাঙ্গণে—সূর্য্যালোকের মধ্যে—টানিয়া আনা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যাহাতে সাধারণ লোকেরা উহাদিগকে দর্শন করিয়া ভীত হয়। ইহাদিগের নিকট যখন প্রার্থনাদি হয়, তখন ব্রাহ্মণেরা স্বকং অন্তরের অন্তস্তল হইতে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। যজ্ঞোৎসবের এই ১৫দিন, অসংখ্য অনুষ্ঠান—সাগ্রহ প্রার্থনা—ভয়-আনন্দের জীবন-উচ্ছ্বাসে—ব্রাহ্মণ-গণ্ডির প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ ভূমি তীব্ররূপে স্পন্দিত হইতে থাকে। দূরস্থ লোকদিগের তুমুল কোলাহলে আমি প্রপীড়িত হইতেছি—আকৃষ্টও হইতেছি। কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ;—মহারাজের অনুগ্রহ এস্থলে কিছুই করিতে পারে না;—সর্ব্বপ্রকার মানবচেষ্টা এখানে নিষ্ফল।

যে বিশাল তালবনে এই নগরটি সমাচ্ছন্ন—সেই তালবনের মধ্যে যে সময়ে দীক্ষিত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোৎসব করিতেছেন, সেই একই সময়ে, তাহারি অনুকরণে, মধ্যবর্ত্তী ও নীচবর্ণের লোকেরাও নিজ নিজ গৃহে এই অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। আমার ন্যায় তাহারাও ব্রাহ্মণসংস্পর্গ হইতে বর্জ্জিত। সেখানেও, চতুর্দ্দিকে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, দেবতার নিকট এইরূপ অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা চলিতেছে।

যুদ্ধে-নিহত বীরপুরুষদিগকে যেখানে যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছে, সেই-সব সমাধিস্থানে—সেই-সব চৈত্যবৃক্ষতলে এইরূপ পূজা-অর্চ্চনা হইতেছে।

রাত্রি হইবামাত্র, সেই বনের প্রত্যেক ছায়াচ্ছন্ন মার্গে, এবং যেখানে যেখানে সমাধিস্তম্ভ সমুত্থিত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যেক চতুষ্পথে, ছোট-ছোট প্রদীপ জ্বালান' হয়, বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে, এবং বিবিধ নৈবেদ্য-সামগ্রী প্রদত্ত হয়। ক্ষুদ্র দেবালয় কিংবা সামান্য যজ্ঞবেদি—যাহা তরু-অধিষ্ঠাত্রী নিকৃষ্ট দেবতাদিগের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—সেখানেও সহস্র-সহস্র ক্ষুদ্র কম্পমান অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। এখানে আমি অবাধে প্রবেশ করিতে পাইলাম। সহসা, পরস্পরসংশ্লিষ্ট তালবনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। যেখান হইতে বাদ্যের শব্দ শোনা যাইতেছে—আলো দেখা যাইতেছে, আমি সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া, পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলাম।

প্রথমেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র দেবালয়;—বহুপুরাতন, লুপ্তমুখশ্রী-প্রস্তরস্তম্ভ-যুক্ত, অতীব নিম্ন, তরুপুঞ্জের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; তরুগণ তাহাকে ছাড়াইয়া অতি ঊর্দ্ধে অন্ধকারের

মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। দেবালয়টি ফুলের মালায় ও ফুলের অলঙ্কারে বিভূষিত। নারিকেলতৈলের ছোট-ছোট দীপ চারিদিকে জ্বলিতেছে এবং তাহা হইতে যেন অসংখ্য জোনাকির আলো বিকীর্ণ হইতেছে। দুই-তিনটি ক্ষুদ্র দালানের পশ্চাদ্ভাগে মন্দিরের বিগ্রহটি সমাসীন,—ভীষণদর্শন, মস্তকে উচ্চ মুকুট, বহুবাহুবিশিষ্ট, মুখমণ্ডল শুকপক্ষীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ। দেবালয়ের সুপরিচিত ও পবিত্র শাদা-শাদা ছাগশিশু চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুষ্পমাল্যে বিভূষিত, অর্দ্ধনগ্ন ভক্তের দল দ্বারের সম্মুখে ভিড় করিয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে। শোকবিষাদময় তূরীরবে ও পবিত্র শঙ্খধ্বনিতে ঢাক-ঢোলের শব্দ ও বংশীধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

উহারা স্বাগত-স্মিতহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা করিল; তীব্রগন্ধি জুঁইফুলের মালা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিল। রাত্রির 'গুমট্'-উত্তাপে, সুগন্ধি-রস-পাকের কটাহ-সমুত্থিত ধূমের ন্যায়, এই জুঁইফুলের গন্ধ আমার 'মাথায় চড়িল'। তাহার পর লোক সরাইয়া আমার জন্য একটু জায়গা করা হইল। তালবনের চতুষ্পথবর্ত্তী শতবর্ষবয়স্ক একটি ডুমুরগাছের তলায় আমি দাঁড়াইলাম। প্রাচীনধরণের মস্তকহীন ক্ষুদ্র-স্তম্ভ-পরিবৃত একটি প্রস্তরবেদীর চতুর্দ্দিকে সমবেত লোকেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাদ্য শ্রবণ করিতেছে। এখানেও দীপালোক, গোলাপ ও জুঁইফুলের মালা, ফল-শস্যাদির নৈবেদ্য। পুরোহিতের মত একজন নীচবর্ণের লোক, মুখের রং কালো, খুব উচ্ছ্বাসের সহিত মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষসমূহের পশ্চাতে, ছায়ার মধ্যে, প্রচ্ছন্নপ্রায় রমণীগণ দাঁড়াইয়া আছে এবং সকলে মিলিয়া দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিয়া মুহুর্মুহু কি-একপ্রকার শব্দ করিয়া উঠিতেছে। কতকগুলি বালক ঘাসের আগুন জ্বালাইয়া ক্রমাগত উস্কাইতেছে; আর বাদকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি সেই আগুনের উপর সঞ্চালিত করিয়া, যথোপযুক্ত শব্দ বাহির করিবার জন্য, তাতাইয়া লইতেছে। পুরোহিতের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—ক্রমে সে ভূতাবিষ্ট হইল। সে বিকট চীৎকার করিয়া, বৃক্ষের উপর—প্রস্তরের উপর মাথা ঠুকিতে উদ্যত হইল; লোকেরা চারিদিকে শৃঙ্খলের ন্যায় বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিল; তাহার পরেই সে অবসন্ন ও স্পন্দহীন হইয়া মূর্চ্ছিত হইল; কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘরশব্দ বাহির হইতে লাগিল।...

এই দেবতা—যিনি আমাদের হইতে বহুদূরে—যাঁহাকে এখানকার লোকেরা ঘোর-বাদ্যধ্বনি-সহকারে পূজা করিতেছে—ইনি রহস্যময় ব্রাহ্মণদিগের দেবতারই রূপান্তর-মাত্র,—সেই দেবতা, যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের নিভৃতকক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন।

আমরাও যে-দেবতাকে ভজনা করি—তিনিও এই দেবতারই রূপান্তরমাত্র...কেন না, ব্রহ্ম, জিহোবা, আল্লা—যে নামেই অভিহিত হউন না, "মিথ্যা-দেবতা" কেহই নাই। যে তত্ত্বজ্ঞানীরা অভিমান করেন কেবল

তাঁহাদের দেবতাই সত্য, তাঁহাদের বৃথা-গর্ব্ব শিশুজনোচিত বলিয়া আমার মনে হয়। আসল কথা, সেই অপরিমেয় অনধিগম্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানকে এতদূর অতিক্রম করেন যে, আমরা তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধে যে-কোন ধারণাই করি না কেন, তাহাতে ভ্রান্তি হইবারই কথা; একটু কম ভ্রম হইল, কি একটু বেশি ভ্রম হইল, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। যাহারা জীবন-মৃত্যুর কষ্টযন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অরণ্যের মধ্যে একটা হীনবিগ্রহের পদতলে প্রার্থনা করে,—যতই তাহারা ক্ষুদ্র হউক, যতই তাহারা অনুন্নত হউক, তাহাদের প্রার্থনাও তিনি শ্রবণ করেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা।

"সত্যেন লোকং জয়তি সত্যন্ত পরমং তপঃ।"

ভারতবর্ষের পুরাতন সত্যনিষ্ঠা দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছে! হয় নাই,—যেমন ছিল, ঠিক সেইরূপ আছে,—এমন অতিশয়োক্তিতে কেহ আস্থাস্থাপন করিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্যসংসর্গে নিপতিত হইয়া ভারতবর্ষ যে কিয়ৎপরিমাণে তাহার চিরপুরাতন পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বসংস্কারকে নিতান্ত কুসংস্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া-দিয়া, পাশ্চাত্যশিক্ষা তাহার স্থানে অদ্যাপি সুসংস্কার সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহা ছিল, তাহা নাই। যাহা আসিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অভ্যর্থনা করা যায় না। তথাপি তাহাকে লইয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় পাশ্চাত্যগণ আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট বলিয়া ভর্ৎসনা করিলে; মহারাজ দুষ্মন্তের রহস্য-প্রিয় বয়স্যের ভাষায় বলিতে হয়,—"স্বয়ং চক্ষু আকুল করিয়া-দিয়া, অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

আমাদের পুরাতন সত্যনিষ্ঠার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরার অভাব নাই। সে ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হয় না বলিয়াই তাহার কথা জনসাধারণের নিকট ক্রমে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ভিন্নদেশের লেখকবর্গ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এক শ্রেণীর প্রমাণ। আমাদের পুরাতন সাহিত্যে যাহা লিখিত আছে, তাহা আর এক শ্রেণীর প্রমাণ। উভয় শ্রেণীর প্রমাণই একবাক্যে আমাদের পুরাতন সত্যনিষ্ঠার গৌরবঘোষণা করিয়া থাকে।

সত্য কাহাকে বলে? এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানবসমাজের সাহিত্যে দুইটি

বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। *পাশ্চাত্যসাহিত্যের সত্যের নাম "ট্রুথ্"।* যাহা বহুলোকে বিশ্বাস করে, তাহারই নাম "ট্রুথ্"। তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক,—তাহার বিচার অনাবশ্যক। বহুলোকে বিশ্বাস করিলেই হইল। ইহাই ধাত্বর্থগত ব্যুৎপত্তি। পাশ্চাত্যজাতির ইতিহাসেও এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুলোকে বিশ্বাস করিল,—পৃথিবী অচলা। যে ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ করিল, যে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে কথা অস্বীকার করিতে চাহিল, যে ব্যক্তি প্রমাণপ্রয়োগে বহুলোকের বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইল, বহুলোকে মিলিয়া তাহার ধৃষ্টতার সমুচিত দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া "ট্রুথ্" রক্ষা করিয়া দিল! বহুলোক কাহারা? যাহারা অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, তাহারাই ত বহুলোক! তাহারা যাহা মানিল না, তাহা মিথ্যা হইয়া গেল; তাহারা যাহা মানিল, তাহারই নাম হইল—"ট্রুথ্"। ইহাই ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা।

We are all very apt to consider truth to be what is *trowed* by others, or believed in by large majorities. That kind of truth is easy to accept. But whoever has once stood alone, surrounded by noisy assertions, and overwhelmed by the clamour of those who ought to know better, or perhaps who did know better,—call him Galileo or Darwin, Colenso or Stanley, or *any other name,—he knows what a real delight it is to feel in his heart* of hearts, this is true,—this *is*—this is *sat*—whatever daily, weekly or quarterly papers, whatever bishops, archbishops or popes, may say to the contrary.—Max Muller's "India: what can it teach us." p. 64.

ইহার সহিত প্রাচ্যসাহিত্যের সত্য-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। যাহা যথার্থ—যাহা আছে—যাহা থাকে—যাহা চিরন্তন, তাহারই নাম সত্য। তাহার সহিত কেবল ইহলোকের সম্বন্ধ নয়; ইহপরলোকের সম্বন্ধ। তাহার সহিত কেবল বহুলোকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সম্বন্ধ নয়; যাথার্থ্যের সম্বন্ধ। সুতরাং সত্যের সহিত "ট্রুথের" পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জনসমাজের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতেও সেই প্রবল পার্থক্য দেদীপ্যমান। "ট্রুথ্" তাহার চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া, বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। "সত্য" কেবল হিমালয়ের সমুন্নত শিখরভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তশীতল সৌম্যমূর্ত্তিতে নিরন্তর আত্মপ্রচার করিয়াই অধিকাররক্ষার আয়োজন করিয়াছে। সে কাহাকেও ভয় না করিয়া তারস্বরে কহিয়াছে—

> "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।।
> অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।।"

যুক্তিযুক্ত উপাদেয় বাক্য বক্তার পদমর্য্যাদার উপরে নির্ভর করে নাই। যে

কেহ বলুক্ না কেন, সত্য হইলেই যথেষ্ট। তাহার বিপরীত বাক্য ব্রহ্মার বেদবাক্য হইলেও অগ্রাহ্য। এমন সরল কথা, এমন সাহসের কথা, এমন অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠার কথা, "ট্রুথ্"শব্দের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "ট্রুথ্" চিরদিনই মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া, কত নির্যাতন সহ্য করিয়া, অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস কুড়াইবার আশায় ভিখারীর মত পাশ্চাত্যজনপদের পথে পথে কাঁদিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে! তাহার ইতিহাস পাশ্চাত্য মানবসমাজের পদ-স্খলনের ইতিহাস। সত্য কতবার তাহাদের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুদ্দামের মত দিগ্‌বলয় উদ্ভাসিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে;—তথাপি জনসমাজ তাহার মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই! সত্য কতবার বীরদর্পে আত্মপ্রচার করিবার আয়োজন করিয়াছে;—জনসমাজ তখনই তাহাকে নির্দ্দয়চরণে নিপীড়িত করিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছে! অদ্যাপি সত্য ভাল করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পাইতেছে না—যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি ভাল; হিংসা অপেক্ষা প্রেম ভাল; পরস্ব অপেক্ষা নিজস্ব ভাল; ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ!

সত্য কি? তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য মানবসমাজ নানা আলোচনায় নিরন্তর ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে। সভ্যসমাজের চেষ্টায় দিনদিন যে সকল অভিনব বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা যেন ভাষ্য-রূপে কোন-এক মূলসূত্রের বিশদ ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছে। সে মূলসূত্র ভারতবর্ষেই সুপরিচিত। ভারতবর্ষ বহুপূর্ব্বেই বুঝিয়া-ছিল,—সত্য এবং ব্রহ্ম অভিন্ন—যাহা থাকে, তাহাই সত্য,—তাহাই ব্রহ্ম,—তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, আর সমস্তই মিথ্যার অলীক আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হয়। সত্যনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠতপস্যা। তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে, মানবসমাজ তর্ককোলাহল হইতে দূরে দাঁড়াইয়া, নীরবে সত্যসেবা করিতে সমর্থ হয়। তখন গ্রামনগর হইতে তস্করতা-ব্যভিচার পলায়ন করে; সত্যপালন করা স্বাভাবিক হয়; সত্যত্যাগ না করিয়া প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেরূপ অবস্থায় জনসমাজ অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করে। মানবজাতির ইতিহাসে কাহার নাম এইরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে? কাহার কাব্য, কাহার শাস্ত্র, কাহার প্রতিদিবসের সাংসারিক ব্যবহার, এই মূলমন্ত্র প্রচার করিয়া বিদেশের লেখকবর্গের সমুচিত শ্রদ্ধালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে?

"বিশ্বচরাচরে আছে একমাত্র হেন ঠাঁই।
সে আমার জন্মভূমি,—তাহার তুলনা নাই।"

যে সকল বিদেশী লেখক ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মেগাস্থিনিস্ এবং এরিয়ানের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহারা বিশ্বস্ত অতীতসাক্ষী বলিয়াই সুপরিচিত। মেগাস্থিনিস্ খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং এরিয়ান্ খৃষ্টাবির্ভাবের শতবর্ষ পরে বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে—এই দুই জগদ্বিখ্যাত অতীত-সাক্ষীর আবির্ভাবসময়ে—মানবসমাজের সত্য-নিষ্ঠা কিরূপ ছিল? এই যুগের পাশ্চাত্য সত্য-

নিষ্ঠার কথা ইতিহাসপাঠকের নিকট সুপরিচিত। ছলে-বলে-কৌশলে পরস্বাপহরণ করিবার জন্ত এই যুগের পাশ্চাত্যসমাজে যে অশান্ত আকাঙ্ক্ষা অকস্মাৎ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল, দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরশাহ তাহারই ছায়াদেহরূপে এশিয়ার জলে-স্থলে তাণ্ডবনৃত্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে তখন পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য সত্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই যুগের ভারতবর্ষে বাস করিয়া মেগাস্থিনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন,—তৎকালে ভারতবর্ষে তস্করতা অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়; সকলেই সত্য ও পুণ্যের সমাদর রক্ষা করিত।* মহাকবি কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—

"প্রক্তৌ তস্করতা স্থিতা।"

সে কবিবাক্যকে অসঙ্গত অতিশয়োক্তির নিদর্শনরূপেই আধুনিক অধ্যাপকগণ ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন! কিন্তু কালিদাসের এই কবিবাক্য এবং মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্যবাক্য একত্র বিচার করিলে, সকল সংশয় নিরস্ত হইয়া যায়। জনসমাজে অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, সকল দেশের ইতিহাসেই এই চিত্র পরিস্ফুট হইত। এরিয়ানের সময়েও ভারতবর্ষের সত্যনিষ্ঠার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"রাজকর্ম্মচারিগণ 'মিথ্যা রিপোর্ট' লিখিতে জানিতেন না; লোকেও 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া কেহ কাহাকেও অভিযুক্ত করিতে পারিত না।" †

আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষা কতদিনে মানবসমাজে এরূপ কল্যাণযুগের প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে? দ্বিসহস্র বৎসরের চেষ্টায় ইউরোপ নানাবিষয়ে আশাতীত সমুন্নতি লাভ করিলেও, সত্যনিষ্ঠায় এখনও এতদূর সমুন্নতিলাভে সমর্থ হয় নাই। না জানি কতকালের চেষ্টায় ভারতবর্ষ এই কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল! কতকাল পর্য্যন্ত সে সত্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্তও যে ভারতবর্ষের সত্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল, চীনদেশের বৌদ্ধশ্রমণগণের ভ্রমণকাহিনীতে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।‡

---

* Thefts were extremely rare, and that they honored truth and virtue.—Fragments.

† They oversee what goes on in the country or towns and report everything to the king, where the people have a king, and to the Magistrates, where the people are self-governed, and it is against use and wont for these to give in a false report; *but indeed no Indian is accused of lying.*—McCrindle.

‡ Though the Indians are of a light temperament, they are distinguished by the straightforwardness and honesty of their character. With regard to riches, they never take anything unjustly; with regard to justice, they make even excessive concessions; straightforwardness is the distinguished feature of their administration.—Hiouen-thsang.

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মুসলমান-লেখককেও সাক্ষিস্থলে উপস্থিত করিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্বনাম-খ্যাত পাশ্চাত্যপর্য্যটক মার্কো পোলো হইতে ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসলেখক আবুল-ফজল পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তকণ্ঠে আমাদের সত্যনিষ্ঠার গৌরবঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।*

এই সকল বিদেশের লেখকগণের উক্তি কোন পুরাতনগ্রন্থগত নীতিবাক্যের অনুবাদ নহে। তাঁহারা অনেকেই আমাদের পুরাতন সাহিত্যের সহিত অপরিচিত ছিলেন; কেবল লোকব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। সে লেখা তর্কফুৎকারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।†

যাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, কালক্রমে এদেশে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারিবর্গও আমাদের সত্যনিষ্ঠার গৌরবঘোষণা করিতে বিস্মৃত হন নাই।

যে জাতি সত্যনিষ্ঠায় জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, কোন্ সময় হইতে কি সূত্রে তাহাদের সত্যনিষ্ঠা শিথিল হইতে আরম্ভ করিল, তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। সে ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই; কেহ লিখিবার জন্য ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেও, আধুনিক সত্যনিষ্ঠা সেরূপ ইতিহাসের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিতে সম্মত হইবে না। তাহা নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ককাহিনী! অধ্যাপক

* (1) The Indians are naturally inclined to justice, and never depart from it in their actions. Their good faith, honesty, and fidelity to their engagements are wellknown, and they are so famous for these qualities, that people flock to their country from every side.—Elliot's History, vol I. 88.

(2) You must know that these *Abraiaman* (Brahmans?) are the best merchants in the world, and the ***most truthful***, for they would not tell a lie for anything on earth.—Marco Polo, vol II. 350.

(3) The people of Lesser India are true in speech and eminent in justice.—Friar Jordanus.

(4) The Hindus are religious, affable, cheerful, lovers of justice, given to retirement, able in business, admirers of truth, grateful and of unbounded fidelity; and their soldiers know not what it is to fly from the field of battle.—Abul Fozl.

† There must surely be some ground for this, for it is not a remark that is frequently made by travellers in foreign countries, even in our time, that their inhabitants invariably speak the truth. Read the accounts of English travellers in France, and you will find very little said of French honesty and fidelity, while French accounts of England are seldom without a fling at *Perfide Albion*.—Max Muller.

উইল্‌সন্‌ তাহার রহস্যভেদের জন্য সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন,—ইউরোপীয় সংসর্গে পতিত হইয়াই এই দুর্গতির সূত্রপাত হইয়াছে!*

যে সকল ইউরোপীয় বণিক্‌ এদেশে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহারা স্বদেশ হইতে অপরিজ্ঞাত সমুদ্রপথে অপরিচিত বিদেশে উপনীত হইবার আশায় একরূপ নিরুদ্দেশযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা প্রবল থাকিবার কথা নহে। ন্যায়-অন্যায় যে-কোনও উপায়ে হউক, জাহাজ ভরিয়া পণ্যভাণ্ডার স্বদেশে বহন্‌ করিতে পারিলেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইতেন। কি উপায়ে পণ্যভাণ্ডার স্বদেশে আনীত হইল, লোকে তাহা জানিলেও, তাহাতে লজ্জাবোধ করিতে পারে নাই। তখন লাভের লোভে অন্ধ হইয়া, ইউরোপ কত কুকার্য্যেই না লিপ্ত হইয়াছিল! সত্যপথ ভিন্ন অসত্যপথে কদাচ কাহারও সমুন্নতি হয় না,—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসেই ভারতবর্ষের লোকে ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে নিয়ত সত্যরক্ষা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণের সংসর্গে পতিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা অসত্যের উপকার অনুভব করিতে পারে নাই। ছল-প্রতারণায় কাহারও কল্যাণ হয়, এ কথা একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল। কেহ তাহা চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইত না। ইউরোপীয় সংসর্গ সেই নূতন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করিবামাত্র, এদেশের লোকে অসত্যের উপকার উপলব্ধি করিতে লাগিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দান করিতে পারিলে কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিয়া, অধিক অর্থোপার্জন করিতে পারা যায়;—এমন সুবিধার কথা যেদিন হইতে প্রথমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, সেই দিন হইতেই এ দেশের লোকের মনে অসৎপথে অর্থোপার্জ্জনের কথা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বসংস্কার নিতান্ত কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। মুখে সত্যের গৌরবঘোষণার আড়ম্বর অধিক হইয়া উঠিল; কার্য্যে অসত্যের প্রভাব দিনদিন বর্দ্ধিত হইয়া চলিল! বহুবৎসরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে যে গগনস্পর্শী দেবমন্দির সুনির্ম্মিত হয়, একদিনেই তাহাকে লোষ্ট্রস্তূপে পরিণত করিতে পারা যায়। এক শতাব্দীর পাশ্চাত্য সংসর্গ ও শিক্ষা এইরূপে বহুশতাব্দীর পুরাতন প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার সমুন্নত দেবনিকেতন ধরাবিলুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে! ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসলেখক, সত্য-নিষ্ঠ হইলে, ইহার প্রমাণ অনুসন্ধান্‌ করিবার জন্য পরিশ্রান্ত হইবেন না। প্রত্যেক ঘটনায় এই ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে!

যাহারা অশিক্ষিত অবস্থায় কুসংস্কার-বশত নিভৃত পল্লীপথেও মিথ্যা কহিতে জানিত না, তাহারা সুশিক্ষিত হইয়া

* Where that feature was lost, it was chiefly by those who had been long familiar with Europeans.—Wilson in Mill's History of British India, Vol. I. 375.

অবলীলাক্রমে রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়াও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! ইহার কি কিছুমাত্র কারণ নাই? কারণ-অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবামাত্র পাশ্চাত্য সংসর্গ ও শিক্ষার দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে হয়। অন্ধবিশ্বাসই প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার মূলভিত্তিরূপে বর্ত্তমান ছিল। লোকে তর্ক করিত না; বিচারবিতণ্ডায় সময়ক্ষয় করিত না; পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস করিত,—"সত্যই ইহপরলোকের একমাত্র সদ্গতির সোপান। সত্যভ্রষ্ট হইলে, ইহপরকাল নষ্ট হইয়া যাইবে!" পাশ্চাত্য সত্যনিষ্ঠা নীরস তর্কযুক্তির কঙ্করভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। "অসত্যে অধিকাংশের অকল্যাণ; সত্যে অধিকাংশের কল্যাণ; অতএব অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হও।"—এই নীতিবাক্য মানবসমাজকে সত্যনিষ্ঠ করিতে পারে না। ইহার সহিত ধর্ম্মের সংস্রব নাই; ইহার সহিত কর্ম্মের সংস্রব নাই; ইহার সহিত সংস্রব কেবল তর্ককোলাহলের!

ইহাই যে পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিণত ফল, সে কথার প্রধান প্রমাণ ইতিহাস। প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার মূলভিত্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্মই লোকসমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। ধর্ম্মই পরলোকের সদ্গতির প্রলোভনে লোকসমাজকে ইহলোকে সত্যনিষ্ঠ করিয়াছিল। ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্যশিক্ষায় সে পুরাতন সংস্কার উড়িয়া গিয়াছে; তাহা কুসংস্কার বলিয়াও পরিচিত হইয়াছে।

শিশুর ন্যায় জনসমাজ সরলভাবে পরানুকরণে লিপ্ত হইয়া থাকে। নীতিশাস্ত্রের সহস্র উপদেশে যাহা কদাপি সিদ্ধ হইতে পারে না, দৃষ্টান্তের বলে তাহা সহজেই জনসমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া যায়। জনসমাজ এখন সত্যনিষ্ঠার কিরূপ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতেছে? যে দেশের রাজা ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে বন্দনা করিয়া তাঁহার ভরণপোষণের জন্য ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের "দেওয়ানী সনন্দ" পাইয়া, কোম্পানী-বাহাদুর ব্রাহ্মণের বাক্য অবিশ্বাস করিয়া দানপত্র দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অগত্যা ব্রাহ্মণ দানপত্র দেখাইয়া ভূমিরক্ষা করিতে বাধ্য হইল। বলা বাহুল্য, ঠাকুর দায়ে ঠেকিয়া জাল করিয়া রক্ষা পাইয়া গেল। মিথ্যার এরূপ অমোঘ উপকার জনসমাজ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। ইংরেজ-বাঙালীতে কলহ ঘটিল; দোষ কাহার, তাহার বিচার হইল না, বাঙালীর দণ্ড হইল। বাঙালী ভবিষ্যতের জন্য—চিরদিনের জন্য—বিচারকের উপর আস্থা হারাইয়া, মিথ্যাসাক্ষ্যে জয়লাভের নূতন পথ আবিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইল। মিথ্যাসাক্ষ্যের উপকার একবার প্রকাশিত হইবামাত্র জনসমাজ তাহাকে আর পরিত্যাগ করিতে পারে না। রাজসদনে উপনীত হইয়া সত্য কহিলে লাঞ্ছনা; অসত্য কহিলে পদোন্নতির সূত্রপাত হয়;—জনসমাজ একবার তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, আর পুরাতন সত্যনিষ্ঠা লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ঘটনার পর ঘটনায় পাশ্চাত্যসংসর্গে প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা এইরূপে প্রতিপদে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে! পাশ্চাত্যসংসর্গের প্রথম সময়ে হিন্দু গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মিথ্যা কহিতে সাহস করিত

না। পাশ্চাত্যশিক্ষা শিখাইয়া দিল,—"গঙ্গা হিমালয়ের তুষারস্তূপে উদ্ভূত হইয়া, বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে; তাহা নদীমাত্র; দেবতা নহে।" শুনিয়াছি, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক স্বনামখ্যাত ডফ্‌সাহেব কলিকাতার বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া হিন্দুছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"গঙ্গা কাহাকে বলে?" ছাত্র ভূগোলসূত্রের সুপরিচিত বর্ণনার আবৃত্তি করিবামাত্র, ডফ্‌সাহেব ভক্তি-বিগলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন,—"আর ভয় নাই, ভারতবর্ষের উদ্ধারলাভের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে!" গঙ্গা হিমালয়ের তুষার-স্তূপের গলিত ধারা হইলেও, আমার পক্ষে চিরসম্ভজনীয় পরম দেবতা। তাহার তীরে তীরেই আমার পূর্ব্বপিতামহবর্গের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার শীতল সলিলপ্রবাহেই আমার পিতৃ-পিতামহের চিতাভস্ম চিরনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল। সে পুণ্যসলিল স্পর্শ করিয়া মিথ্যা বলিলে, আমি মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়া পড়িব। এরূপ যুক্তিমূলক স্বদেশ-প্রীতি জনসমাজকে সত্যনিষ্ঠ করিতে পারে না। তাই তাহারা লোকাচাররক্ষার্থ গঙ্গায় পিতৃপুরুষের অস্থি বিসর্জ্জন করে; লাভের লোভে সেই গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়াই মিথ্যা কহিতে সঙ্কুচিত হয় না! গঙ্গা ত সেই হিমালয়ের গলিত তুষারধারা,—তবে আর ভয় কি?

প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার পুষ্টিরক্ষার্থ কেহ কোনরূপ আয়োজন করে নাই। তজ্জন্যই তাহা পাশ্চাত্যসংঘর্ষে পর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন আবার সে পুরাতন সত্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারে কি না, তাহা বহু সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। মানবের ইতিহাস মলিন করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিসংঘ ভূমণ্ডলে যে অসুরশক্তির আস্ফালন প্রচলিত করিয়া দিয়াছেন, এখন তাহার মধ্যাহ্নকাল। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতেজে মানবহৃদয়ের সকল সুকুমার বৃত্তি দগ্ধ হইয়া গেল! মানব এখন মানব-সংহারব্রতে দীক্ষিত হইয়া, গৃহকলহে লিপ্ত হইয়াছে। এই পাশবসভ্যতার পরিণাম কি, সে কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে না; তাহার অবসর পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভূমণ্ডলে এই অভিনব শিক্ষায় মানবমনকে শোণিত-লোলুপ করিয়া তুলিতেছে। তাহার সম্মুখে সত্যনিষ্ঠা কদাপি আত্মপ্রকাশ করিতে সাহস পায় না। সত্য ত্যাগের ধর্ম্ম। সত্য সংযমের ধর্ম্ম। সত্য সমবেদনার ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ধাবিত হইয়াছে। এখন সম্ভোগের ধর্ম্মই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মূলমন্ত্র—

"যেন তেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধির্গরীয়সী।"

সভ্যসমাজের এই কলহকোলাহলময় বিপ্লব-যুগে সত্যনিষ্ঠা উপর্য্যুপরি বিপর্য্যস্ত হইয়াও, প্রাচ্যসমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও এদেশের প্রশান্ত পল্লী-নিকেতনে যেরূপ সত্যনিষ্ঠা বর্ত্তমান, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তাহাই আমাদের নিজস্ব মহারত্ন। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা কি আবার মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না?

সত্য সাহসের ধর্ম্ম। সাহস হারাইলে, সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করা যায় না। যে সত্য কহিতে সঙ্কুচিত হয়, তাহার মত কাপুরুষ

আর কে আছে? তথাপি দেশের শিক্ষা, দশের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে এমন কাপুরুষ করিয়া তুলিতেছে যে, আমরা সত্যভ্রষ্ট হইয়া, ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া কাজ গুছাইয়া লইবার আশায়, দেশের দোহাই দিয়া, দশের হট্টগোলে মিলিয়া, মিথ্যা বাগ্‌জালবিস্তারে দেশোদ্ধারের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করি!

সত্য নিয়ত নীরবে কর্ত্তব্যপালন করিবার উপদেশ দান করে; কার্য্য সম্পন্ন হইবামাত্র ফলদানের অলীক আশায় প্রলুব্ধ করিয়া জনসমাজের নিকট বণিকের ক্ষতিলাভ-গণনার তুলাদণ্ড সংস্থাপিত করে না। সত্য-নিষ্ঠাই সত্যনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সে সংস্কার অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

এই সংস্কার একদা আমাদের সমগ্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রধান প্রমাণ—রামায়ণ, মহাভারত। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই মহাকাব্যের পঠন-পাঠন বিরল হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষক-বর্গও এই দুইখানি মহাকাব্যের অনেক অলীক সমালোচনায় লিপ্ত হইয়াছেন। একদা এই দুইখানি মহাকাব্য প্রাচ্য সত্য-নিষ্ঠার প্রধানশিক্ষকরূপে সুপরিচিত ছিল। সত্যই কি সে মর্য্যাদা সহসা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে?

রামায়ণ সত্যরক্ষার ইতিহাস। মহাভারত সত্যভঙ্গের ইতিহাস। গল্পাংশে এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও, উভয় কাব্যের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তে পার্থক্য নাই। সত্যনিষ্ঠার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে উভয় কাব্যই জনসমাজকে নিয়ত সত্যপরায়ণ হইবার জন্য উপদেশদান করিতেছে!

দশরথ কৈকেয়ীকে যে যুগলবর দান করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার না করিয়াও, দশরথ রামবনবাস নিবারণ করিতে পারিতেন। তথাপি তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও সত্যরক্ষা করিয়াছিলেন। তখন ভরত মাতুলালয়ে। ভরত আসিয়া কৈকেয়ীর কৌশলোপার্জ্জিত রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন না। তিনি বননির্ব্বাসিত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবামাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য পুনঃপুন অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—

> "ভবানপি তথৈত্যেব পিতরং সত্যবাদিনম্।
> কর্ত্তুমর্হতি রাজেন্দ্র! ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ॥"

রামচন্দ্র বলিলেন—"আমি পিতৃসত্য পালন করিতেছি; তুমিও তাহা পালন করিতে প্রবৃত্ত হও। পিতৃনিয়োগ আমাকে বনবাস ও তোমাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছে। তুমি রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে, পিতৃসত্য যথাযথ পালিত হইতে পারে না। আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র অভিষিক্ত হইয়া, আমার ন্যায় তুমিও পিতাকে সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন কর।"

ভরত পিতৃসত্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি পিতৃনিয়োগ লঙ্ঘন করিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাদুকাযুগল সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, ভরত চতুর্দ্দশবৎসর রামচন্দ্রের ন্যায় জটাবল্কল ধারণ করিয়া ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিলেন। ভরতের

এই আত্মত্যাগে বিমুগ্ধ হইয়া, কথক-সম্প্রদায় ভরতচরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া, নানা রাগরাগিণীর আলাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। কোন্ কোন সমালোচক এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ভরতচরিত্রকে রামায়ণের শ্রেষ্ঠচরিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভরতের ব্যবহার ভ্রাতৃস্নেহে সরস হইলেও, পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের চেষ্টা করে নাই। ভরতের ব্যবহার চতুর্দ্দশবৎসর ধরিয়া দশরথের অবিচারের কথা লোকসমাজে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। তাহা নিবারণ করিবার জন্যই রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন—"আমার ন্যায় তুমিও পিতৃনিয়োগ পালন কর।" আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন সত্যরক্ষা করা যায় না। ভরত যাহা করিয়াছিলেন, ভ্রাতৃবৎসলের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যরক্ষার জন্য স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিকেও সংযত করিতে হয়। দশরথ কৈকেয়ীকে প্রত্যাখ্যান করিলে স্বাভাবিক হইত; যে স্ত্রী স্বামীর স্বেচ্ছানুবর্ত্তিনী নহে, তাহাকে শাস্ত্রশাসনের দোহাই দিয়া পরিত্যাগ করিলেও দশরথের কার্য্য নিতান্ত অস্বাভাবিক হইত না। তিনি সত্যরক্ষার্থ এই সকল স্বাভাবিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণের প্ররোচনায় রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের পক্ষগ্রহণ করিয়া বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিলে, অস্বাভাবিক হইত না। বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—রাম বনগমন করিলে, শাস্ত্রানুসারে সীতাদেবী সিংহাসন-লাভের অধিকারিণী। সে কূটতর্কের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে পরাস্ত করিলেও, অস্বাভাবিক হইত না। এই সকল কূট-তর্কের অবতারণা করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন,—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত না করিলে সত্যপালন করা যায় না। রামচন্দ্রের সত্যপালন কত সুসংযত চিত্তবলে সাধিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্যই মহাকবি এত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। জাবালির বক্তৃতায় পিতৃনিয়োগলঙ্ঘনের নানা যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া, মহাকবি রামচরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত মর্ম্ম ক্ষতিলাভ-গণনাপরায়ণ পাশ্চাত্যবুদ্ধির বোধগম্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা পাশ্চাত্যশিক্ষকের বিচারে কুসংস্কার বলিয়াই প্রতিভাত। তাহা যুক্তিতর্কের অধীন হইতে সম্মত হয় না। তাহার প্রকৃতমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তাহাকে কুসংস্কার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। পাশ্চাত্য-শিক্ষা আমাদিগের নিকট তাহাই কীর্ত্তন করিতেছে;—বুক ফুলাইয়া, হাত নাড়িয়া, কণ্ঠ কাঁপাইয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—"ইহলোকই লোক; তাহার সুখই সুখ।" কেহ তাহাতে প্রতিবাদ করিবামাত্র পাশ্চাত্যসমাজ মালসাট মারিয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হয়। এই পথ প্রকৃতপথ কি না, তাহাতে কিন্তু সমূহ সংশয় আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গ, সমুচিত সাহসের অভাবে, ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া সেই সংশয়ের কথা কখন-কখন ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর একবার বক্তৃতা-

ছলে সাহস করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের জন্য মানবসাহিত্য হইতে চরিত্রসংশোধনের উপায় আবিষ্কার করিতে হইলে, ভারতবর্ষের দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য মনুষ্যত্বলাভের যে সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সত্যনিষ্ঠাই প্রধান। তাহাই পরম তপস্যা; তাহাতেই ইহপরলোক জয় করা যায়। এই আদর্শ পাশ্চাত্যশিক্ষায় মলিন হইয়া গেলে, সমগ্র মানবসমাজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে! যাহারা রুধিরকর্দ্দমে ধরাতল পিচ্ছিল করিয়া নিরন্তর নরহত্যায় ধাবিত হইতেছে, তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে কি না, তাহাতে বিলক্ষণ সংশয় আছে। যে দিন মানবসমাজ রণশ্রান্ত অবসন্ন অন্তঃকরণে চারিদিকে চাহিয়া "কি করিতেছি" বলিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিবে, সেদিন ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কেহ তাহাকে শান্তিদান করিতে পারিবে না। সমগ্র মানবসমাজ যদি স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিয়া একমন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তবে আর মানবসন্তানের চরিত্রসংশোধনের উপায় থাকে না। এইজন্যই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রাণপণে তাহার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করা কর্ত্তব্য। গর্ব্বান্ধ পাশ্চাত্যশিক্ষা যাহা বলুক না কেন, একদিন তাহাকে মোক্ষমূলরের ভাষায় বলিতে হইবে:—

And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India.

একজন খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত পাশ্চাত্যপণ্ডিতের এই সকল কথা অতিবাদ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব আছে, যাহা মানবসমাজকে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে। সে বিশেষত্ব কেবল ভারতবর্ষেই জনসমাজের আয়ত্ত হইয়াছিল। তাহা যদি কখন সমগ্র ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে কেবল ভারত-বর্ষেরই গৌরবগাথা ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। সমগ্র মানবসমাজের চিরপরিত্রাণপ্রদ মুক্তি-মন্ত্র যাহার নিভৃত নিকেতনে বিধাতা সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, সে দেশের লোক যদি তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা না করিতে পারে, তবে ভারতবর্ষের নাম অতল সলিলে নিমগ্ন হইবে! পাশ্চাত্যশিক্ষাবিড়ম্বিত ভারতবাসীকে যে মহাপুরুষ তাহার চরিত্রগত-স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় সমুন্নত করিতে পারিবেন, তিনি যুগাবতাররূপে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিবেন। সে অক্ষয়পদ লাভ করিবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসলেখক। আমরা তাঁহারই অভ্যুদয়কাল প্রতীক্ষা করিয়া প্রতীচ্য পাণ্ডিত্যের অসঙ্গত ঔদ্ধত্য সহ্য করিয়া মন্ত্ররক্ষা করিবার জন্য বিধাতার নিকটে সমুচিত চরিত্রবল ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৬৫

ক্ষেমঙ্করীর নিকট হইতে ফিরিয়া-আসিয়া হেমনলিনী তাহাদের বসিবার ঘরের টেবিলের উপর একখানা মস্ত ভারি চিঠি পাইল। লেফাফার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, চিঠিখানি রমেশের লেখা। স্পন্দিতবক্ষে চিঠিখানি হাতে করিয়া শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠিতে রমেশ কমলাসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছে। উপসংহারে লিখিয়াছে, "তোমার সহিত আমার যে বন্ধন ঈশ্বর দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন, সংসার তাহা ছিন্ন করিয়াছে। তুমি এখন অন্যের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছ—সেজন্য আমি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারি না—কিন্তু তুমিও আমাকে দোষ দিয়ো না। যদিও আমি একদিনের জন্যও কমলার প্রতি স্ত্রীর মত ব্যবহার করি নাই, তথাপি ক্রমশ সে যে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, এ কথা তোমার কাছে আমার স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আজ আমার হৃদয় কি অবস্থায় আছে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না করিতে, তবে তোমার মধ্যে আমি আশ্রয়লাভ করিতে পারিতাম। সেই আশ্বাসেই আমি আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ যখন স্পষ্ট দেখিলাম—তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার নিকট হইতে বিমুখ হইয়াছ, যখন শুনিলাম—অন্যের সহিত বিবাহসম্বন্ধে তুমি সম্মতি দিয়াছ, তখন আমারও মন আবার দোলায়িত হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এখনো কমলাকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। ভুলি বা না ভুলি, তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া আর কাহারো কোনো ক্ষতি নাই। আমারি বা ক্ষতি কিসের! সংসারে যে দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাঁহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ। আজ প্রাতে যখন তোমার সহিত ক্ষণিক সাক্ষাতের বিদ্যুদ্‌বৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন একবার মনে মনে বলিলাম, 'আমি হতভাগ্য।' কিন্তু আর আমি সে

কথা স্বীকার করিব না। আমি সবল-চিত্তে আনন্দের সহিত তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি—আমি পরিপূর্ণ-হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিব—তোমাদের কল্যাণে, বিধাতার কল্যাণে আমি অন্তরের মধ্যে এই বিদায়-কালে যেন কিছুমাত্র দীনতা অনুভব না করি। তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক্! আমাকে তুমি ঘৃণা করিয়ো না—আমাকে ঘৃণা করিবার কোনো কারণ তোমার নাই!"

অন্নদাবাবু চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতে-ছিলেন। হঠাৎ হেমনলিনীকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন—কহিলেন, "হেম, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

হেমনলিনী কহিল—"না, অসুখ করে নাই। বাবা, রমেশবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছি। এই লও, পড়া হইলে আবার আমাকে ফেরৎ দিয়ো।"

এই বলিয়া চিঠি দিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল। অন্নদাবাবু চস্‌মা লইয়া চিঠিখানি বারদুয়েক পড়িলেন—তাহার পরে হেম-নলিনীর নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন, "এ একপ্রকার ভালই হইয়াছে। পাত্রহিসাবে রমেশের চেয়ে নলিনাক্ষ অনেক বেশি প্রার্থনীয়। ক্ষেত্র হইতে রমেশ যে আপনিই সরিয়া পড়িল, এ হইল ভাল।"

এই কথা ভাবিতেছেন, এমন-সময় নলিনাক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া অন্নদাবাবু একটু আশ্চর্য্য হইলেন। আজ পূর্ব্বাহ্নে নলিনাক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে, আবার কয়েকঘণ্টা যাইতে না যাইতেই সে কি মনে করিয়া আসিল? বৃদ্ধ মনে মনে একটুখানি হাসিয়া স্থির করিলেন, "হেমনলিনীর প্রতি নলি-নাক্ষের মন পড়িয়াছে।"

কোনো ছুতা করিয়া হেমনলিনীর সহিত নলিনাক্ষের দেখা করাইয়া-দিয়া নিজে সরিয়া যাইবেন কল্পনা করিতেছেন, এমন-সময় নলিনাক্ষ কহিল—"অন্নদাবাবু, আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়াছে। কথাটা বেশিদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিতে ইচ্ছা করি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"ঠিক কথা, সে ত বলাই কর্ত্তব্য।"

নলিনাক্ষ কহিল—"আপনি জানেন না, পূর্ব্বেই আমার বিবাহ হইয়াছে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"জানি। কিন্তু—"

নলিনাক্ষ। আপনি জানেন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ আপনি অনুমান করিতে-ছেন। নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমন কি, তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"ঈশ্বর করুন, তাহাই যেন সত্য হয়। হেম! হেম!"

হেমনলিনী আসিয়া কহিল—"কি বাবা!"

অন্নদাবাবু। রমেশ তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে অংশটুকু—

হেমনলিনী সেই চিঠিখানি নলিনাক্ষের হাতে দিয়া কহিল, "এ চিঠির সমস্তটাই উঁহার

পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য।”—এই বলিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল।

চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া নলিনাক্ষ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন—“এমন শোচনীয় ঘটনা সংসারে প্রায় ঘটে না। চিঠিখানি পড়িতে দিয়া আপনার মনে আঘাত দেওয়া হইল—কিন্তু ইহা আপনার কাছে গোপন করাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হইত।”

নলিনাক্ষ একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া উঠিল। চলিয়া যাইবার সময় উত্তরের বারান্দায় অদূরে হেমনলিনীকে দেখিতে পাইল। মনটা হইতে লাগিল একবার তাহার কাছে যায়। কিন্তু গিয়া কি হইবে? পূর্ব্বে হেমনলিনীর কাছে সে যেমন সহজে যাইতে পারিত, এখন তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেছে। মাঝখানে অনর্থক একটা বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উভয়কে দূর করিয়া দিয়াছে। এখন পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে নানাপ্রকার জটিলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

হেমনলিনীকে দেখিয়া নলিনাক্ষের মনে আঘাত লাগিল। ঐ যে নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার স্থির-শান্ত মূর্ত্তিটি উহার অন্তঃকরণকে কেমন করিয়া বহন করিতেছে? এই মুহূর্ত্তে উহার মন যে কি করিতেছে, তাহা ঠিকমত জানিবার কোনো উপায় নাই—নলিনাক্ষকে তাহার কোনো প্রয়োজন আছে কি না, সে প্রশ্নও করা যায় না, তাহার উত্তর পাওয়াও কঠিন। নলিনাক্ষের পীড়িত চিত্ত ভাবিতে লাগিল, “ইহাকে কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যায় কি না? কিন্তু মানুষে মানুষে কি দুর্ভেদ্য ব্যবধান! মনজিনিষটা কি ভয়ঙ্কর একাকী—আপনার গভীর গুহান্তরালের মাঝখান হইতে নিজেকে একটুখানি ব্যক্ত করিবার জন্য যে একটা ভাষা তাহার সম্বল, তাহাও কত অসম্পূর্ণ—আবার অধিকাংশসময়ে সেই সঙ্কীর্ণ সহায়কেও বর্জ্জন করিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। হয় ত অতিবড় দুঃসহ বেদনা অত্যন্ত কাছেই আছে, কিন্তু কিছুই করিবার নাই—যেন এখান হইতে ঐ বারান্দাটুকু সহস্রযোজন-দূর।”

নলিনাক্ষ একটু ঘুরিয়া ঐ বারান্দার সাম্নে দিয়া গাড়িতে উঠিবে স্থির করিল—মনে করিল, যদি হেমনলিনী তাহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে;—বারান্দার সম্মুখে যখন আসিল, দেখিল, হেমনলিনী বারান্দা ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে সরিয়া গেছে! হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎ সহজ নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সরল নহে, এই কথা চিন্তা করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে নলিনাক্ষ গাড়িতে উঠিল।

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি যোগেন, একলা যে?”

যোগেন্দ্র কহিল, “দ্বিতীয় আর কোন্ ব্যক্তিকে প্রত্যাশা করিতেছ শুনি?”

অন্নদা কহিলেন—“কেন? রমেশ?”

যোগেন্দ্র। তাহার প্রথমদিনের অভ্যর্থনাটাই কি ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই! কাশীর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিয়া যদি তাহার শিবত্বলাভ না হইয়া থাকে, তবে আর কি হইয়াছে, আমি নিশ্চয় জানি না। কাল

হইতে এপর্য্যন্ত তাহার আর দেখা নাই, টেবিলে একখানা কাগজে লেখা আছে— "পালাই—তোমার রমেশ।" এ সব কবিত্ব আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। সুতরাং আমাকেও এখান হইতে পালাইতে হইল— আমার হেড্‌মাষ্টারিই ভাল—তাহাতে সমস্তই খুব স্পষ্ট—ঝাপ্‌সা কিছুই নাই।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"হেমের জন্ত ত একটা কিছু স্থির—"

যোগেন্দ্র। আর কেন? আমিই কেবল স্থির করিব, আর তোমরা অস্থির করিতে থাকিবে, এ খেলা বেশিদিন ভাল লাগে না। আমাকে আর কিছুতে জড়াইয়ো না—আমি যাহা ভাল বুঝিতে পারি না, সেটা আমার ধাতে সহে না। হঠাৎ দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবার যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা হেমের আছে, সেটা আমাকে কিছু কাবু করে। কাল সকালের গাড়িতে আমি বিদায় হইব, পথে বাঁকিপুরে আমার কাজ আছে।

অন্নদাবাবু চুপ করিয়া বসিয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সংসারের সমস্তা আবারে দুরূহ হইয়া আসিয়াছে।

৬৬

শৈলজা এবং তাহার পিতা নলিনাক্ষের বাড়ীতে আসিয়াছেন। শৈলজা কমলাকে লইয়া একটা কোণের ঘরে বসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিতেছিল, চক্রবর্ত্তী ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন।

চক্রবর্ত্তী। আমার ত ছুটি ফুরাইয়া আসিল—কালই গাজিপুরে যাইতে হইবে। যদি হরিদাসী আপনাদের কোনোরকমে বিরক্ত করিয়া থাকে—বা যদি আপনাদের পক্ষে—

ক্ষেমঙ্করী। ও আবার কিরকম কথা চক্রবর্ত্তিমশায়? আপনার মনের ভাবটা কি শুনি? আপনি কি কোনো ছুতা করিয়া আপনাদের মেয়েটিকে ফিরাইয়া লইতে চান?

চক্রবর্ত্তী। আমাকে তেমন লোক পান নাই। আমি দিয়া ফিরাইয়া লইবার পাত্র নই—কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র অসুবিধা হয়—

ক্ষেমঙ্করী। চক্রবর্ত্তিমশায়, ওটা আপনার সরল কথা নয়—মনে মনে বেশ জানেন, হরিদাসীর মত অমন লক্ষ্মী মেয়েটিকে কাছে রাখিলে সুবিধার সীমা নাই, তবু—

চক্রবর্ত্তী। না না, আর বলিতে হইবে না—আমি ধরা পড়িয়া গেছি। ওটা একটা ছলমাত্র—আপনার মুখে হরিদাসীর গুণ শুনিবার জন্তই কথাটা আমার পাড়া। কিন্তু একটা ভাবনা আছে—পাছে নলিনাক্ষবাবু মনে করেন যে, এ আবার একটা উপসর্গ কোথা হইতে ঘাড়ে পড়িল! আমাদের মেয়েটি অভিমানী—যদি নলিনাক্ষের লেশমাত্র বিরক্তিভাব ও দেখিতে পায়, তবে উহার পক্ষে বড় কঠিন হইবে।

ক্ষেমঙ্করী। হরি বল! নলিনের আবার বিরক্তি! ওর সে ক্ষমতাই নাই।

চক্রবর্ত্তী। সে কথা ঠিক! কিন্তু দেখুন, হরিদাসীকে আমি নাকি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তাই তার সম্বন্ধে আমি অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। নলিনাক্ষ যে ওর 'পরে বিরক্ত হইবেন না, উদাসীনের মত থাকিবেন, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না। তাঁর বাড়ীতে যখন হরিদাসী আছে, তখন

তাকে তিনি আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করিবেন, এ না হইলে মনে বড় সঙ্কোচ-বোধ হয়। ও ত ঘরের দেয়াল নয়, ও একটা মানুষ—ওর প্রতি বিরক্তও হইবেন না, স্নেহও করিবেন না, ও আছে ত আছে, এইটুকুমাত্র সম্বন্ধ, সেটা যেন কেমন—

ক্ষেমঙ্করী। চক্রবর্ত্তিমশায়, আপনি বেশি ভাবিবেন না—কোনো লোককে আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করা আমার নলিনের পক্ষে শক্ত নয়। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার জো নাই, কিন্তু এই যে হরিদাসী আমার এখানে আছে, ও কিসে স্বচ্ছন্দে থাকে, ওর কিসে ভাল হয়, সে চিন্তা নিশ্চয়ই নলিনের মনে লাগিয়া আছে—খুব সম্ভব, সে-রকম ব্যবস্থাও সে কিছু-না-কিছু করিতেছে, আমরা তাহা জানিতেও পারিতেছি না।

চক্রবর্ত্তী। শুনিয়া বড় নিশ্চিন্ত হইলাম। তবু আমি যাইবার আগে একবার বিশেষ করিয়া নলিনাক্ষবাবুকে বলিয়া যাইতে চাই। একটী স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ ভার লইতে পারে, এমন পুরুষ জগতে অল্পই মেলে—ভগবান্ যখন নলিনাক্ষবাবুকে সেই যথার্থ পৌরুষ দিয়াছেন, তখন তিনি যেন মিথ্যা সঙ্কোচে হরিদাসীকে তফাতে রাখিয়া না চলেন, তিনি যেন যথার্থ আত্মীয়ের মত তাহাকে নিতান্ত সহজভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করেন, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনাটি জানাইতে চাই।

নলিনাক্ষের প্রতি চক্রবর্ত্তীর এই বিশ্বাস দেখিয়া ক্ষেমঙ্করীর মন গলিয়া গেল। তিনি কহিলেন—"পাছে আপনারা কিছু মনে করেন, এই জন্যেই হরিদাসীকে আমি নলিনাক্ষের সাম্‌নে তেমন করিয়া বাহির হইতে দিই নাই—কিন্তু আমার ছেলেকে আমি ত জানি, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

চক্রবর্ত্তী। তবে আপনার কাছে সব কথা খোলসা করিয়াই বলি। শুনিয়াছি, নলিনাক্ষবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে—বধূটির বয়সও নাকি অল্প নয় এবং তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা আমাদের সমাজের সঙ্গে মেলে না। তাই ভাবিতেছিলাম, হয় ত হরিদাসীর—

ক্ষেমঙ্করী। সে আর আমি বুঝি না। সে হইলে ভাবনা ছিল বই কি! কিন্তু সে বিবাহ হইবে না—

চক্রবর্ত্তী। সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে?

ক্ষেমঙ্করী। গড়েই নি, তার ভাঙিবে কি! নলিনের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, আমিই জেদ করিতেছিলাম। কিন্তু সে জেদ ছাড়িয়াছি। যাহা হইবার নয়, তাহা জোর করিয়া ঘটাইয়া মঙ্গল নাই। ভগবানের কি ইচ্ছা, জানি না—মরিবার পূর্ব্বে বুঝি আর বৌ দেখিয়া যাইতে পারিলাম না।

চক্রবর্ত্তী। অমন কথা বলিবেন না। আমরা আছি কি করিতে? ঘটকবিদায় এবং মিষ্টান্ন আদায় না করিয়া ছাড়িব বুঝি?

ক্ষেমঙ্করী। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক চক্রবর্ত্তিমশায়! আমার মনে বড় দুঃখ আছে যে, নলিন এই বয়সে আমারি জন্যে সংসারধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাই আমি বড় ব্যস্ত হইয়া সকল দিক্ না ভাবিয়া একটা সম্বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম —সে আশা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনারা

একটা দেখিয়া দিন। দেরি করিবেন না—আমি বেশিদিন বাঁচিব না।

চক্রবর্ত্তী। ও কথা বলিলে শুনিব কেন! আপনাকে বাঁচিতেও হইবে, বৌয়েরও মুখ দেখিবেন। আপনার যে-রকম বৌটি দরকার, সে আমি ঠিক জানি; নিতান্ত কচি হইলেও চলিবে না, অথচ আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, বাধ্য হইয়া চলিবে—এ নহিলে আমাদের পছন্দ হইবে না। তা সে আপনি কিছুই ভাবিবেন না—ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সে ঠিক হইয়াই আছে! এখন যদি অনুমতি করেন, একবার হরিদাসীকে তার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে দুচারটে কথা উপদেশ করিয়া আসি—অমনি শৈলকেও এখানে পাঠাইয়া দিই—আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনার কথা তাহার মুখে আর ধরে না।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "না, আপনারা তিনজনেই এক ঘরে গিয়া বসুন, আমার একটু কাজ আছে।"

চক্রবর্ত্তী হাসিয়া কহিলেন, "জগতে আপনাদের কাজ আছে বলিয়াই আমাদের কল্যাণ। কাজের পরিচয় নিশ্চয়ই যথাসময়ে পাওয়া যাইবে। নলিনাক্ষবাবুর বধূর কল্যাণে ব্রাহ্মণের ভাগ্যে মিষ্টান্নের পালা সুরু হউক!"

চক্রবর্ত্তী, শৈল ও কমলার কাছে আসিয়া দেখিলেন, কমলার দুটি চক্ষু চোখের জলের আভাসে এখনো ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। চক্রবর্ত্তী শৈলজার পাশে বসিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। শৈল কহিল, "বাবা, আমি কমলকে বলিতেছিলাম যে, নলিনাক্ষবাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার এখন সময় হইয়াছে, তাই লইয়া তোমার এই নির্ব্বোধ হরিদাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।"

কমল বলিয়া উঠিল—"না দিদি, না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি,—তুমি এমন কথা মুখে আনিয়ো না। সে কিছুতেই হইবে না।"

শৈল কহিল—"কি তোমার বুদ্ধি! তুমি চুপ করিয়া থাক, আর হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষবাবুর বিবাহ হইয়া যাক্! বিবাহের পরদিন হইতে আর আজপর্য্যন্ত কেবলি ত যত-রাজ্যের অঘটনঘটনার মধ্যে পাক খাইয়া মরিলি, আবার আর একটা নূতন অনাসৃষ্টির দরকার কি?"

কমল কহিল—"দিদি, আমার কথা কাহাকেও বলিবার নয়—আমি সব সহিতে পারিব, সে লজ্জা সহিতে পারিব না। আমি যেমন আছি, বেশ আছি, আমার কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া দাও, তবে আমি কোন্‌মুখে আর একদণ্ড এ বাড়ীতে থাকিব? তবে আমি বাঁচিব কি করিয়া?"

শৈল এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারিল না—কিন্তু তাই বলিয়া হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ হইয়া যাইবে, ইহা চুপ করিয়া সহ্য করা তাহার পক্ষে বড় কঠিন।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"যে বিবাহের কথা বলিতেছ, সেটা ঘটিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে!"

শৈল। বল কি বাবা, নলিনাক্ষবাবুর মা যে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সে আশীর্ব্বাদ ফাঁসিয়া গেছে। মা কমল, তোমার কোনো ভয় নাই, ধর্ম্ম তোমার সহায় আছেন।

কমলা সব কথা স্পষ্ট না বুঝিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুড়ামশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি কহিলেন, "সে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে। এ বিবাহে নলিনাক্ষবাবুও রাজি নহেন এবং তাঁহার মার মাথায়ও সুবুদ্ধি আসিয়াছে।"

শৈলজা ভারি খুসি হইয়া কহিল—"বাঁচা গেল বাবা! কাল এই খবরটা শুনিয়া রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি নাই। কিন্তু সে যাই হোক্, কমল কি নিজের ঘরে চিরদিন এম্‌নি পরের মত কাটাইবে? কবে সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে?"

চক্রবর্ত্তী। ব্যস্ত হোস্ কেন শৈল? যখন ঠিক সময় আসিবে, তখন সমস্ত সহজ হইয়া যাইবে।

কমল কহিল—"এখন যা হইয়াছে, এই সহজ—এর চেয়ে সহজ আর কিছু হইতে পারে না। আমি বেশ সুখে আছি, আমাকে এর চেয়ে সুখ দিতে গিয়া আবার আমার ভাগ্যকে ফিরাইয়া দিয়ো না খুড়ামশায়! আমি তোমাদের পায়ে ধরি, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিয়ো না, আমাকে এই ঘরের একটা কোণে ফেলিয়া আমার কথা ভুলিয়া যাও। আমি খুব সুখে আছি।"—বলিতে বলিতে কমলার দুই চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন—"ও কি মা, কাঁদ কেন? তুমি যাহা বলিতেছ, আমি বেশ বুঝিতেছি। তোমার এই শান্তিতে আমরা কি হাত দিতে পারি! বিধাতা আপনি যাহা ধীরে ধীরে করিতেছেন, আমরা নির্ব্বোধের মত তার মধ্যে পড়িয়া কি সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দিব? কোনো ভয় নাই! আমার এত বয়স হইয়া গেল, আমি কি স্থির হইয়া থাকিতে জানিনা?"

এমন-সময় উমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার আকর্ণবিস্ফারিত হাস্য লইয়া দাঁড়াইল।

খুড়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে উমশে, খবর কি?"

উমেশ কহিল, "রমেশবাবু নীচে দাঁড়াইয়া আছেন, ডাক্তারবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

কমলার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। খুড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন—কহিলেন—"ভয় নাই মা, আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।"

খুড়া নীচে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া কহিলেন—"আসুন রমেশবাবু, রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার সঙ্গে গোটাদুয়েক কথা কহিব।"

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"খুড়া-মশায়, আপনি এখানে কোথা হইতে?"

খুড়া কহিলেন, "আপনার জন্যই আছি—দেখা হইল, বড় ভাল হইল। আসুন, আর দেরি নয়, কাজের কথাটা শেষ করিয়া ফেলা যাক্।"—বলিয়া রমেশকে রাস্তায় টানিয়া লইয়া কিছুদূর গিয়া কহিলেন—"রমেশবাবু, আপনি এ বাড়ীতে কেন আসিয়াছেন?"

রমেশ কহিল, "নলিনাক্ষডাক্তারকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম! তাঁহাকে কমলার কথা আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলা উচিত স্থির করিয়াছি। আমার এক একবার মনে হয়, হয় ত কমলা বাঁচিয়া আছে।"

খুড়া কহিলেন, "যদি কমলা বাঁচিয়াই থাকে এবং যদি নলিনাক্ষের সঙ্গে তার দেখা হয়, তবে আপনার মুখে নলিনাক্ষ সমস্ত ইতিহাস শুনিলে কি সুবিধা হইবে? তাঁহার বৃদ্ধা মা আছেন, তিনি এ সব কথা জানিতে পারিলে কমলার পক্ষে কি ভাল হইবে?"

রমেশ কহিল—"সামাজিক হিসাবে কি ফল হইবে, জানি না—কিন্তু কমলাকে যে কোনো অপরাধ স্পর্শ করে নাই, সেটা ত নলিনাক্ষের জানা চাই। কমলার যদি মৃত্যুই হইয়া থাকে, তবে নলিনাক্ষবাবু তাঁহার স্মৃতিকে ত সম্মান করিতে পারিবেন!"

খুড়া কহিলেন—"আপনাদের ও সব একেলে কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না—কমলা যদি মরিয়াই থাকে, তবে তাঁহার একরাত্রির স্বামীর কাছে তাহার স্মৃতিটাকে লইয়া টানাটানি করিবার কোনো দরকার দেখি না। ঐ যে বাড়ীটা দেখিতেছেন, ঐ বাড়ীতে আমার বাসা। কাল সকালে যদি একবার আসিতে পারেন, তবে আপনাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করিবেন না, এই আমার অনুরোধ!"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা।"

খুড়া ফিরিয়া-আসিয়া কমলাকে কহিলেন—"মা, কাল সকালে তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যাইতে হইবে। সেখানে তুমি নিজে রমেশবাবুকে বুঝাইয়া বলিবে, এই আমি স্থির করিয়াছি।"

কমলা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, "আমি নিশ্চয় জানি, তাহা না হইলে চলিবে না—একেলে ছেলেদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি সেকেলে লোকের কথায় ভোলে না। মা, মন হইতে সঙ্কোচ দূর করিয়া ফেল—এখন তোমার যেখানে অধিকার, অন্য লোককে আর সেখানে পদার্পণ করিতে দিবে না, এ ত তোমারি কাজ। এ সম্বন্ধে আমাদের ত তেমন জোর খাটিবে না।"

কমলা তবু মুখ নীচু করিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন—"মা, অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, এখন এই ছোটোখাটো জঞ্জালগুলো শেষবারের মত ঝাঁটাইয়া ফেলিতে সঙ্কোচ করিয়ো না।"

এমন সময়ে পদশব্দ শুনিয়া কমলা মুখ তুলিয়াই দেখিল—দ্বারের সম্মুখে নলিনাক্ষ। একেবারে তাহার চোখের উপরেই নলিনাক্ষের দুই চোখ পড়িয়া গেল—অন্যদিন নলিনাক্ষ যেমন তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া চলিয়া যায়, আজ যেন তেমন তাড়া করিল না। যদিও ক্ষণকালমাত্র কমলার দিকে সে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই ক্ষণকালের দৃষ্টি কমলার মুখ হইতে কি যেন আদায় করিয়া লইল, অন্যদিনের মত অনধিকারের সঙ্কোচে দেখিবার জিনিষটিকে প্রত্যাখ্যান করিল না। পরমুহূর্ত্তেই শৈলজাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই খুড়া কহিলেন, "নলিনাক্ষবাবু, পালাইবেন না—আপনাকে আমরা আত্মীয় বলিয়াই জানি। এটি আমার মেয়ে

উঠিয়া আসিবে, এমন-সময় খাটের ওপাশে মেঝের উপরে ও কে অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশাইতে চাহিল! হায়রে কমলা, লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই! সে আজ কুলুঙ্গিতে গোলাপ সাজাইয়া স্বহস্তে নলিনাক্ষের বিছানা করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ নলিনাক্ষের পায়ের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার ওপাশে গিয়া লুকাইয়াছিল—এখন পালানোও অসম্ভব, লুকানোও কঠিন। তাহার রাশীকৃত-লজ্জা-সমেত এই ধূলির উপরে সে এমন একান্তভাবে ধরা পড়িয়া গেল!

নলিনাক্ষ এই লজ্জিতাকে মুক্তি দিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। দরজা পর্য্যন্ত গিয়া একবার দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল—কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল—"তুমি ওঠ, আমার কাছে তোমার কোনো লজ্জা নাই।"

ক্রমশ।

রামায়ণের রচনাকাল।

আর্ষপ্রয়োগ।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

[র]ামায়ণের রচনাকাল বহুপুরাতন। তাহার নানা প্রমাণ রামায়ণের রচনারীতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র অনেক বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তন্মধ্যে "আর্ষপ্রয়োগের" বাহুল্য একটি সুপরিচিত বিশেষত্ব।

আর্ষপ্রয়োগ পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে পরিচিত হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে তাহা প্রচলিত হইল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ব্যাকরণশাস্ত্রে আর্ষপ্রয়োগনামক কোন বিশেষ প্রয়োগের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাতন কোষশাস্ত্রেও কোনরূপ বিশেষ ব্যুৎপত্তি উল্লিখিত হয় নাই।* আর্ষপ্রয়োগের অর্থ কি?

কোন কোন আধুনিক অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যাকরণবিরুদ্ধ, অথচ ঋষিলেখকের লেখনীপ্রসূত বলিয়া ঋষিগৌরবে সমাদরপ্রাপ্ত, তাহারই নাম আর্ষপ্রয়োগ।* ঋষিলেখক ভিন্ন অন্য লেখকের পক্ষে সেরূপ প্রয়োগের ব্যবহার করিবার অধিকার নাই;—তাহা অসংস্কৃত—কেবল ঋষিবাক্য বলিয়াই রক্ষা! ইহাই কি আর্ষপ্রয়োগের প্রকৃত ব্যাখ্যা?

* "ব্যাকরণোক্ত অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া ঋষিপ্রযুক্ত অসাধুপ্রয়োগ"—বিশ্বকোষনামক আধুনিক অভিধানে "আর্ষপ্রয়োগের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি, সে কথা উল্লিখিত হয় নাই।

ইহা প্রকৃত ব্যাখ্যা হইলে, রামায়ণের আর্ষপ্রয়োগের বাহুল্য তাহার রচনাকাল-নির্ণয়ের পথপ্রদর্শন করিতে পারিবে না। তাহাতে কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যাইবে,—রামায়ণ ঋষিলেখকের লেখনীপ্রসূত!

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আর্ষ-প্রয়োগের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য আর একটি নূতনধরণের সংজ্ঞার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই শ্রেণীর প্রয়োগকে "সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ," অথবা "অসারসিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন।*

"সারসিক"প্রয়োগ কাহাকে বলে, তাহা বোধগম্য হয় না! ব্যাকরণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের বিচারকালে "স্ব-রস" নামে একটি কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি লিপিকরপ্রমাদে সেই "স্বরস"শব্দ "সারসিকে" পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অর্থগ্রহণ করা কঠিন! "স্বারসিক"শব্দের অর্থ—ইচ্ছাকৃত। দত্তমহাশয় "অসারসিক"-শব্দের যেরূপ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা "অসারসিক" প্রয়োগকে প্রকারান্তরে অশুদ্ধ বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণবিরুদ্ধ—অশুদ্ধ—অপ্রামাণ্য!

রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করিতে গিয়া দত্তমহাশয় স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন,—"সে সময়ে বৈদিকভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃত অর্থাৎ পরিষ্কৃত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তখনও সর্ব্বতোভাবে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয় নাই।"

এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বৈদিকভাষা অসংস্কৃত-ভাষা! তাহাই পরিষ্কৃত হইয়া সংস্কৃত-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল! ইহা সাহেব-দিগের সিদ্ধান্ত। † ভারতবর্ষের সাহিত্য এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। ‡

বৈদিক ও লৌকিক নামক উভয়-শ্রেণীর সংস্কৃতভাষাই সাহিত্যের ভাষা। তাহা রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্বেও সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত। রামায়ণেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। § পাণিনির ন্যায় পুরাতন বৈয়াকরণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বৈদিক এবং লৌকিক ভাষা সাহিত্যের ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল। পাণিনিসূত্রে ¶ লৌকিকসাহিত্যেরও নানা গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনি নিজে "জাম্ববতীজয়"নামক

* ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়। দ্বিতীয়ভাগ। উপক্রমণিকা।

† By the term *classical* or *later* language of those literary monuments which are written in conformity with the rules of native grammer.—Whitney's Sanskrit Grammer : Introduction.

‡ যে ভাষা "শক্তুর ন্যায় ঝাড়িতে ঝাড়িতে" সংস্কারসম্পন্ন হইয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিল, তাহারই নাম "সংস্কৃত-ভাষা"। তাহা বৈদিক ও লৌকিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। এই উভয় ভাগেরই সাধারণ নাম—সংস্কৃতভাষা। পতঞ্জলির "মহাভাষ্যে" সংস্কৃতভাষার এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল শব্দ এইরূপে সংস্কারসম্পন্ন হয় নাই, পতঞ্জলি তাহাদিগকে "অপশব্দ" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈদিকসাহিত্যে "অপশব্দ" নাই; তাহার সকল শব্দই ব্যাকরণসম্মত—পরিষ্কৃত—সংস্কৃত।

§ রামায়ণে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, পুরাণ, ইতিহাস, মনুস্মৃতি, কাব্য ও নাটকাদির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

¶ ৪।৩,৮৮

শৈল, এরি মেয়েকে 'আপনি চিকিৎসা করিয়াছেন।" শৈল নলিনাক্ষকে নমস্কার করিল এবং নলিনাক্ষ প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মেয়েটি ভাল আছে?"

শৈল কহিল—"ভাল আছে।"

খুড়া কহিলেন—"আপনাকে যে পেট ভরিয়া দেখিয়া লইব, এমন অবসর ত আপনি দেন না—এখন, আসিলেন যদি ত একটু বসুন!"

নলিনাক্ষকে বসাইয়া খুড়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে কমলা কখন্ সরিয়া পড়িয়াছে। নলিনাক্ষের সেই একমুহূর্ত্তের দৃষ্টিটি লইয়া সে পুলকিত বিস্ময়ে আপনার ঘরে মনটাকে সংবরণ করিতে গেছে।

ইতিমধ্যে ক্ষেমঙ্করী আসিয়া কহিলেন, "চক্রবর্ত্তিমশায়, কষ্ট করিয়া একবার উঠিতে হইতেছে।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"যখনি আপনি কাজে গেলেন, তখন হইতেই এটুকু কষ্টের জন্য আমি পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম।"

আহার সমাধা হইলে পর বসিবার ঘরে আসিয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"একটু বসুন, আমি আসিতেছি!"—বলিয়া পরক্ষণেই অন্য ঘর হইতে কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে নলিনাক্ষ ও ক্ষেমঙ্করীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শৈলজাও আসিল।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"নলিনাক্ষবাবু, আপনি আমাদের হরিদাসীকে পর মনে করিয়া সঙ্কোচ করিবেন না—এই দুঃখিনীকে আপনাদেরই ঘরে আমি রাখিয়া যাইতেছি—ইহাকে সম্পূর্ণই আপনাদের করিয়া লইবেন। ইহাকে আর কিছু দিতে হইবে না, আপনাদের সকলের সেবা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দিবেন—আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনাদের কাছে জ্ঞানপূর্ব্বক এ একদিনের জন্যও অপরাধিনী হইবে না।"

কমলা লজ্জায় মুখখানি রাঙা করিয়া নতশিরে বসিয়া রহিল। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"চক্রবর্ত্তিমশায়, আপনি কিছুই ভাবিবেন না, হরিদাসী আমাদের ঘরের মেয়েই হইল। ওকে আমাদের কোনো কাজ দিবার জন্য আমাদের তরফ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা করিবার দরকারই হয় নাই। এ বাড়ীর রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে এতদিন আমার শাসনই একমাত্র প্রবল ছিল, এখন আমি সেখানে কেহই না। চাকরবাকররাও আমাকে আর বাড়ীর গৃহিণী বলিয়া গণ্যই করে না। কেমন করিয়া যে আস্তে-আস্তে আমার এমন অবস্থাটা হইল, তাহা আমি টেরও পাইলাম না। আমার গোটাকয়েক চাবি ছিল, সেও কৌশল করিয়া হরিদাসী আত্মসাৎ করিয়াছে—চক্রবর্ত্তিমশায়, আপনার এই ডাকাত-মেয়েটির জন্যে আপনি আর কি চান বলুন দেখি? এখন সব চেয়ে বড় ডাকাতি হয়, যদি আপনি বলেন, এই মেয়েটিকে আমরা লইয়া যাইব!"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"আমি যেন বলিলাম, কিন্তু মেয়েটি কি নড়িবে? তা মনেও করিবেন না। উহাকে আপনারা এমন ভুলাইয়াছেন যে, আজ আপনারা ছাড়া ও আর পৃথিবীতে কাহাকেও জানে না।

দুঃখের জীবনে এতদিন পরে ও আপনাদের কাছেই আজ শান্তি পাইয়াছে—ভগবান্ ওর সেই শান্তি নির্ব্বিঘ্ন করুন, আপনারা চিরদিন ওর 'পরে প্রসন্ন থাকুন, আমরা উঁহাকে সেই আশীর্ব্বাদ করি।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নলিনাক্ষ কিছু না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া চক্রবর্ত্তীর কথা শুনিতেছিল; যখন সকলে বিদায় লইয়া গেলেন, তখন ধীরে ধীরে সে আপনার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন শীতের সূর্য্যাস্তকাল তাহার সমস্ত শয়নঘরটিকে নববিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই রক্তবর্ণের আভা নলিনাক্ষের সমস্ত রোমকূপ ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃকরণকে যেন রাঙাইয়া তুলিল।

আজ সকালে নলিনাক্ষের এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর কাছ হইতে একটুকরি গোলাপ আসিয়াছিল। ঘর সাজাইবার জন্য সেই গোলাপের টুকরি ক্ষেমঙ্করী কমলার হাতে দিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের শয়নঘরের প্রান্তে একটি ফুলদানী হইতে সেই গোলাপের গন্ধ তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ ঘরের বাতায়নে আরক্ত সন্ধ্যার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ মিশিয়া নলিনাক্ষের মনকে কেমন যেন উতলা করিয়া তুলিল। প্রকৃতির সঙ্গে আপন মনের একটা যোগের আনন্দ অনুভব করা নলিনাক্ষের একটা বিশেষ সাধনা ছিল—কিন্তু আজ সেই যোগের মধ্যে এ কি একটা নূতন রসের সঞ্চার হইয়াছে—তাহার সে স্তব্ধতা কোথায়, সে শুভ্রতা কোথায়! নলিনাক্ষের মর্ম্মস্থানের নাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ পাণ্ডুরতম সুদূর দিগন্তের রেখাটি পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। এতদিন তাহার বিশ্বে চারিদিকে সংযমের শান্তি, জ্ঞানের গম্ভীরতা ছিল, আজ সেখানে হঠাৎ এমন নানাসুরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল কোথা হইতে—কোন্ অদৃশ্য নৃত্যের চরণক্ষেপে ও নূপুরঝঙ্কারে আজ আকাশতল এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল!

নলিনাক্ষ জানালা হইতে ফিরিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহার বিছানার শিয়রের কাছে কুলুঙ্গির উপরে গোলাপফুল-গুলি সাজানো রহিয়াছে। এই ফুলগুলি জানি না কাহার চোখের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, নিঃশব্দ আত্মনিবেদনের মত তাহার হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে নত হইয়া পড়িল।

নলিনাক্ষ ইহার মধ্যে একটি ফুল তুলিয়া লইল—সেটি কাঁচাসোনার রঙের হলদে গোলাপ, পাপ্‌ড়িগুলি খোলে নাই, কিন্তু গন্ধ লুকাইতে পারিতেছে না। সেই গোলাপটি হাতে লইতেই যেন সে কাহার আঙুলের মত তাহার আঙুলকে স্পর্শ করিল, তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্তুকে রিমিঝিমি করিয়া বাজাইয়া তুলিল! নলিনাক্ষ সেই স্নিগ্ধ কোমল ফুলটিকে নিজের মুখের উপরে, চোখের পল্লবের উপরে বুলাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাশ হইতে অস্ত-সূর্য্যের আভা মিলাইয়া আসিল। নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে একবার তাহার বিছানার কাছে গিয়া শয্যার আচ্ছাদনটি তুলিয়া ফেলিল এবং মাথার বালিশের উপর সেই গোলাপফুলটি রাখিল। রাখিয়া

"কৃতকৃত্যতদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ।" ১।১।৮৫

এই শ্লোকার্দ্ধের "প্রমুমোদ"শব্দকে দত্তমহাশয় "অসারসিক"প্রয়োগের প্রথম দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"প্রমুমুদে-শব্দই সারসিক"। মুদ্-ধাতুর পরস্মৈপদ লৌকিকব্যাকরণে অপরিচিত হইলেও, বৈদিকব্যাকরণে সুপরিচিত। তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া, টীকাকারগণ ইহাকে ব্যাকরণবিরুদ্ধ না বলিয়া বৈদিকব্যাকরণসম্মত বলিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রমুমোদেতি ছান্দসং পরস্মৈপদম্।"

সুতরাং এরূপ প্রয়োগ অসংস্কৃত নহে,—বৈদিকপ্রয়োগমাত্র। "ছান্দস" বলায় তাহাই সুব্যক্ত হইয়াছে। ঋষিলেখক ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ প্রয়োগের ব্যবহার করিবার অধিকারী না হইলে, ইহাকে ঋষিলেখকের পদমর্য্যাদাগত অনন্যসাধারণ রচনারীতি বলিয়া ব্যক্ত করা চলিত। কিন্তু ইহাকে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অনন্যসাধারণ অধিকার বলিয়া ঘোষণা করিবার উপায় নাই। মৃচ্ছকটিকরচয়িতা ঋষি না হইয়াও, লৌকিকব্যাকরণসম্মত পরস্মৈপদের ধাতুকে বৈদিকব্যাকরণসম্মত আত্মনেপদের ধাতুর ন্যায় ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন! ইহাকে বৈদিকরচনায় অনুকরণস্পৃহার উদাহরণ বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

"তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্।
দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারুনিঃস্বনম্।" ১।২।৯

এই শ্লোকের "চরন্তম্" এবং "অনপায়িনম্" এই দুইটি পুংলিঙ্গের বিশেষণ "মিথুনম্" এই ক্লীবলিঙ্গের সহিত অন্বিত। ইহা লৌকিক-রচনারীতিবিরুদ্ধ হইলেও, বৈদিকরচনা-রীতিবিরুদ্ধ নহে। টীকাকার তজ্জন্য ইহাকে অশিষ্ট না বলিয়া, "আর্ষ" বলিয়া গিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকেও এই শ্রেণীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাও আর্ষ—বৈদিকরচনা-রীতির অনুকরণমাত্র!

এইরূপে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে,—যাহা "আর্ষ-প্রয়োগ" নামে কথিত হইয়া থাকে, ব্যাকরণের ভাষায় তাহাকে "বৈদিক প্রয়োগের অনুকরণ" বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হইবে। রামায়ণের টীকাকারগণ যে এই কথা ব্যক্ত করিবার জন্যই "আর্ষ"-শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, একটি উদাহরণে তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে।

"ঋত্বিগ্‌ভিরুপসন্দিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাপ্যতাম্।" ১।৮।২২

এই শ্লোকার্দ্ধে উপ এবং সম্ এই দুইটি উপ-সর্গ আছে। উপ-উপসর্গ "দিষ্ট"-শব্দের সহিত অন্বিত হইয়া "উপদিষ্ট" হইবে। সম্-উপসর্গ "আপ্যতাং"-শব্দের সহিত অন্বিত হইয়া "সমাপ্যতাং" হইবে। তাহা না হইয়া উপসর্গদ্বয় একত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; ক্রিয়াপদ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে! ইহা লৌকিকব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও, বৈদিক-ব্যাকরণবিরুদ্ধ নহে। টীকাকার সেই কথা বলিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—

"ব্যবহিতপ্রয়োগ আর্ষঃ।"

ইহা "ব্যবহিতপ্রয়োগ"নামক "আর্ষপ্রয়োগ।" এখানে আর্ষশব্দের উল্লেখ করিয়া বৈদিকসূত্র উদ্ধৃত করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে,—টীকাকার বৈদিকপ্রয়োগকেই আর্ষপ্রয়োগ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

উপসর্গ কোথায় বসিবে? ধাতুর পূর্ব্বে

না পরে? পূর্ব্বে বা পরে যেখানেই বসুক না কেন, কত পূর্ব্বে বা কত পরে বসিবে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পাণিনি-ব্যাকরণে তিনটি সূত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"তে প্রাগ্‌ধাতোঃ।" ১।৪।৮০

উপসর্গগুলি ধাতুর (অব্যবহিত) পূর্ব্বে বসিবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। ইহার কি ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না? পারে। কোথায়? বৈদিকরচনারীতিতে। কিরূপ ব্যতিক্রম? দুই শ্রেণীর।

"ছন্দসি পরেঽপি।" ১।৪।৮১

"ব্যবহিতাশ্চ।" ১।৪।৮২

বৈদিকরচনায় ধাতুর (অব্যবহিত) পরেও উপসর্গ ব্যবহৃত হইতে পারে। "নিহন্তি মুষ্টিনা" না বলিয়া, "হন্তি নি মুষ্টিনা" বলিলেও চলিতে পারে। উপসর্গের স্থান অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে না হইয়া, বৈদিকরচনায় তাহা ধাতু হইতে "ব্যবহিত" হইয়াও ব্যবহৃত হইতে পারে। "আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ"—এই মন্ত্রের "আয়াহি"—ক্রিয়াপদের আ-উপসর্গ ব্যবহিত,—ক্রিয়াপদ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এরূপ প্রয়োগ যে ঋষিলেখকগণের অনন্যসাধারণ-অধিকারভুক্ত ছিল না, অন্যান্য কবির রচনায় তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লৌকিকসাহিত্যের অনেক লেখক—ঋষি না হইয়াও—বৈদিকপ্রয়োগের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহাভাষ্যের এক স্থলে তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া পতঞ্জলি লিখিয়া গিয়াছেন,—কবিকুল বৈদিকপ্রয়োগের অনুকরণ করিয়া থাকেন বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে।* তাঁহার এই উক্তি, নানা কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে, সমর্থিত হইতে পারে।

যে সাহিত্যযুগে বৈদিকপ্রয়োগানুকরণের রীতি প্রবল ছিল, সেই সাহিত্যযুগের কাব্যে ইহার উদাহরণ তত অধিক। ইহাকে, একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এরূপ বলিতে পারা যায় না। ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইলেও, একেবারে ইহা বিলুপ্ত হয় নাই।

ইংরাজকবি মিলটনের মহাকাব্যে লাটিন্‌প্রয়োগের অনুকরণস্পৃহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্মীকিবিরচিত মহাকাব্যের আর্ষপ্রয়োগের বাহুল্য সেইরূপ,—বৈদিকপ্রয়োগের অনুকরণস্পৃহার পরিচয় প্রদান করে। এই সকল প্রয়োগ "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া অভিহিত হইল কেন?

ঋষিশব্দের মুখ্যার্থ—মন্ত্র, বেদ। আর্ষশব্দের মুখ্যার্থ—বৈদিক। ঋষিশব্দের এই অর্থ কালে ব্যাপ্তিলাভ করিয়া, মন্ত্রদ্রষ্টার, মন্ত্রপ্রোক্তার,—এমন কি সাধুপুরুষমাত্রের—বংশপরম্পরাগত উপাধিমাত্রে পরিণত হইয়াছিল। আর্ষশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি প্রচলিত থাকিলে, সে কথা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইত।

ঋষিশব্দের উত্তর অণ্‌-প্রত্যয় করিয়া

* "যূ স্ত্র্যাখ্যৌ নদী।" ১।৪।৩ এই সূত্রের আলোচনাকালে "অথ স্ত্র্যাখ্যাবিতি কোঽয়ং শব্দঃ" এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পতঞ্জলি একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, কবিকুল বৈদিকপ্রয়োগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। যথা:—

"যস্মিন্ দশসহস্রাণি পুত্রে জাতে গবাং দদৌ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ সোঽয়মুঞ্ছেন জীবতি॥"
—"ছন্দোবৎ কবয়ঃ কুর্ব্বন্তি। ন হি এষ ইষ্টিঃ। ইতি মহাভাষ্যম্।

একখানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। সূত্রকার পাণিনি এবং কবিতাকার পাণিনি যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহার স্মৃতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। * সুতরাং দত্তমহাশয়ের সিদ্ধান্তের সহিত সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। রামায়ণের রচনাকালে সংস্কৃত-ভাষা "সর্ব্বতোভাবে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয় নাই"—ইহা অনুমানমাত্র।

ইংরাজকবি চসর্ বা শেক্স্পীয়র্ যে সময়ে কাব্যরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহারা ব্যাকরণবিরুদ্ধ অশিষ্টপ্রয়োগের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখনও ইংরাজীভাষা সবিশেষ সংস্কার-সম্পন্ন হয় নাই। রামায়ণের রচনাকালে সংস্কৃতভাষার সেরূপ দুর্দ্দশার অবস্থা বর্ত্তমান ছিল না। ইংরাজিভাষার আধুনিক দৃষ্টান্ত ধরিয়া সংস্কৃতভাষার পুরাতন সাহিত্যের বিচার করিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি সমূহ অবিচার করিতে হয়!

সংস্কারসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে আমাদের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সে অতীতযুগের কোনরূপ সাহিত্য কখন বর্ত্তমান থাকিলেও, কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, সে সমস্তই সংস্কৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর উদ্ভূত হইয়াছে। তাহার অনেক প্রয়োগ এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যাহা অপ্রচলিত হইয়াছে, তাহাও অ-সংস্কৃত ছিল না। কোন্ সময় হইতে কোন্ শ্রেণীর প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, রচনারীতি ধরিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে রচনাকাল নির্ণীত হইতে পারে। তাহার জন্যই যথোপযুক্ত চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হউক!

আর্যশব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে, আর্ষপ্রয়োগের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইতে পারিত। কিন্তু আর্যশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত হইয়াছে! অধুনা "ঋষেরিদং" বলিয়া যে ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহাই প্রকৃত ব্যুৎপত্তি হইলে, আর্ষপ্রয়োগকে ঋষিলেখকের অসাধু-প্রয়োগ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই কি প্রকৃত ব্যুৎপত্তি?

পাণিনিসূত্রে † "অনার্ষ"শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। টীকাকারগণ তাহাকে "অবৈদিক" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উণাদি-সূত্রের সুপ্রসিদ্ধ বৃত্তিকার উজ্জ্বলদত্ত "অবৈদিক" অর্থেই "অনার্ষ"শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ‡ ইহাতে দেখিতে পাওয়া

* স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্ত রুদ্রপ্রসাদতঃ।
আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনু জাম্ববতীজয়ম্।

পাণিনিবিরচিত "জাম্ববতীজয়"নামক কাব্য বর্ত্তমান না থাকিলেও, তাহার নানা শ্লোক পুরাতন গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ন্যায় কাত্যায়নও কাব্যকার ছিলেন। পতঞ্জলি তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে কাব্যের দুইএকটি শ্লোক টীকাকারগণ উদ্ধৃত করায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; মূলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী লৌকিকসাহিত্যের কাব্যগ্রন্থ বর্ত্তমান না থাকিলেও, একদা সেরূপ গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিবার প্রমাণপরম্পরা বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার কথা যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

† ১।১।১৬

‡ Aufrecht's UNADI-SUTRAS.

যায়,—বৈয়াকরণগণের গ্রন্থোক্ত "আর্ষ" ও "বৈদিক" শব্দ একার্থসূচক। তাঁহারা আর্ষ বলিতে বৈদিকপ্রয়োগকেই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। তাহা কি ঋষিমুখবিগলিত চ্যুতসংস্কৃত—ব্যাকরণদুষ্ট—অশিষ্ট—অপপ্রয়োগ ?

রামায়ণের যে সকল প্রয়োগ ব্যাকরণবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে। এক শ্রেণীর প্রয়োগ সত্যসত্যই ব্যাকরণবিরুদ্ধ। তাহার সংখ্যা অধিক নহে। আর এক শ্রেণীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। তাহা লৌকিক ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হইলেও, বৈদিক-ব্যাকরণ-সম্মত। রামায়ণের টীকাকারগণ এই উভয় শ্রেণীর প্রয়োগকেই "আর্ষপ্রয়োগ" নামে অভিহিত করেন নাই। দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিচার করিলে, তাহা সুব্যক্ত হইবে।

"তস্তাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাথ কৈকয়ী ।১।১।২১

এই শ্লোকার্দ্ধের "কৈকয়ী"শব্দ ব্যাকরণসম্মত নহে। "কৈকেয়ী"শব্দই ব্যাকরণসম্মত। রামায়ণে তাহা অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। শিষ্টপ্রয়োগ জ্ঞাত থাকিয়াও, কবিগুরু এখানে তাহার ব্যতিক্রম করিলেন কেন ? ইহা কি ঋষিলেখকের পদমর্য্যাদাগত রচনারীতি ? ইহা কি আর্ষপ্রয়োগ ?

টীকাকারগণ ইহার সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা ব্যাকরণসূত্রের উল্লেখ করিয়া, এরূপ প্রয়োগের দোষপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন,—পদ্যনিবন্ধে ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিবার জন্ম কবিকে প্রয়োজন বুঝিয়া শিষ্টপ্রয়োগের ইতরবিশেষ করিবার অধিকার দান করিতে হয়। তিলকটীকায় স্পষ্টই লিখিত আছে,—

"অপি মাষং মষং কুর্য্যাৎ ছন্দোভঙ্গং ন কারয়েৎ।"

মাষশব্দ সাধু। কিন্তু ছন্দোভঙ্গ ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলে, মাষশব্দকে মষশব্দে পরিণত করিও; তথাপি ছন্দোভঙ্গের প্রশ্রয়দান করিও না। ইহাই উল্লিখিত কারিকার ভাবার্থ। এই অধিকার কেবল ঋষিলেখকবর্গের অনন্যসাধারণ অধিকার বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ইহা কবিমাত্রেরই সাধারণ অধিকার। চলে না বলিয়াই এই অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে; ইহা অশিষ্ট হইলেও, মহাকবিপ্রয়োগ বলিয়া শিষ্টপ্রয়োগের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহাকে আর্ষপ্রয়োগ বলা যায় না। ঋষিপ্রযুক্ত অশিষ্টপ্রয়োগের নাম "আর্ষপ্রয়োগ" হইলে, বাল্মীকিপ্রযুক্ত এই অশিষ্টপ্রয়োগকে আর্ষপ্রয়োগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।

রামায়ণের টীকাকারগণ কোন্ শ্রেণীর প্রয়োগকে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন ? দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহারা "বৈদিক" প্রয়োগকেই কখন "আর্ষ", কখন বা "ছান্দস" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে ব্যাকরণবিরুদ্ধ—অশিষ্ট—অসংস্কৃত বলা দূরে থাকুক, টীকাকারগণ ব্যাকরণসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহার শিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই শ্রেণীর প্রয়োগকে কুত্রাপি ঋষিলেখকের পদমর্য্যাদাগত অনন্যসাধারণ অধিকারের অন্তর্গত করিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই।

আর্ষশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কি অর্থে অণ্-প্রত্যয় হইবে, তাহাতে মতভেদের অভাব নাই। এখানে কোন্ অর্থে অণ্-প্রত্যয় স্বীকার করিব ?

"শব্দকল্পদ্রুমে" আর্ষশব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্দ্দেশের জন্য "ঋষেরিদং" বলিয়া বিগ্রহবাক্যে অণ্-প্রত্যয়ের অর্থ সূচিত হইয়াছে। * ইহা ঠিক সূত্রের কথা নহে। সূত্রের ভাষায় বলিতে হইলে, "তস্যেদং" এই অর্থে অণ্-প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। "ঋষেরিদং" বলায় প্রকারান্তরে তাহাই বলা হইয়াছে। -

"তস্যেদম্।" ৪।৩।১২০

এই সূত্রানুসারে "ঋষিলিখিত" অথবা "ঋষিপ্রযুক্ত" বলিয়া আর্ষশব্দের ব্যাখ্যা করা যায় না। "তস্যেদং" বলিতে কেবল প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্বন্ধমাত্রই বিবক্ষিত হইয়াছে; অন্য কোন সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয় নাই। এই সূত্রের সুপরিচিত উদাহরণ—রাষ্ট্রিয়ম্। "শব্দকল্পদ্রুমে" উদাহরণস্বরূপ "মনুসংহিতার" একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। † তাহাতে যে আর্ষশব্দ আছে, তদ্দ্বারা "ঋষিলিখিত" বা "ঋষিপ্রযুক্ত" বলিয়া অর্থসংগ্রহ করা যায় না।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা (?)।
য স্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" ১২।১০৬

এই বচনোক্ত আর্ষশব্দের অর্থ কি ? যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা "আর্ষ ধর্ম্মোপদেশের" মর্ম্মানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তিনিই ধর্ম্ম (তত্ত্ব) জ্ঞাত হইতে পারেন; অন্য কেহ পারেন না।" ইহাই উল্লিখিত বচনের তাৎপর্য্য। সুতরাং "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং" বলিতে যে "বৈদিক ধর্ম্মোপদেশ" সূচিত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মোপদেশ বলিলে, সংস্কৃতরচনারীতির মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না। উপদেশকে "প্রদত্ত" বলা যাইতে পারে, "প্রণীত" বলা যায় না। সংস্কৃতরচনারীতি এ সকল বিষয়ে সুসংযত; বাঙ্গালারচনারীতির মত নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল নহে।

বারেন্দ্রনন্দনাবাসীয়—ভট্টদিবাকরাত্মজ—শ্রীমৎকুল্লূকভট্ট "মনুসংহিতার" সুবিখ্যাত টীকাকার। তিনি এই বচনোক্ত আর্ষশব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,

* নাগরাক্ষরে মুদ্রিত "শব্দকল্পদ্রুমে" এই ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা কোন্ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, তাহার উল্লেখ নাই। প্রমাণস্বরূপ যে বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, লিপিকরপ্রমাদে তাহাও দুর্ব্বোধ হইয়া রহিয়াছে। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে বচনটি যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

† সংস্কৃতশাস্ত্রে গ্রন্থের তাৎপর্য্যসংগ্রহের জন্য কিরূপ বিচারপ্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়, এই বচনে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বেদশাস্ত্রের অ-বিরোধী তর্কপ্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ না করিলে, বেদার্থ প্রতিভাত হইতে পারে না। সেইরূপ শব্দার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও, শব্দশাস্ত্রের অ-বিরোধী তর্কপ্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ না করিলে, প্রকৃত অর্থ প্রতিভাত হইতে পারে না। আর্ষপ্রয়োগের অর্থ কি, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে এই ইঙ্গিতের অনুসরণ করিতে হয়। বহু অর্থে অণ্-প্রত্যয় হইতে পারে। অনেক সূত্রে তাহার ব্যবস্থা আছে। এখানে কোন্ অর্থে অণ্-প্রত্যয় স্বীকার করিব, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ব্যাকরণের সুপরিচিত তর্কপ্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ করাই বিধেয়।

"শব্দকল্পদ্রুম"-সঙ্কলনকালে সঙ্কলয়িতা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হইত। কুল্লূকভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—

"ঋষির্বেদস্তত্র ভব আর্ষো ধর্ম্মোপদেশো যো বৈদিকঃ।"

ঋষিশব্দের অর্থ—বেদ। "তত্র ভব"—তাহাতে আছে,—তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়,—এই অর্থে আর্ষ। আর্ষ ধর্ম্মোপদেশ কাহাকে বলে? যাহা বৈদিক, তাহারই নাম আর্ষ। কুল্লূকভট্টের এই ব্যাখ্যায়, যে সূত্রের দ্বারা আর্ষশব্দ নিষ্পন্ন হইবে, তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা "তস্যেদং" নহে। তাহা,—

"তত্র ভবঃ।" ৪।৩।৫৩

"তত্র ভবঃ" বলিতে 'কি' বুঝিব? টীকাকারগণ বলেন,—ভবশব্দের অর্থ—সত্তা। তাহাতে যাহার সত্তা আছে,—তাহাতেই যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম "তত্র ভবঃ।" কুল্লূকভট্টের ন্যায় প্রাচীন প্রমাণপুরুষগণ এই সূত্রানুসারেই আর্ষশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনগণ যে "আর্ষ" বলিলে "বৈদিক" বুঝিতেন, ইহাতে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই ব্যাখ্যা বর্ত্তমান থাকিতে, "শব্দকল্পদ্রুম"-সঙ্কলনকালে "তত্রভব"-অর্থে অণ্-প্রত্যয় স্বীকৃত না হইয়া, "তস্যেদং"-অর্থে অণ্-প্রত্যয় কল্পিত হইল কেন, তাহার কোনরূপ কারণ, কি বিচার, কি প্রমাণ—"শব্দকল্পদ্রুমে" উল্লিখিত হয় নাই! এরূপ ব্যুৎপত্তি প্রচলিত হইয়াই সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে!

বৈদিকপ্রয়োগের অনুকরণ করিয়া লৌকিকসাহিত্যে বৈদিক রচনারীতির অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি সংস্কৃতসাহিত্যের লেখকবর্গের মধ্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। কালিদাসের সময়েও এই প্রবৃত্তি একেবারে নিরস্ত হয় নাই। রামায়ণের রচনাকালে ইহা সমধিক প্রবল থাকিবারই কথা। সে কোন্ পুরাতন সাহিত্যযুগের কথা?

বেদানুরক্ত আর্য্যসমাজ বৈদিক শিক্ষা ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ চিরপ্রচলিত রাখিবার আশায় কত-না উপায় উদ্ভাবিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল! বেদবাক্যের যথাযথ উচ্চারণ, বেদমন্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথাযথ অনুষ্ঠান, চিরপ্রচলিত রাখিবার জন্য বিবিধ বেদাঙ্গের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বৈদিক শব্দানুশাসনের জন্যই ব্যাকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। "মহাভাষ্যের" আরম্ভে যে সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সেই কথাই প্রতিভাত হইতেছে। লৌকিক-ব্যাকরণ ধরিয়া বেদবাক্যের অর্থবিচার করিতে গিয়া লোকে পথভ্রষ্ট না হয়, যেন সেই উদ্দেশ্যেই পাণিনিব্যাকরণে লৌকিক ও বৈদিক শব্দানুশাসনের পার্থক্য বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে বৈদিকশিক্ষার প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। লৌকিকসাহিত্যের পুরাতন রচনাযুগে লোকসমাজে বৈদিক-শিক্ষারই প্রাধান্য ছিল। তাহার প্রভাব সকল কার্য্যেই প্রকাশিত হইত। সে যুগের লৌকিকসাহিত্যের লেখকবর্গ বৈদিক রচনারীতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে

পারিবেন কেন? কাত্যায়নযুগে—পতঞ্জলি-যুগে—আরও পরবর্ত্তী যুগে—লৌকিকসাহিত্য, ধীরে ধীরে বৈদিকরচনারীতি পরিত্যাগ করিয়া, স্বতন্ত্র ও সংহত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে লৌকিকব্যাকরণের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিতে বিশেষ ইতস্তত করিবার কারণ ছিল না। রামায়ণ সেই পুরাতন রচনাযুগের গ্রন্থ। ইহাতে যেরূপ শিক্ষা ও সদাচারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে রামায়ণের রচনাকালে বৈদিক-শিক্ষার পূর্ণপ্রভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। তৎকালে বৈদিকরচনারীতির অনুকরণস্পৃহা প্রবল থাকিবার কথা। আর্ষপ্রয়োগের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বিস্মৃত হইয়া, তাহাকে লিপিলেখকের অশিষ্ট রচনারীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া, আমরা অজ্ঞাতসারে সংস্কৃতসাহিত্যের এই ঐতি-হাসিক সূত্র ছিন্ন করিবার আয়োজন করিয়াছি।

রামায়ণ সংস্কৃতসাহিত্যের পরিবর্ত্তন-যুগের মহাকাব্য। বৈদিকরীতি পরিত্যাগ করিয়া লৌকিকসাহিত্যরচনায় অগ্রসর হইবার প্রথম চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবার অল্পকাল পরেই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এক দিকে পুরাতন বৈদিকরচনারীতির প্রভাব, অন্যদিকে উদীয়মান লৌকিকরচনারীতির কৌশল রামায়ণকে পুরাতনের গাম্ভীর্য্যের সহিত নূতনের লাবণ্য দান করিয়া, নিরতিশয় মধুময় করিয়া রাখিয়াছে।

লৌকিক রচনারীতি ক্রমশ জটিলাকার ধারণ করিয়া, কাব্যরসকে দুরবগাহ করিয়া তুলিয়াছিল! নানা কৃত্রিমতার আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া, তাহা যেন দিনদিন আবিল হইয়া উঠিয়াছিল! তাহার তুলনায় রামায়ণের রচনারীতি অকৃত্রিম রচনালালিত্যে অভিষিক্ত। সেই রচনারীতির সহিত আর্ষ-প্রয়োগ যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরলভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী রচনাযুগের কৃত্রিম রচনাকৌশলের সহিত আর্ষপ্রয়োগ সেরূপভাবে মিশিয়া থাকিতে পারিত না। এই কারণে রামায়ণের আর্ষপ্রয়োগে মহাকাব্যের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সমধিক সুব্যক্ত হইয়াছে! তাহা অজ্ঞতাবিজ্ঞাপক নহে; তাহাকে আকস্মিক বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। বরং এরূপভাবে লৌকিকসাহিত্যে বৈদিক রচনারীতির অনুসরণ করিবার নানা কারণ বর্ত্তমান থাকিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামায়ণ নীরবে পঠিত হইবার জন্য রচিত হয় নাই। তাহা স্বরসংযোগে গীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। মহাকবি কাব্যরচনা সমাপ্ত করিবার পর, শিষ্যমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়াও চিন্তা করিতে লাগিলেন, —কে ইহাকে যথোপযুক্তরূপে লোকসমাজে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে? সেরূপ লোক কোথায় পাইব?

"চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ।" ১।৪।৩

সুদীর্ঘ সংগীতের মধ্যে বিচিত্রতা আনয়ন করিবার জন্য কথকগণ থাকিয়া-থাকিয়া ধীরগম্ভীর শব্দঝঙ্কারের অবতারণা করিয়া কণ্ঠস্বরে বিচিত্রতা প্রদান করিয়া থাকেন। রামায়ণপাঠের সময় আর্ষপ্রয়োগ সেই

বিচিত্রতা দান করিয়া থাকে। তাহা বিস্মৃত হইয়া, নীরবে রামায়ণ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আর্ষপ্রয়োগের কল্যাণে রামায়ণের রচনা কত শ্রুতিমধুর হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় তিরোহিত হইয়া যায়।

যাহা কালগত রচনারীতি, তাহাকে ঋষিলেখকের পদমর্য্যাদাগত উচ্ছৃঙ্খলতা (?) বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, রামায়ণের আর্ষপ্রয়োগ আলঙ্কারিক-বিচারে "চ্যুতসংস্কৃত"-দোষের অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে! আলঙ্কারিকগণ তাহাকে দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই কেন, আধুনিক অভিধান-লেখকগণ তাহারও কোনরূপ বিচার করিবার চেষ্টা পান নাই। বরং পাশ্চাত্য-পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্তই আমাদিগকেও সাহেব করিয়া তুলিতেছে! একজন পাশ্চাত্য-পণ্ডিত স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—"ছন্দের অনুরোধেই আর্ষপ্রয়োগ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।" * ইহা যে স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত, তাহাতে সংশয় নাই। যিনি অবলীলাক্রমে চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর্ষ-প্রয়োগের সংখ্যা সমগ্র গ্রন্থের তুলনায় কত অল্প,—তাহা রামায়ণপাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নাই। যিনি আর্ষপ্রয়োগ না করিয়া অধিকাংশস্থলে ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিতে সমর্থ ছিলেন, তিনি কি সমগ্র কাব্য সেই ভাবে সমাপ্ত করিতে পারিতেন না? যাঁহার রচনায় লৌকিকব্যাকরণজ্ঞান সর্ব্বত্র পরিস্ফুট, আর্ষপ্রয়োগের সময়ে তাঁহার অজ্ঞতা বা আত্মবিস্মৃতি স্বীকার করা যায় না; ইচ্ছাপূর্ব্বক আর্ষপ্রয়োগের ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তাহার কারণ কি উচ্ছৃঙ্খলতা? ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিবার জন্যই কি মহাকবি সেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহা হইলে, "কৈকয়ী"-শব্দের ব্যাখ্যায় তাহাকেও "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া ব্যক্ত করিতে হইত।

আর্ষপ্রয়োগসম্বন্ধে যে ধারণা আধুনিক পাঠকসমাজের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা যেন গাল ফুলাইয়া তর্ক করিবার জন্য পুনঃপুন বলিয়া আসিতেছে,—(১) আর্ষপ্রয়োগ অসাধুপ্রয়োগ, (২) কেবল ঋষিলেখকগণই তাহার ব্যবহার করিতে পারিতেন, (৩) তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতাই এরূপ প্রয়োগ ব্যবহৃত হইবার প্রকৃত কারণ, (৪) হয় ত না জানিয়া, অথবা ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিবার উপায়ান্তর না পাইয়া, তাঁহারা এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয়-গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন! সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস ইহার কোন সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে পারে না। রামায়ণের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া, এই সকল অপসিদ্ধান্তই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আর্ষপ্রয়োগের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি, তাহা যেমন নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সংস্কৃতসাহিত্যের অধিকাংশ শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ক্রমশ

* The Indian Epic Poems by M. Williams.

নানা মনঃকল্পিত পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া, ভাবার্থের নানারূপ বিপর্য্যয় সাধিত করিয়াছে। রামায়ণ বুঝিতে হইলে, শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে কত পুরাতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, শব্দবিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, রামায়ণের রচনাকালে যে শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি বা অর্থ প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পুরাতন অর্থ এবং পুরাতন ব্যুৎপত্তি গ্রহণ না করিলে, কোন কোন শ্লোকের মর্ম্মগ্রহণ করিবার উপায় থাকে না। সেই সকল শ্লোক ও শব্দ ধরিয়া বিচার করিলে, রামায়ণের রচনাকাল যে কত পুরাতন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। অতএব অতঃপর তাহাতে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

যুগলনক্ষত্র।

যাঁহারা দূরবীন্‌সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যুগলজ্যোতিষ্ক কোনক্রমেই নূতন হইতে পারে না। যুগল-নিহারিকা আকাশের নানা অংশে প্রায়ই দেখা যায়, বায়েলার যুগল ধূমকেতুর কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, তা ছাড়া যুগল-গ্রহের কথাও আজকাল শুনা যাইতেছে। যে চন্দ্রকে আমরা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়াই জানিতাম, সেটি এখন গ্রহপদে উন্নীত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কয়েক-জন আধুনিক জ্যোতির্বিদের মতে পৃথিবী ও চন্দ্র একটি যুগ্মগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগলনক্ষত্রের ত কথাই নাই,—দৃশ্যমান তারকাগুলির মধ্যে, এই শ্রেণীর নক্ষত্রের সংখ্যা আজকাল প্রায় সহস্রাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আকাশে যতগুলি নক্ষত্র নগ্নচক্ষে বা যন্ত্রসাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে সাধারণত দুইপ্রকারের যুগ্মতা দেখা যায়। জ্যোতির্বিদ্‌গণ ইহাদের মধ্যে কতক-গুলিকে চাক্ষুষযুগল (optical doubles) এবং অপরগুলিকে দূরবীক্ষণিক বা প্রকৃত-যুগল সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। চাক্ষুষ-যুগল নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ নাই; আকাশের নানাস্থানে আমরা যে সকল একক তারকা দেখিতে পাই, তাহাদেরই মত ইহারা কোটিকোটিমাইল দূরে থাকিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্টগতিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, কোনপ্রকারে ইহারা পৃথিবীর সহিত সমসূত্রে আসিয়া পড়ে বলিয়া, আমরা উহাদিগকে যুগল দেখি।* আণুবীক্ষণিক যুগল তারকাগুলির অবস্থা

* সপ্তর্ষিমণ্ডলের Mizerনামক নক্ষত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পাঠক ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির পাশেই একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন। যুগল দেখাইলেও ইহারা প্রকৃত যুগল নয়, ইহাদের যুগ্মতা চাক্ষুষমাত্র।

কিন্তু তাহা নয়, ইহারা প্রকৃতই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণের প্রাবল্য এত বেশি যে, তাহা ছিন্ন করিয়া দূরে যাইবার সামর্থ্য কাহারো থাকে না।

একটা উদাহরণ দিলে, এই দুই শ্রেণীর যুগলতারকার পার্থক্যটা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। মনে কর, একটি বৃহৎ মাঠের ভিতর দিয়া জনৈক পথিক চলিয়াছে, বহুদূরে কেবল দুইটিমাত্র গাছ দেখা যাইতেছে; গাছদু'টির ব্যবধান প্রায় অর্দ্ধমাইল্। পথিক চলিতে চলিতে যখন সেই দূরবর্ত্তী বৃক্ষদ্বয়ের সহিত প্রায় সমসূত্রে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন গাছদু'টির মধ্যে যে একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, তাহা বুঝিতে পারিবে না, উহাদিগকে প্রায় গায়ে-গায়ে বা পাশাপাশি দেখাইবে। আমরা পূর্ব্বে যে চাক্ষুষ যুগলতারকার কথা বলিয়াছি, তাহাদের অবস্থান কতকটা ঐরূপ। তাহারা উদাহৃত বৃক্ষের ন্যায় পরস্পর খুব দূরে থাকিয়াও খুব কাছাকাছি আছে বলিয়া আমাদের চক্ষুকে প্রতারিত করে। দুইটি গাছ খুব কাছাকাছি জন্মাইলে, যে-কোনো স্থানে দাঁড়াইলে যেমন তাহাদিগকে সর্ব্বদাই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী দেখা যায়, প্রকৃত যুগলতারকার অবস্থান কতকটা সেইরূপ। তাহারা স্বভাবতই সর্ব্বদা কাছাকাছি থাকে, তাই যে কোনো স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদিগকে যুগল দেখায়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রকৃত যুগলতারকারই বিষয় আলোচনা করিব।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, স্থানে স্থানে যুগলতারকার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীক্‌পণ্ডিত টলেমি তাঁহার কোন গ্রন্থে যুগলতারকার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই অতি প্রাচীনকালে দূরবীণের প্রচলন ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের উল্লিখিত তারকাগুলি যে প্রকৃত যুগল নয়, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সম্ভবত তাঁহারা নগ্নচক্ষে চাক্ষুষ যুগলতারকা দেখিয়াই সেই কথা লিপিবদ্ধ রাখিয়া গেছেন। যাহা হউক, পুরাবৃত্তের কথা ছাড়িয়া-দিয়া আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যুগলনক্ষত্র-আবিষ্কারের সম্মান অধ্যাপক মিচেলের (Michell) প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। ইনি ১৭৬৭ অব্দে রয়াল্ সোসাইটির কোন এক অধিবেশনে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে যুগলতারকা-সকল যে মহাকর্ষণের নিয়মানুযায়ী কোন এক কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে, তাহার আভাস ছিল। যুগলতারকার প্রকৃতির এই সামান্য আভাস দিয়াই মিচেল সাহেবকে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কারণ, ইহার অধিক কিছু বলিলে, তাঁহার উক্তির পোষকপ্রমাণের অভাবে, সেই সকল কথায় কেহ কর্ণপাতও করিতেন না। কাজেই সেই সময়ে যুগলতারকাসম্বন্ধীয় রহস্যের কোন মীমাংসা হইয়া উঠে নাই।

যুগলতারকাসম্বন্ধে আজকাল আমরা যাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য অষ্টাবিংশতিশতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সার্ উইলিয়ম্ হার্শেলের নিকট আমাদিগকে

সম্পূর্ণ ঋণী বলিয়া মনে হয়। অষ্টাবিংশতি-শতাব্দীর শেষভাগে যুগলতারকার গতির নিয়-মাদি আবিষ্কার করিবার জন্য, হার্শেল্‌সাহেব এক সুদীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের আয়োজন করিয়া-ছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, যদি কোন যুগলনক্ষত্রের মধ্যে কোনটি তাহার সহচর অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী থাকে, তবে বার্ষিকগতিতে পৃথিবী যেমন এক-একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ শেষ করিবে, তারকাযুগলের পরস্পর ব্যবধানের মধ্যেও সেইপ্রকার একটুআধটু বিচলন দেখা দিবে। হার্শেল্ এই ফললাভের আশায় প্রায় পঁচিশবৎসরকাল যুগলতারকা লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গণনায় পূর্ব্বানুমিত ফল দেখা যায় নাই, তৎপরি-বর্ত্তে তিনি প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষণেই, অধিকাংশ তারকাযুগ্মের কোন-না-কোন নক্ষত্রকে একই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছিলেন। পৃথিবী যেমন বৃত্তাভাসপথে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে, তারকাযুগ্মের প্রত্যেক নক্ষত্রটি তাহার সহচরকে ঠিক্ সেইপ্রকার পথে প্রদক্ষিণ না করিলে, পর্য্যবেক্ষণে কোন-প্রকারে ঐপ্রকার গতি দেখা যাইতে পারে না। মনে কর, কোন সার্কাসের খেলোয়াড় অশ্বপৃষ্ঠে বৃত্তাভাসপথে ঘুরিতেছে। এখন যদি সে কোন একটি লোককে ঠিক্ তাহার অগ্রবর্ত্তী থাকিয়াই চলিতে দেখে, তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যে অশ্বারোহীর ন্যায় কোন এক বৃত্তাভাসপথে ঘুরিতেছে, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। হার্শেল্-সাহেব যুগলতারকাস্থ প্রত্যেক নক্ষত্রটিকে একই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইহাদের প্রত্যেকটিই যে নিয়তই অপরটির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা কতকটা ঐপ্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

হার্শেলের ঐ আবিষ্কারসমাচার প্রচারিত হইলে, জ্যোতির্বিন্মাত্রেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে জ্যোতিষ্করাজ্যে নবাবিষ্কার বড়ই দুর্লভ ছিল, কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি হাতে করিয়া অতি প্রাচীন আবিষ্কারগুলির চর্ব্বিতচর্ব্বণ ব্যতীত পণ্ডিতগণের উপায়ান্তর ছিল না। হার্শেলের আবিষ্কারে তাঁহারা দুইএকটা নূতন কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া গিয়াছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তৎপরে অনেকদিন অবধি কোন জ্যোতির্বীই আর নূতন যুগলতারকা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং পরিজ্ঞাত যুগলতারকাগুলির ভ্রমণপথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়া-ছিলেন। কিন্তু এই অকৃতকার্য্যতার জন্য পণ্ডিতগণের উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারেন নাই; কারণ সেই সময়ে কোন পর্য্যবেক্ষণমন্দিরেই ক্ষুদ্রজ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণোপযোগী দূরবীক্ষণযন্ত্রাদি ছিল না, কাজেই আবিষ্কারের শত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল।

হার্শেলের আবিষ্কারের প্রায় কুড়িবৎসর পরে, কয়েকটি বৃহৎ দূরবীন্ নির্ম্মিত হওয়ায় পর্য্যবেক্ষণের খুব সুবিধা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে চল্লিশবৎসরের মধ্যে প্রায় একহাজার নূতন যুগ্মতারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল এবং বৃদ্ধ হার্শেলের সুযোগ্য পুত্র জন্ হার্শেল ও অধ্যাপক

স্তাভারিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সুযোগে অনেকগুলি যুগলতারকার ভ্রমণপথ পর্য্যন্তও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

নানা জ্যোতিষ্কের পরিভ্রমণবেগ তুলনা করিলে, পরস্পরের বেগের মধ্যে কোন ঐক্য বা শৃঙ্খলার আভাস পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি-শুক্র হইতে আরম্ভ করিয়া শত-সূর্য্যোপম নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই এক এক নির্দ্দিষ্টবেগে মহাকাশে বিচরণ করিতেছে। যুগলতারকাগণের পরিভ্রমণেও অবিকল পূর্ব্বোক্তপ্রকার বেগবৈচিত্র্য ধরা পড়িয়াছে। গণনাদ্বারা দেখা গিয়াছে, কুম্ভরাশিস্থ একটি যুগলতারকা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৬৫০ বৎসর অতিবাহন করে, আবার ইকুইলি (Equuleii)-রাশির একটি নক্ষত্র তাহার সহচরটির চারিদিকে ঘুরিতে এগারো বৎসরের অধিককাল ক্ষেপণ করে না। কিন্তু ইহাই যুগলতারকার পরিভ্রমণকালের সীমা নয়, পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের পর্য্যবেক্ষণেও জ্যোতির্বিদগণ অনেকগুলি যুগলতারকার পরিভ্রমণকাল স্থির করিতে পারেন নাই। এই সুদীর্ঘকালে ইহারা এত অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, তৎসাহায্যে গণনাকার্য্য চলিতেছে না, সুতরাং উক্ত নক্ষত্রগুলির পরিভ্রমণকাল পরিজ্ঞাত ঊর্দ্ধসীমা ১৬৫০ বৎসরের যে কত অধিক হইবে, তাহা পাঠক অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন। এই সকল যুগলতারকার পরিভ্রমণপথ আবিষ্কারের ভার সুদূর ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিদগণের উপর অর্পণ করিয়া আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হইতেছে, শত শত বৎসরের পর্য্যবেক্ষণফল তুলনা করিয়া ঐ সকল জ্যোতিষ্কের ভ্রমণপথনিরূপণের সুযোগ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাই পাইবেন।

যুগলতারকাগুলির পরিভ্রমণকাল নানা জ্যোতিষ্কগণনায় আজকাল খুব প্রযুক্ত হইতেছে। কেবল খেয়ালেরই বশবর্ত্তী হইয়া যে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণে চোখ লাগাইয়া অনিদ্রায় কাটাইতেছেন, তাহা নয়। আমরা জ্যোতিষ্কগ্রন্থে কোন নক্ষত্রের বিবরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, নক্ষত্রটি কত বড় জানিবার জন্য প্রথমেই ব্যগ্র হইয়া পড়ি। জ্যোতির্বিদগণ আজকাল যুগলতারকার পরিভ্রমণকালের সাহায্যে গণনা করিয়া, আমাদের এই অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিতেছেন। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী যুগলনক্ষত্রসকল ধরাকক্ষার ব্যাসার্দ্ধের যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহা স্থির করা বড় কঠিন নয়; কাজেই সেই কোণপরিমাপ দ্বারা পৃথিবী হইতে জ্যোতিষ্কগুলির দূরত্বও হিসাব করিয়া বাহির করা কঠিন হয় না। জ্যোতির্বিদগণ যুগলতারকার পরিভ্রমণপথ ও দূরত্ব অবলম্বনে (কেপ্‌লারের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে) ইহাদের গুরুত্বাদিসম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। এই হিসাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি যুগলতারকাকে সূর্য্য অপেক্ষা প্রায় ১৮০০গুণ বৃহত্তর দেখা গিয়াছে এবং আমাদের সূর্য্যের স্থানে নক্ষত্রটি অবস্থান করিলে, সেটিকে ধরাবাসিগণ সূর্য্যাপেক্ষা দেড়শতগুণ উজ্জ্বলতর দেখিত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

যুগলনক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে জ্যোতির্বিদ্‌মহলে খুব আলোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু এই আলোচনার ফলে তাঁহারা যে, কোন নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। একদল জ্যোতিষী বলেন,—দুইটি নক্ষত্র তাহাদের নির্দ্দিষ্টপথে স্বাধীনভাবে চলিতে চলিতে একসময় পরস্পরের খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর বৃহত্তর নক্ষত্রটি ক্ষুদ্রটিকে আর কাছছাড়া হইতে দেয় নাই, এবং প্রবলের আকর্ষণবন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্রটি যে বৃহতের অধিকার ত্যাগ করিবে, সে সামর্থ্যও তাহার নাই। কাজেই সেই মিলনের দিন হইতে সেটিকে বৃহতের চারিদিকে ঘুরিয়াই বেড়াইতে হইতেছে।

নক্ষত্রগণ গতিশীল সত্য এবং তাহাদের পূর্ব্বোক্তপ্রকারের মিলনও অসম্ভব নয়, স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু অনন্ত আকাশের অনন্ত দিক্ ধরিয়া যে সকল নক্ষত্র আসৃষ্টি চলাফেরা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এপ্রকার সাক্ষাৎকার যে একটা সুলভ ঘটনা, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অনন্ত নক্ষত্রগুলির মধ্যে কতগুলি যে যুগ্মাবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা স্থির হয় নাই এবং স্থির করিবার উপায়ও আপাতত নাই, কিন্তু আমাদের দূরবীণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই যখন সহস্রাধিক যুগলতারকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন সমগ্র নক্ষত্রের অনুপাতে এগুলির সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। যুগলনক্ষত্রের এই সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত আকস্মিক মিলন হইতেই যে প্রত্যেকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত সকলে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না।

নাক্ষত্রিক জগতের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে এপর্য্যন্ত যতগুলি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে লাপ্লাসের নিহারিকাবাদই বৈজ্ঞানিকসমাজে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। একদল পণ্ডিত এই নিহারিকাবাদের সাহায্যে যুগলতারকার উৎপত্তিতত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। নিহারিকাবাদিগণ বলেন, নাক্ষত্রিক জগৎগুলি সৃষ্টির প্রথমে বর্ত্তমান আকারে ছিল না। তখন এক-একটা বিশাল জ্বলন্ত নিহারিকাকে নক্ষত্রগুলির স্থানে ঘুরিতে দেখা যাইত; তার পর সেই নিহারিকাগুলিও তাপক্ষয়দ্বারা কালক্রমে জমাট হইয়া গেলে, এই গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত নাক্ষত্রিকজগতের উৎপত্তি করিয়াছে। যুগ্মতারকার উৎপত্তিপ্রসঙ্গেও উঁহারা বলিতেছেন,—প্রথমে এই সকল নক্ষত্রের স্থানে যুগলজ্যোতিষ্কের চিহ্নমাত্রও ছিল না, তখন সেখানে কেবল এক একটি ঘূর্ণ্যমান অনন্ত নিহারিকারাশি দেখা যাইত। পরে সেগুলি শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিলে, সেই ঘূর্ণনবেগ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত যে, তখন আর নিহারিকাটি একসঙ্গে থাকিতে না পারিয়া স্বতই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িত। নিহারিকাবাদিগণের মতে, সেই দ্বিখণ্ডিত নিহারিকারই পরিণতি যুগলতারকা।

যুগলনক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ত্বসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত উক্তিটি পাঠক কেবল অনুমানমূলক মনে

করিবেন না। ঘূর্ণ্যমান পদার্থ ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে যে তাহার আবর্ত্তনবেগ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দ্বারা তাহার দ্বিধা বিভক্ত হওয়ারই যে সম্ভাবনা, গণিতের সাহায্যে নিহারিকাবাদিগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তা ছাড়া, পর্য্যবেক্ষণদ্বারা আকাশে যে কতকগুলি যুগলনিহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও ইঁহাদের উক্তির সার্থকতা জানা যাইতেছে। নিহারিকাবাদিগণ বলিতেছেন, একএকটি বৃহৎ নিহারিকা কোটি কোটি বৎসরের তাপক্ষয়জনিত সঙ্কোচে বেগশালী ও খণ্ডিত হইয়া প্রথমে যুগলনিহারিকার আকার প্রাপ্ত হয়, এবং পরে ইহারাই আবার ক্রমে আরো সঙ্কুচিত হইয়া যুগলতারকার উৎপত্তি করে।

সূর্য্যের ন্যায় একক নক্ষত্রগুলির সহিত যুগলনক্ষত্রের তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বৃহস্পতি, শুক্র ও পৃথিবী ইত্যাদি সৌরসহচরগুলির পরিভ্রমণপথ প্রায় বৃত্তাকার, কিন্তু কোন যুগলতারকার সহচরের কক্ষা এপর্য্যন্ত সেপ্রকার দেখা যায় নাই। যুগলনক্ষত্রের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস বটে, কিন্তু সেগুলি অনেকটা লম্বা-আকৃতি-যুক্ত অর্থাৎ ইহাদের বৃহৎ ব্যাস-(major axis)-গুলি ক্ষুদ্র ব্যাসের (minor axisএর) তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ। নিহারিকাবাদিগণ এপর্য্যন্ত যুগলনক্ষত্রের এই বিশেষত্বটির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা নক্ষত্রের যুগ্মতা-উৎপত্তির যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার সি-(See)-নামক জনৈক জ্যোতিষী নিহারিকাবাদই অবলম্বন করিয়া যুগলতারকার ভ্রমণপথের পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বটির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চন্দ্রের উৎপত্তি ও গতিসম্বন্ধে অধ্যাপক ডারুইন্ যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক তাহা অবশ্যই অবগত আছেন। ডারুইন্ বলিয়াছিলেন, সেই প্রাথমিক নিহারিকার কোন অংশ খণ্ডিত হইয়াই যে ক্রমে পৃথিবী ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু চন্দ্রের কুটিলগতি ও উহার আবর্ত্তনের বিশেষত্ব কেবল পৃথিবী ও চন্দ্রের পরস্পর আকর্ষণজাত জোয়ারভাঁটা দ্বারাই হইয়াছে। ডাক্তার সি ডারুইনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, কেবল জোয়ারভাঁটার সাহায্যে যুগলতারকার ভ্রমণপথের বিশেষত্বটির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ডারুইন্ ও ডাক্তার সি উভয়েই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গণিতই তাহার মূল অবলম্বন, সুতরাং এখন আর তাঁহাদের উক্তিতে কোনক্রমেই অবিশ্বাস করা চলে না।

পরিবর্ত্তনশীল তারকার কথা পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। এই নক্ষত্রগুলির উজ্জ্বলতা সকল সময়ে একপ্রকার থাকে না। একএকটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে এগুলিকে কখন ম্লান ও কখন উজ্জ্বল দেখা যায়। অতি প্রাচীন জ্যোতিষিগণও কতকগুলি নক্ষত্রের এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পার্সিয়ুস্-(Perseus)-রাশিস্থ আল্‌গল্-(Algol)-নামক নক্ষত্রটির পরিবর্ত্তনশীলতার কথা প্রাচীন পারস্যগ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এপর্য্যন্ত এই জ্যোতিষিক

ঘটনাটির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নক্ষত্রগুলির এই এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করা ব্যতীত তাঁহাদের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিদ্গণ যুগলতারকাকেই এই দীপ্তিবৈচিত্র্যের কারণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন,- আমরা এপর্য্যন্ত যতগুলি পরিবর্ত্তনশীল তারকা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকেই যুগলনক্ষত্রশ্রেণীভুক্ত; ইহাদের সহচরগুলি তাপবিকিরণদ্বারা কালক্রমে অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া দূরবীণে উহাদের যুগ্মতা ধরা পড়ে না। অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ায় কিন্তু উহাদের গতির কোন অপচয় হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেককেই ঠিক্ পূর্ব্ববৎ সহচরের চারিদিকে আজও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। জ্যোতির্বিদ্গণ বলিতেছেন,—এই অনুজ্জ্বল বৃদ্ধনক্ষত্রগুলি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন তাহাদের উজ্জ্বল সহচর ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া ঠিক্ একসূত্রে অবস্থান করে, তখন অনুজ্জ্বল নক্ষত্রটির দেহে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আচ্ছাদিত হইয়া যায়; কাজেই আমরা তৎকালে আচ্ছন্ন নক্ষত্রটিকে ম্লানতর দেখি। কিন্তু ইহার এই মলিনতা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ যথাকালে বৃদ্ধনক্ষত্রটির দেহান্তরাল হইতে মুক্তিলাভ করিলেই, সেটি আবার পূর্ব্বজ্যোতি ফিরিয়া পায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ত্রিবঙ্কুর।

৭।

ভারতে, কাকের কা-কা-ধ্বনি যেন সমস্ত শব্দরাশির ভিত্তিস্বরূপ। তাই, ক্রমে সেই ধ্বনি অভ্যস্ত হইয়া যায়—আর গ্রাহ্যের মধ্যে আইসে না। মন্দিরের কোলাহল থামিয়া গেলে, পার্শ্ববর্ত্তী কাকদিগের ভীষণ বৈতালিক সঙ্গীত যখন আরম্ভ হয়, আমি জাগ্রত হইয়া আর তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমার ছাদের সম্মুখেই একটা বৃহৎ বৃক্ষ,—সেই বৃক্ষশাখাই তাহাদের প্রিয় বাসযষ্টি। সেই বৃহৎ তরুর গোলাপিরঙের কুসুমগুচ্ছ অনেকটা আমাদের chestnut-তরুর পুষ্পের ন্যায়। অরুণোদয় পর্য্যন্ত ইহার শাখাগুলি এই কৃষ্ণবর্ণ বিহঙ্গদিগের ভারে বক্র হইয়া থাকে।

আজ প্রাতে, সূর্য্যোদয়ে,—যখন পল্লবপুঞ্জের তলদেশ—হরিৎ-শাখা মণ্ডপের তলদেশ নবভানুর কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইল, আমি সেই সময়ে ব্রাহ্মণঘেরের মধ্যে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটা গাড়িতে উঠিলাম।

সিংহদ্বার পার হইয়া, প্রথমেই আবার সেই পবিত্র পুষ্করিণীগুলি দেখিতে পাইলাম।

এই সব পুষ্করিণীর জলে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন প্রভাতে অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া স্নান করে—পূজার্চ্চনা করে।

এই প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যে এইবার আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি। এই নগরস্থ উদ্যানের মধ্যে,—তালপুঞ্জের মধ্যে, শুধু যে রাজপরিবারেরই বাসস্থান, তাহা নহে; তা ছাড়া, রাস্তার দুধারে ছোট ছোট মাটির ঘর রহিয়াছে,—তাহাতে শুধু উচ্চবর্ণের লোকেরা বাস করে। আয়তনয়না ব্রাহ্মণগৃহিণীরা, এই রমণীয় উষাকালে, নিজ নিজ গৃহের সম্মুখস্থ ভূমির শোভাসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। সেই লাল মাটি উত্তমরূপে পিটাইয়া ও ঝাঁটাইয়া, একটা শাদা গুঁড়া দিয়া তাহার উপর নানাবিধ অদ্ভুত নক্‌সা কাটিতে থাকে। কিন্তু এই নক্‌সাগুলি এত ক্ষণস্থায়ী যে, একটু বাতাস উঠিলেই বিলুপ্ত হয়—অথবা মানুষের, ছাগলের, কুকুরের, কাকের পদসঞ্চারে মুছিয়া যায়। অগ্রে তাহারা একটু-একটু চিহ্ন দিয়া রাখে,—পরে সেই চিহ্ন-অনুসারে খুব তাড়াতাড়ি নক্‌সাগুলি রচনা করে। অতীব শোভনভাবে আনত হইয়া, গুঁড়ার আধারপাত্রটি হস্তে লইয়া, মাটির উপর ঘুরিয়া-ফিরিয়া দ্রুতভাবে বেড়াইতে থাকে। সেই চূর্ণপাত্র হইতে শাদা-শাদা চূর্ণধারা, অক্ষুরস্ত ফিতার ন্যায় অনবরত পড়িতে থাকে। গোলাপপাপ্‌ড়ির অনুকরণে জটিল নক্‌সা, জ্যামিতিক আকৃতির চিত্রাবলী, উহাদের নিপুণ অঙ্গুলি হইতে আশ্চর্য্যরূপে বাহির হইতে থাকে। নক্‌সারচনা শেষ হইলে, অঙ্কিত রেখাজালের প্রধান-প্রধান সন্ধিস্থলে উহারা নানাবিধ পুষ্প বসাইয়া দেয়। এইরূপে, সেই ছোট রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভূষিত হইলে, অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য মনে হয়, যেন একটা চিত্রবিচিত্র অদ্ভুত গালিচায় রাস্তাটি আচ্ছাদিত হইয়াছে।

তা ছাড়া, এই অঞ্চলটির সর্ব্বত্রই কেমন-একটা প্রাচীনধরণের শোভনপারিপাট্য, বিমল শান্তি ও সরল গাম্ভীর্য্য বিরাজমান।

মহারাণীর উদ্যানের সিংহদ্বারের সম্মুখে, সেই একইধরণের কায়দাদুরস্ত লালপাগ্‌ড়ি-ওয়ালা সিপাই-সান্ত্রী। উহারা তুরীভেরী বাজাইয়া, অস্ত্রশস্ত্র স্কন্ধ হইতে নামাইয়া, উচিত সম্মানপ্রদর্শনে সতত তৎপর। মহারাণীর পতি রাজা বহিঃসোপানের নিম্নতম চাতালে নামিয়া-আসিয়া, বিশিষ্ট শিষ্টতার সহিত পূর্ণ উপচারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজের ন্যায় ইনিও সুরুচির অনুসরণ করিয়া, ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন। সবুজরঙের মখ্‌মলের পোষাক, মাথায় শাদা রেশমের পাগ্‌ড়ি, আর সর্ব্বাঙ্গে হীরক ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। এই সমস্ত বেশভূষা সত্ত্বেও ইনি একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত।

প্রাসাদের প্রথমতলস্থ দরবারশালায় মহারাণী আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই দরবারশালাটি য়ুরোপীয় আস্‌বাবে সজ্জিত। কিন্তু মহারাণী স্বয়ং স্বদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করায় তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী ভারতলক্ষ্মী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার পার্শ্বমুখের অবয়ব-রেখা সরল, মুখশ্রী অতি বিশুদ্ধ, চোখদুটি বেশ বড় বড়,—তাঁহার সমস্ত শ্রীসৌন্দর্য্য

স্ববংশসুলভ। নায়ের-জাতির প্রথা-অনুসারে, তিনি তাঁহার কৃষ্ণ কেশকলাপ প্রথমে ফিতাবন্ধনের আকারে বিন্যস্ত করিয়া, পরে সেইগুলি একত্র সম্মিলিত করিয়া ছোট একটি মসৃণ টুপির মত মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। উহা সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া, ললাটের উপর ছায়াপাত করিয়াছে। হীরক-মাণিক্য-খচিত কানবালার ভারে কর্ণদ্বয়ের নিম্নাংশ অতিমাত্র প্রসারিত। মখমলের চোলী পরা', নগ্ন বাহুদ্বয়ে বহুমূল্য মণিখচিত বাজুবন্ধ; পরিধানে জরির পাড়ওয়ালা শাড়ী;—তাহাতে সুন্দর নক্‌সা কাটা। প্রস্তর-প্রতিমা যেরূপ পরিচ্ছদে আবৃত হয়, তাঁহার পরিচ্ছদ তদনুরূপ। যে দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও বেশভূষায় মার্জ্জিতরুচি পরিলক্ষিত হয়, সেখানে পুরাতন রাজবংশের সম্ভ্রান্ত রমণীদিগের কিরূপ বেশভূষা, তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই মহারাণীর শ্রীসৌন্দর্য্য,—বেশভূষা অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বোপরি তাঁহার করুণার্দ্র মুখশ্রীতে, তাঁহার মৌনমাধুর্য্যে, তাঁহার নারীজনোচিত শালীনতায় আরো যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তা ছাড়া, তাঁহার স্মিতহাস্যের অন্তরালে যেন একটা চাপা বিষাদের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বেশ বুঝা যায়। তাঁহার তাপসী-কল্প জীবন কিসের দুঃখে তমসাচ্ছন্ন, তাহা আমি অবগত আছি। ব্রহ্মা তাঁহার অদৃষ্টে একটিও কন্যারত্ন লেখেন নাই; তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীও নাই যাহাকে তিনি দত্তকস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। তাই তাঁহার বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বহু শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কখন ঘটে নাই, এইবার তাহা ঘটিতে চলিল। এইবার ত্রিবঙ্কুরে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে।...

মহারাণীর সহিত য়ুরোপসম্বন্ধে আমার কথাবার্ত্তা হইল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার কল্পনা বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিলাম, ঐ সুদূরভূখণ্ড-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই তাঁহার জীবনের একটি চির-পোষিত স্বপ্ন। কিন্তু, মঙ্গলগ্রহের কিংবা চন্দ্রলোকের কাল্পনিক দেশসমূহের ন্যায়, এই য়ুরোপ তাঁহার পক্ষে দুরধিগম্য। কেন না, ত্রিবঙ্কুরে, কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চকুলের রমণী, বিশেষত কোন রাণী য়ুরোপযাত্রা করিলে, তাঁহাকে জাত্যংশে পতিত হইয়া "পারিয়া"র সামিল হইতে হয়।

আর যে-কয়েকদিন আমি ত্রিবঙ্কুরে অবস্থিতি করিব, ইহার মধ্যে কখন-কখন মহারাজের দর্শনলাভ আমার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই লক্ষ্মীস্বরূপা মহারাণীর দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে আর কখনই ঘটিবে না। তাই, এখান হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে, যে মূর্ত্তিটি একালের বলিয়া মনে হয় না, সেই মূর্ত্তিটি আমার নেত্রের উপর ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে আমি অভিলাষী হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমি এইরূপ রাণীদিগকে কেবল ভারতের পুরাতন ক্ষুদ্র চিত্রপটেই দর্শন করিয়াছি। মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া, এই ব্রাহ্মণ-গণ্ডির মধ্যেই, মহারাণীর এক ভগিনীর পুত্রদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহারাই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তাঁহাদের পরেই এই রাজবংশ লোপ

পাইবে। উঁহাদের মধ্যে একজনের পদবী "প্রথম রাজকুমার", অপরটির পদবী "দ্বিতীয় রাজকুমার"। এই উদ্যানের মধ্যে, তাঁহাদের পৃথক্ আবাসগৃহ। এই যুবকদ্বয়ের উষ্ণীষে মরকতমণির শ্রীপচ্ কল্কা সংযোজিত। ইঁহারা ব্যাঘ্রশিকার করেন, ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠানাদি করেন, অথচ আধুনিক কালের সমস্ত বিষয়েরই খোঁজখবর রাখেন, এবং সাহিত্য ও ভৌতিকবিজ্ঞানের অনুশীলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন, আমার অনুরোধক্রমে, প্রথমে আমাকে হাওদাখানায় লইয়া গেলেন। সেইখানে হাতীদের সাজসজ্জা ও সরঞ্জাম রক্ষিত। তাহার পর, তাঁহার স্বগৃহীত কতকগুলি ফোটোচিত্র আমাকে দেখাইলেন;—তিনি নিজহস্তে সেগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন। এবং পরে, পদকপুরস্কারলাভের আশায় ঐগুলি সখ্ করিয়া তিনি য়ুরোপের কোন প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দেন।

আজ সন্ধ্যার সময়, সূর্য্যাস্তকালে, ভারতসমুদ্র দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল। ত্রিবঙ্কুর হইতে সমুদ্র প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে। সেখানে উহার বীচিমালা বিজন তটভূমির উপর অনবরত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মহারাজের একটা গাড়িতে উঠিয়া, প্রথমে সমস্ত প্রাচীরবেষ্টিত নগরটি অতিক্রম করিতে হইল। ব্রাহ্মণগৃহসমূহের ধার দিয়া যে সব রাস্তা গিয়াছে, সেই সব নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়া, প্রাসাদ ও উদ্যানের লাল প্রাচীরের সম্মুখ দিয়া, বৃহৎ মন্দিরটির ধার দিয়া, আমার গাড়ি চলিতে লাগিল। মন্দিরের এত নিকটে আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন আসি নাই।

শীঘ্রই নগর পার হইলাম এবং নগর পার হইয়াই, নিস্তব্ধ সৈকতভূমির মধ্যে, স্তূপাকার বালুরাশির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড সূর্য্য দিগন্তে মগ্নপ্রায়,—তাহারি ভাঙা-ভাঙা রশ্মিচ্ছটা চারিদিকে প্রসারিত। অস্মদ্দেশের সমুদ্রোপকূলস্থ বৃক্ষের ন্যায় বাতাহত ও আলুলিতশাখ কতকগুলি বিরল তালজাতীয় বৃক্ষ, সাগরবায়ুর অবিশ্রান্ত প্রবাহবেগে, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বহুশতাব্দীসঞ্চিত এই সব বালুকারাশি, এই সমস্ত প্রস্তর, প্রবাল ও শম্বুকের চূর্ণরাশি, সহস্র-সহস্র চূর্ণীকৃত জীবদেহের ধূলিরাশি—এই ভীষণ স্থানের সান্নিধ্য ঘোষণা করিতেছে। তাহার পরেই, সেই অন্তহীন মহা কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। এবং এই বালুকাস্তূপের মধ্যে, একটা পথের বাঁক ফিরিবামাত্র, সেই সচল অনন্তমূর্ত্তি আমার সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইল।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে, মনে হয় যেন, মানবজীবন স্বভাবতই সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। সেখানে লোকেরা সমুদ্রের ধারে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করে, সমুদ্রের যতটা নিকটে হওয়া সম্ভব—তাহাদের নগরপত্তন করে; তাহাদের নৌকাদির জন্য অল্পস্বল্প স্থান এবং বেলাভূমির একটু-আধটু কোণ খালি রাখিতেও তাহারা যেন কুণ্ঠিত হয়।

কিন্তু এখানকার লোকেরা সমুদ্রকে শূন্য শ্মশান ও সাক্ষাৎ মৃত্যু মনে করিয়া, যতটা পারে, তাহা হইতে তফাতে সরিয়া যায়। এদেশে সমুদ্র—একটা দুরতিক্রমণীয় অতলস্পর্শ রসাতলবিশেষ—যাহা কোন

কাজে আইসে না, যাহা কেবল মনুষ্যের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে। সমুদ্রকে দুর্গম স্থান মনে করিয়া কেহ তাহার নিকটে যাইতে সাহস করে না। আমি এই অনন্ত বীচিমালার সম্মুখে, বালুরাশির অক্ষুরন্ত রেখার উপরে, একটি পুরাতন প্রস্তরমন্দির ছাড়া মনুষ্যের আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। মন্দিরটি রূঢ়ধরণে গঠিত, স্থূল ও খর্ব্বাকার, থামগুলি লুপ্তমুখশ্রী,—কতকটা তরঙ্গশীকরে, কতকটা লবণাক্ত জলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যে সমুদ্র-কর্ত্তৃক ত্রিবন্ধুর কারারুদ্ধ, সেই দুর্বৃত্ত সমুদ্রকে মন্ত্রবশীভূত ও প্রশমিত করিবার নিমিত্তই যেন এই মন্দিরটি এখানে অধিষ্ঠিত। এই সন্ধ্যাকালে সমুদ্রটি বেশ প্রশান্ত। কিন্তু গ্রীষ্মের আরম্ভ হইতে, এই সমুদ্র কিছুকালের জন্য আবার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুস্বার ও বিসর্গ।

স্বরবর্ণ-অন্তে তাহাদের উচ্চারণবিশেষের দুইটি চিহ্ন সন্নিবিষ্ট আছে। একটির আকার এক বিন্দু, অন্যটি দ্বিবিন্দু। তাহাদের বৈয়াকরণিক নাম অনুস্বার ও বিসর্গ। উহাদিগকে বৈয়াকরণগণ স্বরও বলেন নাই, ব্যঞ্জনও বলেন নাই। উহাদিগকে অযোগবাহ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত ইহারা বর্ণমধ্যে পরিগণিত নহে। ইহারা স্বরবর্ণে যুক্ত হইয়া কেবল তাহাদের উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটায় মাত্র, তদ্ভিন্ন ইহাদের স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই।

এই চিহ্নদ্বয় স্বর ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণে কখনই যুক্ত হয় না, এইজন্য চিরপ্রসিদ্ধপ্রথানুসারে অকারাদি ঔকার পর্য্যন্ত চৌদ্দটি স্বরবর্ণের অন্তে ইহাদের স্থান হইয়াছে। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চির-প্রচলিত প্রথা অতিক্রম করিয়া ইহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, স্বরবর্ণের সহিতই একমাত্র সম্বন্ধ, তখন ইহাদিগকে স্বরান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যঞ্জনান্তে আনিয়া স্থান দেওয়া বোধ করি সঙ্গত হয় নাই। ইহারা স্বরেরই অনুগামী, সুতরাং ঔকারের পরেই ইহাদের স্থান চিরকাল ছিল এবং এখনও রাখা উচিত। স্বরের অনুগামী বলিয়াই ং এই চিহ্নের নাম অনুস্বার হইয়াছে। ইহাকে বলপূর্ব্বক অনুস্বর হইতে অনুব্যঞ্জন করিয়া লওয়া বোধ করি ঠিক হয় নাই। অনুস্বরের প্রকৃত উচ্চারণ কি, তাহা নির্ণয় করার জন্য অগ্রে আমাদের বর্ণমালার সমস্ত অনুনাসিক বর্ণের সমালোচনা করা আবশ্যক।

অন্যান্য ভাষায় অনুনাসিকবর্ণ একটি

কি দুইটি থাকে, কিন্তু আমাদের ভাষায় পাঁচটি, যথা;—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। ইহারা এক এক বর্গের জন্য এক একটি নির্দ্দিষ্ট। এই পঞ্চবিধ অনুনাসিকের ব্যবস্থা করিয়া আর্য্যঋষিগণ যে ভাষায় প্রতি নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসুতা এবং সুকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রতি প্রণিধান-পূর্ব্বক মনঃসংযোগ করিলে হৃদয় পুলকিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের জন্য এক একটি অনুনাসিকের সৃষ্টি করার কারণ এই যে, এক বর্গের অনুনাসিক অন্য বর্গে প্রযুক্ত হয় না; এবং প্রয়োগ করিলে উচ্চারণ দুরূহ হয়। যেমন ইংরেজীতে দুইটিমাত্র অনুনাসিক এন্ (n) এবং এম্ (m)। এই এন্‌কে যদি আমরা দন্ত্য ন ধরিয়া লই, তবে rankশব্দের উচ্চারণ রেঙ্ক্ হইতে পারে না, রেন্‌ক্ হইবে। কিন্তু এরূপ অদ্ভুত বাঙ্‌নিষ্পত্তি কেহ করে না। কণ্ঠ্যবর্ণের উপর দন্ত্য অনুনাসিক প্রয়োগ করা অস্বাভাবিক। কণ্ঠ্যবর্ণের উপর কণ্ঠ্য অনুনাসিকের প্রয়োগ করাই স্বাভাবিক। আমাদের কণ্ঠ্য অনুনাসিক ঙ। ইংরেজিতে উক্ত ঙ-বর্ণ না থাকা সত্ত্বেও তাহাতে rank-শব্দের nকে ঙর ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকে।

Gangশব্দ উচ্চারণ করিতেও সেই-প্রকার ঙ-উচ্চারণ হয়, ন-উচ্চারণ হয় না। অর্থাৎ k এবং g কণ্ঠ্যবর্ণ, সুতরাং তাহাদের উপর যে অনুনাসিক বসিবে, তাহা "ঙ"র ন্যায় উচ্চারিত হইবে; ঐ ঙ-বর্ণ সেই ভাষাতে থাকুক আর না থাকুক। এইপ্রকার প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক বর্গের উপর সেইবর্গীয় অনুনাসিক ব্যতীত অন্যবর্গীয় অনুনাসিক প্রযুক্ত হয় না; এই কারণেই প্রত্যেক বর্গের জন্য স্বতন্ত্র অনুনাসিক উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইংরেজীতে যে ওষ্ঠ্য অনুনাসিক এম্ (m) আছে, তাহা যদি না থাকিত এবং দন্ত্য অনুনাসিক এন্ (n) দ্বারা lampশব্দস্থলে lanp লিখিত, তবে তাহাকেও লোকে লেম্প্ই উচ্চারণ করিত, কখনও লেন্‌প্ বলিত না। P এবং B বর্ণের উপর nযুক্ত কোন শব্দ ইংরেজীতে দেখা যায় না। ইহার কারণ ওষ্ঠ্যবর্ণের উপর দন্ত্য-অনুনাসিক-প্রয়োগ অস্বাভাবিক। এই কারণের প্রতি ভারতীয় আর্য্যগণই লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্য কোন জাতি করে নাই; কিন্তু স্বভাব সর্ব্বত্রই এক, তাহার বশে সকলেই রেন্‌ক্‌কে রেঙ্ক্ উচ্চারণ করে। অর্থাৎ বর্ণমালায় না থাকিলেও উচ্চারণে ঙ-বর্ণটি সর্ব্ব-ভাষাতেই বর্ত্তমান আছে।

অসদৃশ-অনুনাসিক-যুক্ত যে কোন শব্দ গঠিত হইতে পারে না, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা করিলে সেই শব্দের উচ্চারণ অস্বাভাবিকত্বহেতু সুখদ এবং সহজ হয় না। স্বাভাবিকনিয়মানুসারে যে বর্ণ যে স্থান হইতে উৎপন্ন, তদুপরি যে অনুনাসিক ব্যবহৃত হইবে, তাহাও সেই স্থান হইতে উৎপন্ন হইবে। অধুনা "বঙ্গভাষা" লইয়া নানাপ্রকার বাগ্বিতণ্ডা চলিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন, দন্ত্য ন এবং মূর্দ্ধন্য ণ, এই দুই অনুনাসিক বাঙ্‌লাতে একপ্রকারই উচ্চারিত; সুতরাং মূর্দ্ধন্য ণ বাঙ্‌লাতে নিষ্প্রয়োজন এবং উহাকে বর্ণমালা

হইতে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অনেক প্রাচীন প্রাকৃতেও দেখা গিয়াছে, মূর্দ্ধন্য ণকারের ব্যবহার নাই; কিন্তু মৌলিক আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, স্বাভাবিক-নিয়মানুসারে একটি অনুনাসিকও ত্যাগ করা যায় না। "কণ্ঠ" আর "কন্দর" কখন এক অনুনাসিক দ্বারা উচ্চারণ করা যাইতে পারিবে না। কারণ কণ্ঠের ণ'কে দন্ত হইতে উচ্চারণ করিয়া ঠ'কে মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারণ করিতে গেলে তাহার উচ্চারণ এত কঠিন ও অস্বাভাবিক হয় যে, তাহা কেহ করিবেই না। ঠ এবং তাহার অনুনাসিক উভয়কেই অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির বশে লোকে একস্থান হইতে উচ্চারণ করিবে, ইহার অন্যথা নাই।

আরও দেখুন, Panterশব্দের ণকারের উচ্চারণ করিতে জিহ্বা যে স্থানকে স্পর্শ করে, তাহা মূর্দ্ধা; কারণ t বা ট মূর্দ্ধন্য-বর্ণ। আর Panther বলিতে নকারের উচ্চারণ যে স্থান হইতে হয়, অর্থাৎ জিহ্বাগ্র যে স্থান স্পর্শ করে, তাহা দন্ত; কারণ th বা থ দন্ত্যবর্ণ। Panterশব্দের ণ বলিতে জিহ্বাগ্র মূর্দ্ধাতে না যাইয়া কখনই দন্তে যাইবে না, এবং Pantherশব্দের ন বলিতেও জিহ্বাগ্র দন্ত ছাড়িয়া মূর্দ্ধাতে কোনমতেই যাইবে না। অতএব প্রত্যেক অনুনাসিকের উচ্চারণ স্বতন্ত্র। তাহাদের একের দ্বারা অন্যের কার্য্য কখনই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যে বৈজ্ঞানিক ভাবে আমাদের ভাষা জগজ্জয়ী, সেই ভাবের উপর হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া অতি দুরূহ কার্য্য, এবং তাহাতে অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন।

ব্যঞ্জনবর্ণের যেমন প্রত্যেক বর্গের সহিত সেই বর্গের একটি অনুনাসিক সংস্থিত আছে, সেইপ্রকার অকার হইতে ঔকার পর্য্যন্ত স্বরবর্ণের পরেও তাহাদের একটি অনুনাসিক চিহ্ন ব্যবস্থিত আছে, তাহার নাম অনুস্বার। প্রত্যেক অনুনাসিকই তাহার আপন অধিকারমধ্যে কার্য্য করে, যেমন ঙ কবর্গের উপর বসে, কিন্তু অন্য বর্গের উপর বসিতে পারে না; আবার দন্ত্য ন দন্ত্যবর্ণ ভিন্ন কবর্গ প্রভৃতির উপর বসে না। সেইপ্রকার অনুস্বারও তাহার আপন অধিকার স্বরবর্ণে ভিন্ন অন্য বর্ণে যুক্ত হইতে পারে না। অং ইং ইত্যাদি হইতে পারে, কিন্তু ক্ং হয় না, কং হইতে পারে, কারণ কং=ক্+অ+ং। অকার না থাকিলে কেবল কবর্ণে ং যুক্ত হইতে পারিত না। এইজন্যই ইহাকে অনুস্বর বা অনুস্বার বলা যায়। ব্যঞ্জনানুনাসিকসকল যেমন আপন আপন বর্গের অনুগামী, অনুস্বার তেমনি স্বরের অনুগামী।

বর্গীয় অনুনাসিকসকল যেমন প্রত্যেকে আপন আপন বর্গের উচ্চারণযন্ত্রের সংঘাতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বরবর্ণ যদি কোন যন্ত্রের সংঘাতে উৎপন্ন হইত, তবে ঐ নিয়মানুসারে তাহার অনুনাসিকও সেই যন্ত্রের সংঘাতে উৎপন্ন হইত, কিন্তু স্বরবর্ণোচ্চারণ করিতে কোন দুই উচ্চারণস্থানের সংঘাত হয় না, সুতরাং তাহার অনুনাসিক অনুস্বারের উচ্চারণেও কোন দুই যন্ত্রের স্পর্শ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু আমরা সংস্কৃতশব্দোচ্চারণ করিতে অনুস্বারকে যে অঙ্ক অথবা অঙ্গ শব্দের "ঙ"র ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা কণ্ঠকে

স্পর্শ করে। যদি ঙ এবং অনুস্বারের এক উচ্চারণ হইত, তাহা হইলে এক উচ্চারণের জন্ম দুইটি বর্ণ ব্যবহৃত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। অতএব বোধ হয়, অনুস্বারকে যে "ঙ"র ন্যায় উচ্চারণ করা হয়, তাহা ভ্রম, ইহার প্রকৃত উচ্চারণ আমাদের চন্দ্রবিন্দু এবং ফরাসীভাষার Monsieurশব্দের nএর ন্যায় হওয়া উচিত। আমরা মৌখিক ভাষাতে অনুস্বারের প্রকৃত উচ্চারণই করিয়া থাকি। কাংস, মাংস প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ আমরা কাঁস, মাঁসই করি এবং তাহাই ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ; কিন্তু বিশুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ সংস্কৃত করিয়া বলিতে গেলেই কাঙ্‌স, মাঙ্‌স বলিয়া থাকি। স্বাভাবিক উচ্চারণ চলিতভাষাতে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের শিক্ষিতভাষা অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা যাহা শিক্ষা করিয়া লইতে হয়, তাহা শিখিবার সময় কুশিক্ষাহেতু অশুদ্ধোচ্চারণ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; এবং বহুকাল হইতে ভাষার মৌলিক তত্ত্বানুশীলন না হওয়াতে আমরা যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাই বলিতেছি।

সকল অনুনাসিকের উচ্চারণস্থান মুখ এবং নাসিকা, কিন্তু "নাসিকানুস্বারস্য" ইতি পাণিনি। অর্থাৎ অনুস্বারের উচ্চারণস্থান কেবল নাসিকা। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, ইহার উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর ন্যায়। অনুস্বারকে চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ করিলে তাহা উল্লিখিত সকল নিয়মের সহিত মিলিয়া যায়, আর "ঙ"র ন্যায় উচ্চারণ করিলে তাহা সকল নিয়মের সহিত অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। যথা ;—

১। "ঙ"র ন্যায় হইলে এক উচ্চারণের জন্য দুইটি বর্ণের প্রয়োজন কি ?

২। যদি "ঙ"র ন্যায় ইহার প্রকৃত উচ্চারণ হয়, তবে চিরপ্রথানুসারে ইহা স্বরবর্ণের অন্তে সন্নিবিষ্ট আছে কেন ?

৩। যেমন প্রত্যেক বর্গান্তে তাহার উপযোগী একটি অনুনাসিক আছে, সেইরূপ স্বরবর্গের অন্তে তাহাদের উপযোগী একটি অনুনাসিক থাকিবে না কেন ?

৪। কণ্ঠ্যবর্ণ "ক"র সহিত কণ্ঠ্যানুনাসিক "ঙ" যুক্ত হইলে যে একটি যুক্তবর্ণ (ঙ্ক) হয়, তাহাও কণ্ঠ্যবর্ণই থাকে এবং প্রত্যেক বর্গের সম্বন্ধেই এই নিয়ম, সুতরাং স্বরবর্ণের সহিত স্বরানুনাসিক যুক্ত হইলে তাহাও স্বরই থাকা উচিত; কিন্তু অনুস্বারের উচ্চারণ "ঙ"র ন্যায় করিলে অং, ইং ইত্যাদির স্বরত্ব থাকে না। অং যদি "অঁ"র ন্যায় উচ্চারিত হয়, তবে তাহার স্বরত্ব থাকে।

৫। "ঙ"র ন্যায় উচ্চারণ করিলে আমরা যে চলিতকথায় অনুস্বারকে চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ করি, তাহার কোন কারণ দর্শান যায় না।

৬। অনুস্বারের উচ্চারণ যদি চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় হয়, এবং বিসর্গের উচ্চারণ (যাহা আমরা ইহার পর আলোচনা করিব) কেবল একটুকু শক্তিপ্রয়োগমাত্র হয়, তবে এই দুই বর্ণের উচ্চারণ এত সামান্য যে, ইহাদিগকে বর্ণমধ্যে পরিগণিত না করিলেও চলে। বোধ করি এইজন্যই পাণিনি প্রভৃতি ইহাদিগকে বর্ণমধ্যে পরিগণিত করেন নাই। ইহারা স্বরবর্ণে যুক্ত হইয়া তাহাদের উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য

ঘটায় মাত্র, এইজন্য ইহাদিগকে স্বতন্ত্রবর্ণ না বলিয়া উচ্চারণচিহ্নস্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে। যদি অনুস্বার-বিসর্গের উচ্চারণ ঙ এবং হকারের ন্যায় হইত, তাহা হইলে ইহাদিগকে রীতিমত বর্ণমধ্যে পরিগণিত না করার কোন কারণ ছিল না।

তন্ত্রশাস্ত্রের বীজমন্ত্রোদ্ধারে অনুস্বার-স্থলে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হইয়াছে। "কর্পূরং মধ্যমান্ত্যং স্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তম্" শ্লোকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, অনুস্বারস্থলেই চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার হইয়াছে অর্থাৎ অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু এক এবং তাহাদের একই উচ্চারণ। চন্দ্রবিন্দু নামে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ কখনও ছিল না এবং নাই। ইহা অনুস্বারেরই নামান্তর-মাত্র; কিন্তু ভ্রমপ্রযুক্ত অনুস্বারকে "ঙ"র ন্যায় উচ্চারণ করিতে করিতে যখন কোন-স্থলে (ং), কোন স্থলে (ঁ) বিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ করিতে হয়, তখন স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় অনুপায় হইয়া চন্দ্রবিন্দুকে এক স্বতন্ত্রবর্ণরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাকে অনুস্বার বলা যায়, তাহার প্রকৃত নাম বিন্দু। উহাকে চন্দ্রবিন্দু, ইন্দু, বিধু এবং অনুস্বার বলে। প্রথম তিনটিই ইহার স্বাভাবিক এবং প্রকৃত নাম; কারণ তাহারা ইহার আকৃতিসম্ভূত। বিন্দু গোলাকার, চন্দ্রও গোলাকার, আবার চন্দ্রোদয়ে যেমন আকাশ শোভাধারণ করে, স্বরোপরি বিন্দুপ্রয়োগ করিলে স্বরবর্ণও সেইপ্রকার মাধুর্য্য লাভ করে। এইজন্য ইহার নাম চন্দ্রবিন্দু হইয়াছিল; কিন্তু বৈয়াকরণগণ উহাকে বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান করিয়াছেন; উহা স্বরবর্ণের অনুগামী, এইজন্য উহাকে অনুস্বর বা অনুস্বার বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে উহারা উভয়েই এক, এবং উহাদের উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর ন্যায়।

যে কারণে উহার উচ্চারণবৈকল্য ঘটিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়; যেমন যুক্তাক্ষর ইঅ বলিতে বলিতে তাহার উচ্চারণ প্রায় বর্গীয় "জ"র ন্যায় হইয়া উঠে, যেমন ওঅ বলিতে বলিতে তাহার উচ্চারণ প্রায় ব-কারের ন্যায় হইয়া আসে, যেমন অএ বলিতে বলিতে তাহার উচ্চারণ (অই)র ন্যায় হইয়াছে; আর অও বলিতে বলিতে অউ হইয়া পড়িয়াছে, সেইপ্রকার অং-শব্দের চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার অঙ্-শব্দের ন্যায় উচ্চারণ হইয়া উঠে, সেইজন্যই লোকে অনুস্বারের ঐরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যেমন উল্লিখিত য, ব প্রভৃতির উচ্চারণকে তাহাদের শেষপরিণতি জ, ব প্রভৃতিতে আসিতে দেওয়া উচিত নয়, সেইরূপ অনুস্বারের উচ্চারণকেও তাহার শেষপরিণতি "ঙ"তে আসিতে দেওয়া অবিহিত।

[বিসর্গ]—ইহাও স্বর ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয় না, স্বর ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং ইহার স্থানও স্বরবর্ণের পরেই হওয়া উচিত এবং তাহাই চিরপ্রথা। ইহার উচ্চারণ যে "হ"র ন্যায় করি, তাহা ব্যঞ্জন। যদি বিসর্গ আর "হ"র উচ্চারণ এক হইত, তবে কেবল "হ" থাকিলেই হইত, বিসর্গের কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহা কেবল অন্ত স্বরবর্ণকে কিঞ্চিৎ অধিক শক্তি প্রদান করে

মাত্র। অনুস্বার যেমন স্বরবর্ণকে অনুনাসিক উচ্চারণ দিয়া তাহার মাধুর্য্যবিধান করে, বিসর্গও তেমনি স্বরবর্ণে যুক্ত হইয়া তাহাদের সমধিক বল বিধান করে। সংস্কৃতভাষায় যে তেজস্বিতা এবং মাধুর্য্য, তাহা এই অনুস্বার-বিসর্গের উপরই অধিক নির্ভর করে। মনে হয়, যেন ভাষাতে অধিক বল এবং লালিত্য বিধান করার জন্যই এই উচ্চারণচিহ্নদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে সংস্কৃতভাষা এককালে নির্জীব হইয়া পড়ে। সেই শক্তিবৃদ্ধি করিতে যাইয়া পণ্ডিতমহাশয়েরা বিসর্গকে এককালে "হ্" উচ্চারণ করিয়া বসেন।

আমাদের বঙ্গদেশে বিসর্গের উচ্চারণ হলন্ত "হ্"র ন্যায় করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ কাশী ইত্যাদি স্থানে এককালে সম্পূর্ণ "হ"ই উচ্চারণ করিয়া থাকে। বাঙ্লাদেশে রামঃ=রামহ্, পশ্চিমে রামঃ=রামহ। অধুনা বাঙালীরাও পশ্চিমের অনুকরণ করিয়া রামহ্-স্থলে রামহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মনে করেন যে, ইহাতে উচ্চারণের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। বিসর্গশব্দের ধাত্বর্থ বিসর্জ্জনীয়। বোধ করি, ইহাকে বর্ণমালা হইতে বর্জ্জন করা যায়, ইহা ভাবিয়াই পাণিনি ইহাকে স্বর বা ব্যঞ্জন কিছুর মধ্যেই ধরেন নাই। কিন্তু যদি ইহার উচ্চারণ হকারের ন্যায় স্পষ্ট ব্যঞ্জনবৎ হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই ইহাকে বর্জ্জন করিতে পারিতেন না। অতএব বিসর্গের প্রচলিত উচ্চারণ ভ্রমাত্মক। ইহার উচ্চারণ হকারের ন্যায় নহে, ইহা কেবল অন্ত্য স্বরবর্ণের শক্তিবৃদ্ধিকারক চিহ্নবিশেষমাত্র।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, অনুস্বার ও বিসর্গকে বর্ণমধ্যে পরিগণিত না করিয়া স্বরবর্ণের উচ্চারণবিশেষের চিহ্নমাত্র জ্ঞান করিতে হয়। যেমন, 'অপিচ' 'অধুনা' বলিতে অকারের মৃদু উচ্চারণ হয়, আর অশ্ব, অন্ধ বলিতে প্রশস্তোচ্চারণ হয়, তেমনি অং বলিতে অকারের অনুনাসিক উচ্চারণ হয়, এবং অঃ বলিতে অকারের বিশেষশক্তিযুক্ত উচ্চারণ হয়; উক্ত প্রশস্ত ও মৃদু উচ্চারণের কোন চিহ্ন কল্পিত হয় নাই, কিন্তু অনুনাসিক এবং শক্তিযুক্ত উচ্চারণের দুইটি চিহ্ন ব্যবস্থিত হইয়াছে। তাহা বিন্দু ও বিসর্গ,— একটি এক বিন্দু দ্বারা এবং অন্যটি বিন্দুদ্বয় দ্বারা নিষ্পন্ন। ইহাদিগকে উচ্চারণচিহ্ন না বলিয়া ব্যাকরণের টীকাকারগণ বর্ণসংজ্ঞা প্রদান করিয়া নানাপ্রকার গোলযোগে পড়িয়াছেন। প্রথম বলিয়াছেন, ইহারা স্বরও নহে ব্যঞ্জনও নহে, ইহারা অযোগবাহ। আবার বলিয়াছেন, ণত্ববিধিতে ইহারা স্বর, এবং স্বরসন্ধিতে ইহারা ব্যঞ্জন; যথা, ণত্ববিধির সূত্রানুসারে র, ষ, ঋ, এই তিনটি বর্ণের পরে যে অনন্ত্য নকার, তাহা মূর্দ্ধন্য হয় এবং স্বরবর্ণ, হ, য, ব, কবর্গ, পবর্গ ব্যবধানেও হয়। এই বিধানানুসারে বৃংহণশব্দের অনুস্বারকে স্বরবর্ণ না বলিলে তাহার নকার মূর্দ্ধন্য হইতে পারে না। উরঃকেণ শব্দেও সেইপ্রকার বিসর্গকে স্বর না বলিলে ণকার মূর্দ্ধন্য হয় না। অতএব বৃংহণশব্দের অনুস্বারকে স্বরবর্ণ মানিতে হইল। কিন্তু আবার দেখুন, যদি বৃংহণশব্দের অনুস্বারকে স্বর বলি, তবে "ঋকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঋস্থানে র হয়" এই সূত্রানুসারে ব্রংহণ হইয়া পড়ে। অতএব

একটি শব্দের মধ্যেই অনুস্বারকে একবার স্বর, আরবার ব্যঞ্জন বলিতে হয়,—টীকাকারগণ এই দুইটি উচ্চারণচিহ্নকে স্বতন্ত্রবর্ণ জ্ঞান করিয়া সঙ্কটে পড়িয়াছেন। একবার বলেন স্বর, আবার বলেন ব্যঞ্জন, আবার বলেন অযোগবাহ।

বাস্তবিক বৈয়াকরণগণ অনুস্বার-বিসর্গকে বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; যদি করিতেন, তবে ণত্ববিধানের সূত্রে "স্বরবর্ণ, হ য, ব, কবর্গ, পবর্গ ব্যবধানে"র স্থলে "স্বরবর্ণ, অযোগবাহ, হ, য, ব, কবর্গ, পবর্গ ব্যবধানে" বলিলেই সকল গোলযোগ নিরাকৃত হইত। স্বরসন্ধির সূত্রেও সেইরূপ অযোগবাহের উল্লেখ করিলেই আর কোন গোল থাকিত না। এইরূপ করা অতি সহজসাধ্য হইলেও যখন তাঁহারা তাহা করেন নাই, তখনই জানিতে হইবে যে, তাঁহারা এই দুইটি উচ্চারণচিহ্নকে বর্ণ বলিয়াই ধরেন নাই। বাস্তবিক ইহারা স্বরবর্ণের উচ্চারণবিশেষের চিহ্নমাত্র, ইহারা বর্ণ নহে, এবং তাহা বলিলেই উল্লিখিত সকল গোল নিষ্কাসিত হইয়া যায়। আর ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ কি, তাহাও লোকে সহজে বুঝিতে পারে।

এই অনুস্বার-বিসর্গের উচ্চারণদোষে এত ক্ষতি হইয়াছে যে, ইহাতে আমাদের লিখিত অর্থাৎ সংস্কৃতভাষা এবং কথিত অর্থাৎ বাঙ্‌লাভাষাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতভাষার অর্দ্ধাধিক শব্দ অনুস্বারবিসর্গযুক্ত; সুতরাং তাহাদের উচ্চারণ যদি দূষিত হয়, তবে উক্ত ভাষার প্রায় সকল শব্দই অশুদ্ধোচ্চারিত হয় এবং কাজেই বাঙ্‌লার সহিত তাহার অত্যন্ত অসাদৃশ্য ঘটে।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

গোয়ালিখন্দ।

১

দিল্লীশ্বর হইয়া শেরশাহ একবারমাত্র বাঙ্‌লায় আসিয়াছিলেন। মুঙ্গের তাঁহার উন্নতিসোপানের প্রথম ধাপ, অতএব জাহ্নবীস্রোতোবিধৌত দুর্জ্জয়-শৈলপ্রাকার-পরিবেষ্টিত মুদ্গলপুরীকে চিরদিন তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই দিল্লীর তক্তে বসিয়া বিদ্রোহদমনজন্য বাঙ্‌লায় আসিতে মুঙ্গেরদুর্গে সপ্তাহখানেক শেষ বাস করিয়াছিলেন।

তখন বৈশাখমাস, মৃগয়ার সময়। সুবাদার তাহার আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। প্রভাতে প্রস্তুত হইয়া বাদশাহ বহিরঙ্গণে আসিলে তাঁহার জন্য সুসজ্জিত শিকারী হস্তিসমূহ মাহুতদের ইঙ্গিতে নতজানু এবং ঊর্দ্ধশুণ্ড হইয়া যুগপৎ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। অদূরে ঘোটকশ্রেণী এবং উষ্ট্রের দল রাজাধিরাজের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল,—তাঁহার প্রিয় অশ্ব

প্রভুকে করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে দেখিয়া ঈর্ষায় হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। শেরশাহ ইহা লক্ষ্য করিলেন। হাওদায় উঠিয়া উপবেশন না করিয়াই করিরক্ষকের দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন—"ফিলোয়ান, বালাগাম দে!" মাহুত তাহার কাজে বুড়া হইয়াছে, কিন্তু হস্তিসম্বন্ধে এরূপ হস্তিমূর্খতা আর কখন দেখে নাই। ইহা কি সম্ভব, দুনিয়ার মালিক ঘোড়্‌কুলপতি শেরশাহ আর কখন গজপৃষ্ঠ সুশোভিত করেন নাই? সাতপাঁচ ভাবিয়া করজোড়ে সে জনাবআলীকে জানাইল যে, হাতীর লাগাম হয় না, তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্ত আল্লা আকবর ফিলোয়ানজাতি এবং "আঁকুশ"-নামক আয়ুধের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই এত্তালা শেষ করিয়া অপ্রস্তুতভাবে সে অঙ্কুশ উঠাইয়া শাহনশাহের অপ্রসন্ন-দৃষ্টি-সমক্ষে ধরিল। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"য়্যায়্‌সা বেএক্তিয়ার সওয়ারি মৈ নেহী কর্‌ সক্‌তা হুঁ!" তখন হুকুমে হস্তী আবার বসিল। বাদশাহ অবতরণের জন্ত সোপানের অপেক্ষা না করিয়া লম্ফ দিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন এবং ঘোটকারোহণ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেলেন। শিকারীর দল এবং শরীররক্ষকেরা এই আকস্মিক খেয়ালের জন্ত প্রস্তুত ছিল না। যথাসম্ভব সত্বর হইলেও তাহাদের ভিতর একজনও বাদশাহের সঙ্গ লইতে পারিল না।

"য়্যায়্‌সা বেএক্তিয়ার সওয়ারি মৈ নেহী কর্‌ সক্‌তা হুঁ!" শেরশাহ চকিতে অশ্বপৃষ্ঠে লাফাইয়া উঠিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখনিঃসৃত এই বাণী দুর্গপ্রাঙ্গণে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাজারগল্পের বিষয়ীভূত হইল। কেহ বলিল, "সত্যই ত, অমন হুঁসিয়ার না হইলে আজ পাঠান দুনিয়ার মালিক হইতে পারিত না।" অন্যে কহিল, "দেখিলে বাদশাহী নজর আর মর্জী, কথায় বলে আসমানজমীন ফারাক্‌!" যাহারা চুপিচুপি বক্তব্য সংযমিত করিতেছিল, তাহাদের মনের ভাবখানা কতকটা এইরূপ:—"বাপ্‌রে দেমাক্‌ দেখ! নাসেরামের জায়গীরগন্ধ এখনও তক্ততাউসের খোস্‌বুয়ে লোপ করিতে পারে নাই!" বলা বাহুল্য, বাদশাহের অনুচরবর্গমধ্যেও শিকারের পথে সেদিন এই তিন-প্রকারের সমালোচনা চলিয়াছিল।

সেখপুরাপর্ব্বতের সানুদেশবর্ত্তী নিবিড় বনমধ্যে মৃগয়ার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হস্তী অশ্ব এবং উষ্ট্রারোহী অনুচরবর্গ ক্রমে ক্রমে সেখানে নির্দ্দিষ্ট শিবিরমধ্যে সমবেত হইলেন। কিন্তু বাদশাহের দেখা নাই। কেহ তাঁহার কোন খবর দিতে পারিতেছিল না। কেবল মিঞা সুলেমান পথে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন যে, বাদশাহের ঘোড়ার ডাক বদল হইয়াছে। সহিস সওয়ার চিনিতে পারে নাই বুঝিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, শেরশাহ পথিমধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

২

বেহারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় যদি দেখিতে চাও, চৈত্র-বৈশাখের প্রভাতে গণ্ডশৈলমালার প্রত্যন্তদেশে বায়ুসেবনে বাহির হইও। তথায় বিস্তীর্ণ তালীবন-চ্ছায়ায়, অরুণপুষ্পিত পলাশবৃক্ষরাজির

অবকাশপথে এবং পত্রশূন্য কদাচিৎ নব-কিসলয়খচিত পুষ্পভারানত মহুয়াগাছের নীচে শান্তি এবং মাধুর্য্যের সমাবেশ দেখিতে পাইবে।

বাদশাহ এই অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু তখন আর তাঁহার রাজবেশ ছিল না।

মিঞা সুলেমান ঠিক ধরিয়াছিলেন। ছদ্মবেশে বেড়াইয়া প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখা শেরের অভ্যাস ছিল এবং সেইজন্য পথিমধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে বেশভূষা-পরিবর্ত্তনের উপায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। ফলত এইরূপে এদেশের যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তদীয় ভূমিসংক্রান্ত বন্দোবস্ত এবং লোকহিতকর নানা কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

অনুচরদের এড়াইবার জন্য বাদশাহ জঙ্গল পার হইয়া অপথে অশ্বচালনা করিতে-ছিলেন। গ্রাম দেখিলেই গতিবেগ সংযত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন এবং "খড়ি-হানে" উপনীত হইয়া লোকের শস্যসংগ্রহ ও তাহার বণ্টন পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহারা তাঁহাকে সামান্য সিপাহী ভাবিয়া মামুলি সেলামমাত্র করিতেছিল। চারণরত গোমহিষ-রক্ষক, বিশেষ রাখালের দল দেখিলে শেরশাহ তাহাদের সঙ্গে পরিচয় না করিয়া ছাড়িতে-ছিলেন না, আর মহুয়াকুঞ্জ দেখিলেই তাহার অদূরে ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে পুষ্পচয়ন-রত মহিলাদের সুখদুঃখের গল্প শুনিয়া আমোদিত হইতেছিলেন। এইরূপে তিনি গোয়ালন্দ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন।

ক্রমে রৌদ্র ফুটিয়া উঠিতেছিল এবং প্রখর পশ্চিমবায়ু প্রভাতমলয়ের স্থান অধিকৃত করিতেছিল।

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিয়া বাদশাহ পাহাড়সন্নিহিত বৃক্ষবাটিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, অশ্বটিরও কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যা আবশ্যক। উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ তাহার উপর ক্রমশ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব বেগে অশ্বচালনা করিয়া তিনি লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় ছায়াচ্ছন্ন প্রকাণ্ড-বটবৃক্ষতলে গোমহিষেরা বিশ্রাম করিতে-ছিল, রাখালেরা তাহার আভূমিপ্রণত শাখায়-প্রশাখায় এবং দোদুল্যমান জটাজালে বসিয়া-বসিয়া ঝুলন-উৎসবে মাতিয়াছিল। সহসা একজন সিপাহীকে সেভাবে সেখানে আসিতে দেখিয়া তাহারা ভয়চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বাদশাহ অভয় দিয়া একজনকে ঘোড়া টহলাইতে প্রবৃত্ত করাইলেন। আর একজন তাঁহাকে অদূরে ইঁদারার ধারে লইয়া চলিল। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন যে, সেখপুরা-বস্তিতে ইহাদের বাস এবং পাহাড় ঘুরিয়া গ্রামে যাইতে হয়।

ইঁদারার অনতিদূরে অশ্বত্থগাছের নিবিড় ছায়াতলে একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া-বসিয়া রাশীকৃত মহুয়াফুল শুকাইতেছিল। তাহার সমক্ষে, যতদূর দৃষ্টি চলে, মহুয়াগাছের সারি প্রবল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে এবং যুবতী ও বালিকারা ডালাহস্তে তাহা চুনিয়া লইতেছে। রাখালবালক দূর হইতে স্ত্রীলোকটিকে "নানী" সম্বোধন করিল এবং

ছুটিয়া-গিয়া পথিকটিকে দেখাইয়া বলিল, সে জলপান করিতে চায়। বাদশাহ তাহার প্রকোষ্ঠে কাঁসার গহনার বাহুল্য এবং দেহের প্রায় সর্ব্বত্র উল্‌কির ছাপের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বুঝিলেন যে, মহিলাটি গোপাঙ্গনা। পিপাসার্ত্ত পথিক দেখিয়া সে দৌহিত্রকে ফুলের কাছে বসাইল এবং পরমযত্নে, যতক্ষণ তাঁহার প্রয়োজন, স্মিতমুখে জল তুলিয়া দিল। শেরশাহ দেখিলেন, কূপটি বৃহৎ, কিন্তু সংস্কারাভাবে জীর্ণ. তাহার তিনদিকে পরিখাকারে গোমহিষাদির জলপানের জন্য চৌবাচ্ছার সমাবেশ আছে। গোয়ালিনী পরিষ্কার জলে তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কাক এবং শুকপক্ষীরা মহুয়াফুলের দিকে গেলে সে তাড়না করিতেছে বটে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া চৌবাচ্ছার দিকে আসিলে কিছু বলিতেছে না। আগন্তুকের সঙ্গে ঘোড়া আছে শুনিয়া সে তাহাকে জলপান করাইবার জন্য রাখালদের ডাকিয়া বলিয়া দিল। তাহার আদেশে অনেকে ঝুলনযাত্রার লোভ সংবরণ করিয়া ছুটিয়া পাহাড়ের ঝরণার দিকে গেল এবং দেখিতে দেখিতে জলজ কোমল তৃণরাশি অপরিচিত শ্রান্তক্লান্ত পথিকের অশ্বটির সম্মুখে স্থাপন করিল। বাদশাহ দেখিলেন, মানুষ এবং মূকজীবের সেবাশুশ্রূষার এই মলিনবসনা রমণীর সমান যত্ন। তিনি তাহার মূর্ত্তিতে একটি স্নিগ্ধ মাতৃভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইলেন। বাস্তবিক তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলেন যে, তাহার সহজ সরলভাবটুকু বরাবর অটুট রহিল। গ্রাম্য স্ত্রীলোক আতিথ্যসৎকারের সময় সিপাহীকেও ভয় করে না, ইহা পূর্ব্বে তাঁহার জানা ছিল না।

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া রমণী যখন জানিতে পারিল, পথিক প্রাতঃকাল হইতে রৌদ্রে-রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত তাঁর আহারাদি হয় নাই, তখন সে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে ত্বরিতপদে বটতলায় গিয়া স্বহস্তে গাভী দোহন করিয়া আনিল এবং ডালায় রক্ষিত গুড় ও ভিজা ছোলা পলাশপত্রপুটে সাজাইয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিল। বাদশাহ এই অনুরোধ মাতৃআজ্ঞাবৎ পালন করিলেন; তখন সুস্থ হইয়া গোপকন্যার বিস্তৃত কম্বলাসনে বসিয়া শীতল বৃক্ষচ্ছায়াতলে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

তিনি দেখিতে লাগিলেন, গোয়ালিনীর শ্রমের তিলেক বিরাম নাই। আতিথ্যসৎকার শেষ করিয়া সে মহিষগুলিকে কূপের ধারে উঠাইয়া আনিল এবং জলপান করাইয়া লোটায় জল তুলিয়া তাহাদের প্রত্যেককে সযত্নে স্নান করাইল। এই সকল কাজ শেষ করিতে মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত প্রখরতা মন্দীভূত হইয়া আসিল।

তখন বাদশাহ মৃগয়াশিবিরে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গোয়ালিনীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "মায়ি, তোমার পরিচর্য্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। কি উপকার তোমার করিতে পারি?"

গোপরমণী লজ্জিত হইয়া কহিল, "সামান্য একটু জল তুলে দিইচি বই ত নয় বাবা! ও ত রোজ আমি করি। ওর জন্য অত কথা কেন বল্‌চো?"

শেরশাহ তবু ছাড়েন না। তখন গোপাঙ্গনা তাঁহাকে জানাইল, ঠাকুরের কৃপায় তার কোন অভাব নাই। তিনি তার গৃহ ধান্তে, মহয়ায়, গোমহিষে পূর্ণ রাখিয়াছেন। কোন উপকারে তাহার প্রয়োজন নাই।

বাদশাহের সহিত গোয়ালিনীর এই কথোপকথনের অবসরে সুবাদার মিঞা সুলেমান স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে কুর্ণিশ করিলেন। তখন আর ছদ্মবেশ অসম্ভব জানিয়া শেরশাহ গোপাঙ্গনাকে বলিলেন, "মায়ি, আমি তোর মুল্লুকের বাদশাহ। কি উপকার করিতে পারি বল্।"

সুবাদারের রাজবেশ ও কুর্ণিশ দেখিয়া গোপকন্যার একটু ভয় হইয়াছিল। সে ঈষৎ উত্তেজিত হইল। অপেক্ষাকৃত কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মায়া, উপকার যদি নিতান্তই করিবে, এই পাহাড় কাটাইয়া আমার বস্তিতে যাইবার সোজা রাস্তা বানাইয়া দেও। ধুর জানোয়ার লইয়া রোজ ঘুরিয়া যাইতে বড় কষ্ট!"

শেরশাহ মিঞা সুলেমানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে। আচ্ছা মায়ি, আমি চলিলাম। যদি কখন কোন মুস্কিলে পড়, বাদশাহকে জানাইও।"

রাজাধিরাজ তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বিলম্ব করেন নাই। সেখপুরাগ্রামের পার্ব্বত্যপথ এইরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। লোকে তাহাকে "গোয়ালিখন্দ" বলিয়া জানে। শেরশাহ তাহাতে নিজের নাম যোগ করিতে দেন নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ধম্মপদং।

ধম্মপদং।—অর্থাৎ ধম্মপদনামক পালিগ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, "ধম্মপদং" তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধম্মপদগ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, অন্তত এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাংলা অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন।

এস্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক-

দিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশ এম্‌নি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া আপনার করিয়া, সুসম্বদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন,—যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহার-যোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব, ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহতমূর্ত্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদগ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেম্‌নি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধম্মপদে, কি গীতায়, এমন অনেক কথাই আছে, ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন, এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক্ হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি—সেইজন্য ধম্মপদং-গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংস্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পাড়িয়াছি।

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেম্‌নি সকল দেশের ইতিহাস একভাবের হইতেই পারে না, এ কথা আমরা পূর্ব্বে অন্যত্র কোথাও বলিয়াছি। এইজন্য, যখন আমরা বলি যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মেলে না, তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে য়ুরোপীয়ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন্ কোনো-দিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং এদেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোনো আগ্রহ জন্মে নাই।

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা-মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে;—তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত আমা-দিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্ব্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড় বড় বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ির যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বা-পেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কি লইয়া? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম্ম লইয়া।

কিন্তু ধর্ম্ম কি, তাহা লইয়া তর্কের সীমা নাই—এবং ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বাহ্যরূপ যে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্ত্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না। শৈশব হইতে যৌবনের পরিবর্ত্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বহুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।

য়ুরোপীয় নেশন্‌গণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য।

য়ুরোপে ধর্ম্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা সর্ব্বাঙ্গীণভাবে কাজ করিয়াছে। ধর্ম্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; যেখানে দৈবক্রমে তাহা হয় নাই, সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গেছে।

আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজির ধর্ম্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব, দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।

পলিটিক্স্‌ এবং নেশন্‌ কথাটা যেমন য়ুরোপের কথা, ধর্ম্মকথাটাও তেম্‌নি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিক্স্‌ এবং নেশন্‌ কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না, তেম্‌নি ধর্ম্মশব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয়ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এইজন্য ধর্ম্মকে ইংরিজি রিলিজন্‌রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেকসময়ে ভুল করিয়া বসি। এইজন্য, ধর্ম্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য, এ কথা বলিলে তাহা অস্পষ্ট শুনাইবে।

মানুষ মুখ্যভাবে কোন্‌ ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে, তাহাই তাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয়। লাভ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়,—কল্যাণ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে, টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আসে, সেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়—যে ব্যক্তি লোভকেই মানে, তাহার পক্ষে ঐ সকল বাধার অস্তিত্ব নাই।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব? অন্তত ভারতবর্ষ লোভের চেয়ে কল্যাণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে কি বুঝিয়া মানিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা, তাহার ভালমন্দ কর্ম্ম কিছুই নাই। আত্ম-অনাত্মের যোগে ভালমন্দ সকল কর্ম্মের উদ্ভব। অতএব

গোড়ায় এই আত্ম-অনাত্মের সত্যসম্বন্ধনির্ণয় আবশ্যক। এই সম্বন্ধনির্ণয় এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা, ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে ভিন্নভিন্নরূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে একজায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক্ হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, আত্ম-অনাত্মের মধ্যে কোনো সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার মূলে অবিদ্যা।

কিন্তু যদি এক ছাড়া দুই না থাকে, তবে ত ভালমন্দের কোনো স্থান থাকে না। কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে দুই করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ার চক্রে পড়িয়া দুঃখের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মের ভালমন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, এই যে সংসার আবর্ত্তিত হইতেছে, আমরা বাসনার দ্বারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি ও দুঃখ পাইতেছি—এক কর্ম্মের দ্বারা আর এক কর্ম্ম এবং এইরূপে অন্তহীন কর্ম্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া চলিতেছি—এই কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হওয়াই মানুষের একমাত্র শ্রেয়।

কিন্তু তবে ত সকল কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। কর্ম্মকে এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হয়, যাহাতে কর্ম্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন্ কর্ম্ম শুভ, কোন্ কর্ম্ম অশুভ, তাহা স্থির করিতে হইবে।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জগৎসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মূলে তাঁহার প্রেম,—তাঁহার আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

এই সার্থকতার উপায়ও পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে খর্ব্ব করিতে না পারিলে ভগবানের ইচ্ছাকে অনুভব করা যায় না। ভগবানের ইচ্ছার মধ্যেই নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্ম্মের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাঁহারা অদ্বৈতানন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাও বাসনামোহকে ছেদন করিতে উদ্যত; যাঁহারা কর্ম্মের অনন্তশৃঙ্খল হইতে মুক্তিপ্রার্থী, তাঁহারাও বাসনাকে উৎপাটিত করিতে চান; ভগবানের প্রেমে যাঁহারা নিজেকে সম্মিলিত করাই শ্রেয় জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে

তত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম বা যতই স্থূল হউক্, সে তত্ত্বকে কাজের মধ্যে অনুসরণ করিতে হইলে যতদূর পর্য্যন্তই যাওয়া যাক্, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া সেই তত্ত্বকে কর্ম্মের দ্বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনো বড় কথাকে অসাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসঙ্গত বোধে কোনোদিন ভীরুতাবশত কথার কথা করিয়া রাখেন নাই। এইজন্য একসময়ে যে ভারতবর্ষ মাংসাশী ছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ প্রায় সর্ব্বত্রই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যে য়ুরোপ জাতিগত সমুদয় পরিবর্ত্তনের মূলে সুবিধাকেই লক্ষ্য করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কৃষির ব্যাপ্তিসহকারে ভারতবর্ষে আর্থিক-কারণে গোমাংসভক্ষণ রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধানসত্ত্বেও অন্য সকল মাংসাহারও, এমন কি, মৎস্য-ভোজনও ভারতবর্ষের অনেকস্থান হইতেই লোপ পাইয়াছে। কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন করিয়া পালিত হইতেছে যে, তাহা সুবিধার তরফ হইতে দেখিলে নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিয়া থাকিবার জো নাই।

যাহাই হউক, তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ কর্ম্মকেও ততদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেছে। ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্ম্মের ভেদ সাধন করে নাই। এইজন্য আমাদের দেশে কর্ম্মই ধর্ম্ম। আমরা বলি, মানুষের কর্ম্মমাত্রেরই চরমলক্ষ্য কর্ম্ম হইতে মুক্তি—এবং মুক্তির উদ্দেশে কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাক্, কর্ম্মে আমাদের ঐক্য আছে। অদ্বৈতানুভূতির মধ্যেই মুক্তি বল, আর গতসংস্কার নির্ব্বাণবাসনার মধ্যেই মুক্তি বল, আর ভগবানের অপরিমেয় প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বল—প্রকৃতিভেদে যে মুক্তির আদর্শই যাহাকে আকর্ষণ করুক্ না কেন, সেই মুক্তিপথে যাইবার উপায়গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নয়, সমস্ত কর্ম্মকেই নিবৃত্তির অভিমুখ করা। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম্ম তেমনি কর্ম্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে-পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

য়ুরোপ কর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপে কর্ম্মসংগ্রামের অন্ত নাই—সেখানে কর্ম্ম ক্রমশই বিচিত্র ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে, কৃতকার্য্য হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য। য়ুরোপের ইতিহাস কর্ম্মেরই ইতিহাস।

য়ুরোপ কর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্ম্মকরাসম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে। আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিব—সেই স্বাধীন ইচ্ছা যেখানে অন্যের কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে, কেবল সেইখানেই আইনের প্রয়োজন। এই আইনের শাসন ব্যতিরেকে সমাজের প্রত্যেকের যথাসম্ভব

স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্য য়ুরোপীয়সমাজে সমস্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কর্ম্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি, আমরা যাহাকে সংসার বলি, সেখানে কর্ম্মই বস্তুত কর্ত্তা, মানুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর এক বাসনাকে, এক কর্ম্ম হইতে আর এক কর্ম্মকে বহন করিয়া চলি—হাঁফ ছাড়িবার সময় পাই না—তাহার পরে সেই কর্ম্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া-দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।

এই লক্ষ্যের পার্থক্য থাকাতেই য়ুরোপ বাসনাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং আমরা বাসনাকে যথাসম্ভব খর্ব্ব করিয়াছি। বাসনা যে কোনোদিনই শান্তিতে লইয়া যায় না,—পরিণামহীন কর্ম্মচেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া রাখে, ইহাকেই আমরা বাসনার দৌরাত্ম্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি—য়ুরোপ বলে, বাসনা যে কোনো পরিণামে লইয়া যায় না, তাহা নিয়তই যে আমাদের প্রয়াসকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে, ইহাই তাহার গৌরব। য়ুরোপ বলে—প্রাপ্তি নহে, সন্ধানই আনন্দ। ভারতবর্ষ বলে—তোমরা যাহাকে প্রাপ্তি বল, তাহাতে আনন্দ নাই বটে; কারণ, সে প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সন্ধানের শেষ নাই। সে প্রাপ্তি আমাদিগকে অন্য প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলিয়া ভ্রম করি এবং তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহা পরিণাম নহে। যে প্রাপ্তিতে আমাদের শান্তি, আমাদের সন্ধানের শেষ, এই ভ্রমে তাহা হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করে, আমাদিগকে কোনোমতেই মুক্তি দেয় না। যে বাসনা সেই মুক্তির বিরোধী, সেই বাসনাকে আমরা হীনবল করিয়া দিব। আমরা কর্ম্মকে জয়ী করিব না, কর্ম্মের উপরে জয়ী হইব।

আমাদের গৃহধর্ম্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়মসংযম, আমাদের বৈরাগী ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছে—আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি বুদ্ধিপূর্ব্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তহীন আবর্ত্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য।

সংস্কৃতভাষায় ভবশব্দের ধাতুগত অর্থ হওয়া। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। য়ুরোপ খুব করিয়া হইতে চায়—আমরা একেবারেই না হইতে চাই।

এমনতর ভয়ঙ্কর স্বাধীনতার চেষ্টা ভাল কি মন্দ, তাহার মীমাংসা করা বড় কঠিন। এরূপ নিরাসক্তি যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, আসক্ত লোকের সংঘাতে তাহাদের বিপদ্ ঘটিতে পারে, এমন কি, তাহাদের মারা যাইবার কথা। অপরপক্ষে বলিবার কথা এই যে,

মরা-বাঁচাই সার্থকতার চরমপরীক্ষা নয়। ফ্রান্স তাহার ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীনতার বিশেষ একটি আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই চেষ্টায় প্রায় তাহার আত্মহত্যার জো হইয়াছিল—যদিই সে মরিত, তবু কি তাহার গৌরব কম হইত? একজন মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় একটা লোক প্রাণ দিল—আর একজন তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল—তাই বলিয়া কি উদ্ধারচেষ্টাকে মৃত্যুপরিণামের দ্বারা বিচার করিয়া ধিক্কার দিতে হইবে? পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কর্ম্মের দৌরাত্ম্যকে উৎকট করিয়া তুলিতেছে; আজ ভারতবর্ষ যদি—জড়ভাবে নহে, মূঢ়ভাবে নহে—জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবন্ধমুক্তির আদর্শকে, শান্তির জয়পতাকাকে এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের উর্দ্ধে অবিচলিত দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত, তবে অন্য সকলে তাহাকে যতই ধিক্কার দিক্, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।

কিন্তু এ তর্ক এখানে বিস্তার করিবার স্থান নহে। মোট কথা এই, য়ুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না, এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীতভবিষ্যৎ বিধৃত, তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা, আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসাই কেবল গবর্মেণ্টের দ্বারে ভিক্ষাকার্য্যের মধ্যেই আবদ্ধ—আর কোনো দিকেই তাহার কোনো গতি নাই? সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কাণা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণযুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধম্মপদংগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি, তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইবেন না। একে একে বৌদ্ধশাস্ত্রসকলের অনুবাদ বাহির করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কলঙ্কমোচন করিবেন।

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায়-কথায় মিলাইয়া করিলেই ভাল হয়—যেখানে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবে,

সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে, তবে অন্যায় হয়—কারণ, ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে—এইজন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করি। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। মূলে আছে—

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া—

চারুবাবু ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন:—"মনই ধর্ম্মসমূহের পূর্ব্বগামী, মনই ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়।" যদি মূলের কথাগুলিই রাখিয়া লিখিতেন—"ধর্ম্মসমূহ মনঃপূর্ব্বঙ্গম, মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়", তবে মূলের অস্পষ্টতা লইয়া পাঠকগণ অর্থ চিন্তা করিতেন। "মনই ধর্ম্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" বলিলে ভাল অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাখা উচিত।

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি॥

ইহার অনুবাদে আছে:—"আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়।"

"এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না" বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রকৃত অনুবাদ নহে—বোধ হয় "যে ইহাতে লাগিয়া থাকে না" বলিলে মূলের অনুগত হইত। অর্থ-সুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না—যথা, "আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা যাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাখে, তাহাদের বৈর শান্ত হয়।"

এই গ্রন্থে মূলের অন্বয়, সংস্কৃত ভাষান্তর ও বাংলা অনুবাদ থাকাতে ইহা পাঠকদের ও ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিলে পালিভাষা-অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

এইখানে বলা আবশ্যক, সম্প্রতি ত্রিবেণী কপিলাশ্রম হইতে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক ধম্মপদং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থখানিও এই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারের সাহায্য করিবে।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৬৭

পরদিন সকালেই কমলা খুড়ামশায়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। যখনি নির্জ্জনে একটু অবকাশ পাইল, অমনি সে শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিল—শৈল কমলের চিবুক ধরিয়া কহিল, "কি বোন্, এত খুসি কিসের?"

কমল কহিল, "আমি জানি না দিদি, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যেন আমার জীবনের সমস্ত ভার চলিয়া গেছে।"

শৈল। বল্ না, সব কথা বল্ না আমাকে! এই ত কাল সন্ধ্যাপর্য্যন্ত আমরা ছিলাম, তার পরে তোর হইল কি?

কমল। এমন কিছুই হয় নাই, কিন্তু আমার কেবলি মনে হইতেছে, আমি যেন তাঁহাকে পাইয়াছি—ঠাকুর যেন আমার 'পরে সদয় হইয়াছেন।

শৈল। তাই হোক্ বোন্, কিন্তু আমার কাছে কিছু লুকুস্‌নে!

কমল। আমার লুকাইবার কিছুই নাই দিদি, কি যে বলিবার আছে, তাও খুঁজিয়া পাই না। রাত পোহাইতেই সকালে উঠিয়া মনে হইল আমার জীবনটা সার্থক—আমার সমস্ত দিনটা এমন মিষ্ট, আমার সমস্ত কাজ এমন হাল্কা হইয়া গেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি ইহার চেয়ে আর বেশি কিছুই চাই না—কেবল ভয় হয় পাছে এটুকু নষ্ট হয়—আমি যে প্রতিদিন এমন করিয়া দিন কাটাইতে পারিব, আমার ভাগ্য যে এত প্রসন্ন হইবে, তাহা আমি মনে করিতেই পারি না।

শৈল। আমি তোকে বলিতেছি বোন্, তোর ভাগ্য তোকে এইটুকু দিয়াই ফাঁকি দিবে না—তোর যাহা পাওনা আছে, তার সমস্তই শোধ হইবে।

কমল। না না দিদি, ও কথা বলিয়ো না—আমার সমস্ত শোধ হইয়াছে—আমি বিধাতাকে কোনো দোষ দিই না—আমার কোনো অভাব নাই।

এমনসময় খুড়া আসিয়া কহিলেন—"মা, তোমাকে ত একবার বাহিরে আসিতে হইতেছে—রমেশবাবু আসিয়াছেন।"

খুড়া এতক্ষণ রমেশের সঙ্গেই কথা কহিতেছিলেন। রমেশকে বলিতেছিলেন, "আপনার সঙ্গে কমলার কি সম্বন্ধ, তাহা আমি সমস্তই জানিয়াছি। এখন আপনার

প্রতি আমার পরামর্শ এই যে—আপনার জীবন এখন পরিষ্কার হইয়া গেছে, এখন আপনি কমলার সমস্ত প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করুন। কমলাসম্বন্ধে যদি কোনো গ্রন্থি কোথাও মোচন করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে বিধাতার উপর সে ভার দিন, আপনি আর হাত দিবেন না।”

রমেশ ইহার উত্তরে কহিতেছিলেন—“কমলাসম্বন্ধে সকল কথা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নলিনাক্ষের কাছে সকল ঘটনা না জানাইয়া আমার নিষ্কৃতি হইতেই পারে না। এ পৃথিবীতে কমলার কথা তুলিবার সমস্ত প্রয়োজন হয় ত শেষ হইয়া গেছে, হয় ত শেষ হয় নাই—যদি না হইয়া থাকে, তবে আমার যেটুকু বক্তব্য, সেটুকু সারিয়া ছুটি পাইতে চাই।”

খুড়া কহিলেন, “আচ্ছা, আপনি একটু-খানি বসুন, আমি আসিতেছি।”

রমেশ ঘুরিয়া বসিয়া জানলা হইতে শূন্যদৃষ্টিতে লোকপ্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিলেন—কিছুক্ষণ পরেই পায়ের শব্দে সতর্ক হইয়া দেখিলেন, একটি রমণী ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। যখন সে প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন রমেশ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—“কমলা!” কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়া কহিলেন, “রমেশবাবু, কমলার সমুদয় দুঃখকে সৌভাগ্যে পরিণত করিয়া ঈশ্বর তাহার চারিদিক্ হইতে সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাকে পরম সঙ্কটের সময় যেমন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, তাহার জন্ত যে বিষম দুঃখ আপনাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাতে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদনের সময় কোনো কথা না বলিয়া কমলা বিদায় লইতে পারে না। আপনার কাছে ও আজ আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছে।”

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সবলে রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল—“তুমি সুখী হও কমলা—আমি না জানিয়া এবং জানিয়া তোমার কাছে যা-কিছু অপরাধ করিয়াছি, সব মাপ করিয়ো।”

কমলা ইহার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না—দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, “যদি কাহাকেও কিছু বলিবার জন্ত, কোনো বাধা দূর করিবার জন্ত, আমাকে তোমার প্রয়োজন থাকে ত বল।”

কমলা জোড়হাত করিয়া কহিল, “আমার কথা কাহারো কাছে বলিবেন না, আমার এই মিনতি রাখিবেন।”

রমেশ কহিল—“অনেকদিন তোমার কথা কাহারো কাছে বলি নাই—খুব গোলমালে পড়িলেও চুপ করিয়া কাটাইয়াছি। অল্পদিন হইল যখন মনে করিয়াছিলাম, তোমার কথা বলিলে তোমার কোনো ক্ষতি হইবে না, তখনি কেবল একটি পরিবারের কাছে তোমার কথা প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতেও বোধ হয় তোমার অনিষ্ট না হইয়া ভালই হইতে পারে। খুড়ামশায় বোধ হয় খবর পাইয়া থাকিবেন—অন্নদাবাবু, যাঁহার মেয়ের সঙ্গে—”

খুড়া কহিলেন—“হেমনলিনী! জানি বৈ কি! তাঁহারা সব শুনিয়াছেন?”

রমেশ কহিলেন—"হাঁ। তাঁহাদের কাছে আর কিছু বলা যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি যাইতে পারি—কিন্তু আমার আর ইচ্ছা নাই—আমার অনেক সময় গেছে এবং আরো আমার অনেক গেছে, এখন আমি মুক্তি চাই—হাতনাগাদ সমস্ত দেনাপাওনা শোধ করিয়া দিয়া এখন বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।"

খুড়া রমেশের হাত ধরিয়া সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, "না রমেশবাবু, আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। আপনাকে অনেক বহন করিতে হইয়াছে, এখন ভারমুক্ত হইয়া নিজেকে স্বাধীনভাবে চালনা করুন্, সুখী হউন্, সার্থক হউন্, এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

যাইবার সময় রমেশ কমলার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি তবে চলিলাম।"

কমলা কোনো কথা না কহিয়া আর একবার ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া রমেশকে প্রণাম করিল।

রমেশ পথে বাহির হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, "কমলার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল, দেখা না হইলে, এ পালাটা ভাল করিয়া শেষ হইত না। যদিও ঠিক জানিলাম না, কমলা কি জানিয়া কি বুঝিয়া সে রাত্রে হঠাৎ গাজিপুরের বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু ইহা বুঝা গেছে, আমি এখন সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। এখন আমার আবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া,—এখন তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম—আমার আর পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।"

কমলা বাড়ী ফিরিয়া-আসিয়া দেখিল—অন্নদাবাবু ও হেমনলিনী ক্ষেমঙ্করীর কাছে বসিয়া আছে। কমলাকে দেখিয়া ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "এই যে হরিদাসী, তোমার বন্ধুকে তোমার ঘরে লইয়া যাও বাছা! আমি অন্নদাবাবুকে চা খাওয়াইতেছি।"

কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়াই হেমনলিনী কমলার গলা ধরিয়া কহিল—"কমলা!"

কমলা খুব বেশি বিস্মিত না হইয়া কহিল, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে, আমার নাম কমলা?"

হেমনলিনী কহিল, "একজনের কাছে আমি তোমার জীবনের ঘটনা সব শুনিয়াছি; যেমনি শুনিলাম, অমনি তখনি আমার মনে সন্দেহ রহিল না, তুমিই কমলা। কেন যে, তা বলিতে পারি না।"

কমলা কহিল, "ভাই, আমার নাম যে কেহ জানে, সে আমার ইচ্ছা নয়, আমার নিজের নামে একেবারে ধিক্কার জন্মিয়া গেছে।"

হেমনলিনী কহিল, "কিন্তু ঐ নামের জোরেই ত তোমাকে তোমার অধিকার পাইতে হইবে।"

কমলা মাথা নাড়িয়া কহিল—"ও আমি বুঝি না। আমার জোর কিছুই নাই, আমার অধিকার কিছুই নাই, আমি জোর খাটাইতেই চাই না।"

হেমনলিনী কহিল, "কিন্তু তোমার স্বামীকে তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত

করিবে কি বলিয়া? তোমার ভালমন্দ সবই কি তাঁহার কাছে নিবেদন করিবে না? তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো চলিবে?"

হঠাৎ কমলার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল—সে কোনো উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায়ভাবে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আস্তে আস্তে কমলা মেজের মাদুরের 'পরে বসিয়া পড়িল,—কহিল, "ভগবান্ ত জানেন আমি কোনো অপরাধ করি নাই, তবে তিনি কেন আমাকে এমন করিয়া লজ্জায় ফেলিবেন? যে পাপ আমার নয়, তার শাস্তি আমাকে কেন দিবেন? আমি কেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সব কথা প্রকাশ করিব?"

হেমনলিনী কমলার হাত ধরিয়া কহিল, "শাস্তি নয় ভাই, তোমার মুক্তি হইবে। যতদিন তুমি তোমার স্বামীর কাছে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতেছ, ততদিন তুমি আপনাকে একটা মিথ্যার বন্ধনে জড়িত করিতেছ—তাহা তেজের সহিত ছিঁড়িয়া ফেল, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেনই।"

কমলা কহিল—"আবার পাছে সব হারাই, এই ভয় যখন মনে আসে, তখন সব বল চলিয়া যায়। কিন্তু তুমি যা বলিতেছ, আমি তা বুঝিয়াছি—অদৃষ্টে যা থাকে তা হোক্, কিন্তু তাঁর কাছে আপনাকে লুকানো আর চলিবে না—তিনি আমার সবই জানিবেন।"—এই বলিতে বলিতে সে আপনার দুই হাত দৃঢ়বলে বদ্ধ করিল।

হেমনলিনী সকরুণচিত্তে কহিল, "তুমি কি চাও,—আর কেহ তোমার কথা তাঁহাকে জানায়?"

কমলা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না না, আর কাহারো মুখ হইতে তিনি শুনিবেন না—আমার কথা আমিই তাঁহাকে বলিব—আমি বলিতে পারিব।"

হেমনলিনী কহিল—"সেই কথাই ভাল। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কি না, জানি না। আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবে?"

হেমনলিনী কহিল—"কলিকাতায়। তোমাদের সকালে কাজকর্ম্ম আছে—আমরা আর দেরি করিব না। আমি তবে আসি ভাই। বোন্‌কে মনে রাখিয়ো।"

কমলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"আমাকে চিঠি লিখিবে না?"

হেমনলিনী কহিল—"আচ্ছা, লিখিব।"

কমলা কহিল—"কখন্ কি করিতে হইবে, আমাকে তুমি উপদেশ দিয়া লিখিয়ো; আমি জানি, তোমার চিঠি পাইলে আমি বল পাইব।"

হেমনলিনী একটু হাসিয়া কহিল—"আমার চেয়ে ভাল উপদেশ দিবার লোক তুমি পাইবে, সেজন্যে কিছুই ভাবিয়ো না।"

আজ হেমনলিনীর জন্য কমলা মনের মধ্যে বড়ই একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কি-একটা ভাব ছিল; যাহা দেখিয়া কমলার চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল। কিন্তু হেমনলিনীর কেমন-একটা দূরত্ব আছে—তাহাকে কোনো কথা বলা যেন চলে না,

তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা-কি রাখিয়া গেল, যাহা বিলীয়মান গোধূলির মত অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।

গৃহকর্ম্মের অবকাশকালে আজ সমস্তদিন কেবলি হেমনলিনীর কথাগুলি এবং তাহার শান্ত-সকরুণ চোখের দৃষ্টি কমলার মনকে আঘাত দিতে লাগিল। কমলা হেমনলিনীর জীবনের আর কোনো ঘটনা জানিত না—কেবল জানিত, নলিনাক্ষের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া ভাঙিয়া গেছে। হেমনলিনী তাহাদের বাগান হইতে আজ একসাজি ফুল আনিয়া দিয়াছিল। বৈকালে গা ধুইয়া আসিয়া কমলা সেই ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিতে বসিল। মাঝে একবার ক্ষেমঙ্করী আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আহা মা, আজ হেম যখন আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, আমার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, বলিতে পারি না। যে যাই বলুক্, হেম মেয়েটি বড় ভাল। আমার এখন কেবলি মনে হইতেছে, উহাকে যদি আমাদের বউ করিতাম ত বড় সুখের হইত। আর একটু হইলেই ত হইয়া যাইত—কিন্তু আমার ছেলেটিকে ত পারিবার জো নাই—ও যে কি ভাবিয়া বাঁকিয়া বসিল, তা সে ঐ জানে!"

শেষকালে তিনিও যে এই বিবাহের প্রস্তাবে বিমুখ হইয়াছিলেন, সে কথা ক্ষেমঙ্করী আর মনের মধ্যে আমল দিতে চান না।

বাহিরে পায়ের শব্দ শুনিয়া ক্ষেমঙ্করী ডাকিলেন—"ও নলিন, শুনে যা।"

কমলা তাড়াতাড়ি আঁচলের মধ্যে ফুল ও মালা ঢাকিয়া-ফেলিয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিলে ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "হেমরা যে আজ চলিয়া গেল—তোর সঙ্গে কি দেখা হয় নাই?"

নলিন কহিল, "হাঁ, আমি যে তাঁহাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"যাই বলিস্ বাপু, হেমের মত মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।"

যেন নলিনাক্ষ এসম্বন্ধে বরাবর তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াই আসিয়াছে। নলিনাক্ষ চুপ করিয়া একটুখানি হাসিল।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"হাস্‌লি যে বড়! আমি তোর সঙ্গে হেমের সম্বন্ধ করিলাম, আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করিয়া আসিলাম, আর তুই যে জেদ্ করিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিলি, এখন তোর মনে কি একটু অনুতাপ হইতেছে না?"

নলিনাক্ষ একবার চকিতের মত কমলার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, দেখিল, কমলা উৎসুকনেত্রে তার দিকে তাকাইয়া আছে। চারিচক্ষু হইবামাত্র কমলা লজ্জায় মাটি হইয়া চোখ নীচু করিল।

নলিনাক্ষ কহিল—"মা, তোমার ছেলে কি এম্নি সৎপাত্র যে, তুমি সম্বন্ধ করিলেই হইল? আমার মত নীরস গম্ভীর লোককে সহজে কি কারো পছন্দ হইতে পারে?"

এই কথায় কমলার চোখ আপনি আবার উপরে উঠিল—উঠিবামাত্র দেখিল, নলিনাক্ষের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার উপরেই পড়িয়াছে,—এবার কমলার মনে হইতে লাগিল, ঘর হইতে ছুটিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচি!

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "যা যা, আর বকিস্‌নে, তোর কথা শুনিলে আমার রাগ ধরে!"

এই সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে পর কমলা হেমনলিনীর সব-ক'টি ফুল লইয়া একটি বড় মালা গাঁথিল। ফুলের সাজির উপরে সেই মালাটি লইয়া জলের ছিটা দিয়া সেটি নলিনাক্ষের উপাসনাঘরের একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ বিদায় হইয়া যাইবার দিনে এইজন্যই হেমনলিনী সাজি ভরিয়া ফুল আনিয়াছিল—মনে করিয়া তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল।

তার পরে আপনার ঘরে ফিরিয়া-আসিয়া তাহার মুখের দিকে নলিনাক্ষের সেই দৃষ্টিপাত কমলা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ কমলাকে কি মনে করিতেছে? কমলার মনের কথা যেন নলিনাক্ষের কাছে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কমলা পূর্ব্বে যখন নলিনাক্ষের সম্মুখে বাহির হইত না, তখন সে একরকম ছিল ভাল। এখন প্রতিদিন কমলা তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। আপনাকে গোপন করিয়া রাখিবার এই ত শাস্তি! কমলা ভাবিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ মনে মনে বলিতেছেন—'এই হরিদাসী মেয়েটিকে মা কোথা হইতে আনিলেন, এমন নির্লজ্জ ত দেখি নাই!' নলিনাক্ষ যদি এক মুহূর্ত্তও এমন কথা মনে করে, তবে তাহা সে অসহ্য।"

কমলা রাত্রে বিছানায় শুইয়া মনে মনে খুব জোর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "যেমন করিয়া হোক্, কালই আপনার পরিচয় দিতে হইবে, তাহার পরে যাহা হয় তাহা হউক!"

পরদিন কমলা প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিতে গেল। স্নানের পর প্রতিদিন সে একটি ছোটো ঘটিতে গঙ্গাজল আনিয়া নলিনাক্ষের উপাসনাঘরটি ধুইয়া, মার্জ্জনা করিয়া তবে অন্য কাজে মন দিত। আজও সে তার দিবসের প্রথম কাজটি সারিতে গিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ আজ সকাল-সকাল তাহার উপাসনাঘরে প্রবেশ করিয়াছে—এমন ত কোনোদিন হয় নাই। কমলা তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কাজের একটা ভার বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। খানিকটা দূর গিয়া সে হঠাৎ থামিল—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি-একটা ভাবিল। তার পরে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া-আসিয়া উপাসনা-ঘরের দ্বারের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে যে কিসে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, তাহা সে জানে না; সমস্ত জগৎ তাহার কাছে ছায়ার মত হইয়া আসিল, সময় যে কতক্ষণ চলিয়া গেল, তাহা তাহার বোধ রহিল না। হঠাৎ একসময় দেখিল, নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখনি ভূতলে হাঁটু গাড়িয়া একেবারে নলিনাক্ষের পায়ের উপর

মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—তাহার সন্তর্পনে আর্দ্র চুলগুলি নলিনের পা ঢাকিয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। কমলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল—তাহার মনে রহিল না যে, তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে—সে যেন দেখিতেই পাইল না, নলিনাক্ষ অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, সে একটি অন্তরের চৈতন্য-আভায় অপূর্ব্বরূপে দীপ্ত হইয়া অবিচলিতকণ্ঠে কহিল—"আমি কমলা।"

এই কথাটি বলিবার পরেই তাহার আপনার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল—তাহার একাগ্র চেতনা বাহিরে ব্যাপ্ত হইল। তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—মাথা নত হইয়া গেল—সেখান হইতে নড়িবারও শক্তি রহিল না, দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল—সে তাহার সমস্ত বল, সমস্ত পণ "আমি কমলা" এই একটি কথায় নলিনাক্ষের পায়ের কাছে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে—নিজের কাছে নিজের লজ্জা রক্ষা করিবার কোনো উপায় সে আর হাতে রাখে নাই, এখন সমস্তই নলিনাক্ষের দয়ার উপরে নির্ভর। নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের উপর তুলিয়া-লইয়া কহিল—"আমি জানি, তুমি আমার কমলা। এস, আমার ঘরে এস।"

উপাসনাঘরে তাহাকে লইয়া-গিয়া তাহার গলার কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল, "এস, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।" দুই জনে পাশাপাশি যখন সেই শ্বেতপাথরের মেজের উপরে নত হইল, জানালা হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুই জনের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া আর একবার নলিনাক্ষের পায়ের ধূলা লইয়া যখন কমলা দাঁড়াইল, তখন তাহার দুঃসহ লজ্জা আর তাহাকে পীড়ন করিল না। হর্ষের উল্লাস নহে, কিন্তু একটি বৃহৎ মুক্তির অচঞ্চল শান্তি তাহার অস্তিত্বকে প্রভাতের অকুণ্ঠিত উদার-নির্ম্মল আলোকের সহিত ব্যাপ্ত করিয়া দিল। একটি গভীর ভক্তি তাহার হৃদয়ের কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার অন্তরের পূজা সমস্ত বিশ্বকে ধূপের পুণ্যগন্ধে বেষ্টন করিল। দেখিতে দেখিতে কখন্ অজ্ঞাতসারে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—বড় বড় জলের ফোঁটা তাহার দুই কপোল দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, আর থামিতে চাহিল না, তাহার অনাথজীবনের সমস্ত দুঃখের মেঘ আজ আনন্দের জলে ঝরিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ তাহাকে আর কোনো কথা না বলিয়া একবার কেবল দক্ষিণহস্তে তাহার ললাট হইতে স্নিগ্ধ কেশ সরাইয়া-দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

কমলা তাহার পূজা এখনো শেষ করিতে পারিল না—তাহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ধারা এখনো সে ঢালিতে চায়—তাই সে নলিনাক্ষের শোবার ঘরে গিয়া আপনার গলার মালা দিয়া সেই খড়মজোড়াকে জড়াইল এবং তাহা আপনার মাথায় ঠেকাইয়া যত্নপূর্ব্বক যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল।

তার পরে সমস্তদিন তাহার গৃহকর্ম্ম

যেন দেবসেবার মত মনে হইতে লাগিল। প্রত্যেক কর্ম্মই যেন আকাশে একএকটি আনন্দের তরঙ্গের মত উঠিল-পড়িল। ক্ষেমঙ্করী তাহাকে কহিলেন, "মা, তুমি করিতেছ কি? একদিনে সমস্ত বাড়ীটাকে ধুইয়া, মাজিয়া, মুছিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিবে নাকি?"

বৈকালের অবকাশের সময় আজ আর সেলাই না করিয়া কমলা তাহার ঘরের মেঝের উপরে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, এমন-সময় নলিনাক্ষ একটি টুক্‌রিতে গুটিকয়েক স্থলপদ্ম লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—কহিল, "কমলা, এই ফুলক'টি তুমি জল দিয়া তাজা করিয়া রাখ, আজ সন্ধ্যার পর আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করিতে যাইব।"

কমলা মুখ নত করিয়া কহিল—"কিন্তু আমার সব কথা ত শোন নাই!"

নলিনাক্ষ কহিল—"তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি সব জানি।"

কমলা দক্ষিণ করতল দিয়া মুখ ঢাকিয়া কহিল, "মা কি—" বলিয়া কথা শেষ করিতে পারিল না।

নলিনাক্ষ তাহার মুখ হইতে হাত নামাইয়া-ধরিয়া কহিল—"মা তাঁহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নহে, তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।"

সমাপ্ত।

ইৎ-সিং।

হুয়েন্-সাং, ফাহিয়ান্ প্রভৃতি চীনদেশীয় পরিব্রাজকদিগের নাম আজকাল আমাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। ইঁহাদের স্বলিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমাদের ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের অনেক খবর আমরা পাইয়াছি,—এবং সে সকল, ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান্। সম্প্রতি মিঃ তাকাকাসু, ইৎ-সিং-নামক আর একজন চীনদেশীয় পর্য্যটকের গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইনি হুয়েন-সাং-এর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ৬৭১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্তিবন্দরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে তিনি পদব্রজে রাজগৃহে যান ও অনেকদিন নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রচর্চ্চা করেন। তিনি 'বিনয়পিটকম্' প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের প্রায় ৫০০০০হাজার শ্লোক লিখিয়া স্বদেশে লইয়া যান। ফিরিবার পথে তিনি সুমাত্রার রাজধানী শ্রীভোগে (বর্ত্তমান পালাবাং) সংস্কৃত ও পালি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা ও অনুবাদ করেন। ৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি তা-সিন্‌নামক এক পুরোহিতের সঙ্গে তাঁহার

গ্রন্থসমূহ পাঠাইয়া দেন। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ৬৭১—৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ইৎ-সিংএর পুস্তক হইতে আমরা সেই-সময়কার ভারতবর্ষের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের যে সকল নিখুঁত চিত্র পাই, তাহা আমাদের দেশের ইতিহাসগঠনের জন্য বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধুকেবল তাঁহার স্বলিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত করিব।

"আমি তখন পশ্চিম রাজধানীতে (চাং-য়ান্) থাকিয়া অধ্যয়ন করিতাম। চু-ই, হুং-ই, আমি এবং আরও কয়েকজনে মিলিয়া স্থির করিলাম—আমরা গৃধ্রকূট, বোধিদ্রুম দর্শন করিতে ভারতবর্ষে যাইব। চু-ই তাঁহার বৃদ্ধা মাতার জন্য, হুং-ই নির্ব্বাণলাভপ্রয়াসী হইয়া এবং অন্যেরা অন্য অন্য কারণে যাইতে পারিলেন না—কাজেই আমি ও সান্-হিংনামক একজন অল্পবয়স্ক পুরোহিত উভয়ে যাত্রা করিলাম। [সান্-হিং সুমাত্রা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন—অসুস্থ হওয়ায় তিনি এখান হইতে ফিরিয়া যান।]

* * *

পথে আমার মন কখন সুদূর মৃগদাবে খন বা কুক্কুটপদগিরিতে বিচরণ করিত। আমাদের জাহাজ যখন দক্ষিণসমুদ্রে পৌঁছিল, তখন বর্ষা আসিয়া পড়িল। * * * দিন পরে আমরা ভোজনগরে উপনীত হইলাম। এখানে আমি ছয়মাস থাকিয়া সংস্কৃত শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করি। এখান হইতে শ্রীভোজে এবং শ্রীভোজ হইতে 'কাচা' গমন করি। কাচা হইতে দশদিন উত্তরাভি-মুখে যাইয়া আমি উলঙ্গজাতির রাজ্যে উপস্থিত হই। এখানে নারিকেল ও সুপারি প্রভূতপরিমাণে জন্মে—ইহারা নারিকেল, সুপারি, বেত প্রভৃতির বিনিময়ে লৌহ লইয়া থাকে। এখানকার পুরুষেরা একেবারে উলঙ্গ, স্ত্রীলোকের কটিদেশে পাতার আবরণ।

"এখান হইতে একপক্ষকাল পরে আমরা তাম্রলিপ্তিবন্দরে পৌঁছি। তাম্রলিপ্তি হইতে মহাবোধি ও নালন্দ প্রায় বাটযোজন দূরে। তাম্রলিপ্তিতে আমি মহাযানপ্রদীপকে (হুয়েন্-সাংএর ছাত্র) প্রথম দেখি। এখানে তাঁহার কাছে কিছুদিন থাকিয়া ব্রহ্মভাষা (সংস্কৃত) শিক্ষা ও শব্দবিদ্যা অভ্যাস করি। তার পরে উভয়ে পশ্চিমের রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকি। আমাদের সঙ্গে অনেক সওদাগর ছিলেন।

"মহাবোধিবিহার পৌঁছিবার দশদিন পূর্ব্বে আমাদিগকে এক সুবৃহৎ পর্ব্বত ও জলা পার হইতে হইয়াছিল—এই গিরিপথ অতিশয় দুর্গম। এস্থানে কখন একলা যাইতে নাই। এই সময়ে আমার শরীর অসুস্থ হইল—আমি শ্রান্ত এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম, কোনক্রমেই সঙ্গীদের সঙ্গে যাইতে পারিলাম না। আমাদের সঙ্গে নালন্দের প্রায় কুড়িজন পুরোহিত ছিলেন—তাঁহারা সকলেই আগে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমিই কেবল একলা সেই দুর্গম গিরিবর্ত্ম

পার হইতে লাগিলাম। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, সেই সময় কতকগুলি পার্ব্বত্য দস্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ধনুক লইয়া চীৎকার করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে একদৃষ্টে দেখিতে ও নানাপ্রকারে অপমান করিতে লাগিল। তাহারা একে একে আমার বস্ত্রাদি ও কোমরবন্ধ প্রভৃতি খুলিয়া লইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ সংসার হইতে আমার বিদায়ের ক্ষণ সন্নিকট এবং আমার তীর্থ-দর্শনের আশা আর পূর্ণ হইল না। বিশেষত আমি শুনিয়াছিলাম যে, শাদা মানুষ পাইলে তাহারা দেবতার নিকট বলি দেয়। এই কথা ভাবিয়া আমি কাছের একটা গর্ত্তে কাদার মধ্যে পা' ডুবাইলাম এবং কাদা মাখিয়া পাতা দিয়া শরীর ঢাকিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। রাত্রি হইয়া আসিল—চটি সেখান হইতে তখনও দূরে,—আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে সহযাত্রীদিগের নিকট পৌঁছিলাম। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিতে পাইলাম—মহাযানপ্রদীপ আমার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন। আমি পৌঁছিলে তিনি আমাকে স্নান করাইয়া বস্ত্রাদি দিলেন। কয়েকদিন উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া আমরা নালন্দে পৌঁছিলাম। সেখানে মূল গন্ধকুটিতে পূজা ও গৃধ্রকূটে আরোহণ করিলাম। তৎপরে আমরা মহাবোধিবিহারে গমন করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা, কাষায়বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া সেই মূর্ত্তির নিকট নিবেদন ও উপাসনা করিলাম।

"বিনয়'-অধ্যাপক হিউন আমার সঙ্গে যে সকল ছোট ছোট চন্দ্রাতপ দিয়াছিলেন, সে সকল এইখানে দিলাম এবং 'ধ্যান'-আচার্য্য আন্‌তাওএর অনুরোধমত তাঁহার হইয়াও বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা করিলাম।

* * *

"এইপ্রকারে আমি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম। আমি বিমলকীর্ত্তির ক্ষুদ্র গৃহ (১০ হাত চৌকা) দেখিলাম। বারাণসীতে মৃগদাবে প্রবেশ এবং কুক্কুটপদগিরিতে আরোহণ করিলাম। আমি নালন্দবিহারে দশবৎসর ছিলাম।

* * *

"এই স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আমি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাম্রলিপ্তি আসিবার পথে আবার দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলাম—কোনপ্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়াছি। আমি প্রায় পঞ্চাশহাজার সংস্কৃতশ্লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।"

ইৎ-সিং পুনরায় শ্রীভোজে গমন করিয়া সেখান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যান। স্বদেশে গিয়া কেং-কু বা শীলগুপ্ত নামক কোন পুরোহিতের সাহায্যে এই সকল শাস্ত্র চীন-ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার প্রায় বারবৎসর লাগিয়াছিল (৭০০—৭১২ খৃঃ অঃ)। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে উনাশিবৎসর বয়সে তিনি পরলোক-গমন করেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তটুকু প্রকাশ করিলাম। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া সেখানে এবং যবদ্বীপে ও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে যে সকল আচার-ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ

করিবার ইচ্ছা রহিল। তাঁহার সমগ্র পুস্তকের মধ্যে ভারতবর্ষের উপর যে একটি শ্রদ্ধার,—সম্মানের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বড়ই মনোজ্ঞ। নিজের দেশের আচার-ব্যবহার-অনুষ্ঠানাদির সমালোচনা করিতে গিয়া, তিনি সর্ব্বত্র ভারতবর্ষের আদর্শে সে সকলের বিচার করিয়াছেন। যেস্থানে তাহা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলে নাই, তিনি সে সকল পরিহার করিবার জন্য বারবার স্বদেশবাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন—"তোমরা এরূপ ব্যবহার কর, ইহা জানিলে ভারতবর্ষের লোকেরা কি বলিবে?" আর আজ?—

অধ্যাপক।

পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ।

পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ বহুকাল হইতে জড়বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যেদিন প্রকৃতির রহস্য প্রথমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপোৎপত্তির কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি সেই যুগ-যুগান্তরব্যাপী চেষ্টার সাফল্য দেখা যাইতেছে না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভাবিতেন,—কাঠ বা কয়লা জ্বালাইলে, সেটা যেপ্রকার তাপালোক বিকিরণ করে, সূর্য্যটা বুঝি সেইরকমের একটা দাহ্যপদার্থের বৃহৎ স্তূপ। তার পর যখন হিসাবে দেখা গেল, —সূর্য্য যদি কেবল অঙ্গারময়ই হইত, তবে তাহার সমস্ত অঙ্গার চারিপাঁচহাজার বৎসরে একবারে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের চমক্ ভাঙ্গিল। অনেকেই সূর্য্যের তাপোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন।

এই পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে কল্পনা করিয়া লইলেন,—আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটিতে প্রতিদিনই যেমন হাজার হাজার ছোট-বড় উল্কাপিণ্ড আসিয়া পড়ে, বিশাল সূর্য্যদেহে নিশ্চয়ই প্রতিমুহূর্ত্তে সেইপ্রকার কোটি কোটি উল্কার পতন হয়। কিন্তু চলিষ্ণু পদার্থের গতি হঠাৎ অবরুদ্ধ হইলে, তাহা দ্বারা যে প্রচুর তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিয়া আসিতেছি। স্থির হইল,—সূর্য্যগোলকে যে অজস্র উল্কাবর্ষণ হইতেছে, সেই উল্কাগুলির অবরোধ ও ঘর্ষণজাত তাপই সূর্য্যের তাপভাণ্ডারকে পূর্ণ রাখিয়াছে।

ইহা ছাড়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থ নানা পদার্থের রাসায়নিক সংযোগবিয়োগে যে তাপ হয়, তাহাকেও সূর্য্যের তাপরক্ষার কারণ

বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন।

সৌর-তাপোৎপত্তি-সম্বন্ধে এই কথাগুলি এককালে পণ্ডিতসমাজে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক-যুগের প্রারম্ভে সিদ্ধান্তটির উপর অনেক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন উঠিল,—যদি সৌরমণ্ডলে অজস্র উল্কাবর্ষণই সম্ভবপর হয়, তবে সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত উল্কা সূর্য্যদেহকে কি পুষ্ট করিত না? এবং সেই পুষ্টাবয়ব সূর্য্যের আকর্ষণবৃদ্ধির সহিত সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে কি একটা বিশৃঙ্খলার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না?

আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণে সূর্য্যকে ত অণুমাত্র পরিপুষ্ট দেখি না, এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির চলাফেরাতেও ত দুইএক-হাজার বৎসরে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। অনেকের মনে হইল,—তবে কিপ্রকারে উল্কাবর্ষণকেই সৌরতাপরক্ষার কারণ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়?

বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, কথাটা নিতান্ত উড়াইয়া দিবার মত নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক মিলিয়া সৌরতাপ জন্মাইবার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন।

এই অনুসন্ধানে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণপণ্ডিত হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌সাহেবও যোগ দিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন পরীক্ষাদি করিয়া বলিলেন,—কোন বাষ্পময় পদার্থকে সঙ্কুচিত করিলে, সেই সঙ্কোচদ্বারা যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। সূর্য্যদেহের অন্তত কতকটা যে বাষ্পময়, তাহারো ত প্রচুর প্রমাণ আছে। সুতরাং তাপবিকিরণদ্বারা সৌর-বাষ্পাবরণ সঙ্কুচিত হইলে, যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহাই সূর্য্যের তাপরক্ষার পক্ষে প্রচুর নয় কি?

হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌সাহেব একাধারে মহা-বৈজ্ঞানিক ও অসাধারণ গণিতবিদ্ ছিলেন। তিনি গণিতসাহায্যে স্পষ্ট দেখাইলেন, তাপবিকিরণজাত সঙ্কোচই সেই তাপ-পূরণের পক্ষে প্রচুর, এবং এই সঙ্কোচের পরিমাণ এত অল্প যে, দুইচারিহাজার বৎসরের পর্য্যবেক্ষণেও আমরা পৃথিবী হইতে তাহা বুঝিতে পারিব না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের নেতা লর্ড কেল্‌ভিন্ ও টেট্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ হেল্‌ম্‌হোল্‌জের সিদ্ধান্তে পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিলেন, এবং গণনাদ্বারা স্থির হইল, সূর্য্যদেব এখনো আড়াইকোটি বৎসর ব্যাপিয়া সঙ্কুচিত হইতে হইতে তাপালোক বিকিরণ করিতে থাকিবেন, এবং তার পর সৌরজগতে এক মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হইবে।

হেল্‌ম্‌হোল্‌জের এই আকুঞ্চনসিদ্ধান্তটিই এপর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। ভাবা গিয়াছিল, বিজ্ঞানরথী হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্ ও লর্ড কেল্‌ভিনের পরিণত মস্তিষ্ক হইতে যে সিদ্ধান্তের উৎপত্তি, তাহার বুঝি কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। কিন্তু আজ-কাল সৌরতাপোৎপত্তিসম্বন্ধে আবার একটি নূতন কথার সূচনা দেখা যাইতেছে।

অধ্যাপক সাইডায়্‌নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক আজ কয়েকমাস হইল প্রচার করিয়াছেন, রেডিয়ম্‌নামক যে একটি ধাতু আজ দেড়বৎসর হইল আবিষ্কৃত

হইয়াছে, সূর্য্যের বর্ণাবরণে (chromosphere) তাহা প্রচুরপরিমাণে আছে। অধ্যাপকটির মতে এই ধাতুটিই সৌর তাপ ও আলোকের মূলকারণ। তা ছাড়া, রেডিয়ম্ সহজ অবস্থাতে যে তাপ ও রশ্মি প্রচুরপরিমাণে ত্যাগ করে, তাহা অবলম্বন করিয়া সূর্য্য ও নক্ষত্রের আরো অনেক রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে।

সূর্য্যের কলঙ্কের (sunspots) আবির্ভাব-তিরোভাব একটা বড় রহস্যময় ব্যাপার। প্রতি এগারোবৎসর অন্তর এই কলঙ্ক প্রচুরপরিমাণে দেখা যায়। আজকাল অনেক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থ রেডিয়মের উত্তেজনার হ্রাসবৃদ্ধিতে কলঙ্কের আবির্ভাব-তিরোভাব দেখা যায়।

ভূগর্ভস্থ তাপের প্রসঙ্গেও আজকাল রেডিয়মের কথা শুনা যাইতেছে। এই তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—সৃষ্টির সময় পৃথিবী যখন কোন এক অত্যুষ্ণ নিহারিকা হইতে স্খলিত হইয়া জগৎরচনার সূত্রপাত করিয়াছিল, তখন হইতেই তাপ পৃথিবীতে আছে। সৃষ্টির আদিতে এই তাপ অবশ্য খুবই অধিক ছিল, হয় ত তদ্দারা পৃথিবীকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যাইত। কিন্তু পৃথিবী এপ্রকার অবস্থায় অধিককাল থাকিতে পারে নাই, তাপত্যাগদ্বারা ক্রমে শীতল হইয়া ইহাকে ক্রমেই বর্ত্তমান অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কোন উষ্ণবস্তু শীতল করিলে অগ্রে তাহার উপরটাই শীতল হইয়া পড়ে;—ভিতরের তাপ বাহির হইতে অনেক সময়ের আবশ্যকতা হয়। পৃথিবীরও তাহাই ঘটিয়াছে। ইহার উপরটা শীতল হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই আদিমতাপের যে অংশটা ভূগর্ভে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ভূগর্ভকে অত্যন্ত উষ্ণ দেখায়।

প্রতি বৎসর পৃথিবী কিপরিমাণ তাপ বিকিরণ করে, তাহা ঠিক্ করা কঠিন নয়। এইপ্রকার একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া আজ কয়েকবৎসর হইল লর্ড কেল্‌ভিন্ পৃথিবীর জন্মকাল পর্য্যন্তও ঠিক্ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রদার্‌ফোর্ড-সাহেব ভূগর্ভের তাপসম্বন্ধীয় প্রচলিত সিদ্ধান্তটিকে উল্টাইয়া দিতে চাহিতেছেন। ইনি বলিতেছেন,—সেই আদিমতাপ এবং এখনকার রাসায়নিক-সংযোগবিয়োগজাত তাপ ভূগর্ভের উষ্ণতারক্ষার পক্ষে প্রচুর নয়। নূতন-আবিষ্কৃত রেডিয়ম্ ও সেই-শ্রেণীর ধাতুগুলির কার্য্য আলোচনা করিলে, তাহাদিগকেই তাপরক্ষার মূল বলিয়া মনে হয়।

হিসাবে দেখা যায়, একপাউণ্ড রেডিয়ম্-ধাতু এক বৎসরে যে তাপ ত্যাগ করে, তাহা একশতপাউণ্ড উৎকৃষ্ট কয়লার দহনজাত তাপের সমান। এই তাপবিকিরণে রেডিয়মের ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু এই ক্ষয় এত অল্প যে, পঞ্চাশষাট বৎসরেও তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। তা ছাড়া, এই তাপ-বিকিরণক্ষমতা কেবলমাত্র রেডিয়মেরই গুণ নয়। হেলিয়ম্, থোরিয়ম্ প্রভৃতি

অনেক ধাতুতেই ঐ সকল গুণ সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। এই সকল দেখিয়া রদার্‌ফোর্ড-সাহেব স্থির করিয়াছেন, আমাদের পৃথিবীর আকাশে ও মৃত্তিকাতে রেডিয়ম্ ও তজ্জাতীয় যে সকল ধাতু প্রচুরপরিমাণে আছে, তাহাই তাপত্যাগ করিয়া পৃথিবীর উষ্ণতারক্ষা করিতেছে। ঘরে আগুন জ্বালাইলে, আগুনে ঘরটি যেমন বেশ গরম হইয়া উঠে, ভূপৃষ্ঠস্থ রেডিয়ম্‌জাতীয় নানা ধাতু সেইপ্রকার তাপ বিকিরণ করিয়া আমাদের আকাশটিকে বেশ গরম করিয়া রাখিতেছে।

পৃথিবীতে রেডিয়ম্‌জিনিষটা অতি অল্পই আছে সত্য, কিন্তু রেডিয়ম্‌জাতীয় অপর জিনিষের বড় অভাব নাই। ইহা দেখিয়া রদার্‌ফোর্ডসাহেব বলিতেছেন, এখনো ভূপৃষ্ঠে তাপবিকিরণক্ষম যতগুলি ধাতু আছে, পৃথিবীর তাপরক্ষার পক্ষে তাহাই প্রচুর।

লর্ড কেল্‌ভিন্ যে হিসাবে পৃথিবীর জন্মকাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, রদার্‌ফোর্ড-সাহেব সেই হিসাবেই দেখাইতেছেন যে, পৃথিবীতে সাতাইশকোটি টন্ রেডিয়মের অস্তিত্ব থাকিলে, তাহার তাপেই ভূগর্ভের উষ্ণতারক্ষা হইতে পারে। এল্‌ষ্টের ও গায়টেল্ নামক দুইজন জর্ম্মান্ পণ্ডিতের গবেষণায় দেখা গিয়াছে, সমগ্র ভূদেহে পূর্ব্বোক্তপরিমাণ রেডিয়ম্ প্রকৃতই আছে। তা ছাড়া, গভীর কূপ ও ঝরণার জল এবং সমুদ্রের কর্দ্দমাদিতে যে সকল রেডিয়ম্ মিশ্রিত থাকে, তাহা দেখিয়া ভূদেহের রেডিয়ম্‌প্রাচুর্য্যে আর কেহ বড় অবিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না!

অতি অল্পদিনই হইল, রদার্‌ফোর্ডের এই সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হইয়াছে। নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করেন, শুনিবার জন্য সমগ্র জগৎ আজ উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র।

ধর্ম্মশব্দে বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাগ, হোম, দান, ধ্যান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকলাপকে বুঝিতে হইবে। যে সকল শাস্ত্র আমাদিগকে ঐ সমস্ত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাদিগকে আমরা 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলিয়া জানি।

'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে', 'স্বারাজ্যকামী জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে', 'স্বর্গকামী দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ করিবে', 'পশুকামী চিত্রাযাগ করিবে',—এই সমস্ত ধর্ম্মের উপদেষ্টা বেদই আমাদিগকে দিয়াছেন, অতএব বেদ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র-বিদ্‌গণ বহু যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণে স্থির করিয়াছেন যে, বেদই ধর্ম্মের মুখ্যপ্রমাণ।

বেদপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, কেবল বেদকেই আমরা অনুসরণ করি না। অবশ্য বহুপূর্ব্বে এ পদ্ধতিও ছিল, যখন কল্পসূত্র, সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস ও আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধগুলির উৎপত্তি হয় নাই। আজকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, এই সমস্ত শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে; সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে; তাহা না হইলে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠাতার যে পরিণাম হয়, তাহা মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী এইরূপে বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মং প্রতি বিপ্রতিপন্না বহুবিদঃ, কেচিদন্যং ধর্ম্মমাহুঃ, কেচিদন্যং, যোঽয়মবিচার্য্য প্রবর্ত্তমানঃ কঞ্চিদেবোপাদদানো বিহন্যেত, অনর্থঞ্চ ঋচ্ছেৎ।"

বহুবিজ্ঞ লোকগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিরোধ আছে; একজন যাহাকে ধর্ম্ম বলেন, অন্যজন তাহা না বলিয়া ভিন্ন বলেন। এ অবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি বিচার না করিয়া যে-কোন একটি ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, বিহত হইবে ও অনর্থ প্রাপ্ত হইবে।

মীমাংসাদর্শনকার যে সময়ে উৎপন্ন হন, তখন কল্পসূত্র-সংহিতা প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মপ্রতিপাদক নিবন্ধের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রত্যেক নিবন্ধেই কোন-না-কোন অংশে বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি ইহার ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বমীমাংসার জন্য এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাই আজকাল 'পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র' বা 'জৈমিনিসূত্র' নামে পরিচিত। সেই সময় হইতে ঐ গ্রন্থই ধর্ম্মমীমাংসায় প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। ইহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞই অস্বীকার করিতে পারেন না। ভগবান্ জৈমিনি অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন সাধারণ ব্যক্তির সুকর নহে বিবেচনা করিয়া আচার্য্য শবরস্বামী ঐ সূত্রের ভাষ্য ও কুমারিলভট্ট বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন। তাহার পরেও মীমাংসাদর্শনের বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ফলে এই সমস্ত গ্রন্থের মতভেদে জৈমিনির যথার্থ অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে।

যাহাই হউক, বেদের পর কল্পসূত্র-সংহিতা প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনি ও আচার্য্য শবরস্বামী প্রভৃতি কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অদ্য এস্থানে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

বৌধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ কল্পসূত্রগুলির ধর্ম্মে প্রামাণ্য আছে কি না, এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া মহর্ষি জৈমিনি চারিটি সূত্রে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা এই :—

"প্রয়োগশাস্ত্রম্ (কল্পসূত্রম্) ইতি চেৎ।" "ন, অসন্নিয়মাৎ।"—"অবাক্যশেষাচ্চ।"—"সর্ব্বত্র চ প্রয়োগাৎ সন্নিধানশাস্ত্রাচ্চ।"

কোন ভাষ্য বা বার্ত্তিক অনুসরণ না করিয়া কেবল যথাশ্রুতার্থ ধরিলে, এই সূত্রগুলির অর্থ বোধ হয় এইরূপ হইতে পারে—'প্রয়োগশাস্ত্র (কল্পসূত্র) প্রমাণ যদি (বল)? তাহা নহে, (যেহেতু তাহাতে) ভাল নিয়ম নাই।—বাক্যশেষ নাই।—(ইহাতে) সর্ব্বত্র প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে; (কিন্তু) সন্নিধানশাস্ত্র (বেদ) (অন্য)।'

শবরস্বামী এই সূত্রগুলির এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বাহুল্যভয়ে আমরা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি—

পূর্ব্বপক্ষঃ।—"প্রয়োগস্ত শাস্ত্রং প্রমাণমেবৈবং-জাতীয়কম্ ইতি ব্রূমঃ। সত্যবাচামেতানি বচনানি। কথমবগম্যতে? বৈদিকৈরেবাং সংবাদো ভবতি—য এব হি বেদে গ্রহাঃ (যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষাঃ) ত এব ইহ, যা-এব বেদে ইষ্টয়ঃ, তা এবেহ। তস্মাৎ সত্যবাচ আচার্য্যাঃ। 'আচার্য্যবচঃ প্রমাণমিতি' চ শ্রুতিঃ।"

প্রশ্ন।—এইজাতীয় প্রয়োগশাস্ত্র (কল্পসূত্র) প্রমাণ। কেন না, তাহা সত্যবাদীর বচন। আমরা দেখিতে পাই, বেদে যে সমস্ত যজ্ঞীয়পাত্র বিহিত হইয়াছে, এই কল্পসূত্রসমূহেও তাহাই হইয়াছে; বেদে যে ইষ্টি (যাগবিশেষ) বিহিত, কল্পসূত্রেও তাহাই। সুতরাং এই কল্পসূত্র-প্রণেতা আচার্য্যগণ সত্যবাদী। আর শ্রুতি বলিতেছেন—আচার্য্যবচন প্রমাণ। অতএব কল্পসূত্রের প্রামাণ্য আছে।

ইহার সিদ্ধান্ত ভাষ্যের শেষে শবরস্বামী বলিয়াছেন—

"যচ্চোক্তং সত্যবাচামেতানি বচনানি, তন্ন; আচার্য্যবচনং হি ভবতি পূর্ব্বপক্ষে—'সর্ব্বাসু তিথিষু অমাবাস্যা' ইতি, সন্নিহিতঞ্চ শাস্ত্রম্—'পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত, অমাবাস্যায়ামমাবাস্যয়া যজেত' ইতি। তেন শ্রুতিবিরুদ্ধবচনাৎ ন সত্যবাচঃ, তস্মাদপ্রমাণম্।"

উত্তর।—তুমি বলিয়াছ, প্রয়োগশাস্ত্র সত্যবাদী আচার্য্যের বচন, কিন্তু তাহা নহে। কেন না, তাঁহারা বলিয়াছেন—সমস্ত তিথিতেই 'অমাবাস্যা'যাগ করিবে। কিন্তু বেদ বলিতেছেন—পৌর্ণমাসীতে 'পৌর্ণমাসী' ও অমাবাস্যায় 'অমাবাস্যা'যাগ করিবে। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ বিধান করায় তাঁহারা সত্যবাক্ হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রণীত কল্পসূত্র অপ্রমাণ।

ভাষ্যকার শবরস্বামীর এই উক্তি বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট ভাল বিবেচনা করেন নাই। তিনি বলেন—কল্পসূত্রের প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা ঐ সূত্রগুলিতে আলোচিত হয় নাই; কিন্তু কল্পসূত্রের ধর্ম্মে স্বতন্ত্র প্রামাণ্য আছে কি না, সূত্রকার তাহারই আলোচনা করিয়া স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই ও অস্বতন্ত্র প্রামাণ্য আছে, স্থির করিয়াছেন।—অর্থাৎ বেদ যেমন অপৌরুষেয় বলিয়া স্বয়ংই প্রমাণ, কল্পসূত্র সেরূপ হইতে পারে না; কেন না, কল্পসূত্রগুলি মানব-প্রণীত—পৌরুষেয়। কিন্তু ইহারা যখন বেদ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে;—বেদে যাহা আছে, তাহাই বিনিয়োগপ্রদর্শন করিয়া স্পষ্টরূপে বলিয়াছে; তখন বেদের প্রামাণ্য থাকায় ইহাদেরও প্রামাণ্য আছে;—বেদ যেমন স্বয়ং—স্বতন্ত্র প্রমাণ, কল্পসূত্র অন্যের প্রামাণ্য ধার করিয়াছে বলিয়া সেরূপ স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, কিন্তু অস্বতন্ত্র—পরাধীন প্রমাণ। এসম্বন্ধে স্বয়ং বার্ত্তিককার ও তন্মতানুসারী পার্থসারথিমিশ্র বহুপ্রকার বিচারচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না। তাঁহার মতের নিষ্কর্ষ এই:—কল্পসূত্র সর্ব্বতোভাবে অপ্রমাণ নহে, কিন্তু যে যে স্থানে বেদের সহিত বিরোধ দৃষ্ট হইবে, সেই সেই স্থানেই তাহা অপ্রমাণ।

মীমাংসকধুরন্ধর 'প্রভাকরভট্ট বিচার-ভঙ্গীতে উভয় মতেই সম্মতি দিয়াছেন বোধ হয়। মাধবাচার্য্য ন্যায়মালাবিস্তরে তাঁহার মত এইরূপে উদাহৃত করিয়াছেন—

"কল্পসূত্রকার আহ—সর্ব্বাসু তিথিষু অমাবাস্যা কর্ত্তব্যা ইতি; শ্রুতিস্তু পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত, অমাবাস্যায়াম্ অমাবাস্যয়া যজেতেতি অমাবাস্যা-তিথৌ তৎকর্ত্তব্যতাং ব্রূতে। ততঃ কল্পসূত্ররূপেণ বেদেন বিরুদ্ধত্বাদিয়ং শ্রুতির্ন মানম্ ইতি চেৎ—

মৈবম্, কল্পসূত্রস্য বেদত্বং নাদ্যাপি সিদ্ধম্, কিন্তু প্রযত্নেন সাধনীয়ম্, ন চ তৎ সাধয়িতুং শক্যতে—পৌরুষেয়ত্বস্য সমাখ্যয়া, তৎকর্ত্তৃরুপলম্ভেন চ সাধিতত্বাৎ। অতঃ কল্পসূত্রস্য দুর্ব্বলতয়া ন শ্রুতিরপ্রমাণম্।"

ভাবার্থ।—কল্পসূত্রে সমস্ত তিথিতেই 'অমাবাস্যা'যাগের বিধান আছে, কিন্তু বেদে কেবল পৌর্ণমাসীতেই তাহা উক্ত হইয়াছে। অতএব কল্পসূত্ররূপ বেদের সহিত ঐ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও, ঐ শ্রুতি অপ্রমাণ হইবে না। যেহেতু কল্পসূত্র যে বেদ, তাহার প্রমাণ নাই; তাহার বেদত্ব সাধন করিতেও পারা যায় না। কেন না, কল্পসূত্রগুলির 'বৌধায়ন' 'আশ্বলায়ন' প্রভৃতি নাম শুনিলেই ত তাহার প্রণেতার অনুসন্ধান পাওয়া যায়—তাহা যে পৌরুষেয়, ইহা বুঝা যায়। অতএব কল্পসূত্র দুর্ব্বল বলিয়া শ্রুতির অপ্রামাণ্য করিতে পারে না।

যাহাই হউক, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি কল্পসূত্রকারগণ যে স্ব স্ব গ্রন্থে বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও বিধান করিয়াছেন, এ বিষয়ে সমস্ত মীমাংসকেরই সম্মতি আছে বলিয়া, আমরা উল্লিখিত মতগুলি সমালোচনা করিলে, বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার প্রভৃতি কল্পসূত্র-সমূহ হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। কল্পসূত্রে এতাদৃশ বিধি আরও আছে কি না, তাহা সমালোচ্য।

সূত্রগ্রন্থের পর মনুপ্রভৃতির প্রণীত স্মৃতি;—যাহাকে আমরা সাধারণত সংহিতাশব্দে অভিহিত করিয়া থাকি। বেদোক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগাদিপ্রদর্শনের জন্য কল্পসূত্রের উৎপত্তি হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তির প্রয়োজন কি, এসম্বন্ধে পার্থসারথিমিশ্র শাস্ত্রদীপিকায় স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে বলিয়াছেন—'বেদ বহুশাখায় বিভক্ত। সেই সমস্ত শাখায় বেদবোধিত ধর্ম্ম বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় বেদের একশাখাধ্যায়ী শাখান্তরস্থিত ধর্ম্ম জানিতে পারে না। সেইজন্য স্মৃতি শাখাসমূহে বিপ্রকীর্ণ ধর্ম্মগুলিকে একত্র সংগৃহীত করিয়া দিয়াছে। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও ইহা দ্বারা অনায়াসেই সমস্ত ধর্ম্ম জানিতে পারে।'

স্মৃতিসমূহে যদি কেবলমাত্র বেদোক্ত ধর্ম্ম উপনিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহার প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নাই। বেদে যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ নাই, স্মৃতিনিবন্ধে আমরা তাহাও দেখিতে পাই। এজন্য ধর্ম্মমীমাংসকগণ সেসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া নীরব থাকিতে পারেন না।

স্মৃতিকার বলিয়াছেন—

"অষ্টকাঃ কর্ত্তব্যাঃ"—

অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিবে। ইহার প্রামাণ্য-বিষয়ে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়;—এক দিকে প্রসিদ্ধ বেদতত্ত্বজ্ঞ মনু প্রভৃতি

সেই শ্রাদ্ধের বিধান করিয়াছেন ও তাহা অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরায় প্রথিত বৈদিকগণদ্বারা পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে; অপর দিকে বেদে তাহার কোন মূল দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি জৈমিনি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবাক্যের অপ্রামাণ্য ঘোষণা করিতে পারেন নাই। তিনি এস্থানে বলিয়াছেন—

"অপি বা কর্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ।"

১ অ, ৩ পা, ২ সূ।

বেদমূলক না হইলে সে ধর্ম্ম অপ্রমাণ, সত্য। অষ্টকাশ্রাদ্ধের মূলভূত শ্রুতিবচন বেদে প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তাহাও ঠিক। কিন্তু যে সকল ধর্ম্মস্মৃতিকার অধ্যয়ন, উপনয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মের বিধান লিখিয়াছেন—যাহার মূল বেদে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, এই অষ্টকাশ্রাদ্ধ তাঁহাদের দ্বারাই বিহিত হইয়াছে। অতএব যদিও ইহার মূলশ্রুতি বেদে প্রত্যক্ষগোচর না হইতেছে, তথাপি উভয় স্মৃতির (উপনয়নাদি ও অষ্টকাশ্রাদ্ধ) কর্ত্তা এক বলিয়া, বেদে ঐ অষ্টকাশ্রাদ্ধের মূলশ্রুতি আছে, ইহা আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে ও তাহা দ্বারাই অষ্টকাশ্রাদ্ধের প্রামাণ্য থাকিবে।

শবরস্বামী উল্লিখিত স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে কয়েকটি ভাল কথা বলিয়াছেন। তাহা এই :—স্মৃতিশাস্ত্রবোধিত যে সকল ধর্ম্মের প্রয়োজন আমরা এ সংসারে দেখিতে পাই না, তাহাদের প্রামাণ্যরক্ষার জন্য শ্রুতিবচনের অনুমান হউক। যেমন অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিলে কি ফল হয়, ইহার প্রয়োজন কি, তাহা আমরা এ সংসারে খুঁজিয়া কিছুই পাই না। অতএব আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে, অষ্টকাশ্রাদ্ধের ফল সংসারে দৃষ্ট না হইলেও ভবিষ্যজ্জন্মে কিছু অদৃষ্টফল আছে এবং এই অদৃষ্টফলের আকাঙ্ক্ষায় আমরা ঐ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিব। কিন্তু যে সকল স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের ফল দৃষ্ট, অর্থাৎ যাহার ফল আমরা এই সংসারেই দেখিতে পাই, সেই সকল ধর্ম্মের প্রামাণ্য এই দৃষ্টফলের দ্বারাই সাধিত হইবে; ইহার জন্য বেদবচন-অনুমানের কোন আবশ্যকতা নাই। যেমন, স্মৃতিকারগণ বলিয়াছেন—"গুরুরনুগন্তব্যঃ"—গুরুর অনুগমন করিবে; "তড়াগং খনিতব্যম্" তড়াগ খনিত করিবে; "প্রপা প্রবর্ত্তয়িতব্যা"—প্রপা (জলপানগৃহ) প্রবর্ত্তিত করিবে; "শিখাকর্ম্ম কর্ত্তব্যম্"—শিখাকর্ম্ম করিবে। এই সমস্ত স্মৃত্যুক্তধর্ম্মের আমরা দৃষ্টফলই পাইয়া থাকি। যেমন—"গুরুরনুগন্তব্যঃ" ইহার দৃষ্টফল এই যে—

"গুরোরনুগমনাৎ প্রীতো গুরুরধ্যাপয়িষ্যতি গ্রন্থগ্রন্থিভেদিনশ্চ ন্যায়ানুপদেক্ষ্যতি"—

গুরুর অনুগমন করিলে গুরু প্রীত হইয়া গ্রন্থের জটিলত্বভেদী ন্যায়সমূহের উপদেশ দিবেন। এইরূপ -

"প্রপাতড়াগানি চ লোকোপকারায়, ন ধর্ম্মায়, ইত্যেবাবগম্যতে।......গোত্রচিহ্নং শিখাকর্ম্ম।"

শবরস্বামী এইরূপে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

"তেন যে দৃষ্টার্থাস্তে তত এব প্রমাণম্। যে তু অদৃষ্টার্থাস্তেষু বৈদিকশব্দানুমানম্" ইতি।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, স্মৃতিকারগণ

বেদাতিরিক্ত ধর্ম্মেরও উপদেশ দিয়াছেন ও তাহার প্রয়োজন ছিল দেশকালাদি অনুসারে লোকস্থিতি। অতএব এস্থলে একটু আলোচনা করিবার জন্ত আমরা সহৃদয়বর্গকে প্রসঙ্গক্রমে আহ্বান করিতেছি।

বেদবোধিত বলিয়া যে সকল ধর্ম্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ সেগুলিকে কেবল স্মৃতিকারগণই উপনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সমস্ত ধর্ম্মদ্বারা যদি বর্ত্তমান লোকস্থিতি সুচারু সম্পন্ন না হয়, তবে তাহাদের পরিবর্ত্তন কেন হইবে না? ইহাতে দোষ কি? আমরা দেখিতে পাই, পুরাকালেও লোকস্থিতির নিমিত্ত মনীষিগণ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যথা বৃহন্নারদীয়পুরাণে—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
* * *
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥"

সমুদ্রযাত্রা, সন্ন্যাসগ্রহণ, দ্বিজগণের অসবর্ণা কন্যার সহিত বিবাহ, পতি মৃত হইলে দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্ক-দানে গোবধ প্রভৃতি ধর্ম্মকে মনীষিগণ কলিযুগে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন।

আদিত্যপুরাণেও এ কথা দেখিতে পাওয়া যায়—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
* * *
* * *
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি ধর্ম্মকে লোকরক্ষার নিমিত্ত মহাত্মা বুধগণ ব্যবস্থাপূর্ব্বক কলির প্রথমে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এস্থানে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, লোকরক্ষার জন্যই ('লোকগুপ্ত্যর্থং') তাঁহারা পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মগুলি লোকরক্ষার উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় মহাত্মগণের দ্বারা উপনিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তৎকালবর্ত্তী পণ্ডিতগণ লোকতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত ধর্ম্মদ্বারা সেই সময়ে লোকস্থিতি চলিতে পারে না; অতএব তাঁহারা তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে, যদি সেই সমস্ত ধর্ম্ম বেদবোধিত হইত, তবে 'মনীষী' 'বুধ'গণ 'ব্যবস্থাপূর্ব্বক' লোকরক্ষার জন্য সেগুলিকে নিষিদ্ধ করিতে কিপ্রকারে সাহসী হইলেন? অতএব বুঝিতে হইবে, লোকস্থিতির নিমিত্তই সেই সকল ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের ফল অলৌকিক—অদৃষ্ট ছিল না; তাহাদের ফলাফল এই সংসারেই উপলব্ধ হইত ও তাহা দ্বারাই ঐ ধর্ম্মের প্রামাণ্যরক্ষা হইত। পরবর্ত্তী কালে তাহা দ্বারা যখন আর লোক-স্থিতি রক্ষিত হইল না, তখন তাদৃশ দৃষ্ট-ফলাভাবে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়াছে। অতএব আজকালও যে সমস্ত ধর্ম্মদ্বারা আমাদের লোকস্থিতি রক্ষিত হয় না, তাহাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক; ইহাতে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন কালস্রোতে বাধ্য হইয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা করিতে হইতেছে, তখন

একটু ভাবিয়া-চিন্তিয়া ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাহা করা কি মঙ্গলজনক নহে ?

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এতক্ষণ অন্যত্র গিয়া পড়িয়াছিলাম, এখন আবার আমাদের ঐ পূর্ব্ববিষয়কেই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বলা হইয়াছে—যেখানে স্মৃতি-বোধিত ধর্ম্মের মূলভূত শ্রুতিবচন না পাওয়া যায়, সেখানে শ্রুতি আছে বলিয়া আমাদিগকে অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ স্থানও আছে, যে স্থানে বেদ এক কথা বলেন ও স্মৃতি আর-এক বলেন, এ সকল স্থলে কি করা কর্ত্তব্য। এরূপ ঘটনা দুর্লভ নহে। যথা—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে সদোনামক মণ্ডপের মধ্যে একটি উডুম্বর-বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিবার নিয়ম আছে। স্মৃতি বলিতেছেন, ঐ শাখাটিকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে—"ঔডুম্বরী বেষ্টয়িতব্যা"; কিন্তু বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ শাখাটিকে স্পর্শ করিয়া গান করিতে হইবে—"ঔডুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ"। যদি উডুম্বর-শাখাটিকে বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর তাহাকে স্পর্শ করা চলে না। অতএব বলিতে হইবে, স্মৃতি এস্থলে শ্রুতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়াছেন। আরও, শ্রুতি—

"জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশোঽগ্নীন্ আদধীত।"

পুত্র উৎপন্ন হইলে কেশ কৃষ্ণ থাকিতে থাকিতেই অগ্নির আধান করিবে। স্মৃতি বলিতেছেন—

"অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যচরণম্"—

৪৮বৎসর বেদাভ্যাসার্থ ব্রহ্মচর্য্য করিবে। এই দুই বাক্যের বিরোধ দেখা যায়; কেন না, যদি স্মৃতি অনুসারে ৪৮বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করা যায়, তবে কখন্ দারপরিগ্রহ করিবে, কখন্ বা পুত্র উৎপন্ন হইবে? আর এত বৎসর পর্য্যন্ত কেশ অপকাবস্থায় কৃষ্ণ থাকিবে, তাহাও সম্ভব নহে। এস্থানে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, বেদে আছে—

"ক্রীতরাজকোঽভোজ্যান্নঃ";

স্মৃতি তাঁহারই গৃহে ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"অগ্নীষোমীয়ে সংস্থিতে যজমানস্য গৃহে অশিতব্যম্।"

অতএব এতাদৃশ স্থলে কি করা উচিত, তাহা মহর্ষি জৈমিনি দুইটি সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। প্রথম—

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ, অসতি হ্যনুমানম্।"

১ অ, ৩ পা, ৩ সূ।

স্মৃতির সহিত শ্রুতির বিরোধ হইলে স্মৃতির অপেক্ষা করিবে না; বিরোধ না থাকিলে সেই স্মৃতির দ্বারা শ্রুতি অনুমান করিবে।

ভাষ্যকার এই সূত্রের উপসংহারে বলিয়াছেন—

"তস্মাদুক্তং শ্রুতিবিরুদ্ধা স্মৃতিরপ্রমাণমিতি।"

জৈমিনির দ্বিতীয় সূত্র—

"হেতুদর্শনাচ্চ।" ঐ, ৪ সূ।

কেন ঐ স্মৃতির অপেক্ষা করিতে হইবে না, তাহার হেতু আছে।

ঐ হেতু কিপ্রকার, তাহা ভাষ্যকার এইরূপে বলিয়াছেন—

"লোভাদ্বাস আদিৎসমানা ঔডুম্বরীং বেষ্টিতবন্তঃ কেচিৎ, তৎ স্মৃতের্বীজম্। বুভুক্ষমাণাঃ কেচিৎ ক্রীতরাজকস্য ভোজনমাচরিতবন্তঃ। অপুংস্ত্বং প্রচ্ছাদয়ন্তশ্চাষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যং চরিতবন্তঃ। তত এষা স্মৃতিরিত্যবগম্যতে।"

"ঔদুম্বরী বেষ্টয়িতব্যা" ইত্যাদি স্মৃতির মূল শ্রুতি নহে, এখানে তাহার মূল অন্ত—কতকগুলি লোক লোভবশবর্ত্তী হইয়া বস্ত্র লইতে ইচ্ছা করিয়া ঔদুম্বরী শাখাকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই ঐ স্মৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। বুভুক্ষু হইয়া কয়েকজন ক্রীতরাজকের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই

"অগ্নীষোমীয়ে সংস্থিতে"

প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচন উৎপন্ন। কারণবিশেষে কাহারও ৪৮বৎসর পর্য্যন্ত অপুংস্ত্ব (ক্লৈব্য) উৎপন্ন হইয়াছিল, তিনি তাহাকে গোপনে রাখিতে ঐ সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করেন, তাহাতেই

"অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যচরণম্"

এই স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে।

শবরস্বামী এই ভাষ্যের উপসংহারে বলিয়াছেন—

"উপপন্নতরঞ্চৈতদবৈদিকবচনকল্পনাৎ"—

এরূপ স্থলে বেদবচন অনুমান করা অপেক্ষা তাদৃশ সিদ্ধান্তই যুক্ততর। অতএব, বলা বাহুল্য, শবরস্বামীর মতে এতাদৃশ স্মৃতির কোন প্রামাণ্য নাই।

বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। এসম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় এই—সত্য কথা, বেদে পূর্ব্বোক্ত ঔদুম্বরী শাখার স্পর্শ ও স্মৃতিতে তদ্বিরুদ্ধ সর্ব্ববেষ্টন বিহিত হইয়াছে,—দুইটি এক সময়ে করিতে পারা যায় না; কিন্তু বেদের মধ্যেও আমরা কোন কোন স্থানে যুগপৎ অসম্পাদ্য কর্ম্মের বিধান দেখিতে পাই, যথা—

"অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি, নাতিরাত্রে ষোড়শিনং (যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষ) গৃহ্লাতি।"

তার পর,

"ঔদুম্বরী সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যা"

এই স্মৃতির মূলভূত শ্রুতিবচন যে নাই, তাহা তোমাকে কে বলিল? সমস্ত বেদ অনুসন্ধান করিয়া দেখা তোমার-আমার মত লোকের সাধ্য নহে; বেদগ্রন্থ অতিবৃহৎ—

"সহস্রং সামশাখাঃ, একশতম্ অধ্বর্য্যুশাখাঃ, একবিংশতিশাখং বহ্বৃচম্"—

সামবেদের সহস্র শাখা, যজুর্ব্বেদের একশত ও ঋগ্বেদের একবিংশতি। এই সমস্ত বিবেচনা না করিয়া যদি সেই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতির মূলশ্রুতি নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত কর, ও তাহা দ্বারা ঐ স্মৃতির অপ্রামাণ্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে স্মৃতিত্বসামান্যে সমস্ত স্মৃতিরই অপ্রামাণ্য তুমি ইচ্ছা কর না কেন? অতএব ঐ স্মৃতি অপ্রমাণ নহে, তবে যাবৎ তাহার মূলশ্রুতি না পাওয়া যায়, তৎকালপর্য্যন্ত সেই স্মৃতি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে না।

ইহা আলোচনা করিলে বোধ হয়, বার্ত্তিককার বস্তুত ঐ স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিলেও কেবল নির্বন্ধাতিশয়প্রযুক্ত হইয়া স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করেন নাই।

পূর্ব্বে "হেতুদর্শনাচ্চ" এই জৈমিনিসূত্র উদ্ধৃত করিয়া শবরস্বামী তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শবরস্বামী সে স্থানে (পৃথক্ অধিকরণ রচনা করিয়া) স্মৃতিসম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাহা এইরূপ—জ্যোতিষ্টোম-

যাগে অগ্নীষোমীয় পশুর তন্ত্র প্রক্রান্ত হইলে 'বৈসর্জ্জন'নামক একটি হোমের বিধান আছে। তাহাতে যজমান ও তাহার পত্নী, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নূতন বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঐ বস্ত্রের অন্তে স্রুগ্‌দণ্ড বাঁধিয়া হোম করিতে হয়। সেই বস্ত্রসম্বন্ধে স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

"বৈসর্জ্জনহোমীয়ং বাসোঽধ্বর্য্যুর্গৃহ্লাতীতি।"—

বৈসর্জ্জনহোমের বস্ত্রখানি অধ্বর্য্যু (যজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক্) গ্রহণ করিবেন। এই স্মৃতির প্রামাণ্য আছে কি না, এই বিচার তুলিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন—সে স্মৃতি অপ্রমাণ, এ স্মৃতির মূল শ্রুতি নহে,—

"অত্র অন্যন্মূলম্, লোভাদাচরিতবন্তঃ কেচিৎ, তত এষা স্মৃতিঃ।"

এ স্থানে তাহার মূল অন্য, লোভে কেহ ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্মৃতি হইয়াছে।

আধুনিক লোকের মুখে যদি এই সমস্ত কথা বাহির হইত, তাহা হইলে আমরা তাহাকে কোনমতেই ক্ষমা করিতে পারিতাম না। কিন্তু শবরস্বামীর মুখে ইহা বাহির হইয়াছে জানিয়া সকলকেই তাহা স্তব্ধহৃদয়ে, নির্ব্বাক্‌বদনে ও অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে শবরস্বামীকে অবজ্ঞা করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মগণও ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজোক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য দৃঢ়তর করিয়াছেন। অতএব যদি কেহ—

"ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিরুর্করমকণ্টকম্।
বাপয়েৎ তত্র বীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকী॥
বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং সুভুক্তমপি ভোজয়েৎ।
ন তু মূর্খং নিরাহারং ষড়্‌রাত্রমুপবাসিনম্॥"

ব্যাসসংহিতা ৪অ০, ৪৮ ও ৫২ শ্লো০।

['ব্রাহ্মণের মুখ নিষ্কণ্টক ও কাঁকরহীন ক্ষেত্র, ইহাতে বীজ বপন করিলে (কৃষকের) কৃষি সর্ব্বকামনা পূর্ণ করে। বেদজ্ঞ বিপ্র ভালরূপে আহার করিয়া থাকিলেও আবার ভোজন করাইবে, কিন্তু যদি মূর্খ ব্যক্তি অনাহারে ৬দিনও উপবাসে থাকে, তবুও তাহাকে খাওয়াইবে না।']

ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া, শবরস্বামীর মতানুসারে, তাহাদিগকে কোন বুভুক্ষু ব্রাহ্মণের লোভমূলক বলিয়া নিশ্চয় করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করা শক্ত। এইরূপ—

"ফাল্গুনী ফল্গুনীযুতা চেৎ, তস্যাং ব্রাহ্মণায় সুসংস্কৃতং স্বাস্তীর্ণং শয়নং নিবেদ্য, ভার্য্যাং মনোজ্ঞাং রূপবতীং দ্রবীণবতীং চ প্রাপ্নোতি।"

"জ্যৈষ্ঠী জ্যৈষ্ঠযুতা চেৎ স্যাৎ, ছত্রোপানহপ্রদানেন গবাধিপত্যং প্রাপ্নোতি।"

বিষ্ণুস্মৃতি ৯ অ০, ২৪।১১ ইত্যাদি।

এই সমস্ত স্মৃতিবচনের যদি কেহ শবরস্বামীর দোহাই দিয়া ব্যাখ্যা করেন—ফাল্‌গুনে নববসন্তসমাগমে বিলাসভোগের জন্য সুকোমল সুসংস্কৃত শয্যার প্রয়োজন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের তাহা দুর্লভ; একটি বচন উদ্ভূত হইল—যদি কেহ ঐ সময়ে ঐরূপ শয্যা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করে, সে মনোহারিণী, রূপবতী ও ধনবতী ভার্য্যা পায়; জ্যৈষ্ঠমাসের প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণে নগ্নচরণে ও অনাবৃতমস্তকে ভ্রমণ করা অত্যন্ত কষ্টকর; অতএব বচন রচিত হইল—জ্যৈষ্ঠমাসে ব্রাহ্মণকে ছত্র ও পাদুকা দান

করিলে গবাধিপত্যলাভ হয়; তাহা হইলে ঐ স্মৃতিবচনগুলির প্রামাণ্যরক্ষা শবরস্বামীর মতানুসারে অতি দুষ্কর।

জৈমিনির "হেতুদর্শনাচ্চ" এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভাষ্যকার শবরস্বামী স্মৃতিসম্বন্ধে নিজের যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট তাহা ভাল বিবেচনা করেন নাই। তিনি এস্থানে অন্য বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"হেতুদর্শনাচ্চ" এই সূত্রদ্বারা

"বৈসর্জ্জনহোমীয়ং বাসোঽধ্বর্য্যুর্গৃহ্লাতি"—

ইত্যাদি স্মৃতিবচনের লোভমূলকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে না—এ স্থানে তাহা বিচার্য্য নহে। কিন্তু শ্রুতিমূলক বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে স্মৃতির প্রামাণ্য যেমন সাধিত হইয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধস্মৃতিও স্মৃতির অন্তর্গত হইতে পারে বলিয়া তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বস্তুত তাহা অভিপ্রেত নহে। এজন্য ঐ সূত্রদ্বারা বৌদ্ধস্মৃতির প্রামাণ্য নিরাস করা হইয়াছে। বেদমূলক বলিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, কিন্তু বৌদ্ধস্মৃতি বেদমূলক নহে, স্পষ্টতই সেই স্মৃতিতে বেদের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।

বার্ত্তিককার যে ঐ-সূত্রের এতাদৃশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে ঠিকই হইয়াছে, বলিতে হইবে। তাঁহার সময়ে বৈদিকধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা অত্যন্ত প্রতিহত হইয়াছিল। বৌদ্ধদেরই সেই সময়ে অত্যন্ত প্রাধান্য হইয়া উঠিয়াছিল, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। কুমারিলভট্ট বৌদ্ধাচার্য্যের নিকটেই বিদ্যাশিক্ষা করেন। বৌদ্ধাচার্য্যের নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিলেও, পরে তিনি বৈদিকধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মধ্বংসে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, এ সমস্ত তাঁহাদের অবিদিত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ ও বৈদিকধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই কুমারিলভট্টের জন্ম হয় বলিয়া ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শঙ্করদিগ্বিজয়কার লিখিয়াছেন, বৌদ্ধদের দ্বারা বৈদিকধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিয়া, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবগণের কেহ কেহ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন। কুমারিলভট্ট তাঁহাদের মধ্যে কুমার—কার্ত্তিকেয়। কুমারিলভট্ট সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা শঙ্করদিগ্বিজয়ের নিম্নলিখিত একটি বচনই প্রকাশ করিতে পারিবে—

"কুমারিলমৃগেন্দ্রেণ হতেষু জিনহস্তিষু।
নিষ্প্রত্যূহমবর্দ্ধন্ত শ্রুতিশাখাঃ সমন্ততঃ॥"

কুমারিলসিংহদ্বারা বৌদ্ধহস্তিগণ হত হইলে, শ্রুতিশাখাসমূহ চারিদিকে নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

যাহাই হউক, বৌদ্ধগণের প্রতি কুমারিলভট্টের যে বিদ্বেষ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ভাষ্যকার বৌদ্ধস্মৃতিসম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও, তিনি যে তাহার প্রামাণ্যনিরাকরণে প্রয়াসী হইবেন, তাহা স্বাভাবিক। বার্ত্তিককার বৌদ্ধস্মৃতির প্রামাণ্য পূর্ব্বোক্তরূপে নিরাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি পরেও এসম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বৌদ্ধ-

বিদ্বেষ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এ স্থানে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি—

"শিষ্টাঽকোপেঽবিরুদ্ধমিতি চেৎ।" "ন শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ।" "অপি বা কারণাগ্রহণে প্রযুক্তানি প্রতীয়েরন্।"

১অ, ৩পা, ৫—৭।

এই তিনটি জৈমিনিসূত্রের অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকার আর্য্যস্মৃতিসম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাহা এই—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"বেদং কৃত্বা বেদিং করোতি"—

বেদ (কুশনির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী) করিয়া বেদি (গার্হপত্য ও আহবনীয় এই দুই অগ্নির মধ্যস্থিত চতুরঙ্গুল খাতভূমি) করিবে। এই বেদ ও বেদি প্রস্তুত করিবার মধ্যে যদি ক্ষুৎ (হাঁচি) প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে স্মৃতি বলিতেছেন—

"আচান্তেন কর্ত্তব্যম্"—

আচমন করিয়া পরবর্ত্তী কাজ করিবে। কিন্তু "বেদং কৃত্বা বেদিং করোতি" এই শ্রুতিতে বেদ ও বেদিনির্ম্মাণরূপ উভয় কর্ম্মের আনন্তর্য্য প্রতীত হইতেছে; অর্থাৎ বেদ করিয়া বেদিকেই করিবে। এই উভয় ক্রিয়ার মধ্যে যদি আচমন করা যায়, তাহা হইলে বেদ করিয়া বেদি করা হইল না। অতএব এ স্থলে আচমনবিধায়ক ঐ স্মৃতিবচনটির প্রামাণ্য আছে কি না? ইহার উত্তর এইরূপ—শ্রুতিতে যেরূপ বেদ ও বেদিকরণরূপ দুইটি পদার্থ বিহিত হইয়াছে, আচমনও স্মৃতিদ্বারা সেইরূপ বিহিত পদার্থ। বেদবেদির আনন্তর্য্যরূপ ক্রম ঐ পদার্থনিষ্ঠ ধর্ম্ম। অপ্রধান ক্রমের জন্য প্রধানভূত আচমনরূপ পদার্থের বাধ হইতে পারে না। অতএব ঐ স্মৃতি প্রমাণ।

কুমারিলভট্ট এ স্থানে পুনর্ব্বার বৌদ্ধস্মৃতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসাঞ্চ, অপরিগ্রহঞ্চ, সত্যঞ্চ যত্নেন রক্ষেৎ"—

ইহা শ্রুতির কথা। আবার বৌদ্ধস্মৃতিও ব্রহ্মচর্য্য-অহিংসাদি-পালনের জন্য বিধান দিয়াছে। অতএব এতাদৃশ বৌদ্ধস্মৃতির যখন বেদের সহিত কোন বিরোধ নাই, তখন তাহার প্রামাণ্যস্বীকারে দোষ কি? এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তিনি বলিয়াছেন—যেমন গঙ্গোদক (কেহ কেহ এ স্থানে গোক্ষীর বলেন) পবিত্র হইলেও কুক্কুরচর্ম্মপুটকের মধ্যে (খদৃতিস্থ) থাকিলে, তাহা অগ্রাহ্য, সেইরূপ অহিংসাদি উপাদেয় হইলেও বৌদ্ধস্মৃতিসংসর্গে তাহা অনুপাদেয়,—বৌদ্ধস্মৃতি হইতে তাহাকে গ্রহণ করিবে না। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কোন ফলসাধন করিতে পারে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে—

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ," "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্, তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে," "ধর্ম্মজ্ঞসময়ঃ প্রমাণম্"...ইত্যাদি।

বার্ত্তিককারের এ কথাগুলি একটু অদ্ভুতরকমের। এ স্থানে আমরা কয়েকটি মনুর বচন উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা মনে করিতেছি। মনুর সম্বন্ধে বেদে লিখিত হইয়াছে—

"যদ্বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্।"—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

বিবাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তম্ অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥"

শুনিতে পাই, বার্ত্তিককার বৌদ্ধাচার্য্য হইতেই বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে গুরুর প্রতিবাদ করায় পাপবোধে তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বোধ হয় ভাষ্যকার শবরস্বামী ধর্ম্মমীমাংসায় অপক্ষপাতী ও উদার ছিলেন; কর্ত্তব্যজ্ঞানে তিনি কতকগুলি স্মৃতিবাক্যের স্পষ্টকথায় অপ্রামাণ্য দেখাইয়া দিয়াছেন। বার্ত্তিককার এ বিষয়ে ভাষ্যকারকে যেন ইচ্ছা করিয়াই অনুসরণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতও শবরস্বামীর মতগ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সে সময়ে অতি দুষ্কর হইয়াছিল। কেন না, তিনি তখন বৌদ্ধধর্ম্মকে সমূলে উন্মূলিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় যদি কেহ তাঁহাকে তাঁহার স্বপক্ষস্থিত স্মৃতিগুলির দোষ প্রদর্শন করে, তবে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রভূত অন্তরায়। এজন্য তিনি পূর্ব্বে, যে-কোন প্রকারে হউক, স্বপক্ষ সমর্থিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মস্তকে মুদ্গরপাতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

বেদ ও বেদাবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন সাধুশিষ্টগণের আচারও আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে বলিয়া, ঐ সদাচারও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রস্থানীয়। অতএব তৎসম্বন্ধে মীমাংসকগণের দুইচারিটি কথা প্রকাশ করা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

বসন্তোৎসব প্রভৃতি কতকগুলি আচার আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে, ইহাদের মূলস্বরূপ কোন শ্রুতি বা স্মৃতিবচন পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় ঐ আচারের কোন প্রামাণ্য আছে কি, না, এই কথা উত্থাপন করিয়া বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, যদিও ঐ আচারের মূল শ্রুতি বা স্মৃতি না পাওয়া যায়, তথাপি তাহা বহুপূর্ব্ব হইতে শিষ্টগণদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে; যদি তাহার অপ্রামাণ্য-আশঙ্কা থাকিত, তবে বেদজ্ঞ শিষ্টগণ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন না। যদিও গ্রন্থবাহুল্যভয়ে মনু প্রভৃতি স্পষ্টত ঐ উৎসবাদির কথা উল্লেখ করেন নাই, তথাপি সামান্যরূপে বলিয়া গিয়াছেন—"শ্রুতিঃ, স্মৃতিঃ, সদাচারঃ"—ধর্ম্মে প্রমাণ। এই হেতু অন্যত্রও দেখা যায়। উক্ত হইয়াছে—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্, তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে;"
"ধর্ম্মজ্ঞসময়ঃ প্রমাণং বেদাশ্চ।"

এইরূপে শিষ্টাচার ধর্ম্মে প্রমাণ হইলেও সর্ব্বত্র হইবে না। স্মৃতি যেমন বেদমূলক বলিয়া ধর্ম্মে প্রমাণ, শিষ্টাচার সেরূপ নহে। বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতির প্রামাণ্য নষ্ট হয়, সেইরূপ স্মৃতির সহিত শিষ্টাচারের বিরোধ থাকিলে শিষ্টাচারের প্রামাণ্য যায়। বেদের সহিত বিরোধে যে, সদাচার মোটেই টিকিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করিতে হইলে যেমন শ্রুতির অনুমান করিতে হয়, সদাচারের প্রামাণ্যস্থাপনে সেইরূপ স্মৃতির অনুমান করিতে হয় এবং ঐ অনুমিত স্মৃতির দ্বারা শ্রুতির অনুমান হইয়া থাকে। অতএব স্মৃতি ও সদাচারের মধ্যে বেদাপেক্ষায় স্মৃতির একান্তরিত ও সদাচারের ব্যন্তরিত

প্রামাণ্য ও তজ্জন্য সদাচার অপেক্ষা স্মৃতির প্রামাণ্য বেশী। বার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে—

"আচারাৎ তু স্মৃতিং জ্ঞাত্বা স্মৃতেশ্চ শ্রুতিকল্পনম্।
তেন হ্যন্তরিতং তেষাং প্রামাণ্যং বিপ্রকৃষ্যতে ॥"

অতএব যদি এরূপ স্থান উপস্থিত হয়, যেখানে সদাচারের সহিত স্মৃতির বিরোধ দেখা যায়, সে স্থানে তাদৃশ শিষ্টাচার ত্যাগ করিতে হইবে; যথা—দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যাবিবাহ। দাক্ষিণাত্যে অনেকেই পূর্ব্বপরম্পরাক্রমে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করেন। ইহা শিষ্টাচারের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া তাঁহারা বলেন। কিন্তু তাহা পরিত্যাজ্য। কেন না, স্মৃতির সহিত তাহার বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি বলিতেছেন—

"মাতুলস্য সুতামূঢ়্বা মাতৃগোত্রাং তথৈব চ।
সমানপ্রবরাঞ্চৈব ত্যক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥"*

আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন আচার সমগ্র ভারতে অনুষ্ঠিত না হইয়া প্রদেশবিশেষে অনুষ্ঠিত হয়; যথা প্রাচ্যদেশে 'হোলাক' (১), দাক্ষিণাত্যে 'আহ্নীনৈবুক' (২), উদীচ্যদেশে, উদ্বৃষভযজ্ঞ (৩) † ও হারীতাদি স্মৃতি কোন কোন স্থানে প্রচলিত। এস্থানে কথা হইতেছে, হোলাকাদি উৎসব কেবল প্রাচ্যদেশবাসীই করিবেন, কি অপরাপরদেশবাসীও করিবেন? দেখিতে পাওয়া যায়, গোত্রানুসারে কেহ কেহ তিনটি বা পাঁচটি শিখা ধারণ করেন। এইরূপ যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, হোলাকাদি উৎসব প্রাচ্যাদি দেশমাত্রেই প্রচলিত, তখন ঐ-দেশবাসীই তাহার অনুষ্ঠান করিবেন, অপর দেশ তাহা করিতে পারেন না। মীমাংসকগণ এখানে বলিতেছেন—হোলাকাদি উৎসবের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ নহে; ঐ উৎসবরূপ সদাচারের দ্বারা স্মৃতি ও তাহার দ্বারা বেদের অনুমান করিয়া তবে তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বেদে সাধারণের জন্য ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে,—ব্যক্তিবিশেষ বা দেশবিশেষবাসীর প্রতি নহে। অতএব যাহার প্রামাণ্যে হোলাকাদি উৎসবের প্রামাণ্য, সেই বেদ কখনও বলিতে পারেন না, প্রাচ্যদেশবাসীই তাহা করিবেন, অন্যদেশবাসী করিবেন না।

"পদার্থাঃ কর্ত্তব্যা ইতি হি প্রমাণমস্তি, ব্যবস্থায়াস্তু ন কিঞ্চিৎ প্রামাণ্যম্"...

শাবরভাষ্য।

পদার্থ কর্ত্তব্য, ইহার প্রমাণ আছে; দেশভেদাদির ব্যবস্থার কোন প্রমাণ নাই। গোত্রভেদে বিভিন্ন শিখাধারণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তাহার কথা এখানে উঠিতে পারে না। আরও, দেখিতে গেলে দেশব্যবস্থা সম্ভবই নহে। কারণ, কে প্রাচ্য, কে প্রতীচ্য, তাহারই নির্ণয় হইতে পারে না।

* মাতুলকন্যার বিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা দাক্ষিণাত্যবাসিগণ স্বীকার করেন না। "তৃপ্তাং জুহুর্মাতুলস্যেব যোষা" ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রের কষ্টকল্পিত অর্থদ্বারা ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি শিষ্টব্যক্তির মাতুলকন্যার পরিণয়দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিয়া মাতুলকন্যাবিবাহকে তাঁহারা সমর্থিত করিয়া থাকেন।

† (১) হোলাক—বসন্তোৎসব; পশ্চিমের 'হোলি' এই 'হোলাক' হইতেই উৎপন্ন। (২) স্বস্বকুলক্রমাগত করঞ্জার্কাদি-স্থাবরদেবতা-পূজার নাম আহ্নীনৈবুক। (৩) জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় বলীবর্দ্দগণকে পূজা করিয়া দৌড়ান হয়, ইহার নাম উদ্বৃষভযজ্ঞ।

তত্তদ্দেশসংযোগে প্রাচ্যপ্রতীচ্যাদি আখ্যা হয় বলিতে হইবে। এস্থানে যদি কেহ দক্ষিণদেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরদেশে আসিয়া বসতি করে, কিন্তু সে তবুও 'আস্তৈনেবুক' অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; উত্তরদেশ হইতে দেশান্তরে যাইলেও দেখা যায়, ঐ ব্যক্তি 'উদ্দৃক্ষযজ্ঞ' করে; প্রতীচ্য প্রাচ্যদেশে আসিলে সে নিয়মপূর্ব্বক প্রাচ্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না।

এস্থানে বলা যাইতে পারে—দেশ-সংযোগে আখ্যা হয়, তুমি বলিয়াছ; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কেন না, দেখা যায়, মথুরা হইতে কোন ব্যক্তি দেশান্তরে গেলেও, লোকে তাহাকে 'মাথুর' বলিয়া থাকে,—যদিও সে সময়ে তাহার সহিত মথুরার সংযোগ নাই। ভাষ্যকার শবরস্বামী ইহার উত্তর দিয়াছেন—লোকের আখ্যা দেশ-সংযোগেই হয়, কিন্তু ঐ সংযোগ অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ হইতে পারে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়—যে মথুরা হইতে বহির্গত হইয়াছে (যাহার সহিত মথুরার সংযোগ অতীত হইয়াছে), সে 'মাথুর'; যে মথুরায় রহিয়াছে (যাহার সহিত মথুরার সংযোগ বর্ত্তমান) সে 'মাথুর'; আবার যে ব্যক্তি মথুরাভিমুখে প্রস্থিত (যাহার সহিত মথুরার সংযোগ হইবে), সেও মাথুর। যাহার সহিত এই ত্রিবিধ সম্বন্ধের অন্যতম নাই, তাহাকে কেহ 'মাথুর' বলে না।

অতএব প্রাচ্যপ্রতীচ্যাদিভেদে ধর্ম্ম-ব্যবস্থা হইতে পারে না—ধর্ম্ম সাধারণ। দেশভেদে ব্যবস্থাসম্বন্ধে আমরা শবরস্বামীর যে কয়টি কথা আলোচনা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত নয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, স্মৃতিপুরাণাদিতে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। যথা—

"যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥" মরীচিস্মৃতি।

যে স্থানে যেরূপ শৌচ ও যাদৃশ ধর্ম্মাচার, সে স্থানে তাহাই ধর্ম্ম, তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না।

এই সমস্ত বচন অবলম্বন করিয়া রঘুনন্দনাদি নব্য স্মৃতিনিবন্ধকারগণ অশৌচাদি বিবিধ বিধিকে ইহা কলিঙ্গদেশে, ইহা উৎকলে, ইত্যাদিরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। যদি শবরস্বামীর কথা মানিতে হয়, তবে ইহাদের মোটেই প্রামাণ্য নাই, বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মরীচিস্মৃতি প্রভৃতির সহিত মীমাংসকগণের উক্তির সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে পারা যায়। সম্ভবত শবরস্বামীর অভিপ্রায় এই—বেদে সাধারণের প্রতি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, দেশবিশেষবাসী বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নহে। অতএব যখন বেদের দ্বারাই বসন্তোৎসবাদির প্রামাণ্য রক্ষিত হইতেছে, তখন তাহাও সাধারণের অনুষ্ঠেয়। শবরস্বামী বৈদিক ও বৈদমূলক ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐরূপ বিধান করিয়াছেন। মীমাংসকগণের বেদই একমাত্র ধর্ম্মে প্রমাণ; এইজন্য, যে-কোন-রূপে হউক না কেন, ধর্ম্মরূপে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের মূলে বেদকে রাখিতেই হইবে ও তাহাতে তাঁহারা সচেষ্ট হইয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি স্মৃতি (পূর্ব্বোল্লিখিত) লোকস্থিতির জন্য দেশকালাদি অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যের বিধান করিয়া-

ছেন। ইঁহারা সর্ব্বত্র বেদের অনুগমন করেন নাই। তাঁহারা যে স্থানে ও যে কালে যেরূপ অনুকূল বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কেন না, স্থান ও কাল বিশেষে যাহা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যত্র তাহা হয় না। স্মৃতিগ্রন্থে এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরাশর মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারত:॥" ইত্যাদি।

এইরূপ—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকার: কমণ্ডলুবিধারণম্।

* * *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণ:॥"

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বোধ হয় পরবর্ত্তী ধর্ম্মব্যবস্থাকারগণ কেবল বেদ অনুসরণ না করিয়া দেশকালাদির অনুকূলরূপে বেদাতিরিক্ত ধর্ম্মেরও ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। অতএব যদি স্মৃতিকারগণের বেদাতিরিক্ত ধর্ম্মগুলির কোন কোনটি আজকাল লোকস্থিতির অনুকূল বিবেচিত না হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তনে কোন দোষ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

ত্রিবঙ্কুর।

৮

মহারাজা-বাহাদুরের উপদেশ-অনুসারে দেওয়ান আমার জন্য যতপ্রকার অনুষ্ঠান-আয়োজনের কল্পনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তন্মধ্যে উচ্চবর্ণের বালিকা-মহাবিদ্যালয়ে আমার অভ্যর্থনার্থ যে আয়োজন হইয়াছে, তাহাই আমি বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। উহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না।

সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আমি গৃহ হইতে যাত্রা করিলাম। কিন্তু বলিতে কি, আমার মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল;—না জানি, সেখানে গিয়া কি দেখিব। হয় ত এমন-কিছু দেখিব, যাহা শুধু কঠোর গ্রাম্য-গুরুমহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিবে; কিংবা এমন-কিছু দেখিব, যাহা অতীব নীরস, বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক। পাছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সেখানে উপনীত হই, এইজন্য তালবনের মধ্যে ঘোড়াদের ছাড়িয়া রাখিয়াছিলাম। এই তালবনে,—প্রথমে একটি, তার পর দুইটি, পরে তিনটি ক্ষুদ্র বালিকা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল;—বেশ সুশ্রী, জমকাল বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ঝকমক করিতেছে; দশবর্ষবয়স্কা, নগ্ন পদ, কেশকলাপে শাদা ফুল;—পরিধানে জরির পাড়-দেওয়া রেশমি

শাড়ী; কণ্ঠ ও বাহুস্থিত মণিমাণিক্য—নব ভানুর কিরণে উদ্ভাসিত। আমার ন্যায় উহারাও ব্রাহ্মণঘেরের অভিমুখে চলিয়াছে। আমার গাড়ি দেখিয়া, উহারা প্রাণপণে দ্রুত চলিতে লাগিল; এবং চলিবার সময়, উহাদের মহার্ঘ বস্ত্রের অঞ্চলপ্রান্ত পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল.....তবে কি উহাদের এই পরীসুলভ কিংবা অপ্সরাসুলভ সাজসজ্জা আমারই জন্য ?...

এই সব ভারতীয় পরীবালিকাগুলি উহাদের বিদ্যালয়ে গিয়া সম্মিলিত হইল। বিদ্যালয় সহসা যেন কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, এখন উহাদের ছুটির সময়। কিন্তু তথাপি উহারা আমার জন্য একটি দিনের প্রাতঃকাল ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন একটা ফুলের তোড়া উপহার দিবার জন্য আমার নিকট আসিল। ফুলের তোড়াটি বেশ সুগন্ধ ও সুসজ্জিত; ফুলগুলি জরির তারে জড়িত।

যে শিক্ষা অস্মদ্দেশে সর্ব্বোচ্ছেদকারী অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই শিক্ষা স্বরাজ্যে বিস্তার করা মহারাজের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু যতদিন ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষত থাকিবে, যতদিন ধর্ম্ম সর্ব্বোপরি বিরাজমান থাকিয়া মঙ্গল-কিরণ বর্ষণ করিবে, ততদিন ত্রিবঙ্কুরে কিছু-কালের জন্য শিক্ষা হইতে শুভফলই প্রসূত হইবে, সন্দেহ নাই।

উচ্চকুলোদ্ভবা বালিকাদিগের এই মহা-বিদ্যালয়—যাহা অস্মদ্দেশীয় বিদ্যালয়ের সমতুল্য, অথবা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই বিদ্যালয়টি মহারাজ আমাকে দেখাইবেন মনে করিয়া, যাহাতে আমার চক্ষে ইহা একটি দুর্লভদর্শন দ্রষ্টব্যজিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন; বালিকাগণের অভিভাবকদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যেন বয়োজ্যেষ্ঠাদিগের গুরুভার অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া উহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। তাই, মন্দিরের দেবীগণ যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করেন, সেইরূপ সুগঠিত মণিমাণিক্যের পুরাতন অলঙ্কারগুলি এই সকল তরুণ বাহুতে—তরুণ কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

এই বিদ্যালয়ের পড়িবার ঘরগুলি আমাদের য়ুরোপীয় ইস্কুলের পড়িবার ঘরের ন্যায়;—স্বল্প-উপকরণ ও মুক্ত-পরিসর। শুধু কতকগুলি বড়-বড় মানচিত্র শাদা দেয়ালের গায়ে ঝুলিতেছে। কচি-কচি মেয়েগুলি হইতে, বয়স্কা বালিকা পর্য্যন্ত—এই সমস্ত অপূর্ব্ব ছাত্রীবৃন্দ—আমার চক্ষে কতকগুলি পুতুল বলিয়া মনে হইল। কচি মেয়েগুলির ড্যাবা-ড্যাবা চোখের বিস্ফারিত তারা চারিদিকে ঘুরিতেছিল। শাড়ী ও জরির চোলী—এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, উহাদের তাম্রাভ নগ্নগাত্র দেখা যাইতেছিল। বড়-বড় বালিকাগুলির মাথার উপরিভাগে "ভর্জিন্"-ধরণে ফিতা বাঁধা, তাহার উপর ভারতীয় শাদা মল্‌মলের অবগুণ্ঠনবস্ত্র। যে বয়সে বালিকারা স্বীয় শরীরকে দেবালয়-বৎ সযত্নে রক্ষা করিতে প্রথম আরম্ভ করে—সেই বয়সের বালিকাদিগের দৃষ্টিতে যে উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য্যের ভাব লক্ষিত হয়, এই বালিকাদিগের মুখে ইহারি মধ্যে সেই ভাব

পরিব্যক্ত।...উহাদের প্রবন্ধরচনা, উহাদের ঐতিহাসিক রচনা আমাকে দেখাইল। ঐ ক্ষুদ্র দেবীগুলি যে-সব সুন্দর ছবি আঁকিয়াছে, তাহাও আমাকে দেখাইল। যে-সব আদর্শ আমাদের শিশুরা নকল করে—য়ুরোপ হইতে আনীত সেই-সব আদর্শচিত্র দেখিয়াই এই ছবিগুলি আঁকা। এই সব চিত্ররচনার নীচে উহাদের নাম লেখা। নামগুলি কতিপয়-পদাক্ষর-বিশিষ্ট—গানের কলির ন্যায় অতীব সুশ্রাব্য।

ছয়সাত-বৎসর-বয়স্কা একটি বালিকা, একটা "ঈগল্"-পক্ষীর ছবি আঁকিয়াছে—উহার পালকরাশি অতীব জটিল; পাখীটা বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, বালিকা মাপ-জোক্ না করিয়াই, মধ্যস্থল হইতে আঁকিতে আরম্ভ করে। সমস্ত মাথাটা কুলায়—কাগজের এরূপ উচ্চতা ছিল না; তাই, ঈগলের মাথাটা চ্যাপ্টা করিয়া আঁকিয়াছে—কাগজপ্রান্তের একেবারে গা-ঘেঁষিয়া আঁকিয়াছে; কিন্তু তবুও একটি পালক বাদ দেয় নি,—একটি খুঁটিনাটি বাদ দেয় নি। ছবির নীচে, বেশ সুস্পষ্টরূপে—জোর-কলমে—নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছে—"অপ্সরা"।

জরির কাজ-করা মখ্মল্; বাষ্পবৎ স্বচ্ছ অবগুণ্ঠন; হীরা, মাণিক, স্বচ্ছ-পান্না; সরু-সরু ক্ষুদ্র বাহুতে বড়-বড় বালা সূতা দিয়া আবদ্ধ; দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পোর্টুগীজ-মুদ্রায় গ্রথিত কণ্ঠহার;—যে সময়ে গোয়ার সমৃদ্ধ অবস্থা,—এই মুদ্রাগুলি সেইসময়কার;—চন্দনকাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে না জানি কত শতাব্দী ধরিয়া ঘুমাইয়া ছিল!

সর্ব্বশেষে গান, বহু বেহালার সমবেত-বাদ্য, তাহার পর নৃত্য। নৃত্য অতীব জটিল ও বিলম্বিত—একটু ধর্ম্মভাবান্বিত; তালে-তালে পা পড়িতেছে, বাহুসঞ্চালনে মণি-মাণিক্য ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।...

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেশ সুন্দর-সুশ্রী; সচরাচর এরূপ দৃশ্য দেখা যায় না। আর, উহাদের কি সুন্দর চোখ!—এরূপ চোখ একমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা যায়। অহো! রহস্যের এই কুসুমকলিকাগুলি কি-এক অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় অকলুষ সৌন্দর্য্যের ছবি আমার মনে অঙ্কিত করিয়া দিল!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবজীবনের আদর্শ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

প্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্যে প্রায়ই নবজীবন বলিতে এই স্বাভাবিক জীবনের অতীত, এই জীবনের বিরোধী একটা স্বতন্ত্র অতি-প্রাকৃত আদর্শকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এ জীবন বিষয় ও ইন্দ্রিয় লইয়া, সে জীবন বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। এ জীবন সংসারের প্রয়োজনায়োজনাদি দ্বারা পরিচালিত, সে জীবন সর্ব্বপ্রকারের সংসার-

সম্পর্কবর্জ্জিত। সে জীবন পাইতে হইলে এ জীবনকে খর্ব্ব করিতে হইবে। প্রাণপণ সাধন করিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়সম্পর্ক-বিমুখ করিতে হইবে। বহিরিন্দ্রিয়কে বহির্বিষয় হইতে, মনকে বহিরিন্দ্রিয় হইতে, বুদ্ধিকে মন হইতে, আত্মাকে বুদ্ধি হইতে প্রত্যাহার করিয়া, ক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি পঞ্চকোষ ভেদ করিতে হইবে এবং এইরূপে সর্ব্বপ্রকারের বহিঃসম্বন্ধ-বর্জ্জিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে। প্রাচীন তন্ত্রে সাধারণত ইহাই নবজীবনের অর্থ ও আদর্শ ছিল।

সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা আত্যন্তিক বিরোধ কল্পনা করিয়াই প্রাচীন ধর্ম্মসকল নবজীবনের এই নিরতিশয়-সংসারবিমুখ আদর্শের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। সংসার যদি পরমার্থবিরোধী হইল, তবে পরমার্থসাধন করিতে গেলে সংসারকে তো বর্জ্জন করিতেই হইবে। আর সংসার ও পরমার্থের মধ্যে এই বিরোধ সর্ব্বত্রই নির্গুণব্রহ্মবাদ হইতে উৎপন্ন হয়। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, সকল ধর্ম্মতন্ত্রেই নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও পরমার্থের মধ্যে এই বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহারই ফলস্বরূপ নবজীবনের এই নিতান্তসংসারবিমুখ আদর্শও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার, কি আমাদের দেশে, কি অন্যত্র, সর্ব্বত্রই সগুণব্রহ্মবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম আদর্শও সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে আসিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

নির্গুণব্রহ্মবাদ ব্রহ্মকে সত্তামাত্রে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারকে মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করিয়া থাকে। নির্গুণব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের অতীত, আমাদের ধারণার অতীত, আমাদের বাক্যমন সকলেরই অতীত। নির্গুণের ভাবনা নাই, নির্গুণের ভজনা নাই, নির্গুণে প্রেমভক্তি কিছুই প্রকৃতপক্ষে সম্ভবে না। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে—তাহার কেবল সত্তামাত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু উপলব্ধি কদাপি সম্ভব নহে। নির্গুণব্রহ্ম শুদ্ধ প্রজ্ঞালভ্য। সমাধিতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। আর সর্ব্বপ্রকারের বহিঃসম্পর্ক ও বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত না হইলে সমাধির সূচনাই হয় না। সমাধিতে জ্ঞাতা নাই, জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ নাই; তখন কে কাহাকে কাহার দ্বারা দেখে, কে কাহাকে কাহার দ্বারা শোনে,—স্বপ্নবিরহিত গভীর নিদ্রার ন্যায় সে অবস্থা। এই সমাধি যখন অধ্যাত্মজীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতারূপে গৃহীত হয়, তখন ধর্ম্মজীবনের আদর্শ যে নিতান্ত অন্তর্মুখীন ও সংসার-বিমুখ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু সগুণব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইলে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ আর পূর্ব্বেকার মত নিতান্ত সংসারবিমুখ থাকিতে পারে না। সংসার তখন মায়াচ্ছন্ন হইলেও ব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে সংসারকে জানা তখন আবশ্যক হইয়া উঠে; কারণ সংসার ব্রহ্মেরই প্রকাশ ও অভিব্যক্তি।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

ঊর্দ্ধ যাহার মূল, অধ যাহার শাখা, বেদসকল যাহার পত্র, যাহাকে অব্যয় অশ্বত্থ বলা হইয়া থাকে, তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ।*

কিন্তু প্রথম-প্রথম সগুণ-নির্গুণের মধ্যে যেমন, সংসার ও পরমার্থের মধ্যেও সেইরূপ স্বভাবতই একটা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা দেখা যায়। সগুণকে তখন নির্গুণের নিম্ন অবস্থা, সংসারকে পরমার্থের নিম্নসোপানরূপে গ্রহণ করা হয়। ব্রহ্ম নির্গুণ, এই নির্গুণব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। তবে এই নিতান্ত নির্গুণের দ্বারা গুণময়ী সৃষ্টির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় না বলিয়া, সেই নির্গুণ হইতেই মায়াপ্রভাবে হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর প্রভৃতি সগুণ তত্ত্বের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া জড়চেতনময় বিশ্বের একটা যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়, না করিলে এই জগতের উৎপত্তিস্থিতিলয়াদির উপযুক্ত মীমাংসা হইয়া উঠে না। নির্গুণের ভজনসাধন নাই, মায়োপহিত সগুণ ঈশ্বরাদির ভজনসাধন সম্ভব। কিন্তু সগুণ ঈশ্বরাদিকে অতিক্রম না করিলে মুক্তিলাভও হইতে পারে না। সেইরূপ সংসার ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম না করিলে পরমপুরুষার্থলাভ হয় না।

> ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
> নান্তো নচাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
> অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
> মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা॥
> ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
> যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
> তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
> যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

এই সংসারবৃক্ষের স্বরূপ ইহলোকে কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার অন্তও নাই, আদিও নাই, অথচ ইহার স্থির প্রতিষ্ঠাও নাই। নিরতিশয়বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থকে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া, তদনন্তর, 'যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষকে আশ্রয় করি' এই বলিয়া সেই স্থান অন্বেষণ করিবে, যেখানে গিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

এখানেও সংসারবিমুখ ভাবই প্রবল রহিয়াছে, তবে ব্রহ্মে সংসারের একটা সত্য ও অনাদ্যনন্ত মূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র।

এই সগুণব্রহ্মতত্ত্ব যখন ক্রমে পরিপূর্ণ ভগবত্তত্ত্বে ফুটিয়া উঠে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম আদর্শ পূর্ব্বেকার একান্ত অন্তর্মুখীনতা ও সংসারবিমুখতা পরিত্যাগ করিয়া, ইহজীবনের জ্ঞান-ভোগাদির উপরেই সহজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

নবজীবনের এই আধুনিক আদর্শ, মূলত ও বস্তুত শ্রেষ্ঠতম ভগবত্তত্ত্বেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ভগবান্ পূর্ণপুরুষ; তিনি নিতান্ত নির্গুণও নহেন, নিতান্ত সগুণও নহেন, সগুণ ও নির্গুণ তাঁহার দুই ভিন্ন দিক্ মাত্র। ব্রহ্মভাব ও পরমাত্মভাব, উভয়ই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, উভয়কে ধারণ করিয়া তিনি পূর্ণপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছেন।

> বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

তত্ত্ববিদেরা যে অদ্বয় জ্ঞানবস্তুকে তত্ত্ব

বলিয়া থাকেন, তাঁহাকেই উপনিষদ্ ব্রহ্মনামে, যোগিগণ পরমাত্মনামে এবং ভক্তেরা ভগবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্মা, আর কোথাও বা ভগবান্ নামে সেই অখণ্ড অদ্বয়বস্তুই অভিহিত হন বলিয়া নামভেদে যে তাঁহার স্বরূপধারণাসম্বন্ধে কোন বিভিন্নতা জন্মে না, তাহাও নহে। ব্রহ্ম বলিতে শুদ্ধ জগৎকারণকেই বুঝাইয়া থাকে। সেই অদ্বয়জ্ঞান বিশ্বের মধ্যে জন্মস্থিতিভঙ্গহেতুরূপে যতটা প্রকাশিত হন, তাহাই ব্রহ্মশব্দবাচ্য। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—জগতের জন্ম-আদি যাঁহা হইতে ; "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"—যাঁহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা স্থিতি করে, প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি ভূতসকল গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম। এক কথায় বলিতে গেলে, তটস্থলক্ষণের দ্বারা যতটুকু পরমতত্ত্ব জানিতে পারা যায়, ততটুকুই বিশেষভাবে ব্রহ্মপদবাচ্য। জগৎচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ জানিতে পারি, আত্মচিন্তা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। আত্মার মধ্যে, আত্মার রূপে তাঁহাকে স্বরূপত দেখিতে পাই। এই আত্মাতেই নির্গুণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি। কারণ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ব্যাপার, আমাদের প্রত্যেক বিষয়জ্ঞান, আমাদের প্রত্যেক রসসম্ভোগ, আমাদের প্রত্যেক ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ অন্তরস্থিত এই নির্গুণ সাক্ষিচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হয়। জীবনের প্রত্যেক ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতার মূলে এই নিত্যচৈতন্য বিরাজ করিতেছেন। মনের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই নিত্যজ্ঞান লুক্কায়িত থাকিয়া, উভয়কেই প্রকাশ করিতেছেন। বুদ্ধির বিচারের মূলেও এই নিত্যজ্ঞান বিরাজিত। আপনি সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত থাকিয়া জীবনের দৈনন্দিন বিকারের সাক্ষ্য তিনিই দিতেছেন। আপনি সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের অতীত থাকিয়া সকল পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য তিনিই দিতেছেন। নদীগর্ভে প্রোথিত সুদীর্ঘ বংশখণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যেমন নদীজলের হ্রাসবৃদ্ধি জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এই সাক্ষিচৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা বালক বা বালিকা, যুবক বা যুবতী, প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, রুগ্ণ বা সুস্থ, সুখী বা দুঃখী, ধনী বা নির্ধন ছিলাম, এ সকল কথা বলিতে পারি। সকল অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বদা যে "আমি আমি" বলি, তাহা কেবল এই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মবস্তু এই আমির সঙ্গে একাত্মভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন বলিয়া। নতুবা কে "আমি আমি" ও "আমার আমার" বলিয়া জীবনের একত্ব অনুভব করিতে পারিত ? জীবচৈতন্যের মূলে, মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাদির অবিরাম চাঞ্চল্যের মধ্যে, নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অহর্নিশ যে সাক্ষিচৈতন্য জ্বলিতেছেন, তাহাই পরমাত্মা। মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাদি হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া এই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়।

কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন পরমতত্ত্বের একাংশ-

মাত্র ব্যক্ত করে, পরমাত্মতত্বও সেইরূপ অপরাংশমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্রহ্মতত্ব অজ্ঞেয় তত্ব—কেবল সত্তামাত্রজ্ঞেয়। পরমাত্মতত্ব নিগুর্ণতত্ব, শুদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকার-লভ্য। ওখানে কারণরূপে তত্ববস্তুকে জানিলাম, কিন্তু স্বরূপ জানিলাম না। এখানে স্বরূপ জানিলাম বটে, কিন্তু এই বিপুল বিশ্ব তাঁহার বাহিরে পড়িয়া রহিল। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বিবর্ত্তনে যে আত্মভূত শক্তি, অচিন্ত্য জ্ঞান, অপূর্ব্ব আনন্দ ও অক্লান্ত কল্যাণ অবিরাম স্ফুরিত হইতেছে, ইহার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে, জানিতে, তাঁহাকে সম্ভোগ ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না। ব্রহ্মরূপে তাঁহাকে জানিয়া শান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দ আস্বাদন করিলাম না; পরমাত্মরূপ তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইয়া চিদানন্দমাত্র লাভ করিলাম, কিন্তু তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও বিচিত্রলীলা দেখিতে ও আস্বাদন করিতে পাইলাম না।

ভগবদ্রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেই তাঁহার এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও এই বিচিত্রলীলা জানিতে ও সম্ভোগ করিতে পারা যায়। ভগবত্তত্ব পূর্ণতত্ব। ব্রহ্মতত্ব তাহার একাংশ-মাত্র, পরমাত্মতত্বও তাহার অপরাংশমাত্র। ব্রহ্ম বহির্জগতে, পরমাত্মা অন্তররাজ্যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। ভগবানে উভয়ে সম্মিলিত হন। কারণ, একদিকে ভগবান্ সকল ঐশ্বর্য্য, সকল জ্ঞান, সকল মহিমা, সকল মাধুর্য্যের আধার বলিয়া বিশ্বের ঐশ্বর্য্য, অচিন্ত্য জ্ঞান, অত্যদ্ভুত মহিমা ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অন্য-দিকে তিনিই পরমাত্মরূপে, অন্তর্যামিরূপে, জীবের অন্তর্নিহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপে, তাহার জ্ঞান, ভাব, চেষ্টা, সমুদায়কে ধারণ করিয়া, সমুদায়ের প্রেরয়িতা ও ফলদাতা হইয়া, তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। আবার লীলাময়রূপে তিনিই হাস্যাদ্ভুতকরুণরৌদ্র প্রভৃতি অশ্রেষ্ঠ ও শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রসের আধার ও প্রতিষ্ঠারূপে প্রকাশিত হইতেছেন। যে পরমপুরুষে সকল জ্ঞান, সকল রস, সকল চেষ্টা পরিপূর্ণতা ও সফলতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধ সত্তামাত্রজ্ঞেয় আংশিক ব্রহ্মতত্ব বা শুদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকারলভ্য নিগুর্ণ পরমাত্ম-তত্বকে তাঁহার অঙ্গ-আভা ও অংশবিভূতি বলা হইয়াছে, ইহা আর বিচিত্র কি?

> তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
> উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
> আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
> সেহ ভগবানের অংশবিভূতি যে হয়॥
> অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
> তৈছে জীব ভগবানের অংশ প্রকাশে॥

এই ভগবত্তত্ব প্রকাশিত হইলেই ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ আপনার পূর্ব্বতন সংসার-বিমুখতা বর্জ্জন করিয়া ইহজীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-শক্তি-সৌন্দর্য্য-কল্যাণাদি-সাধনে নিযুক্ত হয়। কারণ ইষ্টদেবতা তখন সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আধার ও প্রতিষ্ঠারূপেই প্রকাশিত হন এবং তখন ইহজীবনের বিত্তাসম্পৎশক্তিসৌন্দর্য্য প্রভৃতিকে বর্জ্জন বা খর্ব্ব করিয়া নহে, কিন্তু এ সকলের যথাযোগ্য বিকাশসম্পাদনের দ্বারাই মানবধর্ম্ম সফলতা প্রাপ্ত হয়।

ভগবত্তত্ত্ব যেমন সগুণনির্গুণের প্রাচীন বিরোধ ভঞ্জন করিয়া উভয়কে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয়, সেইরূপ সংসার এবং পরমার্থের প্রাচীন বিরোধেরও মীমাংসা করিয়া, সংসারেই পরমার্থের ও পরমার্থেই সংসারের প্রতিষ্ঠা এবং পরস্পরের সাহায্যে উভয়েরই পরিপূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভগবান্ ভক্তিরই উপজীব্য ; এবং সংসার ব্যতীত প্রকৃত ভক্তিসাধন কদাপি সম্ভব হয় না। ভগবান্‌কে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তিরূপে সম্ভোগ করাই ভক্তির চরম লক্ষ্য। হাস্যাদ্ভুতকরুণরৌদ্র প্রভৃতি রসের মধ্যে তাঁহার রস আস্বাদন করা, দাস্যসখ্যবাৎসল্য প্রভৃতি সম্বন্ধের মধ্যে তাঁহার ভজনা করা ভক্তির চির-আকাঙ্ক্ষা। সংসারেই এ সকল রস ও এ সকল সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্দ্রিয়সকলকে সতেজ না করিলে, মনোবৃত্তিসকলকে সজীব ও সচেষ্ট না করিলে, বিষয়জ্ঞান বিকশিত না করিলে, নরনারীর সঙ্গে জনসমাজের ও পরিবারের বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইলে, হাস্যাদ্ভুতকরুণরৌদ্র প্রভৃতি অশ্রেষ্ঠ এবং শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রস, কিছুই কদাপি আস্বাদন করিতে পারা যায় না। জড় ও জীব, এই বিচিত্র নিসর্গ ও এই বিচিত্রতর মানবসংসার, সকলই এই সমুদয় রসের আধার ও প্রত্যক্ষমূর্ত্তি। এই জড় ও জীবের আধারেই কেবল সত্যভাবে বিবিধ রস আস্বাদন ও সাধন করিতে পারা যায়। সুতরাং এই জড় ও জীব,—এবং জড় অপেক্ষা অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠভাবে এই জীব, ধর্ম্মসাধনের সহায় ও ভগবদ্ভজনের বিগ্রহরূপে তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ফলত আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভজন, উভয়ই মানবীয় জ্ঞান ও মানবীয় সম্বন্ধাদির দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে। আপনার আত্মার মধ্যে, তাহার অন্তরস্থিত সাক্ষিচৈতন্যরূপেই সাধক সত্যভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। মানবচৈতন্যের মধ্যেই ব্রহ্মচৈতন্য,—মানবজ্ঞানের মধ্যে তাহার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠারূপেই ব্রহ্মজ্ঞান জীবের নিকটে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার আত্মশক্তির মধ্যেই প্রত্যক্ষরূপে জীব ব্রহ্মশক্তির স্বরূপজ্ঞান লাভ করে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের, আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতির উপায়ান্তর নাই। সেইরূপ মানবপ্রেম ব্যতীত ভগবৎপ্রেমের অন্য প্রকাশ ও আধার কিছুই নাই। যখন আমরা—

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু—

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় জ্ঞানদান কর, তোমাকে নমস্কার,—এই বলিয়া ভগবচ্চরণে প্রণত হই, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ পিতৃস্নেহের মধ্যে, সেই স্নেহের জ্ঞান ও স্মৃতির সাহায্যেই, ঈশ্বরের পিতৃত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। সংসারে যে পিতৃস্নেহ সম্ভোগ করে নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন ও ভজনা করা, বন্ধ্যার পুত্রস্নেহের অভিনয়ের ন্যায় অলীক, অসার, শূন্যগর্ভা বাঙ্ময়ী কল্পনা মাত্র। আর সন্তানরূপে পিতৃস্নেহের যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহাও পরোক্ষ অভিজ্ঞতামাত্র।

সন্তান কদাপি পিতৃস্নেহের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যখন স্বয়ং বয়ঃপ্রাপ্তি-সহকারে সে আপনি পিতা হইয়া সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করে, তখনই পিতৃস্নেহ স্বরূপত যে কি বস্তু, তাঁহা সে বুঝিতে আরম্ভ করে। এইজন্ত আপনার পিতৃত্বের মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া জীব যখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, এবং জগতের সমুদায় স্নেহশীল কল্যাণকামী পিতৃমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার নিখিলপিতৃত্ব প্রত্যক্ষ করে, তখনই ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রকৃত-পক্ষে যে কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারে। এইরূপে মাতা হইয়া তাঁহার মাতৃত্ব, সখা হইয়া তাঁহার সখিত্ব, প্রেমিক পতি হইয়া বা প্রেমময়ী সাধ্বী সতীর রূপেই তাঁহার মাধুর্য্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভব ও আস্বাদন করিতে হয়। এ সকল মানবীয় সম্বন্ধ ব্যতীত, দাস্তসখ্যবাৎসল্যাদি শ্রেষ্ঠরসের মধ্যে ভগবান্‌কে রসামৃতমূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিবার ও তাঁহাকে ভজনা করিবার, অন্ত কোন উপায় নাই।

ভগবানের স্বরূপপ্রকাশ মানবের আত্মাতে,—তাঁহার শ্রেষ্ঠপ্রকৃতি জীবের মধ্যে। তাঁহার বিভূতির প্রকাশ জড়চেতনময় এই বিশ্বে। তাঁহার লীলার প্রকাশ মানবসমাজের বিচিত্র সম্বন্ধসকলের মধ্যে। ধর্ম্মসাধনে জড় এবং মানব দুয়ের কিছুকেই অবজ্ঞা করিলে চলিবে না।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

মানুষী তনু আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, মূঢ় লোকেরাই, ভূতমহেশ্বর যে আমি, আমার পরমভাব না জানিতে পারিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

ভগবানের এই মানুষভাব ধারণা করিতে পারিলে ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শে আর প্রাচীন অতিপ্রাকৃত ভাব ও সংসারবিমুখতা স্থান পাইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্যত্বসাধন ও শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মসাধন তখন একপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। কারণ, জীবের মধ্যে শিবত্বপ্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উপাধিব্যাধি।

ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ব্যাধির বহুকাল হইতে সঞ্চার হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উপাধি একটি প্রধান ব্যাধি। এই ব্যাধিটির বহু উপসর্গ, আবার ইহা সংক্রামকও বটে এবং বংশপরম্পরাগত দোষেও দুষ্ট।

দুরারোগ্য উপাধিব্যাধি যতই প্রবলতা লাভ করে, ধনীকে তত অধিকমাত্রায় লঘু করিয়া তোলে। তখন ইন্দ্রনাথবাবুর সেই অভিনব পঞ্জিকার উপাধিলোলুপ ব্যক্তির সহিত "তুলারাশির" তুলনা সত্যই বলিয়া মনে হয়।

দেশে যিনি গরীবের মা-বাপ ছিলেন, যথার্থ দেশের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিত, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সকল জাতির নিকট যাঁহার প্রকৃত রাজোচিত সম্মান ছিল, আদালত-ফৌজদারী যাঁহার মুখের কথায় মীমাংসা হইয়া যাইত, যাঁহার গৃহ দরিদ্রের মুষ্টিভিক্ষার জন্য অবারিত থাকিত, রাস্তা দিয়া যাতায়াত-কালে যিনি দুহাতের সেলাম পাইতেন—আশীর্ব্বাদ পাইতেন, উপাধির দরবারকল্পে রাজধানীতে বাস করিয়া তাঁহার বংশধরকে আজ লোকসম্মানপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে সাহেবকে সম্মান করিতে, প্যায়দাকে প্রতিনমস্কার দিতে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে—দরিদ্র প্রজা ও অতিথির প্রাপ্য রাজধানীর বহুব্যয়সাধ্য ভোজে ব্যয় করিতে হইতেছে। আজ তাঁহার ভদ্রাসন দীপহীন, দেবায়তন শ্রীভ্রষ্ট, অতিথি-শালা জনশূন্য; উৎসব ও আনন্দের দিনে যেখানে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হইত, সেই উৎসবমণ্ডপ-নাটমন্দির আজ পোড়ো-বাড়ীর মত হতশ্রী। বিজয়ার পর যে বৈঠকখানায় প্রীতি-আলিঙ্গনের আগ্রহাতিশয্যে আনন্দ উছলিয়া উঠিত, আজ সেই বৈঠকখানা বন্ধ! একএকটি শ্রাদ্ধব্যাপার বা বিবাহোৎসবে যাঁহার বাড়ীতে যজ্ঞকাণ্ড উপস্থিত হইত, দেশের সমস্ত লোকের আহ্বান পড়িত, সমস্ত সামাজিক দেহ আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিত, আজ রাজধানীর বিলাস-ভোগের মধ্যে তাঁহার সেই সুনাম গুটি-কতক ইয়ারবন্ধুর নিমন্ত্রণবিনিময়ের মধ্যে সঙ্কুচিত। যাঁহার পিতৃপুরুষ দেবতাপ্রতিষ্ঠা, ঠাকুরসেবা এবং বহুবিস্তৃত-দীর্ঘিকাদি-খনন দ্বারা প্রজাসাধারণের উপকার করিয়া পুণ্য-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আজ সহরের কলের জলের জন্য, নাগরিকনাট্যশালা-স্থাপনের জন্য, ইংরাজ রাজপুরুষবিশেষের স্মরণার্থ পাথরের পিণ্ডদানকার্য্যের জন্য কত রকম-বেরকম চাঁদার খাতায় সহি দিয়া ধন্য হইতে হইতেছে। অথচ সেই খাতায় মুক্তহস্তে অঙ্কপাত করিয়াও তিনি শঙ্কিতনেত্রে বারংবার নিজের ভাগ্যবিধাতার ন্যায় রাজপুরুষের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন।

উপাধি-জিনিষটা আমাদের দেশে সকল সময়েই ছিল—হিন্দু-মুসলমান-আমলেও উপাধিদানপ্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের সময়ে উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্তকালে বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপের পরিচায়ক ও সাহিত্যাদিবিষয়ের দক্ষতাবাচক উপাধিদানের ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমান সম্রাট্-গণ দেশের প্রকৃত রাজাদিগকে রাজযোগ্য উপাধিদানে ত্রুটি করিতেন না। আজকাল-কার ভূমিশূন্য ভূমিপাল—রাজ্যশূন্য রাজা, রাজা-বাহাদুর, মহারাজা, মহারাজা-বাহাদুর তখনকার সময়ে দেখা যাইত না। মুসল-মানের ফরমান পাইবার জন্য মোগলরাজ-ধানী পর্য্যন্ত যাইয়া দরবার করা বিস্তৃত ভারতবর্ষের অনেক ধনবানেরও সামর্থ্যে কুলাইত না। আর ইংরেজ রাজা যেমন রাজকর্ত্তব্যগুলি উপাধিলোলুপদের অর্থে সারিয়া লইতে সচেষ্ট, মোগলপাঠানদের সে ভাব—সে দৃষ্টিমাত্রই ছিল না, রাজকার্য্য রাজাই করিতেন। ইংরেজ সদাগর-রাজা এদেশে আসিয়া যখন মোগলসম্রাট্ হইতে

দেওয়ানি লইয়া পরে মোগলসম্রাটের বংশধরকে ফৌজদারীসোপর্দ্দ করিয়া-দিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন উপাধিদানকার্য্যটা স্বতই তাঁহাদের হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিবাহাদুর তখন উপাধির দানসাগর করিতে বসিলেন, পাত্রাপাত্রভেদ নাই,—নফরের পুত্র রাজা হইল, মনিবের পুত্র নফর হইলেন। যে কমিশরিয়টের মদের পিপার ভার পাইয়া টাকা অর্জ্জন করিল, ইংরেজ সদাগর-রাজা তাহাকে "রাজা" উপাধি দিলেন—ইংরেজ-সেফাইদের জন্ত রাস্তা করিয়া-দিয়া নীচজাতীয় লোক উচ্চ উপাধি পাইল। নিজসম্পত্তি বা প্রজার শস্তক্ষেত্র রক্ষা করিতে যাইয়া উচ্চশ্রেণীর ভাগ্যবান্ পুরুষ অধম হইয়া পড়িলেন। সাহেবদের মনস্তুষ্টি করিতে যাইয়া কেহ কেহ, সাহেবগণ যাঁহাদের দ্বারে কৃপাপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদের মাথার উপর আসন পাইলেন। ইংরেজ রাজপুরুষের অপকীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছেন বলিয়া যাঁহাকে সন্দেহ করা হইল, তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া তাঁহার বধসাধনান্তে অনেকে ইংরেজের প্রীতি উৎপাদন করিলেন এবং প্রভুপ্রসাদে গ্রামের মোড়ল হইয়া বসিলেন। এই ত গেল মধ্যযুগের কথা। তার পর ভারতবর্ষের শাসনভার ১৮৫৮ সালে সদাগরদের হস্ত হইতে স্বয়ং মহারাণী গ্রহণ করিলেন, এই সময় হইতে বৎসরে দুইবার উপাধিপ্রদানের ব্যবস্থা হইল—বর্ষা এবং শীত ঋতুতে উপাধির লিষ্টি বাহির হইতে লাগিল। সেই ব্যবস্থা এখনও চলিয়া আসিতেছে। বর্ষাকাল যদি-চ বৎসরে একবারই উপস্থিত হইয়া থাকে, উপাধিবর্ষা কিন্তু বৎসরে দুইবার ঘটে। এই দুইবারই কত লোককে যে আকাশপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়, ইংরেজদেবতার নিকট কত মানত করিতে হয়, ইংরেজপুরোহিতের দ্বারা কত ইংরেজী যাগযজ্ঞ করাইতে হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন সেই অসাধ্যসাধনের তত্ত্ব অপরে কে বুঝিবে?

একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত লেখকের আজও স্মরণ আছে। একবার পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণের উপলক্ষে আমাকে কোন ইংরেজহাকিমের আতিথ্যগ্রহণ করিতে হয়। একদিন প্রাতরাশের পর আমরা দুইজনে ফটো তুলিবার ইচ্ছায় বাহির হইব, বেশপরিবর্ত্তনের জন্ত নিজের কামরায় প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলাম, সাহেবের আর্দ্দালির সঙ্গে কে যেন বাহিরে কথোপকথন করিতেছে,—লোকটি সাহেবের দেখা পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর্দ্দালি সেই ব্যক্তির নামালঙ্কৃত তাসখণ্ড হস্তে লইয়া একটু মিঠেকড়া ভাষায় এই সময়ে সাহেবের নিকট যাওয়ার অক্ষমতা বুঝাইবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। লোকটি যত বাধা পাইতেছে, ততই ব্যগ্রভাবে পেয়াদাকে "বাপধন" প্রভৃতি ভাষায় তোষামোদ করিয়া, এমন কি হাতে কিছু দিয়াও, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পেয়াদা কিছুতেই সম্মত না হইয়া ক্রমশ সুর চড়াইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখার সে সময় নহে, ইহাই বুঝাইতে লাগিল এবং বুধবার ১০টার সময় সাহেব যখন সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া থাকেন, সেইদিন তাহাকে আসিতে উপদেশ দিল। লোকটি কাতরভাবে বুঝাইতেছিল—

বুধবার বড় ভিড়, এত জনতার মধ্যে তাহার কথা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিবার সুবিধা হইবে না, আর তাহার বড় দরকারী কাজ, না বলিলে নয়, বড় জরুরী কাজ। পেয়াদাটা যেন আরও পাইয়া বসিল। বলিল—জরুরী হউক আর নাই হউক, এখন সাহেবকে সে কিছুতেই এই তাস দিতে পারিবে না। ভাঙা হিন্দী এবং আলাপের ধরণেই বোঝা গেল, ব্যগ্র ব্যক্তিটি বঙ্গসন্তান। এমনসময় সাহেব প্রস্তুত হইয়া আমার সন্ধান করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখি, একটি ষাট-বছরের বৃদ্ধ বাঙালী স্থূলকায়াটি চোগা-চাপকানের দ্বারা যথাসাধ্য ঢাকিয়া সামলা-মাথায় দণ্ডায়মান। সাহেবকে দেখিয়া তিনি লম্বাচওড়া সেলাম ঠুকিলেন। সাহেব প্রতি-নমস্কার পর্য্যন্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে would-be রায়বাহাদুর, তুমি মন স্থির করিয়াছ?" ভদ্রলোকটি জোড়-হাতে বলিলেন—"হুজুরের হুকুম পালন করিতে এ অধম সর্ব্বদা প্রস্তুত, তবে এত অধিকমাত্রার হুকুমটি অধীনের উপর অসাধ্য ভারের মত চাপিয়াছে।" সাহেব বলিলেন, "বেশ, যখন ভার সহিতে পারিবে, তখন রায়বাহাদুরী পাইবে।" এই বলিয়াই, টম্‌টম্ প্রস্তুত ছিল, সাহেব রওনা হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধমানুষটি পিছনে পিছনে ছুটিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া আমাদের সন্নিহিত হইতে অশক্ত হইলেন এবং ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ছুটন্ত টম্‌টমের পানে তাকাইয়া রহিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, ইনি একজন ধনবান্ ব্যক্তি। পূর্ব্বে উকিল ছিলেন, মক্কেল ঠকাইয়া জমিদারী নিলামে উঠাইয়া স্বয়ং সস্তাদরে কিনিয়া বেশ অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন। সহরের অনেকগুলি বাড়ীই ইঁহার, এমন কি, সাহেব তাঁহারই ভাড়াটিয়া। কুকর্ম্মে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন, তবুও অভাব হয় নাই, সৎকর্ম্মের জন্য ইঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা সাহেবের ইচ্ছা। নগরের টাউন্‌হল্‌টি তাঁহারই প্রদত্ত ত্রিশহাজার টাকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে লোকটি উপাধির জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হাকিম সুপারিস করিয়া গিয়াছিলেন, সে আজ আটবৎসরের কথা। এবার এই সাহেবের অভিপ্রায় জানিবার জন্য কর্ত্তৃ-পক্ষের চিঠি আসিয়াছে, এ ব্যক্তিকে "রায়-বাহাদুর" উপাধি দেওয়ার পক্ষে তাঁহার মত কি? সাহেব সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট সাহেবদের ক্লাবের জন্য একটা বিলিয়ার্ড-টেবিল চাহিয়া বসিয়াছেন; টেবিলটি পাইলে আর তাঁহার জন্য সুপারিসি করিতে কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু লোকটা বড় কঞ্জুস,—কিছুতেই টাকার মায়া ছাড়িতে পারে না,—৬হাজার টাকা দিতে কষ্টবোধ করিয়া কেমন থতমত করিতেছে। শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। ইংরেজের ক্লাবে বিলিয়ার্ড-টেবিলের দরকার,—যে ক্লাবে শুধু বাঙালী কেন, কোন দেশীয় লোকেরই প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি সাহেবের বিশেষ অনুরোধেও যে ক্লাবে যাইতে আমি দ্বিধা বোধ করিয়াছি, সেই ক্লাবের জন্য একটি বাঙালির নিকট হইতে ৬হাজার টাকা আদায় করিতে সাহেবের লজ্জা

হওয়া দূরের কথা, বরং একটা স্পর্দ্ধার ভাবই প্রকাশ পাইতেছিল। আমি তাঁহাকে এই কথা বুঝাইতে গেলে তিনি উত্তরে বলিলেন, "যে ব্যক্তি অকার্য্যে অর্থ-ব্যয় করিতে পারে, পিতৃশ্রাদ্ধে অর্থব্যয়ের ভয়ে হিঁদুয়ানি ছাড়িয়া উপধর্ম্মের দোহাই দিয়া অর্থরক্ষা করিয়াছে, ইংরেজরাজার নিকট উপাধিপ্রাপ্তির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হয় নাই, একটি ইংরেজ-ক্লাবে ৬হাজার দিলে সে ব্যক্তির পক্ষে অর্থের বরং একটা সার্থকতা হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গেলে ইঁহাকে অন্তত আরও দশগুণ অর্থ ব্যয় করিতে হইত।" আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়া এই প্রসঙ্গের আলাপ বন্ধ করিলাম, কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় আমাকে আর এক নূতন বিপদে পড়িতে হইল। জানি না, কি উপায়ে সেই উপাধিপাগলা বৃদ্ধটি আমার খবর পান, আর আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অতিমাত্রায় বিনয়পূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত টাউনহলের পুস্তকাগারে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে স্বীকার করিলাম। যথাসময়ে তাঁহার দেখা পাইলাম। আমাকে লইয়া তিনি সাধারণ পুস্তকাগারের হলে গিয়া প্রথমত ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরফলকে তাঁহার দানকাণ্ডবিবৃতিখানি দেখাইলেন— সাহেবদের সঙ্গে একত্র তাঁহার ফটো তোলা হইয়াছে, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন—৩০বৎসর কাল সেই স্থানে আছেন, কত সাহেবসুবা তাঁহাকে কত-প্রকারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহার ফর্দ্দ আওড়াইলেন, ছোটলাটগণের মধ্যে কাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থায় ব্যবসায়-ঘটিত ব্যাপারে জব্দ করিয়াছিলেন, কোন্ ছোটলাট Belvedereএ তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন —ইত্যাদি নানা প্রকার প্রসঙ্গের বাহাদুরীবায়ায় রায়বাহাদুরীর পূর্ব্বাভাস দিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন পুস্তকাগারপরিদর্শনের ইচ্ছা-প্রকাশ করিলাম, তখন সেখানে যাইবার দরকার নাই বলিয়া আগ্রহসহকারে তিনি নিষেধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন— এখানে কোন ভাল কেতাব বা কাগজ রাখা হয় না, আর যে সকল খবরের কাগজ লওয়া হয়, তাহাও সাহেবদেরই ব্যবহারে সর্ব্বাগ্রে লাগিয়া থাকে, ৩।৪দিন পরে দেশের লোকেরা প্রসাদ পান। এইজন্য তিনি মাসিক ২৲টাকা চাঁদা দেওয়া অর্থের অপ-ব্যবহার, এমন কি, পাপ মনে করিয়া বন্ধ করিয়াছেন, সেই অবধি সে কামরায় পদধূলি পর্য্যন্ত দেন নাই। লোকটি দাম্ভিকতার সহিত বলিলেন—"কি বলেন মশায়, আমরা পয়সা দেব, আর কাগজ পড়্‌বেন ওঁরা।"—তার পর শুনিলাম, দুকথাই সত্য। তিনি মাসে মাসে চাঁদা দিতেন না,—এজন্য ঢের বাকীর দায়ে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সাহেবেরা নিজেদের কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া এখানকার কাগজ লইয়া যান, এজন্য দেশীয় অনেক শিক্ষিতব্যক্তি পুস্তকা-গারের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। গুটিকতক খোসামুদে লোক—তাহার মধ্যে অশিক্ষিত ধনীর সংখ্যাই অধিক, চাঁদা দিয়া কাগজ জোগাইতেছে। তাহাদের লাভ কমিটির

অধিবেশনের সময় সাহেবকে সেলাম দিতে পারে ও এক কুরছিতে বসিবার অধিকার পায়।

রায়বাহাদুর-উপাধির জন্ম তাঁহার এত অধিক আগ্রহ কেন; প্রসঙ্গক্রমে যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমার বাড়ী অমুক স্থানে—সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষ একজন রায়বাহাদুর হইয়াছেন, তাঁর বাহাদুরীতে আমরা সবংশে নীচু হইয়া আছি। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রায়বাহাদুর না হইলে দেশে আর মুখ দেখাইব না। এমন কি, গৃহিণীর এত মনোদুঃখ যে; রায়বাহাদুরপত্নী না হইলে তিনি দেশের নামটি পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন না। প্রতিপক্ষ ব্যক্তিটি গবর্মেণ্টের চাকুরী করিয়া "রায়বাহাদুর" হইয়াছেন, তাঁহাকে টাকাখরচ করিতে হয় নাই। মাত্র ৮০০৲ টাকা নজর দিয়া খেলাৎ লইয়াছেন। আমার কিন্তু টাউন্‌হল্‌নির্ম্মাণের জন্য ৩০হাজার টাকা এবং ছোট-বড় নানা কার্য্যে আরও তিনহাজার টাকা দিয়াও অব্যাহতি হইল না।"

উপাধিলোলুপতা আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইবার একমাত্র কারণ দশজনের কাছে যেশ যশ ও সম্মানসম্ভ্রমলাভের আশা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহার বিপরীত। মনে করুন, একজন টাকার জোরে রাজা হইলেন। গবর্মেণ্ট "রাজা" উপাধি সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগতভাবে জীবদ্দশাকাল পর্য্যন্ত দান করেন। কাজেই বংশধরেরা "যে তিমিরে" "সেই তিমিরে"ই পড়িয়া থাকেন। যিনি রাজা হইলেন, তাঁহার পত্নী "রাণী" হইলেন না; ব্যাকরণশাস্ত্রে এরূপ প্রথা অসিদ্ধ হইলেও, ইহা আধুনিক-রাজব্যবহার-সম্মত বটে। "রাজা"র পুত্র স্বয়ং 'কুমার'নাম ব্যবহার করিতে পারেন বটে, কিন্তু সরকার-বাহাদুর তাঁহাকে "বাবু"নামেই অভিহিত করিবেন। লাভের মধ্যে এই হয় যে, এই রাজাগিরি রাখিতে যাইয়া পরানুকরণবৃত্তি অসামান্যরূপে বাড়িয়া উঠে, এবং তাহাতে উপাধিধারীকে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। একটি অসংলগ্ন রাজচিহ্ন,—কল্পিত coat of arms গাড়িতে রাখিতে হইবে। একটা রৌপ্যনির্ম্মিত ছোটা সহ চোবদার কোচ্‌বাক্সে না বসিলে রাজার গাড়ি বলিয়া লোকে সম্মান না-ও করিতে পারে। ঘোড়ার ওষ্ঠে-পৃষ্ঠে-ললাটে কল্পিত রাজচিহ্ন না হইলে মানাইবে না। এই সকল কল্পিত উপায়ে নিজসম্মান রক্ষা করিতে রাজাটির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়ে। ছোটলাটের উদ্যান-সম্মিলনীর শোভার্থ ইঁহাদের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু লাট বা ছোটলাট তাঁহাদিগকে চিনিবেন না। একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—একজন "রাজা" ছোটলাটের উদ্যানসম্মিলনীতে কোন রাজপুরুষের নিকট হইতে প্রতিনমস্কার আদায়ের লোভে সেলাম ঠুকিবার জন্য আশেপাশে ঘুরিতেছিলেন। সাহেবটি একজন সেক্রেটারী, সঙ্গে মেম ছিলেন; কিন্তু রাজাটি যত অগ্রসর হইতেছেন, সাহেবটি যেন তাঁহাকে দেখিতে পান্ নাই, এইভাবে ততই চলিয়া যাইতেছেন। রাজা নাছোড়বন্দা, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; সম্মুখে যাইয়া হাতখানি

বাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সাহেব "good morning Raja, how do you do?" বলিয়া চলিয়া গেলেন। যেমটি রাজার বিচিত্র বেশভূষা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "who is this living cushion?" সাহেবের উত্তর শুনিতে আর রুচি হইল না—আমি সরিয়া পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এই সকল লোক কি গণ্ডার-চর্ম্মে নির্ম্মিত। লোকটি ৫০।৫৫বৎসরবয়স্ক, মাথায় সম্মার পাগ্‌ড়ী, গলায় মতির মালা, বক্ষে একটি হীরকের নক্ষত্র, কলে তাহার দলগুলি ঘুরিতেছিল। গায়ে বড়-বড় পুষ্প-পল্লবে চিত্রিত ফরাসী সাটিনবস্ত্রের চোগা। এমন কৌতূহলোদ্দীপক হাস্যরসাত্মক সজ্জা লইয়া রাজানাম ফলাইবার দরকার কি?

এদিকে মহারাজা-মহারাজাবাহাদুরগণকে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে যাইয়া যে কতরকমে নাকাল হইতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। 'মহারাজা' বা 'মহারাজা-বাহাদুর' দুইএকটি বংশ ব্যতীত বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত উপাধি। কিন্তু সম্মান আদায় করিবার বেলায় দেখা যায়, ভারতীয় স্বাধীন-নৃপতিবৃন্দের প্রাপ্য সম্মান ইঁহারা অকুণ্ঠিত-ভাবে প্রত্যাশা করিয়া থাকেন এবং তাহা না পাইলে ক্ষুণ্ণ হন; এমন কি, কাহারও নিকট হইতে সে সম্মান আদায় করিতে না পারিলে তাঁহার সহিত বিবাদ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হন। দুইএকটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, যথা— His Highness এই দুইটি কথা (H. H.) তাঁহাদের অনেকেই নিজের নামের উপর ব্যবহার করিতে লালায়িত। কিন্তু গবর্মেণ্ট হইতে তাহা পাইবার কোন উপায় নাই। কারণ, এই সম্মান শুধু ১১তোপপ্রাপ্ত স্বাধীননৃপতিগণেরই লভ্য, ইহার ন্যূন তোপের স্বাধীন রাজাদেরও ইহা প্রাপ্য নহে। অথচ H. H. the Maharaja Bahadur স্বার্থান্বেষী খবরের কাগজের সংবাদদাতা ও সম্পাদকবিশেষের নিকট প্রাপ্ত হইয়া আমাদের জমিদারমহারাজগণ ইহা সর্ব্বত্র আদায় করিতে ব্যগ্র। অপ্রাপ্য বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বালকদের পক্ষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পক্ষে এই লোভ অতি কুৎসিত দেখায়। তাঁহারা কি এই কথাটি মনে করিতে পারেন না, গবর্মেণ্ট হইতে তাঁহারা যে উপাধি সংগ্রহ করিয়াছেন বা পাইয়াছেন, সেই গবর্মেণ্ট যে ভাবে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে অনিচ্ছুক, দেশের লোক হইতে তাঁহারা তাহা কোন্ মুখে প্রত্যাশা করেন? সেদিন একটি মার্কিণদেশীয় ফটোগ্রাফার আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত। তিনি দেশীয় রাজাদের একখানি সচিত্র জীবনী প্রকাশ করিবেন। তালিকায় দেখিতে পাইলাম, উপাধিপ্রাপ্ত রাজা ও মহারাজাদের নামের সংখ্যা অতিরিক্ত। আমি তাঁহাকে এ কথা বলাতে লোকটি অনায়াসে বলিয়া ফেলিল, "মহাশয়, নামের পাশে কোন্ রাজা কতগুলি কেতাব লইতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাকে উপদেশ দিবেন।" তখন দেখিলাম, যথার্থ রাজারা যেখানে ২।৫খানার জন্ত সহি দিয়াছেন, জমিদাররাজারা সেই স্থলে ২৫।৩০, এমন কি ৫০খানারও অধিক পুস্তক ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মার্কিণছবি-ওয়ালা হাসিয়া বলিলেন, "Good for trade,

is not it ?" আমি বিদায়কালে তাঁহাকে বলিলাম, "এরূপ পুস্তক ক্রয় করিবার আমাদের দরকার নাই।" সেও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিল, "কিন্তু তোমার প্রতিবাসীরা তাহাদের নিজেদের দরকার তোমা অপেক্ষা অধিক জানে।" এই পুস্তক অবশ্য প্রকাশিত হইবে, আর কল্পিত-H. H.-উপাধিভূষিত জমিদার রাজা-মহারাজাগণের মোসাহেবেরা ছবিওয়ালার সুখ্যাতি করিয়া প্রভুমনোরঞ্জনে নিযুক্ত হইবেন।

এদিকে ইঁহাদের অনেকেই দেশের কার্য্যে সাহায্যদানের প্রয়োজন হইলে একেবারে বদ্ধমুষ্টি হইয়া পড়েন। রাজপুরুষদের অনুরোধে কোন গ্রন্থকারের অনাবশ্যক পুস্তক ক্রয় করিতে হয় ত তাঁহারা সহস্রসহস্র মুদ্রা দান করিতেছেন, কিন্তু যদি কোন সৎকার্য্যের জন্য অর্থসাহায্য চাহিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, তবে ইংরেজদের নাম সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না দেখিলে সাহায্যদান করিতে তাঁহাদের ভয় হয়; এমনও দেখা গিয়াছে, গোপনে লোক নিযুক্ত করিয়া জানিতে চেষ্টা পান—কোন্ কার্য্যে অর্থসাহায্য দিলে সাহেবরাজপুরুষেরা প্রীত হইবেন। উপাধিবিজ্ঞান বহুবিচিত্র,—ইহার কয়েক পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করা গেল মাত্র।

আজকাল উপাধির একটা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া যখন এই সকল অসঙ্গত উপাধির অতিমাত্রায় ছড়াছড়ি দেখিতে পাইলেন, তিনি তখন সামলাইতে বসিলেন। তাহার ফলে নূতন রাজা-মহারাজার সৃষ্টি এখন একেবারে দুর্লভদর্শন হইয়াছে। ইহার ফলে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা বংশের মনঃকষ্টের কারণ উপস্থিত হইলেও মোটের উপর উপকার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। দিল্লিদরবারের বহু অর্থব্যয়ের অন্তত একটা সার্থকতা দেখা গিয়াছিল;—উপাধিভূষিত রাজা, মহারাজা, মহারাজাবাহাদুর, মহারাজাধিরাজগণের সঙ্গে অতিসামান্য দেশীয় স্বাধীননৃপতিগণেরও কতটা প্রভেদ, তাহা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। এই রাজসূয়যজ্ঞে তাহারা কে? মণিমাণিক্যসুশোভিত উপাধিপ্রাপ্ত রাজা এবং উপাধিশূন্য লোকদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ ছিল না বলিলেই হয়। দেশীয় নৃপতিগণের জন্য যে সৈনিকসম্মান, যে অভ্যর্থনা, যে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া আমাদের উপাধিগ্রস্ত রাজারা কি মনে করিয়াছিলেন, জানি না—কিন্তু দর্শকমাত্রকেই এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল—

"তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।"

এ সকল দেখিয়া-শুনিয়াও যদি আমাদের মোহভঙ্গ না হয়, পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া পদে-পদে অপদস্থ হইতে হয়, শান্তির ইচ্ছায় অশান্তিকে বরণ করিয়া লইতে হয়—তবে আর কি বলিবার আছে? চাণক্য বলিয়াছেন—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা"—স্বদেশের নিকট যিনি পূজা পাইবেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। নতুবা রাজা-উপাধি সরকারবাহাদুর দিলেও সেটা ব্যাধি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কোন ইংরেজ রাজপুরুষ একজন দেশীয় স্বাধীনরাজাকে 'মহারাজা'-উপাধি

দিবার প্রস্তাব করিলে, রাজা বলিয়াছিলেন— "দেখুন, আমি আমার রাজ্যের king, আমাকে ভারতসম্রাট্,—বাবু, ঠাকুর, রাজা যে নামেই অভিহিত করিয়া সম্মানিত করুন না, আমার প্রজাদের নিকট তাহাতে আমার প্রতিপত্তি একরূপই থাকিবে—আমি তাহাদের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা চিরকালই থাকিব। অতএব আমাকে এমন সম্মান দিবেন না, যাহা আমার বংশ হইতে আবার উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার একজন ভক্ত বিশ্বস্ত-বন্ধু, তাঁহার সাম্রাজ্যশ্রী কুশলে থাকিলেই আমাদের সম্মানও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" ইংরেজ রাজপুরুষ আশা করিয়াছিলেন, রাজা না জানি কত উৎফুল্ল হইবেন। কিন্তু এরূপ অভিনব উত্তর শুনিয়া তিনি ক্ষণকাল বিস্মিত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—"সাচ্ বাত্ হ্যায় রাজাসাহেব, সাচ্ বাত্।"—উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে রাজার এই উক্তিতে রাজপুরুষের বিরক্তি ঘটিবারই আশঙ্কা ছিল, কিন্তু পরে রাজার অনেক ইংরেজবন্ধুর মুখে শোনা গেল, রাজপুরুষটি রাজার এই উক্তিতে এতদূর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ইংরেজমহলে এ কথা উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন— রাজাটির মত যদি দেশীয় ভদ্রসাধারণের সুবুদ্ধি হইত, তবে উপাধিলোলুপতা এদেশে দেখা যাইত না। ইহার পর হইতে উক্ত রাজপুরুষের সহিত রাজার এমনই ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং রাজার প্রতি তাঁহার এতই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল যে, রাজ্য-সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে রাজপুরুষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজার প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই সকল জটিল বিষয়ের অতি সহজ সুমীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। উপাধিলোলুপ ব্যক্তিগণকে রাজার উক্তিটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

শেষ খেয়া।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ!
ও পারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান!
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,

তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘর-ছাড়া
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়!
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়!

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও পার হতে এক-টানা
একটি দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে' চিন্‌ব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়,
ডাক্‌লে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধর্‌বে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়?
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়!

ঘরেই যারা যাবার তারা গিয়েছে চলে ঘরপানে
পারেতে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নয় পারেও নয় যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে!
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফল্‌ল না,
চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বল্‌ল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়!

প্রাচীন রচনা ও পাণিনির আদর্শ।

প্রবাদ আছে যে, বাল্মীকি আদিকবি; এবং তিনি নূতন শ্লোকচ্ছন্দে রামকথা রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তকাণ্ডসংবলিত প্রচলিত রামায়ণের ভূমিকাতেও ঐ কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই রামায়ণখানি যখন কেবলমাত্র শ্লোকচ্ছন্দে রচিত নহে, তখন উহাকে অক্ষুণ্ণভাবে সেই আদিকাব্য বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল এবং ঐ তিনটি ছন্দের সঙ্কর রচনা খুব প্রাচীন। ঐ প্রাচীন ছন্দকয়েকটি ব্যতীতও রামায়ণে অনেক অর্ব্বাচীন ছন্দ পাওয়া যায়; যথা—বৈশ্বদেবী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, রুচিরা, প্রহর্ষিণী, বসন্ততিলকা, মালিনী, মৃগেন্দ্রমুখ এবং অসংবাধা। উহাদের মধ্যে আবার মৃগেন্দ্রমুখ এবং অসংবাধা অধিক অর্ব্বাচীন; এবং এই দুইটি ছন্দ মহাভারতেও পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বাল্মীকির কথা রামায়ণের উপক্রমণিকায় যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যেন অন্য একজন কবি আদিকবি এবং তৎপ্রণীত আদিকাব্যের ইতিহাস দিতেছেন। তাহার পর আবার উত্তরাকাণ্ডের কথাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে— "তচ্চকারোত্তরে কাব্যে ভগবান্ বাল্মীকির্ঋষিঃ।" অন্যলোকে লিখিলেই কবির নামে 'ভগবান্' এই শব্দ যুক্ত হওয়া শোভা পায়, এবং চকার-ক্রিয়ার পূর্ণ সার্থকতা হয়।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আদিকবির রামকথা গাথারূপে সূতমাগধাদির মুখে গীত হইয়া প্রচলিত ছিল, এবং পরবর্ত্তী সময়ে তাহা অবলম্বন করিয়া কেহ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিলেন, তাহা হইলে পূর্ব্বরচিত শ্লোক কতদূর পর্য্যন্ত নূতন কাব্যে যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। রামায়ণের রচনাপ্রণালী এবং ভাষার অবস্থা দেখিলে অনায়াসে ইহা উপলব্ধ হয় যে, প্রাচীনতা এবং নূতনত্ব এক সঙ্গে রহিয়াছে; এবং নূতনত্ব অত্যন্ত অধিক। এ অবস্থায় রামায়ণরচনার কালনির্ণয় করিতে হইলে যদি কেবল রামকথার প্রাচীনতা এবং পূর্ব্বগাথার প্রাচীনতার অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে রামায়ণগ্রন্থের রচনাকাল নির্ণীত হইবে না।

রামায়ণের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যে ভূমিকা লিখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মৌলিক অনুসন্ধান এবং পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রামায়ণরচনায় যে কোন কোন স্থলে পাণিনিনিবদ্ধ নিয়মের অনুবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না, এই কথা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধগুলি শেষ হইবার পূর্ব্বে কোন সমালোচনা করা অন্যায়; কিন্তু এই প্রবন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে একটি কথা তাঁহার বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি। কথাটা এই—যাহা পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহাকেই অতি প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করা চলে কি না।

পাণিনিব্যাকরণ রচিত হইবার পরক্ষণ

হইতেই যে ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। কাত্যায়ন যখন ইহার বার্ত্তিক রচনা করিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং পতঞ্জলি যখন মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনির আদর্শ অবশ্যগ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও সংস্কৃতরচনায় পাণিনির আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই। মহাত্মা কুমারিলভট্ট সপ্তমশতাব্দীতেও ঐ আদর্শ গ্রহণ করেন নাই এবং স্বপ্রণীত তন্ত্রবার্ত্তিকগ্রন্থে এই কথা বলিয়াছেন যে, মাশক, আশ্বলায়ন, নারদ, মনু প্রভৃতি পাণিনিকে আদর্শ করেন নাই, এমন কি, রাজা পালকার্য্য পর্য্যন্ত ঐ আদর্শ উপেক্ষা করিয়াছেন। তখন উহা অবশ্য-অবলম্বনীয় বলা চলে না। (তন্ত্রবার্ত্তিক, কাশীর সংস্করণ, ১৯৯ পৃষ্ঠা)।

সংস্কৃতব্যাকরণের মধ্যে পাণিনিকেই একমাত্র আদর্শ করিতে হইবে বলিয়া সপ্তম-শতব্দীতে ভর্ত্তৃহরি বাক্যপদীয় রচনা করিয়াছিলেন ; এবং পাণিনিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য উহার পরে কাশিকা বৃত্তি রচিত হইয়াছিল। পাণিনিস্থাপনার এই চেষ্টা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ আদর্শ সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইত না। এস্থলেও ইহার প্রমাণস্বরূপে ভট্টকুমারিলকে উপস্থিত করিতেছি।

মহাত্মা কুমারিল ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। উঁহারা উভয়েই এদেশ হইতে বৌদ্ধশূন্যবাদ এবং ভ্রষ্টাচার তিরোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভট্টকুমারিল সদ্ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা; তিনি যখন তাঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকের প্রথম অধ্যায়েই সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না, তখন ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ছিল বলিয়া প্রতীতি হয় না। কুমারিল ভর্ত্তৃহরির নাম করেন নাই ; কিন্তু তন্ত্রবার্ত্তিকের তৃতীয় অধ্যায়ে পদে পদে বাক্যপদীয় হইতে বচন তুলিয়া অতি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। বাক্যপদীয়ের মত খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ ব্যাকরণ যখন বেদাঙ্গ নহে এবং উহার বিধি যখন বুদ্ধের বচনের মত মানবকল্পিত, তখন উহা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তন্ত্রবার্ত্তিকের কাশীসংস্করণের ২০৭ পৃষ্ঠায় আছে—

> ন চ বেদাঙ্গভাবোঽপি কশ্চিৎ ব্যাকরণং প্রতি।
> তাদর্থ্যাবয়বাভাবাৎ বুদ্ধাদিবচনেম্বিব॥
> শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তাবৎ তাদর্থ্যং নাস্য গম্যতে।
> অকৃত্রিমস্য বা কশ্চিৎ কৃত্রিমোঽবয়বঃ কথম্॥

অক্ষয়বাবু যেন মনে না করেন যে, আমি তাঁহার পথে একটা ক্ষুদ্র তর্ককণ্টক আনিয়া উপস্থিত করিতেছি। তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহাই আমার কামনা। তিনি আমার বন্ধু; এ কথাগুলি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াও জানাইতে পারিতাম। কিন্তু কথাগুলি গুরুতর; অনেক সুধীপাঠকেরাও যাহাতে বিষয়টির বিচার করেন, সেইজন্য প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি যে, যাহা পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহাই পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী কি না, অথবা অতি প্রাচীন কি না?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

যুগলমূর্ত্তি।

১

অয়ি বসুন্ধরে! তুমি লক্ষ্মীরূপে সারাবিশ্বতল
উজলি' তুলিয়া তা'রে বিতরিছ অপূর্ব্ব মঙ্গল।
ধাত্রপীন বক্ষে তব বিনিহিত অফুরন্ত সুধা
বিশ্বলোকপালয়িত্রি! মিটাইছ তাহে বিশ্বক্ষুধা।
রত্নগর্ভা দেবী তুমি রত্নকুণ্ড অনন্ত ভাণ্ডার
গোপনে সঞ্চিত করি' দেখাইছ কি স্নেহ উদার!
সংসারসংগ্রামে হেথা বিষশল্যদিগ্ধ যত হিয়া
শীতলিছ নিজ করে কোমল পবন বিলেপিয়া।
ফলপুষ্পে কত কুঞ্জ রচিয়া রেখেছ থরে থরে
শ্রান্তিক্লান্ত জগতের নেত্রমন জুড়াবার তরে।
স্নেহশ্যামচ্ছায়াকুঞ্জে প্রতিদিন শান্ত সন্ধ্যালোকে
তোমার আহ্বানশঙ্খ শুনি মাতঃ আকুল পুলকে।

২

আর ওই মহাকাশ বিশ্বব্যাপ্ত দীপ্ত মূর্ত্তিমান্—
উনি কে মা? উনিই কি চিরধ্যেয় বিষ্ণু সুমহান্?
নির্নিমেষ নেত্রদুটি চন্দ্র-সূর্য্য কোমল-ভাস্বর!
অযুত-দিগ্বাহু-বন্ধে প্রেমে তোমা' বাঁধি' নিরন্তর।
অগণ্য তারকাবৃন্দ দীপ্ত লোমকূপ অগণন
নীলকান্ত দেহে কিবা বিভূষিত জলদচন্দন।
প্রত্যক্ষমূরতি তবু বিস্মিতের চির-অন্বেষণ
মহান্ রহস্য ও'কি নিত্য নব ব্যাপিয়া ভুবন!
হে মাতঃ! পতির তব রহস্যের পেলে কি সন্ধান?
পদতলে মুগ্ধ বসি' আছ তাই রাত্রিদিনমান?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গদর্শন।

দেশীয় রাজ্য।*

দেশভেদে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভেদ হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। সেই ভেদকে স্বীকার না করিলে কাজ চলে না। যাহারা বিলখালের মধ্যে থাকে, তাহারা মৎস্যব্যবসায়ী হইয়া উঠে; যাহারা সমুদ্রতীরের বন্দরে থাকে, তাহারা, দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; যাহারা সমতল উর্ব্বরাভূমিতে বাস করে, তাহারা কৃষিকে উপজীবিকা করিয়া তোলে। মরুপ্রায় দেশে যে আরব বাস করে, তাহাকে যদি অন্যদেশবাসীর ইতিহাস শুনাইয়া বলা যায় যে, কৃষির সাহায্য ব্যতীত উন্নতিলাভ করা যায় না, তবে সে উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং কৃষিযোগ্য স্থানের অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বলা যায় যে, মৃগয়া এবং পশুপালনেই সাহস ও বীর্য্যের চর্চ্চা হইতে পারে, কৃষিতে তাহা নষ্টই হয়, তবে সেরূপ নিষ্ফল উত্তেজনা কেবল অনিষ্টই ঘটায়।

বস্তুত ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন জাতি ভিন্ন-শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করে—এবং সমগ্র মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়। য়ুরোপ কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাবশত যে বিশেষপ্রকারের উন্নতির অধিকারী হইয়াছে, আমরা যদি ঠিক সেই-প্রকার উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি, তবে নিজেকে ব্যর্থ ও বিশ্বমানবকে বঞ্চিত করিব। কারণ, আমাদের দেশের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে আমরা মনুষ্যত্বের যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, পরের বৃথা অনুকরণচেষ্টায় তাহাকে নষ্ট করিলে এমন একটা জিনিষকে নষ্ট করা হয়, যাহা মানুষ অন্য কোনো স্থান হইতে পাইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বমানব সেই অংশে দরিদ্র হয়। চাষের জমিকে খনির মত ব্যবহার করিলে ও খনিজের জমিকে কৃষিক্ষেত্রের কাজে লাগাইলে মানব-সভ্যতাকে ফাঁকি দেওয়া হয়।

যে কারণেই হউক্, য়ুরোপের সঙ্গে ভারত-বর্ষের কতকগুলি গুরুতর প্রভেদ আছে। উৎকট অনুকরণের দ্বারা সেই প্রভেদকে দূর করিয়া দেওয়া যে কেবল অসম্ভব, তাহা নহে, দিলে তাহাতে বিশ্বমানবের ক্ষতি হইবে।

আমরা যখন বিদেশের ইতিহাস পড়ি বা

* গত ১৭ই আষাঢ় শনিবার রাজধানী আগরতলায় 'ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

বিদেশের প্রতাপকে প্রত্যক্ষচক্ষে দেখি, তখন নিজেদের প্রতি ধিক্কার জন্মে—তখন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাই, সমস্তই আমাদের অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়। কোনো অধ্যাপকের অর্বাচীন বালকপুত্র যখন সার্কাস্ দেখিতে যায়, তাহার মনে হইতে পারে যে, এম্‌নি করিয়া ঘোড়ার পিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাফালাফি করিতে যদি শিখি এবং দর্শকদলের বাহবা পাই, তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহার পিতার শান্তিময় কাজ তাহার কাছে অত্যন্ত নির্জ্জীব ও নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ স্থলে পিতাকে ধিক্কার দিবার কারণ থাকিতেও পারে। সার্কাসের খেলোয়াড় যেরূপ অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজের ব্যবসায়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, সেইরূপ উদ্যম ও উদ্যোগের অভাবে অধ্যাপক যদি নিজের কর্ম্মে উন্নতিলাভ না করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া চলে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অনুভব করিয়া যদি আমাদের লজ্জা পাইতে হয়, তবে লজ্জার কারণটা ভাল করিয়া বিচার করিতে হয়, নতুবা যথার্থ লজ্জার মূল কখনই উৎপাটিত হইবে না। যদি বলি যে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট আছে, ইংলণ্ডের যৌথকারবার আছে, ইংলণ্ডে প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনার কিছু-না-কিছু অধিকারী, এইজন্যই তাহারা বড়, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোট, তবে গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে যদি কয়েকদিনের জন্য মূঢ় আবুহোসেনের মত ইংরেজিমাহাত্ম্যের বাহ্য অধিকারী হই —আমাদের বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়—পার্লামেণ্টের গৃহচূড়া আকাশভেদ করিয়া উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহসন পঞ্চম অঙ্কে কি মর্ম্মভেদী অশ্রুপাতেই অবসিত হয়! আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে, পার্লামেণ্টে মানুষ গড়ে—বস্তুত মানুষই পার্লামেণ্ট গড়ে। মাটি সর্ব্বত্রই সমান; সেই মাটি লইয়া কেহ বা শিব গড়ে, কেহ বা বানর গড়ে; যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে মাটির পরিবর্ত্তন নহে, যে ব্যক্তি গড়ে, তাহার শিক্ষা ও সাধনা, চেষ্টা ও চিন্তার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই ত্রিপুররাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃতবাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—"কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেণ্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশকালপাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর। বর্ত্তমানে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না, তাহার কতকগুলি কারণ আছে—কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কারণ বীর্য্যের অভাব। এই বীর্য্যের দারিদ্র্যবশত যদি নিজের প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করিয়া থাকি, তবে বিদেশের অনুকৃতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে?

আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেলবাগানে প্রচুর

আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলা কাটিয়া-ফেলিয়া আপেলগাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিব? এই কথাই নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেল-গাছে যে বেশি ফল ফলিতেছে, তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে সার আছে—আমাদের আমবাগানের জমির সার বহুকাল হইল নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আপেল পাই না, ইহাই আমাদের মূল দুর্ভাগ্য নহে; মাটিতে সার নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। সেই সার যদি যথেষ্ট-পরিমাণে থাকিত, তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুরপরিমাণে ফলিত এবং তখন সেই আম্রের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবার কথা আমাদের মনেই হইত না। তখন দেশের আম বেচিয়া অনায়াসে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া এক-রাত্রে পরের প্রসাদে বড়লোক হইবার দুরাশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না।

আসল কথা, দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে। সেই সার আর কিছুই নহে—"কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে। ঋষিরা বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই যে আত্মা, ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। বিশ্বাত্মা, পরমাত্মার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্—যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, সে নিজের আত্মাকে পায় না—নিজের আত্মাকে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে, সে অপর কিছুকেই লাভ করিতে পারে না। য়ুরোপ নিজের আত্মাকে যে পথ দিয়া লাভ করিতেছে, সে পথ আমাদের সম্মুখে নাই; কিন্তু যে মূল্য দিয়া লাভ করিতেছে, তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাবশ্যক—তাহা বল, তাহা বীর্য্য। য়ুরোপ যে কর্ম্মের দ্বারা যে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে, আমরা সে কর্ম্মের দ্বারা সে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব না—আমাদের সম্মুখে অন্য পথ, আমাদের চতুর্দ্দিকে অন্যরূপ পরিবেষ, আমাদের অতীতের ইতিহাস অন্যরূপ, আমাদের শক্তির মূলসঞ্চয় অন্যত্র—কিন্তু আমাদের সেই বীর্য্য আবশ্যক, যাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেষকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্ত্তমানে সফল করিতে পারিব, এবং শক্তির গূঢ়সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত-উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—আত্মা ত আছেই, কিন্তু বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না। ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, দুঃখ পাইতে সাহস নাই, লক্ষ্য অনুসরণ করিতে নিষ্ঠা নাই;—কৃশ সঙ্কল্পের দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশক্তির আত্মবঞ্চনা, সুখবিলাসের ভীরুতা, লোকলজ্জা, লোকভয় আমাদিগকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যথার্থভাবে আত্মপরিচয়, আত্মলাভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে। সেইজন্যই ভিক্ষুকের মত আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষা করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ্য অবস্থা যদি দৈবক্রমে অন্যের মত হয়, তবেই আমাদের সকল অভাব, সকল লজ্জা দূর হইতে পারে।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভাল

করিয়া পড়িয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব, মহত্ব কত বিচিত্রপ্রকারের—গ্রীসের মহত্ব এবং রোমের মহত্ব একজাতীয় নহে—গ্রীস্ বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বড়, রোম কর্ম্মে ও বিধিতে বড়। রোম তাহার বিজয়পতাকা লইয়া যখন গ্রীসের সংশ্রবে আসিল, তখন বাহুবলে ও কর্ম্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিদ্যাবুদ্ধিতে গ্রীসের কাছে হার মানিল, গ্রীসের কলাবিদ্যা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস্ হইল না—সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল, অনুকৃতিতে নহে—সে লোকসংস্থানকার্য্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্যবিজ্ঞানকলাবিদ্যায় হইল না।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ য়ুরোপীয় প্রতাপের যে আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে, উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্য-আকারের হইতে পারে—আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার, বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদিগকে লজ্জিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্ম্মের দ্বারা চীন-জাপান, ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ, তিব্বত-মঙ্গোলিয়া,—এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল; আজ য়ুরোপ অস্ত্রের দ্বারা, বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে—আমরা ইস্কুলে পড়িয়া এই আধুনিক য়ুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্তু ইংরেজের বাহুবল নহে, ইংরেজের ইস্কুল ঘরে-বাহিরে, দেহে-মনে, আচারে-বিচারে সর্ব্বত্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদিগকে যে সকল বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাতে অন্তত কিছুকালের জন্যও আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সেই আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কখনই আত্মোন্নতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির যথার্থ উপযোগিতা কি, তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশবিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির যাত্রাপথে পিছাইয়া পড়া ভাল নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারাই অগ্রসর হওয়াই যথার্থ অগ্রসর হওয়া—তাহাতে যদি মন্দগতিতে যাওয়া যায়, তবে সেও ভাল। অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই—কারণ, চলিবার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়ামাত্রই লাভ নহে। ব্রিটিশরাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের কৃতকার্য্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনরক্ষণ-বিধিব্যবস্থা যত ভালই হউক্ না কেন, তাহা ত বস্তুত আমাদের নহে। মানুষ ভুলত্রুটি-ক্ষতিক্লেশের মধ্য দিয়াই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভুল করিতে দিবার ধৈর্য্য যে ব্রিটিশরাজের নাই। সুতরাং তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারেন,

শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের যাহা আছে, তাহার সুবিধা আমাদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বত্ব দিতে পারেন না। মনে করা যাক্‌, কলিকাতা-ম্যুনিসিপালিটির পূর্ব্ববর্ত্তী কমিশনারগণ পৌরকার্য্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, সেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে, এখন কলিকাতার পৌরকার্য্য পূর্ব্বের চেয়ে ভালই চলিতেছে, কিন্তু এরূপ ভাল চলাই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা খারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল। আমরা গরীব এবং নানা বিষয়েই অক্ষম, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য ধনি-জ্ঞানী বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষাবিভাগে দেশীয় লোকের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেয় আছে—আমরা গরীবের যোগ্য বিদ্যালয় যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি, তবে সেই আমাদের সম্পদ্‌। যে ভাল আমার আয়ত্ত-ভাল নহে, সে ভালকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিষম বিপদ্‌। অল্পদিন হইল, একজন বাঙালি ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্‌ দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতেছিলেন—তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ-রাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাঁহাদেরই সুব্যবস্থা;—তিনি যে ভারবাহিমাত্র, তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্ত অঙ্গমাত্র, এ কথা যদি তাঁহার মনে থাকিত, তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশরাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি,—অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীয় রাজ্যের ভুলক্রটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুররাজ্যের প্রতি উৎসুকদৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই, তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণে, এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃঙ্খলার অভাব দেখি, তবে তাহা লইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না,—আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই, তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্ত লাভের জন্ত,—উপস্থিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য, রাজশ্রীর মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া

দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের লজ্জা এবং ইহার গৌরবকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি, তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্য্যের দ্বারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে পারিব। ব্রিটিশরাজ ইচ্ছা করিলেও এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই একমাত্র মহিমা বলিয়া জানেন—এই কারণে ভালমনেও তাঁহারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিখিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্যাট্রিয়ট্ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের অনেকেই এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এইরূপে যাঁহারা ভারতকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করেন, তাঁহারাই ভারতকে বিলাত করিবার জন্য উৎসুক—সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কখনই সফল হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া-পড়িয়া থাকুন, আর যাহাই হোক্, এইখানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিকৃতি-অনুকৃতির মহামারী এখানে প্রবেশলাভ করিতে না পারুক্, এই আমাদের একান্ত আশা। ব্রিটিশরাজ আমাদের উন্নতি চান, কিন্তু সে উন্নতি ব্রিটিশমতে হওয়া চাই। সে অবস্থায় জলপদ্মের উন্নতি-প্রণালী স্থলপদ্মে আরোপ করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে দেশ উন্নতিলাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের সভ্যতা মানবজাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে, তাহা যে মহামূল্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করা ধৃষ্টতা।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে, এ কথা আমার বক্তব্য নহে—তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে—উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই—তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সেদিন এখানকার কোনো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, গবর্মেণ্ট-আর্টস্কুলের গ্যালারি হইতে বিলাতি ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভাল হইয়াছে?

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে, ভালই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতী চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা চলে না। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায়? দুটো লক্ষ্ণৌ-ঠুংরি ও "হিলিমিলি পনিয়া" ভাঁজিয়া যদি কোনো বিলাতবাসী ইংরেজ ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বন্ধুর কর্ত্তব্য তাহাকে নিরস্ত করা। বিলাতী

বাজারের কতকগুলি সুলভ আবর্জ্জনা এবং সেই সঙ্গে দুটিএকটি ভাল ছবি চোখের সামনে রাখিয়া আমরা চিত্রবিদ্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিখি, তাহা যে কত নিকৃষ্ট, তাহাও ঠিকমত বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই। যেখানে একটা জিনিষের আগাগোড়া নাই,—কেবল কতকগুলা খাপ্‌ছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেখানে সে জিনিষের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়—পরের দেশের ভালটা ত শিখিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কি, তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম, তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপ্‌ড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গপরিপূর্ণ একটি সমগ্রমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পাইতাম, ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম—পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থায় বিলাতী চিত্রের মোহ জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া ভাল। নহিলে নিজের দেশে কি আছে, তাহা দেখিতে মন যায় না—কেবলি অবজ্ঞায় অন্ধ হইয়া যে ধন ঘরের সিন্দুকে আছে, তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এদেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন—তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্ম জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকানবাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্নকাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্টস্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, কলাবিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি বিদেশের অপরিচিত-রীতির চিত্রের সৌন্দর্য্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান—তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিতে শিখিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পদৃষ্টি, শিল্পজ্ঞান জন্মিত, যাহার সাহায্যে শিল্পসৌন্দর্য্যের দিব্য-নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই, তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া

মনে করি, যাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে, তাহাকে নিজের সম্পদ্ জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠি।

"পিয়ের্-লোটি" ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতী আস্‌বাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতী আস্‌বাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড় বড় রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতী সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সঙ্গতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন—আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মূর্খ দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলা খাপ্‌ছাড়া জিনিষপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি—তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই আস্‌বাবের দোকান যদি লর্ড কার্জন্ বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন, তবে দায়ে পড়িয়া আমরা স্বদেশী সামগ্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম—তাহা হইলে টাকার সাহায্যে জিনিষক্রয়ের চর্চ্চা বন্ধ হইয়া রুচির চর্চ্চা হইত। তাহা হইলে ধনিগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে, আমাদের স্থাপত্যে-ভাস্কর্য্যে, আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতরসম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই—সুতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অনুকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে,—তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই ফরমায়েসে তৈরি সভ্যপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য্য সুলভ ও ইতর অনুকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এদেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অদ্ভুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে, তেমনি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ্ আর হইতেই পারে না।

এই মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা

তাকাইয়া আছি। এ কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনিতে নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না। একলব্যের মত ধনুর্ব্বিদ্যার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দান করিব না। এ কথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিলে দুর্ব্বল হইতে হয়। ব্যাঘ্রের আহার্য্যপদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ভাবে-ভঙ্গীতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এইজন্য আমাদের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে—আমরা কেবলি অকৃতকার্য্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব—এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিলাতী কারখানাঘরের প্রভূত জঞ্জাল যদি ঝাঁট দিয়া না ফেলি, তবে দুই দিক্ হইতেই মরিব—অর্থাৎ বিলাতী কারখানাও এখানে চলিবে না, চণ্ডীমণ্ডপও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারখানাঘরের ধূমধূলিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্ব্বাসন করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজের হাতে মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, ইংরেজের সামগ্রীকে যদি লইতেই হয়, তবে তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে—এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অনুকূলে পরিণত করিয়া তোলা—তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাদ্য যদি খাদ্যরূপেই বরাবর থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে পুষ্টি দূরে থাক্, ব্যাধি ঘটে। খাদ্য যখন খাদ্যরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরক্তরূপে মিলিয়া যায় এবং যাহা মিলিবার নহে পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাহা আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতী সামগ্রী যখন আমাদের ভারতপ্রকৃতির দ্বারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায়, তখনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে—যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে, ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতী সরস্বতীর পোষ্যপুত্রগণ এ কথা কোনোমতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিসাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্যই আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদেশী কার্য্যবিধির অসঙ্গত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মত না দেখিতে হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাত্র হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতিমুহূর্ত্তে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব হৃৎপিণ্ডের

নাড়ির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের রাজ্য কেরাণীচালিত বিপুল কারখানা নহে—নিভুর্ল নির্ব্বিকার এঞ্জিন্ নহে—তাহার বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্তু—রাজলক্ষ্মী প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কর্ম্মের শুষ্কতার মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেন, দেনা-পাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমার অশ্রুজলে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্য-গুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে—এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশ-লক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষস্থলের সজীব-কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলা ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন—দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর চিন্তা, আদর্শ বা সাধনাতে প্রতাপচন্দ্রের প্রতিভার চাক্ষুষ প্রভাব কতটুকু পড়িয়াছে, ইহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। অথচ শিক্ষিত ভারতসমাজে প্রতাপচন্দ্রের প্রতিপত্তি যে অল্প ছিল, তাহাও নহে। তাঁহার বাগ্মিতার যশঃসৌরভ ভারতময় পরিব্যাপ্ত ছিল। যেমন বাংলাতে, সেইরূপ ইংরেজিতে, উভয় ভাষাতেই সুললিত বাক্যবিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। ভারতবাসীর তো কথাই নাই, ইংরেজ ও মার্কিণীয় লেখক ও বক্তাগণের মধ্যেও অতি অল্পলোকেই শব্দচিত্র-অঙ্কনে প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় এরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহার কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার অলোকসাধারণ বাক্‌চাতুর্য্যে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে, দলে দলে যাইয়া নিরতিশয় আগ্রহসহকারে তাঁহার বক্তৃতামণ্ডপ লোকারণ্য করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, কখনো আপনাদের চিন্তাতে, আদর্শে, সাধনাতে, বা চরিত্রে, প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার স্থায়ী প্রভাব অনুভব করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার কারণও চক্ষের উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজই প্রতাপচন্দ্রের প্রত্যক্ষ কার্য্যক্ষেত্র ছিল, আর ব্রাহ্মসমাজ

ভারতের চিন্তা ও সাধনাতে যে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিরই সঙ্গে জড়িত,—আজ পর্য্যন্ত এ ক্ষেত্রে চাক্ষুষভাবে কোন চতুর্থ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কোন বিষয়েই প্রতাপচন্দ্রও ইঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। আজীবনকাল তিনি একরূপ কেশবচন্দ্রের ছায়ারূপেই আমাদিগের সমক্ষে বিচরণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার শৈশবসহচর ছিলেন, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, কেশবচন্দ্র হইতেই তিনি আপনার সমুদায় শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কেশবচন্দ্র যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার কোন স্বাধীন অধিকার ছিল না। কেশবের স্বর্গারোহণের পরেও, আত্মকলহনিবন্ধন, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার যথোপযুক্ত প্রভাব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অথচ প্রতাপচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভা যে নিতান্ত সামান্য ছিল, তাহাও নহে। অন্য ক্ষেত্রে, অন্য অবস্থাধীনে, কেশবচন্দ্রের মত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কিরণজালে আচ্ছন্ন না হইলে, প্রতাপচন্দ্রের প্রতিভাও সম্ভবত স্বদেশীয় সমাজের চিন্তা ও চরিত্রে কোন-না-কোন আকারে স্বল্পবিস্তর স্বাধীনপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত।

এদেশের আধুনিক নেতৃবর্গের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র আজীবন অত্যন্ত বৈদেশিকভাবাপন্ন ছিলেন। কোন কোন সামাজিক বিষয়ে, কখনো কখনো তিনি রক্ষণশীল হিন্দুর ন্যায়, প্রাচীন প্রথাসকলের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ সকল ভাব বৈরাগ্য-ও-সন্ন্যাসপ্রধান আদর্শের সাধারণ নিদর্শন; খৃষ্টীয়, মোহম্মদীয়, বৌদ্ধ ও হিন্দু, সকলেরই পক্ষে নিবৃত্তিমার্গের সঙ্গে এ সকল ভাব স্বভাবতই জড়িত হইয়া আছে। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এবং সাধারণত রমণীকুলের সম্বন্ধে তাঁহার যে ভাব ও ধারণা ছিল, তাহা যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে, সেইরূপ খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। হিন্দুর সন্তান বলিয়া ও হিন্দুসমাজে ও হিন্দুপরিবারে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া, অন্তরে-অন্তরে একটা স্বাভাবিক হিন্দুত্ব তাঁহার মধ্যে সহজভাবেই সর্ব্বদা বিদ্যমান ছিল, এবং এই হিন্দুভাব তাঁহার অজ্ঞাতে, তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকেও বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল সত্য, কিন্তু যাঁহারা কোনো কোনো সামাজিক বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের সঙ্কীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা দ্বারা তাঁহার হিন্দুত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দুর বিশেষত্ব কি, ইহা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বিধিমার্গে নহে, কিন্তু অধ্যাত্মযোগে ও ভাগবতী লীলাতেই হিন্দুর বিশেষত্ব; ইহাতেই সভ্যজগতে ও মানবীয় সাধনায় হিন্দুর অসাধারণ অধিকার ও প্রাধান্য। আর এই বিশেষ হিন্দুভাব ও আদর্শের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের কখনো কোনও গভীর যোগ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

স্বদেশীয় শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে কেশবচন্দ্রেরও সাক্ষাৎযোগ ছিল না সত্য; কিন্তু কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা ঈষৎ ইঙ্গিতমাত্র পাইলেই অতি জটিল ও নিগূঢ়

তত্ত্বের অভ্যন্তরেও মোটামুটিরূপে প্রবেশ করিতে পারিত। তাঁহার ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাক্ষাৎভাবে এই সকল গভীর হিন্দুতত্ত্ব শিক্ষা বা সাধনা না করিয়াও শুদ্ধ আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ অধ্যাত্মদৃষ্টিপ্রভাবে কেশবচন্দ্র কতটা যে যোগভক্তির মুখ্যভাব ও আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপচন্দ্রের এ অধিকার ছিল না; সুতরাং আপনার প্রতিভার বলেও তিনি স্বদেশীয় শাস্ত্রসাধনার মুখ্য সত্যগুলিকে সম্যক্‌রূপে কখনো আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

কেশবচন্দ্রের অভ্যুত্থানকালে শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। পাশ্চাত্যদর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবই তখন নবশিক্ষিত ভারতসমাজে নিরতিশয় প্রবল ছিল। শিক্ষিত ভারতসমাজের মতিগতি তখনো স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। সুতরাং সে সময়ে স্বদেশীয় শাস্ত্রসাহিত্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা শিক্ষিতসমাজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ছিল না। আপনার সামসময়িক শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ অধিকার ছিল। স্বজাতির অভিনব চিন্তাস্রোত প্রবলবেগে যে পথে প্রবাহিত হইতেছিল, সে পথ কেশবচন্দ্রের সুপরিচিত ছিল। দক্ষ, অভিজ্ঞ, শক্তিমান্ কর্ণধারের ন্যায়, এই-জন্যই তিনি সে সময়ে শিক্ষিত ভারতের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সেই বৈদেশিক পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়া, তাঁহাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দেশের মতিগতি ফিরিতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও সাধনা উত্তরোত্তর হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। তথাপি কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুভাবপ্রধান করিয়া তুলিতে পারেন নাই, সত্য। তাঁহার জীবদ্দশায় আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান নব-বেদান্তের অভ্যুদয় হয় নাই—সূচনাই হইয়াছিল কি না, সন্দেহের কথা। রামমোহন রায় উপনিষদ্, বেদান্তসার ও বেদান্তসূত্র প্রভৃতি প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে শিক্ষা সমাজে বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পঁচিশবৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্কলিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থই আমাদিগের মধ্যে উপনিষদ্বের সারতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মহর্ষি কোন অংশেই বৈদান্তিক ছিলেন না, তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থে মূল বৈদান্তিক তত্ত্ব ও আদর্শের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে দর্শনাঙ্গে ও তত্ত্বাঙ্গে স্বজাতির সনাতন সাধনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত করিবার অবসরই প্রাপ্ত হন নাই। তবে তাঁহার কবিত্বময়ী উপাসনার মধ্যে শেষদশায় অদ্বৈতভাবের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নামে,—ভাবোচ্ছ্বাসে our return to the Vedanta আমাদিগের বেদান্তে প্রত্যাবর্ত্তন, ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু তত্ত্বাঙ্গে ও দর্শনাঙ্গে হিন্দুভাবাপন্ন না হইয়াও, কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম, ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর হইতেই, তাহাকে বিশেষরূপে হিন্দুভাবপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র সর্ব্বদাই কেশবের এই হিন্দুপক্ষপাতিত্বকে ঈষৎ আশঙ্কার চক্ষে দেখিতেন। ভক্তশিরোমণি বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যখন বৈষ্ণবী ভক্তি শনৈঃশনৈঃ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রতাপচন্দ্র তাহার বিরোধী ছিলেন। যেদিন প্রথমে খোলকরতালসংযোগে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হয়, সেদিন কেশবচন্দ্র, "প্রতাপ যেন দেখিতে না পান"—এই কারণে খোলকরতাল উপাসনাস্থলে ঢাকিয়া আনিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ক্রমে কীর্ত্তনাদ ব্রহ্মোপাসনার প্রধান সহায় হইয়া উঠিলে প্রতাপচন্দ্রও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভোগ করিতেন বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু চিরদিনই ভিতরে ভিতরে এই সকল মত্ততাকে তিনি একটু যেন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ফলত ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রতাপচন্দ্র আজীবনই মূলত বৈদেশিক ও খৃষ্টীয় ভাবাপন্ন ছিলেন। এইজন্যই আপনার স্বদেশী সমাজে তাঁহার কোন স্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারা যায় না।

কিন্তু তাই বলিয়া প্রতাপচন্দ্রের প্রতিভা একেবারে নিষ্ফলে গিয়াছে বলিতে পারা যায় না। আমাদিগের মধ্যেও, সামান্যপরিমাণে হইলেও, তিনি একটা অতি মহৎকার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। ভারতের শিক্ষিতসমাজে খৃষ্টচরিত্রের প্রতি যে ভক্তি ও প্রকৃত খৃষ্টীয়সাধনার প্রতি যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়া, আমাদের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবনে স্বল্পবিস্তরপরিমাণে যে একটা উদার সার্ব্বভৌমিকতা ফুটাইয়া তুলিতেছে, ইহা বহুলপরিমাণে কেশবচন্দ্রের ও কিয়ৎপরিমাণে প্রতাপচন্দ্রের সাধনা ও বক্তৃতাদিরই প্রত্যক্ষ ফল। ইহা দ্বারা কেবল যে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ উপকৃত হইয়াছেন, তাহা নহে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয়জীবন গঠনেও ইহা বিশেষ সাহায্য করিয়াছে ও ভবিষ্যতে আরো করিবে। নব-ভারত কেবল হিন্দুর নহে, যদিও লোকসংখ্যাগণনায় হিন্দুই ভারতের জনগণমধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মুসলমানকে ছাড়িয়া বর্ত্তমান ভারতে কদাপি জাতীয় অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। যাঁহারা ভারতবর্ষে একটা স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করেন, তাঁহারা আধুনিক রাজতন্ত্রের এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শও আয়ত্ত করেন নাই এবং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্‌জ্ঞানও লাভ করেন নাই। যেমন হিন্দু ও মুসলমান, সেইরূপ খৃষ্টীয়গণও ভারতরাষ্ট্রের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহাকে ছাড়িয়াও কোনপ্রকারের জাতীয়তন্ত্র আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। রাজা রামমোহন রায় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মেরই উদারতাসম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং ভারতে ধর্ম্মবিরোধই জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায়, ইহা জানিয়া, এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্দ

বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে এদেশে এক চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিবে, এ কল্পনা তিনি করেন নাই। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, আপন আপন সাম্প্রদায়িক ভাব ও বিশেষত্ব পশ্চাতে রাখিয়া সাধারণভাবে জগতের স্রষ্টা ও পালয়িতা যিনি, তাঁহারই ভজনা করিবে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠায় রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড্ (trust deed) ইহার অকাট্য প্রমাণ। কার্য্যত এই ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুগণ বিশেষভাবে যোগদান করেন, এবং তজ্জন্য ক্রমে কলিকাতাসমাজের উপাসনাপ্রণালী প্রভৃতি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। হিন্দুগণ আপনাদিগের শাস্ত্রসাহিত্যের অনুসরণ করিয়াই হিন্দুধর্ম্মকে উদার ও আধুনিক আদর্শের অনুযায়ী করিয়া তুলিবেন, ইহা রাজারও অভিমত ছিল। কিন্তু মুসলমানেরাও সেইরূপ আপনাদিগের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রাদি অবলম্বনে ও তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া, মুসলমানধর্ম্মকে উদার ও সার্ব্বভৌমিক করিয়া তুলিবেন এবং খৃষ্টীয়ানেরাও ঐরূপ খৃষ্টীয়শাস্ত্রাদি অবলম্বনে, খৃষ্টীয়তত্ত্বকে উদার ও সার্ব্বভৌমিক করিবেন, ইহাই রাজার অভিপ্রায় ছিল। এবং এইজন্যই তিনি একদিকে যেমন বেদান্তাদিশাস্ত্রের সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মকে, সেইরূপ কোরাণ ও হদিসাদির সাহায্যে মহম্মদীয় ধর্ম্মকে ও বাইবেল এবং তালমুদ অবলম্বনে খৃষ্টীয়ধর্ম্মকে কুসংস্কারবর্জ্জিত, সত্যোপেত, বিশুদ্ধজ্ঞানানুমোদিত ও উদার সার্ব্বভৌমিকভাবাপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয়ধর্ম্মসম্বন্ধে রাজা যে সংস্কারকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র এবং প্রতাপচন্দ্র তাহারই সাহায্য করিয়া আমাদিগের মধ্যে খৃষ্টভক্তি, খৃষ্টীয়সাধনা ও খৃষ্টীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বিকশিত করিয়া, ভারতের বর্ত্তমান জাতীয়জীবনের একতা ও ঘননিবিষ্টতা সম্পাদনে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাই স্বদেশী শিক্ষিতসমাজে প্রতাপচন্দ্রের বিশেষ কীর্ত্তি। আমাদিগের মধ্যে এই কীর্ত্তিদ্বারাই কেশবচন্দ্রের স্মৃতির সঙ্গে তাঁহার স্মৃতিও চিরদিন জাগ্রত থাকিবে।

রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রহীন যুক্তি বা যুক্তিহীন শাস্ত্র, দুএর কিছুরই সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রযুক্তির আশ্চর্য্য সমন্বয় সাধন করিয়া, এই উভয় ভিত্তির উপরেই ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সত্যের দ্বিবিধ প্রকাশ,—এক অন্তরে, মনোরাজ্যে; অপর বাহিরে, নিসর্গে ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশশীল চিন্তা, সাধনা, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে। একই সত্য অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়াই, আমরা অন্তরের বৃত্তিনিচয়কেও জানিতেছি এবং বাহিরের নৈসর্গিক ও সামাজিক নিয়ম ও বিধিব্যবস্থাদির মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি। অন্তর ও বাহির একত্রভাবে পরস্পরকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে, ইহা যেমন সত্য; যাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে তাহা

জাগেও না ভাঙে, ইহাও ঠিক সেইরূপ সত্য। অন্তরবাহিরের সম্মিলন ও সাম্য স্থলেই প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শাস্ত্রকে বর্জ্জন করিয়া স্বাভিমতকে অবলম্বন করেন নাই, স্বাভিমতকে বর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রকেও অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠের উপদেশানুযায়ী সদ্‌গুরু, সুশাস্ত্র ও স্বাভিমতের একবাক্যতার উপরেই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন আচার্য্যমত অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, রাজা এজন্য সদ্‌যুক্তিসম্পন্ন, মোক্ষোপদেশক, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেন। পুরাণতন্ত্রাদিকেও তিনি একেবারে বর্জ্জন করেন নাই, কেবল যেস্থলে এ সকলের সঙ্গে বেদান্তবিজ্ঞানের বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন মীমাংসকদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই, রাজা কেবল তাহাই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজার ধর্ম্মে একটা বাহ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য বিদ্যমান ছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রপ্রামাণ্যসম্বন্ধে রাজার প্রতিষ্ঠিত পন্থা প্রকাশ্যত পরিত্যাগ করিয়াও কার্য্যত উপনিষদাদি হইতেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতি সংগ্রহ করিয়া আপনার "ব্রাহ্মধর্ম্ম"গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা করেন; এবং আমরণকাল তিনি এই গ্রন্থকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য ও বহিরাশ্রয়রূপে গণ্য করিতেন।

কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে তত্ত্বে ও ব্যবহারে উভয়ত স্বদেশীয় শাস্ত্রসাধনাদিকে পূর্ব্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া ব্যক্তিগত মতামতের শিথিল বালুকাস্তূপের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা তৎসময়ের প্রবলতম চিন্তা ও ভাবের অনুযায়ী হইয়াছিল, ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সে সময়ে ভারতের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে পাশ্চাত্য চিন্তা ও সাধনার অত্যন্ত প্রভাব পড়িয়াছিল। আর পাশ্চাত্যজগতে তখন নববিজ্ঞানের প্রভাবে মানবের মন বহুশতাব্দীর কঠোর শাস্ত্রপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সত্যনির্দ্ধারণে স্বাভিমতের অনন্যপ্রতিযোগী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। ইহা বিদ্রোহের অবস্থা ছিল, সন্দেহ নাই; এবং এই সকল সামাজিক, রাজনৈতিক বা মানসিক বিদ্রোহকালে প্রাচীন বন্ধন ছিন্ন হইয়া জনমণ্ডলীকে স্বল্পবিস্তরপরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে, ইহাও সত্য। কেশবচন্দ্র এই নিরঙ্কুশ মানসিক স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং সে সময়ে শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ স্বাভিমতের উপরে ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু এ জগতে আধখানা সত্য লইয়া কোনো-কিছুই বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজেও সাধকমণ্ডলীর নিরঙ্কুশ স্বাভিমতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মের প্রামাণ্য ও সার্ব্বভৌমিক প্রতিষ্ঠা প্রায় বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তখন কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগত মতামতের উপরে, আদেশবাদ প্রভৃতি অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত মতের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন। আমাদের মতামতে নহে, কিন্তু ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে আমাদের অন্তরে যে সত্যপ্রকাশ করেন, তাহাতেই ধর্ম্মের সনাতন

প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা, এই সিদ্ধান্ত করিলেন। তবে "মোহান্তগুরুকে" ছাড়িয়া শুদ্ধ চৈত্য-গুরুকে অবলম্বন করিলে স্বাভিমতের গৌরব-বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। কেশবচন্দ্রের আদেশ-বাদেও গোল মিটিল না। আদেশেরই বা প্রমাণ কি? ব্যক্তিগত খেয়াল ও মতামত এবং ঈশ্বরাদেশের মধ্যে সত্য নির্দ্ধারণ করিবে কে? আমার ঈশ্বরাদেশকে তোমার খেয়াল বলিবার অধিকার কি?—আদেশ-বাদে এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কেশব-চন্দ্র তখন ব্যক্তিগত মতামত ও ব্যক্তিগত ঈশ্বরাদেশের উপরে ও বাহিরে ধর্ম্মের এক প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, অবশেষে তাঁহার শ্রীদরবারের প্রতিষ্ঠা করিলেন। শ্রীদরবারে বসিয়া, প্রেরিত-মণ্ডলী, অর্থাৎ তাঁহার প্রচারকগণ, সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে যাহা গ্রহণ করিবেন, তাহাই ঈশ্বরাদেশ ও তাহাই ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে, এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। শুদ্ধ ব্যক্তিগত মতামতের উপরে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা যে অসম্ভব, কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রতাপ-চন্দ্রও ইহা বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন। যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ বা rationalism ব্যক্তি-গত মতামতকে সত্যের কষ্টিপাথররূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সুযোগ পাইলে তাহার উপরে প্রতাপচন্দ্র কখনো ঘৃণাকটাক্ষপাত করিতে ছাড়িতেন না। অন্যদিকে কেশব-চন্দ্রের ন্যায় আদেশবাদে বা শ্রীদরবারেতেও ধর্ম্মের সনাতন প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া তিনি মনে করিতেন, এমনও বোধ হয় না। কেশবপ্রতিষ্ঠিত কোন মত বা প্রতিষ্ঠান-কেই প্রতাপচন্দ্র কখনো প্রকাশ্যভাবে প্রত্যা-খ্যান করেন নাই, আদেশ ও দরবারের মতেরও তিনি কখনো প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু এইজন্য তিনি যে আদেশবাদের বিঘ্নবিপত্তি ও দরবারবাদের অসারতা না বুঝিয়াছিলেন, এমনও বলা যায় না। কেশবচন্দ্রের স্বর্গা-রোহণের পরে দরবারের সঙ্গে তাঁহার গুরু-তর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কেশব-চন্দ্র শ্রীদরবারে নববিধানধর্ম্মের যে বহিঃ-প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিলে, প্রতাপচন্দ্র কখনো কার্য্যত এরূপভাবে দরবারের সভ্যগণের সঙ্গে আধ্যা-ত্মিক সহকারিতার সমুদায় সম্বন্ধ ছেদন করিতে পারিতেন না।

রাজা রামমোহন জাতীয় শাস্ত্রসাহিত্যে ধর্ম্মের বহিঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কেশব ধর্ম্মের বহিঃপ্রামাণ্যরূপে শ্রীদরবার সংগঠিত করিয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র এ দুএর কোন পন্থাই অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু আধুনিক উদারমতি খৃষ্টীয় আচার্য্যগণের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া, তিনি যিশুখৃষ্টকে ধর্ম্মের বহিঃপ্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠারূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার খৃষ্ট-চরিত্র ও খৃষ্টীয় সাধনার প্রতি অসাধারণ অনুরাগের উৎপত্তি হয়। McCosh, Mansel প্রভৃতি আধুনিক খৃষ্টীয় দার্শনিকগণ বর্ত্তমানযুগের যুক্তিবাদ বা rationalismকে প্রতিহত করিতে যাইয়া, আত্মপ্রত্যয়বাদ বা intuitionalismএর পূর্ণতা প্রতিপাদনার্থে, খৃষ্টকে ধর্ম্মের বাহ্যমূর্ত্তি বা objective revelationরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। রামমোহন, সমগ্র মানবেতিহাসের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যে নিখিলজ্ঞান, নিখিল রস, নিখিল কর্ম্মের চিরপুরাতন-চিরনবীন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাকেই আত্মপ্রত্যয়ের ও স্বাভিমতের বহিঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ম্যাক্‌কশ্ বা ম্যান্‌সেলের ন্যায় তাঁহাকে ধর্ম্মের অন্য কোন সাময়িক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার অন্বেষণ করিতে হয় নাই। প্রতাপচন্দ্র সমগ্র মানবেতিহাসকে রাজার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছার ক্রমপ্রকাশরূপে যদি গ্রহণ করিতে পারিতেন, বিশেষভাবে খৃষ্টের আশ্রয় অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক হইয়া পড়িত। কিন্তু রাজার মনস্বিতা তাঁহার ছিল না। রাজার বিশাল পাণ্ডিত্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার জন্মে নাই। রাজার গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি তিনি কদাপি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কেশবচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রখর প্রতিভাতে তাঁহার চক্ষু এমনই ঝলসিয়া গিয়াছিল যে, রাজার স্নিগ্ধতর ও বিশালতর প্রতিভার উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ ও মর্য্যাদা রক্ষা করাও তাঁহার পক্ষে কদাপি সম্ভব ছিল না। এই জন্যই তিনি রাজার সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞানদর্শনসম্মত পন্থাও গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কেশবচন্দ্রের অদ্ভুত পন্থাও প্রাণ ধরিয়া অনুসরণ করেন নাই; কিন্তু ম্যাক্‌কশ্‌ ম্যান্‌সেল্ প্রভৃতির ইঙ্গিতমাত্র গ্রহণ করিয়া, অন্য পথে যাইয়া খৃষ্টচরিত্রকে ধর্ম্মজীবনের প্রকাশ্যপ্রতিষ্ঠারূপে বরণ করিয়া, সেই চরিত্রের আদর্শেই আপনার অধ্যাত্মজীবনকে গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টচরিত্র ও খৃষ্টীয় আদর্শের প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ ও পক্ষপাতিত্ব নিবন্ধনই স্বদেশীসমাজে প্রতাপচন্দ্রের প্রভাব কোনপ্রকারে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। কিন্তু অন্যদিকে এই কারণেই তিনি বর্ত্তমান উদারমতি খৃষ্টীয় মণ্ডলীসকলের মধ্যে অসাধারণ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র খৃষ্টকে ঈশ্বররূপে কখনো গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরের অবতাররূপেও কখনো তিনি খৃষ্টকে কোনোপ্রকারের ঐশ্বরিক মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয়ানেরা যে চক্ষে খৃষ্টকে দর্শন করেন, প্রতাপচন্দ্র সে চক্ষে কখনো খৃষ্টকে দর্শন করেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবী পরিভাষা যাঁহাকে মোহান্তগুরু বলে, কিয়ৎপরিমাণে সেই চক্ষেই প্রতাপচন্দ্র খৃষ্টকে দর্শন করিতেন। সেই গুরুরূপেই তিনি খৃষ্টকে আপনার অধ্যাত্মজীবনের কেন্দ্রস্থলে বরণ করেন এবং অকৃত্রিম গুরুভক্তি সর্ব্বদা খৃষ্টপদে অর্পণ করিয়া খৃষ্টচরিত্রকে আপনার অধ্যাত্মজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবীলতা যেমন সুবিশাল অশ্বত্থবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া, তাহারই আশ্রয়ে ঊর্দ্ধাদপি ঊর্দ্ধদেশে আপনার সুকুমার দেহযষ্টিকে উন্নীত করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতাপচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবন সুবিশাল খৃষ্টচরিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহারই আশ্রয়ে ভগবচ্চরণ লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধমুখে অগ্রসর হইয়াছিল।

ইহাই বর্ত্তমান খৃষ্টীয়জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম আদর্শ। ত্রিত্ববাদী ও ত্রিত্ববিরোধী,

উভয় সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানমণ্ডলীই পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে এই উদার, এই আধ্যাত্মিক, এই দার্শনিক আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। যাঁহারা প্রকাশ্যত খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বা অবতারমর্য্যাদা অস্বীকার করেন না, তাঁহারাও চিন্তায় ও সাধনায়, কার্য্যে ও চরিত্রে খৃষ্টসম্বন্ধীয় অতিপ্রাকৃত মতামতের জটিলতাকে নীরবে উপেক্ষা করিয়া, শুদ্ধ খৃষ্টের মানুষভাব ও অধ্যাত্মচরিত্রের ধ্যান ও অনুকরণের দ্বারাই আপনাদিগের ধর্ম্মজীবনের পরিপুষ্টিসম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

বৈষ্ণবপরিভাষায় যাঁহাকে মোহান্তগুরু বলে, আধুনিক খৃষ্টীয় মণ্ডলীসকল ঈশু-খৃষ্টকে সেই চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্রও খৃষ্টকে সেই চক্ষেই দেখিতেন। অথচ হিন্দুর আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী বলিয়া, তিনি এই গুরু-খৃষ্টভাব ও আদর্শকে এমন গভীর, এমন সরস, এমনি আধ্যাত্মিকসম্পৎসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টজগৎ বহুশতাব্দীব্যাপী সাধনাদ্বারাও সেরূপ করিতে পারিবে কি না, সন্দেহের কথা। প্রতাপচন্দ্রের এই মধুর, এই গভীর খৃষ্টবাদ খৃষ্টীয়জগতের সম্মুখে এক অভিনব অধ্যাত্মসম্পদ্‌ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এইজন্যই তিনি পাশ্চাত্য খৃষ্টীয়সমাজের আধুনিক আচার্য্যগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের, ও বিশেষত মার্কিণের উদারমতি খৃষ্টীয়ানেরা প্রতাপচন্দ্রের উপদেশবাক্যকে ফেনিলো, টমাস্ একেম্পিস্ এবং এমার্সনের উপদেশের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা প্রতাপচন্দ্রের স্বজাতীয় ও স্বদেশবাসিগণের পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

ফলত প্রতাপচন্দ্র বর্ত্তমান যুগের সভ্য-জগতের ধর্ম্মসাধনা ও ধর্ম্মচিন্তায় কত যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড বা আমেরিকায় না যাইলে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একটি বৈপরীত্য।

য়ুরোপ ও আশিয়ার ইতিহাস আলোচনার ফলে উভয় খণ্ডের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। য়ুরোপের ব্যবহার পরমার্থশূন্য, আশিয়ার ব্যবহার পরমার্থ-পূর্ণ। প্রাচীন য়ুরোপ বলিলে বুঝা যায়, গ্রীস, রোম ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট অসভ্য-জাতি। গ্রীসের Culture, রোমের Law ও খৃষ্টীয় চরিত্রনীতি লইয়া বর্ত্তমান য়ুরোপ। গ্রীকশিল্প, গ্রীকসাহিত্য, গ্রীকরাজনীতির মধ্যে পারমার্থিকতার প্রভাব অল্প, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রীস্-ইতিহাসে পারমার্থিকতা দ্বারা চালিত ঘটনা চক্ষে ঠেকে না। যে পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস, ইহাকেই সুন্দর ও উপভোগ্য করা

গ্রীকদের আদর্শ। গ্রীসে কলাবিৎ, শিল্পী, কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রণপণ্ডিত ও রাজনৈতিকের প্রাচুর্য্য। বহুপ্রকৃতির বহুজাতির একত্রে শাসন ও তাহাদের প্রতি প্রয়োজনমত প্রযোজ্য ব্যবস্থা বা আইন গ্রীসে উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহা রোমকশক্তির বৈশিষ্ট্য। রোমকব্যবস্থাশাস্ত্রের দুইটি মূলমন্ত্রের উল্লেখ করিলেই কথাটি ফুটিয়া উঠিবে। Vox populi vox Dei, জনসাধারণের বাক্যই ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে শরীরশোষক তপস্যার প্রয়োজন নাই, নিরালোক নির্জ্জন গিরিগহ্বরের প্রয়োজন নাই, শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের প্রয়োজন নাই, ভয়াবহ কঙ্কালমালী শ্মশানের প্রয়োজন নাই, দুর্ব্বোধ্য শব্দরাশির প্রয়োজন নাই। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, সভামণ্ডপে লোকে সমবেত হইয়া যাহা বলে, তাহাই ঈশ্বরের বাণী। আপন অন্তরে "স্থির, ক্ষীণ স্বর" রূপে প্রেরিত ঈশ্বরের বাণী শুনিতে কান পাতিয়া থাকিতে হয় না। Vox populi vox Dei। রোমকব্যবস্থার আর একটি মহামন্ত্র—Salus populi suprema lex, জনসাধারণের হিতই শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা। যাহাতে জগতের কল্যাণ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হউক আর নাই হউক, তাহা যাজকগণের অনুমোদিত হউক আর নাই হউক, তাহা শ্রেণীবিশেষের অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক, তাহাই যথার্থ ব্যবস্থা। জনসাধারণকে একদৃষ্টিপাতে দেখিয়া তাহাদের এই পৃথিবীতে উন্নতি, অভ্যুদয়চিন্তা,—ইহাই রোমকব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই রোমক-ইতিহাসে দেখা যায় না। রোমক নাগরিকের উপর এ বিশ্বাস কখন বিশেষ জোর করে নাই।

১৬৪৮ খৃঃঅব্দে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির পর হইতে য়ুরোপের ব্যবহারকার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরমার্থ-অনাশ্রিত। রুষ ও জর্ম্মাণ দেশে ইহুদি তাড়না যাঁহারা সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উহার মূলে আর্থিক স্বার্থ, পরমার্থের সহিত ইহার সুদূর সম্পর্ক, অনেকটা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচ্য বিদ্বেষের সহিত তুলনীয়। ১৮৭০ সনের ফরাসী-জর্ম্মণের যুদ্ধ জেসুইট্‌সম্প্রদায়ের গুপ্তমন্ত্রণার ফল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু ইহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। এ বিশ্বাস সমূলক হইলেও বিশেষ কিছু আসে-যায় না। তৃতীয় নেপোলিয়ন চরিত্রগুণে আগাগোড়া যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ যুদ্ধ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।

য়ুরোপে ব্যবহারকে পরমার্থসংশ্লিষ্ট করিবার চেষ্টা হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু শোণিতস্রোতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন বিলুপ্ত। ত্রিশবার্ষিক যুদ্ধের (১৬১৮—১৬৪৮) পর সে চেষ্টা য়ুরোপে অভাবনীয়। ইতিহাস চর্চ্চা করিলে বিশদরূপে প্রতীতি হয়, পরমার্থশূন্য-ব্যবহার-স্থাপনাই য়ুরোপবাসীর অতর্কিত লক্ষ্য। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে তুর্কি য়ুরোপ হইলেও প্রকৃতি ও উৎপত্তিভেদে বর্ত্তমান স্থলে অগ্রাহ্য। রুষও কতকটা সেইরূপ।

আশিয়ার দিকে চাহিলে দেখা যায়, ইহার বিপরীত। মুশার ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ-

দিগের ব্যবস্থা, মহম্মদের ব্যবস্থার সহিত রোমকব্যবস্থার তুলনা করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় আহার-ব্যবহার, শ্রমবিরাম প্রভৃতি ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত দৈববাণীর উপর স্থাপিত। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন ইহার প্রধান লক্ষ্য, লৌকিক উন্নতি-অবনতি ইহার গৌণ ফল। রোমকব্যবস্থা লোক-হিতের জন্য লৌকিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ধারণা এই যে, শক্তির মূলকেন্দ্র অতি-প্রাকৃত। সেই গুপ্ত বিষ্ণুপাদবিনিঃসৃতা শক্তিগঙ্গা মহাদেবরূপী ঋষি, মুনি, পীর-প্যাগম্বরের জটামধ্যে অন্তর্হিতা হইয়া পুনরায় দেশব্যাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যাপ্তি-লাভের পূর্ব্বে অবশ্য নানা তুঙ্গশৃঙ্গ বন্ধুরপথ অতিক্রমণ প্রয়োজনীয়। সেই অদৃষ্ট পর-দেবতার বাণী যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা অল্প লোকের সুবোধ্য ভাষার মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নানা টীকা-টিপ্পনী-হাদিস-তালমুদ-পুরাণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহা জনসাধারণের কর্ণগোচর হইতেছে। এ অবস্থায় যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিয়াছে। পরদেবতা সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বামিক। রাজা পৃথিবীতে নিঃস্বামিক। সেই দেবতার আজ্ঞা শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণ-মোল্লা প্রভৃতি শ্রেণী-বিশেষ। রাজার কার্য্য চর্চ্চা করা সাধা-রণের পক্ষে লৌকিক অপরাধ ও শাস্ত্রীয় পাপ। পুরাণে অনুক্ত রাজার চরিত্র আলো-চনা সাধারণ হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রোক্ত পাপ। রাজার ধর্ম্ম প্রজাপালন করা, প্রজার ধর্ম্ম রাজাজ্ঞা পালন করা। ধর্ম্মহীন রাজা ধর্ম্মের নিকট দণ্ডার্হ, প্রজার নিকট নহেন। ভারত-অভ্যাগত সিংহাসনপ্রাপ্তিমাত্রেই রাজা প্রভু, প্রজা তাঁহার আজ্ঞাধীন। এ নিমিত্ত প্রাচ্য রাজা স্বেচ্ছাচারী। পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর প্রতি বুদ্ধদেবের ব্যবহার এস্থানে স্মরণীয়। রাজা শাস্ত্রাধীন, শাস্ত্রবিদের বশবর্ত্তী বলিলে দেখিবে, কার্য্যত তাহা নহে। শাস্ত্রবিৎ রাজার উপর শাস্তি-প্রয়োগে অক্ষম। রাজাকে ছাড়িয়া কোথায় শক্তি আছে যে, তাহা দণ্ডরূপে রাজার উপর নিপতিত হইবে? প্রজা ত সে শক্তির আধার হইবে না। কেন না, রাজাজ্ঞাপালনই প্রজার ধর্ম্ম। প্রাচ্য ইতিহাসে এক রাজার দমনের জন্য অন্য রাজাকে ডাকিবার যে এত দৃষ্টান্ত আছে, তাহার মূল এই। আর এই একই হেতুবশত রাজার সম্বন্ধে দায়াধিকারের নিয়ম অচল। যে নিয়মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, যাহার জন্য নিয়ম, তিনিই যে নিয়মের রক্ষা-ভঙ্গের প্রভু, তাহাকে নিয়ম বলা শব্দের ব্যভিচার-মাত্র। রাজ্যলোলুপ রাজসন্ততির যুদ্ধকাহিনী এজন্য প্রাচ্য ইতিহাসের এত অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। আরও একটা কথা। রাজা যে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাভূত করিয়া রাজ্য পাইলেন, সে শক্তি কাহার? এক দেবতাই সর্ব্বশক্তির মূলাধার, অতএব রাজ্যলাভমাত্রেই রাজা ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ও প্রজার প্রভু। এইরূপে আসিয়াতে এক-দিকে রাজা স্বেচ্ছাচারী, অপর দিকে ব্যবহার পরমার্থপূর্ণ। একই কারণবৃক্ষের এ দুইটি বিভিন্ন ফল। যেখানে রাজা স্বেচ্ছাচারী, সেখানে রাজাজ্ঞার দ্বারা সমস্ত কার্য্য নিয়-

ম্নিত করা বা রাজা ভিন্ন অন্য পার্থিব নিয়ামক স্বীকার করা, দুই অসম্ভব। সিংহাসনরক্ষার জন্য সদাশঙ্কিত রাজার পক্ষে সর্ব্বতোমুখী ব্যবস্থা স্থাপনের অবসর নাই। আর দৈবাধীন ব্যবস্থা ভিন্ন অপরের অধীন ব্যবস্থায় রাজার অধিকারসঙ্কোচ ঘটে। কাজে কাজেই পরমার্থ-আশ্রিত বিধি ও স্বেচ্ছাচারী রাজা ছায়াতপের ন্যায় অবিচ্ছেদ্য। আশিয়ার লোকে মানে দুই—বাহুবল ও পরমার্থাধীন ব্যবহার। রাজাকে কর দাও, আর নিজের ধর্ম্মরক্ষার উপায় কর—আশিয়াবাসীর এই লক্ষ্য। রাজা যেমন কর্ত্তব্যরক্ষায় বিষয়ে কাহারও অধীন নহেন, প্রজাও ধর্ম্মরক্ষার জন্য কাহারও অধীন নহে, কেবল ধর্ম্ম জানিবার জন্য স্বদলের নির্ব্বাচিত পণ্ডিতের মুখাপেক্ষী—এই পর্য্যন্ত। বর্ত্তমান ও অতীতের আলোচনায় দেখা যায়, স্থিতিশীল প্রাচ্যের একমাত্র পরিচালক—ঐতিহাসিক আলোড়নের একমাত্র হেতু—বাহুবল ও ধর্ম্মরক্ষার চেষ্টা। ধর্ম্মশব্দে এখানে পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের কথা হইতেছে না। যাহার মূল ও ফল দৈব, লৌকিক নহে, এইরূপ ধারণাপ্রসূত ব্যবহারের নাম ধর্ম্ম।

পরমার্থ-অসংশ্লিষ্ট ব্যবহার যে আমাদিগকে চালাইতে অক্ষম, ইহা আমরা না বুঝিলেও আমাদের শাসনকর্ত্তারা বুঝেন। নতুবা তাঁহাদের নিকট কংগ্রেস অপেক্ষা গোরক্ষিণী সভার গুরুত্ব থাকিত না।

লোকের মুখে শুনিয়া আমরাও মনে করি, আমরা জড়, কার্য্যপরাঙ্মুখ। কিন্তু যাঁহারা দুর্গম তীর্থযাত্রী কুলবধূদিগকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গবেদকণ্ঠ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। যাঁহারা মহার্থা ও শিখসৈন্যকে "কূচ" করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। যাঁহারা একখণ্ড শাল বা কিংখাব প্রস্তুত জন্য শিল্পীকে জীবনশেষ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। এমন কি, যাঁহারা জগন্নাথের মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারাও এ কথা বলিবেন না। যাঁহারা বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের কীর্ত্তি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কখন এ কথা বলিবেন না। আমরা জড়,—নিষ্কর্ম্মা, কেন না, আমরা নারীপরিবৃত হার্কুলীস্, গদা ছাড়িয়া কাটনা কাটিতেছি! আমাদের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের প্রতি আমরা দৃষ্টিশূন্য। আমরা অহল্যা-পাষাণী হইয়া রামচন্দ্রের চরণকমল-স্পর্শপ্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

Ah, God! for a man with
  heart, head, hand
Like some of the simple
  great ones gone
  For ever and ever by,
One still strong man
  in a blatant land,
Whatever they call him
  what care I?

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গহেলী ও মতিরাম।

ঘাসজলের প্রাচুর্য্য বঙ্গে যেমন, বেহারে তেমন নহে। অন্তত বেশীদিনের কথা নয়, যখন খাস বাঙ্‌লায় চাষারা ঘাস এবং জলের অভাবে তাহাদের গোধন লইয়া দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও বিপন্ন হইয়া পড়িত না। কিন্তু বেহার, বিশেষত দক্ষিণবেহার সম্বন্ধে সে কথা কখন বলা যায় না। তথায় চৈত্র-মাসের প্রারম্ভেই গোমহিষের আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহ গোয়ালাদের পক্ষে এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই অনেকে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা তাহাদের লইয়া গঙ্গাপারে অথবা অন্য কোন তৃণজলসুলভ স্থলে কাটাইয়া আসে এবং আষাঢ়ের প্রথমভাগে, আকাশে নবমেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করে। অনেক সম্পন্ন জমিদার, যাঁহারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে গোমহিষ-পালন এবং কৃষিকার্য্য করেন, তাঁহাদের ভিতরও এই প্রথা চলিত আছে।

বলা বাহুল্য, গোপজাতির মধ্যে এই রীতি সর্ব্বজনীন। তাহাদের ভিতর বেহার ও ছোট নাগপুরে প্রথমবর্ষায় যে পর্ব্বানুষ্ঠান হয়, তাহা ইহারই উৎসব। গহেলী ও মতিরামের কাহিনীর উপলক্ষ্যও ইহাই।

গল্প বা গানের প্রথমে মতিরাম-গোপ তাহার মাতা গহেলীর কাছে অনুমতি চাহিতেছে, মহিষগুলি লইয়া করকিয়া যাইবে; কেন না, দেশে তাহাদের আহার্য্য এবং পানীয়ের বড় অভাব হইয়াছে। শুনিতে পাই, করকিয়ানামক গ্রাম জনকপুরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং গঙ্গার তীরবর্ত্তী। এইখানে বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কয়বৎসর পূর্ব্বে ত্রিহুত-অঞ্চলে প্রবাসকালে আমরা একবার পূজার ছুটির সময় জনকপুর ও ধনুকা দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত গোচারণক্ষেত্র এবং চারণরত হৃষ্টপুষ্ট গাভী ও গোবৎসপাল দেখিতে দেখিতে স্বতই মনে হইতেছিল, নেপাল হিন্দুসাম্রাজ্য বলিয়া সম্ভবত সেখানে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে। সে যাহা হউক, আমরা যে গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার আরম্ভ এইরূপ:—

খড় বিনু কলট আর পানিবিনু লালায়া
অব্ ভঁইস্ নেহী রাখ্‌বো লে যাবো করকিয়া।
তব্ বোলে মাই গহেলী—
করকিয়া করকিয়া কি বোষরে বেটা
করকিয়া জীকে কাল।
ইমসাল ভঁইস রাখহ বিলমাকে।
তব্ বোলে মতিরাম—
শুনযে মাই গহেলী রোহণ তরুতো মৃগশিরা,
কেইসে হম্ ভঁইস রাখ্‌বো বিলমাহা।
তব্ বোলে মাই গহেলী—
শাণ্ পুছ্‌হো খিলকরকে পাকড়বো পুরণী,
গড়কে খিলাওব ছিলা ধাঁস জমায়,
ঔর কাঁটিয়া সে পানি ভরকে
পিলাওবংভঁইসকে।
তব্ বোলে মতিরাম—
শুনলে মাই গহেলী
সবসে করকিয়া হাম্‌রে জীরহেরি হৈ
হাম্ কেইসে হিয়া রহব বিলমা।

করকিয়া অনেকদূরে, মাতার ইচ্ছা নয় যে, মতিরাম সেখানে যায়। কিন্তু যাত্রার জন্ত পুত্র অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রোহিণীর সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, মৃগশিরা আসিয়া পড়িল, মহিষদের লইয়া কিরূপে আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে পারি? মা বলিতেছেন, বাপু, তোর গিয়া কাজ নাই, আমি পুত্রবধূসহ মহিষদের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিব, দুজনে খুরপী লইয়া ঘাস ছিলিব, আর কলসে জল ভরিয়া তাহাদের পান করাইব। কিন্তু সে সব ওজর শুনিলে মতিরামের চলে না। সে করকিয়া-অঞ্চলে যাত্রার জন্ত জাতিভাইদের কাছে নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া "ক্ষীরহেরি" বা মাশুল আদায় করিয়াছে, আর দেরি সহিতেছিল না।

মাতা এবং স্ত্রীর অনুনয় ও প্রার্থনা না মানিয়া মতিরাম সদলবলে প্রবাসযাত্রা করিল।

বোলে বলজোরি মতিরাম ভঁইস হাকাও করকে।
পৌছা মতিরাম তিরছাপুর গাঁও।
তীরকে বেটী তিরায়েন ইসে ধাঁতা সারের,
এহুনা শুনকে মতিরাম গাঁওমে
ভঁইস্ হেলায়ে দিয়া;
ছানছপর খিঁচকে ভঁইসকে খিলায়েন লাগা
আর লাগ্নীবীরো গানে লাগা।

তিরছাপুর গ্রামে পৌঁছিয়া মতিরাম, তীরের কন্তা তিরায়েন যাঁতা পিষিতে পিষিতে যে সারিগান গাহিতেছিল, তাহা শুনিল এবং আপনার মহিষের দল সেখানে ছাড়িয়া দিল। তাহারা লোকের চাল হইতে খড় টানিয়া খাইতেছে, মতিরামের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে তখন মনের আনন্দে "লাগ্নীবীরো" গান সুরু করিয়া দিল। ইহাতে "তীরকে বেটী তিরায়েন" যাঁতা ও সারির গান ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং মহাবিরক্ত হইয়া উঠিল।

বার বরিষ হাম রহিলি তিরছাপুর গাঁও
কভি না শুন্লি লাগ্নীবীরো।
কোন্ ঐছন লাগ্নীবীরো গাওলক।
যাঁতা ছোড় করকে পুছে তীরকে বেটী তিরায়েন
কাঁহা চাষবাস কাঁহা কৈলা পেগাঁও।

তাহার প্রশ্নোত্তরে মতিরাম বলিল যে, বেণুয়াগ্রামে তাহার বাস, আর করকিয়াতে যাইতেছে।

এখন তিরছাপুরগ্রামে তীর নিশ্চয় একটা মাতব্বর লোক, তাহাতে বারবছর সেখানে তাহার বসবাস। তাহার কন্তা তিরায়েন মতিরামের লাগ্নীবীরো গান গাওয়ার বেয়াদবি মাফ্ করিবে কেন? সে বলিল যে, তিরছাপুরের মাশুল চুকাইয়া দে, নহিলে মহিষ পার হইতে দিব না। কাজেই ঝগড়া বাধিল।

তব্ বোলে তীরকে বেটী তিরায়েন—
মাশুল লাগে তিরছাপুরকে
সে চুকায় দে তব্ ভঁইস পার হোয়ে দেব।
তব্ বোলে মতিরাম—
বার বরিষ হাম্ করকিয়া ভঁইস চরাইলু̐
সে ইস্ রাস্তা মে কভি নেহী মাশুল চুকাইলু̐।
অব্ কেইসে হাম মাশুল চুকাইবো।
বলে বলজোরি ভঁইস লে ভাগা।

সমান উত্তর করিয়া মতিরাম ত মহিষ লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল, কিন্তু তিরায়েন— সে ভাগ্যবানের বেটী—এই অপমানে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাপের কাছে সে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল এবং নানা কথা বলিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিল। কন্তাকে একটা

বিদেশী আহীর গালি দিয়া গিয়াছে শুনিয়া, তীর মতিরামের পাছে পাছে ছুটিল এবং তাহার মহিষগুলি "ছেঁকিয়া" মাশুল চাহিল।

তব্ বোলে মতিরাম—
সে কোন্ তু ভঁইস ছেকে হে!
তব্ বোলে তীর—
তিরছাপুরকে যে মাশুল হৈ সে চুকায় লে
তব্ যায় দেব।

তখন আর জোরজবরদস্তি খাটে না দেখিয়া মতিরাম দৈববলের আশ্রয় লইল এবং মাতা কাত্যায়নী তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া দুর্দ্ধর্ষ তীরটাকে অন্ধ করিয়া দিলেন। গোপপুত্র অতঃপর নিরাপদে ফরকিয়াতে উপনীত হইল বটে, কিন্তু কাত্যায়নী মাতার নিকট প্রতিশ্রুত পূজা দেওয়ার কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেল। ইহাতে তাহার মহিষ মরিতে লাগিল। মতিরাম আসল কথা ভুলিয়া মনে ভাবিল, মাতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, হয় ত তিনিই শাপ দিয়াছেন।

তব্ সুমরে মতিরাম মাই গহেলী।
সে মাই গহেলো তুহি কি সরাপ দেলি
সে ভঁইস মরা লাগ্‌লো।

মাতা কাত্যায়নী তাঁহার ভক্ত পুত্রকে বৃদ্ধার রূপ ধরিয়া একবার সাবধান করিয়া দিলেন, তাহাতেও কিন্তু তাহার চক্ষু ফুটিল না। তখন আপনার জননীর কথাই সে ভাবিতেছিল,—এ ত্রিভুবনে তাঁর চেয়ে আর বড় কে? না, আমি কাত্যায়নীর পূজা দিব না।

তব্ আদমি স্বরূপ হো করকে মায়ি কাতানে
খাড়া হোগেল, বুঢ়িকা সামান।
রে মতিরাম সে আনেকে বখৎ
মাতা কাতানেকে পূজা কবল লে
সে পূজা ভুল গেলে, এই সে ভঁইস মর্ যায়।
তব্ বোলে মতিরাম—
সে হামারা মাই গহেলীসে কোন্ বাঢ়ন হৈ
সে হম্ পূজা নেহী দেব কাত্তানে কে।
এত্না শুনকে চলগেল বুঢ়িয়া।

তখন মতিরামের বড় বিপদ্ ঘটিল। বৃদ্ধা চলিয়া যাওয়ার পর সে যেমন দুধ দুহিতে বসিল, অমনি ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া মাতা কাত্যায়নী তাহাকে বধ করিলেন। অন্তিমে সে প্রার্থনা করিয়াছিল—

শুন্‌গে মাই কাতানে, হামরাকে তো মারবে করেহ
হামারা মাই গহেলী সে মোলাকাৎ করায়ে দে।

অতঃপর দেবী সাধুর রূপ ধরিয়া বেণুয়াগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। গহেলী পুত্রের খবর না পাইয়া জীবন্মৃত হইয়াছিল। সাধুজী তাহাকে সর্ব্বনেশে খবর শুনাইলেন।

গহেলী সহসা সে কথায় বিশ্বাস করিল না, নিজে ফরকিয়া চলিয়া গেল। তথায় তাহার শোকদুঃখে করুণার্দ্র হইয়া মাতা কাত্যায়নী বলিলেন যে, পূজা পাইলে সব তিনি বাঁচাইয়া দিবেন। তদবধি মহিষেরা ঘরে ফিরিলে আষাঢ়মাসে তিনি গোপগৃহে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

তব্ বোলে মাই কাতানে হামারা পূজা দে।
তব্ সবদিন ফরকিয়া ভঁইস্ চরতো।
তব্ মাই গহেলী বোলা মাই কাতানে কো সমুঝা
সে পূজা হাম্ তোরা দেব আষাঢ় মাহিনা মে
ভঁইস লোটায়কে লে যাব ঘর পর তব্।
আজ্ দিনু সে ভঁইসকে কুছ নেহী হোয়,
তব্ হরসাল পূজা দেব।
তব্ বোলে কাতানে মাই—
আজ্ দিনসে কুছ ভঁইস কো নেহী হোগা,
হরসাল পূজা হাম লেব।
এত্না শুনকে মাই গহেলী ঘর আইল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ

রামায়ণের-রচনাকাল শীর্ষক প্রবন্ধগুলি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আষাঢ়ের "বঙ্গদর্শনে" একটি প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া লিখিয়াছেন,—"প্রবন্ধগুলি শেষ হইবার পূর্ব্বে কোন সমালোচনা করা অন্যায়; কিন্তু এই প্রবন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে একটি কথা * * বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি। কথাটা এই—যাহা পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহাকেই অতি প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করা চলে কি না?"

ইহার সরল এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে—চলে না। কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তা পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার প্রশ্নটি প্রবন্ধলেখককে পত্রে লিখিয়া জানাইলেও চলিত; তথাপি প্রশ্নের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা তাহাকে 'বঙ্গদর্শনে' পত্রস্থ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে এত সংক্ষিপ্ত উত্তর মনঃপূত না হইবারই কথা।

লিখনভঙ্গীতে প্রশ্নটি কিছু জটিল আকারে প্রতিভাত হইয়াছে। পাঠ করিলেই মনে হয়,—যেন রামায়ণের-রচনাকাল-শীর্ষক প্রবন্ধমধ্যেই এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিবার কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে; বুঝি কোন স্থলে আকারে-ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে—যাহা পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহা অবশ্যই অতি প্রাচীন। নচেৎ এমন সংশয় উপস্থিত হইবে কেন?

মূল প্রবন্ধে এমন সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই। তথাপি এমন সংশয় উপস্থিত হইল কেন? মজুমদারমহাশয়ের প্রশ্নপত্রে তাহার আভাস পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তাহা এই—"পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইবার পরক্ষণ হইতেই যে ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। কাত্যায়ন যখন ইহার বার্ত্তিক রচনা করিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং পতঞ্জলি যখন মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনির আদর্শ অবশ্যগ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও সংস্কৃতরচনায় পাণিনির আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই।" এই কথাগুলি যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্বতই মনে হইতে পারে—এ সকল কথা বুঝি স্বতঃসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য। মজুমদারমহাশয় এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য কোথায় পাইয়াছেন, প্রশ্নপত্রে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। প্রশ্নপত্র পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেন বলিতে চাহেন,—(১) পাণিনিমুনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয় লেখকগণের সম্মুখে একটি আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; (২) সে আদর্শ ব্যাকরণরচনার পরক্ষণ হইতেই সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহাতে সময় লাগিবার কথা; (৩)

কিন্তু কোন সময়েই তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় নাই; (৪) তজ্জন্ত চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; (৫) এমন কি, কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনা করিয়া এবং পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনির আদর্শকে লোকগ্রাহ্য করিবার জন্ত বিশেষভাবেই চেষ্টা করিয়াছিলেন; (৬) কিন্তু সংস্কৃতরচনা তাহাকে কোনকালেই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করে নাই!

পাণিনি কি উদ্দেশ্যে সূত্ররচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা একটি সূত্রে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা প্রতিজ্ঞাসূত্র বলিয়া বৈয়াকরণসমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাহাতেই সূত্ররচনার প্রয়োজন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এই—

"অথ শব্দানুশাসনম্।"

ইহার অর্থ "শব্দ-শাসন" নহে; ইহার অর্থ শব্দের "অনু-শাসন।" অনু-উপসর্গটি বিনা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নাই; সূত্রের একটি বর্ণও বিনা প্রয়োজনে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হইবার নিয়ম ছিল না। অনু-শব্দের অর্থ—পশ্চাৎ। শাসন এবং অনুশাসনের মধ্যে উপসর্গযোগে বিলক্ষণ অর্থপার্থক্য সূচিত হইয়াছে। অনু-উপসর্গের ব্যবহারে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে—আগে শব্দ, তাহার পর শাসন; আগে সাহিত্য, তাহার পর ব্যাকরণ।

পাণিনির পূর্ব্বকালবর্ত্তী লৌকিক ও বৈদিক সাহিত্যের শব্দ অর্থাৎ সাধুশব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হইত, সেই ব্যবহারের "অনুশাসন" ব্যাখ্যা করাই ব্যাকরণরচনার প্রয়োজন বলিয়া প্রতিজ্ঞাসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কেহ সেই সকল শব্দের সেরূপ অনুশাসনক্রমে ব্যবহার করিবেন কি না,—ভবিষ্যতে কখন সে প্রণালী অবলম্বিত হইবে কি না,—সে কথা পাণিনি চিন্তা করেন নাই। তিনি অতীত এবং বর্ত্তমান সাহিত্য ব্যাখ্যা করিবার জন্তই ব্যাকরণরচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; ভবিষ্যতের কথা তাঁহার অধিকারের অন্তর্গত হইতে পারে না বলিয়াই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া অনধিকারচর্চ্চার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কোন সূত্রেই এমন কথা বলেন নাই, —সংস্কৃতরচনায় চিরকালই এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে। তিনি বরং ইহাই বলিয়া গিয়াছেন,—এইরূপ নিয়মে সাধুশব্দ ব্যবহৃত হইতেছে—এইরূপ নিয়ম লক্ষিত হইতেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। পাণিনির সময় পর্য্যন্ত যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তিনি কেবল তাহারই শব্দানুশাসনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনাগত ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞাত সাহিত্যের শব্দানুশাসনের কথা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত হইবার উপায় নাই; ইচ্ছা করিলেও, সেরূপ ব্যাকরণসূত্র রচনা করা অসম্ভব। ব্যাকরণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করিলেই তাহা সুব্যক্ত হয়; তাহাকে বেদাঙ্গ বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছিল কেন, তাহাতেও সে কথা পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। আগে বেদ; তাহার পর বেদ বুঝিবার জন্ত বেদের অঙ্গ—ব্যাকরণ। পাণিনিব্যাকরণ বৈদিক ও লৌকিক শব্দের অনুশাসন করিয়াছিল; অতএব আগে বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্য, তাহার পর—পাণিনিব্যাকরণ। সে ব্যাকরণ কেবল পাণিনির সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত

সাহিত্যের শব্দানুশাসন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিল।

পাণিনির গ্রন্থের নাম "ব্যাকরণ," তাহা "সংস্করণ" নহে। যাহাকে "সংস্করণ" বলা যাইতে পারে, তাহা শব্দকে শাসন করিতে পারে। তাহারই নাম "গ্রামার।" ব্যাকরণ "গ্রামার" নহে;—ঠিক তাহার বিপরীত গ্রন্থ। ব্যাকরণ অতীত-সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করিয়া তাহাকে বুঝিয়া লইবার সুযোগ প্রদান করে। বিদ্যালয়ে "গ্রামারকে" ব্যাকরণ বলিয়া অযথা নামকরণ করায়, আমরা এক্ষণে যাহাকে ব্যাকরণ বলিতেছি, তাহার সকল গ্রন্থই প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণ নহে; যাহাকে আবার না বুঝিয়া "গ্রামার" বলিতেছি, তাহাও প্রকৃতপক্ষে "গ্রামার" নহে। পাণিনিব্যাকরণকে "পাণিনি-গ্রামার" বলিতে গিয়া সাহেবেরা ভুল করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর শীঘ্র দূরীভূত হইতেছে না! এই ভুল সামান্য ভুল নহে; ইহারই নাম স্থূলে ভুল। ইহার জন্যই লোকে পাণিনিব্যাকরণকে বিভীষিকার চক্ষে দর্শন করিতেছে; তাহা যে কাব্যের ন্যায় মধুময়, বিজ্ঞানের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ, সে কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে "গ্রামারের" ন্যায় নীরস ভাবিয়া সংস্কৃতশিক্ষার্থিগণ দূরে পলায়ন করিতেছেন। পাণিনিব্যাকরণ আর কিছুই নহে; পাণিনির সময় পর্যান্ত প্রচলিত সাহিত্যের প্রকৃতিবিচারের বত্রিশটি বিশদ বক্তৃতা।

বিশিষ্ট বিচারপদ্ধতি সংস্থাপিত করিবার জন্য যাহাকে "পাণিনি-যুগ" বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছে, তাহা পাণিনির পরবর্ত্তী সাহিত্যযুগ নহে;—পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যযুগ। সাহিত্য যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; মূল প্রকৃতি অবিকৃত থাকিলেও, শাখা-প্রশাখা পরিবর্ত্তিত আকারে প্রতিভাত হয়। পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহা অপেক্ষা কত নূতন সাহিত্য উদ্ভূত হইয়া কত নূতন নূতন রচনারীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল! সেই অভিনব সাহিত্যের সকল কথাই পাণিনিসূত্রানুসারে ব্যাখ্যাত হইবার উপায় ছিল না। পাণিনিব্যাকরণমাত্র সম্বল করিয়া বসিয়া থাকিলে সে সাহিত্যের সকল কথা ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে না বলিয়াই, কাত্যায়ন বার্ত্তিকসংযোগে পাণিনির পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব সাহিত্যের শব্দানুশাসনের প্রয়োজনসাধনের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও ভবিষ্যতের জন্য কোন আদর্শ-সংস্থাপনের কামনা করেন নাই; তিনিও অনধিকারচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করিবার মত উচ্ছৃঙ্খল লেখক ছিলেন না। পাণিনিকে লোকগ্রাহ্য করিবার জন্যও কাত্যায়নের চেষ্টা ছিল না। তিনি কেবল ১৫০০ পাণিনি-সূত্রে প্রায় ৪০০০ বার্ত্তিক সংযোগ করিয়া এক বিচারগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণের কঠোর সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সমালোচনা সকল স্থলে সমীচীন হয় নাই; কোন কোন স্থলে সমালোচকসুলভ সূক্ষ্মবিচারে সমালোচনার প্রকৃত লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কাত্যায়নের পরে এবং পতঞ্জলির পূর্ব্বে আবার অভিনব সাহিত্য উদ্ভূত হইয়া কত নূতন নূতন রচনা-রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তাহার

সকল কথা পাণিনির সূত্রে এবং কাত্যায়নের বার্ত্তিকে ব্যাখ্যাত হইবার উপায় ছিল না। সেই অবস্থায় ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত সমগ্র সাহিত্যের শব্দানুশাসন ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলিও সমগ্র সূত্রের বিচার করেন নাই, যেখানে বিচার আবশ্যক, সেখানেই বিচার করিয়া গিয়াছেন। সে বিচারে কাত্যায়নের বহুসংখ্যক বার্ত্তিকসূত্র সমালোচিত হইয়াছে; এবং যে সকল বার্ত্তিকসূত্র অনাবশ্যক ছিল, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই মুনিত্রয় ভারতীয় সংস্কৃতসাহিত্যের তিনটি প্রসিদ্ধ রচনাযুগের রচনারীতির ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইয়া নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া, শিষ্ট শিষ্যের ন্যায় চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসসঙ্কলনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, সে চেষ্টা সফল হইতে পারে।

রামায়ণে যে রচনারীতি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহা কি সম্পূর্ণরূপে পাণিনিসূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে? পারিলে বলিতে হইবে, রামায়ণ পাণিনিযুগের গ্রন্থ; না পারিলে, রামায়ণকে পাণিনিযুগের পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলিবার কারণ উপস্থিত হইতে পারিবে। তখন আবার বার্ত্তিক এবং ভাষ্য ধরিয়া দেখিতে হইবে, রামায়ণের রচনারীতি তদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে কি না। এই বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই যে রামায়ণের-রচনাকাল-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিত হইবে, সে কথা প্রথম প্রবন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। "রামায়ণরচনায় কোন কোন স্থলে পাণিনিনিবদ্ধ নিয়মের অনুবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না"—মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন যে, মূলপ্রবন্ধে এই কথা প্রদর্শিত হইতেছে। কেন হইতেছে, ভাবিয়া দেখিলেই সংশয় নিরস্ত হইতে পারিত। ইহাতেই দেখা যাইতেছে—রামায়ণ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত এই একটি কথারই বিচার সমাপ্ত হয় নাই। ইত্যবসরে মজুমদারমহাশয় প্রশ্ন উত্থাপিত করায় তাহার উত্তর দিতে গিয়া মূলপ্রবন্ধের অনুসরণে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। বঙ্গসাহিত্যে এই সকল আলোচনা বিচারবাহুল্যে পাঠকসমাজের ধৈর্য্যচ্যুতি সাধন করে। এরূপ ক্ষেত্রে মজুমদারমহাশয়ের ন্যায় বিশিষ্ট পাঠক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া প্রবন্ধলেখককে আশাতিরিক্ত সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের অতীত-কাহিনী যথাযোগ্যরূপে সঙ্কলিত হয় নাই। তজ্জন্য স্বদেশে-বিদেশে সকলেই বলিয়া থাকেন,—আমাদের ইতিহাস নাই। নাই,—তাহা সত্য কথা। কিন্তু উপাদানের অভাবকে তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে দেশে আমাদের ন্যায় বিপুল পুরাতনসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, সে দেশের ইতিহাসসঙ্কলনের উপাদানরাশির অভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু উপাদানগুলি এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! এরূপ অনেক উপাদান ত্রিমুনিব্যাকরণের কল্যাণে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক শব্দের ভিতর দিয়া

কত পুরাকাহিনী আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে!

ত্রিমুনি-ব্যাকরণ কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে প্রকৃত তথ্য তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে? এক সময়ে সাহেবেরা ভাবিয়াছিলেন,—কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি বুঝি পাণিনির টীকাকার। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি কোন টীকা রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে কথার অনুসন্ধান না করিয়াই, সাহেবেরা বার্ত্তিক ও ভাষ্যকে টীকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা যখন দেখিলেন, পাণিনির সকল সূত্রেরই বার্ত্তিক বা ভাষ্য নাই, তখনও তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই, সাহেবেরা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন,—যে সকল সূত্রের বার্ত্তিক বা ভাষ্য নাই, তাহা পুরাতন নহে, প্রক্ষিপ্ত; পুরাতন হইলে, অবশ্যই বার্ত্তিক ও ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। কেহ কেহ আবার উদাহরণ-প্রত্যুদাহরণগুলি পাণিনি-বিরচিত মনে করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণের আধুনিকত্বসংস্থাপনেও বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিয়া গিয়াছেন,—পাণিনিব্যাকরণ প্রচলিত হইয়া, সংস্কৃতসাহিত্যকে "পাণিনীয় ছাঁচে" ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে,—সমগ্র পরবর্ত্তী সংস্কৃতসাহিত্য কেবল পাণিনিকে মানিয়া চলিবার জন্যই গলদঘর্ম্ম হইয়াছে! সাহেবদিগের পক্ষে এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই সকল ভ্রমপ্রমাদ যে আমাদের প্রকৃত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে কত বিঘ্নবাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, মজুমদারমহাশয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। তথাপি তিনিও যেন এই সকল সিদ্ধান্তেরই অনুমোদন করিয়া আসিতেছেন।

"পাণিনির্ব্যাকরণ রচিত হইবার পরক্ষণ হইতেই যে ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে।" মজুমদারমহাশয়ের এই উক্তি যেন বলিতে চাহিতেছে,—পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইবার পরক্ষণ হইতেই "পাণিনীয় ছাঁচ" প্রচলিত হয় নাই—তাহা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া থাকিবে—তাহা সময়সাপেক্ষ বলিয়াই তাহাতে সময় লাগিবার কথা। কিন্তু মজুমদারমহাশয় আবার নিজেই দেখাইয়াছেন,—কাত্যায়ন হইতে ভট্টকুমারিল পর্য্যন্ত কাহারও সময়েই পাণিনিব্যাকরণের বিধি সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় নাই! এরূপ অসঙ্গতির কারণ কি? কারণ আর কি হইতে পারে? ইংরাজী ধরিয়া সংস্কৃত-অধ্যয়নের চেষ্টা!

যুগে যুগে সাহিত্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সকল দেশেই তাহার প্রভাব দেদীপ্যমান। ভারতবর্ষে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবার কারণ ছিল না। এই সকল বিভিন্ন সাহিত্যযুগের গ্রন্থবিচারের কি কোনই উপায় নাই? তাহার জন্যও কি আমাদিগকে নিয়ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া বিদেশের পণ্ডিতসমাজের চর্ব্বিতচর্ব্বণ লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে! আমাদের স্বদেশের সাহিত্যে কি তথ্যানুসন্ধানের উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না?

উপায় আছে। আগে সাহিত্য, তাহার পর ব্যাকরণ,—এই সহজ কথাটি স্মরণ করিয়া রাখিলেই, উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে-কোন পুরাতন গ্রন্থ ধরিয়া,

তাহার রচনারীতি পর্য্যালোচনা করিয়া, একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা যাইতে পারে; কঠিন হইলেও এই কার্য্য অসম্ভব নহে। মনে করুন, রামায়ণ ধরিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। রামায়ণে দেখিলাম,—

"আশ্চর্য্যমিদমাখ্যানং মুনিনা সম্প্রকীর্ত্তিতম্।"

ইহার অর্থ—"মুনিকর্ত্তৃক সম্প্রকীর্ত্তিত এই আখ্যান আশ্চর্য্য।" এখানে "আশ্চর্য্য" বলিতে কি বুঝিব? টীকাকার বলেন,—মনোহর। তাহাতে মোটামুটি ভাব বুঝিতে কষ্ট না হইলেও, আশ্চর্য্য-শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য সুব্যক্ত হয় না। রামায়ণে এই "আশ্চর্য্য"শব্দটি কি কেবল এই এক স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে? নির্ঘণ্ট খুলিয়া দেখিলাম, তাহা নহে,—আরও অনেক স্থলে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন্ স্থলে আশ্চর্য্য-শব্দে কি বুঝিব, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। ত্রিমুনি-ব্যাকরণের শরণাপন্ন না হইলে সংশয় দূর হইবার উপায় নাই।

পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাতে "অ-নিত্য" এই একমাত্র অর্থেই "আশ্চর্য্য"-শব্দ ব্যবহৃত হইত; অন্য কোন অর্থ পরিচিত ছিল না। পাণিনিসূত্রে সেই একমাত্র অর্থই উল্লিখিত হইয়াছে।

"আশ্চর্য্যমনিত্যে" ,৬।১।১৪৭

এই অর্থ এক্ষণে প্রচলিত নাই; ক্রমে কিরূপে এই অর্থ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। এই পুরাতন প্রচলিত অর্থ সহসা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। কাত্যায়নের সময়ে "আশ্চর্য্য" বলিতে "অ-নিত্য" বুঝাইত, "অদ্ভুতও" বুঝাইত। পাণিনির পরে এবং কাত্যায়নের পূর্ব্বে কোনসময়ে এই নূতন অর্থটি প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই নূতন অর্থটি পুরাতন হইতে পৃথক্। সুতরাং কাত্যায়ন পাণিনিসূত্রে একটি বার্ত্তিক সংযোগ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্যমনিত্যে অদ্ভুতে চ।"

পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত এই উভয় অর্থ প্রচলিত থাকিয়া, পতঞ্জলির পর কোনসময়ে "অনিত্য"-অর্থটি বিলুপ্ত হইয়া, "অদ্ভুত"-অর্থটি বর্ত্তমান আছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে দুইটি অর্থই উল্লিখিত আছে; কিন্তু পতঞ্জলির পরে যে সকল অভিধান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর "অ-নিত্য" অর্থটি দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অনিত্যের অর্থ "ধ্বংসশীল" নহে। অ-নিত্য Rare; অদ্ভুত wonderful; অ-নিত্যে নূতনত্বের আভাস; অদ্ভুতে বিস্ময়ের আতিশয্য।

এই দুইটি অর্থের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আকাশে যে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে, তাহারা ভূপতিত হয় না কেন? ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও, ব্যাপারটি অ-নিত্য (Rare), নূতন নহে; কেন না, প্রত্যহই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহা আশ্চর্য্য বটে; কিন্তু এখানে আশ্চর্য্য-শব্দের অর্থ "অদ্ভুত" অর্থাৎ বিস্ময়াবহ। নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া অ-নিত্য নহে; যখনই ভাবিয়া দেখি, তখনই বিস্ময়ে অভিভূত হই বলিয়া অদ্ভুত—বিস্ময়াবহ! পতঞ্জলি এই উদাহরণ ধরিয়াই অর্থপার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন

আশ্চর্য্যশব্দের এই উভয় অর্থের মধ্যে যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে, ভগবান্ পতঞ্জলি তাহা বিশদভাবে প্রদর্শিত না করিলে, কুতর্ক নিরস্ত হইত না।

রামায়ণে যতবার "আশ্চর্য্য"শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সকল স্থলই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বিচারে সকল স্থলেই যদি "অ-নিত্য" অর্থ ধরিয়া লইতে হয়, তবে বলিতে হইবে—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে আশ্চর্য্যশব্দের অনিত্য-অর্থ প্রচলিত ছিল। বিচারে কোনস্থলে অ-নিত্য এবং কোনস্থলে অদ্ভুত অর্থ ধরিয়া লইতে হইলে, বলিতে হইবে—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে এই উভয় অর্থই প্রচলিত ছিল। বিচারে যদি কোনস্থলেই অ-নিত্য অর্থ ধরিতে পারা না যায়, সকল স্থলেই একমাত্র অদ্ভুত-অর্থই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তবে বলিতে হইবে—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে অ-নিত্য-অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অমরসিংহের সময়ে লৌকিকসাহিত্য হইতে এই অর্থ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি আশ্চর্য্যশব্দের ব্যাখ্যায় অনিত্য-অর্থের উল্লেখ না করিয়া কেবল 'বিস্ময়াবহ অদ্ভুত' অর্থেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"বিস্ময়োঽদ্ভুতমাশ্চর্য্যং চিত্রমপি।"

সুতরাং পাণিনিযুগে কেবল অনিত্য-অর্থে, কাত্যায়নের এবং পতঞ্জলির যুগে অনিত্য-অর্থে এবং অদ্ভুত-অর্থে, তথা পরবর্ত্তী সাহিত্য-যুগে কেবল অদ্ভুত-অর্থে আশ্চর্য্যশব্দ ব্যবহৃত হইবার এই ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিয়া আমরা রামায়ণে ব্যবহৃত "আশ্চর্য্য"-শব্দের বিচারে রামায়ণের রচনাকালের আভাস প্রাপ্ত হইতে পারি।

"আশ্চর্য্যমিদমাখ্যানম্।"

এই আখ্যান (রামায়ণ) আশ্চর্য্য,—ইহার অর্থ কি বিস্ময়াবহ? এই আখ্যান (রামায়ণ) আশ্চর্য্য—অনিত্য—নূতনত্বময়—এইরূপ বলিলেই কি অর্থসঙ্গতি সুরক্ষিত হয় না? এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত কি না, সুধী পাঠক সুধীর হইয়া তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। রামায়ণ হইতে আশ্চর্য্যশব্দ-প্রয়োগের আর একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী বনগমন করিবার সময়ে রামলক্ষ্মণের সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ ছিল। একদিকে সন্ন্যাসীর সৌম্যবেশ, অন্যদিকে ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশস্ত্র,—একদিকে অপরূপ রূপলাবণ্য, অন্যদিকে সন্ন্যাসের কঠোর আত্মত্যাগ,—ইহাতে রামলক্ষ্মণ-সীতাদেবীকে দেখিয়া বননিবাসী ঋষিসমাজ "আশ্চর্য্যভূত" দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন।

"রূপসংহননং লক্ষ্মীং সৌকুমার্য্যং সুবেশতাম্।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ॥
বৈদেহীং লক্ষ্মণং রামং নেত্রৈরনিমিষৈরিব।
আশ্চর্য্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্ব্বে তে বনবাসিনঃ॥"
৩।১।১৩—১৪॥

এখানে "আশ্চর্য্য"-শব্দের অর্থ কি? এখানে যে বিস্ময়ের ভাবই সমধিক প্রবল, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তথাপি নূতনত্বেরও আভাস আছে। সে অরণ্যে লোকালয় হইতে কত নরনারী সমাগত হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিত; তাহাতে নূতনত্ব ছিল না,—বিস্ময়েরও অবসর উপস্থিত হইত না। বননিবাসী

তপস্বিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না; সুতরাং অস্ত্রশস্ত্রের আবির্ভাবেও নূতনত্ব বা বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হইতে পারে নাই। সে অরণ্যে অনেকেই আসিত;—কেহ সন্ন্যাসীর ন্যায় আসিত;—কেহ বা আশ্রমরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আসিত;—কেহ কিন্তু সন্ন্যাসিবেশে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জীভূত হইয়া আসিত না। ইহাতে নূতনত্ব ছিল না, এমন নহে, কিন্তু বিস্ময়ের ভাবই প্রবল হইবার কথা। এখানে "আশ্চর্য্য"শব্দের অর্থবিচার করিলে বলিতে হইবে,—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে অনিত্য ও অদ্ভুত, এই উভয় অর্থই প্রচলিত ছিল।

"আশ্চর্য্যমিতি তস্যৈতদ্বচনং ভাবিতাত্মনঃ।
রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ সহ ভ্রাত্রা মহাযশাঃ॥" ৩।১১।২০

মাণ্ডকর্ণিমুনির "পঞ্চাপ্সর"নামক তটাকের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র তাহাকে "আশ্চর্য্য" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে "আশ্চর্য্য"শব্দে বিস্ময় অপেক্ষা অনিত্য-অর্থই সমধিক পরিস্ফুট। এইরূপে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত ধরিয়া সমালোচনা করিলে রামায়ণের রচনাকাল কত পুরাতন নহে এবং কত নূতন নহে, এই দুইটি (প্রাচীনত্বের ও অর্ব্বাচীনত্বের) সীমা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ভাবে এবং ভাষায় রামায়ণ পুরাতন ও নূতনের অপূর্ব্ব মিশ্রণের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। মজুমদারমহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়া সাহিত্যসমাজের সুপরিচিত কথারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ অংশ নূতন, কোন্ নূতন অংশ কবে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে মজুমদারমহাশয় প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারিতেন। রামায়ণে নানা শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে সুপরিচিত আছে। কিন্তু যাহা প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক, তাহা কত আধুনিক, সে কথা অদ্যাপি কেহ বিচার করিয়া দেখাইয়া দেন নাই। ইহাতে অনেকে প্রক্ষিপ্তাপবাদ শ্রবণ করিয়াই রামায়ণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। মজুমদারমহাশয়ের প্রশ্নপত্রেও এই অশ্রদ্ধার গন্ধ প্রাপ্ত হইলাম। প্রক্ষিপ্তাংশের পরিমাণ কি এতই অধিক যে, তাহার দোষে মূলগ্রন্থ অনাদৃত হইবার যোগ্য হইয়াছে? রামায়ণে যে সকল আধুনিক ছন্দের কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা কত, তাহার প্রভাবই বা কিরূপ, তাহার আলোচনা আবশ্যক। মজুমদারমহাশয়ের লিখন-ভঙ্গীতে বোধ হয়, এ সকল যেন তুচ্ছ কথা,—ইহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে! সাহেবেরা সংক্ষেপেই মীমাংসা সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা ধরিয়া আমাদের দেশের কৃতবিদ্য-লোকেও প্রচলিত রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিতে-ছেন। তাহা এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন কথা বটে। পুরাতন মত কি, তাহা সকলেই জানি। কেবল তাহাকে সমর্থন করিবার প্রমাণ কি, তাহা না জানিয়াই নূতনের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। যথাযোগ্য ধীরতা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদি-কবির মহাকাব্যের আলোচনা সমাপ্ত করিতে পারিলে, নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইবার আশা

আছে। তাহার জন্ম সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায় আবশ্যক।

মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন—"এরূপ অবস্থায় রামায়ণরচনায় কালনির্ণয় করিতে হইলে, যদি কেবল রামকথার প্রাচীনতা এবং পূর্ব্বগাথার প্রাচীনতার অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে রামায়ণগ্রন্থের রচনাকাল নির্ণীত হইবে না।" বলা বাহুল্য, মজুমদারমহাশয়ের এই জ্ঞানগর্ভ উক্তি কেহই অমান্য করিতে পারিবেন না। রামায়ণের-রচনাকাল-শীর্ষক প্রবন্ধে এ পর্য্যন্ত রামকথার প্রাচীনতার আলোচনা হয় নাই; তাহা একটি সাহেবী-মত;—যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

আর একটি কথা। মজুমদারমহাশয় সুবিজ্ঞ সাহিত্যসেবক। তিনি প্রবন্ধ-লেখককে প্রকাশ্যপত্রে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া সমুহ সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীপ্রসূত সকল কথাই সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুর অনর্গল অধিকার লইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, একটু সংযত হইয়া অভিমত ব্যক্ত করিলেই সাহিত্যের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন,—"রামায়ণের রচনাপ্রণালী এবং ভাষার অবস্থা দেখিলে অনায়াসে ইহা উপলব্ধ হয় যে, প্রাচীনতা এবং নূতনত্ব একসঙ্গে রহিয়াছে; এবং নূতনত্ব অত্যন্ত অধিক।" অধিককে লেখনীচালনায় বিবর্দ্ধিত-বেগে অত্যন্ত-সংযোগে অত্যধিক করিয়া, মজুমদারমহাশয় যেরূপ সাহসের সঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। রামায়ণে নূতনত্ব আছে,—তাহা "অনায়াসে" সাহেবদিগের গ্রন্থে পাঠ করিয়া শিখিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু কোন্ অংশ নূতন, আর কোন্ অংশ পুরাতন, প্রমাণপ্রয়োগে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতেছি—সে বিচার বিলক্ষণ আয়াসসাধ্য ব্যাপার,—"অনায়াসে উপলব্ধ" হইবার বিষয় নহে।

ভর্ত্তৃহরি কি উদ্দেশ্যে "বাক্যপদীয়" রচনা করিয়াছিলেন, কি উদ্দেশ্যেই বা "কাশিকা বৃত্তি" রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতভেদের অভাব নাই। তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কোন মতামত ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না। "পাণিনিকেই একমাত্র আদর্শ করিতে হইবে" বলিয়া ভারতবর্ষে পাণিনিস্থাপনার চেষ্টা হইয়াছিল কি না, তাহাতেও সংশয় আছে। পাণিনিস্থাপনার চেষ্টা হইয়াছিল,—তাহা সত্য কথা। অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই; কখন হইবে কি না, তাহাতেও সন্দেহের অভাব নাই। তাহার উদ্দেশ্য "পাণিনিকেই একমাত্র আদর্শ" করা নহে। তাহার উদ্দেশ্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা। সে আলোচনা যখনই প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই পাণিনিস্থাপনার প্রয়োজন অনুভূত হয়—গত্যন্তরাভাবাৎ। পুরাতন সাহিত্য বুঝিতে হইলে পাণিনিকে পরিত্যাগ করিবার উপায় কোথায়?

পাণিনির পঠনপাঠন প্রচলিত না থাকায়, রামায়ণের ভাবার্থ নানা স্থানে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা "অনায়াসে" উপলব্ধ না হইলেও, অল্পায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। আর্ষপ্রয়োগশীর্ষক প্রবন্ধে তাহার কিছু-কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ

যাহাকে "ঋষিপ্রযুক্ত অসাধুপ্রয়োগ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, পাণিনির পঠন-পাঠন প্রচলিত থাকিলে তাহার প্রকৃত রহস্য বিলুপ্ত হইতে পারিত না; আধুনিক অভিধানেও নানারূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রবেশলাভ করিতে পারিত না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ত্রিবঙ্কুর।

৯

কাল আমি ত্রিবঙ্কুর ছাড়িয়া যাইব। এখানে যে আদরযত্ন পাইয়াছি, আমি তার যোগ্য নহি। রাজাকে একটি "ক্রুশ" উপহার দিবার যে ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমি সেই প্রীতিকর কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছি। মহারাজার একটা নৌকা করিয়া জলাভূমির রাস্তা দিয়া আমি উত্তরদিকে যাত্রা করিব। কোচিনের ক্ষুদ্র রাজ্যে পৌঁছিতে দুই দিন দুই রাত্রি লাগিবে। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিব। তাহার পর, কোচিন ছাড়াইয়া, ৩০।৪০ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, আবার সেই সব প্রদেশে আসিয়া পড়িব, যেখান দিয়া রেলপথ গিয়াছে এবং যেখান দিয়া আমি অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। যে রেলপথ কালিকট্ হইতে মান্দ্রাজে গিয়াছে, সেই মহারেলপথটি আবার আমি ধরিব।

ত্রিবন্দ্রমে আজ আমার শেষ রাত্রি। তাই আজ সহরের অলিগলির মধ্যে ইচ্ছা করিয়া একটু বিলম্ব করিতেছি;—সেই সব পথ, যেখানে তমসাচ্ছন্ন নিবিড় পল্লবপুঞ্জের মধ্যে নারিকেলতৈলের ক্ষুদ্রখাস দীপগুলি মহাপ্রভাবশালী তালপুঞ্জের নৈশ অন্ধকার ভেদ করিতে না পারিয়া যেন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। দিনমান অপেক্ষা রাত্রিকালেই উদ্ভিজ্জজীবনের প্রভাব এখানে যেন একটু বেশি করিয়া অনুভব করা যায়;—হরিৎশোভার মহিমাসাগরে যেন ডুবিয়া যাইতে হয়।

কাল আমি চলিয়া যাইব। এখানে কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না। ভারতের হৃদয়দেশে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। এই প্রদেশ—যাহা ব্রাহ্মণ্যের কেন্দ্রস্থল বলিলেও হয়—এখানে আসিয়াও আমি ব্রাহ্মণ্যের কিছুই জানিতে পারিলাম না। যথোচিত সাদর অভ্যর্থনা পাইলেও, আমরা য়ুরোপীয়, আমাদের নিকট সে সমস্ত রহস্যের দ্বার এখনো রুদ্ধ।

বেড়াইতে বেড়াইতে আমি অবশেষে বণিক্‌দের সেই বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। অনাবৃত আকাশ। উপরে তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সোজা বড় রাস্তা—প্রাসাদ ও মন্দিরের ঘের পর্যন্ত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সরু-সরু উচ্চ

দণ্ডের উপর স্থাপিত সেকেলে-ধরণের দীপগুলি হইতে যে আলোক বিকীর্ণ—সেই আলোকের মধ্যে, স্ত্রীজনসুলভ দীর্ঘকেশধারী পুরুষজনতা চলাফেরা করিতেছে। এই সব লোক,—খোদিত পিত্তলসামগ্রী, ছাপ্-দেওয়া ছিটের কাপড়, পুতুল, দেবদেবীর মূর্ত্তি—এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতা। ইহাদের কপিল গাত্র, কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ, কৃষ্ণবর্ণ অলন্ত চক্ষু। শস্যের দানা, মিষ্টান্ন, উদ্ভিজ্জমূল প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের মিতাহারোপযোগী খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। অসংখ্য ছোট ছোট দোকান;—উজ্জ্বল প্রদীপসমূহের আলোকে আলোকিত। কোন-কোন দীপের তিনটি শিখা। কোন পশুমূর্ত্তি অথবা দেবমূর্ত্তি এই দীপগুলিকে ধারণ করিয়া আছে।

রাজপথ হইতে দূরে সেই পবিত্র ঘেরের সিংহদ্বার এবং উহা ছাড়াইয়া আরো দূরে মুক্তদ্বার মহামন্দির ও তাহার গভীর অভ্যন্তরপ্রদেশ দেখা যাইতেছে। বিন্দুচিহ্নের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দীপশিখা সারি-সারি জ্বলিতেছে। ইহাই ব্রহ্মার মন্দির;—যেন এই প্রদেশেরই সুগম্ভীর ধ্যানমগ্ন অন্তরাত্মা।

যতদূর দৃষ্টি যায়—মন্দিরের ভিতরটা সমস্তই আলোকিত। ওখানে পুরোহিত ছাড়া আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। দীপালোকের রেখা দেখিয়া বুঝা যায়—মন্দিরের দালান কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। মধ্যস্থলে, গোলাপপাপ্‌ড়ির অনুকরণে একটা জ্যামিতিক নক্সা পরিলক্ষিত হইতেছে—বোধ হয়, উহা একটা প্রকাণ্ড বেলোয়ারি ঝাড়;—কিন্তু এতদূরে যে, ঠিক্ করিয়া কিছুই নিরূপণ করা যায় না। মন্দিরে সারাদিনই পূজার্চ্চনা চলিতেছে। আজ এই সান্ধ্যপূজার সময়, মানবকোলাহলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্গীতধ্বনি—তূরীনিনাদ ;আমার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে। এই সিংহদ্বার যদিও কথনই রুদ্ধ থাকে না—তবু উহা দুর্লঙ্ঘনীয়। নভোব্যাপ্ত স্বচ্ছ তমোজালের মধ্য হইতে একটা প্রকাণ্ড "পিরামিড়" সিংহদ্বারের উপর দেখা যাইতেছে—উহা রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির যেন একটা স্তূপ। উহার খাঁজকাটা চূড়াদেশ—মনে হয় যেন তারকারাজির সহিত সংলগ্ন। চারিটা সিংহদ্বারের উপর এইরূপ চারিটা "পিরামিড্" অধিষ্ঠিত। প্রতিদিন সান্ধ্যপূজার সময় প্রত্যেক পিরামিডের উপর দীপাবলী হইতে বিচ্ছুরিত একটা আলোকরেখা পরিলক্ষিত হয়;—এই আলোকরেখা তমসাচ্ছন্ন খোদিত মূর্ত্তিরাশির মধ্য দিয়া লতাইয়া-লতাইয়া চূড়াদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে;—মনে হয় যেন এই সব প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তির মধ্য দিয়া একটা স্বর্গের পথ উপরে উঠিয়াছে।

যে সময়ে রাজপথ জনশূন্য হইয়া পড়ে, সেই সময় এখন উপস্থিত। এই সময়ে আদিমকালসুলভ কাঠের দোকানগুলিতে দোকানদারেরা বেচাকেনা বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এবং ভূতযোনি যাহাতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশে প্রাচীরের বহির্ভাগে, কুলঙ্গিতে ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালাইয়াছে।

দোকানদারেরা হিসাবনিকাশ করিতেছে। ত্রিবঙ্কুরের গোল-গোল টাকা ও পয়সা উহারা থলিয়া হইতে চালডালের মত মুঠা-মুঠা তুলিয়া একপ্রকার গণনা-যন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। কতকগুলা তক্তা—তাহাতে সারি-সারি গর্ত্ত; এই প্রত্যেক কাঠের গর্ত্তের মধ্যে একএকটি মুদ্রা ধরে। যখন তক্তার সমস্ত আধার-গর্ত্তগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই মুদ্রার মোট সংখ্যা ঠিক্ জানিতে পারে; তার পর, ঐ সব মুদ্রা একটা বাক্সর মধ্যে ঢালিয়া, আবার অন্য মুদ্রার গণনা আরম্ভ করে। অপর কতকগুলি লোক, একতাড়া শুষ্ক তালপত্রে তাহার অঙ্কগুলি লিখিয়া হিসাব করিতে থাকে। এই শুষ্ক তালপত্রগুলি কতকটা পুরাকালের "পেপাইরস্"-পত্রের ন্যায়। আমার মনে হইল, আমি যেন সেই পুরাকালের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছি।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। জীবন-কোলাহল সহসা স্তম্ভিত হইল। প্রাচীরের ও মন্দিরের প্রদীপগুলি ছাড়া আর সমস্তই অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইল। রমণীরা নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—কোথাও আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। পুরুষেরা শাদা মসিনা-সূত্র-বস্ত্রে অথবা মলমলে আবৃত হইয়া, কেশকলাপ মুক্ত করিয়া, ছাগাদির সহিত গৃহদ্বারের সম্মুখে, বারাণ্ডার নীচে, ছাতের উপর, মৃতবৎ সটান শুইয়া পড়িয়াছে। গৃহকুট্টিমের নীচে অথবা ভূগর্ভস্থ কক্ষে শয়ন করিতে ভারতবাসীর অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। তাই, তাহারা অবসাদজনক গ্রীষ্মরাত্রে, বিবিধ কুসুমের সুরভি উচ্ছ্বাসে পরিষিক্ত ও নীল ধূলায় পরিলিপ্ত হইয়া বহির্দ্দেশে শয়ন করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহেশ্বর।

উপনিষদ্ ব্রহ্মের পর ও অপর এই দুইটি বিভাবের (aspect) উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমটি নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ ভাব; দ্বিতীয়টি সবিশেষ, সবিকল্প, সোপাধি, সগুণ ভাব।

> দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে।
>
> বৃহদারণ্যক ২।৩।১
>
> 'ব্রহ্মের হয় দুই রূপ।'
>
> এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম।
>
> প্রশ্ন ৫।২
>
> 'হে সত্যকাম! এই পর ও অপর ব্রহ্ম।'

ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবের অর্থ এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না; কোন চিহ্নেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহার ধারণা করা যায়। এই ভাবের পরিচয়স্থলে শ্রুতি "তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন" এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং নির্ব্বিশেষ

ব্রহ্মের উপদেশপ্রসঙ্গে "নঞের" অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন। তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন; তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি শব্দ নহেন, তিনি স্পর্শ নহেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। মাণ্ডূক্য-উপনিষদের ভাষায় 'তিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত, প্রপঞ্চের অতীত।' তিনি একমাত্র সৎ; "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তাঁহাকে চিহ্নিত করা যায় না, লক্ষিত করা যায় না, বিশেষিত করা যায় না, পরিচিত করা যায় না। তিনি বিষয় নহেন, বিষয়ী নহেন; জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, জ্ঞেয় নহেন; তিনি সৎ নহেন, তিনি অসৎ নহেন; তিনি চিৎ নহেন, তিনি জড় নহেন; তিনি সুখ নহেন, তিনি দুঃখ নহেন। পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অগোচর; তিনি যোগসমাধিরও বেদ্য নহেন; তিনি সর্ব্বথা অজ্ঞেয়। ইহাই সংক্ষেপে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবের উপদেশ।

সবিশেষ ভাব এই ভাবের বিপরীত। সবিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সবিশেষ ভাবের যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

ব্রহ্মের এই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রুতি দুইপ্রকার বাক্যের অবতারণা করেন। এক নির্ব্বিশেষ লিঙ্গ ও অপর সবিশেষ লিঙ্গ। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।

'ব্রহ্মবিষয়ে দুইপ্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয়। এক সবিশেষলিঙ্গ শ্রুতি; যেমন, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। অন্য নির্ব্বিশেষলিঙ্গ শ্রুতি; যেমন, তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন।'

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত স্থাপন করিয়া, সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, ৩।২।১১

'অতএব উভয়লিঙ্গ নির্দ্দেশ থাকিলেও সমস্তবিশেষরহিত, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত (সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) নহেন। কারণ উপনিষদ্‌বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি), সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়বিশেষরহিত, এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।'

অন্যপক্ষে, রামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্র সগুণ ব্রহ্মকেই (যিনি সমস্তদোষরহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্

উভয়লক্ষণমভিধীয়তে নিরস্তনিখিলদোষত্বকল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ।

শ্রীভাষ্য ৩।২।১১

নমু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভির্নির্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অস্তু, সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যকামত্বাদিকং নেতি-নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিবিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যং, তৎ কথং কল্যাণগুণাকরত্বনিরস্তনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি তত্রাহ।

শ্রীভাষ্য ৩।২।১৪ ও ১৭

'কেহ কেহ বলেন যে, "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে "নেতি নেতি" এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন ইহা দ্বারা তিনি "সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, জগৎকারণ, অন্তর্যামী, সত্যকাম" ইত্যাদির নিষেধ করিয়া সগুণভাব যে অবাস্তব, ইহাই বুঝিতে হইবে; তবে আর তিনি কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্তদোষরহিত—তাঁহার এই উভয়লিঙ্গত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?' এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্র উভয়লিঙ্গরূপে (তিনি সমস্তদোষরহিত, এবং কল্যাণগুণের আকর, এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য,—সগুণ নহেন এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য,—নির্গুণ নহেন।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণের মধ্যে যখন এইরূপ মতভেদ, তখন যে শ্রুতি তাঁহাদের উপজীব্য, যাহার ব্যাখ্যানে তাঁহারা স্ব স্ব সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই শ্রুতিই আমাদের অবলম্বনীয়। এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন—

উদ্গীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম
তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।

'এই যে পরব্রহ্ম, ইনি অক্ষর; ইঁহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে'; এইরূপ উদ্গীত হইয়াছে।'

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি ত্রয়ং প্রতিষ্ঠিতং ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারম্ ইতি বক্ষ্যমাণং ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণম্। * * অক্ষরঞ্চেতি যদ্যপি বিকারপ্রপঞ্চাশ্রয়ং তথাপি অক্ষরম্ * * অবিনাশি এব ব্রহ্ম।"

'সেই ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা (নিয়ন্তা), এই তিনটি প্রতিষ্ঠিত আছে। পুনশ্চ তিনি অক্ষর। যদিও সবিকার প্রপঞ্চের আশ্রয়, তথাপি তিনি বিকারী নহেন, তিনি অবিনাশী।'

অন্যত্র শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যম্ ইতরৎ সর্ব্বম্, প্রেরিতা অন্তর্যামী পরমেশ্বরঃ, এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি।"

অর্থাৎ 'পুরুষ প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রামানুজাচার্য্য যে সগুণব্রহ্ম পরমেশ্বরের অতিরিক্ত নির্গুণব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা শ্রুতিসিদ্ধ নহে। এবং শঙ্করাচার্য্য যে নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত সগুণ মহেশ্বরের অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ নহে। তবে ইহাও বক্তব্য যে, সগুণ ও নির্গুণ একই

বস্তু। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদমাত্র; বস্তুত কোন ভেদ নাই।
এ কথা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট উপদিষ্ট আছে—

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ১।১।২

'যিনি প্রকৃতিক্ষোভজনিত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের হেতুভূত পুরুষ ঈশ্বর, তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম।'

এ সম্বন্ধে ভাগবত এইরূপ বলিয়াছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভাগবত ১।২।১১

'সেই অদ্বিতীয় চিত্তত্ত্বকে তত্ত্বজ্ঞানীরা "তত্ত্ব" আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর)।

উপনিষদ্ প্রায়ই নিগুণব্রহ্মের নির্দ্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণব্রহ্মের নির্দ্দেশস্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।"—কঠ ৩।১৫

ইহার দ্বারা নির্গুণের নির্দ্দেশ; আবার—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ"

ছান্দোগ্য ৩।১৪।২

ইহার দ্বারা সগুণের নির্দ্দেশ। কোথাও কিন্তু দেখা যায় যে, একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

ঈশ ৮

এখানে প্রথম অংশ নির্গুণব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ; আর শেষাংশ সগুণব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য পুংলিঙ্গের প্রয়োগ। একই মন্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে কেবলমাত্র ভাবের প্রভেদ; সগুণ ও নির্গুণ বস্তুত একই বস্তু।*

কারণ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া মহেশ্বর হন—"মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" এই মায়া-উপাধি দ্বারা তিনি যেন নিজেকে সঙ্কুচিত করেন। তখন তাঁহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সবিকল্প ভাব। তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়।

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।

শ্বেতাশ্বতর ৬।১০

'যেমন ঊর্ণনাভ জালরচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন।'

যেমন দুর্নিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে কাচ-খণ্ডের দ্বারা আবৃত করিলে তাহার তেজ যেন

* এই মর্ম্মে চীনজাতির প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ "তাওতেচীং" বলিতেছেন—
So says Tao Teh Ching—Having no name it is the originator of Heaven and Earth. Having a name it is the mother of all things. Under these two aspects it is really the same.
(Quoted in Ancient Wisdom, p. 10.)

কতক সঙ্কুচিত হয়, পরব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব হয়। সেইজন্য মায়াকে ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥

ভাগবত ২।৬।২৯

'এই জগৎ' ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবত নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।*

অনন্ত সাগরের যেমন নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত-নিথর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল বীচি-বিক্ষুব্ধ সফেণ-তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নির্গুণ, কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম মায়াযবনিকার আবরণে সগুণ-সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ-নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহা-সমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা; পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্ম-জ্যোতি কখন সঙ্কীর্ণ-সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতি অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন। +

* অধ্যাত্মবিজ্ঞানের রহস্যভাষায় 'পরিধিকেন্দ্রস্থ বিন্দুজ্যোতিঃ' দ্বারা এই ভাব সূচিত হয়। ইহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ হিরণ্যগর্ভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

The primeval point in the centre of the circle—the logos as one within the self-imposed encircling sphere of subtlest matter for the purpose of manifestation—of shining forth from the darkness. এই encircling sphere-কে Madam Blavatsky 'The ring pass not'—এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

\+ এ সম্বন্ধে শ্রীমতী এনি বেসান্ট কয়েকটি অতি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

Coming forth from the depths of the One Existence, from the One beyond all thought and all speech, a Logos, by imposing on Himself a limit, circumscribing voluntarily the range of His own Being, becomes the manifested God, and tracing the limiting sphere of His activity thus outlines the area of His universe. Within that sphere the universe is born, is evolved, and dies; it lives, it moves, it has its being in Him.

The Ancient Wisdom, p. 51.

We may think of Him as an eternal Centre of Self-consciousness, able to merge in Super consciousness and to again limit Himself to Self-consciousness when a new universe is to be brought into existence. Isvara enveloped in *Maya*, brings forth a universe and is enclosed, as it were, in the universe of which He is the light. Breaking the shade, the light shines forth in every direction. Dissolving the universe, He still re-

বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মের যে মায়া আবরণ, তাহা স্বেচ্ছাকৃত। অতএব তিনি সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না। কারণ তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতিগ (Transcendent), প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। সেইজন্য শ্রুতি বলেন—

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

ঈশ ৫

'তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।'

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন—

অয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ।

বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

পুরুষসূক্ত ৩

'সমস্ত ভূত তাঁহার একপাদমাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ অমৃত—বিশ্বাতীত।'

গীতাও এই কথা বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

গীতা ১০।৪২

'আমি একাংশদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি।'

নারায়ণ-উপনিষদ্ এই ভাবে বলিয়াছেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

নারায়ণোপনিষদ্, ১৩ অনুবাক।

'জগতে যে-কিছু দৃষ্ট হয় বা শ্রুত হয়, সে সমস্তের অন্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন এবং তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন।'

সেইজন্য বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, পরব্রহ্মের ষষ্ঠাংশে মায়া। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, নিরংশ ব্রহ্মের অংশকল্পনা কেবল বোধের সুবিধার জন্য। এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম মায়া-উপহিত হইলেও প্রপঞ্চের সসীমতায় তাঁহার অসীমতা অভিভূত বা নিমজ্জিত হয় না। ব্রহ্মজ্যোতির পাদাংশ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়। *

এই যে সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর, ইনিই সচ্চিদানন্দ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় ২।১।১), "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদারণ্যক) ৩।৯।২৮

এই সকল সবিশেষ শ্রুতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ব্রহ্মসংহিতায় আছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।৫।১

'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।'

mains. The centre remains, but the circumference that circumscribed it is gone.

Relation of man to God, p. 9.

* But He will not be merged in His work, for, vast as that work seems to us, to Him it is but a little thing; "Having pervaded this whole universe with a portion of Myself, I remain." That marvellous Individuality is not lost, and only a portion thereof suffices for the life of a kosmos. The Logos, the Oversoul, remains, the God of His universe.

The Theosophical Review—July 1902, p. 453.

শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারে বলা হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।

'সচ্চিদানন্দরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।'

এই অবস্থায় তাঁহাতে তিনটি শক্তির প্রকাশ হয়। এই শক্তিত্রয়ের নাম যথাক্রমে সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।

বিষ্ণুপুরাণ।

'হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ, এই শক্তিত্রয় বিশ্বাধার অদ্বিতীয় ভগবানে অবস্থিত।'

সন্ধিনীশক্তিযোগে মহেশ্বর সৎ, সংবিৎ-শক্তিযোগে চিৎ ও হ্লাদিনীশক্তিযোগে আনন্দস্বরূপ হয়েন। সন্ধিনী শক্তির ক্রিয়া সত্তা বা সত্য, সংবিৎ শক্তির ক্রিয়া জ্ঞান এবং হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া আনন্দ।

ইহা গেল সগুণব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। তাঁহাকে যে "তজ্জলান্" * বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থলক্ষণ। "তজ্জলান্" অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।১

'যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।'

জন্মাদ্যস্য যতঃ

এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্‌যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

বৃহদারণ্যক ২।১।২০

'যেমন ঊর্ণনাভ তন্তু উদ্গিরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।'

ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের তটস্থ-লক্ষণ।

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—মহেশ্বরের এই তিন জগদ্ব্যাপার স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম দেওয়া হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। রজোগুণপ্রধান সৃষ্টিকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান পালনকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বিষ্ণু এবং তমোগুণ-প্রধান লয়কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি রুদ্র। ইঁহাদিগকে ত্রিমূর্ত্তি বলে। এ তিন স্বতন্ত্র নহেন—ইঁহারা তিনেই এক, একেই তিন। সেইজন্য মহেশ্বরের স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

ভক্তচিত্তসমাসীন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক।

সূতসংহিতা ৩।৪৮

'তিনি ভক্তের চিত্তে অধিষ্ঠিত; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক।'

কালিদাস এই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

* সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।

ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥

'সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি কেবল অদ্বিতীয়; পরে গুণত্রয়ের উপাধিভেদে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্নরূপ হও। তোমাকে নমস্কার।'

ভাগবত এই অর্থে বলিয়াছেন—

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥

৪।৭।৪৮

'হে দ্বিজ, আমি গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার নিষ্পন্ন করি। সেই সেই ক্রিয়ার অনুযায়ী আমার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র) সংজ্ঞা হয়।'

এই সগুণ ব্রহ্মকে যে মহেশ্বর বলা হয়, তাহার বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত জগতের প্রভু, সকলই তাঁহার শাসনাধীন। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ (৩।১) বলিয়াছেন—

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।

'যিনি এক মায়াবী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, সমস্ত লোককে শক্তিদ্বারা শাসন করেন।'

বৃহদারণ্যক (৩।৮।৯) বলিয়াছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

'হে গার্গি! ইঁহারই শাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবস্থিত আছে।'

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তৈত্তিরীয় ২।৮।১

'ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।'

সেইজন্য বলা হইয়াছে—

পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

'তাঁহার পরা শক্তি বিবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাঁহার জ্ঞানশক্তি, বল-(ইচ্ছা)-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি স্বাভাবিক।*

এই শক্তিযোগেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া নানাভাবে প্রতীয়মান হয়েন।

* A Jewish prophet writes: 'He hath made the earth by His Power, He hath established the world by His Wisdom and hath stretched out the heaven by His understanding', the reference to the three functions being very clear. These three are inseparable, indivisible, three aspects of One. Their functions may be thought of separately, for the sake of clearness, but cannot be disjoined. Each is necessary to each and each is present in each. In the first Being, Will, Power (বল) is seen as predominant, as characteristic, but Wisdom (জ্ঞান) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) are also present; in the second Being, Wisdom (জ্ঞান) is seen as predominant, but Power (বল) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) are

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।

শ্বেতাশ্বতর ৪।১

'যিনি অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম, তিনিই বিবিধশক্তিযোগে স্বার্থনিরপেক্ষ হইয়া নানা বিভাব ধারণ করেন।'

বাস্তবিক জগতে যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ, সেখানে তাঁহারই প্রভাব বুঝিতে হইবে। সেইজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

গীতা ১০।৪১

'যে-কিছু বস্তু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত অথবা ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে।'

শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা অনির্দ্দেশ্য, অবাচ্য, অলক্ষ্য। সেইজন্য পরব্রহ্ম বচনের, লক্ষণের, নির্দ্দেশের অতীত। আমরা এখন দেখিলাম যে, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর ইহার বিপরীত। তাঁহাকে স্বরূপলক্ষণে লক্ষিত করা যায়; তাঁহাকে তটস্থলক্ষণে চিহ্নিত, বিশেষিত করা যায়। অতএব ব্রহ্মের যে সবিশেষ ভাব, তাহা লক্ষণের, বচনের, নির্দ্দেশের অতীত নহে।

শ্রুতি আরও দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্ম অজ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, বাক্য-মন-বুদ্ধির অগোচর; এমন কি, তিনি সমাধির বা যোগজ শক্তিরও অতীত। সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর, কিন্তু, অজ্ঞেয় নহেন। অবশ্য তিনি ইন্দ্রিয়ের বা সাধারণ মন-বুদ্ধির গোচর হন না। কিন্তু তিনি অগ্র্যা বুদ্ধির, বিশুদ্ধ মনের এবং যোগ-সমাধির বেদ্য।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

কঠ ৩।১২

'এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে সূক্ষ্ম-সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।'

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

কঠ ২।১২

'অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীরব্যক্তি সুখদুঃখ অতিক্রম করেন।'

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

কঠ ৬।৯

'তিনি হৃদয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হয়েন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্বলাভ হয়।'

---

none the less inherent in them; in the Third Being, Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) is seen as predominant, but Power (বল) and Wisdom (জ্ঞান) are ever also to be seen. And though the words First, Second, Third are used, because the Beings are thus manifested in time, in the order of Self-unfolding, yet in Eternity they are known as interdependent and co-equal. "None is greater or less than Another,"—Evolution of consciousness : Ibid.

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

মুণ্ডক ৩।১।৩

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

মুণ্ডক ৩।১।৮

'জীব যখন জ্যোতির্ম্ময় কর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মার জনক) পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া পরম সমত্ব লাভ করেন।'

'জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত (সাধক), ধ্যানযোগে নিষ্কল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে দর্শন করেন।'

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

কঠ ৪।১

'স্বয়ম্ভূ (ভগবান্) ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন; সেইজন্য জীবগণ বহির্ব্বিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষু হইয়া (বহির্ব্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।'

এই সকল শ্রুতি স্মরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্র-কার বলিয়াছেন—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪

'সংরাধনকালে তিনি (মহেশ্বর) দৃষ্ট হন; শ্রুতিস্মৃতি ইহার প্রমাণ।' সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির অনুষ্ঠান।

এই সগুণব্রহ্মের পরিচয় উপলক্ষে ঋষিরা শাস্ত্রের নানাস্থানে বহুতর সুন্দর-গম্ভীর বাক্যের সমাবেশ করিয়াছেন। তাহার কয়েকটিমাত্র নিম্নে অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিতেছি।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।

মাণ্ডূক্য ৬

'ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনিই ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান।'

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯

'তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ গমন করেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না; তাঁহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে।'

এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।

ছান্দোগ্য ৮।১।৫

'এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, জরাহীন, মৃত্যু-হীন, শোকহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন; ইনি সত্য-কাম, সত্যসঙ্কল্প।'

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।

কঠ ৫।১৩

'তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।'

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।

'তিনি অণু অপেক্ষাও অণু; মহৎ অপেক্ষাও মহান্।'

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ
স্বশক্তিলেশাদ্ধৃতভূতবর্গঃ।
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধ-
সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥

ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১ সূত্রের শ্রীভাষ্যধৃত।

'সমস্ত কল্যাণগুণের আধার ভগবান্ তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য, শক্তি প্রভৃতি গুণের রাশি। তিনি নিজশক্তির কণিকামাত্রে সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম, পরাৎপর; তাঁহাতে পঞ্চক্লেশের তিলমাত্র নাই।'

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

'ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি; সাধুকর্ম্মের দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধুকর্ম্মের দ্বারা অপচয় হয় না; ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূতপাল; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক সেতু।'

সংস্কারাস্তেঽভবন্ বেদা নাস্তদস্তি ত্বয়া বিনা।
জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে স্থৈর্য্যং তু বসুধাতলম্।

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১১৭।১২।৩০

'বেদসকলে তোমার সংস্কার হইয়াছিল; তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সমস্ত জগৎ তোমার শরীর; বসুধাতল তোমার স্থিরত্বের নিদর্শন।'

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥

ভাগবত ৮।৩।৩

'যাঁহাতে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি স্বয়ং এই বিশ্ব; যিনি এই বিশ্বের পরেরও পরে, সেই স্বয়ম্ভুর শরণাগত হই।'

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্-
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।৬—৮

'যিনি কালের অতীত, সংসারবৃক্ষের ঊর্দ্ধে; যাঁহা হইতে এই প্রপঞ্চের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে; যিনি ধর্ম্মের সঞ্চার ও পাপের পরিহার করেন; সেই অমৃত বিশ্বাধার ঐশ্বর্য্যাধিপতি (মহেশ্বরকে) আত্মায় অধিষ্ঠিত জানিবে।

'তিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের পরমপতি; পরাৎপর বিশ্বপতি আরাধ্য দেবকে আমরা জানিয়াছি।

'তাঁহার শরীর নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; তাঁহার সমান, তাঁহার অধিক কেহ দৃষ্ট হন না। তাঁহাতে বিবিধ পরা শক্তি

স্বভাবসিদ্ধ—জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি, ক্রিয়া-শক্তি।'

> বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
> বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
> সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ-
> র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥
>
> শ্বেতাশ্বতর ৩।৩

'তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র, তাঁহার বাহু সর্ব্বত্র, তাঁহার গতি সর্ব্বত্র; তিনি মনুষ্যকে ভুজযুক্ত এবং পক্ষীকে পক্ষযুক্ত করিয়াছেন; তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি অদ্বিতীয়।'

> সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
> সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
> সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥
>
> শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬।১৭

'তাঁহার সর্ব্বত্র করচরণ, সর্ব্বত্র শিরঃ-নয়ন, সর্ব্বত্র শ্রুতি-আনন; তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।

'তিনি সকলইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণযুক্ত; তিনি সকলের প্রভু, মহেশ্বর, সকলের বৃহৎ শরণ (আশ্রয়)।'

মহেশ্বরের এমন বর্ণনা অন্যজাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সুদুর্লভ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কুমারসম্ভব।

তপঃফলোদয়।*

এরূপে চোখের 'পরে পিনাকী দহিলা স্মরে,
তাহাতে উমার করে হৃদয় বিকল!
আপনারও যৌবনে ধিক্ দিলা মনে মনে—
না চাহিলে প্রিয়জনে চারুতা বিফল! (১)

উঠিল বাসনা জাগি'—অমোঘ রূপের লাগি'
তপোজপে অনুরাগি' পূরাবে দুরাশা!
নহিলে কেমনে তাঁর এ উভয় মিলিবার—
সেইরূপ স্বামী, আর সেই ভালবাসা? (২)

* 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গ। ইহাতে মদনভস্মের পরের ঘটনা অর্থাৎ পার্ব্বতীর তপশ্চরণ বর্ণিত হইয়াছে।

কঠিন সাধনতরে বালিকা যতন করে,
পিনাকপাণির 'পরে সঁপি' প্রাণমন।
শুনিয়া মেনকারাণী উমারে বুকেতে টানি'
কহিলা সোহাগবাণী তপোনিবারণ :—(৩)

"দেবতা সে মনোমত আছে গৃহে শত শত ;
কোথা বাছা মুনিব্রত, কোথা তনু তোর !
ভর সহে ভ্রমরার শিরীষ সে সুকুমার,
তা বলে' কি পারে আর পাখীর কঠোর ?" (৪)

দৃঢ়মনা মেয়েরে সে মেনা হেন উপদেশে
তপোনীতি হ'তে শেষে নিবারিতে নারে—
সাধের সাধনে যদি ধায় মন নিরবধি,
কে ফিরাবে দ্রুতনদী—স্রোতসম তারে ? (৫)

সখী যে নিকটে আছে পাঠায়ে পিতার কাছে
একদা মানিনী যাচে—"যাইব বিপিনে,
মন-আশা সকলি ত আপনি জানেন পিতঃ,
করিব সাধনা নিত' ফলে যতদিনে !" (৬)

অনুরূপ অভিলাষে গিরিরাজ মনে হাসে,
তনয়ার বনবাসে দিলা অনুমতি।
যায় বালা,—এ ভুবনে পরে তাঁরি নামে ভণে
গৌরীশিখর-বনে, শিখীর বসতি ! (৭)

তপোমতি বালিকার ঘুচে সাধ বালিকার—
বুকের সুরভিসার লুটিত যা' আগে,
বাঁধিল বাকল বালা অরুণ-পাটল আলা—
টুটিল যা', এ কি জ্বালা, উচ' কুচভাগে ! (৮)

চিক্কণ চিকুরে লুটে' যে-মুখে মাধুরী ফুটে,
রাজিল তা' জটাজূটে এখনো তেমন !
কেবল ভ্রমরসারে কমল ত শোভে না রে—
শেহালাদলেও তারে সাজায় কেমন ! (৯)

ব্রতবতী তিন-নরী তৃণ-গুণ জিন পরি',
তনুলতা কি শিহরি' উঠে থেকে থেকে
কভু তা পরে দি আগে, কটিতে কঠিন লাগে—
চারিধার রাঙা রাগে দিল এঁকে এঁকে! (১০)

অধরে আলতা দিত যে-হাতে সে অবিদিত,
স্তনরাগে অরুণিত ভাঁটা নাহি ধরে ;
কুশ-সূচে অবিরত আঙুল হতেছে ক্ষত,
করেছে প্রণয় কত জপমালা'পরে! (১১)

কোমল শয়নে, ভুলে ফিরে-শুতে যেত খুলে—
সেই সে চুলের ফুলে বাজিত বেদন,
ভুজলতা-উপাধানে শুধু বালা সাবধানে
বসে-শুয়েও পাষাণে কাটিছে এখন! (১২)

আজিকে নিয়মবতী ছুটি ধন দোঁহা প্রতি
রাখি' দিলা, পেলে পতি লইবেন ফিরে—
লতিকা সে সুকুমারী লীলাগতি দিলা তারি,
চকিত চাহনি ছাড়ি' দিলা হরিণীরে! (১৩)

নিরলসা নিজে-থেকে ঘটস্তনবারিসেকে
বাড়াইলা একে একে চারাগাছগুলি,—
প্রথমে জনমে বলে' বনের এ তরুদলে,
নবীন 'কুমার' হ'লে, যাননিকো ভুলি'! (১৪)

মুঠা-মুঠা বনবীজে মৃগ পালিতেন নিজে,
তাই তারা এমনি যে তাঁহাতে ভুলিত—
সখীরা সমুখে থাকে তবু নাহি ভয় রাখে,
কুতূহলে তাঁরি আঁখে আঁখিটি তুলিত। (১৫)

স্নান সারি', চীর পরি', হোমযাগ সমাচরি',
যথাবিধি বেদ পড়ি' যাপিত দিবস।
সদা তাঁর দরশনে আসিতেন ঋষিগণে,—
ধরমে যে বড়, গণে কে তার বয়স? (১৬)

প্রতিকূল প্রাণিকুলে আগেকার বৈর ভুলে ;
তরুগুলি ফলফুলে অতিথিরে সেবে ;
কুটীরে সারাটি ক্ষণ জ্বলে হোমহুতাশন ;
হইল সে তপোবন সুপাবন এবে ! (১৭)

বুঝিলেন উমা যবে—প্রথম ক্রমের তপে
কখনো নাহিক হবে ফল মনোমত,
তখন তাপসব্রতা নাহি বাসি' কোমলতা
করিলা সে তনুলতা আরো তপোরত ! (১৮)

আগে যেবা ভাঁটা খেলে' বাঁচিত না শ্বাস ফেলে',
ধরিল সে অবহেলে মুনির আচার !
কনককমলদলে তনু না রচিত হ'লে,
কেন হেন সুকোমলে এমন স-সার ? (১৯)

সুহাসিনী চারিধার হুতাশন জ্বালি' চার,
রাখিতেন মাঝে তার ক্ষীণ তনুখানি ;
নিদাঘে ভানুর দিক্ চাহিতেন অনিমিখ—
চোখে যে ঠিকরে চিক সে কিছু না মানি' ! (২০)

এইরূপে সবিতার সহি' কর খরধার
ধরিল মুখানি তাঁর কমলের ছবি !
অবিরল বিলোকনে দীঘল নয়নকোণে
কেবল কালিমা ক্রমে লভিল পদবী ! (২১)

অযাচিত ধারা-পয়, বিধুকর সুধাময়,
শুধু এই দুয়ে হয় তাপসী বালার
পারণের বিধি সারা ! বিটপিগণের পারা
জীবিকা এতেক ছাড়া নাহি ছিল আর ! (২২)

দহিয়া বিবিধানলে—সমিধে, নভে যা' জ্বলে, *
—নিদাঘ যাইত চলে'। বরষা তথাও ?
তখন নূতন বারি শরীরে ঝরিলে, তাঁরি
ধরা-সহ তাপ ছাড়ি' ধাইত উধাও ! (২৩)

* আকাশের অগ্নি সূর্য্য।

ক্ষণ থাকি' ঘন-জল আঁখি-লোমে টলিল,
পীড়িয়া অধরদল লুটে কুচশিরে !
ত্রিবলীর খাঁজে খাঁজে স্খলিত, চলিত না যে—
অবশেষে নাভিমাঝে পশিত সুচিরে ! (২৪)

শুতেন শিলার 'পর ছাড়িয়া কুটীরঘর,
অবিরাম জলঝড় না মানি' মানিনী
কি কঠোরে ব্রত রাখে ! চপলা-চমক-আঁখে
যেন তা দেখিতে থাকে নিতি নিশীথিনী ! (২৫)

বহে ঘোর শীতবাত নাহি তাহে দৃক্‌পাত—
সারাটা পউষরাত বারিমাঝে রহে।
দুটি চকাচকী পাখী অদূরে উঠিছে ডাকি'—
ঝরিছে উমার আঁখি তাদের বিরহে ! (২৬)

সরোজসুরভি মুখে রজনীতে জলে চুকে,
ঠোঁটখানি টুক্‌টুকে কাঁপে ঠিক দল !—
ঘুচেছে তুষারঘায় কমল সকলি হায়,
সেথা যেন শোভা পায় একটি কেবল ! (২৭)

তরুতলে ঝরি'-পড়া পর্ণে পরাণ-ধরা
সেই ত তপের পরা' ! তাহারো বিহনে
সুভাষিণী ধরে প্রাণ, তাই তাঁরে করে দান
'অপর্ণা'-অভিধান পুরাবিদ্‌গণে। (২৮)

এইমত নিশিদিন সাধি' ব্রত সুকঠিন
করিতে লাগিলা ক্ষীণ মৃণালের দেহ—
সুদৃঢ় শরীর দিয়া অবিরত আচরিয়া,
পারেন নি হেন ক্রিয়া মুনিরাও কেহ ! (২৯)

অজিনে আষাঢ়ে * সেজে', জলি' যেন তপ'তেজে,
বটু এক—কয় সে যে অতয়বচনে,
শিরে বহি' জটাভার, সাধনারি অবতার—
একদা পশিল তাঁর নব তপোবনে ! (৩০)

* পলাশদণ্ড।

গিরিজার অতিথিপরা, বতিরে পুজিতে ত্বরা
উঠিলা ত্যজিয়া ধরা দিলা বহুমান ;—
সাধুরা সুধীরমতি লোকবিশেষের প্রতি
দেখান অধিক রতি, হোন্ না সমান! (৩১)

গৃহাগত, গ্রহি' তাঁর বিধিমত পূজাচার,
ক্ষণতরে শ্রমভার যেন করি দূর,
অকুটিল ছুটি আঁখি উমার উপরে রাখি'
কহিলা বিনয় মাখি' বচন মধুর!—(৩২)

"বলি, তব ক্রিয়াতরে কুশকাঠ জোটে ত রে?
বারিও ত মেলে তোরে—স্নানে যত লাগে?
আপন শকতিমত তপ তুমি করিছ ত?
সাধিতে ধরমব্রত দেহই যে আগে! (৩৩)

"বলি, নিত' ঢালি' জল আপনি ত নবদল
ফুটাইছ এ সকল বনলতিকায়?
তাই চির রাগহারা ও-রাঙা ঠোঁটের পারা
পাটলবরণে তারা হেন শোভা পায়! (৩৪)

"মৃগ'পরে তব মন রয়েছে ত সযতন—
ভালবেসে অনুখন লয় কুশমুঠি?
বলি লো কমল-আঁখি, তোমারি চাহনি নাকি
চল-চোখে নিতে আঁকি' তোলে আঁখিছুটি? (৩৫)

"শোন বালা লোকে বলে—সুরূপ না পাপে টলে—
সে বাণী সদাই ফলে জানিনু বিশেষ;
নহে কেন সুশোভনে! ও-স্বভাব-বরণনে
মুনিগণো সযতনে লবে উপদেশ? (৩৬)

ক্রমশঃ।

বঙ্গদর্শন।

ঘাটের পথ।

ওরা চলেছে দীঘির ধারে।
ঐ শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হ'য়ে গেছে জলভরা আজ,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা চলেছে দীঘির ধারে।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরথর পাতা-মরমর
ছায়া-সুশীতল বাটে ?
বেলা বেশি নাই, দিন হ'ল শেষ,
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ,
এ বেলা কেমনে কাটে ?
আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে ?

ওগো কি আমি কহিব আর ?
ভাবিস্‌নে কেহ ভয় করি আমি
ভরা-কলসের ভার !
যা হোক্ তা হোক্ এই ভালবাসি,
বহে নিয়ে যাই, ভরে' নিয়ে আসি,
কতদিন কতবার।
ওগো কি আমি কহিব আর !

এ কি শুধু জল নিয়ে আসা ?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কি ক'ব, কি আছে ভাষা !

কত-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকাপথে
কত কাঁদা কত হাসা!
একি শুধু জল নিয়ে আসা?

আমি ডরি নাই ঝড়জল।
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
উদ্দাম অঞ্চল।
বেণুশাখা'পরে বারি ঝরঝরে,
এ কূলে ও কূলে কালো ছায়া পড়ে,
পথঘাট পিচ্ছল।
আমি ডরি নাই ঝড়জল।

আমি গিয়েছি আঁধার সাঁজে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জ্জন বনমাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
ঝিল্লীর সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে।
আমি গিয়েছি আঁধার সাঁজে।

যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা—
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা,—
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা।
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

ওগো দিনে কতবার করে'
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে!
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো দিনে কতবার করে'।

আমি　　বাহির হইব বলে'
　　যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
　　　　নীল আকাশের কোলে!
　　　　　　তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,—
　　　　　　কালো লহরীর মাথায় মাথায়
　　　　　　　　চঞ্চল আলো দোলে—
　　　　　　আমি　　বাহির হইব বলে'।

আজ　　ভরা হ'য়ে গেছে বারি।
　　আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
　　　　ঘর ছেড়ে যেতে নারি।
　　　　　　দিনের আলোক ম্লান হ'য়ে আসে,
　　　　　　বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
　　　　　　　　কক্ষে লইয়া ঝারি।
　　　　　　মোর　　ভরা হ'য়ে গেছে বারি।

রামায়ণের রচনাকাল।

ব্যাকরণের জন্মকথা।

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ।"

ভারতবর্ষের আর্য্যসমাজে শব্দ "ব্রহ্ম" বলিয়াই পরিচিত ছিল। শব্দ ব্রহ্ম;—শব্দ "মহান্ দেবঃ"। তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য তাহার বৃষভরূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেই বৃষভ শব্দ করিতে করিতে মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হইয়া শব্দপ্রচার করিত। তাহার চারিটি শৃঙ্গ;—বিশেষ্য, ধাতু, উপসর্গ ও নিপাত; তিনটি পদ;—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল; দুইটি শীর্ষ;—নিত্য ও কার্য্য; সাতটি হস্ত;—সপ্ত বিভক্তি;—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ; সে বৃষভ তিন স্থানে আবদ্ধ;—উরসে, কণ্ঠে, শিরে।* সে কতদিনের কথা, তাহার কোন

* "চত্বারি শৃঙ্গাণি—চত্বারি পদজাতানি,—নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদাঃ—ত্রয়ঃ কালাঃ—ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাঃ। দ্বে শীর্ষে—দ্বৌ শব্দাত্মানৌ—নিত্যঃ কার্য্যশ্চ। সপ্ত হস্তাসো অস্য—সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধা বদ্ধঃ—ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধঃ—উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভো বর্ষণাৎ। রোরবীতি—শব্দং করোতি। কুত এতৎ? রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশেতি। মহান্ দেবঃ শব্দঃ। মর্ত্ত্যা—মরণধর্ম্মাণো মনুষ্যাঃ। তান্ আবিবেশ।"—ইতি মহাভাষ্যম্।

ইতিহাস পাইবার আশা নাই। তাহা সভ্যতা-বিকাশের সর্ব্বপ্রথম পুরাতনযুগের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল। সে যুগ কেবল কল্পনার যুগ; তখনও পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারণা প্রচলিত হইয়া সত্যনির্ণয়ের জন্য আগ্রহপ্রকাশ করে নাই। সে যুগ কেবল বিশ্বাসের যুগ; তখনও তর্কপদ্ধতি সমুদ্ভূত হইয়া সকল কথাই বিচার করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই।

তখন জনসমাজ বুঝিয়াছিল;—শব্দই বেদ। তাহাকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল জানা নহে;—বেদবাক্যকে নিত্যকাল রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, বেদার্থবিজ্ঞাপনের চেষ্টায়, বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ব্যাকরণ তাহারই একটি কৌশলমাত্র। তাহার প্রধান প্রয়োজন,—শব্দানুশাসন।*

শব্দসকল যেভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রকৃতি বিচার করিবার জন্য অতি পুরাকালেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। শব্দশিক্ষা না করিলে, বেদার্থজ্ঞানে অধিকার জন্মে না। বেদার্থজ্ঞানে অধিকার না হইলে, প্রকৃত আর্য্যজীবন যাপন করা যায় না। যাঁহারা আর্য্যত্বরক্ষার্থ নিরত লালায়িত ছিলেন, তাঁহারা যে শব্দশিক্ষার্থ ব্যাকুল হইবেন, তাহা স্বাভাবিক কথা।

শব্দশিক্ষার উপায় কি? সংখ্যায় অল্প হইলে, পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষালাভ করিবার উপায় হইতে পারিত। কিন্তু শব্দ যে অসংখ্য! অল্পকালে অনায়াসে অসংখ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিশিক্ষার উপায় কি? এই প্রশ্ন পুরাকালের সমগ্র সভ্যসমাজকেই বিচলিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু উপায়ান্তরের অভাবে, সমগ্র সভ্যসমাজ পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষালাভ করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইতে বাধ্য হইয়াছিল! এই প্রণালীতে শব্দশিক্ষা করিবার নাম,—"প্রতিপদপাঠ।"

অদ্যাপি চীনদেশে এই প্রণালী প্রচলিত আছে। এক সময়ে ভারতবর্ষেও এই প্রণালী প্রচলিত ছিল। ইহা যে শব্দশিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নহে, ভারতবর্ষেই তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। তাহা ভারতীয় সভ্যতার উল্লেখযোগ্য গৌরবের কথা। সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রে সেই গৌরব চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে শব্দশিক্ষার কিরূপ প্রণালী প্রচলিত ছিল, কিজন্যই বা তাহা পরিত্যক্ত হইল, তাহার কোন লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও, একটি প্রবল জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ভগবান্ পতঞ্জলি "ব্যাকরণমহাভাষ্যের" উপক্রমণিকায় তাহার উল্লেখ করিয়া, তাহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছেন।

জনশ্রুতি এইরূপ। দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে শব্দশিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষালাভ করিবার "প্রতিপদপাঠ"-

* "অথ শব্দানুশাসনং" নামক যে প্রতিজ্ঞাসূত্র পাণিনিব্যাকরণে মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাহা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনির লেখনীপ্রসূত বলিয়া "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" উল্লিখিত আছে। উহা পাণিনিসূত্র নহে। কিন্তু উহাতেই ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে।

প্রণালী প্রচলিত ছিল। দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং অধ্যয়নার্থ যত্নশীল হইয়াছিলেন; এইভাবে দিব্যসহস্রবর্ষ শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল;—তথাপি শব্দশিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই! মনুষ্যলোকে যাহার পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারও পরমায়ু শতবর্ষমাত্র। তাহাতে "প্রতিপদপাঠ"প্রণালী অবলম্বন করিয়া, কয়টি শব্দের শিক্ষালাভ করা সম্ভব? এই কথা চিন্তা করিবামাত্র মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন,—"প্রতিপদপাঠ"-প্রণালী শব্দশিক্ষার প্রকৃষ্টপ্রণালী হইতে পারে না। তখন শব্দশিক্ষার প্রকৃষ্টপ্রণালীর অনুসন্ধান আরব্ধ হয়। কালে তাহা হইতেই ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সহসা এই কার্য্য সাধিত হয় নাই। কত দিনে কত মনীষীর কত অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই প্রকৃষ্টপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।*

শব্দ অসংখ্য বলিয়াই, "প্রতিপদপাঠ"-প্রণালী ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল! শব্দ অসংখ্য হউক; তাহাকে কি কোন উপায়ে অল্পসংখ্যক শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করিবার উপায় নাই? এই চিন্তা হইতেই ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। যাঁহারা ইহার উপায়-অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই মানবসমাজের আদি বৈয়াকরণ,—সভ্যসমাজের সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক শিক্ষক। তাঁহারা কতকগুলি প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কল্পনা করিয়া, তদ্দ্বারা, অসংখ্য শব্দকে অল্পসংখ্যক শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করিয়া, সহজে শব্দশিক্ষার এক প্রকৃষ্টপ্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহারা যে-সকল শব্দকে শ্রেণীভুক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারেন নাই, তাহাদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহারই নাম—"নিপাতন।" তাহা "প্রতিপদপাঠেরই" নামান্তরমাত্র। কারণ, যে সকল শব্দ "নিপাতনের" নিয়মে শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক শব্দকে পূর্ব্ববৎ পৃথক্‌ভাবেই শিক্ষা করিতে হয়। কেবল সংখ্যায় অল্প বলিয়া, এই শ্রেণীর শব্দশিক্ষায় আর পূর্ব্ববৎ জীবনক্ষয় করিতে হয় না।

অনেকে প্রকৃতিপ্রত্যয়কে চিরপ্রচলিত মনে করিয়া, তাহা যে বৈয়াকরণগণের কল্পনামাত্র, এই ঐতিহাসিক সত্যের উপলব্ধি করিতে পারেন না। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিয়া থাকেন,—ভূ, কৃ, অস্ প্রভৃতি ধাতুই মূলশব্দ; তাহার সহিত উত্তরকালে প্রত্যয় সংযুক্ত হইয়া ভবতি, করোতি, অস্তি প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের মত নহে। ভারতবর্ষের মতে "শব্দ নিত্য"—তাহা চিরকাল সমভাবে বর্ত্তমান আছে। একসময়ে বুঝিবার সুবিধার জন্য ভবতি, করোতি, অস্তি

* এবং হি শ্রূয়তে। বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং সহস্রবর্ষং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ। নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা, ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা, দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালো ন চান্তং জগাম! কিং পুনরদ্যত্বে? যঃ সর্ব্বথা চিরং জীবতি, স বর্ষশতং জীবতি। তস্মাৎ অনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ।"—ইতি মহাভাষ্যম্।

প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দকে পৃথক্‌ভাবে শিক্ষা করিবার "প্রতিপদপাঠ"প্রণালী প্রচলিত ছিল; উত্তরকালে তাহার অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া, মনীষিগণ প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কল্পনা করিয়া, তাহার দ্বারা এক সঙ্গে অনেক শব্দের শিক্ষাকৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্লেষণবুদ্ধি পরিস্ফুট না হইলে, "ব্যাকরণ" জন্মগ্রহণ করিত না;—"প্রতিপদ-পাঠ"প্রণালীই প্রচলিত থাকিত! ব্যাকরণ জন্মগ্রহণ করায়, সহজে শব্দশিক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার জন্য ভারত-বর্ষের মনীষিগণ কত প্রয়াস স্বীকার করিয়া-ছিলেন, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। *

এইরূপে শব্দশিক্ষার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইবার সময়ে, মনীষিগণ আর একটি প্রবল তর্কে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সে তর্কটি এইরূপ। সকল শব্দই কি 'ধাতুজ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে? এ বিষয়ে প্রবল মতপার্থক্য উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুক্তকারগণ সকল শব্দকেই "ধাতুজ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। শকটপুত্র শাকটায়ন ভিন্ন অন্য কোন বৈয়াকরণ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে অনেক শব্দ "ধাতুজ" হইলেও, সকল শব্দই "ধাতুজ" নহে।

যাহা "ধাতুজ" নহে, বৈয়াকরণগণ তাহাকে "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক" বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত শব্দ ধরিয়া, প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কল্পনা করিয়া, শব্দব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিতান্ত কষ্টকল্পনা ব্যতীত সকল শব্দেরই প্রকৃতিপ্রত্যয়ের নিয়মনিরূপণ করা যায় না। বৈয়াকরণগণ সেরূপ কষ্ট-কল্পনায় প্রশ্রয়দান না করিয়া, এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক" নামে অভিহিত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—তাহারা "যথোপদিষ্টানি,"—যে ভাবে উপদিষ্ট হইবে, সেই ভাবেই তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।

"অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের" সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে! এই শ্রেণীর শব্দশিক্ষার সহজ উপায় কি? "প্রতিপদপাঠ"প্রণালী ভিন্ন এই শ্রেণীর শব্দশিক্ষার অন্য উপায় কোথায়? যে উপায়কে পরিহার করিবার জন্য এত চেষ্টা, তাহাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিবার উপায় রহিল না,—শব্দসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এক শ্রেণীর শব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে ব্যাখ্যাত হইবার উপায় হইল; আর এক শ্রেণীর শব্দ পুরাতন "প্রতিপদপাঠ"প্রণালীতেই ব্যাখ্যাত হইতে থাকিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া গেল! ইহা মনীষিমাত্রেরই মনঃপূত হইল না। যাঁহাদের মনঃপূত হইল না, তাঁহারা পুনরায় প্রত্যয় কল্পনা করিয়া, নিপাতনের নিয়মে "অব্যুৎপন্ন প্রাতি-পদিকের", ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যার্থ যত্নশীল হইলেন।

* রাজশাহী-সাহিত্যসমিতিতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় "উণাদিতত্ত্ব"নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সকল বিষয়ের বিবিধ আলোচনায় উৎসাহদান করিয়াছেন। তাঁহার "পাণিনিতত্ত্বের" প্রবন্ধ "ভারতীতে" প্রকাশিত হইতেছে; "উণাদিতত্ত্বের" প্রবন্ধও মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইবে।

এইরূপে যে সকল নূতন প্রত্যয় কল্পিত হইতে লাগিল, তাহার প্রথম প্রত্যয়টির নাম "উণ্"। তাহা হইতেই "উণাদি"প্রত্যয়নামক একটি স্বতন্ত্র শব্দশিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈয়াকরণসমাজে এক-সময়ে এ বিষয়ে প্রবল মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও, উত্তরকালের বৈয়াকরণমাত্রেই "উণাদি"কে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং "উণাদয়ো বহুলং" বলিয়া সূত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, কোন ব্যাকরণেই সমগ্র উণাদির আলোচনা স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই; তাহার জন্য "উণাদি-সূত্র"নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে। *

কবে "উণাদির" প্রথম উদ্ভাবনা হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। "নিরুক্ত"-শাস্ত্রে তাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায়। কবে ব্যাকরণোক্ত প্রকৃতিপ্রত্যয় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা যেমন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কবে "উণাদি"-প্রত্যয় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাও সেইরূপ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে! তাহার কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সফলকাম হইবার আশা নাই।

এইরূপে ব্যাকরণশাস্ত্র প্রসূত হইয়া, শব্দানুশাসনকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ স্থিতিশীল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ স্থিতিশীল হইয়াও, বিলক্ষণ গতিশীল ছিল। যাঁহারা ভারত-বর্ষের পুরাতন সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই দেখিবেন,—এক-সময়ে যে শব্দের যে ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, চিরদিন সাহিত্যসমাজ সেই ব্যাখ্যা লইয়া পরিতৃপ্ত হয় নাই! একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়াছে। কখন পুরাতন ব্যাখ্যা বিলুপ্ত করিয়া, অভিনব ব্যাখ্যা প্রবল হইয়াছে; কখন বা নূতন-পুরাতন সকল ব্যাখ্যাই তুল্যভাবে সমাদরলাভ করিয়াছে। বৈয়াকরণগণ "নিপাতনের" ব্যবস্থা করিয়া যে সকল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, "উণাদি"-কারগণ তাহারও কত শব্দের "উণাদি"-প্রত্যয়সম্মত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। † শব্দশিক্ষার এই সকল উপায় যে কল্পনা-প্রসূত, এই সকল মতপার্থক্য এবং ব্যাখ্যা-পার্থক্যই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। এই সকল কারণে, সংস্কৃতসাহিত্যের শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, পুরাতন গ্রন্থের রচনাকালনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার আশা আছে।

ব্যাকরণ একটি "বেদাঙ্গ" বলিয়া সুপরিচিত। অঙ্গের মধ্যে মুখ যেমন শ্রেষ্ঠ অঙ্গের অন্তর্গত, "বেদাঙ্গের" মধ্যেও ব্যাকরণ সেইরূপ—"মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং"—তাহা বেদের মুখ বলিয়াই কথিত হইয়া আসিতেছে। এই বেদমুখ—ব্যাকরণ—প্রথমে কেবল বেদবাক্যের ব্যাখ্যা লইয়াই

* অধ্যাপক অফ্রেক্‌টকর্ত্তৃক লণ্ডননগরের মুদ্রিত উজ্জ্বলদত্তকৃত বৃত্তিসংযুক্ত "উণাদিসূত্র"নামক গ্রন্থই এই প্রবন্ধরচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

† বৈয়াকরণগণ "হিন্‌স্"-ধাতু হইতে নিপাতনের নিয়মে "সিংহশব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশ করেন; "উণাদি-কারগণ "সিচ্"-ধাতু হইতে নিপাতনের নিয়মে "সিংহ"-শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশ করেন। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক।

ব্যাপৃত ছিল; তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইত। তাহার পর লৌকিকসাহিত্য উদ্ভূত হইলে, সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্য বৈদিক ও লৌকিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উভয় ভাগের শব্দানুশাসন একরূপ হইতে পারে না বলিয়াই, ব্যাকরণশাস্ত্র উভয়বিধ শব্দানুশাসনের জন্য উভয়বিধ সূত্ররচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে সাহিত্য-যুগে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, সে যুগের ব্যাকরণের সমগ্র সূত্র আর "বেদাঙ্গ" বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিতে পারে নাই। পাণিনিব্যাকরণ এই শ্রেণীর মিশ্র ব্যাকরণ;—তাহাতে বৈদিক ও লৌকিক সূত্র একাধারে বর্ত্তমান। কিন্তু লৌকিক শব্দানুশাসনের ব্যবস্থা থাকিলেও, পাণিনিব্যাকরণ সর্ব্বপুরাতন বলিয়া, এখনও "বেদাঙ্গ"নামেই কথিত হইয়া থাকে। যে ব্যাকরণ কেবল বৈদিকশব্দের অনুশাসনকার্য্যেই লিপ্ত ছিল, লৌকিকশব্দের ছায়াস্পর্শ করিত না,—যাহা কেবল "বেদাঙ্গ"নামেই কথিত হইবার যোগ্য,—সেরূপ ব্যাকরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পাণিনিব্যাকরণ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া, পাণিনিব্যাকরণকেই "বেদাঙ্গ" বলিলে বলিতে পারা যায়; অন্য কোন ব্যাকরণ সে গৌরব লাভ করিতে পারে না!

পাণিনিব্যাকরণে লৌকিকসাহিত্যের যে সকল রচনারীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেক রীতি সংস্কৃতসাহিত্য হইতে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কত পুরাতন রচনারীতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কত অভিনব রচনারীতি সমুদ্ভূত হইয়াছে, সংস্কৃতব্যাকরণ ধরিয়া তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া লইলে, পুরাতন গ্রন্থের রচনাকালনির্ণয়ের অভ্রান্ত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। তাহার সন্ধানলাভ করিবামাত্র, বিস্ময়ের অবধি থাকে না; "সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস" নামধেয় পাশ্চাত্যপাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ আমাদিগকে কত বিষয়ে কিরূপ ভ্রান্তিজালে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারও বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়!

এক মত পরিত্যাগ করিয়া, অন্য মত গ্রহণ করিবার সময়ে, সাহিত্য হইতে পুরাতন মত সহসা বিলুপ্ত হইয়া, নূতন মতকে আসনদান করিতে পারে না। কিয়ৎকাল উভয় মতই যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে। পরিণামে প্রবল মত স্থায়িত্বলাভ করে;—দুর্ব্বল মত বিলুপ্ত হইয়া যায়! ভিন্ন ভিন্ন যুগের ব্যাকরণ ধরিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিভাত হয়। পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল-নির্ণয়ের জন্য এই বিষয়ের অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত হইবামাত্র, ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার যে সকল বিলুপ্ত গৌরব সহসা আত্মপ্রকাশ করে, তাহা কেবল বিস্ময়াবহ বলিয়াই কীর্ত্তিত হইতে পারে না; তাহাতে আর্য্যসমাজের সভ্যতাবিকাশের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—আর্য্যসমাজ স্থিতিশীল হইয়াও, গতিশীল ছিল। এক সময়ে তাহার জ্ঞানানুরাগ তাহাকে বিবিধ আলোচনায় উৎসাহযুক্ত করিয়া, সভ্যা-

বিকারে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। কিছুদিন পরে, সে ভাব তিরোহিত হইলে, অনুদার ও সঙ্কীর্ণবুদ্ধি আর্য্যসমাজকে সর্ব্ববিষয়েই জড়ভরতের ন্যায় নিতান্ত নিরুদ্যম করিয়া তুলিয়াছিল! এই ঐতিহাসিক সত্য সকল বিষয়েই দেদীপ্যমান। কি ব্যাকরণ, কি কাব্যশাস্ত্র,—কি দর্শন, কি বিজ্ঞান,—কি চিকিৎসাবিদ্যা, কি জ্যোতিষ,—সর্ব্বত্রই এক কথা! সাহিত্যের মধ্যে যেন ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। এক এক স্তরে এক এক মূর্ত্তি;—তাহা কোন স্তরে সজীব, নৈসর্গিক রূপলাবণ্যে সমুজ্জ্বল; —কোন স্তরে নির্জীব, কেবল অস্পষ্ট ছায়াকলেবরে ঈষৎ প্রতিভাত! এক যুগের সাহিত্যে ভাবে, ভাষায়, রচনাকৌশলে সজীব সমাজের অবিরল প্রবল প্রবাহ; আর এক যুগের সাহিত্যে ভাবে, ভাষায়, রচনাকৌশলে নির্জীব সমাজের কৃত্রিমতার উচ্ছৃঙ্খল আড়ম্বর! স্বদেশের সংস্কৃতসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচনা ব্যতীত, বিদেশের বিকৃত সিদ্ধান্ত এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত করিতে পারে না। বিদেশের শিক্ষা আমাদিগকে প্রগল্ভ করিয়া তুলিয়াছে;—জ্ঞানানুরক্ত ভক্ত সাধকের ন্যায় স্বদেশের সাহিত্যসেবায় নিবিষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদের সাহিত্যে এখনও অসার আলোচনার আতিশয্য! ভবিষ্যতের ইতিহাসলেখকের নিকট তাহা বর্ত্তমান লেখক-পাঠক-সম্প্রদায়ের গৌরবঘোষণা করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না!

আমাদের প্রগল্ভতার সীমা নাই! ব্যাকরণ অবশ্যপাঠ্য হইলেও, আমাদিগের বিচারে তাহার মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা ব্যাকরণের জন্ম ও ক্রমবিকাশের আলোচনা করিতে অসম্মত। কেবল ভাষাশিক্ষার্থই ব্যাকরণ রক্ষা করিতেছি; নচেৎ তাহাকে চিরনির্ব্বাসিত করিতেও আপত্তি ছিল না! এই শ্রেণীর তর্ককণ্টক যে এখনই সহসা কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। অনেকদিন পূর্ব্বে,—অন্তত দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বেও,—তাহার প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তখনও কেহ কেহ বলিতেন,—শব্দশিক্ষার্থ আবার শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? লোকে যে শব্দ যে ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, লোকের নিকটেই তাহা শিক্ষা করিতে পারি। ভগবান্ পতঞ্জলি "ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের" উপক্রমণিকায় এই তর্কের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত ভাষাশিক্ষাই ব্যাকরণশিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নহে;—আরও কিছু লক্ষ্য আছে। নচেৎ শব্দশিক্ষার্থ শাস্ত্রের প্রয়োজন উপস্থিত হইত না।

"যদি তর্হি লোক এষু প্রমাণং, কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে?"

এই পুরাতন পূর্ব্বপক্ষ যেন এখনও থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে! বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন বিশিষ্ট প্রবন্ধলেখক স্পষ্টাক্ষরেই তাহার উল্লেখ করিতেছেন! যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া স্বদেশের উচ্চশিক্ষার প্রকৃতিনির্ণয়ে মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও যেন অজ্ঞাতসারে আত্মহারা হইয়া, যে-কোন উপায়ে ভাষাশিক্ষা সমাপ্ত করাইবার জন্যই লালায়িত। ছাত্রসমাজও, ব্যাকরণশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত

হইলে, অসহিষ্ণু হইবেন বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি, চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের পাণ্ডিত্য-উপার্জ্জনের পথ সহজ করিয়া দিবার জন্ত তাঁহাদিগের পরীক্ষাতেও ব্যাকরণের যথোপযুক্ত অধ্যয়নের প্রয়োজন ধীরে ধীরে অস্বীকৃত হইতেছে!

যে-কোন উপায়ে ভাষাশিক্ষা সমাপ্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য নহে। যে-কোন দ্রব্যে উদরপূরণ করিলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে। ভগবান্ পতঞ্জলি তাহার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—তবে আর ভক্ষ্যাভক্ষ্যনির্ণয়ের জন্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যে-কোন পাত্রে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, তবে আর পাত্রাপাত্রনির্ণয়ের জন্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যে-কোন যূপে পশুবন্ধন সম্পন্ন হইতে পারে,—তবে আর কাষ্ঠাকাষ্ঠবিচারের জন্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে। যুগে যুগে অর্থপার্থক্য সমদ্ভূত হইতেছে বলিয়া, লোকব্যবহারমাত্র সম্বল করিয়া শব্দশিক্ষা সমাপ্ত করিলে, তদ্দ্বারা প্রচলিত সাহিত্যের অর্থবোধ করা সম্ভব হইলেও, অতীত-সাহিত্যের অর্থবোধের চেষ্টা সফল হইবে না;—পূর্ব্বপুরুষের সহিত উত্তরপুরুষের ভাবসামঞ্জস্ত খণ্ডিত হইয়া, আমাদিগকে নিয়ত উচ্ছৃঙ্খলতার পথে প্রধাবিত করিয়া, আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অধোগতি সাধিত করিয়া দিবে,—আমরা আবার "ম্লেচ্ছ" হইয়া পড়িব। তজ্জন্তই পতঞ্জলি বলিয়া গিয়াছেন,—

"ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রায়গৃহিণী।

১

ত্রিবেণীগ্রামে গঙ্গা-সরস্বতীর মিলনক্ষেত্রের অদূরে বাণীনাথবাবুর প্রাচীন চকমিলানকরা বাড়ীটির জীর্ণসংস্কার সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেন না, দীর্ঘকাল পূর্ত্তবিভাগে কাজ করার পর পেন্‌শন্ লইয়া বাড়ীতে বিশ্রাম করা তাঁহার অভিপ্রেত।

বাণীনাথের মাতা অদ্যাপি বাঁচিয়া আছেন এবং ত্রিবেণীর এই বাটী তাঁহারই পিতৃভিটা। বাণীনাথ নিজে চট্টবংশসম্ভূত হইলেও সেইজন্ত তাঁহার মাতামহ রায়বংশের সহিত এই গৃহের স্মৃতি জড়িত এবং "রায়গিন্নি" বলিলে তাঁহার মাতাকেই বুঝায়। ফলত পুত্র যে মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন, বিধবা মাতাই তাহার মূল। কিন্তু জননীর উদার সরল হৃদয় সন্তানে বর্ত্তে নাই। বাণীনাথ কেবল তাঁহার স্থির দৃঢ়চিত্ততার কতক কতক উত্তরাধিকার করিয়াই সংসারসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিয়াছেন। প্রৌঢ়বয়সের শেষসীমায়

পৌঁছিয়াও সাংসারিক ব্যাপারে সকল বিষয়েই তাঁহাকে বৃদ্ধা মাতার ইচ্ছামত চলিতে হইত। প্রায় প্রতি দুইবৎসরে বদলীর হাঙ্গামায় তিনি কখন সপরিবারে কর্ম্মস্থানে বাস করেন নাই। বরাবর সুদূর প্রবাসে—বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে—তাঁহাকে ঘুরিতে হইয়াছে, গঙ্গাহীন দেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব মনে উঠিলেও কখন মাতার সমক্ষে উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। ইহার ফলে তাঁহার একমাত্র পুত্র নলিনীনাথের সম্পূর্ণ ভার পিতামহীর উপর পড়িয়াছিল।

এ অবস্থায় সচরাচর যাহা অনিবার্য্য, তাহাই ঘটিল। বৃদ্ধা ঠাকুরমাতার মানসিক বল সংসারে অন্ত সকলের পক্ষে অজেয় হইলেও আদরের পৌত্রের কাছে টুটিয়া গিয়াছিল। বাণীনাথের পত্নী নিতান্ত সাধাসিধা লোক ছিলেন, শাশুড়ীর কোন কার্য্যের উপর কথা কহিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। অতএব গোকুলে নন্দদুলালের মত নলিনীনাথ দুগ্ধঘৃত এবং নবনীত খাইয়া আর ভদ্র-অভদ্র বয়স্যদলে মিলিয়া-মিশিয়া বাড়িতে লাগিল। সে তাহার ঠাকুরমার কাছে শুনিতে পাইত যে, তাহাদের যা-কিছু আছে এবং এক কলমে তাহার পিতা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা খাইবার যথেষ্ট লোক তাহাদের সংসারে নাই। গ্রামের ইস্কুলে আর পণ্ডিতের টোলে যে লেখাপড়া হয়, তার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বেশী ইংরেজীবিদ্যায় মন দিয়া হিন্দুর ছেলের চালচলন বিগ্‌ড়াইয়া যায়, যেমন ওপাড়ার রামগোপাল ঘোষের হইয়াছিল; অতএব নাতিকে তিনি তাহা করিতে দিবেন না। ইহার ফলে শেষবার ফার্লো লইয়া বাড়ী আসিয়া বাণীনাথ দেখিলেন, তিনি যে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াইয়া লাভজনক চাকরী কি ঠিকাদারী কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার আর কোন সম্ভাবনা নাই। গ্রামের মাইনর-স্কুলের পড়া শেষ করিয়া সে এখন শিরোমণি-মহাশয়ের টোলে প্রবেশ করিয়াছে এবং ঠাকুরমার সহিত রোজ গঙ্গাস্নান ও পূজা-আহ্নিক করে। ইহার উপর বাণীনাথ মাতার আদেশ পাইলেন যে, তাঁহার ছুটী ফুরাইবার আগে নলিনীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হওয়া চাই; কেন না, তিনি কনে দেখিয়া ভদ্রলোককে কথা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেশ কার্য্যকুশল লোক এবং মাত্রার অধিক হিসাবী বলিয়া মাতার কাছে মাঝে মাঝে তিরস্কৃত হইতেন। বিস্তর টাকা তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তথাপি পেন্‌শন্‌-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও নিরনব্বইয়ের ধাকা সাম্‌লাইতে পারেন নাই। অবসর গ্রহণ করিয়া কি ভাবে মাতৃভূমিতে দিন কাটাইবেন, সেই চিন্তা এখন তাঁহার প্রবল। পথে ২।৩দিন রেলগাড়িতে আসিতে তিনি মনে মনে হিসাব করিয়াছিলেন, কারবারে প্রথম-প্রথম যে টাকাটা ফেলিবেন, তাহার অন্ততঃ একচতুর্থাংশ এখনকার প্রথামত পুত্রের বিবাহ দিয়া ভাবী বৈবাহিকের কাছে আদায় করিতে হইবে। কাজেই মা যখন বলিলেন যে, নলিনীর সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে,

তখন তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

মাথা চুলকাইয়া বাণীনাথ মাতৃদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় সম্বন্ধ হয়েছে?" বৃদ্ধা ইহাতেই তাঁহার মনোগত বুঝিলেন এবং কাঞ্চনপল্লীর বন্দ্যোপাধ্যায়দের উল্লেখ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাদের এখন ভাঙনদশা বলে' আমি অলঙ্কারপত্রের কোন কথা হতে দিইনি। এ কালের ধরণ-ধারণ কিছুই আমি বুঝ্তে পারি না, আর মালক্ষ্মীর কৃপায় সেরকম' বেণের ব্যবহারে আমার দরকারই বা কি?" "বেণের ব্যবহার" কথাটার উপর জোর দিয়া মাতা যে-ভাবে তাঁহার সুদীর্ঘ ও সমুন্নত নাসা সঙ্কুচিত করিলেন, তাহাতে ছেলেবেলায় একবার প্রতিবেশিনীগৃহে শসাচুরী করায় মাতৃহস্তে তিনি যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সে দৃশ্য সহসা বাণীনাথের মনে পড়িয়া গেল। অতএব আর দ্বিরুক্তি করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

কিন্তু যাঁহার কলকৌশলে ইষ্টক এবং প্রস্তর প্রায় ত্রিশবর্ষকাল ধরিয়া অবিশ্রান্ত রৌপ্যচক্র বর্ষণ করিয়াছে, মনুষ্যলোকে কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া যাইবে, বাণীনাথবাবু স্বয়ং এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে, এইরূপ পন্থা তিনি অবলম্বন করিলেন। গঙ্গার অপর তীরে কাঁচড়াপাড়াগ্রামে তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের গৃহ। একদিন প্রাতর্ভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া মাতার অজ্ঞাতসারে সেখানে তিনি দেখা দিলেন। অজ্ঞাতাগ্রস্ত পরেশনাথবাবু রায়গৃহিণীকে কন্যা দেখাইয়া এবং তাঁহার পাকা কথা পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, "হবু বেহাই"এর বাক্যভঙ্গীতে বুঝিলেন যে, কেজো কথায় মেয়েলী উচ্ছ্বাসের স্থান নাই। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহার এই কাজের কথায় ইহাও স্পষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর ছেলেটি বি. এ., এম্. এ, এমন কি, এনট্রান্স পর্য্যন্ত পাস্ করে নাই সত্য, কিন্তু এই সব পাস্ করার যে উদ্দেশ্য আহার্য্যান্বেষণ, তাঁহার সংসারে তাহার অপ্রাচুর্য্য নাই। পরেশনাথ শেষে শঙ্কিত হইয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে, বিবাহের সময় সামান্ত অলঙ্কার ছাড়া তিনি কিছু দিতে না পারিলে বছরদুই পরে দ্বিরাগমনের সময় দুইহাজার টাকার অলঙ্কার অবশ্য দিবেন। আর আজিকার এই গোপন সাক্ষাৎ ও পরামর্শ কোনরূপেই রায়গৃহিণীর কানে উঠিতে পারিবে না।

তার পর মাঘমাসে পুত্রের বিবাহ দিয়া বাণীনাথবাবু মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন। মা বলিয়াছিলেন যে, একবৎসর পরে নাত্-বউকে ঘরে আনিবেন; কেন না, তিনি আর কতদিন, দিনকতক তাহাদের লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে চান। পুত্র মাতৃ-সমীপে কিছু বলিতে না পারিয়া বেহাইকে টিপিয়া দিয়া গেলেন, দুই বৎসরের আগে দ্বিরাগমন করান না হয়। কেন-না, ততদিনে তিনি পেন্‌শন্ লইয়া বাড়ী আসিবেন। মনে সন্দেহ, পরেশনাথ অলঙ্কারগুলো ফাঁকি দিতে না পারে! ইহাতে পরেশবাবু মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। সর্ব্বস্ব বেচিয়াও টাকাটা সংগ্রহ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

২

বিবাহের পর বছর ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু পরেশনাথবাবুর অবস্থাপরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। নিজে তিনি কখন উপার্জন করেন নাই, পৈতৃক বিপুল সম্পত্তি পিতামহের সময় হইতে দেনার দায়ে পরহস্তগত, কেবল দেবোত্তরটুকুর উপর নির্ভর, তাহাও সরিকীবিবাদে হস্তচ্যুত হইতে বসিয়াছে। এই সময়ে রায়গৃহিণী জেদ্ ধরিলেন, নাত্‌বউকে ঘরবসতে পাঠাইতে হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া পরেশনাথ সস্ত্রীক একদিন বৈবাহিকমাতাকে প্রণাম করিতে গেলেন।

বুড়ীর সেই এক কথা—"আমি আর কতদিন? নাতি-নাত্‌বউকে লইয়া দিনকতক আমোদ-আহ্লাদে ঘরকন্না করতে পাব না?" কিন্তু পরেশনাথ কিছুতে ছাড়িলেন না, করজোড়ে আরো বছরখানেকের মহলৎ ভিক্ষা করিলেন। রায়গৃহিণীর হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি বুঝিলেন, সম্ভ্রান্তঘরের ছেলে, বিবাহের সময় ইচ্ছামত তেমন-কিছু দিতে না পারিয়া লজ্জিত আছে। তাই ঘরবসতের সময় একটু সমারোহ করিতে চায়। অতএব কুটুম্বের ক্ষুণ্ণ ধনগৌরবে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় তিনি আর জেদ্ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু এখন হইতে পুত্রস্থানীয় পরেশনাথের উপর তাঁহার বড় মায়া হইল। আগে গলার পরপারে বড়-একটা যাইতেন না, কিন্তু অতঃপর একখানা পান্সী কিনিয়া ইচ্ছামত যখন-তখন কুটুম্বগৃহে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে কিশোরী নাত্‌বউটির ওরফে হেমন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁর সাধ-আহ্লাদের সখীত্ব বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং তদীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদার হৃদয় সমক্ষে নূতন কুটুম্বের সঠিক অবস্থা প্রতিভাত হইল।

পরেশনাথের আর একটি কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বৈবাহিকের কাছে প্রতিশ্রুত আভরণের, ঋণ শোধ না করিয়া সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা তিনি করিতে পারিতেছিলেন না। রায়গৃহিণী ভিতরের কোন কথা না জানিলেও বুঝিলেন, অর্থকৃচ্ছ্রই তাহার কারণ। ছোট্ট নাত্‌বউটির সঙ্গে ইহার ভিতরই তিনি সাংসারিক সুখদুঃখের পরামর্শ করিতে সুরু করিয়াছিলেন। অর্থসাহায্যের কথা নিজে হইতে বলিলে পাছে পরেশনাথ মনে ক্লেশ পান, ইহা ভাবিয়া তিনি নাত্‌বউকে দিয়া বলাইলেন যে, দেবোত্তরবিষয়রক্ষা ও কন্যার বিবাহে যে চারিপাঁচহাজার টাকা খরচ পড়িবে, তাহা এখন কর্জস্বরূপ তাঁহার কাছে লওয়া হউক।

পরেশবাবু কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া মাহইমাতার চরণবন্দনা করিতে গেলেন এবং সাক্ষাৎকালে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে রায়গৃহিণী পৌত্রের সম্মুখে তাঁহাকে জানাইলেন যে, এই টাকা তিনি তাঁহার পিতৃদত্ত অর্থ হইতে দিবেন, বাণীনাথের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেবোত্তর বিষয় সম্পূর্ণ পরেশনাথের দখলে থাকিলে খরচখরচাবাদ একশত টাকা মাসিক লাভ দাঁড়াইবে। ইহার মধ্যে

পঞ্চাশটাকা দেনার হিসাবে তিনি যেন জামাতার নামে জমা রাখেন, কেন না, ইহারই ভিতর তাঁহার সমস্ত স্ত্রীধন তিনি নলিনীনাথের নামে উইল্ ও রেজেষ্টারি করিয়াছেন।

অতএব এই ঋণ গ্রহণ করিতে পরেশনাথ আর দ্বিধা বোধ করিলেন না। বৈবাহিকের দেনাশোধের পূর্ব্বে দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে কাজে-কাজেই তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইল। মাহইমা ছাড়েন না, মাঘমাসে বিবাহ দিতেই হইবে। হেমন্তকুমারীর দ্বিরাগমনের দিনও প্রায় সেই সময়ে পড়িবে। কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উপায় নাই।

পরেশবাবু সংবাদ পাইলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র রায় গবর্মেণ্ট কালেজের মাষ্টারি ছাড়িয়া সম্প্রতি স্বগ্রাম সুবর্ণপুরে এক বিদ্যালয় খুলিয়াছেন এবং তাঁহার দুইটি ছেলে বিবাহযোগ্য হইয়াছে। দুই বন্ধুতে প্রায় পনরবছর দেখাশুনা নাই, অতএব পরেশনাথ একটু সঙ্কুচিতভাবেই গেলেন। যোগেশকে তিনি "বাবু" ও "আপনি" বলিয়া সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, উত্তরে শুনিলেন, "ছাখ্ পরেশ, তুই যদি ওসব জ্যাঠামি করবি, তবে ছেলেবেলার মতই চড় কষাইয়া দিব।" ফলত পরেশ দেখিলেন, বয়োধর্ম্মে চুলদাড়ির কতক-কতক পাকিলেও যোগেশের হৃদয়টুকু পূর্ব্ববৎ সরস আছে।

পরেশ সুধাইলেন, "চাকরী ছাড়িলে কেন?" উত্তর—"তুই কখন ও পাপ করিলি না কেন? জুতার লাথি হ'তে নিষ্কৃতিলাভ করেছি, সেটা সুখের না দুঃখের কথা?" প্রশ্ন—"ইস্কুল করিলে, চলিবে কি? বিশেষ শুনিতে পাই, পরীক্ষা-দেওয়ান তোমার উদ্দেশ্য নয়।" উত্তর—"না চলুক, চেষ্টা ত করিতে হয়। আমি দেখিতে চাই, অন্তত গোটাকতক ছেলে এ'অঞ্চলে মানুষ হয়। নিজের ছেলেকটাকে নিজের আদর্শে যদি মানুষ করে' যেতে পারি, ঢের কাজ হলো।" প্রশ্ন—"কিন্তু তোমার অনেকগুলি ছেলেপুলে এবং পোষ্য, চলিবে কি করে'?" ইহার উত্তরে যোগেশচন্দ্র মনুর শ্লোক উচ্চারণ করিলেন :—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্‌বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।

তোর আশীর্ব্বাদে আমি কোন বিষয়ে পরাধীন নই। মানুষেরও নয়, কোন অভ্যাসেরও নয়। তা ছাড়া, চাষবাসের ব্যবস্থাও কিছু করেছি। কিন্তু তুই চিঠি না লিখে হঠাৎ এলি যে বড়? এমনই কি প্রয়োজন শুনি?"

পরেশনাথ কোন ভূমিকা না করিয়া একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন; কেন না, যোগেশ কোনরকম লুকাচুরির ধার ধারে না, তাঁহার জানা ছিল। শুনিয়া যোগেশ বলিলেন—"আমার বেহাই হ'তে চাস্, জানিস্ তো এখনকার দিনে ছেলের দর? চারি-হাজারের দর এই সবে ফিরাইয়া দিয়াছি। তুই ত শুনিতে পাই দেনাপত্রে বিব্রত—কত উঠিতে পারিবি? জানিসই ত আমি গরিব লোক, লোভের—আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।" যোগেশের সেই বিদ্রূপের সুর, কিন্তু পরেশনাথ ইহা সত্য ভাবিতে-ছিলেন। বলিলেন, "ভাই, হাজারহই টাকা

কোনরকমে দিতে পারি। তুমি আমায়, এই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার কর।"

যোগেশ উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন, "ভাল ভাল, পাঁচটা হরীতকী দিতে পারিবি ত? টাকাকড়ির কথা আমার কাছে আর বলিস্ নে। যে কেহ বলিয়াছে, তাহাকেই তাড়াইয়া দিয়াছি, বসিতে পর্য্যন্ত বলি নাই। সুতবিক্রয়ের পাপ হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জাগত হ'তে বসেছে। ভদ্রলোকমাত্রেরই ইহার প্রতিরোধ করা উচিত।"

মাঘমাসে বিবাহ দিতে সম্মত হইয়া যোগেশচন্দ্র পরেশকে বিদায় দিলেন। সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই, কোনরূপ ব্যয়বাহুল্য তুমি করিও না। আমাকে ত ছেলেবেলা থেকে চেন। কথার খেলাপ হইলে বেহাই বলে' খাতির করিব না।"

পরেশনাথ অতঃপর সহধর্ম্মিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করাইলেন। হেমন্তকুমারী ভিতরের কথা এতদিন জানিত না, কিন্তু সম্প্রতি সে তেরবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার কাছে কোন কথা গোপন রাখা মাতা আর কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। হেমন্ত যদি শুনিল, নলিনী না শুনিবে কেন? সে সকল বিষয়ে পিতামহীর শিষ্য, ছেলেবেলা হইতে কোন কথা তাঁহার কাছে লুকাইতে শেখে নাই। কিন্তু পিতার ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও ঠাকুরমাকে কিছু বলিতে পারিল না, কেন না, হেমন্ত মাথার দিব্য দিয়াছিল।

এদিকে রায়গৃহিণী বিবাহের উদ্যোগসম্বন্ধে সর্ব্বদা পরেশনাথকে তাড়া দিতেছেন। আর কুটুম্বগৃহ হইলেও ছোট-বড় সকল কথার খোঁজ রাখেন, উদ্দেশ্য—ভালমানুষ পরেশ আর জড়াইয়া না পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার সহিত খানিকটা লুকোচুরীর ভাব রক্ষা না করিলে নহে।

শেষে বৃদ্ধা একদিন গহনার ফর্দ্দ দেখিতে চাহিলেন। পরেশনাথকে বলিতে হইল যে, তাঁর ভাবী বৈবাহিক কোন ফর্দ্দ দেন নাই, কোন বিষয়ে কোন দাওয়া করেন নাই। রায়গৃহিণী প্রশংসমান চক্ষে এই কথা শুনিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি কিছু না চাহিলেও অন্তত হাজার বারশত টাকার আভরণ দিতে হইবে। তার পর তিনি নাত্‌বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিজেই অলঙ্কারের ফর্দ্দ লেখাইতে বসিলেন। লেখিকা স্বয়ং হেমন্তকুমারী।

সেদিন পিতামহীর সঙ্গে নলিনীনাথও গিয়াছিল। বেলা পড়িয়া যায় দেখিয়া সে শশুরালয়ের অন্দরে ঠাকুরমাকে আনিতে গেল। যেখানে বৃদ্ধা ফর্দ্দলেখিকার সঙ্গে প্রায় সমবয়স্কার মত পরামর্শ আঁটিতেছিলেন, এবং সে মাথায় কাপড় দিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া বারংবার তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিতেছিলেন, নলিনী সহসা সেইখানে দেখা দিল। ঠাকুরমার আজ পর্য্যন্ত বর-কনেকে এভাবে একত্র দেখার সুযোগ ঘটে নাই, অতএব তাঁর ভারি আমোদবোধ হইল। ওদিকে তিনি যে নাত্‌বৌয়ের মাথার কাপড় ফেলিয়া-দিয়া তাহার অঞ্চলটা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা আর মুক্ত করিলেন না। নলিনী মহা লজ্জায় পড়িয়া

গেল, মুক্তাবগুণ্ঠনা নতমুখী ভার্য্যার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইল। রায়-গৃহিণীর অনুরোধে তাহাকেও কাছে বসিতে হইল। তখন তিনি উভয়ের চিবুকস্পর্শ করিয়া আদর ও চুম্বন করিলেন। এই মুহূর্ত্তটুকুর সুখানুভব করিতে করিতে বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতি সহসা তাঁহার চিত্তে উদিয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বিমনা হইলেন।

নলিনী অপ্রস্তুতভাব দূর করিবার উপায়ান্তর দেখিতেছিল না। গহনার তালিকা দেখিয়া না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিয়া বসিল, "ঠাকুরমা, বউএর জন্যে দুইহাজার টাকার গহনা গড়ান হচ্চে, আবার এ কিসের ফর্দ্দ?"

কথাটা বলিয়া-ফেলিয়াই তাহার জ্ঞান হইল যে, কাজ ভাল হইল না। কিন্তু তখন আর লুকান যায় না। রায়গৃহিণী প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া আসল কথা জানিয়া লইলেন। বাড়ী ফিরিয়া-গিয়া পুত্রকে চিঠি দিলেন যে, তিনি আর তাহার মুখদর্শন করিতে চান না এবং নলিনীর স্ত্রীকে গৃহে আনিয়া মাঘমাসে স্বয়ং কাশীবাস করিতে যাইবেন।

পরেশনাথ প্রথমা কন্যার জন্য যে দুই-হাজার টাকার গহনা গড়াইয়াছিলেন, দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের রাত্রে, রায়গৃহিণী নিজে বাসরঘরে বসিয়া সেগুলি নবপরিণীতাকে পরাইয়া দিলেন। তার পর নাতবউয়ের দ্বিরাগমনের ব্যাপার শেষ হইলেই তিনি কাশী চলিয়া গেলেন।

নলিনী ঠাকুরমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, বৎসরের অধিকাংশ কখন একাকী, কখন বা সস্ত্রীক, তাঁহার কাছে থাকিত। অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতে পারিল না। কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন, "বাণী আমার সত্যরক্ষা করে নাই। টাকাই কি এত বড়?"

অন্তিমশয্যায় মাতা বাণীনাথকে বলিয়া-ছিলেন, "এতদিনে তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। মনে রেখো, ধর্ম্মের বাড়া ধন নাই।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

কুমারসম্ভব।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

"'সাত-ঋষি'-পূজাশেষে ফুল আসে ভেসে ভেসে—
সুরধুনী হেসে হেসে নামেন বরিতে,
তাহাতেও নগরাজ নাহি হন তত আজ
পরিপূত, যত আজ ও-শুভচরিতে (৫৭)

"ধন আর কামনায় করিয়াছ পরিহার—
সেবিতেছ অনিবার কেবল ধরম ;
হে ভাবিনি ! আমি তাই ভাবিতেছি, তবু ঠাঁই
এ তিনের শেষটাই পরম চরম ! (৩৮)

"আজি এত সমাদর দেখালে আমার 'পর !
হে সুতনু, মোরে পর ভেবো নাকো আর—
বলেছেন বুধগণ—'সেই ত আপন জন,
যার সাথে আলাপন সাতটি কথায় !' (৩৯)

"জানি' তুমি ক্ষমাবতী, এবে এ চপলমতি
দ্বিজ কিছু তোমা' প্রতি পুছিবারে চায় ;
শুন অয়ি তপোধনে ! বড় আশা করি মনে,
গোপন নহিলে, ক্ষণে বলিবে তাহায় :—(৪০)

"জনম তোমার মূলে আদিবিধাতার কুলে,
ত্রিলোকমাধুরী তুলে' তনুটি তোমার !
ধনসুখ মনোমত, বয়স নবীন অত !
সাধনার ফল কত, বল চাহি আর ? (৪১)

"সহি' ঘোর অপকার মহীয়সী মহিলার
হ'তে পারে অনিবার এ হেন মনন—
বিশেষ বিচার করি' দেখিলাম কৃশোদরি !
সেও ত তোমার 'পরি ঘটে নি কখন ! (৪২)

"রূপ যার মধুঢালা স'বে না সে দুখজ্বালা—
গৃহে তব চারুবালা ! কোথা অবমান ?
পীড়া না দিবেক পরে,—মণিশলাকার তরে
ফণিনীর শিরে করে কে করপ্রদান ! (৪৩)

"যৌবনে, এ কি মরি—আভরণ পরিহরি'
রহিয়াছ চীর পরি' প্রাচীনের ভূষা ?
শশিতারা ভরে' সাঁঝে রজনী মধুরে রাজে,
সে কি রে অরুণে সাজে, না হইলে ঊষা ! (৪৪)

"যদি গো বরগে আশ, বৃথা তবে এ আয়াস,—
তোমার পিতার বাস ত্রিদিবভূমি যে !
স্বামী যদি চাহি, তবে প্রয়োজন নাহি তপে—
রতনেরি খুঁজে সবে, সে খুঁজে না নিজে ! (৪৫)

"ছাড়িলে দারুণ শ্বাস ! বুঝিনু বরেই আশ ;
আমার এ দ্বিধা নাশ কর তুমি তবু—
কোনো-কিছু নাহি যার মনোমত চাহিবার,
চাহিলে কি সে আবার নাহি পায় কভু ? (৪৬)

"তুমি চাহ যে যুবায়, সে এত নিঠুর হায় !
হেরি' তব এ দশায় রয়েছে কি করে'—
ঘুচেছে কমলছল ; ধানের শীষের তুল
পাটল জটিল চুল গালে লুটি' পড়ে ! (৪৭)

"তপজপে অবিরত শুকায়েছে দেহ কত !
গহনার ঠাঁই যত দহে রবিকর !
দিবা শশিলেখাপ্রায় নিরখি' ও কৃশ কায়
কোন্ সহৃদয় হায় হবে না কাতর ! (৪৮)

"বুঝিলাম তব প্রিয়, রূপের গরবে স্বীয়
ঠকেছেন ও অমিয় মুখানি ভুলিয়া ;
আঁখিপুটে বলিহারি কুটিল রোঁয়ার সারি—
দেখিল না আজো তারি নয়ন খুলিয়া ! (৪৯)

"ওগো, আর কতদিন শ্রমে তনু হবে ক্ষীণ ?
আমারো ত যোগাধীন সুকৃতি রয়েছে !
তাহারি আধেকে লও' মনোমত বর তব—
কে তবে সে জানি' লব বাসনা হয়েছে !" (৫০)

হৃদে হেন পশি' দ্বিজে শুধাইলা সাধ কি যে ;
লাজে নগবালা নিজে বলিতে না পারে !
কাছে ছিল সহচরী, ফিরায়ে তাহার 'পরি
কাজলবিহীন মরি দুটি আঁখি ঠারে ! (৫১)

যতিরে কহিল আলি—"যদি এত কুতূহলী,
হে সাধু, শুনুন বলি, ইনি যে কারণে
এ কোমল তনুলতা করেছেন তপে রতা—
কমলের দল যথা রোদনিবারণে!—(৫২)

"দেবরাজ-আদি চারি দিক্‌পাল ভারি ভারি
অবহেলে সবে ছাড়ি' শুধু এ মানিনী
করেছেন দৃঢ় পণ পেতে পতি ত্রিনয়ন—
স্মরজিৎ—রূপে মন ভুলিবার যিনি! (৫৩)

"অতনু যে বাণ ছুঁড়ে' হরকোপে যান পুড়ে',
সেই সে সায়ক ঘুরে' অঘোর-গরজে
না সহি' আসিল ফিরে, পরিহরি' পিনাকীরে
গিরিজারি হৃদি চিরে' বিঁধিল বড় যে! (৫৪)

"সে হ'তে পিতার ঘরে সখি মোর জরজরে;
শীতল তিলক করে অলক ধূসর!
দিশে নাহি পায় বালা কিসে যে জুড়ায় জ্বালা—
বিফলে তনুয়া ঢালা হিম-শিলা'পর! (৫৫)

"সখী সুর-গায়িকায়—রাজার কুমারী তারা—
হর-জয়গীতি-ধারা ছাড়ে বনপাশে!
শুনি' মনোব্যথাভরে উমার না কথা সরে,—
দেখি' তারা আঁখিলোরে কতদিন ভাসে! (৫৬)

"রাত্তি তি-পহর পরে যদি বালা ক্ষণতরে
আঁখিদুটি মুদিত রে, জাগিত অমনি
স্বপনে কহিয়া কথা—'অয়ি দেব যাও কোথা!'
মিছে গলে ভুজলতা বাঁধিত রমণী! (৫৭)

"বলেছে জ্ঞানীরা সবে—'তুমি আছ সারা ভবে;
এ ভকতজনে তবে কেন জিগাস' না?'
এত বলি নিজ করে আঁকা ছবিখানি'পরে
সরলা নিরলে হয়ে করে ভৎসনা! (৫৮)

"যখন দেখিল এবে—লভিতে সে মহাদেবে
আর ত উপায় ভেবে নাহি পায় মনে,
তখন পিতারে কয়ে' সখী আমাদেরে লয়ে'
ব্রত লাগি' আসিল এ দূর তপোবনে। (৫৯)

"সেই যে আসিয়া তপে সখী নিজে তরু রোপে,
সাধনায় সে পাদপে দেখা দিল ফল!
ফল-ধরা' থাক্ দূরে, যে বাসনা শশিচূড়ে,
আজো তার বীজ ফুঁড়ে' উঠিল না দল! (৬০)

"না জানি সে দেব কবে সখীরে সদয় হবে!
মোদের এ চোখে ব'বে কত আঁখিধার
হেরি' ওরে তপে ক্ষীণা? ধরা যেন ধারা বিনা!—
করুণা ঝরিবে কি না নভোদেবতার!" (৬১)

গিরিজার গূঢ় চিত সখী ছিল সুবিদিত—
খুলিল সে সকলি ত চারু দ্বিজরাজে;
"অয়ি! সহচরীভাষ প্রকৃত, না পরিহাস?"
পুছে যতি মনোহাস চাপি' মনোমাঝে! (৬২)

যতিবর কুতূহলে—এতেক পুছিলে ছলে,
মুকুলিত করতলে রাখি' জপমালা,—
লাজে অবনত মাথা,—কোনমতে গোপাগাঁথা
চিরবিরচিত গাথা কহে নগবালা—(৬৩)

"হে দ্বিজ, শুনিলে যাহা সকলি প্রকৃত তাহা—
চাহিছে এ জনা আহা উচপদ অতি!
সেই পদ লভিবার মিছে তপ এ আমার—
তবু হায় বাসনার নাহি যে অগতি!" (৬৪)

তখন তাপস ভণে—"জান ত সে জিনয়নে,
তারি আশা তব মনে উঠিয়াছে পুন?
অশুভ-আচারে যার অনুরাগ অনিবার
কভু না সেবিবে তায়, বলিতেছি শুন! (৬৫)

"কি ছার বিষয় প্রতি মজেছে তোমার রতি !
না জানি লো গুণবতি ! কেমনে আগু যে
বিবাহের সূতা-পরা' তব হাত দিবে ধরা
ভুজগ-বলয়ে ভরা' পিনাকীর ভুজে ! (৬৬)

"তুমি নিজে বিবেচনা করি' কেন দেখিছ না,
উভয়ের এ যোজনা মানাইবে কি রে—
বধূর দুকূলবাস আঁকা যাহে কলহাঁস,
আর গজাজিনপাশ ভিজে যা' রুধিরে ? (৬৭)

"ফুলে-ছাওয়া মেজে'পরে সদা যে চরণ চরে—
চলিতে-ফিরিতে ঝরে আলতার আলো !
বেড়ালে শ্মশানে এসে' ছড়ানো মড়ার কেশে,
অরাতিও হেন কে, সে বলিবেক ভালো ? (৬৮)

"অনুচিত এর পরে কি আছে বলহ মোরে—
তুমিও শিবের ক্রোড়ে পড়িবে সহজে !
কোথা উরসিজদুটি সুরভিতে রবে ফুটি,'
তা' না হ'য়ে লুটোপুটি খাবে চিতারজে ! (৬৯)

"আরেক মজার কথা, শোন লো কনকলতা !
গজরাজে তুমি কোথা সাজিয়া আসিবে—
তা' না, তোর বিয়ে সেরে' বুড়া বাঁড়ে চড়াবে রে,
মহতে যে তাহা হেরে' মুচকি' হাসিবে ! (৭০)

"পিনাকীর সহবাস যখন করেছ আশ,
তখন উভয় আজ লভিল শোচনা—
সুবিমল শশিকলা ভালে আগে সে বিকলা,
তুমিও হইলে মলা জগতজোছনা ! (৭১)

"উগ-আঁখি বপুখানা ! কুলেরি বা কি ঠিকানা !
ধন যত গেছে জানা দিক্-বসনেই !
লো মৃগনয়না, বরে লোকে যা' যাচনা করে,*
তাহার যে হেন বরে কিছু লেশ নেই ! (৭২)

* কন্যা রূপ, মাতা ধন, বিদ্যা চান পিতা ;
জ্ঞাতিরা চাহেন কুল, অপরে মিষ্টতা।

"এ কু-আশা হ'তে অহো! মানস ফিরায়ে লহ;
কোথা সে পিনাকী কহ, তুমি শুভে! কোথা?—
কে সাধু শ্মশানপাঁকে আরোপিত শূলটাকে
যূপসম পূজে' থাকে, বেদে বিধি যথা?" (৭৩)

দ্বিজ যদি এইমত প্রতিকূলে বলে কত,—
অধরে ক্রোধের স্রোত বাধা নাহি মানে,
ভ্রুলতা বাঁকাইয়া আঁখিকোণ রাঙাইয়া
রহে উমা তাকাইয়া কুটিল নয়ানে! (৭৪)

বলে শেষে—"তুমি হয়ে জান নাকো ভাল করে',
তাই ত আমার 'পরে কহিছ এমন!
সাধুদের সদাচার সাধারণে বোঝা ভার—
না বুঝিয়া হেতু তার, দুষে যে কুজন! (৭৫)

বিপদ হরিয়া নেবে, অথবা বিভূতি দেবে,
তাই লোকে সদা সেবে শুভ বাস-হার—
যিনি জগতের গতি, বাসনাবিহীন অতি,
আশা-কলুষিত-মতি এ-সবে কি তাঁর? (৭৬)

"কিছু তাঁর নাহি বটে, তবু ধন তাঁহে ঘটে!
নিবসে শ্মশানতটে ত্রিভুবনভূপ!
ভীষণমূরতি প্রভু শিব শোভাময় তবু—
হায় তাঁর কেবা কভু জানিবে স্বরূপ? (৭৭)

"ভূষণে ভাসুক শোভা, বাঁধা থাক্ ভুজগ বা,
চকুল খুলুক প্রভা, কিবা গজাজিন,
মাথায় মড়ার খোলা উঠুক বা শশিকলা—
কিছুতে না যায় বলা সে তনুর চিন্! (৭৮)

"অই দেহে লভি' ঠাঁই পূত যে চিতার ছাই,
তাহে আর ভুল নাই—দেখেছ আপনি,
নাচিতে নাচিতে শূলী ঝরিলে গায়ের ধূলি,
দেবতারা লন তুলি' মাথায় অমনি! (৭৯)

"কাঙাল সে, যাঁকে ফেরে? সুরেশ যে তাঁরে হেরে'
মাতোয়ারা হাতী ছেড়ে পড়েন চরণে!—
লুটিতে মুকুট খুলি' ফোটা-পারিজাত-ধূলি
রাঙায় আঙুলগুলি অরুণ বরণে! (৮০)

"অসংস্বভাববশে শূলীরে ফেলিতে দোষে
তোমারো রসনা ঘোষে ভাল এক কথা—
দেবাদি কমলযোনি যাঁ হ'তে লভিলা জনি, *
তাঁহার জনমধনি কে জানিবে কোথা! (৮১)

"আর না, হয়েছে ঢের—কাজ নাই বিবাদের!
হোক সে শতেক-ফের জান যা', তাপস!
তাঁহাতেই মোর মন মজি' আছে অনুখন—
না ডরে প্রেমিকজন পর-অপযশ! (৮২)

"নিবার' নিবার', সখি! আবারো এ বটু, লখি,
কি-যেন উঠিবে বকি,'—ঠোঁট করে ফাঁক!
সাধুরে যে অপভাষে তারে শুধু পাপে টানে
তা' নয়,—যে শোনে কানে সেও পাপভাক্! (৮৩)

"হেথা হ'তে, দূর-ছাই! আমিই চলিয়া যাই"—
বলি' বালা ছুটে যাই, বুকে টুটে চীর!
অমনি স্বরূপ ধরে' হর মৃদু হাসিভরে
গিরিজারে ভুজডোরে বাঁধিলেন দৃঢ়! (৮৪)

নিরখি' শঠে শিহরি' ওঠে, অঙ্গে স্বেদবিন্দু!
কমলপদ তুলিয়া শুধু করিবে যদি ন্যস্ত—
পথের মাঝে অচলরাজি-আকুলা যেন সিন্ধু,
নগাধিরাজকুমারী আজ 'ন যযৌ ন তস্থৌ'! (৮৫)

---

* জন্ম, উৎপত্তি।

"আজি অবধি হে পার্ব্বতি! হইনু দাস তব,—
কিনিলে মোরে সাধনা-মূলে," কহিলা ব্যোমকেশ।
ঝটিতি বালা যতেক জ্বালা ভুলিলা তপোভব!
লভিলে ফল, নবীন বল প্রদানে পুন ক্লেশ। (৮৬)

শ্রীবিহারিলাল গোস্বামী।

৺ অক্ষয়কুমার দত্তের কথা।

১

আমাদের আদরের চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি ও ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের প্রণেতা অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর ঊনবিংশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ১২৯৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চরম-পত্রের অভিপ্রায়মত আমি অনেক "এক্‌জিকিউটার"স্বরূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছিলাম।; অধুনা তাঁহার একমাত্র পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিষয়াভিজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার উপর ভার দিয়া আমি অবসর-গ্রহণ করিয়াছি। এই সময়ে তাঁহার সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অক্ষয়কুমারের সহিত যে সকল লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁহাদের অনেকেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমি বয়সে ও তাঁহার মমতায় পুত্রস্থানীয় ছিলাম, আমিই বার্দ্ধক্যে উপনীত। বোধ হয়, আর কয়েকবৎসর পরে তাঁহার অন্তর্জীবনের কথা বলিবার আর কেহই থাকিবে না।

১২৮০ সালে চৈত্রমাসে বালীর গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আমি প্রথম অক্ষয়কুমারকে দর্শন করি। তিনি তখন পীড়িত অবস্থায়। বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া ও সংসারে বিরক্ত হইয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বিরহিত-ভাবে বালীতে বাস করিতেছিলেন। তখন বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পত্র ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ তাঁহার পরিবার। গুরুতর চিন্তা করিতে তিনি তখন অসমর্থ; গুরুতর কেন, সামান্য চিন্তা করিতেও তিনি অসমর্থ। সাংসারিক বা বৈষয়িক কোন বিষয়ের চিন্তা আবশ্যক হইলে,—কর্ত্তব্যনিরূপণ করিতে হইলে, তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইতে হইত। আমার শ্বশুর, ৺ স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের জামাতা, ৺শ্রীনাথ ঘোষ ও ৺রাজার দৌহিত্র ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমারের পরম বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁহাদের নিকট তিনি উচ্চশ্রেণীর গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের বৈষয়িক ও সাংসারিক চিন্তাকার্য্যের ভার, প্রায়ই এই দুইজনের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের অভিপ্রায়মত সকল কার্য্য হইত। চিন্তা

করিবার ক্ষমতা ছিল না, চিন্তা ধার করিতে হইত; তজ্জন্য আমার শ্বশুর অক্ষয়কুমারকে "think-loan" বলিতেন।

অক্ষয়কুমার আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; আমারও তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে কেবল গ্রন্থের দ্বারা পরিচিত মহাত্মাকে দেখিতে কাহার না লালসা হয়? প্রাতঃকালে আমার শ্বশুরের সহিত বালীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের উপর বাটী; স্থানটিকে তিনি শোভনোদ্যান বলিতেন, কিন্তু ঋষিকুটীর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে অট্টালিকাকে "কুটীর" বলিয়া নিজের নিরভিমান দেখান; অক্ষয়বাবু কুটীরকে শোভনোদ্যান বলিতেন; তিনি "কুটীর"কেই শোভনোদ্যান বলিয়া নিজের সন্তুষ্টচিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে পূতসলিলা ভাগীরথী; ভবন বিবিধলতাবৃক্ষসমন্বিত; সংসারবিরত ব্যক্তির থাকিবার স্থান। দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একটি আম্রবৃক্ষ; মাধবীলতাসমন্বিত সহকারের পরিবর্ত্তে তাহা কণ্টকময় লতার রক্তবর্ণপুষ্পসমন্বিত। প্রথমেই বৃক্ষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দক্ষিণে অনতিদূরে অপর একটি রক্তবর্ণপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষ, ইহাও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অন্যান্য বিবিধ আকারের ও বিবিধ চিত্রের বৃক্ষলতাদি দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। সহকারবৃক্ষের উপর বুগেনভালা স্পেক্টাবিলিস্ (Bugainvalla spectabilis)। দক্ষিণের বৃক্ষটির নাম "পানসেটিয়া রিজিয়া।" এখন কলিকাতার রাস্তায় অনেক "পানসেটিয়া রিজিয়া" দেখিতে পাওয়া যায়। বাগানে বাগানে "বিউগেনভিরিয়া স্পেকটাবিলিস্।" তখন এ সকল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না; অন্তত আমি তখন দেখি নাই। দ্বিতল ইষ্টকালয়ের দক্ষিণে অনেক গোলাপের গাছ, মধ্যস্থলে একটি সুন্দর "অরেকেরিয়া এক্সেলসা"। কত রকমে অক্ষয়কুটীর সুশোভিত! তাঁহার পরিবারবর্গের সংখ্যা ও আকার ও প্রকৃতি অগণ্য ছিল!

তখন অক্ষয়কুমার একটি ছোট কাচের যন্ত্র হস্তে লইয়া কি পাতা দেখিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি সাদরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস বাবা, এখনও উত্তাপ বেশী হয় নাই; তোমাকে উদ্ভিজ্জজীবনের বৈচিত্র্য দেখাই।" বোধ হইল, যেন তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার নিকটস্থ পরিজনের সহিতও আমার সম্প্রীতি হয়,—আমি তাহাদের নাম ও প্রকৃতি বুঝিয়া লই। আমি তখনও উদ্ভিদবিদ্যার নিকটেও যাই নাই। উদ্ভিদ্‌জীবনের কিছুই জানিতাম না। বৃক্ষলতাদি ভালবাসিতাম বটে; কিন্তু অন্য চিন্তায়, অন্য পাঠে, সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম; তখনও উদ্ভিজ্জজগতের কথা একবারও চিন্তা করি নাই। অক্ষয়কুমার সেইদিন প্রথম উদ্ভিদবিদ্যার আনন্দে আমাকে দীক্ষা দিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেক বৃক্ষলতাদি ও তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখাইলেন; তৎকালে তাহাদের লিনিয়ানরীতির নামও বলিলেন। তিনি শিবপুরের "বোটানিকেল গার্ডেনে" প্রায়ই যাইতেন, নূতনরকমের উদ্ভিদ দেখিলেই তাহাকে আনাইয়া আদরের সহিত নিজের সঙ্গী করিতেন।

অক্ষয়কুমারের যত্নে ও স্নেহে আমি সিক্ত হইলাম। অনতিপূর্ব্বেই আমি "মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিনে" "বঙ্গভাষার ভাষাবিজ্ঞান" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তিনি তাহা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। ভাষাবিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তখন তিনি বপ্, কার্ক ও মোক্ষমূলার সাহেবের ভাষাবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেক মতই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মধ্য-এশিয়া হইতে আর্য্যজাতির বিস্তৃতি হওয়ার কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমিও তখন "মাক্সমুলার"সাহেবের সকল কথাই বিশ্বাস করিতাম। আমাদের প্রফেসার টনিসাহেবের সেই মত ছিল।

দ্বিতলে উঠিয়া প্রথমেই বিবিধ শঙ্খাদি ও প্রস্তরাদি দেখিলাম। প্রত্যহ পাঁচসাত-রকমের ঔষধসেবন ও দুইতিনরকম তৈলমর্দ্দনেরও ব্যবস্থা দেখিলাম। পরে গঙ্গাস্নান করিয়া আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। তিনিও ঘরের ভিতরে স্নান করিয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, আমাকে ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শঙ্খবিদ্যা প্রভৃতিতে দীক্ষা দিবার সময় আসিল। আমাকে অনেকগুলি অনেকরকমের প্রতিকৃতি দেখাইলেন ও যাহাতে আমার তত্তৎবিদ্যায় আসক্তি হয়, তাহার চেষ্টা করিলেন। আমি অনেকই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এতটুকু বুঝিলাম যে, অক্ষয়কুমার এই সকল বিদ্যায়ও সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়াছেন। পরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, তিনি প্রকৃতই বিজ্ঞানসেবক ছিলেন।

বেলা পড়িলেই তিনি আমাকে লইয়া "অর্কিড্হাউসে" প্রবেশ করিলেন। বিবিধ প্রকার অর্কিড্, ফারন্, মস দেখাইলেন, তাহাদের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য্য দেখাইলেন এবং নাম বলিয়া দিলেন। হাতে কাঁচযন্ত্র, আমাকেও তদ্দ্বারা দেখিতে বলিলেন। নিকটে একটি শাদা ফুলের গাছ ছিল, তাহা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া তাহার নাম বলিলেন এবং অন্যান্য অনেক বৃক্ষলতাদির গুণের কথা বলিলেন। পরে বেলা অবসন্ন হইয়া আসিলে আমার শ্বশুর ও আমাকে সস্নেহে বিদায় দিলেন, এবং আমি যেন সময় পাইলেই তাঁহাকে দেখিতে যাই, তজ্জন্য আমার শ্বশুরকে অনুরোধ করিলেন। সেই দিন হইতেই আমি অক্ষয়কুমারের স্নেহের পাত্র হইলাম এবং আমারও অক্ষয়কুমারকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। অক্ষয়কুমারের বসিবার স্থানে ও তাঁহার শয়ন-গৃহে ডারউইন্ ও নিউটনের ছবি, আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির নক্সা, মনুষ্য ও কয়েকটি পশুপক্ষীর প্রতিকৃতি। কাঁচের ভিতর ছবির স্থলে এই কয়েকটি পংক্তিও বড় বড় নাগরাক্ষরে লিখিত ছিল—

আর্মান বহুৎ রাখ্তেথে দিলকা চমন্মে।
বৈঠেন খুসী সে সায়েকে তলে হাম্।
কি আপশোষ দিলকা কম্বল করহি মিলনে না পায়া।
কই দিন্মে চলা যাতহো মাটিকো তলে হম্।

বাঙ্লা পদ্যে ইহার অনুবাদও ছিল।

তদবধি তাঁহার পরিচারক শ্রীরাম প্রায়ই

আমার নিকট আসিত। শ্রীরাম বাঙলা-স্কুলে পণ্ডিত ছিল। সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া অক্ষয়কুমারের নিকট নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার লেখাপড়ারও সমস্ত কার্য্য করিত। কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাম ছোট ছোট টবে কতগুলি গাছের চারা ও কলম আমাকে আনিয়া দিল। আমি যে যে রকমের পুষ্প প্রীতি-বিস্ফারিতলোচনে দেখিয়াছিলাম, তাহা অক্ষয়কুমার বুঝিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার নিকট কলম বাঁধাইয়া ও চারা প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম আমাকে বলিল যে, অক্ষয়বাবু আবার আমাকে একদিন বালীর বাটীতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। "চোর চায় ভাঙা বেড়া;" আমি কয়েকদিবসের মধ্যেই বালীতে উপস্থিত হইলাম। যে সময়ে উপস্থিত হইলাম, তখন অক্ষয়কুমার "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের" উপক্রমণিকা-অংশ শ্রীরামকে দিয়া লেখাইতেছিলেন। কোনদিন পাঁচ ছত্র, কোনদিন দশ ছত্র মুখে মুখে বলিতেন ও শ্রীরাম লিখিয়া লইত। তাঁহার নিজে লিখিবার সামর্থ্যের অভাব হইয়াছিল; অতিকষ্টে আটদশ ছত্র লিখাইয়াই ক্লান্ত হইতেন ও পুনর্ব্বার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্টবোধ হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয়-ভাগের ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা লেখাইতে পারিয়াছিলেন; এই ২৮২ পৃষ্ঠা অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তি। উপক্রমণিকায় শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন—"এবার এই পর্য্যন্ত, আর চলিয়া উঠিতেছে না......যদি কখন এই উপাসকসম্প্রদায়ের তৃতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়, তাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ইতিবৃত্ত বিনিবেশিত হইবে। এখন শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এটি একটি দুরাশা-মাত্র; কিন্তু আশায় জগতের জীবন, আশায় ইহলোক ও আকাশপথ অতিক্রম করিয়া উড্ডীয়মান হয়, শরীরের ঐপ্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা আর কি বলিব। না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থশ্রবণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যে আমি সমর্থ নহি, ইহার কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রে মানসিক কষ্ট হইয়া থাকে......অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাবসংবলিত চিন্তাপ্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে স্পষ্টই অনুভব করিতেছি; তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি; কিছুতেই সে চিন্তাস্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় ও যাহা কিছু অন্তরূপে জানিতে পারি তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তকমধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি, অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রাকাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়াও কতবার কত বিষয় লিখাইতে হইয়াছে।......এইরূপ করিয়া কখনও ৫।৭ পংক্তি ও কখনও ২।৪ পংক্তি, কখনও ২।৪টি বা ২।১টি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়।"

যে মহাত্মা এরূপ অবস্থায় এরূপ অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কি অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার কি অসাধারণ উৎসাহ, কি অসাধারণ অধ্যবসায়! এইরূপে মহাত্মা অক্ষয়কুমার ১২৮৯ সালে ৮ই চৈত্র ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়ভাগ প্রকাশ করিবার আর অবকাশ হয় নাই। এই গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্বে আমি অনেকবার তাঁহার নিকটে গিয়াছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাঁহার চরম গ্রন্থের কোন অংশ লিখনের ভার পড়ে নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কালাবশিষ্ট দেহের উত্তমভাগে বুদ্ধির, জ্ঞানের ও চিন্তার যথেষ্ট চিহ্ন ছিল। চিন্তায় অসমর্থ অথচ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে দুইতিনবার লিখাইতে দেখিয়াছি মাত্র; আমাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহার বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইত, গুরুতর চিন্তা অন্তর্হিত হইত। তিনি সকল সময়েই আমাকে উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি তাঁহার আদরের শাস্ত্রসমূহে দীক্ষিত করিবার জন্য যত্নবান্ হইতেন। যতবার গিয়াছি, ঐ সকল শাস্ত্রেরই কথা। আমিও তাঁহার শিষ্য হইয়া বিজ্ঞানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞান ভালবাসিতে শিখিয়াছি মাত্র; অক্ষয়কুমারের শিষ্য হইতে পারি নাই।

১২৯১ সালের শীতকালে, বোধ হয় মাঘমাসে, শ্রীরাম আসিয়া অক্ষয়কুমারের উইলের মুসবিদা আমার হস্তে দিল। তাঁহার ইচ্ছা যে, আমি তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিই। অনেকেই অক্ষয়কুমারের উইল বা চরমপত্রের নকল দেখিয়া থাকিবেন; অন্তত অনেকেই শুনিয়াছেন। বোধ হয়, এতদিনের কথা অনেকেরই মনে নাই। তাঁহার পুত্রপৌত্র ও কন্যা বর্ত্তমান, অথচ তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির ⅔ ভাগ বিজ্ঞান-আলোচনা, বিদ্যোৎসাহবর্দ্ধন, দরিদ্রদুঃখ-বিমোচন, বালকগণের শরীরপুষ্টির জন্য অর্পণ করিয়া যান। উইলের মুসবিদা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া ও যতদূর সম্ভব আইনসঙ্গত করিয়া আমার এক মুহুরিকে আমি নকল করিতে দিলাম। মুহুরি যথাযথ নকল করিল, কিন্তু একটি কথা অধিক লিখিয়াছিল। সে হিন্দু, মুসবিদার শিরোভাগে "শ্রীশ্রীহরি" লিখিয়াছিল। আমার সংশোধিত মুসবিদা ও তাহার নকল, আমি শ্রীরামের হস্তে পাঠাইয়া দিলাম। শ্রীরাম ৩।৪ দিবস পরে আসিয়া আমাকে বলিল যে, শিরোভাগের লিখিত "শ্রীশ্রীহরি" শব্দ লিখায় অক্ষয়বাবুর আপত্তি আছে, ও তিনি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। প্রায় একসপ্তাহ পরে এক রবিবারে আমি বালীর শোভনোদ্যানে উপস্থিত হইলাম। আহারের পর গিয়াছিলাম বলিয়া তিনি একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন। প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীনাথ ও আনন্দকৃষ্ণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যাসাগরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অন্যান্য কথার পর তাঁহার উইলের কথা তুলিলেন। প্রথম কথা—উইলের উপরিভাগে ঈশ্বরের কিংবা কোন দেবতার নাম না লিখিলে কি চলে না? আমি বলিলাম—"কিছুই লিখিবার প্রয়োজন নাই; তবে

বাঙ্লায় উইল হইলে প্রায়ই কোন-না-কোন দেবতার নাম লিখা হইয়া থাকে।” তিনি বলিলেন—“তবে বিশ্ববীজ লিখায় কি কোন আপত্তি আছে?” আমি বলিলাম—“কোন আপত্তি নাই; কিছুই না লেখায়ও ক্ষতি নাই।” তৎকালে অক্ষয়কুমারের মনের গতি কোন্দিকে চলিতেছিল, তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা এই কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারা যায়। তিনি তখন প্রকৃতিবাদী হইয়াছিলেন। আধুনিক-বিজ্ঞান-অধ্যয়ন ও সাংখ্যাদিদর্শন-অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ধর্ম্মবিশ্বাসের বিপ্লব হইয়াছিল।

তাহার পর উইলের একটি দফা পরিবর্ত্তনের কারণ আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, “অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দান করা যায় না।” সুতরাং আমার সংশোধনই তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি উইলের “একজিকিউটার” হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, “শ্রীনাথ আমার অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ। শ্রীনাথের পরিবর্ত্তে তোমাকে ভার লইতে হইবে।” অগত্যা আমি সম্মত হইলাম, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষাশেষি তাঁহার উইল সম্পাদিত হইয়াছিল। আমি উইল-দস্তখতের সময় উপস্থিত ছিলাম না।

কিছুদিন পরে অক্ষয়কুমার আমাকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখিলাম, তাঁহার শরীর আরও শীর্ণ হইয়াছে; বোধ হইল, জীর্ণশরীর আর বহুদিন তিনি বহন করিতে পারিবেন না। তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল, দেখিয়া তাহার একটি তালিকা করিতে বলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই পুস্তকগুলি বিশবৎসর আমার নিকটে থাকে ও সাধারণে পড়িতে পারে। সেইদিন অনেকগুলি পুস্তক আমি খুলিয়া দেখিলাম ও দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তিনি সকলগুলি পড়িয়াছিলেন অথবা অপরের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। পেনি সাইক্লোপিডিয়ার ধারে ধারে অনেক স্থলেই বাঙ্লায় তাঁহার অভিপ্রায় লিখা আছে। “এশিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণাল্” প্রায় সমস্তই ছিল এবং পাশে পাশে বাঙ্লায় তাহার টিপ্পনী। গণিতশাস্ত্রের অনেক পুস্তক্ ছিল, এমন কি “ক্যাল্কুলাস্”ও তিনি পড়িয়াছিলেন। ফ্লাক্সানেও (fluxion) তাঁহার টীকা। জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরিক বিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান, প্রায় সকল-প্রকার বিজ্ঞানেরই পুস্তক ছিল ও সকল পুস্তকই তিনি পড়িয়াছিলেন, সকল পুস্তকেই তাঁহার টিপ্পনী। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮বৎসর পুস্তকগুলি আমার নিকটে ছিল, অনেকসময় আমি তাহার অনেকগুলি দেখিয়াছি; তাঁহার অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। অনেকে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাগারের শোভা বর্দ্ধিত করেন, অনেকে পরের উপকারার্থ বিবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন; অক্ষয়কুমার তাঁহার সংগৃহীত পুস্তক সমস্তই পড়িতেন বা পাঠ করাইয়া শুনিতেন ও তাহার স্বাদ সংগ্রহ করিতেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। উপাসক-সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা পড়িলে তাঁহার বিদ্যানুশীলনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পুস্তকের তালিকা আপনারা শুনিতে চাহিলে আমি শুনাইতে পারি, কিন্তু বোধ হয় এখন তাহা অনেকেরই তৃপ্তিদায়ক হইবে না।

তাঁহার মৃত্যুর ২।৩মাস পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি আরও শীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেক কথার পর আমাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি ত উইল অনুসারে আমার সম্পত্তির পর্য্যালোচনা করিবে, কিন্তু আমার মৃতদেহসম্বন্ধে একটি কথা আছে; আমার মৃত্যুসংবাদ পাইলেই তুমি এখানে আসিবে, যতক্ষণ তুমি না আসিবে, আমার সৎকার হইবে না। ডাক্তারদ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সৎকারের আদেশ দিবে, কিন্তু মৃত্যুর পর অন্তত ছয়-ঘণ্টা সৎকার হইবে না।" এই কথার উদ্দেশ্য কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না, আমিও তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম।

মৃত্যুর দুইএকমাস পূর্ব্বেও বিজ্ঞানে তাঁহার এরূপ আসক্তি ছিল যে, তিনি বিলাত হইতে প্রায় ১৫০৲ টাকা মূল্যের ভূতত্ত্বের নমুনা (specimen) আনিবার বন্দোবস্ত করেন। সেগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল।*

ব্রতধারণ।†

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি বা আমার কোনো নূতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার মনে নাই।

আমার কথা নূতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হবে না বলিয়াই, আমি আজ সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারী-সমাজের নিকট সুস্পষ্টরূপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার এই উদ্যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে

* এই প্রবন্ধ সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে গত ১০ই শ্রাবণ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্. এ., বি. এল্., মহাশয়-কর্ত্তৃক পঠিত।

† কোন "স্ত্রীসমাজে" জনৈক-মহিলা-কর্ত্তৃক পঠিত।

আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু-না-কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে দুর্যোগ বলিব কি? এই যে দিগ্‌দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এই যে বিদ্যুতের আলোক এবং বজ্রের গর্জ্জন আমাদের হৃৎপিণ্ডকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই যে জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল—এই দুর্যোগকেই যাহারা সুযোগ করিয়া তুলিয়াছে, তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনি স্কন্ধে হল লইয়া কৃষককে কোমর বাঁধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয়, তবে সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। যে এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে,—কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড় দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, —নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"। আজ আসন্ন-বিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালী এ কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা, তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয়'ত সহ্য হইয়া যাইবে—অপমানে যাহা শিখিয়াছি, তাহা হয় ত আবার ভুলিয়া-গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্য প্রস্তুত হইব। যে দুর্ব্বল, যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ইহাই দুর্ভাগ্য—দুঃখ তাহাকে দুঃখই দেয়, শিক্ষা দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই দুঃসময়ের দান গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্‌দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকূলতা, আজ দৈবকৃপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিস্মৃত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মত আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে খাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না—তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে খাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক—পুরুষের মত আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার দুর্দ্দিনে আমাদের পুরুষেরা কি কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? জানি না, এখনো তাঁহারা যথার্থ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!"

যে নির্জ্জীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক-বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয় ত এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজদ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্র-পারে যাইতে হইবে! সমুদ্রের এ পারেই কি, আর ও-পারেই কি, অনন্তশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে—তাঁহাদের বহুদিনের বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা খিলানে-খিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে—এখন তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটীর আশ্রয় করাও নিরাপদ্। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্য একটা মর্ম্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে পুরুষেরা কে কি ভাবে সাড়া দিবেন, তাহা জানি না—কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কন্যা নহি? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে? দেশের দুঃখ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না?

ভগিনীগণ, আপনারা হয় ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি করিতে পারি—দুঃখের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কি না করিতেছি, তাই দেখুন্! আমরা পরণের শাড়ী কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন্, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতী দোকানের, আমরা শয়নে-স্বপনে বিলাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা প্রতিদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া বিলাত-দেবতার পায়ে রাশিরাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতেও যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথাও বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়,—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া-দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের বেশভূষার সখ্ মিটাইব না? আমরা, ভাল হউক্, মন্দ হউক্, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিষ ব্যবহার করিব।

ভগিনীগণ, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দোহাই দিবেন না! সৌন্দর্য্যবোধ অতি উত্তম

পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চজিনিষ আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিষে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে; কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয়, তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্য্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড় করিবার দিন আজ নহে—সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত; তখন জননী বেনারসি শাড়ীখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না—তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্য্যবোধের দাবী?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ, করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ—ইহাদিগকে ঠেলিয়া-নড়ানো বড় কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মত চাঁদার খাতায় সহি দেওয়া সহজ। কিন্তু বড় কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে, যখন ধর্ম্মের শঙ্খ বাজিয়া উঠে, তখন, যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত তাহাতেই আনন্দ, সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, দুঃসাধ্য বলিয়াই সুখ।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুতমহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে, তখন সুবিধা বা সৌন্দর্য্যচর্চ্চার কথা ভাবে নাই—ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি-বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে—সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্ম্মের বীর্য্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি, তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই—স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্য্যদ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দ্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া সৌখীনতা করিতে যাইব না।

দেশের জিনিষকে রক্ষা করা—এও ত রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালবাসিতে জানি! ভালবাসা চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া নূতনের কুহকে চারিদিকে ধাবমান হয় না। আমাদের যাহা আপন, সে সুশ্রী হউক্ আর কুশ্রী হউক্, নারীর কাছে অনাদর পায় না—সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গ-সাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসঙ্কোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিতপুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈফিয়ৎ দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ীর ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা

আজ্ঞা, তাঁহাদের সে লজ্জার ভার আমরাই বহন করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ ত সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে! যে বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলা-দেশের শিশুসন্তানেরা- তাহারা কালোই হউক্ আর ধলোই হউক্—পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে—বঙ্গসাহিত্যও সেই বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের দুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি-পুরুষ বিলাতী কাপড় পরিয়া সর্ব্বত্র নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন, সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণ বিদেশীবেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয়বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে, ইহা আমাদের স্ত্রী-প্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অসঙ্গত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইয়াছেন যে পুরুষ, তিনিও আপন স্ত্রীকন্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই, দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নূতন-ত্বের বন্যায় দেশের অনেক জিনিষ, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃতকক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্যার উপদ্রব এক-দিন যখন দূর হইবে, তখন নিশ্চয়ই তাহা-দের খোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহ-শীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

অতএব আজ আমরা যদি আর সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্ত্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশঙ্কা আছে যে, আমা-দের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা কয়জনে দেশী-জিনিষ ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেষ্টর্ ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভার্পুল্ বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!

সে কথা জানি। ম্যাঞ্চেষ্টরের কল চিরদিন ফুঁসিতে থাক্, রাবণের চিতার ন্যায় লিভার্পুলের এঞ্জিনের আগুন না নিভুক্! আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্ত্তে দেশীজিনিষ ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান্। বস্তুত আমাদের এই যে চেষ্টা, ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা সহজে না হউক্, অন্তত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ঔৎসুক্যকে যে কায়ে-মনে-বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে -নতুবা দুইদিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীর রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্ট-

রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে, যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম, ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব, ততদিন পর্য্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে—সে যেন অহঙ্কার অনুভব না করে! অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্ব্বদা যেন এই কথা স্মরণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্! আমরা যে অপমানিত হইতেছি, ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি! আমরা নিজেকে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়ের অনুকূল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিষে গৌরববোধ না করি; বিলাতী আস্‌বাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সে কষ্টই আমাদের গৌরবের কারণ হইবে। সেই কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি এই—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

যাহা-কিছু পরবশ, তাহাই দুঃখ; যাহা-কিছু আত্মবশ, তাহাই সুখ।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়-স্বজনের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘ-কালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালীর সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রতগ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে—তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

ত্রিবঙ্কুর।

১০

প্রভাতে, বায়সদিগের অশুভ কোলাহলের মধ্যে, মন্দিরের প্রাতঃপূজা যখন শেষ হইল, সেই সময়ে একটা গাড়িতে উঠিয়া আমি যাত্রা করিলাম। প্রথমেই ত্রিবন্ত্রমের বন্দরে উপনীত হইলাম। এই মধুর রমণীয় সূর্য্যোদয়কালে, আর একবার—এবং এই শেষবার—নারিকেলবনাচ্ছন্ন ত্রিবন্ত্রমনগরের মধ্য দিয়া চলিতেছি।

আজ রাত্রে একটা ঝড় উঠিয়া, রাস্তার রক্তিম ধূলা, ছোট ছোট মেটে দেয়ালের উপর—সুধালিপ্ত গৃহছাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছে; তাহাতে করিয়া, যেন একপ্রকার লাল আলোকে, গৃহগুলি দৃষ্ট হইতেছে। আবার স্থানে-স্থানে, স্তবকে-স্তবকে পুষ্পরাশি তরুসমূহের চূড়াদেশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছে।

প্রভাতে মহারাজার সিপাই-শান্ত্রি বিভিন্ন স্থানে বদ্‌লি হইয়া দলে-দলে যাতায়াত করিতেছে;—অস্ত্রশস্ত্রে ও উষ্ণীষে তাহাদের দেখিতে খুব জম্‌কাল। একদল লোক শান্তভাবে গির্জার অভিমুখে চলিয়াছে; কেন না, আজ রবিবার। ইহারা ক্ষুদ্র বালিকা, মলমলচাদরে অবগুণ্ঠিতা—হস্তে একএকখানি গ্রন্থ। ইহাদের অধিকাংশই প্রাচীনখৃষ্টানবংশীয়; ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ, আমাদের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, খৃষ্টভক্ত। এই সিরীয় অথবা ক্যাথলিক্ খৃষ্টানদের গির্জা হইতে ঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই গির্জ্জাগুলি হিন্দুমন্দিরের সন্নিকটে এবং সেই একই হরিৎশোভার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। দেখিলে মনে হয়, শান্তি, সুশৃঙ্খলা, নির্ব্বিঘ্নতা ও পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা এখানে পূর্ণভাবে বিরাজমান।

নৌকারোহণের ঘাট;—ইহাই ত্রিবন্দ্রের বন্দর। কিন্তু বন্দর বলিলে যাহা বুঝায়—এ সেরূপ বন্দরই নহে;—অর্থাৎ সমুদ্রের বন্দর নহে। কেন না, এখান হইতে সমুদ্র অনধিগম্য। এই বন্দরটি বিস্তৃত বিলের ধারে অধিষ্ঠিত। শতশত অচল-স্থির নৌকার মধ্যে একখানি নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এটি রাজার নৌকা। ইহা দেখিতে কতকটা সেকেলে সুদীর্ঘ রণতরীর ন্যায়; ইহার চোদ্দটা দাঁড়; পশ্চাদ্ভাগে একটি কাম্‌রা;—এই কাম্‌রার মধ্যে পা-ছড়াইয়া ঘুমানো যায়। চৌদ্দজন দাঁড়ী চোদ্দটা সরু বাঁশের দাঁড় যন্ত্রের ন্যায় একসঙ্গে ফেলিতেছে। এই যন্ত্র—তাম্রাভ মানবদেহ;—সুনম্যতা ও বল যেন মূর্ত্তিমান্।

নিবিড় তালবনের মধ্যে, সূর্য্যালোকে, এই বিলটি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল। এই গভীর বিলটি বরাবর সোজা চলিয়াছে। যাত্রারম্ভের সময়, দাঁড়ীরা গান গাইয়া, চীৎকার করিয়া, আপনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কীটাণুসঙ্কুল এই আবিল

জলরাশি আমরা ভেদ করিয়া চলিলাম। ত্রিদিবসব্যাপী নিঃশব্দ জলযাত্রার আজ এই প্রথম আরম্ভ।

বিলের দুইধারে তালতরুপুঞ্জ অফুরন্ত পর্দার ন্যায় একটার পর একটা ক্রমাগত আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে বহুকাণ্ডবিশিষ্ট বটবৃক্ষ। শাখায়-শাখায় অপরিচিত কুসুম-গুচ্ছ মাল্যাকারে বিলম্বিত; এবং বিন্দুলাঞ্ছিত আলুলিতদল একপ্রকার পদ্ম, কাঠিতে-জড়ানো সূতার গুটির ন্যায় খাগড়াবনের মধ্যে গজাইয়া উঠিয়াছে।

ত্রিবন্দ্রম-অভিমুখ নৌকাসকল প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদের নৌকার সম্মুখ দিয়া যাই-তেছে। এই শান্তিময় নিস্তব্ধপ্রদেশের এই বিস্তীর্ণ জলাশয়টি লোকযাতায়াতের মহা-মার্গ। এই নৌকাগুলি প্রকাণ্ড, আকারে "গণ্ডোলা"র ন্যায়,—অতীব মন্থর ও নিঃশব্দ-চারী। সুনম্য-সুন্দর-অঙ্গভঙ্গি-সহকারে মাল্লারা লগি মারিয়া নৌকা চালাইতেছে। এই নৌকাগুলিরও পশ্চাদ্ভাগে একএকটি কাম্‌রা, এই কাম্‌রাগুলি ভারতবাসী স্ত্রী-পুরুষে পরিপূর্ণ। আমরা চৌদ্দদাঁড়ের নৌকা করিয়া ব্যস্তভাবে কোথায়-না-জানি চলিয়াছি,—এই মনে করিয়া, ঐ সকল বড়-বড় কালো-চোখের কুতূহলী দৃষ্টি আমাদের উপর নিপতিত।

মধ্যে মধ্যে, একরকম চমৎকার পাখী—"মাছরাঙা,"—খুব উজ্জ্বল, খুব নীলবর্ণ, এক-প্রকার আনন্দের চীৎকার করিতে করিতে জলের গা ঘেঁষিয়া উড়িয়া যাইতেছে। নীল-পদ্ম ও রক্তপদ্ম চারিদিকে ফুটিয়া আছে।

আমাদের যাত্রাপথের এই অফুরন্ত জল-রাশি, বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ ভাব ধারণ করিতেছে:—কখন সঙ্কীর্ণ ও ছায়াময়;—মাথার উপর, দুই ধারের নারি-কেলগাছগুলা সম্মিলিত হইয়া মন্দিরমণ্ডপে পরিণত হইয়াছে; শাখাগুলি যেন তাহার খিলান!—তাহার পর, এই জলরাশি ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া, উচ্ছলিত হইয়া, সুদূর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। দুই ধারে, যবনিকার ন্যায় নিবিড় তালপুঞ্জ;—তাঁহার মধ্যে, এই বিলটি উদ্ভিজ্জশ্যামল ক্ষুদ্রদ্বীপসঙ্কুল সাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

সূর্য্য ক্রমশ ঊর্দ্ধে উঠিল। এই ছায়া-সত্ত্বেও, এই আলোড়িত জলরাশিসত্ত্বেও, গ্রীষ্মদেশসুলভ উত্তাপ ক্রমশ যেন ঘনাইয়া উঠিতেছে। তথাপি, আমাদের দ্রুতগতির কিছুমাত্র লাঘব নাই; আমাদের দাঁড়ীরা সমান জোরে দাঁড় ফেলিতেছে। মাঝি মধ্যে মধ্যে হাঁকডাক্ দিয়া দাঁড়ীদিগকে উত্তেজিত করিতেছে; সেই হাঁকডাকে তাহাদের সমস্ত মাংসপেশী একএক চাবুকের ঘায়ে যেন খাড়া হইয়া উঠিতেছে; এবং তাহারাও তাহার প্রত্যুত্তরে বানরের ন্যায় তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। আমাদের নৌকার পার্শ্ব দিয়া—তৃণরাশি, পদ্মের বৃন্তসমূহ, বিকশিত খাগড়াগুচ্ছ, আমাদেরি ন্যায় দ্রুতভাবে চলিয়াছে।

বেলা দশটা। এখন আমার নৌকা আর তাল-নারিকেলের নীচে দিয়া যাইতেছে না,—একটা গলির মত সঙ্কীর্ণ পথে, একপ্রকার শাদা ফুলের ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আমার সম্মুখে,—দুইধারে সমান সারিসারি তাম্রমূর্ত্তি-মানবেরা যন্ত্রের

ন্যায় অঙ্গচালনা করিতেছে। এইভাবে ১৮ক্রোশ পথ উহারা অতিক্রম করিয়াছে। কেবল, অল্পস্বল্প স্বেদবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় উহাদের গাত্রে দেখা দিয়াছে; তাহাতে, উহাদের দেহযষ্টি খাঁটি ধাতবপদার্থের ন্যায় ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। প্রখর-ভীষণ সূর্য্য-কিরণে উহাদের দেহপঞ্জরের রেখাবলি আরো যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তটজাত ঝোপের অবসাদক্লিষ্ট শুভ্র কুসুম-সমূহ বৃন্তচ্যুত হইয়া, উপর হইতে নীল জলরাশির উপর পতিত হইতেছে। উহাদের অতিপ্রচুর অনাবশ্যক ফলরাশিও বিকীর্ণ হইয়া, ছোট ছোট সোনার "আপেলের" ন্যায় চারিদিকে জলের উপর ভাসিতেছে।

আমাদের মাঝিমাল্লারা অবিশ্রান্ত বাহিয়া চলিয়াছে। এইবার উহারা গান ধরিয়াছে। স্বাস্থ্যকর-শ্রমপ্রভাবে তন্দ্রাভিভূত স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় উহারা অলস-অবশভাবে গান গাহিতেছে। একপ্রকার ভাবশূন্য স্মিতহাস্যে উহাদের দশনদীপ্তি প্রকটিত হইতেছে।

এইবার একটি অধ্যুষিত প্রদেশ দিয়া আমরা চলিয়াছি। কতকগুলি গ্রাম; কতকগুলি মন্দির; কতকগুলি হিন্দুধরণে নির্ম্মিত প্রাচীন গির্জ্জা; সিরীয় খৃষ্টানেরা এদেশে আসিয়া, এইরূপ গঠনপ্রণালী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবলম্বন করিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে, আবার ঝিলটি—দুইধারের পর্ণতরুভূষিত উচ্চ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ অন্ধকার;—অন্তর্ভৌম শৈত্য। আমরা একটা সুরঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহাতে দুরস্থ অজ্ঞাত বিলের সহিত—উত্তরস্থ বিলসমূহের যোগাযোগ ঘটে, এই উদ্দেশ্যে মহারাজা এই সুরঙ্গটি কাটাইয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় এবং কাল সমস্তদিন আমরা এই অন্তর্ভৌম খালের মধ্য দিয়া যাইব। দাঁড়পতনের শব্দ এখন যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। অন্ধকারের ন্যায় কালো-কালো চলন্ত নৌকাগুলা যখন আমাদের নৌকার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন আমাদের মাল্লারা চীৎকার করিয়া উঠে;—সেই শোকগম্ভীর প্রতিধ্বনির অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে।

এখন মধ্যাহ্ন। এইবার মাঝিমাল্লারা বদ্‌লি হইবে। অন্তর্ভৌম খাল অতিক্রম করিয়া আবার আমরা তালীবনসঙ্কুল ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের গোলকধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সুশ্যামল-তরুপল্লব-নিমজ্জিত একটি গ্রামের সম্মুখস্থ তটভূমিতে আসিয়া আমাদের নৌকা ভিড়িল! এইখানে চল্লিশজন নূতন মাল্লা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মহারাজার নৌকার জন্য, সমস্ত পথ এইরূপ লোকবদ্‌লির বন্দোবস্ত আছে।

এই নূতন মাল্লারা স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর, একপ্রকার উন্মত্ত অঙ্গচালনা ও কোলাহল আরম্ভ হইল। শিশুসুলভ আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উহারা যাত্রা আরম্ভ করিল, খুব উত্তেজিত হইয়া দাঁড় ফেলিতে লাগিল, এবং শুভ্র দন্তপংক্তি আ-প্রান্ত বিকশিত করিয়া হাসিতে লাগিল—গাহিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টান;—খৃষ্টসন্ন্যাসীরা যে বক্ষ-আবরণ পরিধান

করে, সেই "স্যাপুলারি" ইহাদের নগ্নবক্ষে ঝুলিতেছে। অপর মাল্লাদের ললাটে শৈবচিহ্ন, এবং বাহু ও বক্ষদেশে ভস্মধূসর তিনটি করিয়া সমতল রেখা অঙ্কিত।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জ,—সেই একঘেয়ে তালীবনের প্রাচুর্য্যমহিমা! ...উহা দেখিয়া-দেখিয়া চিত্ত উদ্বেজিত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনে করিয়া দেখ,—তিনশতক্রোশব্যাপী সমস্ত প্রদেশটি উহাদের নিবিড় শাখাপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন। ইহাতে, মনের মধ্যে কেমন একপ্রকার যাতনা উপস্থিত হয়। পুরাকালের লোকেরা যাহাকে "অরণ্যভীতি" বলিত ইহা তাহারি একটা বিশেষ-আকার বলিলেও হয়।

সেই তালজাতীয় তরু; ক্রমাগত সেই তালজাতীয় তরু—তাহার আর অন্ত নাই। তন্মধ্যে কতকগুলি গগনস্পর্শী তালতরুর শাখাপত্র একত্র পুঞ্জীভূত। তাহাদের উত্তুঙ্গ কাণ্ডের চূড়াদেশ হইতে যেন কতকগুলা পালোকের খোপ্না নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আবার কতকগুলি তরুণ তরু আগ্রতপ্ত ভূমি হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের শাখাপত্র আরো বিশাল। সমস্তই কি হরিৎ শ্যামল! কি অভিনব উজ্জ্বলকান্তি। সূর্য্যকিরণে ঐ সকল স্নিগ্ধমসৃণ পত্রপুঞ্জ ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে; এবং উহাদের তলদেশে, এই মধ্যাহ্নসময়ে, ঝিলের জলরাশি টিনের দর্পণের ন্যায় ধক্‌ধক্ করিতেছে।

সূর্য্য এখন মাথার উপর। গৌরাঙ্গ লোকদিগের যাহাতে সদ্য মৃত্যু হইবার কথা—সেই মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর কিরণে, আমার এই নৌকার মধ্যে, কি অপর্য্যাপ্ত জীবনী শক্তি ব্যক্ত হইতেছে! দাঁড়ীরা, বাহুপেশী প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া দুইঘণ্টাকাল সমানভাবে দাঁড় টানিতেছে; বাহুর শিরাগুলা ফুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিতেছে; আর সেই সঙ্গে উহারা গলা ছাড়িয়া তীক্ষ্ণস্বরে গান গাহিতেছে। এক-একসময়ে, যেন একটা মত্ততার আবেশ আসিয়া উহাদের চিত্তকে অধিকার করে;—তখন, উহারা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ঝোঁকে-ঝোঁকে গান গাহিতে থাকে, জলরাশিকে অতীব ভীষণভাবে আক্রমণ করে;—জল ফেনাইয়া উঠে; দাঁড়গুলা ভাঙিবার উপক্রম হয়। তখন কৃষ্ণচর্ম্মের উপর অঙ্কিত শৈবচিহ্নগুলি স্যন্দমান স্বেদজলে মুছিয়া যায়।

সন্ধ্যার মুখে, ঝিলটি আবার দুইধারের গালিচা-বৎ তৃণভূষিত উচ্চপাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আমাদের চতুর্দ্দিকে শতশত নৌকা বিশ্রাম করিতেছে এবং আমাদের মাথার উপর, খোদাই-কাজ-করা একটা প্রস্তরসেতু প্রসারিত। যে স্থানে আমরা আসিয়াছি, ইহা "কিলোন্"-নামক ত্রিবঙ্কুরের একটি বৃহৎ নগর;—ত্রিবন্দ্রমের ন্যায়, বাগান-বাগিচার মধ্যস্থিত একটা মুক্ত পরিসরভূমি। এখানে তালজাতীয় বৃক্ষ আর দেখা যায় না। অন্য বৃক্ষ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বৃক্ষগুলি আমাদের বৃক্ষ হইতে ভিন্ন। এমন কি, এখানে শাদ্বলভূমি ও গোলাপগুল্মও দৃষ্ট হইতেছে।

একটা বৃহৎ সোপান জলের মধ্যে নাবিয়া গিয়াছে; অদূরে শাদা-শাদা স্তম্ভশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। ঐ গৃহে, অনেকদিন কেহ বাস করে নাই। শুনিলাম, দেওয়ানের আদেশক্রমে ঐখানেই আমাদের জন্য সান্ধ্যভোজের আয়োজন হইয়াছে। রাত্রির প্রারম্ভেই, আমরা ঐ বাটীতে উঠিলাম। উঠিবামাত্র, ঐ শুভ্রগৃহের ন্যায় —শুভ্রবসনধারী ভারতীয় ভৃত্যগণ সোপান-পংক্তির উপর দৌড়িয়া আসিল এবং স্বাগত-অভ্যর্থনা করিয়া রূপার থালায় রক্ষিত একটা ফুলের তোড়া আমাকে উপহার দিল। দুইএকঘণ্টাকাল মাত্র এখানে আমার থাকিবার কথা। ততক্ষণ আমার মাঝিমাল্লারা বিশ্রাম করিতে পাইবে।

সান্ধ্যভোজের পর, এই বিজন উদ্যানে বসিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমার আর কোন কাজ নাই। মনে হয় যেন, ফ্রান্সের একটা পুরাতন উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছি।

উদ্যানটির একটু "পোড়ো" অবস্থা; ইহার সরু পথগুলির ধারে-ধারে বঙ্গদেশীয় গোলাপগুল্ম। আমার সম্মুখে, 'অস্তাচল-দিগন্তে, নির্ব্বাপিতরশ্মি নভোদেশ এখনো তামসী রক্তিমা ধারণ করিয়া আছে—সেই ম্লানাভ আলোকচ্ছটা যাহা অস্মদ্দেশের উষ্ণতম গ্রীষ্মসন্ধ্যায় কখন-কখন পরিলক্ষিত হয়।

এই শান্তিময় নিস্তব্ধতার মধ্যে, শৈশবের চিরাভ্যস্ত ও সুমধুর স্মৃতির আবেশ আসিয়া আমার চিত্তকে অধিকার করিল; তখন,—সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র আমি প্রায় যাহা করিয়া থাকি, এখন তাহাই করিলাম;—এই স্মৃতির প্রবাহে আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। এই বিষাদময় স্মৃতি লইয়া আমি যদৃচ্ছাক্রমে আত্মবিনোদন করিতে পারি—তাহাতে কিছুমাত্র আমার ক্লান্তি হয় না।...বনবেষ্টিত "পোড়ো"-ধরণের এই উদ্যানের ন্যায়, স্বদেশের কোন-একটি উদ্যানে, প্রকৃতির ভাব আমার মনে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাত হয়; এবং আমাদের সেই সমতল-দিগন্ত-প্রদেশে, অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের জ্বালাময়ী সন্ধ্যার এইরূপ রক্তিম আলোকে, "গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের" প্রথম স্বপ্ন আমার মনে সমুদিত হয়।

সেই সেকালের গ্রীষ্মবায়ুর মধ্যে, এই একই যুথির সৌরভ বিচরণ করিত; এমন কি, তাম্রাভ আকাশের নীচে, উত্তাপ ও সন্ধ্যালোকপ্রভাবে ধূসরীকৃত—এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বাদুড় ও পেচকগুলা সেখানেও যাতায়াত করিত।...তবে কিনা, এখানে যে বাদুড়গুলা গৃহের মধ্যে বিচরণ করে, তাহা আমাদের চাম্‌চিকা অপেক্ষা অনেক বড়; আমাদের চাম্‌চিকার ন্যায়, ইহারাও নিঃশব্দচারী ও বিচিত্রগতি; কিন্তু ইহারা সেই বৃহৎ-আকারের বাদুড়, যাহাকে "ভ্যাম্পায়ার্" বলে; এবং ইহাদের ডানা এত বিস্তৃত যে, উহারা সম্মুখে আসিলে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।...তাহার পর সুদূরে—এই উদ্যানের চারিদিকে তমোবেষ্টনের ন্যায় যে তরুপুঞ্জ রহিয়াছে, তাহারি মধ্য হইতে সহসা তূরীনিনাদ ও পবিত্র শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। এখন পূজার সময়;—তাই মানবকোলাহলও শুনিতে পাইলাম;—মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে লোকেরা দেবতার নিকট যে স্তবস্তুতি করিতেছে—ইহা তাহারি শব্দ।..

তাহার পর, নিস্তব্ধতা আবার যেন ঘনাইয়া আসিল ;—মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা বিশেষ আকার ধরিয়া পুনরাবির্ভূত হইল। কি-যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভারে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। স্মরণ হইল, আজ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রি। আমার শৈশবের শতাব্দীটি কালের অতল রসাতলে এখনি নিমগ্ন হইবে।... আমাদের নিকটে যাহা অনন্তবৎ—সেই তারকারাজি নভস্তলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুরুভার অনন্তের ভাব আসিয়া, আমার ন্যায় ক্ষণজীবী প্রাণীর চিত্তকে বিদলিত করিল। এই পুরাতন শতাব্দী যাহা অস্তোন্মুখ, এবং এই উদীয়মান নব শতাব্দী—যাহাতে আবার আমি ভাসিয়া চলিব—এই উভয়েরই উত্থানপতন মহাভীষণ অনন্তের তুলনায় অতীব নগণ্য বলিয়া মনে হয়। সকল পদার্থই শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে—মরিয়া যাইতেছে—এইরূপ একটা ভাব আসিয়া, মনোমধ্যে একটা উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বৃহৎ বন ও বৃহৎ মন্দিরসমূহে আমি পরিবেষ্টিত—সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণভারতের মধ্যে—ছায়ান্ধকারের মধ্যে আমি আবদ্ধ—এই কথা মনে হওয়ায়, মনোমধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ও সুমধুর উদ্বেগ উপস্থিত হইল। এই সব গোলাপবুখিকাশোভিত উদ্যান দর্শনে বারংবার স্বদেশবিভ্রম হইলেও, প্রবাসের ভাব মন হইতে একেবারে দূর হয় না। যখনি যে দেশে গিয়াছি—এইরূপ অসম্বদ্ধ ও অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ আমার চিত্তমধ্যে উদয় হইয়াছে। তবে কিনা, সকল জিনিষেরই মত, তাহার তীব্রতা কালসহকারে হ্রাস হইয়া আসে। কিন্তু আজ রাত্রে, আমার এই দৈহিক শ্রান্তির মধ্যে, অবসাদময় উষ্ণতার মধ্যে, তন্দ্রাবস্থার মধ্যে, ঐ সমস্ত ভাব আবার যেন সহসা ঘনাইয়া আসিল।...

রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়, এই সুন্দর পরিষ্কার তারার আলোকে, আবার আমরা যাত্রা করিব। আমার মাঝিমাল্লারা বিশ্রাম করিয়াছে। এখন আরো তিনক্রোশ তাহাদিগকে নৌকা বাহিতে হইবে। তাহার পর, আমরা একটা গ্রামে গিয়া পৌঁছিব—সেইখানে মাঝিমাল্লা বদ্‌লি হইবে।

আমাদের যাত্রাকালে, মন্থরগামী নৌকাসকল, আবার আমাদের নৌকার পাশ দিয়া যাইতে লাগিল ;—কালো-কালো ছায়াচিত্র ;—জলে প্রতিবিম্ব পড়ায় আরো বড় দেখাইতেছে—যেন অতি-উচ্চ "গণ্ডোলা"—কিন্তু একটু উপচ্ছায়াবৎ।

একটু পরেই, গোলকধাঁধার মত এই বিলগুলি সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হইয়া উঠিল—অগ্নিশিখায় পূর্ণ হইল। এই অগ্নিশিখাগুলি ধীবরদিগের লণ্ঠান ;—মৎস্যদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বড়-বড় মশাল; সুদীর্ঘ খাগড়ার গুচ্ছে আগুন জ্বালাইয়াছে, এবং যাহাতে না নিবিয়া যায়, এইজন্য উহা ক্রমাগত দুলাইতেছে। এই সকল মশালের আলোকচ্ছটা, দীর্ঘরেখায় জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।...নিশার মৃদুমন্দ নিশ্বাসে, লঘু-লহরীর ক্ষীণ রেখা জলের উপর কদাচিৎ অঙ্কিত হইতেছে। এই একঘেয়ে দাঁড়পতনের শব্দে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হয়; কিন্তু মনের মধ্যে এই ভাবটি সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে যে,

—আমার চতুর্দ্দিকে, সর্ব্বত্রই, জীবন-উদ্যম —সুতীব্র জীবন-উদ্যম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তবে এ কথা সত্য,—এ জীবনস্ফূর্ত্তি নিতান্ত আদিমকালসুলভ;—আমাদের হ্রদবাসী পূর্ব্বপুরুষের জীবন হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আত্মগৃহ।

হে ভারত, তোমার এ শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াকুঞ্জ'পরে
কুসুমে পল্লবে ধান্যে বিকশিত উদার প্রান্তরে
যে মহান্ গ্রন্থখানি সম্মুখেতে রাখিয়াছ খুলি
তার ভাষা দাও শিখাইয়া। অতীতের স্মৃতিগুলি,
স্তব্ধ যাহা বহুদিন, স্পন্দিত জাগ্রত করি তারে
ধ্বনিত করিয়া তোল!—এ মহান্ জলধির পারে
দূরদূরান্তরে তার পাঠাইয়া দাও সমাচার,
অবসাদক্লান্ত প্রাণে নবপ্রেম করহ সঞ্চার,
নব আশা, উৎস যথা রুদ্ধবারি ধরা হ'তে টানি
উচ্ছ্বসিত করে তারে, তেমনি তোমার মহাবাণী
প্রেমের মঙ্গলধারা বক্ষ হ'তে হরি' ল'য়ে আজ
উৎসারিত করি দিবে দিকে দিকে ধরণীর মাঝ।
তুমি ত রাখনি দূরে কাহারেও! আপন যে নয়
তারেও ডাকিয়া ঘরে চিরদিন দিয়েছ আশ্রয়।
তবে কেন হে জননি, যারা তব আপন সন্তান
ছাড়িয়া তোমার ক্রোড় পরদ্বারে পায় অপমান?
পর হতে পারে তবু আপনারে পারে না বুঝিতে
ঘরে শত্রু আছে বলে', যায় মূঢ় পরেরে যুঝিতে।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরাণপ্রসঙ্গ।

বৈদিকযুগে ঋষিগণ প্রকৃতিপূজক ছিলেন; লীলাময়ী প্রকৃতির সরলসুন্দর বা ভীতিসঙ্কুল শক্তিগুলিকে দেবভাবে দেখিতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিনিচয়ের মধ্যে এক বিরাট্ সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। সেই ধর্ম্মবৃত্তি আবার উপনিষদের যুগে পরমার্থতত্ত্বের ভূমা আনন্দে পরিণত হইয়াছিল। বেদান্তের মায়াবাদ এবং গীতার কর্ম্ম ও নিষ্কামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাখ্যাপন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি লইয়া গৌরব করিতে হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ধরিতে গেলে, বহুসহস্র বৎসর হইতেই এই সকল তত্ত্ব হিন্দুসমাজের দূর অতীতের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে এবং পৌরাণিক দেবদেবীপূজা ও পুরাণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিই ভারতবর্ষের সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ই পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতা ও বেদান্তের উচ্চতত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত পৌরাণিক উপাখ্যান ও উপদেশমালা দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী পর্য্যন্ত পুরাণগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পুরাণগুলিই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ। যাহাতে ভিত্তি প্রশস্ত ও মজবুত হয়, তাহা বুঝিয়া সকল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম পুরাণগুলিতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরাণপাঠে সর্ব্বশাস্ত্রপাঠের, বেদবেদান্তপরিজ্ঞানের ফল হয়, পুরাণসম্বন্ধে এরূপ মতেরও বহুলপ্রচার দেখা যায়।

দুঃখের বিষয়, ইংরাজিশিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে এই পৌরাণিকসাহিত্যপ্রচারের সম্যক্ হানি হইয়াছে।* যখন শতশত বৎসর ধরিয়া মুসলমানশাসিত হিন্দুস্থানের বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজে, ইংরাজিশিক্ষারূপ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, তখন প্রথমেই এই পৌরাণিকসাহিত্য ধ্বংসোন্মুখ হইল। পুরাণগুলি নিতান্ত অর্ব্বাচীন গ্রন্থ, ইহাতে ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শ বিকৃতভাবে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে নানারূপ কুসংস্কার, কদাচার, দুর্নীতির কথা আছে, আর্য্যগণের অবসাদদশায় এগুলি রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করিয়া কৃতবিদ্যসম্প্রদায় এগুলির ধ্বংসে ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। পৌরাণিক দেবদেবীকল্পনা ছাড়িয়া-দিয়া উপনিষদুক্ত সারসত্য 'অপৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম' বা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দুসমাজের স্থিরসলিলে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া ইংরাজি-

* কেবল এক বৈষ্ণবসমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের চর্চ্চা আছে।

শিক্ষিত যুবকগণ পুরাণগুলিকে আবর্জ্জনা-বোধে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। বোধ করি, এখনও পুরাণগুলির উপর একটা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

ইহার পর ৫০।৬০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সনাতন তথ্যগুলি নবীন আকারে ব্রাহ্মসমাজ-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের উপরও এই তরঙ্গের আঘাত লাগিয়াছে, এবং তাহারি ফলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' রক্ষণশীল হিন্দু-দিগের পক্ষের প্রধান কীর্ত্তি। সংস্কারক-গণের সেই জ্বলন্ত উৎসাহ এখন আর নাই, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও আর অসাড়ভাবে পৌরাণিক দধিসমুদ্রে-ক্ষীরসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন না, পৌরাণিক সাহিত্যের প্রকৃত মর্ম্ম তলাইয়া বুঝিতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। পুরাণসম্বন্ধে আহেলো বিলাতী মতগুলি দ্বিধাশূন্য হইয়া গ্রহণ করিতে আজকাল ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় ইতস্তত করিতেছেন, এরূপ লক্ষণ দেখা যায়। পুরাণগুলির সঙ্গে হিন্দুসমাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা স্মরণ রাখিলে ইহাকে সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

বেদ ও উপনিষদে যে প্রগাঢ় উদাত্ত-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, পুরাণে তাহার সম্পূর্ণ অভাব; পক্ষান্তরে, ইহাতে দেবদেবী-পূজা ও প্রতিমাপূজারূপ অপকৃষ্ট ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; তজ্জন্যই ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় পুরাণগুলিকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। এ কথা সত্য যে, পুরাণে সূক্ষ্ম পরমার্থতত্ত্ব বা বিশ্বব্যাপী বিরাট্ সত্তার কথা কম আছে; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিশাল উদার মনুষ্যত্ব (humanity) পুরাণশাস্ত্রের মজ্জাগত। দেবদেবীর লীলারহস্য প্রকটন করিয়া পুরাণকার দেবপ্রকৃতির মানবীকরণ (anthropomorphism) সংসাধিত করিয়াছেন,—মনুষ্যহৃদয়ের উচ্চনীচ সকল ভাবগুলিই (feelings) এই দেবদেবীতত্ত্বে উদ্ভাসিত। যদি মার্জ্জিতরুচি গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকগণ এই দোষে সেগুলিকে পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, এই আদর্শে বিচার করিতে হইলে খ্রীষ্টানের ও য়িহুদীর বাইবেলও সেই দোষদুষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। মুসল-মানের কোরাণও বড় বাদ পড়ে না। বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত বোধিসত্ত্ব, য়িহুদীর জিহোবা, খ্রীষ্টানের যীশু, এ সকল দেব-আত্মাতেই মানবের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ আপনার ধরণে দেবতা গড়াইবে (Man must make god after his own image), ইহা নিবারণ করা বোধ করি অসম্ভব। অতএব এই দোষের জন্য পৌরাণিকধর্ম্ম বর্জ্জন করা অবিবেচনার কার্য্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাণশাস্ত্রের দেবদেবী-তত্ত্বে মনুষ্যহৃদয়ের সকল ভাবগুলিই উদ্ভাসিত। যে সমস্ত সরলনীতি জীবন-যাত্রার সহায়তা করে, দেবদেবীর লীলাচ্ছলে সেই সকল নীতির অবতারণা করা হইয়াছে। দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগে সতীত্বের মহিমা

ও পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর চরিত্রবল খ্যাপিত হইয়াছে। সাংবৎসরিক দুর্গোৎসবে গৌরীর পতিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আগমন ও দিনত্রয় পিতৃগৃহবাসের পর পতিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, এই তত্ত্বে কন্যাগতপ্রাণ মাতাপিতার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও উচ্ছ্বসিত শোকের কি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার শিশুজীবনের প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনার উপর কি-এক অপূর্ব্ব গৌরব (halo) আনিয়া দিয়াছে; সাথীগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণব্যাপারে গোষ্ঠলীলা মধুর প্যাষ্টোর্যাল্ কাব্যের রসে অভিষিক্ত হইয়াছে। আর কত উদাহরণ দিব? পদ্মপুরাণে একস্থানে দেখিতেছিলাম, সদানন্দ মহাদেব প্রেমভরে গৌরীর চুল বাঁধিয়া টিপ পরাইয়া গামছা দিয়া মুখ ও পিঠ মুছাইয়া দিতেছেন! গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠক হয় ত নাক সিঁট্‌কাইয়া বলিবেন যে, ইহাতে শিবের শিবত্ব গেল; কিন্তু এস্থলে দেবদেবের মনুষ্যোচিত-ক্রিয়াবর্ণনে মানবজীবনের সাধারণ কার্য্যপরম্পরায় কেমন একটুকু সুমধুর কাব্যরস ফুটিয়া উঠিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অনেকবার পড়িয়াছি, কিন্তু কৈ, কোথাও এমন মধুর দাম্পত্যপ্রেমলীলা দেখি নাই! এই মনোহর চিত্র দেখিতে দেখিতে জীবে-শিবে প্রভেদ ভুলিয়া যাইতে হয় এবং হরগৌরীর বা রামসীতার বা রাধাকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবনের আলেখ্যে আদর্শমানবদম্পতির অপূর্ব্ব সুখদুঃখময় জীবনযাত্রার প্রতিকৃতি দেখিতেছি বলিয়া বিভ্রম উপস্থিত হয়।

বাস্তবিক পক্ষে, পুরাণগুলির রচনা-কৌশল কালিদাসাদির কাব্যের ন্যায় শোভনসুন্দর না হইলেও এবং আধুনিক রুচির হিসাবে সেগুলিতে অনেকরূপ উদ্ভট অসম্বদ্ধ কথা লিপিবদ্ধ থাকিলেও, সেগুলির দ্বারা যে শতশত বৎসর ধরিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সাধারণ লোকের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সহায়তা করিবার জন্য সেগুলি প্রণীত হইয়াছিল। খ্রীষ্টানজগতে সাদামাটা ল্যাটিনভাষায় লিখিত Legends of the saints প্রভৃতি গ্রন্থও ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যেও অবদানকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থের এই একই উদ্দেশ্য। যাহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল না (স্ত্রীশূদ্রাদি), তাহাদের জন্য পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। এদেশে ইংরাজি-সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাজসভায় ও গ্রাম্যগোষ্ঠীতে পুরাণপাঠ একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণ পাঠ করিয়া দেশভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছিল। যখন আপামর সাধারণকে সংস্কৃতভাষায় বুঝান কষ্টকর হইয়া পড়িল, তখন একদিকে দেবদেবী-মাহাত্ম্য লইয়া দেশভাষায় কাব্যরচনা আরম্ভ হইল, এবং অপরদিকে কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন ও পাঁচালীর সৃষ্টি হইল। ক্যাথলিক্‌ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণের অবোধ্য ভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া ঠিক এই একইরূপ কারণে Miracle-plays, Mysteries প্রভৃতির অভিনয়প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পৌরাণিক কাহিনীও উপদেশ-

মালা মানবকণ্ঠের সুমধুরস্বরসংযোগে ও স্বাভাবিক বাগ্মিতাগুণে মনোরম ও শ্রুতিসুখদ করিবার ব্যবস্থা হইল। এইভাবে ধর্ম্ম ও নীতির স্থূল স্থূল তত্ত্বগুলির প্রচারের সুচারু বন্দোবস্ত ছিল। এখন ইংরাজিশিক্ষার ফলে কথকতা দেশ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। যাহা সামান্য অবশিষ্ট আছে, তাহা ইতরলোকে ও স্ত্রীলোকে শুনে; কথকেরা উচ্চ আদর্শের অভাবে নানারূপ কুৎসিত রসের অবতারণা করিয়া জিনিষটাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছেন। অধিকাংশ যাত্রার পালা এখন থিয়েটারের ছাঁচে ঢালা। ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় কথকতা, কীর্ত্তন, যাত্রা ইত্যাদি প্রথা নিতান্ত 'সেকেলে' বলিয়া পরিহার করেন। কীর্ত্তনের আদর কেবল শ্রাদ্ধের আসরে। থিয়েটারী অপেরা এখন দেশের লোকের রুচি বিগ্‌ড়াইয়া দিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কারবিষয়ক আন্দোলন উপলক্ষে একপ্রকার অভিনব বাগ্মিতার আবির্ভাব হইয়াছে, ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় এখন কথকতা ছাড়িয়া সেই 'বিলাতী আদর্শের বাক্‌চাতুর্য্যে মজিয়াছেন। ইংরাজিশিক্ষার গুণে এই সম্প্রদায়ের সহিত সাধারণ লোকের রুচির মিল নাই। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, পৌরাণিক কাহিনী ও উপদেশমালা লোকপরিচিত করিবার যে সকল উপায় ছিল, সেগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ইহার অনেকগুলি বিষময় ফল ফলিতেছে। প্রথমত, আমরা এ অবস্থায় আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও সমাজের আসল প্রকৃতি ভুলিয়া যাইতেছি। পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সমাজ অবহেলা করিয়া আমরা ধর্ম্মসংস্কারব্যপদেশে উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা লইয়া একটা খিচুড়ি বানাইতে বসিয়াছি;—সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে, এমন একটা সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছি। পুরাতন হারাইয়াছি, অথচ নূতন গড়িতে পারি নাই, কেবল ভাঙিতেছি-চুরিতেছি ও প্রতিভার ক্যালিডোস্কোপে রং ফলাইতেছি। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানের অভাবে ও বিলাতী বিলাসপরায়ণতার প্রভাবে আমরা ঘোর আত্মসুখতৎপর ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িতেছি। গীতার ফলকামনাশূন্য কর্ম্মানুষ্ঠান, বেদান্তের অপার্থিব মায়াবাদ, উপনিষদের গভীর পরমার্থতত্ত্ব, কখনই সাধারণ লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই, এই বিলাসের ও সুখলিপ্সার যুগে ক্যো করিতেই পারে না। এ সমস্ত উচ্চতত্ত্ব জনকতক বাছা-বাছা লোকের জন্য; সাধারণ লোক এ সকল তত্ত্বের অধিকারী নহে। পক্ষান্তরে, পুরাণে যেরূপ সরল ও স্থূলভাবে সংসারযাত্রার উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই সাধারণ লোককে সৎপথে আনিবার প্রশস্ত উপায়। এই কারণেই পৌরাণিকসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।'

লোকশিক্ষার এই সরল, সহজ, সর্ব্বজনমনোহর পন্থা ছাড়িয়া-দিয়া আমাদের আধুনিক শিক্ষকগণ তাহার পরিবর্ত্তে নীতিবোধ ও চরিতাবলী পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া সুকুমারমতি বালকবৃন্দের চিত্তক্ষেত্রে নীতি-

ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এবং বৃক্ষগণের আহারগ্রহণের প্রণালী ও বিড়ালের পদনখের সংস্থানকৌশল বুঝাইয়া তাহাদিগকে বাস্তবজগতের সঙ্গে পরিচিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের তো এইরূপ বন্দোবস্ত। এখন যদি সমাজের প্রকৃত হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিগণ নিজেরা অগ্রসর হইয়া লোকশিক্ষার ভার লন, তবে তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যান ও উপদেশগুলি সরল ভাষায় সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে লোকসমাজে প্রচার করুন এবং লুপ্তপ্রায় কথকতা, কীর্ত্তন, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ সুপরিচিত উপায়গুলির পুনঃপ্রচলন করুন। ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় কথকতা, কীর্ত্তন, যাত্রা, পাঁচালীর উৎসাহ দিলে, সেগুলি আবার জাগিয়াও উঠিবে এবং সেগুলির আদর্শও উন্নত ও বিশুদ্ধ হইবে। তা ছাড়া, অবিশ্রান্ত বিলাতী অনুকরণে অবসাদপ্রাপ্ত মনে খাঁটি স্বদেশী আমোদ উপভোগে আবার স্বাস্থ্য ও সরলতা ফিরিয়া আসিবে।

এতদ্ভিন্ন, ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় যাহাতে পুরাণসম্বন্ধে একটু বিশিষ্টজ্ঞান লাভ করেন, সেই উদ্দেশ্যে পুরাণগুলির স্থূল পরিচয় দিয়া 'পুরাণপরিচয়' বা 'পুরাণপ্রবেশ' বা এইরূপ একটা-কিছু নাম দিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিলে অনেক উপকার হয়।

ইংরাজিভাষায় Classics for the million এবং ঐরূপ অন্যান্য অনেকগুলি গ্রন্থে হোমরের কাব্যের সারসংগ্রহ ও গ্রীক্‌-পুরাণের উপাখ্যানগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল উপাখ্যান কেবলমাত্র গ্রীক্‌ভাষানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। আমিও সেই আদর্শে আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সারসংগ্রহের প্রস্তাব করিতেছি। উপরন্তু, আধুনিক ইংরাজজাতির গ্রীক্‌-পুরাণের সঙ্গে যে সম্পর্ক, আমাদের পুরাণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তদপেক্ষা সহস্রগুণে ঘনিষ্ঠতর। অতএব আমাদের দেশেও ভাষায় এরূপ সঙ্কলনকার্য্য নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

এ বিষয়ে উদ্যমশীল লেখকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি। লেখকমহাশয় ইচ্ছা করিলে মাসিকপত্রিকায় ধারাবাহিক-প্রবন্ধ-আকারে গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রকাশ করিয়া পরে সম্পূর্ণপুস্তকাকারে প্রচার করিতে পারেন। পুস্তকের বিষয়বিভাগ কতকটা এইরূপ হইলে ভাল হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে পুরাণগুলির ও উপপুরাণগুলির নাম, সম্ভব হইলে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ, পুরাণের লক্ষণ, পুরাণপাঠের ক্রম ও ফলশ্রুতি থাকিবে। অবশ্য এ-অংশ-সঙ্কলনে বিশেষ পরিশ্রম নাই। লক্ষণবিচারকালে য়ুরোপীয় প্রণালীতে বিচার করিলে পুরাণগুলির কিরূপ বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করিলেও মন্দ হইবে না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুরাণগুলি কোন্‌ সাহিত্যযুগের রচনা, কি উদ্দেশ্যে ও কি ভাবে সেগুলির প্রচলন হইয়াছিল, ধর্ম্মগ্রন্থহিসাবে বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থের সঙ্গে তাহাদিগের কিরূপ সম্বন্ধ, ও কাব্যহিসাবে একপক্ষে রামায়ণ এবং মহাভারতের সঙ্গে, ও অপরপক্ষে কালিদাসাদির কাব্যনাটকের সঙ্গে সেগুলির কিরূপ সম্বন্ধ,

ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার থাকিবে। এ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মতেরও সম্যক্ বিচার বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুরাণগুলির রচনা-রীতির দোষগুণবিচার, পুরাণবর্ণিত প্রধান প্রধান উপাখ্যানের উল্লেখ বা স্থূলবিবরণ, এবং ভিন্ন-ভিন্ন-পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তের মধ্যে কতটা মিল, কতটা অমিল, তাহার স্থূলভাবে নির্দ্দেশ থাকিবে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে পুরাণগুলি-দ্বারা কিভাবে লোকশিক্ষা সম্পাদিত হইত, উদাহরণ দিয়া তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের সঙ্কলন কার্য্যে প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞানের এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদের রচনায় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা যায়। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত এ কার্য্যে ব্রতী হইলে 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ' নীতির সার্থকতা হয়। তদভাবে সংস্কৃতবিৎ ইংরাজিশিক্ষিত কোন লেখক এই কার্য্যের ভার লইলে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। 'বঙ্গবাসী'সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ-মহাশয় শাস্ত্রপ্রকাশকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন এবং বৎসর-বৎসর রাশীকৃত অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গের গৃহে গৃহে বিতরণ করিতেছেন। ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে তিনি যদি সংস্কৃতবিৎ কোন সুপণ্ডিত দ্বারা এই ধরণের একখানি পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া লন, তাহা হইলে অনায়াসেই এ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্ বা সাহিত্য-সভা এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যদি লেখকসম্প্রদায়কে পারিতোষিকদ্বারা উৎসাহিত করেন, তাহা হইলেও কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহারা এই উপায়ে সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তিকা প্রকাশের সহায়তা করিয়া হিন্দুসমাজের বিশেষ কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন।

পরিশেষে ইংরাজিশিক্ষিত যুবকগণের প্রতি একটা অনুযোগ করি। এপর্য্যন্ত এদেশে যাঁহারা সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনায় মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহারা হয় কাব্যরসবিশ্লেষণ, না হয় কালনির্ণয়-বিষয়ক গবেষণা করিয়াছেন, অথবা গীতা বা বৈদিকসাহিত্যের গভীরতত্ত্ব কিংবা দর্শনশাস্ত্রের জটিলতত্ত্ব বিদ্বৎসমাজে প্রকটিত করিয়াছেন, অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় পুরাণগুলির দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। এখন জনকতক লোক এ পথে অগ্রসর হইবার সময় হইয়াছে। যাঁহারা রচনাপটু নহেন, সাহিত্যসৃষ্টি করিবার শক্তি নাই, সাহিত্য পাঠ করেন, তাঁহারাও যদি Kipling ও Zolaর আপাতমনোরম উপন্যাসগুলি না পড়িয়া পুরাণপাঠে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে একটা অভিনব জগতের সঙ্গে পরিচয়স্থাপন এবং নিজেদের সমাজবন্ধনের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তাঁহাদের উৎসাহের জন্য এ কথাও বলিয়া রাখি, তাঁহারা যে রসের লোভে Zola, Daudet, Paul de Kock প্রভৃতি ফরাসীলেখকগণের উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ সাগ্রহে পাঠ করেন, পুরাণগ্রন্থের কোন কোন অংশে সে রসেরও অভাব দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

সোনার বাংলা।

বাউলের সুর।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)।
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায় হায় রে)—
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ওমা তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে
দেগো তোর পায়ের ধূলো সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে (মরি হায় হায় রে)
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি ॥

রামায়ণের রচনাকাল।

শব্দবিচার।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।"

বেদার্থ অবগত হইতে হইলে, ষড়ঙ্গে ব্যুৎপত্তিলাভ আবশ্যক। ছন্দ বেদের পদদ্বয়; কল্প হস্তদ্বয় বলিয়া কথিত; জ্যোতিষ চক্ষু; নিরুক্ত কর্ণ; শিক্ষা ঘ্রাণ; ব্যাকরণ মুখ। অতএব ষড়ঙ্গে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে, বেদার্থে ব্যুৎপত্তিলাভ করা অসম্ভব। এইজন্য সূত্রকালে ষড়ঙ্গের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিশেষ আড়ম্বর ছিল।

বেদমন্ত্রের যথাযথ-উচ্চারণ-শিক্ষার্থ শিক্ষাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ আবশ্যক; অন্যথা অর্থবোধ দূরে থাকুক, বেদমন্ত্রের আবৃত্তি পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। মন্ত্রগুলির যথাযথ আবৃত্তি করিবার জন্য শিক্ষাশাস্ত্রের ন্যায় ছন্দঃশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি আবশ্যক। কল্পশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে, বেদমন্ত্রের প্রয়োগজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেদবাক্যের অর্থনির্ব্বচনের জন্য "নিরুক্ত," ব্যুৎপত্তিবিজ্ঞানের জন্য "ব্যাকরণ" এবং বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের কালনির্ণয়ের জন্য "জ্যোতিষ" অধ্যয়ন করিতে হয়। সুতরাং যে যুগে বৈদিকশিক্ষা প্রবল ছিল, সে যুগে ষড়ঙ্গের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও প্রচলিত থাকিবার কথা। কালক্রমে ধীরে ধীরে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে!

সংস্কৃতশব্দের পুরাতন উচ্চারণরীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইলে, উচ্চারণরীতির অভ্যাস করিতে হইত। লৌকিকসাহিত্য পাঠ করিবার সময়ে,—এমন কি, শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনসময়েও,—সে অভ্যস্ত উচ্চারণরীতি পরিত্যক্ত হইত না। তাহা বিলুপ্ত হইবার পর হইতে, "উদাত্তানুদাত্তস্বরিত"-ভেদে উচ্চারণভেদ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; পুরাতন ব্যাকরণে সে বিষয়ে যে সকল বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, আধুনিক ব্যাকরণ হইতে তাহাও দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।*

কোন্ সময় হইতে পুরাতন উচ্চারণরীতি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাণিনিযুগে,—কাত্যায়নযুগে,—পতঞ্জলিযুগে,—খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বকালবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যযুগেই তাহা প্রচলিত ছিল। তাহার পর বৈদিকসাহিত্যালোচনার শিথিলতা উপস্থিত হইলে, পুরাতন উচ্চারণরীতি ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।

রামায়ণের রচনাকালে শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনেও পুরাতন উচ্চারণরীতি প্রচলিত ছিল। এক্ষণে বেদাঙ্গের মধ্যে একমাত্র ব্যাকরণেরই যাহা-কিছু আলোচনা প্রচলিত আছে; অন্যান্য বেদাঙ্গের আলোচনা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর পুরাতন উচ্চারণরীতি প্রচলিত নাই।

ভরত যখন ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্যস্বীকার করেন, তখন অশেষতপঃপ্রভাবসম্পন্ন ভরদ্বাজ নানারূপে ভরতের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কথোপকথনেও তাঁহার "শিক্ষা-স্বর-সমাযুক্ত" বাক্য উচ্চারণ করিবার কথা অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে। যথা,—

"এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাঽপ্রতিমেন চ।

শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ॥" ২।৯১।২২

তৎকালে শিক্ষিতসমাজে শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত উচ্চারণরীতি সুপরিচিত না থাকিলে, গৃহীর সহিত কথোপকথনকালে শিক্ষাস্বরসমাযুক্ত বাক্য উচ্চারিত হইবে কেন? রামায়ণের রচনাকালে লোকশিক্ষার্থ যে সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে ষড়ঙ্গ বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। যথা,—

"নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীৎ নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ॥" ১।১৪।২১

রামায়ণ পাঠ করিয়া তাহার আভ্যন্তর

* রামায়ণের "ছন্দোবিচারে" প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। বৈদিকসাহিত্যের ন্যায় লৌকিকসাহিত্যেও এক সময়ে স্বরসংযোগে পাঠ করিবার রীতি ছিল। তখনও আধুনিক ছন্দ প্রচলিত হয় নাই।

মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে, ষড়ঙ্গের শরণাপন্ন হইতে হয়; নচেৎ অনেক কথাই বুঝিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে দেখিতে পাওয়া যায়,—রামায়ণের রচনাকালে বৈদিক-শিক্ষা পূর্ণপ্রতাপেই প্রচলিত ছিল।

কালপ্রভাবে কেবল উচ্চারণরীতিই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। শব্দের ব্যুৎপত্তিও নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্র প্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, এই সকল পরিবর্ত্তনের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে।

শব্দসকল ত্রিধা বিভক্ত হইতে পারে;—বৈদিক, লৌকিক ও লৌকিক-বৈদিক। এই শ্রেণীবিভাগও ক্রমে কত পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছিল। যাহা পাণিনিযুগে কেবল বৈদিক বলিয়াই পরিচিত ছিল, উত্তরকালে সেরূপ অনেক শব্দ লৌকিকসাহিত্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা লৌকিক-বৈদিক উভয় সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, সেরূপ কত শব্দ আর লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই! এই শ্রেণীর শব্দবিচার জটিলাকারে প্রতিভাত হইয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি সংঘটিত করিতে পারে; তাহার কথা আপাতত উল্লিখিত হইবে না। আপাতত কেবল ব্যুৎপত্তিগত শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বিশ্বামিত্র-ঋষি দশরথের নিকট উপনীত হইয়া, যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিবার আশায় রামচন্দ্রকে যুদ্ধার্থ তপোবনে লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। দশরথ বলিয়াছিলেন,—রামচন্দ্র উনষোড়শ-বর্ষবয়স্ক,—বালক বলিলেই হয়,—এখনও তাহার শস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। অক্ষৌহিনী সেনা প্রেরণ করিলে কি হয় না? ঋষি কহিলেন,—না। দশরথ স্বয়ং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ঋষি কহিলেন,—না না। তখন অনন্যোপায় হইয়া দশরথ পুত্রসমভিব্যাহারে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঋষি কহিলেন,—না। এইরূপে পুনঃপুন প্রত্যাখ্যাত হইয়া, দশরথ অবশেষে দৃঢ়স্বরে কহিলেন—

"বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্! নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।"

'হে ব্রহ্মন্! আমার বালক "তনয় পুত্রকে" দান করিতে পারিব না।' এই শ্লোকার্দ্ধে "তনয়" এবং "পুত্রক" এই দুইটি শব্দ যুগপৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কি মহাকবির রচনাদোষ? অথবা এই দুইটি শব্দের যুগপৎ ব্যবহারের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে? শব্দবিচার না করিলে, তাহার মীমাংসা করা যায় না।

রামায়ণের টীকাকার তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, এই শ্লোকার্দ্ধের (তনয় পুত্রক) পুনরুক্তিদোষ পরিহার করিবার জন্য আলঙ্কারিক বিচারের অবতারণা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অতিদুঃখিতত্বাৎ পৌনরুক্ত্যং ন দোষঃ।"

এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে মহাকবির রচনা প্রথমে দোষাবহ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; পরে বিশেষ কারণে দোষক্ষালনের চেষ্টা হইয়াছে। সেই বিশেষ কারণটি বিচারসহ না হইলে, দোষ দোষই থাকিয়া যাইবে। এইরূপে প্রথমে দোষ কল্পনা করিয়া, তাহার পর দোষক্ষালনের

চেষ্টা না করিয়া,—আদৌ কোনরূপ "পুনরুক্তি" আছে কি না, তাহার বিচার করিলেই ভাল হইত।

"অতিদুঃখিতত্বাৎ পৌনরুক্ত্যং ন দোষঃ।"

ইহার প্রথম কথাটি—মূল কারণটি—সঙ্গত হইলে, শেষ কথাটি—টীকাকারের সিদ্ধান্তটি—অবশ্যই সুসঙ্গত হইবে। কিন্তু দশরথ যখন এই বাক্যের উচ্চারণ করেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ? তাহা কি তখন দুঃখভারে অবনত? আদ্যন্তের সহিত ভাবসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই আখ্যায়িকা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—মহর্ষির শুভাগমনে দশরথ প্রথমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; সংস্কারবশত অভ্যস্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—

"অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।"

ইহা শিষ্টাচারবিজ্ঞাপক অভ্যর্থনামাত্র। বিশ্বামিত্র তাঁহার আগমনের প্রয়োজন ব্যক্ত করিবামাত্র, এই শিষ্টাচার তিরোহিত হইয়া গেল! সহসা সংজ্ঞাহীন হইয়া, আবার সংজ্ঞালাভের পর, দশরথ শোকাবিষ্ট হইলেন;—বিচলিত হইলেন;—মোহপ্রাপ্ত হইলেন; অবশেষে নিতান্ত ভয়াম্বিত হইয়া, বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন!

"শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ।
লব্ধসংজ্ঞস্ততোত্থায় ব্যষীদত ভয়াম্বিতঃ।

প্রথমে হর্ষ, তাহার পর সংজ্ঞালোপ! তাহার পর শোক,—চাঞ্চল্য,—মোহ,—অবশেষে ভয়াম্বিত বিষণ্ণতা,—পর্য্যায়ক্রমে দশরথকে অভিভূত করায় প্রথমে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্রমে ভয় দূর হইলে, প্রত্যুত্তরদানের সাহস হইল;—শোক নিরস্ত হইলে, উত্তরদানের জন্য কণ্ঠরোধ বিদূরিত হইল;—চাঞ্চল্য সংযত হইলে, মোহ অপগত হইল;—বিষণ্ণতা বশীকৃত হইয়া, দশরথকে প্রত্যুত্তরদানের জন্য প্রগল্‌ভ করিয়া তুলিল! তিনি বিশিষ্ট বাগ্মীর ন্যায় বহুবাক্যে বিশ্বামিত্রকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুবিজ্ঞ নৈয়ায়িকের ন্যায় বহু তর্কে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে বসিলেন; যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখনই কেবল বলিতে বাধ্য হইলেন—

"বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্! নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।"*

মানবচরিত্রতত্ত্বজ্ঞ সমালোচকগণ দশরথের মানসিক অবস্থার সমালোচনা করিয়া এই শেষবাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে দশরথকে নিরতিশয় দুঃখভারাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিলে, পুনরুক্তিদোষ মহাকবির রচনাদোষ বলিয়াই ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইবেন! ইহা আদৌ রচনাদোষ কি না, তাহার বিচার না করিয়া, ইহাকে প্রথমে রচনাদোষ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তাহার পর "অতিদুঃখিতত্বাৎ" বলিয়া আর একটি অনুমানের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া মহাকবিপ্রয়োগের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কি আদৌ পুনরুক্তিদোষের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য? তাহার মীমাংসা

* "নৈব" এই নিশ্চয়াত্মক নিষেধবাক্যে দশরথের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত হইতেছে। ইহার সহিত দুঃখাতিশয্যের সংস্রব থাকিতে পারে না।

"পুত্রক-"শব্দের বিচারের উপরে নির্ভর করিতেছে।

পুত্র কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের সহিত ভারতবর্ষের বহু বিলুপ্তকাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য বঙ্গসাহিত্যেরও আগ্রহ উপস্থিত হইবার কারণ আছে। পুত্র কোন্ শ্রেণীর শব্দ? ইহা কি "ব্যুৎপন্ন"—অথবা "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক"?

এ বিষয়ে মতপার্থক্যের অভাব নাই! উণাদিকারগণ অন্যান্য "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের" ন্যায় পুত্রশব্দেরও একটি ব্যুৎপত্তি-নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অথচ বৈয়াকরণগণ পুত্রশব্দকে "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক" বলিয়া কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই!

পুত্রশব্দ সুপরিচিত হইলেও, তাহার একটি ভিন্ন অন্যান্য ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। যে ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত, তাহা পুত্রকে "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। এই ব্যুৎপত্তির ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে, তর্কস্থলে ইহাকেই পুত্রশব্দের একমাত্র ব্যুৎপত্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও, পুনরুক্তিদোষ নিরাকৃত হয় না। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পুত্র,—জন্মগ্রহণমাত্রেই,—পিতাকে পুন্নাম-নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে; সুতরাং রামচন্দ্রের যাহা করিবার, তাহা জন্মগ্রহণমাত্রেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে অকস্মাৎ মৃত্যু সংঘটিত হইলে, দশরথের শোক ভিন্ন পারলৌকিক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। এরূপ অবস্থায় "তনয়" এবং "পুত্রক" শব্দের যুগপৎ ব্যবহারের সার্থকতা সুব্যক্ত হইতে পারে না।

পুত্রশব্দের পুরাতন ব্যুৎপত্তি অপ্রচলিত হইলেও, সংস্কৃতসাহিত্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই শব্দ বহু পুরাতন;—বৈদিকসাহিত্যেও সুপরিচিত। ইহার অনেক প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন প্রতিশব্দেই পুত্রশব্দের বিশেষ অর্থ প্রতিভাত হয় না। সূনু, সন্তান, তনয়, নন্দন ইত্যাদি প্রতিশব্দ কেবল জন্মগত অর্থ প্রকাশিত করে। সূনু প্রসূত ব্যক্তি;—এই শব্দে অন্য কোন ভাব প্রকাশিত হয় না। সন্তান ও তনয় বংশবিস্তারকারক;—তাহারা অন্য কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। নন্দন কেবল আনন্দদাতা,—অন্য ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই সকল শব্দ একএকটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিয়া, কেবল তাহারই বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। পুত্রশব্দও এইরূপ একটি-না-একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। তাহাতে অন্য কোন ভাব ব্যক্ত হইত না; অন্য কোন শব্দেও তাহার বিশেষ কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না। সে ভাবটি কি? তাহা বৈদিক-সাহিত্যেই অভিব্যক্ত।

বৈদিকযুগ আর্য্যসমাজের পরম কল্যাণাবহ বিজয়যুগ। সে যুগের আর্য্য-সমাজ বিবিধ বিজয়সাধনের জন্যই নিয়ত উদ্যমশীল ছিল। সকলেই তন্ময় হইয়া বিবিধ বিজয়সাধনের আশায় কায়মনোবাক্যে নিয়ত তপশ্চরণ করিতেন। তজ্জন্য বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। রাজ্যরক্ষা,

ধর্ম্মরক্ষা, আচাররক্ষা,—রাজ্যজয়, শত্রুজয় সমরবিজয়,—ইহাতে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণপণে তপস্যা করিবার দায়িত্ব ছিল। প্রত্যেক কর্ম্মানুষ্ঠানে এই দায়িত্ব স্পষ্টাক্ষরে পুনঃপুন কীর্ত্তিত হইত; প্রত্যেক আহুতি এই দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিত; প্রত্যেক মন্ত্রে এই দায়িত্বের কথাই নানাভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। এইরূপ একটি দায়িত্ববিজ্ঞাপক কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত পুত্রশব্দের পুরাতন ব্যুৎপত্তি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কথা "বৃহদারণ্যক"-উপনিষদে অদ্যাপি উল্লিখিত আছে।

অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ।
মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি।
সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা।
কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।

'তিনটিমাত্র লোক;—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক। তন্মধ্যে এই যে মনুষ্যলোক, ইহা কেবল "পুত্রের" দ্বারাই জিত হইতে পারে; কোনরূপ অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে জিত হইতে পারে না। কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক, বিদ্যার দ্বারা দেবলোক জিত হয়।' এই বেদবাক্যে বৈদিকযুগের আর্য্যসমাজের মত ও বিশ্বাস স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে।

পুত্রের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ পারলৌকিক কল্যাণসাধন করিবার কথা এই বেদবাক্যে উল্লিখিত হয় নাই;—পুত্র কেবল মনুষ্যলোক জয় করিবার সহায়। পক্ষান্তরে, "পুন্নামনরকত্রাতা" বলিয়া পুত্রশব্দের যে ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত, তাহাতে মনুষ্যলোক জয় করিবার প্রসঙ্গ নাই; তাহাতে কেবল পারলৌকিক কল্যাণসাধনের কথা। দুইটি ব্যুৎপত্তি দুইটি বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেছে!

"অথাতঃ সংপ্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্ মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি। স পুত্রঃ প্রত্যাহ অহং ব্রহ্ম অহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি।"

মনুষ্য যখন অরিষ্ট-লক্ষণে আপনার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিবে, তখন তাহাকে "সংপ্রত্তি"নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সে পুত্রকে কহিবে—"তুমি আমার অসমাপ্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিও।" পুত্র কহিবে—"অবশ্যই করিব।" এইরূপে পুত্রহস্তে অসমাপ্ত কার্য্যভার সমর্পণ করিবার কর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। এই কর্ম্মানুষ্ঠানে যথাশাস্ত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পিতার কর্ত্তব্যপালনের ছিদ্র পূরণ করিয়াই পুত্র "পুত্র"-নামে কথিত হইতেন। আত্মজমাত্রেই এই গৌরবের উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন না; ইহা কেবল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিদ্রপূরণকারীকেই "পুত্র" বলিয়া ঘোষণা করিত। আত্মজের অভাবে অন্য কেহ—দত্তক, কৃত্রিম, পুত্রিকাপুত্র—"পুত্র" হইতে পারিতেন। একজন না একজনকে এইরূপে অসমাপ্ত কর্ত্তব্যভার সমর্পণ করিতে হইত; কেহই লোকজয়ের কার্য্য বিস্মৃত হইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন না!

এই বেদবাক্যের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, এই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিবরণের মধ্যেই পুত্রশব্দের নির্ব্বচন—নিরুক্ত—ব্যাখ্যা—প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

* পূরণেন ত্রায়তে স পিতরং যস্মাৎ তস্মাৎ পুত্রো নাম।—ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

ঔরসজাত না হইলেও যে পুত্রপদবাচ্য হইতে পারা যায়, এই বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই তাহার রহস্য নিহিত রহিয়াছে। "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়া পুত্রশব্দের যে ব্যুৎপত্তি সর্ব্বত্র সুপরিচিত, তাহা যে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নহে, তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন— "যাহারা বেদোক্ত বিশেষ অর্থ অনবগত, সেই সকল তর্কলোলুপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুত্রাদি সাধনকে মোক্ষলাভের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে।" *

বৈদিকযুগে এরূপ বিশ্বাস জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। সে যুগের আর্য্যসমাজ কর্ত্তব্যপালনকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল। মনুষ্যমাত্রেই বিজয়যাত্রায় বহির্গত,—প্রত্যেকেই বীরব্রতে সঙ্কল্পারূঢ়। তাহাকে লোকত্রয় জয় করিতেই হইবে, তাহাতেই মানবজীবনের সফলতা। সেই বিজয়কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পূরণকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে হইত। সেই পূরণকর্ত্তার নাম "পুত্র"।

মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইলে, আমরা কেবল পুত্রের বিলাসভোগের ব্যবস্থা করিবার জন্যই "উইল্" করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরাও "উইল্" করিতেন। তাঁহারা মৃত্যুকালে সস্নেহে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কহিতেন,—

ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞত্বং লোক ইতি।

'তুমি অসমাপ্ত বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিও; তুমি অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাপ্ত করিও; তুমি অসমাপ্ত লোকজয় সমাপ্ত করিও। আমি যাহা পারিলাম, করিলাম; যাহা পারিলাম না, তাহা পূরণ করিবার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম।'

এইরূপে মন্ত্রবাচনে পিতার ইচ্ছা পুত্রকে জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া, বৈদিকযুগের আর্য্যসমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা পিতৃধন উপভোগ করিবার,—পিতা এত অল্প রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া ভর্ৎসনা করিবার,—আধুনিক সম্বন্ধ হইতে কত পৃথক্! তাহা কেবল পিতৃকর্ত্তব্যপালনের জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের সম্বন্ধ। তাহাতে পিতৃলোকের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল; পুত্রজীবন কৃতার্থ হইয়াছিল; দেশের মুখও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল!

যাহাকে এইরূপে মৃত্যুকালে "পুত্র" করিতে হইবে, তাহাকে আবাল্য সেইরূপ শিক্ষায় সমুন্নত করিবারই ব্যবস্থা ছিল। পিতা চিরজীবন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতেন। দশরথ এইরূপে রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহাকে "পুত্র" করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঋষি যখন কোন তর্কেই কর্ণপাত করিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া বলিতে হইল,—

বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্। নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।"

'হে ব্রহ্মন্! রামচন্দ্র একে বালক,— তাহাতে আমার বংশবিস্তারকারক "তনয়",

* কেচিৎ বাবদূকাঃ শ্রুত্যুক্তবিশেষার্থানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ পুত্রাদিসাধনানাং মোক্ষার্থবত্তাং বদন্তি।
—ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

—তাহাতে আবার মরণান্তে আমার ছিদ্র-পূরণকারী "পুত্র"রূপে নির্ব্বাচিত ও প্রতিপালিত হইতেছে ;—তাহাকে কিছুতেই দান করিতে পারিব না !'

পুত্রশব্দের এই পুরাতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, আর পুনরুক্তিদোষ দেখিতে পাওয়া যায় না ; আর দোষক্ষালনের জন্ত আলঙ্কারিক কষ্টকল্পনারও প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। বালং—তনয়ং—পুত্রকং—এই তিনটি শব্দের একত্র ব্যবহারে মহাকবি কত সংক্ষেপে, কত সুকৌশলে, দশরথের সকল কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুধাবন করিবামাত্র কবিগুরুর চরণতলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে হয়! যাহা সত্যসত্যই কবিগুরুর রচনাগুণ, ব্যাখ্যা-বিভ্রাটে তাহাই রচনাদোষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে! রামায়ণ যে সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, সেই যুগের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি পরিত্যাগ করিয়া, উত্তরকালের ব্যুৎপত্তি লইয়া অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে, এইরূপে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। রামায়ণে ইহার উদাহরণের অভাব নাই; বাহুল্যভয়ে একটিমাত্র উদাহরণ উল্লিখিত হইল।

রামায়ণের রচনাকালে আর্য্যসমাজে পুত্রশব্দের এই পুরাতন ব্যুৎপত্তিই প্রবল ছিল। "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়া পুত্র-শব্দের যে ব্যুৎপত্তি এখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রামায়ণের রচনাকালে জনশ্রুতিমধ্যে পরিগণিত ছিল ;—লোক-সমাজে সুপরিচিত হয় নাই। রামায়ণে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুরাণে চৌরাশী নরকের নাম ও বর্ণনা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে পুৎ-নামক কোন নরকের নাম বা বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোন উপলক্ষে সংস্কৃতসাহিত্যে পুৎ-নামক নরকের উল্লেখ হইয়া থাকিলেও, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পিতার অসমাপ্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালিত না হইলে পিতার যে মনঃক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাকে পুৎ-নামক নরক বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলে, পুরাতন ব্যুৎপত্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে পুৎ-নামক নরক কল্পিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই!

পুত্র যে পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া পারলৌকিক সদ্গতি দান করিতে পারে, বৈদিকযুগের আর্য্যসমাজে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। আত্মাই আত্মার মিত্র,—আত্মাই আত্মার শত্রু ;—আত্মা ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারে না ;—এই চিরপ্রচলিত আর্য্যসংস্কার কালক্রমে পরিবর্ত্তিত না হইলে, লোকে "পুত্রাদি সাধনের মোক্ষার্থতা" প্রচার করিবে কেন? তাহা যে বেদার্থানভিজ্ঞ "বাবদূকগণের" ভ্রান্ত বিশ্বাস, কেবল তাহা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। সত্য হউক, মিথ্যা হউক,—প্রকৃত হউক, আর ভ্রান্ত হউক,—এই বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাকে অনার্য্য-বিশ্বাস বলিয়া নিন্দা করিতে পার, তথাপি এই বিশ্বাস যে আর্য্যসমাজে

প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই! কি সূত্রে এই বিশ্বাস আর্য্যসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া পুরাতন বিশ্বাসকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥"

রামায়ণের এই শ্লোকে প্রসঙ্গক্রমে পুত্রশব্দের নূতন ও পুরাতন দুইটি ব্যুৎপত্তিই উল্লিখিত হইয়াছে। "ত্রায়তে" এবং "পাতি" ক্রিয়াপদ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি সূচিত করিতেছে। রচনাভঙ্গী যেন স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে,—প্রথমটি আধুনিক ও অপ্রচলিত। "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলে, সকলে বুঝিবে না বলিয়াই যেন, সর্ব্বলোকপরিজ্ঞাত অন্য ব্যুৎপত্তিও উল্লিখিত হইয়াছে। পুত্রশব্দের এই ব্যুৎপত্তি মহাকবির স্বকপোলকল্পিত নহে। এই ব্যুৎপত্তি ভৃগুপ্রোক্ত "মনুসংহিতাতে"ও উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে চতুর্থচরণ অন্যরূপ; এবং এই ব্যুৎপত্তির মূল কি, তাহাও অনুক্ত। রামায়ণে তাহা অনুক্ত নহে। কবিগুরু স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—গয়নামক অসুরের এই ব্যুৎপত্তি প্রচার করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

"শ্রূয়তে ধীমতা তাত! শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষেব পিতৄন্ প্রতি॥"

পিতৃলোকের উদ্দেশে গয়াসুরের যাহা গান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইত, কালে তাহাই পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে'। বাল্মীকি ইহাকে প্রচলিত বা আর্য্যসমাজসম্মত ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন নাই; বরং বুঝিবার অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "মনুসংহিতায়" পুরাতন ব্যাখ্যাও উল্লিখিত আছে—

"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি।"

ইহা যে বৈদিকযুগের প্রচলিত ব্যুৎপত্তিকেই সূচিত করিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই। বৈদিক ব্যুৎপত্তি অনুসারে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের কার্য্যের আরম্ভ। জন্মমাত্রে পুত্র কোনই উপকার সাধন করিতে পারে না! গয়াসুরের ব্যুৎপত্তি অনুসারে, জন্মমাত্রেই পুত্র পিতাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। "মনুসংহিতার" সুবিখ্যাত টীকাকার মেধাতিথি "পুত্রেণ লোকান্ জয়তি" এই বচনের ব্যাখ্যায় উভয় ব্যুৎপত্তির সামঞ্জস্যসাধনের আশায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পুত্রেণ জাতেন, তৎকৃতেন উপকারেণ।" *

পুত্রের জন্মদ্বারা লোক জিত হয় না; পুত্রকৃত উপকারের দ্বারাই লোকজয় সুসম্পন্ন হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের টীকাকার আধুনিক ব্যক্তি হইয়াও, পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যায় গয়াসুরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন,—"পৃষোদরাদি" নিপাতনের নিয়মে পিতৃশব্দ হইতেই পুত্রশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে! † উণাদিকারগণ আবার

* কুল্লূকভট্ট অনেকস্থলে মেধাতিথির ব্যাখ্যাকে চাতুরীমাত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পুত্রশব্দের টীকা করেন নাই।

† "পিতৄন্ পাতি" ইত্যর্থে পুত্রস্ত "পৃষোদরাদিত্বাৎ" সাধুত্বম্। তিলকটীকা।

আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যে পবিত্র করে, তাহারই নাম পুত্র. এই অর্থে পূ-ধাতু হইতে পুত্রশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।'

"পুনো হ্রস্বশ্চ।"

এই সকল বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি বিভিন্ন যুগের আর্য্যসমাজের পুত্রবিষয়ক বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তন্মধ্যে পূরণার্থক পৃ-ধাতু হইতে পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যার পুরাতন মতই বেদবাক্যসম্মত। রামায়ণের রচনাকালেও এই মত প্রচলিত ছিল;—কিন্তু একালের সুবৃহৎ অভিধানেও তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না! "শব্দকল্পদ্রুমে" বা "বিশ্বকোষে" পুত্রশব্দের ব্যাখ্যার আড়ম্বরের অভাব নাই; কিন্তু যে ব্যাখ্যাটি বেদবাক্যসম্মত, শঙ্করাচার্য্যধৃত, পুরাতন সাহিত্যে ব্যবহৃত, এবং অনাত্মজ ব্যক্তির পুত্রনামগ্রহণের রহস্যোদ্ধারে সুসমর্থ,—তাহার কথা উল্লিখিত হয় নাই!

গয়াসুরের ব্যুৎপত্তিকে পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, পুত্রশব্দের বর্ণবিন্যাসে তকারদ্বয়ের প্রয়োজন হয়। পুরাতন ব্যুৎপত্তি অনুসারে তকারদ্বয়ের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয় নহে। পুরাকালে পুত্রশব্দের কিরূপ বর্ণবিন্যাস প্রচলিত ছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনিযুগে তকারদ্বয়ের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল না। ইহার বিচার জটিল হইবে বলিয়া, এস্থলে উল্লিখিত হইল না। বিশেষজ্ঞগণ এখনও পুত্রশব্দের বর্ণবিন্যাসে তকারদ্বয়ের ব্যবহার করেন না কেন, তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেও, পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি পুনরায় লোকসমাজে সুপরিচিত হইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

আর্ট কাহাকে বলে ?

রুশদেশীয় সাহিত্যিক টল্‌স্টয়ের what is art? আর্ট কি, একটা প্রসিদ্ধ পুস্তক। টল্‌স্টয় বলিতেছেন, আর্টের খাতিরে ইউরোপের সহস্র সহস্র লোক খাটিয়া মরিতেছে, তাহাদের কোন আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই, ছাপাখানায়, থিয়েটারে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি নষ্ট করিতেছে। এ আর্ট ব্যাপারটা কি, এবং মানুষের পক্ষে ইহা এমনি কি প্রয়োজনীয়, দেখা যাক্।

আর্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বড় সহজ নয়। বস্তুত আর্টকে বাদ দিলে ইউরোপীয় ধনী ও বিলাসী সম্প্রদায়ের কিছুই থাকে না। তাহাদের আমোদ জোগাইবার জন্য অসংখ্য

লোকের এই দুরূহ পরিশ্রম এবং তাহারাও সাধ্যমত এই অগ্নিতে অর্থের ইন্ধন দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

এই আর্টটা কি, ইউরোপীয় নানা পণ্ডিত নানা উপায়ে বলিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। একটা বড় কথা হচ্চে সৌন্দর্য্য, যাহা সকলেরই মুখে মুখে ফিরে। সৌন্দর্য্য যাহাতে আছে, তাহাই আর্ট। সৌন্দর্য্য মানে কেবল চক্ষুকে যাহা তৃপ্ত করে, তাহাই নয়,—তাহার অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া গেছে। কেহ বলেন, সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক;—যাহা ভাল নয়, তাহা সুন্দর নয়; কেহ বলেন, সৌন্দর্য্যটা বস্তুত বাহিরের নয়, বাহিরে তাহার প্রকাশ মাত্র,—সৌন্দর্য্য হচ্চে আত্মার; কেহ বলেন, ভালমন্দ কিছু নয়,—সৌন্দর্য্য হচ্চে যাহা চিত্তকে আনন্দ দেয়, সে আনন্দের সঙ্গে প্রয়োজনের কোন সম্বন্ধ নাই। এইপ্রকার নানা মুনির নানা মত আছে, তাহা জানিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। কিন্তু একটা কথা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে যে, ইউরোপীয় আর্ট-সমালোচক আর্ট বলিতে বুঝেন—সৌন্দর্য্যকে যাহা প্রতিভাত করে এবং সৌন্দর্য্যের অর্থ তাঁহাদের অভিধানে যাহা খুসি করে, আনন্দ দেয় বই আর কিছুই লেখে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আর্টের গোড়ায় এক মানে লিখিয়া, শাস্ত্র তৈরি করিয়া পরে যেমন খুসি তেমন জিনিষকে আর্টের দোহাই দিয়া তাঁহারা চালাইতেছেন।

মানুষের খাদ্যসম্বন্ধে কেহ যদি বলে যে, খাদ্য রসনাকে তৃপ্ত করে বলিয়াই মানুষ খায়, তবে সে যেমন হয়, তেমনি আর্টসম্বন্ধেও শুধু আনন্দ দেয় বলিয়া আর্ট সৃষ্ট হইতেছে বলিলে আর্টের মানে এবং প্রয়োজনীয়তাই বুঝা যাইবে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা মানুষের, ইহা কেন মানুষের অন্তরে এমন প্রবল এবং ইহার ফলাফলই বা কি জানিতে হইবে—খুসি বলিলে কোন কথাই বলা হয় না।

মানুষে মানুষে মিলিবার একটা পথ হচ্চে আর্ট। কথার দ্বারা যেমন আমরা আমাদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা জানাই এবং অন্য মানুষের মনের সঙ্গে সেই প্রকাশের সূত্রে আমাদের যোগ হয়, আর্টের দ্বারা তেমনি আমরা আমাদের অনুভূতিকে অন্যের অন্তরে উদ্বোধিত করি। এই একজনের অনুভূতি অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হইবার উপায় আর্ট ছাড়া দ্বিতীয় কোন জিনিষের দ্বারা হইতে পারে না।

বরাবর মানুষ নিজের অন্তরের অনুভূতিকে নানারূপ প্রকাশের দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। ছবি, গান, মূর্ত্তি, কবিতা, কত উপায় যে তাহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু সকলপ্রকার প্রকাশচেষ্টাকেই কি আমরা আর্ট নাম দিই? কাপড়চোপড় ঘটিবাটি ত এক হিসাবে আর্ট বটে, কিন্তু তাহার কথা হইতেছে না। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় বড় অনুভূতির প্রকাশকেই আর্ট নাম দিয়া থাকি,—সেই আর্টের সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

মানুষের হৃদয়ের মধ্যে মানুষের হৃদয়ের প্রবেশের দ্বারই যদি আর্ট হয়, তবে ইহা যে কত বড়, একটুখানি চিন্তা করিলেই বুঝা

যাইবে। বস্তুত আর্টকে বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই মানুষ ক্রমাগত নিজের অনুভূতিকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিবে, মানুষের নিকট চিরদিন সে প্রকাশ আছে এবং থাকিবেও।

এই পর্য্যন্ত টল্‌স্টয় যে সংজ্ঞা আর্টের দিলেন, তাহা বোঝা গেল। কিন্তু এইটুকু বলা শেষ করিয়াই তিনি আর্টের এক গণ্ডী টানিতেছেন—সে হচ্চে ভালমন্দের গণ্ডী, ধর্ম্মের গণ্ডী; বলিতেছেন যে, আর্টকে সেই মাপকাঠিতে তৈরি করিতে হইবে ও বিচার করিতে হইবে।

তিনি বলিতেছেন যে, মানুষ জীবনের অর্থ ক্রমেই বুঝিতেছে। মানুষের উন্নতির মানেই তাই যে, ক্রমে জীবনের অর্থ মানুষের কাছে স্ফুটতর, সম্পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই এমন-সকল লোক জন্মগ্রহণ করেন দেখা যায়, যাঁহাদের নিকট মানবজীবনের অর্থটা অন্যান্য মানুষের চেয়ে আরও খোলসা হইয়া দেখা দিয়াছে। এই জীবনের অর্থ লইয়াই জগতে নানা ধর্ম্মের উৎপত্তি—কালে কালে এই অর্থকে মানব-গুরুগণ গভীরতর, ব্যাপকতর করিয়া বুঝিয়াছেন। সমস্ত মানুষও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম্ম দিয়াই বিচার করা যাইতে পারে—কোন্ ভাবটা ভাল, কোন্ ভাবটা মন্দ। যে সকল অনুভূতি এই ধর্ম্মভাবের সঙ্গে খাপ্ খায়, মানুষ তাহাকে আপনার করিয়া লয় এবং ভাল বলিয়া বিবেচনা করে; যে সকল অনুভূতি খাপ্ খায় না, মানুষ তাহাকেই মন্দ বলে এবং পরিহার করে।

ইহুদীগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত, ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যাহা মানিত, তাহাকেই সযত্নে রক্ষা করা ছিল তাহাদের ধর্ম্ম। সুতরাং এই ধর্ম্মভাবের অনুভূতির দরুণ তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইল যে আর্ট, তাহা তাহাদের পক্ষে অপর সকল আর্ট অপেক্ষা বড় হইল। Psalms, Book of genesis প্রভৃতি হইল একমাত্র শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। গ্রীকেরা জীবনের অর্থ অন্যরূপ বুঝিয়াছিল। পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেই তাহারা বড় করিয়াছিল, সুতরাং সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, বল, জীবনের স্ফূর্ত্তি ও সম্ভোগ তাহাদের আর্টে স্থান পাইল—কুৎসিত রূপ, হীনবীর্য্যের ভাব কাছেও ঘেঁষিতে পাইল না। এইরূপে যে-কোন জাতিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তাহাদের জীবনের আদর্শের অনুকূল যে আর্ট, তাহাকেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিকূল কোন আর্টকেই স্বীকার করে নাই, পরিহার করিয়াছে।

প্রতি যুগে, প্রতি সমাজেই এইপ্রকারের একটা ভালমন্দর ধারণা, একটা ধর্ম্মভাব আছে, এবং এই ভাবটি থাকার জন্য আর্টের ভালমন্দও বিচার করা চলে।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রথমে শুধু খৃষ্টকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিল, তজ্জন্য খৃষ্টের নামগন্ধ যাহাতে নাই, এমন সমস্ত আর্টকে সে অবজ্ঞাই করিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম যে মুহূর্ত্তে গির্জ্জার ধর্ম্ম (church-religion) হইল, তখনই যীশু-মাতা, দেবদূত, পরী, সাধু, পীর প্রভৃতি কত-কি যে তাহার মধ্যে হুহু করিয়া স্থান পাইল এবং কত মূর্ত্তিই যে পূজা পাইতে লাগিল, তাহার সীমা নাই।

খৃষ্টের শিক্ষার সহিত ইহার মিল থাক্ বা নাই থাক্, এই আর্ট তখনকার সমাজের উপযোগী ছিল—সমস্ত মানুষের অনুভূতিরই ইহা প্রকাশমাত্র ছিল—কারণ সকলেই এই সমস্ত মূর্ত্তি ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করিত, ইহা তখনও বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের হইয়া পড়ে নাই।

কিন্তু অনুষ্ঠানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পোপে ও প্রচলিত ধর্ম্মে ধনী ও উচ্চ সম্প্রদায়ের ক্রমে অনাস্থা জন্মিল, খৃষ্টের শিক্ষার সঙ্গে চর্চ্চের শিক্ষার বিরোধ স্পষ্টই সকলের চোখে ফুটিল।

যদিও লুথর (Luther), ক্যাল্ভিন্ (Calvin), উইক্লিফ্ (Wycliffe) প্রভৃতি কোন কোন মনীষী খৃষ্টের যথার্থ উপদেশ গ্রহণ করিয়া চর্চ্চের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সমস্ত ধনিসম্প্রদায় তাহা করিলেন না, করাও কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। সকলেই কিছু সত্যকে যথাযথ দেখিতে পায় না এবং দেখিতে পাইলেও গ্রহণ করা আরও শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাঁহারা কোন ধর্ম্মেই রহিলেন না।

তার পর ইউরোপীয় রেনেসাঁস্ (Renaissance) যে জাগিল, যখন নাকি আর্ট ও বিজ্ঞান তাহার চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, —তাহার মূলমন্ত্র হইল ধর্ম্ম বলিয়া কোন জিনিষ নাই, তাহাকে অস্বীকার করাও অনায়াসেই চলে। জীবনের অর্থ দাঁড়াইল আমোদপ্রমোদ, সুখসম্ভোগ করা। সুতরাং সৌন্দর্য্যচর্চ্চা অর্থাৎ যথেচ্ছাচার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। গ্রীক্‌দের টানিয়া-আনিয়া সৌন্দর্য্যচর্চ্চার পাণ্ডাগণ বলিলেন যে, ইহাও তাঁহাদের নবাবিষ্কার নয়, বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহা আছে,—গ্রীক্‌দের মধ্যেও ইহা ছিল। গ্রীক্‌দের মধ্যে নৈতিক আদর্শটা আসলেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, তাহারা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সত্যের একটা আব্‌ছায়া-সম্পর্ক পাতাইয়াছিল, সেই আগাগোড়া গোলমেলে ব্যাপারের উপর দাঁড়াইল বর্ত্তমান যুগের Æsthetics—সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

আর্ট যে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝি—লোকে যখন ভারতবর্ষীয়, চীনদেশীয়, গ্রীক্, ইহুদী, কি মিশরের আর্ট বলে, তখন বুঝি যে, সে দেশের সব চেয়ে বড় অনুভূতি যেগুলি, সেইগুলিকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত আর্ট জাগিয়াছে,—কিন্তু মানুষের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, সমস্ত মানুষ যাহার জন্ত খাটিয়া মরিবে, অথচ তাহার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে, একটি সম্প্রদায়বিশেষেই যাহা আবদ্ধ, ইহা কোন্ আর্ট? কিন্তু ইহাকেই একমাত্র খাঁটি আর্ট বলা হইতেছে।

যে সমস্ত ক্রীতদাস দিন হইতে দিন, রাত্রিরও অধিকাংশ সময় বিনিদ্র হইয়া—এই আর্টের আমোদ জোগাইবার জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, ইহার রসাস্বাদনে যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দাও, দেখি তোমাদের চাক্‌চিক্যময় আর্ট দাঁড়ায় কোথায়!

এইখানে কথা উঠিবে যে, আর্ট বুঝিতে গেলে যতটা শিক্ষা দরকার করে, তাহা ইহাদের নাই, সে শিক্ষা হইলে ইহারা আপনিই বুঝিতে পারিবে। সকল আর্টেই দেখা গিয়াছে, প্রথমে লোকে বুঝিয়া উঠে নাই, পরে বুঝিয়াছে।

কিন্তু কথা হচ্চে যে, এই বর্ত্তমান আর্টের প্রকৃতি এতই বিভিন্ন,—সমস্ত মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে এতই সুদূরে যে, ইহাকে বুঝিয়া উঠাই প্রথমত দুঃসাধ্য। যে সকল অনুভূতিকে এই আর্ট ক্রমাগত প্রকাশ দিবার চেষ্টা পাইতেছে,—যেমন স্বাদেশিকতা, স্ত্রীপুরুষের প্রেম ইত্যাদি—সে সমস্ত অনুভূতি এম্‌নিই অদ্ভুত যে, তাহা কখনই সমস্ত মানুষের হইতে পারে না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হয় যে, এ আর্ট জীবন্ত ও সবল অনুভূতি হইতে উদ্ভূত নয়, এ আর্ট বিকৃত আর্ট।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত বড় বড় অনুভূতি ধর্ম্মভাব অন্তরে সজীব থাকিলেই যেগুলি সম্ভবপর হয়, যাহা এক কালে সমস্ত মানুষকে আনন্দ দিত, বল দিত, স্বাস্থ্য দিত,—তাহা আজকাল ধর্ম্মভাবে অবিশ্বাসের জন্য উচ্চসম্প্রদায় একেবারে হারাইয়াছে। হারাণর দরুণ আর্ট বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে সুস্থতার লক্ষণমাত্র নাই। এই বিকারের কতগুলি লক্ষণ দেখা দিয়াছে, যথা—আর্টের বিষয়ের লঘুত্ব, জটিলতা, অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা প্রভৃতি।

আর্টের বিষয় যে হাল্‌কা হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ হচ্চে সরস অনুভূতির অভাব। যদি আমোদই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, তবে তাহার রসদ জোগান শক্ত ব্যাপার। একই জিনিষকে ঘাঁটাইলে তাহা ক্রমেই দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। কিন্তু সরস অনুভূতি ধর্ম্মভাব হইতে আইসে। ধর্ম্মভাব যাহার মধ্যে যত পরিস্ফুট, যত ব্যাপক, যত গভীর হইতেছে, জীবনের মধ্যে ততই সে প্রবেশ করিতেছে," তাহার প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে, অননুভূত অনুভূতি তাহার অন্তরে জাগিতেছে। এ অনুভূতির বস্তুত শেষ নাই, কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ, এ ক্ষেত্রে মানুষ তাহা যে প্রতি মুহূর্ত্তেই নবীন করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। বর্ত্তমান আর্টের দলের লোকেরা বলেন যে, ইঁহাদের বিষয়ের অন্ত নাই, বাহির হইতে মনেও তাহাই হয় বটে, কিন্তু আমোদ ত আর অসীম হইতে পারে না। তিনটিমাত্র অনুভূতির বিষয় ইঁহাদের আছে দেখিতে পাওয়া যায়, এক—আভিজাত্যের গর্ব্ব, দ্বিতীয়—কামপ্রবৃত্তি, তৃতীয়—একটা শূন্যতা ও অবসাদের ভাব। এই কামপ্রবৃত্তির ইন্ধন ইঁহাদের আর্ট নিত্য নূতন জোগাইতেছে—নভেলে, নাটকে, স্ত্রীলোকের নগ্নমূর্ত্তির চিত্রে ও নানাপ্রকার শ্লীলতাবর্জ্জিত ছবিতে ও গানে।

জটিলতার কারণও এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য। যত বড়ই উঁচু কথা বলা যাক্ না কেন, তাহার প্রকাশ স্বভাবতই এম্‌নি হওয়া উচিত, যাহাতে বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা না থাকে। একটা সোজাসুজি খোলাখুলি প্রকাশ সমস্ত বড় আর্টেই দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত আর্টিষ্ট খেয়াল-মেখল করিয়াই বলিতে ভালবাসেন, তাহার মধ্যে এমন সমস্ত কথার উল্লেখও মাঝে মাঝে করিয়া থাকেন,—যাহা তাঁহাদের দলের লোক ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। দেখা যায় যে, সাদা কথাকে ঘুরাইয়া বলাই ইঁহাদের মতে আর্ট। আজকাল যে-কোন লেখকের কবিতা কিংবা গল্পরচনা

লইয়া বস না কেন, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। ভাবলেন, বদেলেয়ার আজকাল ফরাসীস্‌দের মধ্যে সব চেয়ে বড় কবি, অথচ ইঁহাদের বলিবার কথা যে কি, তাহা বুঝা যায় না। একজন বলেন, নীতি কিছু না, সৌন্দর্য্যই সব। অপরটিও তাই। তিনি আবার ক্যাথলিক্ মূর্ত্তি-উপাসক। ফ্রান্সের নমুনা ত এই। ইংলণ্ড, জর্ম্মাণী, সুইডেন, নরওয়ে, ইতালী, রুশিয়া, সমস্ত দেশেই এই দুর্দ্দশা—এবং এক কবিতায় নয়, ছবিতে, গানে, নাটকে, আর্টের সকল ক্ষেত্রেই।

তৃতীয় ব্যাপার হচ্চে অনুকরণ, পুনরাবৃত্তি, সর্ব্বপ্রকার অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা। অনুভূতি না আসিলেও জোর করিয়া যদি তাহাকে টানিয়া আনিতে হয়, তবে আর্টে কৃত্রিমতা জন্মে। অনুভূতি নাই—পরের ধার-করা অনুভূতিকে লইয়া ঘষিয়া-মাজিয়া রঙ্‌চঙ্ দিয়া চক্ষু ঝল্‌সাইবার চেষ্টা হচ্চে আজকালকার আর্টের আর একটা লক্ষণ। কতকগুলি কবিত্ব আছে (আমাদের দেশে যেমন মলয়পবন, বসন্ত, কোকিলের কুহু-কুহু), সেইগুলি লইয়া এবং একটা বর্ণনার মাত্রা অতিরিক্ত চড়াইয়া, খুনজখম একটা-কিছু দাঁড় করাইয়া আর্টিষ্টেরা লোকের মনে বিভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা করেন। এ কথা ভুলিয়া যান যে, অনুভূতি যদি বাস্তবিক অন্তর হইতে না জাগে, তবে বাহিরের সাজসজ্জায় রূপ ফুটিয়া উঠিবে না, বরং রূপের অভাবই প্রকাশ পাইবে। হ্যানিলে নাটকটি যেমন। একটি নিরপরাধা বালিকা তাহারা মাতাল পিতার নিকটে নৃশংস ব্যবহার পাইতেছে, সেই উপলক্ষ্য করিয়া নাটককার দর্শকের করুণা উদ্রেক করিতে চান। ভাল, এমন করিয়া তাহার মুখ দিয়া কিংবা অন্য কাহারও মুখ দিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করান, যাহাতে সকলের হৃদয় করুণায় দ্রব হয়। তাহা নয়, ষ্টেজের আলো নিভাইয়া—মাতাল পিতা মেয়েটিকে মারিতেছে, তাহার চাপা কান্নার স্বর শ্রোতাদের কানে পৌঁছাইয়া দেবদূত পরী তাহাকে লইতে আসিতেছে—কত-কি কাণ্ড করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিবার চেষ্টা! এই যে Sensationalism—ইন্দ্রিয়ের উপর একটা অনাবশ্যক তাড়নাদ্বারা চিত্তবিভ্রম জন্মান, ইহা উচ্চ আর্টের অঙ্গীভূত একেবারেই নয়, ইহা অন্যায়। তাই তাক্-লাগান হিসাবে কোন আর্ট যত বড়ই হোক না কেন, যদি সুস্থ, মহৎ, বৃহৎ অনুভূতি অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করিতে সে আর্ট সক্ষম না হয়, তবে সে আর্টকে কিছুতেই বড় আর্ট বলা চলে না।

এই অনুভূতির একটা বিশেষত্ব হচ্চে, যে আর্টের ভাবটি যে ব্যক্তি গ্রহণ করুক, তাহার সহিত আর্টিষ্টের এম্‌নি মনের মিল হইয়া যাইবেই যে, গ্রহীতার মনে হইবে, বুঝি আর্টটা তাহারি নিজের রচনা, আর কাহারও নয়। এই যে নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলা, বিশ্বমানবের সঙ্গে নিজের একাত্মভাব অনুভব করা, ইহাতেই আর্টের শক্তি, এবং এই শক্তির জন্যই মানবসমাজে আর্ট অত বড় স্থান পাইয়াছে। সুতরাং (আমি টল্‌স্‌টয়ের শেষ কথায় আসিয়াছি) জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে যেমন দেখা যায় যে, ভুলচুক এবং অনাবশ্যক জিনিষ বাদ পড়িয়া

ক্রমেই মোটামুটি আবশ্যক এবং যথার্থ জিনিষটুকুই দাঁড়াইয়া যায়, অনুভূতির ক্ষেত্রেও অনুভূতির বিষয় হইতে ঝড়্‌তি-পড়্‌তি কাটিয়া-গিয়া পরে জিনিষগুলিই ক্রমে টিকিয়া যায়।' তজ্জন্য পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে সীমাবদ্ধ ধর্ম্মভাবটুকু ছিল, যাহা তাহাদের আর্টের ভালমন্দ-বিচারে সহায়তা করিত, ভবিষ্যতে সেই জাতিগত, সম্প্রদায়গত বা দেশগত সীমাটুকু টানিয়া রাখিলে চলিবে না, আর্টকে সমস্ত মানুষের করিতে হইবে। আজকাল জীবনের অর্থ হইবে—মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ, মঙ্গলসম্বন্ধ স্বীকার করা, মানুষের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া ভাবা, মানুষ বলিয়া নিজেকে জানা।

অতএব এই অনুভূতিকে যে আর্ট সব চেয়ে বেশী প্রকাশ দিতে পারিবে, সেই আর্টই হইবে আধুনিক আর্ট ; যাহা পারিবে না, তাহাকে বর্জ্জন করিবার দিন আসিয়াছে।

কোন্ অনুভূতিতে মানুষ এক বলিয়া নিজেকে মনে করে, দেখিতে গেলেই চোখে পড়ে—দুটো জিনিষ। এক হচ্চে—আমাদের এক ঈশ্বর, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান, এই ধারণা। দ্বিতীয় হচ্চে—সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ, বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক জীবনের সুখদুঃখ নহে। এই আর্টের দৃষ্টান্তস্বরূপে একপক্ষে Schillerএর Robbers, Victor Hugoর Les Miserables, George Eliotএর Adam Bede প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, অন্যপক্ষে Moliere, Dickens প্রভৃতির লেখার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমকে টল্‌স্টয় একপ্রকার আর্টের ক্ষেত্র হইতে বিদায় দিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। সে প্রেমে মানুষকে নাকি কলুষেই টানিয়া লয়, অতএব গোড়া ঘেঁষিয়া তাহাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলা হউক্, নবীন আর্টের সহিত তাহার কোন সংস্রব না থাকুক।

টল্‌স্টয়ের আর্টসম্বন্ধে বক্তব্যবিষয় আমি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। পঞ্চদশ বর্ষের অধ্যবসায়ের ফলে নাকি পুস্তকখানি বাহির হইয়াছে। অল্প কথায় তাহাকে সারিয়া দিয়াছি, জানি না, ভুলচুকের হাত অতিক্রম করিয়াছি কি না। বারান্তরে টল্‌স্টয়ের আর্টের মন্তব্যসম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে, দেখা যাইবে।

শ্রী—

ত্রিবঙ্কুর ও কোচিন।

দাঁড়ীরা সমস্ত রাত্রি অবিরাম তালে-তালে দাঁড় ফেলিয়াছে। এই কবোষ্ণ রাত্রির অবসানে, নব শতাব্দীর নবরক্তিম প্রথম সূর্য্য, একপ্রকার মৎস্যজীবি জগতের উপর সমুদিত হইল;—যে জগতের লোক শিকারে রত,—যাহারা এই অকলুষ তরুণ আলোকে আহার্য্য-আহরণের প্রত্যাশায় চারিধারে বসিয়া আছে। বিশাল-বিস্তীর্ণ বিল; দুই ধারের তালজাতীয় নিবিড় তরুপুঞ্জ তটের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য জেলে-নৌকা;—অনেক সময়ে আমাদের নৌকার গা ঘেঁষিয়া যাইতেছে—আমাদের পথরোধ করিতেছে। কোন নৌকা একস্থানে স্থির হইয়া আছে, আবার কোন নৌকা, যতদূর সম্ভব—নিঃশব্দে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোক-গুলা,—জাল, ছিপ্, বল্লম হস্তে লইয়া, ভাসন্ত তক্তার উপর, সজাগ সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছে; জলের মধ্যে কোথাও কিছু নড়িলেই ব্যগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। পানিভেলা, বক এবং অন্যান্য ছোট ছোট পাখীরাও জলের ধারে কাদার উপর বসিয়া অন্বেষণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে; এবং অনেক বর্ষির কাঁটায়, প্রসারিত মৎস্যজালে, ত্রিমুখ শূল-অস্ত্রে, শত শত মৎস্যের মুখ আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। এই বিলটি—এই সব শীতলমাংস নিঃশব্দচারী ক্ষুদ্রজীবের অফুরন্ত জলাধার। তাই, এত অসংখ্য মৎস্যভোজী এইখানে আকৃষ্ট হয় এবং মৎস্য আহার করিয়া প্রাণধারণ করে। নবোদিত শতাব্দী এ সমস্ত কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না,—এই ব্যাপার অনাদি-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তটভূমি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায়,—মহাপ্রভাবশালী নারিকেলপুঞ্জের নীচে, নিম্নশ্রেণী ইতর লোকদিগের বাস। এই দীনহীন মানবকুলের অস্তিত্ব বৃক্ষগণের অস্তিত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে। নারিকেলপত্রের ডাঁটাগুলা একটা গুঁড়ি হইতে অন্য গুঁড়িতে প্রসারিত হইয়া বেড়ার কাজ করিতেছে; মৎস্যের জাল, রসারসি—সমস্তই নারিকেল-ছোব্‌ড়ায় প্রস্তুত।

এই অতীব প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলি শুধু যে ছায়াদান করে,—ফলদান করে,—তৈল-দান করে,—তাহা নহে; যাহারা উহাদের হরিৎশ্যামল অনন্ত ছায়াতলে বাস করে, তাহাদের যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই উহারা যোগাইয়া থাকে।

রঙিন রেশমের তলতলে গদির মত, চৌকোণা এক-এক টুক্‌রা ধানের ক্ষেত যে ইতস্তত দেখা যায়—মনে হয়,—এ প্রদেশে সে সকল ক্ষেত না থাকিলেও চলে—খাদ্যের কোন অভাব হয় না।

বিলটি ক্রমশই বিস্তৃত আকার ধারণ করিতেছে। এইবার একটু অনুকূল বাতাস উঠিয়াছে। বাহুদ্বয়ের সাহায্যার্থ,—মাল্লারা, ৪।৫গজ উচ্চ একটা দর্ম্মা একটা মাস্তুলের উপর চড়াইয়া দিল; নিরীহ ধরণের এই ক্ষুদ্র সমুদ্রটির উপর পাল ও দাঁড়যোগে আমাদের নৌকা আরো দ্রুত চলিতে লাগিল। বিলের দুই কূলে, বন; এই বনরাজি দূর হইতে নীলাভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বায়ুযোগে, নৌকার প্রসারিত পালটি ফুলিয়া উঠিয়াছে; এই বায়ুর সাহায্য পাইয়া মাল্লারা নিজ বাহুবেগ অনেকটা কমাইয়া দিয়াছে এবং আর-এক ধরণের তান উঠাইয়া একপ্রকার ঘুমের গান মুখ বুজিয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয়, যেন গির্জ্জা-ঘড়ির সুর-সংবলিত ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে আসিতেছে—আর যেন, তাহা ফুরায় না।

ফ্রান্সে, এ সময়ে প্রায় মধ্যরাত্রি; এই সময়ে বিংশতি শতাব্দী প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। এই নববর্ষের উৎসব আজ সেখানে অন্ধকারের মধ্যে, বরফের মধ্যে, পূর্ণ উপচারে অনুষ্ঠিত হইবে।

বাতাস পড়িয়া গেল। মধ্যাহ্নের তপ্তোজ্জ্বল নিস্তব্ধতা—অগ্নিকুণ্ডবৎ উষ্ণতা। নারিকেলতরুশোভিত তটভূমিতে আমাদের নৌকা আসিয়া ভিড়িল। প্রাতঃকালের মাঝিমাল্লারা এইখানে বদ্‌লি হইল,—অতীব নতভাবে উহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। নূতন মাল্লারা আর-একটু উজ্জ্বল-তাম্রবর্ণ; উহাদের বহুল কণ্ঠমালা,—কানবালা; গাত্রে নানাবিধ পৌরোহিতিক নক্‌সা ধূসরবর্ণে অঙ্কিত। এক্ষণে উহারা ভীষণবেগে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। বায়ু ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। উষ্ণবাষ্পগর্ভ পরিম্লান আকাশমণ্ডল, বিস্তীর্ণ আবিল জলাশয়, সমস্ত জীব, সমস্ত পদার্থ,—অতিরিক্ত আলোকপ্রভাবে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। নেত্রাভিঘাতী অত্যুজ্জ্বল একটা শাদা-রঙের ব্যাপক প্রলেপে যেন সমস্তই একাকার। আবার এই সমস্ত একাকারের মধ্যে, নৌকার চতুষ্পার্শ্বে, উজ্জ্বলকান্তি কাটা-ছোলা হীরার টুক্‌রাগুলির মত—জলবিন্দু উচ্ছ্বসিত হইতেছে,—দাঁড়ের গা দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; এবং দাঁড়ীদেরও ললাট ও বক্ষ বাহিয়া স্বেদবিন্দু স্যন্দিত হইতেছে।

প্রায় তিনঘটিকার সময়, ত্রিবঙ্কুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র কোচিনরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু, কি জলরাশির উপর, কি তালীবনের মধ্যে—কোথাও কিছু রূপান্তর লক্ষিত হইল না। কেবল, দিবাবসানে, বৃহৎ নদীর ন্যায় পরস্পর-দূরবর্ত্তী দুই কূলে, নগরাদি দেখা যাইতে লাগিল।

অপেক্ষাকৃত নিকটতর দক্ষিণকূলে রাজার রাজধানী—"এরাকুলম"-নগর। এইখানে রাজা বাস করেন। বিলের বরাবর ধারে-ধারে, প্যাগোদা-মন্দিরের ন্যায় চারিটা সীরীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের গির্জ্জা, একটা বৃহৎ দেবমন্দির, কতিপয় সৈন্য-নিবাস, কতকগুলি পাঠশালা;—এই সমস্ত, লালমাটীর উপর অধিষ্ঠিত ও রক্তিমবর্ণ। একটি মনুষ্য নাই। কিনারায়

একখানি নৌকা নাই। এই সমস্ত প্রাণহীন নিষ্প্রভ ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের পশ্চাতে বিষয়বিতৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের আবাসগৃহগুলি অরণ্যের বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া,—সর্ব্বগ্রাসী তালজাতীয় তরুপুঞ্জের মধ্যে, ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্যে, নীলিম ছায়ার মধ্যে—ক্রমশ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আরো দূরে, জলাশয়ের অপর পারে, বাম কূলে,—জীবন-উদ্যমের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি। প্রথমেই হিন্দু বণিক্‌দিগের নগর—"মাতাঞ্চেরি";—শত-শত ক্ষুদ্র গৃহ উদ্ভিজ্জশ্যামল ভূমির উপর অধিষ্ঠিত। একটি উপসাগর-সূত্রে, মহাসমুদ্রের সহিত এই নগরীর যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। এই উপসাগরে অসংখ্য নৌকা নোঙর করিয়া আছে; এগুলি সেকেলে-ধরণের নৌকা;—পাল ও অদ্ভুত মাস্তুল বিশিষ্ট। এই নৌকাগুলি আরবসমুদ্রের উপর দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করে, মস্কটের সহিত বাণিজ্য করে, পারস্য-উপসাগরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে এবং বসোরা-নগরে মসলা-সামগ্রী ও শস্যাদি লইয়া যায়। তার পর, আরো দূরে—পোর্টুগী ও ওলন্দাজদিগের পুরাতন কোচিন। এখন ইহা অন্য প্রভুদের হস্তে। উহাদের একটা বন্দর আছে,—সেইখানে আধুনিক জাহাজগুলার ধোঁয়া-চোং হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

এই বিলের মাঝখানে,—ঐ পরস্পর-বিসদৃশ তিনটি নগরের সংস্রব হইতে দূরে,—একটি তরুসমাচ্ছন্ন দ্বীপ আছে;—এখন সেই দ্বীপের অভিমুখে আমার নৌকা চলিতে লাগিল। হরিৎ-শ্যামল উদ্ভিজ্জ-রাশির মধ্যে নিমজ্জিত কতকগুলা শাদা-শাদা সোপানপংক্তি, একটা শাদা ঘাট, একটি শাদা রঙের পুরাতন প্রাসাদ। আমি যে রাজার অতিথি, সেই রাজার আদেশক্রমে বোধ হয় ঐখানেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার যেরূপ জীর্ণ ও "পোড়ো" অবস্থা, তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল শাদ্বল-ভূমির উপর, ঐ সকল শাখাপল্লবের মধ্যে—কোন নিদ্রামগ্না ঔপন্যাসিক রূপসী বাস করে; সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, এই বিজন দ্বীপটি আরো বিষণ্ণ আকার ধারণ করিল।

কিলোন্-নগরীর ন্যায়, এখানেও শুভ্র-বসনধারী ভারতীয় ভৃত্যগণ আমাকে একটি গোলাপের তোড়া দিবার জন্য, শাদা সিঁড়ির উপর দৌড়িয়া-আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি এখন, একটি সুন্দর পুরাতন উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিতেছি;—সেকেলে-ধরণের সোজা-সোজা রাস্তা; ধারে-ধারে জুঁইগাছ, গোলাপগাছ।

এই দ্বীপের মধ্যে একটিমাত্র বাড়ী, আর সেই বাড়ীর মধ্যে আমি একা। যে শতাব্দীতে, কোচিনরাজ্য ওলন্দাজদিগের অধিকারে ছিল, তখন এই বাড়ীটিতে ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। ইহা দুর্গের ন্যায় পিণ্ডাকৃতি; এবং ইহার অলিন্দ, বারান্দা—সুন্দর মসজিদ্-ধরণের খিলানে বিভূষিত। অভ্যন্তরে, সেকালের স্তম্ভময়ী বিলাসিতা। চুনকাম-করা প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর;—তাহাতে প্রাচীনকালের মাদুর বিছানো;—এপ্রকার সূক্ষ্মধরণের মাদুর আজকাল আর দেখা যায় না।

পুরাতন সুদুর্লভ কাঠ-কাঠরার কাজ; অতি পুরাতন য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত খোদাই-কাজ-করা ঘরের আস্‌বাব; দেয়ালে জল-রঙের ছবি;—এই ছবিগুলা সপ্তদশ-শতাব্দীর আমষ্টর্ডামের চিত্রকলার নমুনা। কি রাত্রে, কি দিনে,—দর্জাগুলা কখনই বন্ধ করা হয় না। এই প্রত্যেক দর্জার সম্মুখে এক-একটা দাঁড়াহনা-পর্দা;—তাহাতে ম্লান-মনোহর পীতবর্ণ রেশমের কাপড় টানা।

ভৃত্যেরা আমাকে জানাইল,—আমি যে রাজার অতিথি, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না; কেন না, তাঁহার অশৌচ—এখন তিনি শ্রাদ্ধশান্তি করিতেছেন। কোচিনরাজ্যের অল্পবয়স্ক যুবরাজ—নিতান্ত শিশু—সম্প্রতি স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণ কুসুমনেত্র চিরতরে নিমীলিত করিয়াছেন; তাই, প্রাসাদের সমস্ত লোক এখন শোকমগ্ন।

এই রাজকীয় বিজনতার মধ্যে না আসিয়া, মাত্তাঞ্চেরি-নগরে অবস্থিতি করিলে আমার পক্ষে ভাল হইত। সেখানে একটা ক্ষুদ্র পান্থনিবাসে থাকিলেও, আজ আমি সায়াহ্নে, তত্রত্য জনতার মধ্যে মিশিয়া, তাহাদের প্রকৃত জীবন প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম!...এখানে ও ত্রিবন্ধুরে—আমি ভারতবর্ষে থাকিয়াও যেন নাই। বিশিষ্ট-দর্শন নিঃশব্দচারী ভৃত্যেরা, মার্জ্জারবৎ-পদসঞ্চারে, খাঁজ-কাটা-খিলান-বিলম্বিত সমস্ত দীপগুলি জ্বালিয়া দিল। নূতন-ধরণে পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত টেবিলের ধারে বসিয়া আমার "কেয়েদির ভোজ" শেষ হইলে, পর,—নবশতাব্দীর প্রথম সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিবার জন্য আমি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যেখানে নির্ব্বাপিতপ্রায় জ্বলন্ত অঙ্গারের রং এখনো পর্য্যন্ত রহিয়াছে—সেই পশ্চিম দিগন্তপটের উপর, এই দীপ-তরুগুলি, ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ কত-কি দুর্ব্বোধ্য চিত্রাক্ষর অঙ্কিত করিতেছে। এখনো, উদ্যানবীথির ঊর্দ্ধদেশে—উত্তপ্ত নভস্তলে, সেই সন্ধ্যাচর জীব—পেচক ও বৃহৎ-জাতীয় বাদুড় বিচিত্র চক্রগতিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

তাহার পর, সমস্ত আকাশে, মিটমিট করিয়া তারা জ্বলিতে লাগিল—সহসা রাত্রি আসিয়া পড়িল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগমন।

তখন রাত্রি আঁধার হ'ল
সাঙ্গ হ'ল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম
আসবে না কেউ আজ।

মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হ'ল রাতের মত,
দুয়েক জনে বলেছিল
"আস্‌বে মহারাজ।"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"আস্‌বে না কেউ আজ!"

দ্বারে যেন আঘাত হ'ল
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম
বাতাস বুঝি হবে!
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দুয়েক জনে বলেছিল
"দূত এল বা তবে!"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"বাতাস বুঝি হবে!"

নিশীথরাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি'
কাঁপ্‌ল ধরা থরহরি,
দুয়েক জনে বলেছিল
"চাকার ঝনঝনি।"
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা
"মেঘের গরজনি।"

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠ্‌ল ভেরী,
কে ফুকারে—"জাগ সবাই,
আর কোরো না দেরি!

বক্ষ'পরে দু'হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—
"রাজার ধ্বজা হেরি!"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরি!"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন!
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা কোথায় সজ্জা!
দুয়েক জনে কহে কানে—
"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্যঘরে
কর অভ্যর্থন!

ওরে দুয়ার খুলে দেরে—
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা!
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখরাতের রাজা!

রাজা ও প্রজা।

ইংরেজ অনেকসময় বলিয়া থাকে যে, তরবারির সাহায্যেই ভারতে তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তরবারির সাহায্যেই ভারতকে চিরদিন পদানত রাখিতে হইবে।

কথাটা সত্য হইলেও সাধু হইত না। বলপূর্ব্বক তুমি একদিন আমাকে তোমার পদানত করিতে পারিয়াছিলে বলিয়া, চিরদিনই যে আমাকে তোমার পদলগ্ন করিয়া রাখিবার একটা ধর্ম্মানুগত বা ন্যায়-সুলভ দাবি জন্মিল, তাহা নহে। আমা অপেক্ষা প্রবল বলিয়া তুমি আমাকে পদদলিত করিতে পার, কিন্তু তাহাতে আমার অসারতা প্রতিপন্ন হইলেও তোমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

কথাটা কিন্তু আদোপেই সত্যও নহে। ইংরেজ আপনার সঙীনের সাহায্যে বিশাল ভারতভূমে এই একচ্ছত্র রাজত্ব লাভ করে নাই, প্রধানত ও মূলত ভারতবাসীর তরবারির সাহায্যেই তাহার এই অপরিসীম সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর আজও ভারতের নিশ্চেষ্ট ও নির্বীর্য্য প্রকৃতিপুঞ্জের নীরব আনুকূল্যেই সে আপনার এই অনন্ত-প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে।

প্রজার এই আনুকূল্যের উপরে সর্ব্বত্রই রাজসিংহাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। কারণ রাজা কুত্রাপি শুদ্ধ আপনার প্রহরি-পাহারার বলে রাজ্যশাসন করিতে পারে না। জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ শক্তিরাশিই প্রচ্ছন্নভাবে রাজশক্তি-রূপে প্রকাশিত হইয়া, এই সকল সামান্য প্রহরি-পাহারাকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। এইরূপে সর্ব্বত্রই জনগণ আপনা-দিগের স্বাভাবিক শক্তিকে সংহত করিয়া রাজ-আধারে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাহার সাহায্যে আপনাদিগের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া লয়।

ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তিও এই সার্ব্বভৌমিক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশের প্রজাশক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমাদের শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া ইংরেজ এই সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছে। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ইংরেজ সকল সময়ে ইহা ভাবে না, ঘোরতম-মোহাচ্ছন্ন হইয়া আমরাও ইহা দেখি না,—ইহাই তাহার ঘনঘন দুর্ম্মতির ও আমা-দিগের নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতির একমাত্র মুখ্য-কারণ।

উপনিষদে এরূপ গল্প আছে যে, একদা অসুরসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দেবতারা অত্যন্ত অভিমানী ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন, এবং "আমাদেরই এই মহিমা," "আমরাই বিজয়ী হইয়াছি" এইরূপ ভাবিতে আরম্ভ করেন। তখন সহসা দেবসভা-

সমীপে এক অদ্ভুতদর্শন পুরুষ প্রকাশিত হইলেন। দেবতারা তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য প্রথমত অগ্নিকে, পরে বরুণকে, পরে মরুৎকে প্রেরণ করেন। ইঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অদ্ভুতদর্শন পুরুষ ইঁহাদের সম্মুখে একখণ্ড তৃণ রাখিয়া, ইঁহাদের শক্তিপরীক্ষা করেন। অগ্নি আপনার সমুদয় শক্তিপ্রয়োগেও সেই তৃণখণ্ড দগ্ধ করিতে পারিলেন না, বরুণ তাহা ভাসাইতে পারিলেন না, মরুৎ তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে ক্রমে ইঁহারা পরাভব মানিয়া দেবসভায় ফিরিয়া আসিলে, দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে এই যক্ষের পরিচয় লইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন সেই পুরুষ শূন্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন এবং সেই আকাশে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা হৈমবতী প্রকাশিত হইয়া, 'ইনি যে সেই ব্রহ্ম, যাঁহার শক্তিতে দেবতারা জয়ী হইয়াছেন', ইন্দ্রকে এই উপদেশ দান করিলেন।

ব্রহ্মের শক্তিতে অসুরসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দেবতারা আত্মবিস্মৃত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া যেমন "আমরাই বিজয়ী হইয়াছি", "আমাদেরই এই মহিমা"—এইরূপ ভাবিতেছিলেন, ভারতের শক্তিতে এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া আত্মবিস্মৃত ইংরেজও আজ সেইরূপই ভাবিতেছে। কিন্তু একবার যদি ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ কিয়ৎপরিমাণে আত্মস্থ হইতে পারে এবং ভারতের এই প্রচ্ছন্ন প্রজাশক্তি যদি একবার কেন্দ্রীভূত, ঘনীভূত ও প্রকট হইয়া দাঁড়ায়, সেই যক্ষের সমক্ষে ইংরেজ আপনার বিপুল জ্ঞানবিজ্ঞানের ও অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের সমগ্রশক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণাদপি লঘুতর তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত বিচলিত বা বিদগ্ধ করিতে পারিবে না।

ইংরেজকে আপনার কল্যাণের জন্যই ইহা বুঝিতে হইবে যে, যেমন তাহার স্বদেশে, সেইরূপ জগতের সর্ব্বত্রই প্রজাশক্তি হইতে রাজশক্তি উৎপন্ন হয়। 'প্রজার সম্পূর্ণ আনুকূল্যলাভ না করিলে রাজশক্তি' শুদ্ধ সৈন্যসামন্তের সাহায্যে কুত্রাপি আত্মরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজার আনুকূল্যই রাজশক্তির মূলাধার। সৈন্যসামন্ত এই আনুকূল্যলাভে রাজাকে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু এই আনুকূল্য ব্যতীত তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ইহাই রাজনীতির মূলসূত্র। জড়রাজ্যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে একান্ত অগ্রাহ্য করিয়া যেমন কোন জড়বস্তু শূন্যে স্থিতি করিতে পারে না, রাজনীতিক্ষেত্রে সেইরূপ প্রকৃতিপুঞ্জের শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া ও তাহাদের আন্তরিক আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কোন রাজশক্তি কুত্রাপি স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। রাজা প্রজাকে ভয়বিহ্বল করিয়া নিশ্চেষ্ট করিতে পারে, বিবিধ কুটিল কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহার জ্ঞানবীর্য্য হরণ করিয়া তাহাকে অসাড় পুত্তলিকায় পরিণত করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, তাহার আনুকূল্যলাভ না করিলে কিছুতেই আপনার প্রভুশক্তিকে স্থির রাখিতে পারে না।

এদেশে আসিয়া অবধি ইংরেজও বিবিধ

কারণে প্রকৃতিপুঞ্জের আনুকূল্যলাভ করিয়া আসিয়াছিল। দিল্লির সিংহাসন ভাঙিয়া পড়িলে দেশময় একটা প্রবল শক্তিদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সেই ভীষণ শক্তিসংঘর্ষের মধ্যে প্রকৃতিপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে এবং জনমণ্ডলী একটা দুর্ব্বিষহ চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজ নানা ছলে-বলে-কৌশলে দেশমধ্যে আপনার প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে সে চাঞ্চল্য ও সে আতঙ্ক নিবারণ করে এবং বহুলরাষ্ট্র-বিপ্লববিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে শান্তিস্থাপন করিয়া প্রথম হইতেই প্রজাবর্গের আন্তরিক আনুকূল্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। দেশীয় ভূপতিবর্গের সঙ্গে নানা ছল ধরিয়া পুনঃপুন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, তখন হইতেই দেশীয় সিপাহীর সাহায্যে, আপনার অসাধারণ কুটিলবুদ্ধিবলে ইংরেজ এক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক প্রতাপ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও ভয়ে অভিভূত করিয়া ফেলে, এবং এই অদ্ভুত মায়াপ্রভাবেও, অন্যদিক্ হইতে, ভারতের ভয়বিস্ময়বিমূঢ় প্রজাপুঞ্জের আনুকূল্যলাভ করে। এইরূপে প্রথম হইতেই ভারতের প্রজাসাধারণের নীরব আনুকূল্যের উপরেই ইংরেজের প্রভুশক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

ইংরেজ তখনো মোহাচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় নাই; ভারতের প্রজামণ্ডলীও তখনো পর্য্যন্ত নিরস্ত্র ও নির্বীর্য্য হইয়া নূতন রাজশক্তির অনিষ্টসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়ে নাই। ইংরেজ এইজন্য সেই সময়ে প্রজারঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। আপনার স্বার্থ সে আজও পারিলে ছাড়ে না, তখনো ছাড়িত না, কিন্তু প্রজার মনস্তুষ্টিসম্পাদনের উপরেই যে তাহার সর্ব্ববিধ স্বার্থসাধন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, এই জ্ঞান তখন তাহার অন্তরে নিয়ত জাগরূক ছিল। এইজন্যই সে তখন সর্ব্বদা প্রজাবর্গের সমক্ষে আপনার উদার কল্যাণনীতি প্রকট করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

ইংরেজ-রাজনীতি তখন সত্যসত্যই অনেকটা উদার হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লব পাশ্চাত্যজগতের সমক্ষে যে এক উচ্চ, দিব্য, বিশ্বজনীন স্বাধীনতা ও কল্যাণের আদর্শ ধারণ করিয়াছিল, বণিক্‌বৃত্ত ইংরেজও একেবারে তাহার প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারে নাই। অজ্ঞানে হউক সজ্ঞানে হউক, ইংরেজও সে উদার ভাব ও আদর্শ, অতি সামান্যমাত্রায় হইলেও, গ্রহণ করিয়াছিল। জনমণ্ডলীর স্বাধীনতাবিস্তার এবং বিশ্বমানবের সেবার জন্য ইংরেজের মনেও তখন একটা সাময়িক আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে ভারতে ইংরেজ-রাজনীতিও কিছুদিনের জন্য একটা উদার কল্যাণোজ্জ্বল বিশ্বপ্রেমের বেশ পরিধান করিয়া আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই মোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াই ইংরেজ ভারতের প্রজামণ্ডলীর সরল চিত্ত হরণ করিয়াছিল। ইংরেজের রাজবিধি ও দণ্ডবিধি প্রাচীন ও চিরাগত বিবিধবৈষম্যপূর্ণ ভারতবর্ষে এক সর্ব্বজনীন সাম্যমন্ত্র প্রচার করিতে লাগিল। ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে জমিদার-রায়ৎ, ধনি-নির্ধন,

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সকলই সমান হইয়া গেল। এমন কি, প্রজাও রাজার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনিয়া ন্যায়বিচারপ্রার্থী হইবার অজ্ঞাতপূর্ব্ব অধিকার পাইয়া রাজাপ্রজার বিশাল ভেদ পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইতে লাগিল। এইরূপে একদিকে যেমন ইংরেজের দণ্ডপ্রতাপে, সেইরূপ অন্যদিকে তাহার এই উদার বিশ্বজনীন সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শে অভিভূত হইয়া এদেশের নেতৃবর্গ ইংরেজকে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের নেতৃত্বে বরণ করিয়া, পরিণামে জাতীয় স্বাধীনতালাভের লোভে, স্বাধীনভাবে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

পশুবলপ্রয়োগে ইংরেজ বিশালসাগরোপম ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে এরূপ অপ্রতিহত ও অনন্যপ্রতিযোগী প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। ভারতে শৌর্য্যবীর্য্যের একান্ত অভাব এখনো নাই, তখন তো আরো ছিল না। আজও গোরা-সৈন্য অপেক্ষা দেশীয় সিপাহীগণই ইংরেজ-রাজের প্রধানতম সেনাবল হইয়া রহিয়াছে। যে দেশের লোক প্রারব্ধে বিশ্বাস করে, নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান সর্ব্বদা স্বীকার করে, যাহারা মৃত্যুভয় জানে না,—তাহারা স্বেচ্ছায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ পশুবলে আবদ্ধ হয় না। ফলত শুদ্ধ পশুশক্তির উপরে ভারতে ইংরেজের প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সিপাহীবিদ্রোহের প্রলয়বন্যায় তাহা কখনো রক্ষা পাইত না। সিপাহীরাই তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, সাধারণ প্রজাবর্গ তাহার প্রতি কখনো বিমুখ হয় নাই। তাহারা যদি একটু বিমুখ হইয়া দাঁড়াইত, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। সে দেশব্যাপী দাবানল নির্ব্বাণ করা ইংরেজের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হইত না। ভারতের প্রজামণ্ডলীর আনুকূল্যেই সেই দুর্দ্দিনে এদেশে ইংরেজ আপনার প্রভুশক্তিকে অটুট রাখিতে পারিয়াছিল। সুদিনে লোকে দুর্দ্দিনের কথা ভুলিয়া যায়, ইংরেজও সে সকল কথা আজ ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তাহা ভুলিবে না।

প্রজার আনুকূল্যের মূল্য তখন বস্তুতই ইংরেজ বেশ ভাল করিয়া বুঝিত। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও অপোগণ্ড শিশুদিগের প্রতিও যে নির্ম্মম নির্যাতন হইয়াছিল, তাহা ইংরেজ বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। কি জানি ভুলিয়া যায়, এইজন্য সে যত্নপূর্ব্বক স্থানে স্থানে তাহার স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই সকল নৃশংস ব্যাপারের প্রথম তীব্রযাতনা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশমিত হইতে না হইতেই, ইংরেজ ভারতের প্রজাসাধারণের প্রতি যে সদ্ভাব ও উদারতা প্রকাশ করিয়াছিল, মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবতার পক্ষেও তাহা দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। সেই ভীষণ-বিদ্রোহাবসানে, ইংলণ্ডের রাণী বণিক্‌-কোম্পানীর হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময়, প্রজার আনুকূল্য ব্যতীত রাজ্যরক্ষা অসাধ্য ভাবিয়াই, ন্যায় ও সাম্য-নীতির উপরেই ভারতে ব্রিটিশপ্রভুশক্তি চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিলেন।

সেই উদারনীতির গুণেই ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তি এতটা-পরিমাণে প্রজাসাধারণের আনুকূল্যলাভ করিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে ইংরেজ সে উদারনীতি বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে ইংরেজের কোনই অপরাধ আছে বলিয়া মনে করি না। ইংরেজের সে উদারনীতি ধর্ম্মের দ্বারা প্রণোদিত হয় নাই, সঙ্কীর্ণ স্বার্থেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও যদি আপনার স্বার্থরক্ষার জন্ম সে উদারতা আবশ্যক মনে করিত, ইংরেজ প্রাণপণে তাহা অবলম্বন করিয়া চলিত। কিন্তু আজ ইংরেজ ভারতে অভয়পদ পাইয়াছে। প্রজা-মণ্ডলী দুর্ব্বল, নিঃস্ব, নিরস্ত্র ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজের সাম্যনীতি শ্বেত-কৃষ্ণের ভেদ নষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু জমিদার ও প্রজার প্রাচীন পরস্পরমুখাপেক্ষী সম্বন্ধকে চিরদিনের জন্ম ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রজার উপরে জমিদারের আর তেমন অধিকার নাই। ইংরেজরাজত্বে জমিদার অপেক্ষা জমাদার প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের শিক্ষায় ইতরভদ্রের মধ্যে প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা প্রাচীনকালে প্রকৃতিপুঞ্জের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের সে প্রভাব আজ নামশেষমাত্রেও বিদ্যমান নাই। যাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের পশ্চাতে সহস্র সহস্র লোক যাইয়া দাঁড়াইত, আজ তাঁহারা অশেষ অনুনয় করিয়াও দুচারিটি প্রকৃত অনুচর প্রাপ্ত হন না। ভারতের জনমণ্ডলী হীনবল, হীনবীর্য্য, নিরস্ত্র, বিচ্ছিন্ন, আত্ম-বিস্মৃত ও নেতৃবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ আজ তাহাদের হইতে আর বিশেষ কোন বিপদ্ আশঙ্কা করে না।

প্রজা যেখানেই দুর্ব্বল, বিচ্ছিন্ন ও অনিষ্ট-সাধনে-অক্ষম হইয়া উঠে, সেখানেই রাজা প্রজারঞ্জনে বিমুখ হইয়া অত্যাচারপ্রবণ হয়। ইহা রাজনীতির সার্ব্বভৌমিক অভিজ্ঞতা। ইংরেজের আধুনিক অত্যাচারপ্রবণতা ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের নিশ্চেষ্টতা ও বীর্য্য-হীনতারই প্রতিফল। ইংরেজ নহে, কিন্তু আমরাই ইহার জন্ম দায়ী।

এখনো কিন্তু আমরা এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। এইজন্যই ইংরেজের নিন্দাবাদ ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। নিন্দায় নিন্দুকের প্রাণে একটা কৃত্রিম আরাম অনু-ভূত হয় বটে, কিন্তু নিন্দিতের প্রকৃতি কখনো পরিবর্ত্তিত হয় না। ইংরেজ আজ যাহা-কিছু করিতেছে, তাহার মূল মানবপ্রকৃতির মধ্যে। ইংরেজ আমাদিগের প্রতি যে ব্যব-হার করিতেছে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে, আমরাও আমাদিগের অধীনস্থ জনমণ্ডলীর প্রতি ঠিক তাহাই করিতাম। জাপানের মহত্ত্বে, জাপানের সংযমে ও আত্মত্যাগে, জাপানের ধর্ম্মভীরুতায় আজ জগৎ বিমুগ্ধ, বিস্মিত, নতশির হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতেছে। কিন্তু এই জাপান যদি শিতত-বর্ষাধিক কাল ইংরেজের মত একটা বিরাট্‌-কার নির্বীর্য্য জাতির উপরে অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজনৈতিক অধিকার ও আধি-পত্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার এ সকল সদ্‌গুণ বেশিদিন কখনই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। প্রজা ও রাজা

পরস্পরে সর্ব্বদাই ঠিক পরস্পরের উপযোগী হইয়া থাকে। বিধাতা এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই 'যোগ্যং যোগ্যেন' যোজনা করিয়া থাকেন। শক্তিশালী, সম্মিলনক্ষম, বীর্য্যবান্‌, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতিভক্ত প্রজামণ্ডলী যে রাজার অধীনে বাস করে, আপনাদিগের শক্তি ও সাধনাবলেই তাহাকে উদার, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল ও ধর্ম্মভীরু করিয়া তোলে। ইংলণ্ডের প্রজাপুঞ্জ শক্তিশালী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও সম্মিলনক্ষম বলিয়া, ইংলণ্ডের রাজা প্রজাহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। প্রাচীনকাল হইতেই ইংরেজ নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে কদাপি রাজকীয় অত্যাচার বহন করে নাই। অত্যাচারী, প্রজারঞ্জনবিমুখ ও প্রজার স্বার্থস্বত্বস্বাধীনতাসংরক্ষণে উদাসীন রাজার বিরুদ্ধে ইংরেজ সর্ব্বদাই অস্ত্রধারণ করিয়াছে। ইংরেজপ্রজাপুঞ্জ যদি নীরবে রাজকীয় অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিত,—সশস্ত্র হইয়া রাজা জোহনকে বেষ্টন করিয়া রাণিমিড্‌ক্ষেত্রে যদি তাহারা সঙ্গীনের অগ্রভাগে আপনাদের আবেদন রাজার হস্তে অর্পণ না করিত, তাহারা কদাপি ম্যাগ্‌নাকার্টা লাভ করিতে পারিত না। আবার প্রথম চার্লসের সময়ে, আপনাদিগের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজপ্রজামণ্ডলী যদি অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে আপনাদিগের সংহত শক্তিরাশিকে প্রবলবেগে প্রয়োগ না করিত, এবং প্রজাদ্রোহিতা-অভিযোগে রাজাকে অভিযুক্ত করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিত, তবে আজ ইংরেজ সভ্যজগতে স্বাধীনজাতিরূপে এমন গৌরবলাভ করিতে পারিত না। ইংলণ্ডে আজ যে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ও রাজকীয় অধিকার যে পদে পদে প্রজাপুঞ্জের স্বার্থ ও স্বাভিমতের অনুযায়ী হইয়া চলিতেছে, ইহা কেবল ইংরেজপ্রজাসাধারণের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরের ফল। যেমন ইংলণ্ডে, সেইরূপ অপর সর্ব্বত্রই, প্রজামণ্ডলীর শক্তিপ্রয়োগে রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত ও রাজকীয় শক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা সংযত হইয়াছে। ভারতের প্রজামণ্ডলী যদি সংযোগক্ষম, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতিভক্ত, বীর্য্যবান্‌ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, ভারতের রাজশক্তি অপরিহার্য্যরূপে উদার ও কল্যাণকারিণী হইয়া উঠিবে।

অতএব ইংরেজকে যেমন বুঝিতে হইবে যে, প্রজাশক্তির আনুকূল্যলাভ ব্যতীত ভারতে তাহার প্রভুত্ব স্থায়ী হইতে পারিবে না, সেইরূপ ভারতের প্রজাসাধারণকেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের আত্মশক্তি জাগ্রত, সংহত ও যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হইলে, এদেশে ইংরেজপ্রভুশক্তি কদাপি জাতীয়জীবনের চরিতার্থতাসম্পাদনের সহায় হইতে পারিবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের রাজাও আপনার প্রকৃত কল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, প্রজামণ্ডলীও আজ পর্য্যন্ত যথাবিহিতরূপে আপনার কর্ত্তব্যপথ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই।

আধুনিক ভারতবর্ষে প্রজানীতি এইজন্য রাজার অনুগ্রহপ্রত্যাশায় বিমূঢ় হইয়া

কেবলই রাজদ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আবেদন, প্রার্থনা ও বিধিগর্ভ আন্দোলনের নিষ্ফল প্রয়াসেই আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আপনাদিগের ও স্বদেশবাসীদিগের সমুদায় শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে প্রজাসাধারণের আত্মশক্তি যাহাতে জাগ্রত হয়, তৎপ্রতি অনুরূপ মনোনিবেশ করেন নাই। প্রজাশক্তি জাগ্রত হইয়া আপনাকে রাজনীতিক্ষেত্রে যথাযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, এ সকল আন্দোলন-আবেদনের দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার প্রসারপ্রাপ্ত হইতে পারে,—হইয়া থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু ইংলণ্ডে ও মার্কিণে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রজাসাধারণের মতামত আপনার অনন্যপ্রতিযোগী প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। সে সকল দেশে প্রজাশক্তিই সাক্ষাৎভাবে রাজশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রজাপ্রতিনিধিগণই সে দেশে রাজকীয় অধিকার ও শাসনসংরক্ষণের সমুদায় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। সে সকল দেশে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে গবর্মেণ্টের সমুদায় কার্য্য স্থায়িত্বর নির্ভর করে। সুতরাং সেখানে প্রজামণ্ডলীকে কোন একটা বিষয়ে প্রণোদিত করিতে পারিলে, সহজেই তদ্দ্বারা রাজকীয় ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করিতে পারা যায়। রাজমন্ত্রিগণ প্রজামণ্ডলীর অভিমতানুযায়ী কার্য্য না করিলে পদচ্যুত হইয়া থাকেন বলিয়া, যাহা-কিছুতে তাঁহাদের প্রতি প্রজাবর্গের বিরুদ্ধমত বা বিরুদ্ধভাব জাগ্রত হয়, তাহাকে তাঁহারা সহজেই সর্ব্বদা ভয় করিয়া চলেন। এইজন্য সে সকল দেশে আন্দোলন-আবেদনাদি সর্ব্বদাই ঈপ্সিতফলদানে সমর্থ হয় এবং সে সকল দেশে এই প্রণালীর রাজনৈতিক আন্দোলন ভিক্ষাবৃত্তির সমপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। কিন্তু এদেশে প্রজাশক্তি এখনো জাগ্রত হয় নাই। রাজকীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রজামণ্ডলীর যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা এখনো হয় নাই। এখানে রাজা বা রাজমন্ত্রী বা রাজকর্ম্মচারিগণ কেহই প্রজামুখাপেক্ষী নহেন, প্রজার মতামতের উপরে তাঁহাদের পদের ও কর্ম্মের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। বিলাতের প্রজাবর্গ আপনাদিগের প্রতিনিধিসভার সাহায্যে ভারতের শাসনসংরক্ষণাদির সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বড়লাট, ছোটলাট, জঙ্গীলাট, এ সকলই ভারতের প্রজামণ্ডলীর মতামতনিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। বিলাতের লোকের নিকটে ইঁহারা আপনাদিগের কর্ম্মের জন্য দায়ী, আমাদিগের দেশের প্রজামণ্ডলীর নিকটে নহেন। সুতরাং এখানে রাজনৈতিক আন্দোলন ও আবেদনাদি অনন্যোপায় হইয়াই সর্ব্বদা ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করিয়া থাকে। এতকাল ধরিয়া আমাদের সমুদায় রাজনৈতিক চেষ্টা ও অনুষ্ঠানাদি এইজন্যই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে উদরান্নের সংস্থান হইলেও, কখনো কুত্রাপি ভিক্ষুকের চরিত্রে শক্তিসঞ্চার হয় না। কিন্তু রাজনীতি কেবল যেন-তেন-প্রকারেণ জীবনোপায় সংগ্রহ করা নহে। রাজনীতি-

ক্ষেত্রে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তি পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া, এক মহামল্লযুদ্ধে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া থাকে। যেখানে প্রজা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, সেখানে রাজশক্তি নিরঙ্কুশভাবে আপনাকে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাবর্গের ধনমান সকলই আত্মসাৎ করিয়া লয় এবং প্রকৃতিপুঞ্জকে নির্ধন, নির্বীর্য্য, হীনমতি ও হীনবৃত্ত এবং মনুষ্যত্বের সমুদায় উচ্চতর অধিকার ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া পশুতুল্য করিয়া রাখে। এখানে ভিক্ষাবৃত্তি আর আত্মহত্যা একই কথা।

ভিক্ষার ধর্ম্মই এই যে, তাহা ভিক্ষুককে সর্ব্বদাই অশক্ত ও নির্বীর্য্য করিয়া তোলে। ভিক্ষুকের সফলতা আপনার শক্তিপ্রয়োগের উপরে নির্ভর করে না, অপরের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। ভিক্ষায় আত্মশক্তির উদ্বোধন অনাবশ্যক, দাতার অনুকম্পার উদ্রেক করিতে পারিলেই হইল। আমরাও এতকাল ধরিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাই করিয়া আসিয়াছি। আমরা আপনাদিগের শক্তিসাধন অপেক্ষা ইংরেজের অনুকম্পার উদ্দীপনকেই আমাদিগের সমুদায় রাজনৈতিক প্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য ধরিয়া, বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এদেশে ও বিশেষত বিলাতে তুমুল আন্দোলন করিয়া আসিয়াছি। এতদিন ধরিয়া যদি আমরা এই শক্তি ও এই অর্থ দেশের প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ও সংযোগসাধনের জন্য ব্যয় করিতাম, আজ আমাদের মধ্যে এমন এক প্রবল শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিত যে, সেই শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ইংরেজের সাধ্য ও সাহস হইত না যে, একমুহূর্ত্তের জন্যও এদেশের রাজশক্তিকে শুদ্ধ আপনার স্বজাতীয়ের বিবিধ স্বার্থসাধনে নিযুক্ত করে।

এতদিন এইরূপ আন্দোলনের একটা সামান্য যৌক্তিকতাও ছিল। আমরা এতকাল ইংরেজকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। ইংরেজও এতকাল বলিয়া আসিয়াছিল যে, ভারতের প্রজাপুঞ্জের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রাচীনজাতিকে অবনতির নিম্নতম স্তরে প্রাপ্ত হইয়া হাতে ধরিয়া জাতীয়জীবনের উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হইবে। চিরদিন ভারতকে আপনার পদলগ্ন করিয়া রাখা ইংরেজশাসনের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিস্তার করিয়া ক্রমে জগতের শ্রেষ্ঠজাতিসকলের সমকক্ষ করিয়া এই দেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে সভ্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাহার চরম লক্ষ্য। এই সকল স্তোভবাক্যে ইংরেজ এতকাল আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, হয় ত এক সময়ে তাহার আন্তরিক ভাবও এইরূপই ছিল। যতদিন আমরা ইংরেজকে বিশ্বাস করিতাম, ততদিন ইংরেজের নিকটে আত্মনিবেদন এতটা হীনকার্য্য ছিল না। কিন্তু এই প্রাচীন আদর্শ ইংরেজ এখন প্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতদিন ভারতে ব্রিটিশ-প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততকাল ভারতের প্রজাপুঞ্জকে সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগের স্বদেশে ইংরেজের পদানত থাকিতে

হইবে, ইংরেজ ইহা অসঙ্কোচে আজ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘোর দুর্দ্দিনে, সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজরাজমহিষী যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ইংরেজরাজপুরুষ টীকাটিপ্পনী করিয়া কার্য্যত তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। এই সকল কারণে এখন আর প্রাচীন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে চলিবে না। এখন দেশের প্রজা-শক্তিকে যদি জাগ্রত করিতে পারা যায়, তবেই আমাদিগের জাতীয়জীবনের সার্থকতা সম্ভব হইবে; অন্যথা নহে।

আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনাকে এইজন্ত এখন অন্তর্মুখীন হইতে হইবে। ইংরেজের অনুকম্পার আশা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগকে এখন আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি আপনারা আপনাদিগের উদ্ধারপথ খুঁজিয়া লইতে পারি, তবেই আমাদের মুক্তি আছে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—মুক্তির অন্য কোন পথ নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্য।

তোমার এ পুণ্যস্বচ্ছ জাহ্নবীর তীরে
হে বঙ্গজননি তব কুটীরে কুটীরে
যে পুরাণো শান্ত শক্তি ছিল সঙ্গোপনে,
আজি কোন্ বায়ুবেগে কোন্ শুভক্ষণে
এ ধূমান্ধ নগরীর বাতায়নপথে
প্রবেশিল তারি কণা আজি কোনমতে।
সন্তানের মৃতদেহে করেছ সঞ্চার
ঈষৎ চেতনা, তাই আশা বাঁচিবার।
নাহি তবু বল মনে নাহি বীর্য্য দেহে,
তাই আজি নাহি আশা এ দরিদ্রগেহে।
হিংসার প্রলয়বাণ চাহে ত্যজিবারে
পরেরে নাশিতে; তবু দুর্ভাগা না পারে
মঙ্গল-শান্তির তরে দিতে বলিদান
আপনার স্বার্থপুষ্ট দীনহীন প্রাণ।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবস্থা ও ব্যবস্থা।*

(৯ই ভাদ্র শুক্রবার টাউনহলে পঠিত

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশিরাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে, তখন সে বোলগুলি কেবলি মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেম্‌নি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, ফল ফলিবার সময় সুদূরে নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলম্বন, বিদেশী কদাচ নহে,—ইত্যাদি; নানা মুখ হইতে এই যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা উপস্থিতমত মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্ব্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আসিতেছে, তাহারও সূচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্য যে সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই, আজ তাহা অতি অনায়াসেই চিরন্তন সত্যের ন্যায় গ্রহণ করিতেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে পরের দ্বারস্থ হইবার জন্য নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্য, এ কথা আজ আমরা একদিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি, বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই।

অতএব আমার মুখে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন, তাঁহার অগ্নিময় তর্জ্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা-কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্ব্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধুশুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও

* গতবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোনো কোনো অংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে।

নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্ত্তী হইতে থাকে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তখন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতসাধনসম্বন্ধে নিজের কাছে যে সকল আশা করি না, পরের কাছ হইতে সেই সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর। নিরাশ হইবার মত আঘাত বারবার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

"আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও"—এই যে সকল দাবী আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত করিয়াছি, ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মানুষমাত্রেরই অধিকার সমান, এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্তু সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে, যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে, তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই, তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে, তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? সে প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব সাম্যের দরবার করিবার পূর্ব্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে, ধর্ম্মে, প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে ইহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন, এমন ইহাদের ইতিহাসে কোথাও নাই। এমন কি, তাহারা ইহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে, এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ভারতবর্ষের রাজাদের যখন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, তখন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি দুইএকটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম্ম, সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য কোনো অংশে বিসর্জ্জন না দিয়া হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশিরূপে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়া আসিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরাজিত বলিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে নাই। ইহার সহিত ইংরেজ-উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতী উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার বিবরণ হয় ত অনেকে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌পত্রে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলে স্থির

করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবসায় অথবা বাসের জন্য তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি কেহ দেয়, তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল বাড়ী এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে সকল হৌস্ ঐশিয়দিগকে কোনোপ্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভাগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, সেজন্য একটা Vigilance Association বা চৌকিদারদল বাঁধিতে হইবে। সভায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের সহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবসায়ীদিগকে যেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন কি ইংলণ্ডের কোনো সহরে দেওয়া সম্ভব হইত? ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, সেখানে তাহাদিগকে "লিঞ্চ" করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে "লিঞ্চ্" করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের মনোভাবের এই যে সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহা লইয়া আমরা যেন অবোধের মত উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর করিতে হয়, তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই জানে।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হেয়জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে, সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন, তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ,—এ কথা আমরা কখনো ভুলি না। এইজন্য যে সকল জাতিকে আমরা অনার্য্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি—আমরাও আছি, তাহারাও থাক্; বলিয়াছি—প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভাল। য়ুরোপ বলে, জন্তুকে খাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘৃণা করে, তাহা নহে,

তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্ত্তব্য বলিয়া জানে। অন্যকে রক্ষা করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ্ খাইয়া যায়, তবেই অন্যের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র খাপ্ না খাইবে, সে অংশে দয়ামায়া-বাচবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে দুইএকটা প্রমাণ আছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত, যাহা দেখিয়া ইংরেজ ঈর্ষা অনুভব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজনির্ম্মাণের বিদ্যা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের "দেশের কথা" নামক বইখানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হোক্, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সঙ্কোচ অনুভব করে নাই।

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত-বড় অধর্ম্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্রপশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্ম্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ জগতে অ্যাংলো-স্যাক্সন্ জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা চরম ধর্ম্ম জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মত নির্জ্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়, তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই।

অ্যাংলোস্যাক্সন যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এদেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেকদিন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে, অ্যাংলোস্যাক্সন্-মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম দুর্ম্মূল্য বস্তুও হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূম করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সত্যটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুখের কথায় যতই আশ্বাস দিতেছেন, আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের

নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এমন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় ত আর এক দলের দয়া হইতে পারে, প্রাতঃকালে যদি অনুগ্রহ না পাওয়া যায় ত যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা ত আমাদের একটি নয়, এইজন্য বারবার সহস্রবার তাড়া খাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না—এম্‌নি আমাদের মুস্কিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভাগ্যে একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে,—একজন বিদেশী রাজা নহে। একটি দূরবর্ত্তী সমগ্র জাতির কর্ত্তৃত্বভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অনুকূল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?

অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নৈতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্ত্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রবৃত্ত, তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে খেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম্ম করিতে চান, অবিশ্বাসের নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক রাখিতে হয়। এই যে অবিশ্বাস, ইহা অন্যের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষাবশত নহে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্ত্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং সেই অবিশ্বাস যে কিরূপ নিয়মভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্ম্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিশ্বাসের জন্য ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐক্যের যে কি শক্তি, কি মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্ত্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না—উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই, সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে, আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্ব্বলতার

কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল্-হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ কথা বুঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে সকল পোলিটিকাল্ প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা যদি ভিক্ষুকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত, তাহা হইলেও হয় ত মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত—কিন্তু তাহারা গর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্দ্ধাকে লালন করা হয়—এইজন্য ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই সকল পোলিটিকাল্ সভা কৃতকার্য্যতার বল লাভ করিতে পারে না;—একত্র হইবার যে শক্তি, তাহা ক্ষণকালের জন্য পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে স্ফূর্ত্তি, তাহা পায় না। সুতরাং নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মত পঙ্গু হইয়াই থাকে—সে কেবল পরের রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল্—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে—আর, ষোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে কঠিন শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অশ্রদ্ধেয় তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্য আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুস্কিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন প্রকৃতিবশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অনুকূল নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্যই য়ুনিভার্সিটি-সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্মেণ্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব্ব করিবার সঙ্কল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতর সঙ্কিণ্ণ অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত—আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না, তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না, এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে—অধিকাংশস্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই, তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরেশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষা-বৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।

বস্তুত ইংরেজের উপরে রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন—যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ী যাওয়া। সে বেগের হ্রাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে সেই শ্বশুর-বাড়ীতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয়, তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড় কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট্‌ বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই, তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে—তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য-পরতাও হয় ত আমাদের সমাজে একটা বড়-রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল—হয় ত স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে, সে পক্ষেও আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনী ক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে, তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতী জিনিষ কেনা বন্ধ করিয়া দেশী

জিনিষ কিনিবার জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই সঙ্কল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্ত্তমান উদ্যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি, তবে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে—এ সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে—সে সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিক্‌টা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্ব্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশীজিনিষ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিষটা দেশী নহে, তাহার ব্যবহারে বাধা হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশীজিনিষ-ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম, বিলাস, আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছুপরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্যদ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশীজিনিষ ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান্ সঙ্কল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরূপে কোনো একটা কর্ম্মের দ্বারা, কাঠিন্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনের জন্য আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে—আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই। কখনো ভ্রমেও মনে করি নাই, ইহার দ্বারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে—ইহার দ্বারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই—ইহা আমাদের চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যগ্রতাকে, আমাদের সুখদুঃখনিরপেক্ষ, ফলাফলবিচারবিহীন আত্মদানের ব্যাকুলতাকে দুর্নিবারবেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে—সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে, তাহার নির্ব্বাণহীন প্রদীপ জ্বলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি, তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না,

তখনি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি—নিজেকে আর দীনহীন দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আজ আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্ব্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা দুঃখবহন করিতে, বিলাসত্যাগ করিতে, ক্ষতিস্বীকার করিতে অসম্মত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রীর মত একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্য্যের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্য্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন—আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্ত্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে—আমাদের পুণ্যনদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দুমুসলমানখৃষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেষণ করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দ্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি—দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখদুঃখ, এক বিরাট্ প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জ্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজীস্কুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত, ইহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্য্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোন উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং

অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য যাহারা কোনোদিন চিন্তা করিত না, তাহারা চিন্তা করিতেছে; যাহারা পরিহাস করিত, তাহারা স্তব্ধ হইয়াছে; যাহারা কোনো মহান্ সঙ্কল্পের দিকে তাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিতে জানিত না, তাহারাও যেন কিছু অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য উদ্যম অনুভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক কথাতেই পরের দ্বারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, তাহারাও আজ কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা ভাল করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখুন্। ইতিপূর্ব্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কণ্ঠকৌশল, অনেক কোলাহল, অনেক সভা আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্য সহস্র অত্যুক্তিদ্বারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ করিতে পারি নাই, দেশেরও ঔদাসীন্য দূর করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বঙ্গবিভাগের উদ্যোগ বাঙালির পক্ষে পরম শোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে নিরুপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই অনুভব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করিতেছি,—পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে আজ আমরা ত্যাগ করিবার, দুঃখ-ভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ আমাদের বালকেরাও বলিতেছে—পরিত্যাগ কর, বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের বিলাস পরিহার কর—সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না;—এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমরা কোথা হইতে পাইলাম! সুখেই হউক্ আর দুঃখেই হউক্, সম্পদেই হউক আর বিপদেই হউক্, হৃদয়ে হৃদয়ে যথার্থভাবে মিলন হইলেই যাঁহার আবির্ভাব আর মুহূর্ত্তকাল গোপন থাকে না, তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন,—দুঃখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে, সেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাসাদের সচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম তবে আমাদের অন্তরের এই উদার উদ্যমটুকু কখনই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেইজন্যই আজ আমাদের উৎসাহ্ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিন নহে, কিন্তু সঙ্কটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরের

শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে, তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্ব্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ্ আছে, এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি, সেই জাগ্রত পুরুষ, কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, গবর্মেণ্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন, তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া-কহিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, বিলাতি-জিনিষ-কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া লও। তাঁহার অনুশাসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন্, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে—তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না—তোমরা যে আজ একই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছ, ইহাতেই আনন্দিত হও এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য সকলের মনে একই উদ্যম জন্মিয়াছে, ইহার দ্বারাই সার্থকতা লাভ কর!

অতএব এখন কিছুদিনের জন্য কেবলমাত্র একটা হৃদয়েরই আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ সুযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংযত করিয়া এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আত্মন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি,—আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালী বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি, আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায়, তবে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, সহরবাসী ও পল্লিবাসী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সঙ্ঘটিত হইতে থাকে, তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুতশক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু অনির্দ্দিষ্টভাবে, সাধারণভাবে এ কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সে দিন নাই,—আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাবমোচন করা, নিজেদের কর্ত্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্ম্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব—তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্ব্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব—তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে দুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেইজন্যই আমি বিরক্তি ও বিদ্রূপ উদ্রেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং সকলকে আশ্বস্ত করিবার জন্য একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা রুশীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ বাহ্লীকপ্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্ব্বে ষ্টেট্স্‌ম্যান্‌পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহ্লীকপ্রদেশে জর্জ্জীয় ও আর্ম্মাণিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না, তাহা জানি না! সেখানে "সকারটুভেলিষ্ট"নামধারী একটি জর্জ্জীয় "ন্যাশনালিষ্ট"সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে—ইহারা "কার্স্‌"প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্যজিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপনবিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন।

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the Government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education Delyanoff, who by the way, was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি—অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্ম্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামী নহে—বস্তুত দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত-

লোক যে গবর্মেণ্টের চাকরীতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না, কেবল চাকরীর পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিব? চাকরীর খাতিরে আমাদের দুর্ব্বলতা কতদূর বাড়িতেছে, তাহা কি আমরা জানি না? আমরা মনিবকে খুসি করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি—এই চাকরী আরো বিস্তার করিতে হইবে? দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কর্ম্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম, তবে গবর্মেণ্টের আপিস রাক্ষসের মত আমাদের দেশের শিক্ষিত-লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরী নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে! যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে পারেন, আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কি শক্তি আছে, তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাসের দ্বারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম, যেখানে দেশের কাজ করিতেছি, এই ধারণা সর্ব্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে দেশকে ভালবাস, এ কথা নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে, একদিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্যদিকে প্রত্যেক অভাবের জন্য পরের সাহায্যের প্রার্থী হওয়া—এমনতর অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না, দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিত-সমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জজ্জীয়গণ, আর্ম্মাণিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে, আমরা কি সেই সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্ব-পারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধানচেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লির শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলায়-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্ত্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে—নতুবা বলিব, আজ আমরা যে একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা মাদকতা-মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয়সম্পদ্‌রূপে গণ্য হইতে

পারে না—বরঞ্চ তাহার বিপরীত! দৃষ্টান্ত-স্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। এক সময় পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিষ ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্মেণ্টের আপিসে-গড়া জিনিষ হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায়, তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মত চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েৎপদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে—পঞ্চায়েৎ ম্যাজিষ্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপরপক্ষ বলিয়া জানিবে, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে—ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ এদেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল, সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্ত্তমান আছে—যে পঞ্চায়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত—যে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণকার্য্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত, সেই সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেণ্টের বেনো-জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মত ঘুচিল। দেশের জিনিষ হইয়া তাহারা যে কাজ করিত, গবর্মেণ্টের জিনিষ হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই, তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে যাহা পাই, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিষ আমরা পাইতেই পারি না। সুতরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব, সে-জন্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে—পরের কাছ হইতে যাহা পাইব, সেজন্য পরের কাছে না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয়, তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে—যাহা স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরি কেন?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষীদের অধিক সুদে কর্জ্জ দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না—অতএব গবর্মেণ্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে, তোমরা অল্পসুদে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন কর, তবে নিজে খর্চ্চের ডাকিয়া-আনিয়া আমাদের দেশের চাষীদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না? যাহারা যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ্, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এমনি করিয়া বাঁধা রাখিতে হইবে? আমরা

যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব, সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকিব, দেশকে স্বেচ্ছাকৃত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব, এ কথা কি বুঝা এতই কঠিন? পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের পক্ষে উপস্থিত সুবিধার কারণ যেমনই হৌক্, তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে, আমাদের মোহজাল ততই দুশ্চেদ্য হইয়া উঠিতে থাকিবে।

অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারী পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্ব্বেই আমাদের নিজের পল্লিপঞ্চায়েৎকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্ব্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে—কারণ, এস্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্ব্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলাসাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলাসাহিত্যে সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক বাংলাবই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। গবর্মেণ্টের উপাধি, পুরস্কার, প্রসাদের প্রলোভন বাংলাসাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য বাঙালির স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয় ত গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থসংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয় ত বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্ত্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড় করিয়া দেখিতে পাই, কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক্ দীন হউক্, এ রাজার প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী নহে, আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের বাংলাবইগুলির প্রতি ন্যূনাধিকপরিমাণে অনেকদিন হইতেই সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে স্কুলবইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে, তাহা কাহারো অগোচর নাই।

এই যে স্বাধীন বাংলাসাহিত্য, যাহার মধ্যে বাঙালী নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়িজালের মত বাংলার পূর্ব্বপশ্চিম, উত্তরদক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে;

যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয়, তবে বাংলাসাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য্য হইবে। বাংলাভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলাসাহিত্য যত উন্নত-সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালীজাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশিরামদাসের মহাভারত আজ পর্য্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ একমুহূর্ত্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্ব্বাচনপূর্ব্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ-তর্ক-বিতর্ক না করিয়া আমরা যে কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাঁচদশ জনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্ব্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্ত্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরিবার, প্রতিবেশী ও পল্লিকে লইয়া স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধানসম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (Co-operative Store), ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিশ-নিষ্পত্তির সভা ও নির্দ্দোষ আমোদের মিলন-গৃহ থাকিবে।

এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ডখণ্ডভাবে দেশের নানাস্থানে এইরূপ একএকটি কর্ত্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগ-সূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গ-প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে—এবং পর্য্যায়ক্রমে একএকটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার—এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্ত্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে, বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলি দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত্র করে, তাহার

মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলি অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারো চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই সয়তানের প্রদত্ত বিষ, যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্যরক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে—ইহাতে মহান্ সঙ্কল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালীকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চ্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে—আপনাকে খর্ব্ব করিয়া আপনাদিগকে বড় করিবার এই সাধনা, গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা—ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে, তখন আমরা সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোন শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব, তখন আমরা দাসত্ব করিব না—তা আমাদের প্রভু যত বড়ই প্রবল হউন্। জল যখন জমিয়া কঠিন হয়, তখন সে লোহার পাইপ্‌কেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মত তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শতশত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি—জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণবাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব্বপশ্চিম, জননীর বামদক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতে পৃথক্ করিতে পারে, এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোন কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি যদি আমাদের সকলদিকে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশঙ্কা করি, তবে কোন কৌশললব্ধ সুযোগে, কোন প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহে

আমাদিগকে অধিকদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধি-মত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনি ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃ-গণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখনি ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য—তখনি অনুভব করিব, 'বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঙ্গুলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জ্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রায় সহায়তা কেহ করিয়ো না—আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না— বিধাতার রুদ্রমূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

প্রেমের কামনা।

১

আমি ত বুঝি না, তারে কেন ভালবাসি,
সেই হাসি—সেই মুখ,
সেই প্রেমভরা বুক :
যে বলে বলুক রূপে নাহি জ্যোৎস্নাহাসি,
আমি ভালবাসি তার শ্যাম শোভারাশি

২

চাহি না ফুলের রূপ, জ্যোৎস্না হাসিময়,
ফুল ফেলে—জ্যোৎস্না ফেলে,
ভালবাসি অবহেলে,
নব নীরদের ছবি, শ্যাম কিশলয়,
তাই ও রূপের কাছে কোন রূপ নয়।

৩

যত দেখি, রূপ তত উথলে নয়নে ;
প্রেম যেন মূর্ত্ত হ'য়ে,
আছে তারি রূপ ল'য়ে,
তাই সে আনন্দচ্ছবি সদা জাগে মনে,
প্রীতির নির্ঝর ঝরে তার দরশনে।

৪

চিরপরিচিত কোন সঙ্গীত মধুর,—
যেমন পাগল করে,
যেমন মানস হরে,
তেমনি সে রূপে বুঝি আছে কোন সুর,
তিরপিত করে মোর পরাণ বিধুর।

৫

যেমন বিশ্বের আলো, বাতাস যেমন,
তেমনি গো রূপ তার
ব্যাপি' মোর চারিধার,
তেমনি উদার আর প্রশান্ত তেমন,
তাই ভালবাসি তায় থাকিতে মগন।

৬

সাধ যায়—ফুল হ'য়ে হই উপচার ;
ফুটে থাকি তারি তরে,
তেমনি আনন্দভরে ;
আপনারে করে' রাখি পূজা-উপহার,
তাতেই কৃতার্থ করি জীবন আমার।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

দেশের মাটি।

(বাউলের সুর)

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা—
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা।
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কিবা তোমায়
দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ওমা বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা!

বঙ্গদর্শন।

বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা।

বাংলাদেশের প্রবল ও প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন-আবেদনাদির আন্তরিক অসারতা বর্ত্তমান বঙ্গবিভাগসম্বন্ধীয় সাধারণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে অতিশয় ক্লেশকররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে রাজকীয়-শাসনসংরক্ষণ-বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে একটা ঐক্যভাব ও ঘননিবিষ্টতা গড়িয়া উঠিয়াছে, যে ঐক্য ও পরস্পরের সঙ্গে গভীর সহানুভূতি ও সতেজ সহকারিতার সম্বন্ধ ইদানীন্তন রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও আধুনিক শাসননীতির নিষ্পেষণে ও নিপীড়নে আরো ঘনীভূত ও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছিল, ইংরেজরাজ ইহা হইতে কথঞ্চিৎপরিমাণে আপনার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল বা অশান্তি আশঙ্কা করিয়া এই ঐক্যবন্ধন ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া, সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে ঘোষণা বাহির হইয়াছে যে, বাংলাদেশের আপামর সাধারণ সকলে ঘোরতর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতই কি তাই হইয়াছে? বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবের বন্যা ছুটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ভাবকে কি শোকনামে কদাপি অভিহিত করিতে পারা যায়? শোকাহত হইয়াই কি বাংলার ধনিবর্গ "প্রভো সংহর সংহর" বলিয়া রাজদ্বারে তারস্বরে চীৎকার ও তারযোগে আবেদন-আর্ত্তনাদ তুলিয়াছেন? শোকাচ্ছন্ন হইয়াই কি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ইংরেজের কোমল-কম্বল-লালিত সুষুপ্তিকে ভঙ্গ করিবার জন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সশরীরে বিলাতযাত্রা করিয়া প্রবল ক্রন্দনের রোল তুলিবার বিপুল আয়োজন করিতেছেন? যে ভাবে দেশ মাতিয়াছে, তাহাকে কি শোক বলে? এ সকল প্রশ্ন তুলিলেই আমাদিগের এই সকল আন্দোলন-আস্ফালনের আন্তরিক অসারতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এ ভাবকে আমরা শোক বলিতেছি শুদ্ধ এইজন্য যে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ও সত্য প্রকৃতি ব্যক্ত করিতে পারি, ইংরেজের লোহিত-লোচনসম্মুখে আমাদের প্রাণে এমন সাহস হয় না। গভীর বিরাগ, বিজাতীয় বিদ্বেষ, অপরিসীম সন্দিগ্ধতা ও অবিশ্বাস, এ সকলেই আমাদের প্রাণে ইংরেজরাজের এই অমঙ্গল-

সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের দণ্ডবিধির ভয়ে এ সকল ভাবকে আমরা যথাসম্ভাবে ব্যক্ত করিতে সাহস পাই না। তাই বলিয়া আমরা আমাদের অমল লোচনকে কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া এই অলীক শোকের হাহাকার তুলিয়াছি। ইংরেজের চক্ষে ধূলা দিবার ইচ্ছাতেই আমরা হাতে কালো ফিতা বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তারই জন্য আমরা আমাদিগের বিরাট্ সভার দিনে বহুল অর্থের অপব্যয় করিয়া সভামণ্ডপকে কৃষ্ণবস্ত্রমণ্ডিত করিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। তারই জন্য আমরা এই অলীক শোকের কথা এমন তারস্বরে দেশমধ্যে প্রচার করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে যে, দেশে এই বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, ইহা নহে।

ফলত, ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে শোকের কারণই বা কি আছে? ইংরেজ তাহার স্বার্থসাধনের জন্যই এদেশে আসিয়াছে, আমাদিগের উদ্ধারসাধনের জন্য নহে। এতদিনেও যদি আমরা এই সামান্য কথাটা না বুঝিলাম, তবে আমাদিগের বিচারবুদ্ধিকে ধিক্,—শতাধিক ধিক্। আপনার স্বার্থসাধন করিতে যাইয়া, আপনার শ্রেষ্ঠবলপ্রয়োগে ইংরেজ যদি আমাদের অনিষ্টসাধন করিতে যায়, তাহাতে আমাদের ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে, শোকের কারণ কি আছে, বুঝি না। অভিমানেও একপ্রকার শোকের উদ্রেক হয়, কিন্তু ইংরেজ কি এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে এতটাই ভালবাসিয়া আসিয়াছে যে, আজ সে সহসা বিমুখ হইল বলিয়া স্ত্রীজনস্বভাবসুলভ অভিমানভরে আমরা ক্রন্দন করিতে বসিব? ইংরেজ প্রেমের হাট বসাইতে এদেশে আসে নাই, আপনার পণ্য-বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। এ তো অতিশয় জানা কথা। তবে, আমাদিগকে হতবীর্য্য ও হীনবল করিয়া সে আপনার প্রভুশক্তিকে সর্ব্ববিধ উপায়ে এদেশে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে, ইহার জন্য আমরা এত অধীর হইয়া এরূপ শোকের অভিনয় করিব কেন? ইহাতে আমাদের অকল্যাণ ভিন্ন কদাপি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

অলীক কথা লইয়া অতিশয় আলোচনা-আন্দোলন করিলে, সেই শব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাব ও চরিত্র পর্য্যন্ত আন্দোলনকারীর স্বভাবে স্বল্পবস্তর সংক্রমিত হইয়া থাকে, ইহা মনস্তত্ত্বের একটা অতি স্থূল কথা। এইজন্যই এই শোকধ্বনিতে আমাদের বীর্য্যহানির বিশেষ আশঙ্কা করিতেছি। শোকে লোককে অধীর করে,—আমরা চাই আজ অশেষ ধৈর্য্য। শোকে লোককে ম্রিয়মাণ করে,—আমরা চাই আজ প্রবলজীবনের অপরাজেয় বীর্য্য। শোকে মানুষকে হতাশ করে,—আমরা চাই আজ বিপুল বিশ্বের সমগ্র আশাকে হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া বিশ্বমানবের বিশাল ক্রোড়ে বাঙালীজাতির জন্য যে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট স্থান অনাদিকাল হইতে বিশ্বের অবিরাম পরিণামের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে উপবেশন করিতে। জাতীয়জীবনের এই অভিনব উদ্দীপনাকালে কি এই অলীক শোকের অভিনয় আমাদিগকে আর সাজে? ইহাতে ইংরেজের প্রসাদলাভ তো হইবেই না, আমাদেরও শক্তি বা চরিত্র লাভ হইবে না।

আমরা আপনাদিগের অন্তরে শক্তি বা চরিত্র লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল ইংরেজরাজের প্রসাদলাভের জন্য আকুল হইয়া এতকাল বিপুল অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন-অনুষ্ঠানের দ্বারা এই-জন্যই আমরা ক্রমশ হতাশ্বাস ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছি। ইংরেজরাজনীতি ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের কতকগুলি বাঁধা গত সাধিয়া সাধিয়া আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা, আলোচনা ও চেষ্টার মৌলিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আজ পর্য্যন্ত তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, ইহারই জন্য আমাদের সমুদায় চেষ্টা এমন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এখনো যদি অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে না পারি, বঙ্গবিভাগসম্বন্ধীয় যে আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে, তাহাও নিশ্চয়ই একান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এইজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত অবস্থাটা যে কি, তাহা বিশদরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে; অলীক শব্দসন্ধানে যাইয়া শুদ্ধ পথভ্রান্ত হইয়া শক্তি-ক্ষয় করিলে চলিবে না। প্রথমত ইংরেজ যদিই বা বাংলাদেশকে বিভাগ করিয়া ফেলে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত অনিষ্টসম্ভাবনা কি, ইহা বুঝিতে হইবে; তার পর, সে কেন এ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছে, তাহারই বা ইহাতে স্বার্থ বা সুবিধা কি, এ কথাও ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ আমাদিগের দিক্ দিয়া ও ইংরেজের দিক্ দিয়া, এই উভয় দিক্ হইতে ধীরভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে, এবং প্রকৃত অবস্থা একবার পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না।

প্রথমত বাংলাদেশ যদি সত্যসত্যই বিভক্ত হইয়া যায়, তাহাতে আমাদের কিরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, ইহার আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সত্যকথাটা পরিষ্কার ভাষায় আজ পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সে কথাটা যে কেহ বোঝেন নাই, এমন মনে করি না। কথাটা এত জটিল নয় যে, তাহা অতি সামান্য বুদ্ধি লইয়াও কেহ বুঝিতে পারিবেন না। বিষয়টা চক্ষের উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ মৃতদেহ দেখিয়া ভীরু লোকে যেমন চোক বুজিয়া সরিয়া যায়,—কি জানি তাহা দেখিলে ও তাহার কথা ব্যক্ত করিলে পরিণামে আপনাকেই খুনদায়ে পড়িতে হয়, সেইরূপ কি জানি এই বঙ্গ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্যটা কি, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে রাজদ্বারে রাজভক্তিহীনতা-অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইতে হয়, এই ভয়ে বুঝিয়া-সুঝিয়াও অনেকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহসী হন নাই। গতবৎসর এই বিষয়ে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই এই মূল উদ্দেশ্যটাকে চাপা দিয়া, অবান্তর বিষয়েরই আলোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এইজন্য এত সহজে লাট কার্জ্জন তাঁহার ঢাকা, মৈমনসিং ও চট্টগ্রামের বক্তৃতায়, বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে আমরা যা-কিছু আপত্তি তুলিয়াছিলাম, তাহা অমন করিয়া খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন। সত্য কথাটা

একবার সাহস করিয়া যদি আমরা বলিতে পারিতাম, শাসনের সুবিধার জন্য নহে, কিন্তু গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে এই বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, এ কথা যদি স্পষ্ট করিয়া একবার বলিতাম, লাট কার্জ্জন তাঁহার অসাধারণ বিচারশক্তি ও অলোককুটিল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াও আমাদের আপত্তিখণ্ডন বা আমাদিগের যুক্তিবলকে আপাততঃ অধিকৃত ও পরাভূত করিতে পারিতেন না।

বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশস্থলেই আমার নিকটে নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। সাক্ষাৎ-ভাবে এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক বা নৈতিক, বা অর্থগত বা সমাজগত কোন বিশেষ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে, ইহা আমি মনে করি না। আমাদের মানসিক জীবন দেশের পাঠশালা, স্কুল, কালেজ ও ইউনিভার্সিটি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শিক্ষাবিষয়ক এই সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজরাজের শিক্ষানীতি দ্বারা সর্ব্বত্রই পরিচালিত হইতেছে। সে নীতি পূর্ব্ববঙ্গে যেমন, পশ্চিমবঙ্গেও সেইরূপই সমভাবে কার্য্য করিবে। পূর্ব্বেকার অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, এখন যে একই শিক্ষানীতি দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক-শিক্ষার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হইতেছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। বাংলা বিভক্ত হইয়া, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই ভাগ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেই যে এই শিক্ষানীতি দুই বিভাগে দুইরূপ হইবে, তাহা নহে। সুতরাং এই বিভাগপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, আমাদের মানসিক জীবনে সাক্ষাৎরূপে যে কোনপ্রকারের বিশেষ বিসদৃশ ভাব বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙালীজাতির বর্ত্তমান মানসিক ঐক্যবন্ধন শিথিল বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সমস্যার সমতা হইতে চিন্তা, ভাব ও আদর্শ বিষয়ে জাতীয়জীবনে যে মানসিক ঐক্য স্থাপিত হয়, একই শাসনাধীনে বাস করিয়া বাঙালীজাতির মধ্যে যে ঐক্যবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল, এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা তাহাও যে সাক্ষাৎভাবে শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কাও করি না। কারণ, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা, নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনেও, প্রজামণ্ডলীর অবস্থারই অনুসরণ করিয়া রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বাংলাদেশের প্রজাসাধারণের সর্ব্ববিধ অবস্থা পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যখন একইরূপ রহিয়াছে, ও মোটামুটি একইরূপ থাকিয়াও যাইবে, তখন বাংলার দুই বিভাগে যে রাজকীয়-বিধিব্যবস্থা-জনিত কোন একটা বিশেষ পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে পারিবে, এমন ভাবিবার কোন উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিম-বঙ্গে যে সকল আইনকানুন সময়-সময় প্রচলিত হইবে, পূর্ব্ববঙ্গেও প্রায় তাহাই হইবে।

এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে বাংলা-সাহিত্যের কোন অনিষ্ট হইবে, এমনও সম্ভাবনা

দেখি না। বাংলাসাহিত্য ইংরেজের সংসর্গে অসাধারণ সজীবতা ও প্রসার লাভ করিয়াছে, সত্য ; কিন্তু তাহা ইংরেজের শাসননীতির দ্বারা হয় নাই, ইংরেজী ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যেরই দ্বারা হইয়াছে। বাংলা বিভক্ত হইয়া গেলে দেশমধ্যে পাশ্চাত্যসাধনার চর্চ্চা ও প্রভাব যে কোনরূপে হ্রাস হইয়া যাইবে, তাহার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অতএব তদ্দ্বারা যে বাংলাসাহিত্যের শক্তিহ্রাস বা অধিকার সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ হইবে, এ আশঙ্কাও করি না। বাংলাসাহিত্য বাঙালীজাতির সাধারণ সম্পত্তি। এই সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পূর্ব্বে যেমন পশ্চিম ও পূর্ব্ব বঙ্গ যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছে, বঙ্গদেশ যদি রাজ-আদেশে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়, তাহার পরেও সেইরূপ পূর্ব্বপশ্চিম সম্মিলিত হইয়াই, এই সাধারণ সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টিসাধনে রত হইবে। স্কুলপাঠ্যের বাহিরে বাংলাসাহিত্যের উপরে বিদেশীয় ইংরেজরাজের হাত সাক্ষাৎভাবে আজ পর্য্যন্ত পড়ে নাই, কখনো পড়িতে পারিবেও না। আর স্কুলের পাঠ্যের দ্বারা সাহিত্যের দেহপুষ্টি কোথাও হয় না, আমাদের মধ্যেও হইবে না। এই সকল কারণে এই বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেই যে অবশ্যম্ভাবিরূপে বাংলাসাহিত্যের উপরে কোন বিশেষ অনিষ্টপাত হইবে, এইরূপ ভয় করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

এতদ্দ্বারা যে আমাদের কোন অর্থগত অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে, এ আশঙ্কাও করি না। পণ্য ও বাণিজ্য, অর্থাগমের এই প্রশস্ত পন্থা। এখন দেশে যে পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হইতেছে, বাংলাদেশে একজন লাটের স্থানে দুইজন লাট প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে তাহাতে কোন হ্রাসবৃদ্ধি হইবে, এমন কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। গ্রাহকের প্রয়োজন দ্বারা সর্ব্বত্রই পণ্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে,—রাজকীয় বিধিব্যবস্থার দ্বারা নহে। ভারতে ইংরেজরাজ্যে একটা সর্ব্বজনীন অর্থনীতি বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ভারতের পণ্যবৃদ্ধিতে ভারতবাসীর দৈন্যনিবারণের প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে, সত্য। ভারতের পণ্যে, এই ব্রিটিশ অর্থনীতিপ্রভাবে, ভারতসন্তানগণের দৈন্য দূর হয় নাই, হইতেছে না ; ব্রিটিশেরই ধনাগার পরিপূর্ণ ও স্ফীতকায় হইয়া যাইতেছে। বাংলাদেশের পূর্ব্বপশ্চিমবিভাগ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্তই থাকুক, আর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নই হইয়া যাউক,—তাহা দ্বারা এই সর্ব্বগ্রাসী ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রকৃতি কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবে না। সুতরাং যতদিন এই অর্থনীতি রাজকীয় শাসনের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকে, ততদিন কিছুতেই আমাদের এই নিদারুণ দৈন্য দূর হইবে না ;—বাংলা এক থাকুক আর দুই হউক, এ বিষয়ে আমাদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। অন্যদিকে, বাংলার বাণিজ্যের লাভ যাহাদেরই মুষ্টিগত হউক না কেন,—বাংলাবিভাগের দ্বারা এই বাণিজ্যের পরিমাণের কিছুতেই হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। কলিকাতার ব্যবসায়িগণ ও ইংরেজ বণিক্‌সম্প্রদায় এখন বাংলার সমুদায় বহির্বাণিজ্যকে আপনাদের

হস্তগত রাখিয়াছেন; বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, এই বহির্বাণিজ্যস্রোত দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, এক ভাগ চট্টগ্রামে চলিয়া যাইবে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে কলিকাতার যে ক্ষতি হইবে, চট্টগ্রামের সে-পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি হইবেই হইবে। বঙ্গবিভাগে কলিকাতার ব্যবসায়ী ও বণিক্‌সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, কিন্তু সমষ্টিভাবে বিচার করিলে বাংলাদেশের বা বাঙালীজাতির অর্থগত লাভালাভ তদ্দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বরং চট্টগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে মোটের উপরে যে বাণিজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা আছে, তাহা দ্বারা কলিকাতা-বন্দরের বাণিজ্যের যতটুকু হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎপরিমাণে অধিক হইবারই কথা। সে অবস্থায় চট্টগ্রাম কলিকাতার বাণিজ্য যতটা আত্মসাৎ করিবে, তদপেক্ষা যা-কিছু নূতন পণ্য আমদানি-রপ্তানি করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে, এই নূতন বন্দরের প্রতিষ্ঠাদ্বারা সমগ্র বাংলা-দেশের স্বল্পবিস্তর লাভবান্ হইবারই কথা।

সামাজিক বিষয়েও এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের যে কোন গুরুতর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, এমনও মনে হয় না। ইংরেজ আইনকানুন ও সিপাইসান্ত্রীরই কর্ত্তা, আমাদের সমাজের প্রভু নহে। আমাদিগের সামাজিক জীবন কার্য্যত ইংরেজাধিকারের বাহিরে এখনো অনেকটাই পড়িয়া রহিয়াছে। ইংরেজের প্রতি আমাদের বিশ্বাসভক্তি যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর যে কখনো আমরা স্বেচ্ছায় তাহাকে আমাদিগের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া আমাদিগের সামাজিক নেতৃত্বে বরণ করিব, এ আশা একদিন হয় ত আমরা কেহ কেহ করিতাম, এখন সে আশঙ্কা আর নাই। বিষম-উৎসাহ-গ্রস্ত সমাজসংস্কারকও এখন আর ইংরেজের হস্তে আপনাদের সামাজিক কুরীতি-কুনীতি-সংশোধনের ভার কিঞ্চিৎপরিমাণেও অর্পণ করিতে সাহস পাইবে না। ইংরেজ দেশীয় জনসাধারণের এতটাই শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছে যে, সে যাহা স্পর্শ করিবে, তাহারই বিরুদ্ধে লোকের মন প্রবলভাবে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব ইংরেজ বাংলা-দেশকে দ্বিখণ্ডই করুক বা ত্রিশতখণ্ডই করুক, বাঙালী হিন্দুমুসলমানের সামাজিক জীবন তদ্দ্বারা কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে ভালমন্দ কোনদিকেই পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান আন্দোলনে এ সকল মানসিক, নৈতিক, অর্থগত বা সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধে বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা বর্ণিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অধিকাংশ-স্থলেই নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। এই সকল আপত্তির ও আশঙ্কার কোন মৌলিক শক্তি ও সারবত্তা নাই বলিয়াই ইংরেজ এই আন্দোলনকে নিতান্তই কল্পনাজড়িত ও শুষ্ক ভাবুকতাপ্রধান বা Sentimental বলিয়া মনে করিতেছে। কথাটাও তাহাই। এই বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবে আমাদের একটা বহুকালপোষিত ভাবে আঘাত লাগিয়াছে। আমরা বাঙালী সকলে এক হইয়া আছি, একই হইয়া থাকিতে চাই; আমাদের ভাষা এক, সাহিত্য এক, প্রাচীন ইতিহাস এক;

ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক আধার ও আবেষ্টন এক; আমরা হিন্দু হই, মুসলমান হই,—মোটামুট আমাদের পুরুষপরম্পরাগত প্রকৃতি ও কৌলিক জীবনপ্রবাহ একই মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া, গঙ্গাযমুনাধারার ন্যায়, একই জাতীয়জীবনধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই সকল প্রাচীন স্মৃতি ও সম্বন্ধকে ছিন্ন করিয়া সহসা অকারণে এক অভিনব রাজকীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরেজ আমাদিগকে পূর্ব্ব পশ্চিম এই দুই ভাগে বলপূর্ব্বক বিভক্ত করিবে, ইহা আমাদের মর্ম্মে লাগে। এই মর্ম্মে লাগাটুকুই কেবল, এই Sentimental ভাবটাই কেবল, আমাদিগের আন্দোলন আবেদনের মধ্যে এতকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যে বিধানের দ্বারা প্রজার কোন বাস্তবিক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই,—কেবল তাহার একটা কল্পিত মর্ম্মপীড়ামাত্র উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী, প্রজারঞ্জনপ্রয়াসী রাজার পক্ষে সেরূপ বিধান প্রবর্ত্তিত করাও অন্যায় ও অসঙ্গত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাহাতে সত্যসত্যই রাজ্যের কোন বিশেষ ইষ্ট সাধিত হইবার স্থিরতা বা বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, তবে রাজাকে প্রজাবর্গের কল্যাণার্থেই তাহাদের এইরূপ কল্পিত মর্ম্মবেদনার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সেইরূপ বিধানকে প্রজামণ্ডলীর মতের বিরুদ্ধেও প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। ইংরেজ এই যুক্তি অনুসরণ করিয়াই এই বিষয়ের সমর্থন করিতেছে। আমাদের যুক্তিকে সবল ও ইংরেজের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য, এই বঙ্গবিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, ইহা একটু গভীরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমত, আমাদের আপত্তি যে কেবলই বা মুখ্যত ভাবুকতাপ্রধান বা Sentimental এবং আমাদের অনিষ্টাশঙ্কা যে কেবলই কল্পিত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম ইংরেজও ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, আমরাও প্রকাশ করিয়া বলিতে বা আলোচনা করিতে আজ পর্য্যন্ত সাহস পাই নাই। তারই জন্য কেহ বুঝিয়াও, কেহ বা বস্তুতই না বুঝিতে পারিয়া, আমাদিগের এই আপত্তি ও আন্দোলনকে কেবলই Sentimental বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা এ নয়।

এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক জীবনের, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের, আমাদের আর্থিক বা সামাজিক বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এ ফাঁকা কথা। আমরাও ইহা জানি, ইংরেজও ইহা বিলক্ষণই বোঝে। আসল কথাটা এই যে, ইহা দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজরাজ আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের, কেবল যে পেলবপল্লবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মূলে একেবারে আপনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। যাহার উপরে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, সাহিত্যের সম্প্রসারণ, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও সামাজিক শক্তিসঞ্চার ও রাজনৈতিক মুক্তি-

লাভ, সকলই একান্ত নির্ভর করিতেছে, ইংরেজ এই প্রস্তাব করিয়া সেই বস্তুকে আমূল উৎপাটিত ও বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহাই আমাদের আপত্তির কারণ।

প্রথমত আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের সর্ব্ববিষয়ে সার্থকতালাভ আত্যন্তিকভাবে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভের উপরে নির্ভর করিতেছে। মানসিক উন্নতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাধ চর্চ্চা দ্বারা জাতির উদ্ভাবনী শক্তিকে ফুটাইয়া তোলা, প্রথমত শিক্ষার ও দ্বিতীয়ত সেই শিক্ষা হাতে-কলমে—কার্য্যে, জীবনে, চরিত্রে—মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিবার সুযোগ ও অবসরের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শিক্ষাপ্রণালী যদি এমন হয় যে, তাহার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন করা নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম্ম বা সমাজ বা রাজ্যশাসনবিষয়ে কতকগুলি মত, ভাব ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা, তবে সে শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন কদাপি সম্ভব হয় না। ইংরেজের আধুনিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আমাদের মানসিক উন্নতি-সাধনের সহায়তা করা নহে, কিন্তু ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তির স্থায়িত্ব রক্ষা করা। এই-জন্য এই শিক্ষা আমাদিগের জাতীয়জীবনের প্রাচীন গৌরবকাহিনীকে ঢাকিয়া-রাখিয়া আমাদের চিরন্তন হীনতা ও বর্ত্তমান বিদেশীয় রাজজাতির শক্তি ও মহিমা দ্বারা আমা-দিগের সরল চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিবার জন্য এমন অপরিসীম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে;—যে সকল উপায়ে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে, সর্ব্বদা সশঙ্কিতে, নানা কৌশল অবলম্বনে তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে। রাজকার্য্যে ও স্বদেশের শিক্ষা, সম্পদ্, সৌন্দর্য্য ও শক্তি-বিধানের শতমুখ পন্থায় মানসিক শক্তি নিয়োগ ও মৌলিক গবেষণা করিবার অবাধ সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইংরেজ সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সকল ক্ষেত্রে, সর্ব্ববিধ বিষয়ে, দেশের রাজশক্তি তাহার হস্তগত আছে বলিয়া, ইংরেজ এদেশে হুকুমবরদার হইয়া রহিয়াছে;—দেশের গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও শক্তিশালী যে যেখানে আছে, হয় বিজনে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও নির্জ্জীবতার মধ্যে পড়িয়া আপনার স্বভাবদত্ত শক্তিরাশির অপচয় করি-তেছে, অথবা ইংরেজের তাঁবেদার হইয়া দাসের উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া স্বল্পবিস্তরপরিমাণে ইংরেজের প্রসাদভোগ করিতেছে। আপিসে ইংরেজ কর্ত্তা, এদেশীয়গণ তাঁহার ভৃত্য। ব্যবসায়বাণিজ্যে ইংরেজ ধনী, এদেশীয়েরা কেবল জন খাটিয়া জীবনধারণ করিতেছে। জাতীয়জীবনের বিশাল কর্ম্মভূমিতে যথাযোগ্য কর্ত্তৃত্ব, সুযোগ ও অবসর আমাদের ভাগ্যে কদাপি লাভ হয় না। এ অবস্থায় আমাদের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক কোনপ্রকারের উন্নতিলাভের আশা অলীক কল্পনামাত্র।

অল্পে অল্পে আমরা এইটি বুঝিয়া উঠিতে-ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। ইংরেজ শাসনক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া আছে, থাকুক। পুলিস-

পাহারার ভার এবং এই পুলিস-পাহারার জন্যই রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিবার ভারও সে আপনার হাতে রাখিবে, তাহাও রাখুক। আইনকানুন যাহা করিতে হয়, সে করুক। এ সকল বিষয়ে আমরা এখনি তাহাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, আমাদের সে শক্তি নাই। কিন্তু এই সর্কলের বাহিরে যে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যথাসাধ্য আমরা অগ্রে সে ক্ষেত্র অধিকার করিতে চেষ্টা করিব। দেশের লোকের শিক্ষার ভার আমরা স্বহস্তে যথাসাধ্য গ্রহণ করিব। দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার যথাবিহিত উপায় রাজশাসননিরপেক্ষ হইয়া যতটা অবলম্বন করা সম্ভব, আমরা স্বয়ং তাহা করিব। দেশের শিক্ষিতদলের সঙ্গে আপামর সাধারণের স্বাভাবিক নেতৃনীত-সম্বন্ধ যতটা বর্ত্তমান-অবস্থাধীনে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, ইংরেজের শাসননীতির কুটিল গতির প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আমরা তাহার যথাযোগ্য উপায় উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করিব। এইরূপে বিবিধ ক্ষেত্রে, বিবিধ উপায়ে স্বজাতির আভ্যন্তরীণ প্রজ্ঞা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চারিদিকেই হইতেছিল। এই চেষ্টার সঙ্গে ইংরেজরাজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের একটা সহজ বিরোধ রহিয়াছে। আমাদের এই চেষ্টা যে পরিমাণে ফলবতী হইবে, ভারত-শাসনের দ্বারা ইংরেজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের পন্থা সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। ইংরেজের সঙ্গে এখন এমনই এক বিপরীত সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, আমাদের প্রভাবে তাহার পরাভব, আমাদের ধনাগমে তাহার অর্থহানি, আমাদের শক্তিবিকাশে তাহার শক্তিচালনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবেই হইবে। এ অবস্থায় ইংরেজ দেবতা হইলেও আমাদের কল্যাণকামনা করিতে পারিত কি না, সন্দেহের কথা। ইংরেজ সামান্য মানুষ, আত্মস্বার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের স্বার্থ সে সাধন করিতে যাইবে, এ অদ্ভুত আশা করা বাতুলতামাত্র। অন্য কোন জাতি আমাদের উপর এরূপ অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুশক্তি লাভ করিলে আমা-দিগকে বহুদিন পূর্ব্বে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই। এই নিষ্পেষণে হয় আমাদের জাতীয়শক্তি অরণি-গর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িত, নতুবা এই প্রাচীন জাতিও অপরাপর প্রাচীন জাতিসকলের ন্যায় পৃথিবীবক্ষ হইতে একে-বারে চিরদিনের জন্য বিলোপ পাইত। ইংরেজ আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; যাহাতে আমরা তাহার উন্নত সভ্যতার ভার বহন করিবার উপযোগী বল লাভ করি, তাহারও চেষ্টা করিয়াছে। হৃষ্ট-পুষ্ট-তুষ্ট বলীবর্দ্দের মত বসুন্ধরার শ্রীসম্পৎশক্তিকর্ষণে তাহার সহকারিতা করিয়া আপনাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সার্থক করি, ইংরেজ আমাদের জন্য এ আয়োজনও করিয়া রাখি-য়াছে। অন্য কোন জাতি ইহাও করিত কি না, সন্দেহ। মানুষে যতটা মহত্ব ও উদারতা সম্ভব, ইংরেজ তাহা দেখাইয়াছে। এর বেশী করিতে পারিলে ইংরেজ দেবতা হইত। দেবতা নয় বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না।

ইংরেজের কোন দোষ ইহাতে নাই—ইংরেজকে ইহার জন্য দায়ী করি না। কিন্তু বিষয়টা এই যে, ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে, বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের জাতীয় স্বার্থের সম্মিলন ও

সামঞ্জস্য কদাপি সম্ভব নহে। আমরা যে ভাবে আমাদের জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাই; সেভাবে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়, ইংরেজ ইহা ইচ্ছা করিতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদিগকে অশক্ত করিয়া রাখিতে পারিলেই, এদেশে তাহার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে, অন্যথা নহে। এইটি ইংরেজ বিলক্ষণ বোঝে, এবং বোঝে বলিয়াই বাঙালীর জাতীয়জীবনের এই অভিনব অঙ্কুরোদ্গম দর্শন করিয়া আপনার স্বার্থ ও প্রভুত্বের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া, বাংলাদেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙালীজাতির এই বিকাশোন্মুখ রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবকে ভাঙিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে অভিনব রাজনৈতিক আন্দোলনস্রোত প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনকে উর্ব্বর ও সজীব করিয়া তুলিতেছে, সেই পুণ্যধারার পবিত্র গোমুখী, ভারতভাগ্যবিধাতা, বহুশতাব্দী হইতে বিষমসম্পাতগ্রস্ত ভস্মাবশিষ্ট ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য, এই মুখসর্ব্বস্ব বাঙালীর মুখ হইতেই প্রবাহিত করাইয়াছেন। বোম্বাইএ, মাদ্রাজে, পঞ্জাবে, আগ্রা ও অযোধ্যায় যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে এই অধম বাঙালীজাতির রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙালী কার্য্যক্ষম নহে, কিন্তু অবলাজনের ন্যায় তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ভারতের কর্ম্মঠ ও বীর্য্যবান্ জাতিসকলের জীবনে, ভাবে, চরিত্রে ও চেষ্টায় এক অলৌকিক বল সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। এখনো ভারতের অন্যত্র লোকে রাজনীতিক্ষেত্রে যে সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে না,—বাঙালী প্রতিদিন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনে এমন একটা মুখরতা ও প্রগল্‌ভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অন্য প্রদেশে এখনো দেখা যায় নাই। এ মুখরতা নির্ব্বীর্য্য ও নিরস্ত্র ও রমণীস্বভাব বাঙালীর মধ্যে কোন বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে, ইংরেজ এ আশঙ্কা করে না। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত যদি অন্যে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে, বাংলার সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে যে নির্ভীকতার পরিচয় ক্রমশই পাওয়া যাইতেছে,—পঞ্জাবে, অযোধ্যায় ও মহারাষ্ট্রে যদি সে নির্ভীকতা একবার ফুটিয়া উঠে, এমন ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে, যাহা রাজা প্রজা উভয়েরই মহা অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে। গোমুখীতে গঙ্গার ক্ষীণ নির্ঝরকে যদি বন্ধ করিতে পারা যায়, তবে গঙ্গা-পদ্মা, সকলের শক্তি যেরূপ ক্ষীণ হইয়া যাইবে, সেইরূপ বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনকে যদি ভাঙিয়া দিতে পারা যায়, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাপ ও বেগ নিশ্চয়ই কমিয়া আসিবে। এইজন্যই, আপনার ভবিষ্যৎ অকল্যাণের আশঙ্কা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ইংরেজ এই বঙ্গবিভাগব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

বাংলার রাজনৈতিক শক্তি বাঙালী-হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী-হিন্দুদিগের ঐক্য ও উপচীয়মান প্রভুত্বকে যদি বিনাশ করিতে পারা যায়, বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই বঙ্গবিভাগের

দ্বারা ইংরেজ তাহারই চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এই মুসলমানগণ স্মরণাতীত কাল হইতে আপনাদিগের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে অত্যন্ত সদ্ভাবে বাস করিয়া আসিতেছেন। বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই ফলত আদিতে হিন্দুসন্তান ছিলেন। হিন্দুদিগের সঙ্গে কুলগত বা ethnological কোন বিশেষ পার্থক্য ইহাদিগের নাই। হিন্দুমুসলমানের বিবাদ বাংলায় কখনো শোনা যায় নাই। ইংরেজের কুটিল রাজনীতি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে,—আগ্রা ও অযোধ্যায়—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে, বাংলাতেও এই বঙ্গবিভাগের পরে, তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। মুসলমানসম্প্রদায় নানা কারণে এখনো ইংরেজের মুখাপেক্ষী হইয়া চলাকেই শ্রেয়স্কর মনে করেন। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-সম্প্রদায়ের কোন কোন নেতা ইতিমধ্যেই, এই বঙ্গবিভাগবিষয়েই, ইংরেজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল অনুচরের সাহায্যে আপনার কুটিল ভেদনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইংরেজ বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবিধ রাজকীয় ব্যাপারে ঈর্ষাদ্বেষ উৎপাদন ও পরিপোষণ করাইয়া, বাঙালীর রাজনৈতিক শক্তিকে অক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। পশ্চিমবঙ্গে সেইরূপ ভেদনীতি প্রচার করিয়া উড়িষ্যাবাসী ও বেহারবাসীদিগের সাহায্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং পূর্ব্ববঙ্গে চা-কর-সম্প্রদায় ও পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজ বণিক্‌মণ্ডলী ও বেহারের নীলকরদল, উভয়ত্রই হিন্দুমুসলমানকে চাপিয়া রাখিবে। এইভাবে, এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা, বাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক শক্তিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে। এই আমাদের প্রধান আশঙ্কা। ইহাই আমাদের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি। এইজন্যই আমি মনে করি যে, বঙ্গবিভাগ কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের উপরে বিষম কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইজন্যই ইংরেজ যাই করুক না কেন, আমাদিগকে এই প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

নূতন গুরুমহাশয়।

বৈশাখমাস,—প্রাতঃকাল,—সূর্য্য উঠিয়াছে। ধনঞ্জয়পুরগ্রামের গুরুমহাশয় নটবর দত্ত তাঁহার পাঠশালায় বসিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। এই পাঠশালা গুরুমহাশয়ের নিজ বাড়ীতেই স্থাপিত। তাহার পূর্ব্বদিকে উদ্যান। অনেকদিন বৃষ্টি হয় নাই, সেজন্য

মাঠের ঘাস ও বাগানের গাছপালা রৌদ্রে ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। মাটী শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষকগণের চাষ বন্ধ হইয়াছে।

ধনঞ্জয়পুর একটি বড় গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা, মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এ গ্রামে আগে স্কুল ছিল না, তাই পেড্‌লারসাহেবের নবশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার কিছুদিন পরেই নটবর দত্ত এই পাঠশালাটি স্থাপন করিয়াছেন।

এস্থলে এই গুরুমহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি বর্দ্ধমান-জেলার কোন এণ্ট্রান্সস্কুলে তৃতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সে আজ ১৫ বৎসরের কথা। তিনি যখন গ্রামে আসিয়া গল্প করিতেন—"পৃথিবীর আকার গোল—কমলা-লেবুর মত"—"ইংরেজিতে নাম লিখিতে হইলে শ্রী দিতে হয় না"—"ইংরেজদের দেশে সাহেবরা জমি চাষ করে"—ইত্যাদি ইত্যাদি—তখন গ্রামের চাষাগণ অতি সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার সেই সকল জ্ঞানগরিমা-সূচক কথা কান পাতিয়া শুনিত, কেহ বা তাঁহাকে পরিহাস করিত। পরে একদিন পরীক্ষা দিতে বসিয়া জুতার মধ্যে একখানা কাগজে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এই অভিযোগে তিনি স্কুলগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। তাহার পর কতকদিন কলিকাতায় গিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পড়ার আর কোন সুবিধা হইল না, পড়াশুনা করার প্রবৃত্তিও বোধ হয় বেশী ছিল না। তাঁহার এক আত্মীয় বিশ্বম্ভর সরকার গৌহাটি-চা-বাগানে কাজ করিত। নটবর তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি নটবরকে কুলী সংগ্রহ করিবার জন্য সর্দ্দার আড়কাটীর পদে অভিষিক্ত করিয়া মেদিনীপুরজেলায় পাঠাই-লেন। সেখানে ৩বৎসরকাল অনেক নিরীহ ভালমানুষকে কুলি করিয়া চালান দিলেন, বৈধ-অবৈধ উপায়ে অনেক টাকা রোজগার করিলেন, অনেক টাকা বদ্‌খেয়ালী করিয়া উড়াইলেন। অবশেষে দুইজন সাঁওতালকে ফাঁকি দিয়া কুলী করিয়া চালান দেওয়া-অপরাধে তাঁহার তিনমাস শ্রীঘরবাসের হুকুম হইল এবং হাতে যে-কিছু টাকা ছিল, তাহা সেই পূর্ব্বপাপের প্রায়-শ্চিত্তের দক্ষিণাস্বরূপ একজন উকিল ও দুইজন মোক্তারের উদরে স্থান পাইল।

জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নটবর মনে করিলেন, "না—আর ও পথে যাব না। এখন সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা যায় কি না, তাহাই একবার দেখিব।" সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন কিসে হয়? ভাল চাকুরী?—সেরূপ বিদ্যা নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য?—তাহার মূলধন নাই। কৃষিকার্য্য?—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। যদি কৃষিকার্য্য করিতে হয়, তবে দেশে গিয়াই করা ভাল, ইহা মনে করিয়া তিনি ধনঞ্জয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা জঙ্গলময় হইয়া ছিল। তিনি সেই জঙ্গল কাটাইয়া বাসোপযোগী কয়েকখানা খড়ের ঘর তুলিলেন। তাঁহার পৈতৃক যে-কিছু জমি ছিল, তাহাতেই একখানা লাঙ্গল এবং একজন চাকরের সাহায্যে চাষ আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময়ে পেড্‌লারসাহেবের নূতন শিক্ষাপ্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত হইল।

নটবর মনে করিলেন, এ গ্রামে অনেকগুলি ছেলে আছে, ইহাদের লইয়া একটা পাঠশালা খুলি না কেন? তাহা হইলে আমার কৃষিকার্য্যেরও অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি নূতন শিক্ষাপ্রণালীর নিয়মাবলী খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। পরে একদিন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নবপ্রণালীতে স্কুল খুলিবার অনুমতিপত্র বাহির করিলেন। ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর দেখিলেন, এ লোকটার বুদ্ধি আছে, বেশ কাজের লোক। হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী বেশ বুঝিয়াছে এবং ইহার নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতাও আছে। ইহা দ্বারাই নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান আরম্ভ করা যাক। আগে শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া পরে স্কুলস্থাপন করা অনেক বিলম্বের কথা। সরকারী কার্য্যে এত বিলম্ব সহ্য হয় না, কারণ "শুভস্য শীঘ্রম্!"

নটবর বাড়ী আসিয়া ৪০জন ছাত্র সংগ্রহ করিয়া স্কুল খুলিলেন। তাঁহার বাহিরের চৌচালা-ঘরে স্কুল বসিল। তাহার পার্শ্বেই বাগান। তিনি ছাত্রগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গ্রাম্য অশিক্ষিত বর্ব্বর লোকেরা তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে নানাপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্খলোকে নূতন শিক্ষাপ্রণালীর মাহাত্ম্য বুঝিবে কিরূপে?

এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। গুরুমহাশয় পাঠশালায় আসিয়াই ছাত্রদিগের রেজেষ্টরি বহি খুলিয়া তাহাদের নাম ডাকিলেন। ছাত্রগণ একে একে নামের সাড়া দিল। পরে তিনি এইরূপে পড়ান আরম্ভ করিলেন।

"রহিম বিশ্বাস?"

"উপস্থিত।"

"কাল তোমাকে গরুর কথা শিখাইয়াছি—গরুর কয় পা?"

"চারি পা।"

"বেশ—বেশ। তোমার খুব পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি! কয়টা শিং?"

"দুটা।"

"বেশ—খুব ভাল।"

এখানে আর একটি ছেলে হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে, এ সব কথা ত আমরা আগেই জানিতাম, এজন্য বই পড়ার দরকার কি?"

"তুই বড় পণ্ডিত হয়েছিস্ কিনা! বেয়াদপ—পাজি,—নচ্ছার!"

এই বলিয়া গুরুমহাশয় তাহার পৃষ্ঠে এক ঘা বেত মারিলেন। পরে রহিম বিশ্বাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"গরুর খুর কিরকম?"

"বিভক্ত।"

"বেশ। তোমার বেশ শিক্ষা হইয়াছে—তুমি যাও, এখন নিজে ভাল করিয়া গরু দেখ গিয়া। আমার গোয়ালে যে কয়টা গরু আছে, তাহাদিগকে লইয়া মাঠে যাও। গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিও না, খুব ভাল করিয়া তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। আর দেখিও, যেন অন্যের ফসল নষ্ট না করে।"

রহিমবিশ্বাস আদেশমত গরু লইয়া মাঠে গেল।

তখন শিক্ষকমহাশয় আর একটি ছাত্রকে ডাকিলেন—"সতীশচন্দ্র সরকার?"

"উপস্থিত।"

"গরুর বিষ্ঠাকে কি বলে ?"

"গোবর বা গোময়।"

"বেশ—গোবরে কি হয় ?"

একটি বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র বলিল—'পদ্মফুল হয়।"

অমনি গুরুমহাশয় ভয়ানক গরম হইয়া পড়িলেন এবং তাহার চুল ধরিয়া খুব কয়েকটা কিল তাহার পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া দিলেন।

সতীশ বলিল—"আজ্ঞে, গোবর দিয়া ঘর নিকান হয়।"

"আর কি হয় ?"

"ঘসি প্রস্তুত হয়।"

"আর কি হয় ?"

"জমিতে সার দেওয়া হয়।"

"বেশ—বেশ—তুমি খুব ভাল ছেলে। তোমার খুব বিদ্যা হবে। আচ্ছা, এখন আমি যাহা বলি, তাহাই কর। জান ত বিদ্যা হাতে-কলমে—experiment করিয়া শিখিতে হয়। মুখস্থবিদ্যাকে আমরা একেবারে বর্জ্জন করিব। তুমি যাও, আমার গোয়ালে যে সব গোবর পড়িয়া আছে, সেগুলি একটি ঝুড়িতে করিয়া ঐ বাগানে নিয়া রাখ। পরে সেখানে থাকিয়া উহা পচিলে ভাল সার হইবে। তখন উহা ক্ষেতে দিয়া দেখিবে, কেমন ভাল ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। গোয়াল ভাল করিয়া পরিষ্কার করিও, যেন দুর্গন্ধ না থাকে।"

সতীশ এই কার্য্যে প্রস্থান করিল। তখন গুরুমহাশয় যদুনাথ দাস নামক একটি ছাত্রকে ঘর নিকানর উপকারিতা কি বুঝাইয়া-দিয়া তাহাকে ঘর নিকাইতে পাঠাইলেন।

পরে গুরুমহাশয় দ্বিতীয়শ্রেণীর ছাত্র-দিগকে বলিলেন—"তোমরা অবশ্যই গাছ কাহাকে বলে জান। ঐ বাগানে দেখ কতরকম গাছ আছে—আমগাছ, কাঁঠাল-গাছ, নেবুগাছ, কুলগাছ ইত্যাদি। একটি গাছের কয়টা অংশ ?"

একটি ছাত্র। "দুই অংশ।"

"কি ?"

"শিকড় ও কাণ্ড।"

"বেশ—শিকড় দিয়া কি হয় ?"

"গাছ রস শুষিয়া খায়।"

"বেশ—বেশ। আর পাতা দিয়া কি হয় ?"

"কলার পাতায় ভাত খায়, তালপাতায় লেখে—"

"আরে আমি তা চাই না। পাতা দিয়া গাছের কি উপকার হয় ?"

"গাছের বৃষ্টিনিবারণ হয়।"

"না—তা নয়। পাতা বায়ু হইতে গ্যাস্ টানিয়া লয়, তাহাও গাছের আহার।"

"আজ্ঞে গ্যাস্ কি ?"

"গ্যাস্—গ্যাস্ জানিস্ না ? পাথুরে কয়লা পোড়াইলে গ্যাস্ বাহির হয়। আমি রাণীগঞ্জে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"আজ্ঞে, এখানে পাথুরে কয়লা কোথায় ?"

"আরে বোকা জানিস্ না ? পাথুরে কয়লা সর্ব্বত্রই আছে, মাটি খুঁড়িলেই বাহির হয়, নতুবা এখানে গ্যাস্ থাকিবে কেন ? যাক্ সে সব কথা। এই যে সকল গাছ দেখিতেছ, বল ত উহাদের গোড়ায় আগাছা জন্মিলে তাহাতে গাছের কি হয় ?"

একটি ছাত্র। "জঙ্গল হয়।"

আর একটি ছাত্র। "তাহাতে পাখীরা বাসা করে।"

গুরু। তুমি কেবল পাখীর বাসাই চেন? আগাছা জন্মিলে গাছ বাড়ে না। সেইজন্য আগাছা কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বুঝিলে?

ছাত্রগণ। "হাঁ, বুঝিলাম।"

"আচ্ছা, বিনোদ, হরি, কালাচাঁদ, রাখাল—তোমরা কয়জনে দা লইয়া ঐ বাগানে যাও, আর যত আগাছা দেখিবে, সব কাটিয়া ফেলিবে। পরে তোমরা দেখিতে পাইবে, এই সকল আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলবান বৃক্ষে কত ফল ধরিয়াছে।"

একটি ছাত্র। "সে ত আর এবার না?"

"এবারই ধরিবে—তোমার নিজের চক্ষেই দেখিতে পাইবে। বিদ্যা নিজ নিজ চক্ষে দেখিয়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। বুঝিলে?"

উল্লিখিত ছাত্রগণ তখন জঙ্গল কাটিতে গেল।

এইরূপে গুরুমহাশয় তাঁহার ছাত্রদিগকে নানা বিভাগে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জলের গুণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুইজন ছাত্রকে কূপ হইতে জল তুলিয়া তাঁহার বাগানে ও ক্ষেত্রে জলসেক করিতে নিযুক্ত করিলেন। বাঁশের উপকারিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩টি বালককে বাঁশ চিরিয়া বাঁখারি প্রস্তুত করিতে দিলেন, তাহা দিয়া বাগানের বেড়া দেওয়া হইবে। একটি ছাত্র বাঁশের বেতি তুলিয়া গুরুমহাশয়ের জন্য একটা ধুচুনি প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এই সময়ে হঠাৎ একটা গোল উঠিল। গ্রামের ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি লোকের সঙ্গে স্বয়ং ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের শরৎবাবু ডেপুটিবাবুকে বলিলেন—"এই দেখুন মশাই! আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক কি না! গুরুমহাশয় ছেলেদের দিয়া কিরূপে নিজের সব কাজ করাইতেছেন। যত চাষার কাজ, ভদ্রলোকের ছেলেদের দিয়া করাইতেছেন,—এ ভারি অন্যায়!"

এই কথা বলিতে বলিতে, গুরুমহাশয়ের ইঙ্গিতমতে সব ছেলে আসিয়া যথাস্থানে বসিল—কেবল আসিল না রহিম বিশ্বাস। তাহার বাপ কেফাতুল্লা সঙ্গে আসিয়াছিল। সে গুরুমহাশয়কে বলিল—"বাবু, আমার ছেলেকে কোথায় পেঠিয়েছেন?"

একটি ছেলে বলিল—"সে গুরুমহাশয়ের গরু চরাইতে মাঠে গিয়াছে।"

গুরুমহাশয় তাহার দিকে রোষকষায়িত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তাহাকে গরুর সমস্ত অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়াছি।"

কেফা। পণ্ডিতমশায়, আমরা চাষালোক—আমাদের মোটাবুদ্ধি। আমরা তোমার ও সব দোমবাজির কোন এলাকা রাখি না। আপনি যদি তারে মাঠে গরু চরাতি পেঠাইলেন, তবে আমি ঘরের গরু রাখতি না দিয়ে তারে কেন্ এখানে দিইলাম? বাবু, এ কথাডার বিচার করেন!

ইহা বলিয়া ডেপুটিবাবুর দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডেপুটিবাবু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। এখন গম্ভীরভাবে বিরক্তিপূর্ণস্বরে গুরুমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এ সব কি হচ্ছে?"

নটবর জোড়হস্তে বলিলেন—"হুজুর, এ ঠিকমত কাজ হইতেছে। আপনারা যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তার একচুলও এদিক্-ওদিক্ করি নাই। যাহাকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া বলে, আমি ঠিক তাহাই দিতেছি।"

শরৎবাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "না—কখনই না—গবর্মেণ্টের অভিপ্রায় কখনই এরূপ নহে। গ্রামের সব ছেলে আসিয়া তোমার মুনিষ খাটিবে, ইহা কখনই গবর্মেণ্টের রুল নহে।"

নটবর। আপনি হাল-আইনের শিক্ষাপ্রণালীর রুল কি, তাহা জানেন না। ছেলেদিগকে মাটী, জল, গাছ প্রভৃতি দ্রব্যের গুণ শিক্ষা দিতে হইবে—তাহারা নিজের চক্ষে এগুলি দেখিয়া শিখিতে অভ্যস্ত হইবে, ইহাই হইতেছে রুল। আমি ত ঠিক তাহাই করিতেছি। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, আমি এ সকল জিনিষ নিজের বাড়ী হইতে দিতেছি, এজন্য স্কুলের কোন অতিরিক্ত খরচ হইতেছে না। হুজুর কি বলেন?

ইহা বলিয়া ডেপুটিবাবুর দিকে একবার কাতর দৃষ্টিপাত করিলেন।

ডেপুটবাবু বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি কিপ্রকারে এ সকল শিক্ষা দিতেছ, আমাকে দেখাও।"

তখন নটবর ছাত্রদিগকে পূর্ব্বে যেরূপ পড়াইতেছিলেন, সেইরূপ পড়ান আরম্ভ করিলেন। তবে গরু-চরান, জঙ্গলকাটা প্রভৃতি উপদেশগুলি বাদ দিলেন।

ডেপুটবাবু এই শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ,—আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী এইরূপই বটে। তুমি ইহার principle বেশ grasp করিয়াছ, তবে practically কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছ, তাহা আর করিও না।"

শরৎবাবু বলিলেন—"মহাশয়, এই শিক্ষাপ্রণালীর principle যাহাই থাকুক, আমরা practically যাহা দেখিতেছি, তাহা কখনও অনুমোদন করিতে পারি না। শিক্ষকমহাশয় এই সকল বালককে কেন চা-বাগানের কুলি করিয়া তুলিয়াছেন, ইহার বিচার করুন। আমরা এরূপ পাঠশালা চাই না।"

ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর এ কথার কোন উত্তর না দিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি একটি ছেলেকে "নিম্ন প্রাইমেরী রিডার" পড়িতে বলিলেন। সে পড়িল—"গরুর প্রধান আহার ঘাস। উহারা মাঠে চরে। জিহ্বা, ঠোঁট ও চুয়ালের সাহায্যে ঘাস কাটিয়া মুখের ভিতরে লয় এবং না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে। উহাদের উদর 'চারি-কুঠারি-বিশিষ্ট।"

ডেপুটি। আচ্ছা বল দেখি, গরুর পেটে যে চারিটা কুঠারি আছে, তাহাদের কিপ্রকার ক্রিয়া হয়?

একটি বালক দাঁড়াইয়া সেই পুস্তকের কথা অবিকল মুখস্থ বলিল—"প্রথমে গরু চরিবার সময় যত ঘাস পারে, প্রথম কুঠারি দিয়া দ্বিতীয় কুঠারিতে পাঠায়। দ্বিতীয় কুঠারি ভরিয়া গেলে, চরা বন্ধ করে। পরে ইচ্ছামত দ্বিতীয় কুঠারি হইতে ঘাস বাহির করিয়া আনিয়া চিবায়, চিবান হইলে উহা আবার গিলে; কিন্তু সে গিলিত ঘাস দ্বিতীয় কুঠারিতে না গিয়া তৃতীয় কুঠারি দিয়া চতুর্থ কুঠারিতে গিয়া পৌঁছায়। ইহাকে জাবরকাটা বলে।"

ডেপুটি। আচ্ছা, বল ত, গরুদের এই জাবরকাটায় অভ্যাস কিরকমে হইল ?”

আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আবার সেই বই মুখস্থ বলিতে লাগিল—“বন্য অবস্থায় গোজাতি সিংহব্যাঘ্রাদির ভয়ে বড় ভীত থাকিত। সেজন্য সুবিধা হইলেই তাড়াতাড়ি যত ঘাস পারিত, পেটের মধ্যে ভরিয়া পলাইত, পরে অন্য সময়ে আস্তে আস্তে উহা চিবাইয়া গিলিত।”

ডেপুটি। বেশ। ঠিক হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি কি পড় ?

একটি উচ্চপ্রাইমেরী শ্রেণীর নবমবর্ষীয় শিশু দাঁড়াইয়া বলিল—“আজ্ঞে, আমি পড়ি আদর্শপাঠ, বিজ্ঞানপাঠ, শিশুব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোলপাঠ, ব্যাবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি, পাটীগণিত, Infant Reader, ড্ইং।”

শরৎবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া ডেপুটিবাবুকে বলিলেন—“মহাশয়, আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনাদের নূতন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা ভাল বুঝি না। শুনিতে পাই, আপনারা নাকি মুখস্থবিদ্যার উপর ভয়ানক চটা। মুখস্থবিদ্যাকে (Cramming) আপনারা পাঠশালার ত্রিসীমানার মধ্যেও আসিতে দিতে চাহেন না। আমার বিশ্বাস, সেই মুখস্থবিদ্যাটা যদি মানুষের মত কোন প্রত্যক্ষ প্রাণী হইত, তবে গবর্মেণ্ট তাহাকে এতদিন আণ্ডামানদ্বীপে পাঠাইতেন। কিন্তু ঐ নিম্নপ্রাইমেরী শ্রেণীতে আপনি যে পরীক্ষা করিলেন, ইহাতে কি বুঝিলেন ? আমি ত দেখিলাম, ছেলেরা আগাগোড়া সেই মুখস্থ কথাই বলিয়া গেল। আর সে বেচারীদেরই বা দোষ কি ? আপনারা হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চান, আচ্ছা, গরুর পেটে কয়টা কুঠারি আছে, তাহা গরুর পেট চিরিয়া না দেখাইলে ছেলেরা কিপ্রকারে স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিতে পারে ? সেরূপ পেট চিরিয়া শিক্ষা দেওয়াটা Medical Collegeএর anatomyবিভাগের জন্য মুলতুবি রাখিলে ভাল হয় নাকি ? এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায় সেরূপ শিক্ষা সম্ভবপর হইতে পারে কি ? তাহা যদি না হয়, তবে অবশ্যই ছেলেরা পুস্তকে যাহা পড়িবে, তাহাই মুখস্থ করিয়া রাখিবে। সুতরাং ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই মুখস্থকেই আপনারা প্রশ্রয় দিতেছেন। আরও দেখুন, এই নবমবর্ষীয় শিশু উচ্চপ্রাইমেরী ক্লাসে পড়িতেছে। ইহাকে কতগুলি নূতন নূতন বিষয় পড়িতে হইতেছে, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। এই সকল সুকুমার শিশুদের মস্তিষ্কে এতগুলি কঠিন বিষয় চাপাইয়া দিলে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইবে, না বিনাশ হইবে ?”

ডেপুটি। কেন, তাহারা বুঝিয়া পড়িবে।

শরৎ। এ সকল কঠিন কঠিন বিষয় আমরাই কি সব বুঝিতে পারি ? আমরা ত দেখিতে পাই, ছাত্রগণ কিছুই না বুঝিয়া এই সকল বই আগাগোড়া মুখস্থ করিতেছে। আপনি পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর যদি আমার বেয়াদপি মাপ করেন, তবে একটা কথা বলি। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী একশত বৎসর এদেশে চলিলে, আপনারা মনুষ্যজাতিকে গোজাতিতে পরিণত করিবেন।

ডেপুটি। সে কেমন?

শরৎ। এই যে গরুদিগের "গিলিত চর্ব্বণের" কথা শুনিলাম, শিশুগণও পাঠ্য-বিষয়ের সেইরূপ গিলিত চর্ব্বণ আরম্ভ করিবে, এবং ক্রমে তাহাদের পেটে—ঠিক পেটে না হউক—মস্তিষ্কের মধ্যে চারিটি কুঠারি প্রস্তুত হইবে—এই উচ্চপ্রাইমেরী ক্লাসে বিজ্ঞান-পাঠ, জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি বিদ্যা প্রথম কুঠারিতে বোঝাই হইয়া থাকিবে, পরে বি. এ. কিংবা এম্. এ. ক্লাসে গেলে তাহার জাবর-কাটা আরম্ভ হইবে। কিন্তু আমার একটা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। পুরাকালে সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তুর ভয়ে যেন গোজাতি অতি অল্পসময়ের মধ্যে যত ঘাস পারিত, পেটের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া পলাইত, কিন্তু এখন এই শিশুগণ কাহার ভয়ে তদনুরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইতেছে?"

ছাত্রদিগের মধ্য হইতে অমনি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—"পেড্লারসাহেবের ভয়ে।"

ইহার পরেই একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল—"ধর্ ধর্, মার্ মার্।" সে ছেলেটি চম্পট দিল। সেইদিন হইতে নটবর দত্তের সাধের পাঠশালা ভাঙিয়া গেল। তাঁহাকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য নূতন ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কোচিন।

১২

প্রভাতে রক্তিমভানু আবার যখন উদিত হইল, দেখিলাম—বৃহৎ সোপানের তলদেশে আমার নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে। নৌকায় উঠিয়া, বিলের মধ্য দিয়া, মাতাঞ্চেরি-নগরের অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে সহরের ইহুদি-বিভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অষ্টম শতাব্দীতে, জেরুশালেমের দ্বিতীয় মন্দিরটি যখন ধ্বংস হইয়া যায়, সেই সময়ে প্রায় দশ-সহস্র ইহুদি ও ইহুদিনী এই ম্যালাবার-প্রদেশে আসিয়া, ক্র্যাঙ্গানোরে (তৎকালীন নাম "মহোদ্রপত্তনা") বাসস্থাপন করে। পরধর্ম্মসহিষ্ণু হিন্দুরা উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র উপনিবেশিকমণ্ডলী, পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুগণ হইতে—সমস্ত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, পুরুষ-পরম্পরাগত স্বকীয় ঐতিহ্য ও কুলপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। মনে হয়, যেন উহারা কোন জাদুঘরের সংরক্ষিত ঐতিহাসিক কৌতুক-সামগ্রী।

মাতাঞ্চেরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, প্রথমেই "শাদা-ইহুদি"দিগের সহরে (এ দেশে উহাদিগকে "শাদা-ইহুদি" বলে) উপনীত হইলাম। মাতাঞ্চেরি—একটি বৃহৎ বিপণি বলিলেও হয়—খাঁটি দেশীয় বিপণি,—যেখানকার সমস্ত মানবমূর্ত্তি—সমস্ত মানবদেহ বিশুদ্ধ পিত্তল-

বর্ণের; সমস্ত দোকানগুলি কাঠের,—বার-গুার পশ্চাতে মুক্ত পরিসর—সেই উত্তুঙ্গ সুনম্য তালতরুর তলদেশে অবস্থিত। ক্রোশখানেক ধরিয়া এইরূপ বাজার চলিয়াছে। এইরূপ ভারতীয় দৃশ্যে চক্ষু যখন অনেকক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছে—এমন সময়ে, একটা বাঁক ফিরিয়াই একটা পুরাতন "অন্ধকেরে" রাস্তায় হঠাৎ আসিয়া পড়িলাম; যেন ইহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোনপ্রকারে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। কোন স্থানচ্যুত জিনিষ দেখিলে মনে যেমন একপ্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, আমার মনে সেইরূপ অশান্তি উপস্থিত হইল। খুব ঘেঁষাঘেঁষি সারি-সারি পাথরের বাড়ী। শীত-প্রধান দেশের ন্যায়, বাড়ীর সম্মুখভাগের মুখশ্রী বিষাদময়, প্রবেশপথগুলি সঙ্কীর্ণ। তাতে আবার, প্রত্যেক গৃহের দ্বারদেশে, গবাক্ষে, বিষাদতমসাচ্ছন্ন এই ক্ষুদ্র রাজপথে, সর্ব্বত্রই ইহুদিমুখ দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্যপরিবর্ত্তনের ন্যায় ইহুদিমুখও আমার চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই বিষাদময় জীর্ণদশা, এখানকার এই সমস্ত পরিদৃশ্য,—পার্শ্ববর্ত্তী তালপুঞ্জের সহিত, আকাশের সহিত, যেন একটুও খাপ্ খায় না। এই অপ্রত্যাশিত রাস্তাটিতে সহসা আসিয়া, মনে হয় যেন আমি এখন আর ভারতের মধ্যে নাই;—এমন কি, মনে হয়, প্রাচ্যভাব যেন এখান হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন, লাইড্ কিংবা আমষ্টার্ডামের রাস্তার একটা টুক্‌রা স্থানচ্যুত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে;—কেবল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর উত্তাপে উহা তাপদগ্ধ হইয়াছে,—ফাটিয়া গিয়াছে। বেশ মনে হয়, ওলন্দাজেরাই সহরের এই ভাগটি নির্ম্মাণ করিয়াছে; কেন না, সেই যুগের ওলন্দাজেরা, আপনাদের নিজের দেশেও, জলবায়ুভেদে কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা জানিত না। তাহার পর, ওলন্দাজেরা এ দেশ হইতে চলিয়া গেলে, ক্র্যাঙ্গানোরের ইহুদিরা সেই সব শূন্যগৃহ অধিকার করে। এখানে কেবলি ইহুদি—ইহুদি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সব ইহুদিদের রং ফ্যাকাশে; ভারতের জল-বায়ুপ্রভাবে এবং খুব-ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ীতে বাস-করা-প্রযুক্ত, ইহারা রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দ্বিসহস্রবৎসর কাল ম্যালাবার-প্রদেশে বাস করিয়াও উহাদের মৌলিক ছাঁচ কিছুমাত্র রূপান্তরিত হয় নাই;—এমন কি, (প্রচলিত মতের উল্টা) উহাদের মুখ তাপদগ্ধ হইয়া একটুও মলিন হয় নাই। জেরুশালেমে, কিংবা তিবেরিয়াদে যেরূপ মুর্ত্তি—যেরূপ লম্বা আলখাল্লা সচরাচর দেখা যায়,—এখানেও ঠিক্ তাই। যুবতীদের সূক্ষ্ম-চারু মুখশ্রী; দীনদর্শন বৃদ্ধাদিগের শুকচঞ্চুবৎ বক্র নাসিকা; শিশুদিগের শাদা ও গোলাপি রং; রসপ্রধান দৈহিক প্রকৃতি—মুখে একটু ধূর্ত্তামির ভাব পরিস্ফুট,—"কানানে"র জাত্-ভাইদিগের মত, ইহাদেরও কানের উপর চুল-কোঁকড়াইবার কাগজ রহিয়াছে।

রাস্তা দিয়া যদি কোন বিদেশী পথিক চলিয়া যায়, অমনি তাহাকে দেখিবার জন্য, এই সকল লোক দ্বারদেশে নামিয়া আসে; কেন না, মাতাঞ্চেরিতে বিদেশী লোক প্রায় কখন আইসে না। বিদেশী দেখিলেই, উহাদের মুখে স্মিতহাস্য ও আতিথ্যের ভাব ফুটিয়া উঠে। যে-কোন গৃহেই আমি প্রবেশ

করি না কেন—প্রায় সকল গৃহেই উহারা সৌজন্যসহকারে আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

এইরূপ কিংবদন্তী—পূর্ব্বে দশসহস্র ইহুদি এখানে আইসে; তন্মধ্যে এখন কয়েকশত মাত্র অবশিষ্ট। দ্বিসহস্রবৎসর কাল অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে বাস করায়, এই চিরস্থায়ী ইহুদিজাতি ক্রমশই বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, ইহারা এখন গুপ্ত ব্যবসায়ের দ্বারা—কুসীদবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে; এবং যখন উহারা ধনাঢ্য হইয়া উঠে—তখন, যেন ধনশালী নহে—এইরূপ ভাণ করিয়া থাকে। দুইতিনজন বিশিষ্ট ইহুদির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, কিয়ৎকাল আমি তাহাদের গৃহে বসিয়াছিলাম। সেই সব গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ:—অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে একটা সুঁড়িপথ; পচাধসা জিনিষপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে; কতকগুলা পুরাতন কীটদষ্ট আস্‌বাব—প্রায় সমস্তই য়ুরোপীয়—বোধ হয়, ওলন্দাজদিগের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। দেয়ালে মূশার কতকগুলি প্রতিকৃতি ও কতকগুলি উৎকীর্ণ-লিপি বিলম্বিত।

রাস্তার প্রান্তভাগে ইহুদি-গির্জ্জা; ঘণ্টাঘরটির অতীব শোচনীয় অবস্থা;—গ্রীষ্মে সূর্য্যের উত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে;—বয়ঃপ্রভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে। প্রথম-দরজা পার হইয়াই একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম;—প্রাচীর স্থুল এবং কারাগারের প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ। পবিত্র বেদিটি মধ্যস্থলে রহিয়াছে;—অষ্টঘটিকার প্রাতঃসূর্য্যের বিমল আলোকে পরিপ্লাবিত; এবং ঐ সুধালিপ্ত বেদি হইতে ধবল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া নেত্র ঝলসিয়া দিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও এরূপ একটি ইহুদি-গির্জ্জা দেখা যায় না—যাহার সাজসজ্জা এত পুরাতন এবং সাজাইবার ধরণটিও এরূপ অপূর্ব্ব—এরূপ নূতন। এখানকার বিচিত্র বর্ণবিন্যাস কালপ্রভাবে ক্ষীণ ও ম্লানাভ হইয়া, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে চিত্তকে মুগ্ধ করে। সবুজ দরজা:—তাহাতে অদ্ভুত পুষ্পসকল চিত্রিত; গৃহের কুট্টিমটি চমৎকার—নীল চীনে মাটি দিয়া বাঁধানো; দেয়ালগুলা দুধের মত শাদা। গির্জ্জার অভ্যন্তরে লালরঙের - সোনালি রঙের আগুন যেন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কতই তামার থাম্—কতই তামার গরাদে—তার আর অন্ত নাই;—মানবহস্তের ঘর্ষণে উহা দর্পণবৎ মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলা বিচিত্র রঙের বহুপুরাতন ঝাড়লণ্ঠন চাঁদোয়া-ছাদ হইতে লম্বমান;—এইগুলি, বোধ হয়, সেই ঔপনিবেশিক যুগে য়ুরোপ হইতে আসিয়াছিল।

পাণ্ডুমুখশ্রী, আলখাল্লা-পরিধান, দীর্ঘনাসিক কতিপয় ব্যক্তি বিড়্‌বিড়্ করিয়া কি প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতেছিল,—হস্তে হিব্রুগ্রন্থ;—আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হঠাৎ থামিল। একজন পুরোহিত,—মনে হয়, শতবর্ষ বয়ঃক্রম—কাঁপিতে-কাঁপিতে আমাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন, অতিসূক্ষ্ম-খোদাই-কাজ-করা সেই তাম্রস্তম্ভগুলি—আমাকে দেখাইলেন, এবং উহা কিরূপ মসৃণ, স্পর্শ করিয়া দেখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন; তাহার পর, নীল চীনেমাটিতে বাঁধানো কুট্টিমের কমনীয় সূক্ষ্ম

আমার নিকট বিবৃত করিলেন। কুট্টিমটি, বাস্তবিকই অমূল্য—এত দুর্লভ জিনিষ যে, উহাতে পা রাখিতে ভয় হয়। প্রায় দশসহস্র বৎসর হইল, এই চীনে-মাটি চীনদেশ হইতে ফর্ম্মাস দিয়া আনানো হয়, ইহার জাহাজ-ভাড়ায় বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। তাহার পর, আমাকে পুণ্য-মঞ্জুষাটি (Tabernacle) দেখাইলেন; উহা একখণ্ড জরির-পাড়-লাগানো বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। উহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রত্নখচিত মুকুট রহিয়াছে,—যাহার নক্সা-কল্পনা সলোমন-রাজার মুকুট-নক্সার ন্যায় অতীব আদিমকালের। অবস্থাবিশেষে শতবর্ষবয়স্ক বর্ষীয়ান্ পুরোহিতদিগকে এই মুকুটে বিভূষিত করিবার জন্যই ঐগুলি রক্ষিত হইয়াছে। তা ছাড়া, উহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে;—অনির্দ্দেশ্য অতীতের কতকগুলা গোটানো পার্চমেণ্ট-কাগজ,—রূপালি-জরির পাড়ওয়ালা কালো রেশ্মি কাপড়ে আচ্ছাদিত।

অবশেষে, উহাদের যেটি বহু আদরের পবিত্র স্মৃতিসামগ্রী—সেইটি আমার নিকট লইয়া আসিল। ইহা একটি বহুমূল্য দলিল; তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপিমালা। ইহুদিদিগের ভারতবর্ষে আসিবার প্রায় চারিশত বৎসর পরে, ৩১৯ খৃষ্টাব্দে, ম্যালাবারের অধিপতি এই শাসনপত্রে লিখিত কতকগুলি অধিকার উহাদিগকে প্রদান করেন।

এই তাম্রফলকে এই মর্ম্মের কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে:—

যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি রাজাদিগকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন—সেই পরমেশ্বরের প্রসাদে, আমি রবিবর্ম্মা ম্যালাবারের সম্রাট্, আমার ৩৬ বৎসরের রাজত্বকালে, ক্র্যাঙ্গানোরস্থ মাদেরকাৎলা-দুর্গের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, সচ্চরিত্র জোসেফ্ রব্বান্‌কে নিম্নলিখিত স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিলাম:—

১। পবিত্রবর্ণের লোকদিগের মধ্যে তিনি নিজ-ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবেন।

২। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্মান সম্ভোগ করিতে পারিবেন; তিনি অশ্বারোহণ ও গজারোহণ করিতে পারিবেন; সমারোহপূর্ব্বক নগরযাত্রা করিতে পারিবেন; নকিবেরা তাঁহার পদবী তাঁহার সম্মুখে ফুকরাইতে পারিবে; দিবাভাগেও তিনি আলোক ব্যবহার করিতে পারিবেন—তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত করিতে পারিবেন; বৃহৎ ছত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন; এবং তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত শাদা গালিচার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি চতুর্দ্দোলা-সিংহাসনে বসিয়া, লোকজন সম্মুখে রাখিয়া সবৈভবে যাত্রা করিতে পারিবেন।

জোসেফ্-রব্বান্‌কে এবং ৬২জন ইহুদি ভূম্যধিকারীকে এই সকল অধিকার আমি প্রদান করিলাম। জোসেফ্-রব্বান্ নিজ অধীনস্থ প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারিবেন; এবং যতদিন জগতে দিবাকরের উদয় হইবে, ততদিন ঐ প্রজারা তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের আদেশপালন করিতে বাধ্য।

ত্রিবঙ্কুর, তেসেনোর, কত্রযোর, কালিকিলোন, ক্রেঙ্গুট-আমোরিন্, পালিয়াথাচেন, ও কালিত্রিয়া—এই সকল রাজাদের সম্মুখে এই শাসনপত্র আমি লিখিয়া দিলাম।

লেখক কলম্বী-কেলাপুরের হস্তাক্ষরে এই শাসনপত্র লিখিত হইল। এবং যেহেতু কোচিনের রাজা পরম্পরায় আমার উত্তরাধিকারী—সেইজন্য এই রাজাদিগের মধ্যে তাঁহার নাম ধরা হইল না।

স্বাক্ষরিত:—

চেরুম্ প্রমল্ রবিবর্ম্মা—
ম্যালাবারেশ্বর।

ইহুদিঘরের উপরে, ফাটা ঘণ্টাঘরের পার্শ্বে, উহারা আমাকে একটা উচ্চ ঘর

দেখাইল। ঘরটি যার-পর-নাই জীর্ণ ও ভগ্নদশাপন্ন,—দেয়াল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ও লোহার কড়িগুলা ভাঙ্‌চোরা; তক্তায় গর্ত্ত; কালো চাঁদোয়া-ছাদে বাদুড়-চাম্‌চিকারা ঘুমাইতেছে। দুর্গপ্রাকারের রন্ধ্রের স্থায়, প্রাচীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ;—তাহার মধ্য দিয়া ওলন্দাজসহরের কিয়দংশ পরিলক্ষিত হয়—সেই অংশটি এখন ইহুদিদিগের হস্তগত;—সমস্তই ধূসরবর্ণ, বিষাদমগ্ন ও হৃতসার—মহাপ্রবল তালপুঞ্জের নীচে অধিষ্ঠিত। এই ঘননিবিষ্ট তালপুঞ্জের বিশাল চূড়াগুলি সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত;—সহসা একস্থানে অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে;—উহাদের স্থির-স্নিগ্ধ শ্যামলশোভায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। আবার, অপর দিকে দেখা যায়,—একটা পুরাতন দেবমন্দিরের সুধালিপ্ত ছাদ, বৃহৎ ও নিম্ন তাম্রগম্বুজ,—মনে হয়, যেন উত্তপ্ত ধরাতলের উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

এই উচ্চ ঘরটি—এই লূতাতন্তুসমাকীর্ণ ভগ্নাবশেষটি শাদা-ইহুদি-শিশুদিগের পাঠশালা। এই অনুষ্ণ মধুর প্রভাতে, ২০জন শিশু হিব্রু পড়িতেছে। সিদ্ধপুরুষ (Elie) এলির মত দেখিতে একজন ইহুদি-পুরোহিত একটা ফলকের উপর হিব্রু-বাক্য লিখিয়া উহাদিগকে দেখাইতেছে। উহাদের পাশ্চাত্য ভ্রাতৃগণ আজকাল যে হিব্রুভাষাকে অবহেলা করে, সেই হিব্রুভাষাতেই এই প্রবাসী শিশুরা এখনো কথা কহে।

শাদা-ইহুদি-অঞ্চলের পরেই, কালো-ইহুদি-টোলা। এই কালো-ইহুদিরা শাদা-ইহুদিদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাকে জানাইয়াছিল—ইহার পর যদি আমি কালো-ইহুদি ও তাহাদের সির্জ্জা দেখিতে না যাই, তাহা হইলে উহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইবে। আমি উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই কি না, দেখিবার জন্য এখনি কতকগুলি কালো-ইহুদি রাস্তার মাথায় দাঁড়াইয়া আছে। আবার, ঊর্দ্ধে গবাক্ষদেশে, অর্দ্ধোত্তোলিত "গ্যাকড়া-কানি"র পর্দ্দার পিছনে কতকগুলি শাদা-ইহুদি-মুখও দেখা যাইতেছে;—একটু যেন বেশি শীর্ণ, কিন্তু সুশ্রী। উহারাও কৌতূহলের সহিত দেখিতেছে—আমি কোন্ দিকে যাই।

কালো-ইহুদি-বেচারাদিগের ওখানেই তবে যাওয়া যাক্। কালো-ইহুদিরা বলে, শাদা-ইহুদিদিগের আসিবার কিয়ৎ-শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারা জুডিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে। আবার, শাদা ইহুদিরা অবজ্ঞাসহকারে এই কথা বলে যে, কালো-ইহুদিরা আদিমনিবাসী পারিয়া-জাতির অন্তর্ভুক্ত, শাদা-ইহুদিরা এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া উহাদিগকে স্বধর্ম্মভুক্ত করিয়াছে।

শাদা প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা ইহাদের রং একটু মলিন বটে, কিন্তু একেবারে কালো নহে। আসলে উহারা ভারতীয় ও ইহুদির সংমিশ্রণজাত 'মেটে ফিরিঙ্গি"। উহারা আমাকে আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিল। উহাদের সির্জ্জা অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী সির্জ্জাটিরই অনুরূপ;—কিন্তু তেমন সমৃদ্ধ নহে। সেই সুন্দর তাম্রময় স্তম্ভশ্রেণী এখানে নাই; বিশেষত এখানকার কুট্টিম সেই চমৎকার চীনে-মাটিতে বাঁধানো নহে। এই সময়ে শিশুদের জন্য কি-একটা অনুষ্ঠান হইতেছিল। সমবেত শিশুগণ ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে নাক গুঁজিয়া ভল্লুকের মত দাঁড়াইয়া, শরীর

দোলাইতেছিল;—ইহুদি-অনুষ্ঠানাদির ধরণই এইরূপ। পুরোহিত, প্রতিদ্বন্দ্বী শাদা-ইহুদিদিগের অহঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া আমার নিকট বড়ই দুঃখ করিতে লাগিল। উহারা কালো-ইহুদিদিগের সহিত পরিণয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সম্মত নহে; এমন কি, কালো-ইহুদিদিগের সহিত ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া একত্র বসিতেও কুণ্ঠিত। আরো দুঃখের বিষয় এই, উহারা যখন এই বিষয়ের দুঃখ জানাইয়া প্রধান-পুরোহিতকে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি সাধারণভাবে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আরো মর্ম্মঘাতী:—"এক নীড়ে একত্র বাস করিতে গেলে, এক-পালোকের পাখী হওয়া চাই।"

ইহুদি-গির্জ্জার উপর হইতে—তাম্রগম্বুজ, প্রস্তরপ্রাচীর ও সুধালিপ্তছাদ বিশিষ্ট যে দেবমন্দিরটি দেখিয়াছিলাম—সমস্ত উপকূলের মধ্যে—সেই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা আদিম ও ভীষণদর্শন। তা ছাড়া, এরূপ দুষ্প্রবেশ্য যে, বলা বাহুল্য, আমি উহার নিকটে ঘেঁষিতে সাহস করি নাই। সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রাঙ্গণ—শূন্য, শোকগম্ভীর;—উত্তপ্ত প্রস্তররাশির মধ্যে, লৌহ ও তাম্র-গঠিত কতকগুলা অদ্ভুত সামগ্রী খাড়া হইয়া রহিয়াছে;—এইগুলি বহুশাখাবিশিষ্ট একপ্রকার দীপাধার;—বহুশতাব্দীব্যাপী ঝঞ্ঝাবাতের প্রভাবে উহাতে মর্চ্চে ধরিয়াছে।

পার্শ্বেই কোচিন-রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ। সরু-সরু দীর্ঘ ঢাকা-বারাণ্ডার পথ দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাওয়া যায়। কিছুকাল হইল, কোচিন-রাজারা এই প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, অপরকূলস্থ এর্ণাকুলমের নূতন আবাসগৃহে উঠিয়া গিয়াছেন। এই প্রাসাদটি দেখিলে মনে হয়—একটা গুরুভার চতুষ্কোণ পুরাতন দুর্গ। ইহার নির্ম্মাণকাল ঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব;—বিশেষত এই প্রদেশে, যেখানে গল্প ও রূপকের সহিত ইতিহাস মিশিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, প্রাসাদটি দেখিলে, অতি পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে অঙ্কিত হয়। দ্বারদেশে আসিবামাত্র মনে হয়, কি-যেন-একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রবলপরাক্রম অনার্য্য বর্ব্বরদেশে প্রবেশ করিতেছি। খুব্‌রি-কাটা ছোট-ছোট কত গবাক্ষ; নীচে, প্রস্তর হইতে খুদিয়া-বাহির-করা কত আসনবেদিকা;—ইহাতেই বুঝা যায়, ইমারতের মালমস্‌লা কতটা ঘনসন্নিবিষ্ট। সমস্ত সিঁড়ি—এমন কি, যে সিঁড়িটি দিয়া দরবারশালায় উঠা যায়, তাহাও অতি সঙ্কীর্ণ, তমসাচ্ছন্ন, শ্বাসরোধী;—একজনমাত্র উঠিতে পারে, এইরূপ পরিসর; উহাদের নির্ম্মাণে কি-যেন-একটা শিশুসুলভ বর্ব্বরতা লক্ষিত হয়। বড়-বড় দালানঘর খুব দীর্ঘ, নীচু, "অন্ধকেরে"—কারাগারের মত কষ্টজনক।

ঘরের চাঁদোয়া-ছাদগুলা খুব নীচু—খুব কাজ-করা—দুর্লভ কাঠে নির্ম্মিত;—কোথাও ঘর-কাটা নক্সা, কোথাও গোলাপপাপ্‌ড়ির নক্সা, কোথাও খিলান-কাটা নক্সা—সমস্তই মলিন, কোন-কোন অংশ রং দিয়া চিত্রিত। আবার এদিকে দেয়ালগুলা একেবারে সমতল—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একসমান;—অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয়, দেয়ালগুলা বুঝি নানারঙের রঙিন কাপড়ে মোড়া; কিন্তু

আসলে তাহা নহে,—উহাতে নানা রঙের ছবি চিত্রিত হইয়াছে। প্রাসাদের সর্ব্বত্রই, দেয়ালের গায়ে এইরূপ বর্ণচিত্র;—কোথাও বা কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—কোথাও বা সমাধিমন্দিরস্থ বর্ণচিত্রের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দেয়ালের এই বর্ণচিত্রগুলি দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়;—ইহাতে একটি বিশেষ কলানৈপুণ্য প্রকাশ পায়। কি শাখাবহুল প্রাচুর্য্য! কি উদ্দাম বিলাসলীলা! রাশি-রাশি নগ্নমূর্ত্তি,—ভারতরমণীর রূপ অতিরঞ্জিতভাবে চিত্রিত হইলেও, মানবদেহ-পঞ্জরের সমস্ত খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুকৃত হইয়াছে। কটিদেশ অতীব ক্ষীণ, বক্ষোদেশ অতীব পরিপুষ্ট ও প্রলম্বিত। সুগোল বাহু, সুবক্র নিতম্ব, অতি পীন পয়োধর—এই সমস্তের ছড়াছড়ি—জড়াজড়ি;—উহার মধ্যে কোনপ্রকার শৃঙ্খলা নাই। হস্তে বলয়, পায়ে নূপুর; ললাটে সিঁথি, কণ্ঠে হার। এই সব মূর্ত্তির সহিত পশুমূর্ত্তিও মিশ্রিত।

কোথাও একটি আস্‌বাব নাই;—সমস্তই শূন্য। সমস্ত দেয়াল বর্ণচিত্রে আচ্ছন্ন—এ ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ঘরগুলা পরিত্যক্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন—সেখানেও এই মানবমূর্ত্তি ও পশুমূর্ত্তির ছড়াছড়ি। মাঝের ঘরটি খুব বিশাল—খুব উচ্চ; এইখানে রাজাদিগের অভিষেক-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই ঘরের দেয়ালে যে-সব কিরণমণ্ডলভূষিত সারি-সারি দেবীমূর্ত্তি—উহারা আসন্নপ্রসবা এবং অসংখ্য বিনম্র দর্শকের মধ্যে অবস্থিত।

রাজাদের শয়নকক্ষটিতে এখনো কিছু-কিছু আস্‌বাব আছে—নৌকা-আকৃতি, দুর্লভ কাঠে নির্ম্মিত একটি পর্য্যঙ্ক,—তাহাতে জরির রেশ্‌মি গদি—লাল রেশ্‌মি রজ্জু দিয়া চাঁদোয়া-ছাদে লট্‌কানো। ভোজনান্তে রাজাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ভৃত্যেরা এই পর্য্যঙ্কটি দোলাইয়া থাকে। এই রাজ-শয্যার চতুর্দ্দিকে, প্রাচীরের বর্ণচিত্রগুলিতে নিরঙ্কুশ লাম্পট্যলীলা প্রকটিত। দেবদেবী, মানব, পশু, বানর, ভল্লুক, হরিণ—সকলেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামাবেশে সবেগে আক্ষিপ্ত, চক্ষু উন্মত্তের ন্যায় বিস্ফারিত, আবেশভরে পরস্পরকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়াছে—পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি করিয়া আছে। একটা পিছনের ঘর—অতিব্যবহারে মলিন ও হতশ্রী—সেখানে দিবারাত্রি একটা পিত্তলের দীপ জ্বলিতেছে ও ধূমায়িত হইতেছে... এ ঘরটিতে আমার পদার্পণ করিবার অনুমতি নাই—কেন না, উহারি প্রান্তভাগ—যেখানটা অন্ধকার—সেইখান দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ ...

মধ্যাহ্ন আসন্ন। এখন একটা গৃহের মধ্যে আশ্রয় লওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমার ছায়াচ্ছন্ন দ্বীপটি এখান হইতে বেশী দূরে। এখন আমি কোচিনে গিয়া কোনো পান্থশালায় আশ্রয় লইব।

দুইটি চটুল-অশ্ব-যোজিত একটা ক্ষুদ্র ভাড়াটে গাড়ি করিয়া আবার আমি মাতাঞ্চেরির ভারতীয়-ধরণের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। 'আজ প্রাতে যেখানে ম্যালাবারের বিভিন্নবেশধারী নানাজাতীয় লোক পিপীলিকার সারির ন্যায় চলিতেছে দেখিয়াছিলাম—সেইখানে এখন মধ্যাহ্নের নিস্পন্দতা।

সেখান হইতে শীঘ্রই কোচিনে পৌঁছি-

লাম। এক দিকে বিল, অপর দিকে সমুদ্র—ইহারই মাঝখানে, বালুভূমির উপর, কোচিন স্থাপিত ;—পুরাতন ঔপনিবেশিক নগর—একটু স্থাবরভাবাপন্ন—এখনো যেন সেখানে ওলন্দাজি ছাপ্ মুদ্রিত। যে ক্ষুদ্র গৃহে আমি আশ্রয় লইয়াছি, সেখান হইতে সমুদ্রের বেলাভূমি পরিদৃশ্যমান—বিরাট অনন্ত পরিদৃশ্যমান।

আমার সম্মুখে সেই নীল মহাসমুদ্র,—আরবসাগর। মাথার উপর মধ্যাহ্নসূর্য্য—তাহার প্রখর কিরণে বালুকারাশি ও তটভূমি একপ্রকার শুভ্র ও গোলাপি রঙে উদ্ভাসিত। কাকচীলেরা চীৎকার করিয়া আকাশে উড়িতেছে। নিয়মিত সময়ান্তরে, তরঙ্গমালা স্ফীত হইয়া, তটভূমির উপর সবেগে ভাঙিয়া পড়িতেছে। বহিঃসমুদ্রের সুনীল মসৃণ ঝিকিমিকি জলের মধ্য হইতে শিকার-অন্বেষী দুর্বৃত্ত হাঙরদিগের ডানা ও পৃষ্ঠদেশের কিয়দংশ উঁকি মারিতেছে। নেত্রাভিঘাতী দীপ্ত প্রভার মধ্যে দিগন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। যে আবাসগৃহে আমি আজ নিদ্রা যাইব—তাহার কোনো দিক্ বদ্ধ নহে; ইহার পশ্চাদ্ভাগে, নারিকেলবন যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে; আমার ঘরের জানলা দিয়া, যেন একপ্রকার সবুজ আলোকে সমস্ত নিম্নদেশ দেখা যাইতেছে। উচ্চ তালতরুর খিলান-আকৃতি সুদীর্ঘ সবৃন্ত-পত্রগুলি স্বচ্ছ প্রভায় উদ্ভাসিত এবং তালীবনের গভীর প্রদেশে হরিদ্বর্ণ যেন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, একজন ভারতীয় যুবক একপ্রকার পানীয় আহরণ করিবার জন্য পদাঙ্গুলির সাহায্যে স্তম্ভবৎ মসৃণ তালতরু বাহিয়া কপিসুলভ চটুলতা ও দ্রুততা সহকারে নিঃশব্দে উপরে উঠিতেছে। যে শেষ প্রতিবিম্বটি গ্রহণ করিয়া আমার নেত্র নিমীলিত হইল, সেটি ঐ চতুর্ভুজপ্রায় মনুষ্যমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব। লোকটা এত শীঘ্র গাছের উপর উঠিয়া গেল যে, তাহার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।...

এই সমুদ্রটি এমন ভাস্বর, এমন গভীর—ইহাকে আজ আমি নিকটে পাইয়াছি, হৃদয়ের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি; ইহার বিপুল স্পন্দন শুনিতে পাইয়া আজ আমার কি আনন্দ! ... এই সেই অবারিত মার্গ, যেখান দিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায়; সেই মার্গ, যেখান হইতে সুদূর পরিলক্ষিত হয়; যেখানে প্রতি নিশ্বাসে মুক্তবায়ু গ্রহণ করা যায়; সেই মার্গ, যাহা আমার চিরপরিচিত। বাস্তবিক, ইহার সান্নিধ্যে আমার জীবন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠে; উহাকে পাইলে আমি যেন আপনাকে ফিরিয়া পাই; মনে হয়, যেন এই দুর্ব্বোধ্য দুরবগাহ্য ভারত হইতে—এই ছায়াচ্ছন্ন তরুসমাকীর্ণ বদ্ধ ভারত হইতে ক্ষণেকের জন্য বাহির হইয়াছি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপান ও হিন্দু-আশিয় সাধনা।

জাপান রুষের সঙ্গে যে সর্ত্তে সন্ধি করিয়াছে, তাহাতে শত্রু-মিত্র সকলেই বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ইতিহাসে এরূপ ঔদার্য্যের দৃষ্টান্ত কখনো দৃষ্ট হয় নাই। য়ুরোপীয় সাধনায় এমন সংযমের আজিও শিক্ষা হয় নাই। য়ুরোপ জাপানের এ অদ্ভুত আত্মত্যাগে স্তম্ভিত হইবে, কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু জাপানও যে ভাল করিয়া এ ব্যাপারের মর্ম্ম ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

জাপান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রবল শত্রুর নিকটে সন্ধিভিক্ষা করিতে যায় নাই, আপনার বিজয়পতাকা হস্তে লইয়া সন্ধিসভায় সোজা মাথায় প্রবেশ করিয়াছে। দেড়-বৎসর কাল জাপান যেরূপ দৃঢ়ভাবে এই সর্ব্বশোষক সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে জাপানের অর্থ ও সামর্থ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জাপান আরো বহুদিন ধরিয়া স্বচ্ছন্দে এ সংগ্রাম চালাইতে পারিবে, তাহার তদনুরূপ ধনবল ও জনবল উভয়ই আছে, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। এ অবস্থায় জাপান সন্ধিপ্রস্তাবে যথাযোগ্যভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা না করিয়া এতটা আত্মত্যাগ করিয়াছে, ইহার মর্ম্ম স্বার্থপর য়ুরোপ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না,—জাপানের রণমত্ত গর্ব্বান্ধ প্রকৃতিপুঞ্জও ভাল করিয়া হৃদ্বোধ করিতে পারিতেছে না। এর অর্থ কি?

ইহার অর্থ এই যে, কি য়ুরোপ, কি জাপান, কেহই এখনো ভাল করিয়া জাপানের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষ ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সে সাধনার সংবাদ য়ুরোপ রাখে না: সে সাধনার গভীর তত্ত্ব বর্ত্তমানের প্রবলতর সাধনা হৃদ্বোধ করিতেও পারিবে না। আর জাপানও আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা এতটাই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতের মত সেও আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এ সাধনা অতি জটিল বস্তু। ইহা জাপানের নিতান্ত নিজস্ব সম্পত্তি নহে, ইহার উপরে সমগ্র পূর্ব্ব-আশিয়ার সাধারণ অধিকার রহিয়াছে। বিশিষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হইলে, এই সাধনাকে হিন্দু-আশিয় সাধনা বা Indo-Asiatic culture নামে অভিহিত করিতে হয়। হিন্দু-আর্য্য ও মোঙ্গলীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে এ সাধনার উৎপত্তি। বৌদ্ধ, কনফুশীয় ও শিণ্টো, এই ত্রিবিধ ধারা মিলিত হইয়া এই অশেষশৌর্য্যবীর্য্যসৌন্দর্য্য-সংযমশালী অদ্ভুত সাধনা রচনা করিয়াছে। বর্ত্তমান জাপরক্ষময়ে, ও তৎপরে এই

সন্ধিব্যাপারে জাপান এই বিচিত্রশক্তি-সম্পৎসম্পন্না সাধনারই পরিচয় দিয়াছে।

হিন্দু-আশিয় কথাটা নূতন। এই কথা যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাও অতি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দু-য়ুরোপীয় বা Indo-European সাধনার কথা বহুদিন হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি। সংস্কৃতের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই সাধনার সংবাদ সভ্যজগতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যের সন্ধান পাইয়া তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলে, গ্রীক্ ও ল্যাটিনের সঙ্গে এই নবাবিষ্কৃত ভাষার মৌলিক প্রকৃতি ও গঠনরীতির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। ক্রমে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তুলনার প্রণালী বা comparative method প্রযুক্ত হইতে লাগিল, এবং এই-অভিনব-প্রণালী-অনুযায়ী ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণার ফলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও প্রাচীন ভারতীয়দিগের মধ্যে একটা কৌলিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন হইতেই হিন্দু ও য়ুরোপীয় সাধনার প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক, মৌলিক সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিবার জন্য হিন্দু-য়ুরোপীয় শব্দের সৃষ্টি হইল। ভারতের হিন্দু ও য়ুরোপের জর্ম্মাণ, ইংরেজ, রুশ প্রভৃতি জাতিসকল যে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা সকলে অতি প্রাচীনকালে যে একই দেশে বাস করিত, একই ভাষা ব্যবহার করিত, একই দেবতার ভজনা করিত, সংস্কৃত-আবিষ্কারের সঙ্গে এই প্রত্নতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। হিন্দু ও য়ুরোপীয় সাধনার উৎপত্তি সেই মৌলিক আর্য্যসাধনা হইতে, ইহারা একই প্রাচীন কাণ্ডের দুইটি বৃহৎ প্রকাণ্ডমাত্র। সেই প্রাচীন কাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, হিন্দু ও য়ুরোপীয়দিগের সেই প্রাচীন সাধারণ সভ্যতাকেই পণ্ডিতেরা হিন্দু-য়ুরোপীয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। এ প্রাচীন সাধনার সংবাদ আমরা বহুদিন পাইয়াছি।

হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনা বলিয়া পণ্ডিতেরা যাহার বর্ণনা করেন, তাহা অতি প্রাচীন বস্তু। বেদের প্রাচীনতম সূক্তাদিতে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ভারতীয় আর্য্যদল এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া অশেষ যত্নে ও তপস্যায় যে বিচিত্র সাধনা গড়িয়া তুলিয়াছেন, বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে, তৎপরে নিরুক্তাদি বেদাঙ্গে, ক্রমে উপনিষদে, পুরাণে, তন্ত্রে, ইতিহাসে যে সাধনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই হিন্দুর নিজস্ব সাধনা। ইহার জন্য হিন্দু গৌরব করিতে পারে, কিন্তু পণ্ডিতেরা যাহাকে হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা হিন্দু, গ্রীক্, রোমক, জর্ম্মাণ, শ্লাভ, সকল আর্য্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি, তাহাতে হিন্দুর কোনো বিশেষ অধিকার নাই। হিন্দু তাহা লইয়া কোনো গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

কিন্তু এক সময়ে আমরা হিন্দু-য়ুরোপীয়-সভ্যতাভুক্ত বলিয়া আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ গৌরবান্বিত মনে করিতাম, ইহা সত্য। কিন্তু এ গৌরব আমাদের হীনতাই ঘোষণা করিত। আমরা য়ুরোপকে কিছু শিক্ষাদীক্ষা দান

করিয়াছি, যাহার গুণে য়ুরোপীয় সাধনার বিশেষ অঙ্গপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনার ইতিহাসে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। ফলত হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনা যে প্রাচীন যুগের বস্তু, তখনো হিন্দু-য়ুরোপীয়ের বিভেদ উৎপন্ন হয় নাই, তখন উভয় দলই একত্রে বাস করিতেন। আমরা যে মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, য়ুরোপের সভ্যজাতি-সকলও সেই মূল হইতে জন্মিয়াছে, হিন্দু-য়ুরোপীয় বা Indo-European শব্দে কেবল তাহাই নির্দ্দেশ করে, অন্য কিছু নহে। য়ুরোপকে পঁচিশবৎসর পূর্ব্বে আমরা অত্যধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। তখন তাহার সঙ্গে কোনোপ্রকারের একটা সম্বন্ধ পাতাইতে পারিলে, আমাদের আত্মশ্লাঘা অত্যন্ত চরিতার্থতা অনুভব করিত, ইহা তো সত্য কথা। এই হিন্দু-য়ুরোপীয়-সাধনাসূত্রে আমরা পশ্চিমের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইতে পারিতেছি বলিয়াই, ইহার আবিষ্কারে আমরা এতটা গর্ব্বিতানন্দ ভোগ করিয়াছিলাম। বড় মানুষের সঙ্গে পায়ে পড়িয়া একটা সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা যে আপনার নিতান্ত হীনতার পরিচায়ক, ইহা তখনো বুঝি নাই।

ক্রমে সে জ্ঞান জন্মিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্মও আমরা বুঝিয়া উঠিতেছি।

প্রথমত আমরা দেখিতেছি যে, এ জগতে জাতিধর্ম্ম বলিয়া একটা বস্তু আছে। সমুদায় মানবমণ্ডলী অতি প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। আদিতে এক মনুষ্যমিথুন হইতে সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলীর উৎপত্তি হইয়াছিল, না ভিন্ন ভিন্ন মিথুন হইতে হইয়াছিল, এ প্রশ্ন তোলা বৃথা, কারণ তাহার মীমাংসা অসম্ভব। আদিতে যাহাই হউক না কেন, স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া এ জগতে বাস করিতেছে, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে অতি প্রাচীন ও মৌলিক পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। এ পার্থক্য কেবল তাহাদের নৈসর্গিক আবেষ্টনের বিভিন্নতা হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, এমনও মনে করা যায় না। নৈসর্গিক আবেষ্টনে এই মৌলিক বিভিন্নতাকে পরিস্ফুট করিয়াছে সত্য, কিন্তু সৃষ্টি করিয়াছে, এ কথা যথাপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে মৌলিক, চিরাগত এক-একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই, তাহাই জাতিধর্ম্ম।

সকল মানুষই এক দিক্ দিয়া দেখিলে এক। মানবের গঠন, মানবের ইন্দ্রিয়াদি, মানবের প্রকৃতি সাধারণভাবে সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু এই সমানতার মধ্যেও একটা বিশেষত্বও সর্ব্বদাই থাকিয়া যায়। চরণের সাধারণ উপাদান সকল মানুষেরই এক, কিন্তু চলনের ধরণ প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্বতন্ত্র ও পৃথক্। সেইরূপ একই উপাদানে মানুষের বাক্‌যন্ত্র নির্ম্মিত, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন লোকের গলার স্বর কত-না বিভিন্ন হয়। শারীরিক ব্যাপারে চলনের ধরণ, গলার সুর, হাসি-চাহনির ভাব, এ সকলের দ্বারাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব নির্দ্দেশ করি। মানসিক ব্যাপারেও মানুষে

মানুষে এইরূপ একটা মৌলিক পার্থক্য আছে, তাহারই দ্বারা তাহাদের চরিত্রের পার্থক্য জানা যায়।

যেমন মানুষে মানুষে, সেইরূপ এক জাতির সঙ্গে অপর জাতিরও একটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দেহের গঠন ও চর্ম্মের বর্ণ-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, ইহা প্রত্যক্ষ ও সর্ব্ববাদিসম্মত। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান মনোমানসাহায্যে বিভিন্ন জাতির এই পার্থক্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই Psychometrical (psycho—মন, meter—মান) আলোচনার ফলে আর্য্য, মোঙ্গলীয়, নিগ্রো প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে দেহগঠনসম্বন্ধে যে মৌলিক বিভিন্নতা আছে, তাহা অকাট্যপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন দেহগঠনসম্বন্ধে সেইরূপ চিন্তার গতি এবং সমাজবন্ধনের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধেও এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা মৌলিক ভেদ দৃষ্ট হয়।

মানুষের চিন্তার প্রধান বিষয় দুই,—অহং ও ইদং; এক সে স্বয়ং, আর এক যে নৈসর্গিক ও সামাজিক আবেষ্টন ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে সে বাস করে, তাহা। আর জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্নচক্ষে অহংকে, ইদংকে, এবং অহং-ইদংএর বিচিত্র সম্বন্ধকে ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। চিন্তার সঙ্গে ভাষার অতি ঘনিষ্ঠযোগ। ভাষা চিন্তার অনুগামিনী হয়। ভাষাতে যাহা ব্যক্ত হয় নাই, চিন্তাতেও তাহা অভিব্যক্ত হয় নাই, ধরিয়া লইতে পারা যায়। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিন্তার মৌলিক প্রকৃতির প্রমাণ তত্তজ্জাতির জাতীয় ভাষাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনো জাতি অতি প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই অহংকে কর্ত্তারূপে ধরিয়াছে, বিষয়িরূপে অহংকে প্রত্যক্ষ করিয়া ইদংকে তাহার বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই জাতির ভাষায় এই জাতির চিন্তা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, তাহাদের ব্যাকরণে, জাতীয়-ভাষার পদযোজনায়, কর্ত্তা ও কর্ম্ম এবং কর্ত্তাকর্ম্মের সম্বন্ধপ্রকাশের ব্যবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রাম অন্নভক্ষণ করিতেছে, শ্যাম বৃক্ষে আরোহণ করিতেছে, এইরূপ পদযোজনা এই সকল জাতির ভাষায় দৃষ্ট হয়। এই পদযোজনায় কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম, বিষয়ী ও বিষয়, এ সকলের জ্ঞান যে পরিস্ফুট, ইহার অকাট্যপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য জাতির ভাষায় তাহা পাওয়া যায় না। সে ভাষায় অন্ন ভক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ আরূঢ় হইয়াছে, এইরূপ পদযোজনাই কেবল হয়। ইহার অর্থ এই যে, যে জাতির ব্যাকরণে এইরূপ পদযোজনাই কেবল সম্ভব, তাহাদের চিন্তায় অহংজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাহাদের চিন্তা ইদংএর দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার পদযোজনায় কর্ত্তা ও কর্ম্ম এবং কর্ত্তাকর্ম্মের সম্বন্ধ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আর্য্যভাষামাত্রেই এই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সকল ভাষায় কেবলমাত্র অস্তিত্বব্যঞ্জক পদযোজনা হইয়া থাকে। আমি আছি, অহমস্মি, I am, এ সকল পদ অন্য ভাষায় সিদ্ধ হয় না। সে

সকল ভাষায় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে গেলে, অবস্থা ব্যক্ত করিতে হয়। সংস্কৃতে বা অন্যান্য আর্য্যভাষায় যেখানে অহমস্মি পদ ব্যবহৃত হয়, অনার্য্য কোনো কোনো ভাষায় সেখানে আমি বসিয়াছি, আমি দাঁড়াইয়াছি, ইত্যাদি কোনো-না-কোনো অবস্থা বা ক্রিয়াবাচক শব্দের সঙ্গে "আমার" যোগ করিয়া তবে অস্তিত্ব ব্যক্ত করিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের জাতীয়চিন্তার ছাঁচে অহংএর জ্ঞান প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্য জাতির চিন্তার ছাঁচে ততটা পরিস্ফুট হয় নাই। আমরা কর্ত্তার ভিতর দিয়া কর্ম্মকে দেখিয়াছি, তাঁহারা কর্ম্মের ভিতর দিয়া কর্ত্তাকে দেখিয়াছেন; এইজন্য কর্ম্ম ব্যতিরেকে কর্ত্তার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অবস্থান ব্যক্ত করিবার উপযোগী উপাদান তাঁহাদের ভাষার মৌলিক গঠনপ্রণালীতে বিদ্যমান নাই।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌলিক চিন্তার ছাঁচ যেমন বিভিন্ন, তাঁহাদের সমাজের ছাঁচও সেইরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোনো কোনো জাতির মধ্যে সমাজগঠন সামরিক আদর্শ অনুসারে রচিত হইয়াছে। সমরক্ষেত্রে যেমন সর্ব্ববিষয়ে সেনাপতির অনন্যপ্রতিবাদী অধিকার, তাঁহার ইচ্ছাই অখণ্ডপ্রতিপাল্য, সেইরূপ সমাজেও সমাজপতির ইচ্ছাই সমাজের একমাত্র প্রতিপাল্য বিধান। এই সকল জাতির মধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সামাজিক জীবনে পঞ্চায়তের স্থান হয় নাই। ইংরেজিতে যাহাকে constitutional শাসনপ্রণালী বলে, এই সকল জাতির মৌলিক ও প্রাচীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থায় তাহার কোনো অবসর হয় নাই। ইহাদের সমাজের ছাঁচ স্বেচ্ছাচারিতা বা despotismএর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার অপর কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রাচীনতম কাল হইতেই দেশের শাসনকার্য্যে দশের একটা প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যজাতিসকলের মধ্যে রাজা অতি প্রাচীনকাল হইতেই দশজনের প্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। দলপতি দলের দশজনের প্রতিনিধি, সমাজপতি সমাজের দশজনের মুখপাত্র, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের কর্ত্তাগণ তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। আর্য্যজাতির সমাজগঠনপ্রণালীতে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই এই সাধারণতন্ত্রভাব ছিল বলিয়া ইঁহাদের মধ্যে কি ভারতে, কি জর্ম্মাণিতে, সর্ব্বত্রই গ্রাম্য পঞ্চায়তপ্রথা সর্ব্বদা বিদ্যমান।

মনোরাজ্যে চিন্তার মৌলিক-ছাঁচ-সম্বন্ধে, এবং সমাজজীবনে সমাজনীতি ও রাজনীতির মৌলিকপ্রকৃতিবিষয়ে আর্য্যজাতি জগতে অপরাপর জাতি হইতে প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। য়ুরোপীয় আর্য্যগণ অহংকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, ইদংকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সমাজকে যে ছাঁচে গড়িয়াছেন, ভারতীয় হিন্দুগণও মূলত সেই ভাবেই দেখিয়াছেন, লইয়াছেন ও গড়িয়াছেন। হিন্দু ও য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এই সামান্য ধর্ম্মকে ও এই মৌলিক সম্বন্ধকে নির্দ্দেশ করিবার জন্যই হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনা—Indo-European culture—এই শব্দের সৃষ্টি হই-

য়াছে। আমরা যে অতি প্রাচীনকালে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, Indo-European শব্দে কেবল তাহাই ব্যক্ত করে। য়ুরোপের উপরে কখনো যে হিন্দু আপনার শ্রেষ্ঠসাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া য়ুরোপীয়সাধনার পরিপুষ্টি সম্পাদন করিয়াছে, এমন কিছুই তাহাতে বোঝায় না।

ভারতীয় আর্য্যগণ য়ুরোপীয় আর্য্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেই, ফলত আপনাদিগের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, হিন্দুসাধনা বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি। অহংএর জ্ঞান হিন্দুদেরও ছিল, গ্রীক্‌দিগেরও ছিল। বিষয়িরূপে অহংকে যাহারা যখনই ধরিতে পারিয়াছে, তখনই তাহাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী এক একত্বের জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে। এই একত্ববোধ গ্রীক্‌-হিন্দু উভয়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু গ্রীস্ এক ভাবে এই একত্ব সাধন করিয়াছে, হিন্দুস্থান অন্য ভাবে করিয়াছে। একত্ব ও বহুত্ব লইয়াই এই বিচিত্র জগৎ। একত্বজ্ঞানের মধ্যে বহুত্বকেও স্থান দিতে হয়। গ্রীক্ একের মধ্যে বহুকে তাহার আদিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, হিন্দু বহুর মধ্যে এককে তাহাদের প্রাণ ও সত্তা ও পরমার্থরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একের মধ্যে বহুকে দেখিলেই, বহুর পরস্পরের যে সম্বন্ধ, তাহারই মধ্যে এককে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হয়। অঙ্গাঙ্গিভাবে বহু ও একের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। বহু অঙ্গ, এক অঙ্গী। অঙ্গের বিকাশে অঙ্গীর বিকাশ, অঙ্গের পরস্পরের সম্বন্ধকে পাকাইয়া তুলিলে তবে অঙ্গী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গ্রীক্ একের মধ্যে বহুকে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, চিত্রশিল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয়। হিন্দু বহুর মধ্যে একেক দেখিয়াছে, অর্থাৎ বহুর বহুত্বের মধ্যে যে সাধারণ একত্ব আছে, তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। অতএব যে বিশেষত্বকে ফুটাইয়া-তুলিয়া তাহারই সাহায্যে বিশিষ্টের মধ্যেই নির্ব্বিশেষকে দেখিবার জন্য গ্রীক্‌সাধনা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দু সেই বিশেষত্বকে বর্জ্জন ও উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাহাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া-দিয়া, তাহার মূলস্থিত সাধারণ নির্ব্বিশেষ একত্বকেই ধরিতে আজীবন প্রাণপণ যত্ন করিয়াছে। ইহা ভাল হউক মন্দ হউক, ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। এই মূল হইতেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক আদর্শসকল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই হিন্দুসাধনার অন্তর্মুখীনতার মুখ্য কারণ। ইহাই হিন্দুর আত্মস্থিতি ও আত্মরতির উৎপত্তি ও সম্ভবস্থান।

য়ুরোপ অহং ও ইদংকে অঙ্গাঙ্গিভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে। অঙ্গী অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু অঙ্গনিরপেক্ষ নহেন। অতএব আত্মা ও অনাত্মা পরস্পরের উপরে নির্ভর, পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া চলে। অনাত্মাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলা আত্মার পক্ষে, অঙ্গাঙ্গিভাবে আত্মা ও অনাত্মাকে দেখিলে, আত্মঘাতী ব্যাপার হইয়া উঠে। এইজন্য য়ুরোপ আত্মার প্রাধান্য মানিয়াও অনাত্মাকে একেবারে আত্মাধীন করিতে পারে নাই। হিন্দুও তাহা পারে নাই। কিন্তু হিন্দু অনাত্মাকে বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়া, আর কিছু পারুক আর না পারুক, এমন একটা বিশাল নির্লিপ্ত ও

নির্ম্মুক্ত ভাব সাধন করিতে পারিয়াছে, যাহা অপর জাতি এখনো সাধন করিতে পারে নাই ;—এমন একটা দুর্গের সন্ধান পাইয়াছে, যেখানে বিষয়সম্বন্ধজনিত সর্ব্বপ্রকারের ভয়-লোভ-হর্ষামর্ষের অতীত হইয়া সে আত্মসংস্থ হইতে পারে, যাহার সংবাদ এখনো পর্য্যন্ত য়ুরোপ ভাল করিয়া পায় নাই।

এই যে আত্মসংস্থের আদর্শ, ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনা ইহার সংবাদ রাখে না ; হিন্দু-আশিয় যে সাধনা, তাহা এই আত্মজ্ঞান, আত্মরতি ও আত্ম-স্থিতিরই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এই আদর্শের সন্ধান যাহারা পাইয়াছে, তাহারা সর্ব্বদাই ভিতর দিয়া বাহিরকে দেখে, আত্মা দ্বারা অনাত্মার বিচার করে ;—অন্তরের অনুভূতি ও ভাবের দ্বারা বাহিরের অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকে। য়ুরোপ যাহাকে আশিয়ার অতিরঞ্জনপ্রবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করে, তাহা ফলত অতিরঞ্জন নহে, আত্ম-রঞ্জনমাত্র। একটা বস্তু দেখিলে আমরা তাহার বাহিরের মাপ ও ওজন করিতে ব্যস্ত হই না, কিন্তু তদ্দর্শনে অন্তরে যে রসের সঞ্চার হয়, তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই বাহ্য-বস্তুর বর্ণনা করি। য়ুরোপ চে'ন ফেলিয়া পথের দৈর্ঘ্য নির্দ্ধারণ করে, আমরা আমাদের পায়ের বল কতটা কমিল, তাহা দেখিয়া, পথ-ক্লান্তির পরিমাণ দিয়া, পথের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। য়ুরোপ বলে, পথের মাপ পথ ; আশিয়া বলে, পথের মাপ পথিক। এই-রূপে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, য়ুরোপ যাহাকে আশিয়ার অত্যুক্তি বলে, তাহা অত্যুক্তি নহে, আত্মোক্তিমাত্র।

এই আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্ম্মুখীনতা হিন্দু-আশিয় সাধনার প্রধান লক্ষণ। ইহা পূর্ব্ব-আশিয়ার সর্ব্বত্রই স্বল্পবিস্তর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মূলত ও প্রধানত হিন্দুরই নিজস্ব সম্পত্তি। হিন্দু-সাধনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আশিয়ার অন্যান্য জাতিসকলের মধ্যে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জাপান বর্ত্তমান সময়ে যে অদ্ভুত আত্ম-সংস্থ ভাব দেখাইয়াছে, তাহা এই হিন্দু-আশিয় সাধনারই ফল।

জাপান রাষ্ট্রলোভে বা অর্থলোভে নহে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থে এই ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রুষিয়া মাঞ্চুরিয়াকে বিবিধ ছলে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে-ছিল। কোরিয়ার উপরেও তাহার লোলুপ-দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল। আর্থারবন্দরের সাহায্যে প্রশান্তমহাসাগরে প্রবেশের পথ সে ক্রমে পরিষ্কার করিয়া লইতেছিল। কোরিয়া হস্তগত হইলে, মাঞ্চুরিয়ায় তাহার প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিলে পর, রুষের পক্ষে জাপানের উপরে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অসম্ভব বা একান্ত অসাধ্য হইত না। ফলত রুষ চীনের উপরে যে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, তাহাতে জাপানকে বিনাশ করিতে না পারিলে তাহার সমগ্র আশা সে-দিকে যে একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে, ইহাও সে জানিত। এইজন্য জাপানের উচ্ছেদসাধন রুষনীতির যে লক্ষ্যবহির্ভূত ছিল, এমনও মনে করা যায় না। জাপান রুষের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই আত্মরক্ষার জন্য এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উদ্দেশ্যও জাপানের অন্তরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। সেটি চীনের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা। য়ুরোপ যখন চীনের উপরে আপনার সমবেতশক্তি প্রয়োগ করে, জাপান সেই শত্রুদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া আপনার সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী রাজনীতিপ্রভাবে চীনকে য়ুরোপীয়ের গ্রাস হইতে রক্ষা করে। জাপান সমগ্র য়ুরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া চীনকে বাঁচাইতে পারিত না; কিন্তু য়ুরোপের সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া চীনকে বাঁচাইয়াছে। য়ুরোপ জাপানের কৌশল বুঝিয়াছিল, কিন্তু জাপানের বল কত, তাহা দেখে নাই। জাপানের পক্ষে চীনকে বাঁচাইবার জন্যও য়ুরোপের সমক্ষে একবার আত্মশক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব রুষের ভবিষ্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও সমগ্র য়ুরোপের সমক্ষে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠা করা, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া জাপান এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। বিধাতার কৃপায় এই উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। রুষ মাঞ্চুরিয়া হইতে তাড়িত হইয়াছে; কোরিয়ায় জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সমগ্র য়ুরোপের সমক্ষে জাপানের অলোকসামান্য প্রতাপ প্রদর্শিত হইয়াছে। য়ুরোপ জাপানকে আর হেয়জ্ঞান করিতে সাহসী হইবে না; জাপানের ভয়ে চীনের উপরেও হস্তক্ষেপ করিবার লোভকে এখন সাবধানে সংযত করিয়া রাখিবে। জাপানের স্বাতন্ত্র্য ও চীনের ভবিষ্যৎ উভয়ই সুরক্ষিত হইয়াছে। এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি?

এইজন্যই জাপান আপনার অর্থহানি করিয়াও রুষের প্রস্তাবিত সন্ধির সর্ত্ত হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে।

য়ুরোপ অর্থের মাপে সকল বিষয়ের মূল্যনির্দ্ধারণ করে। দেহ, মন, মান, ধর্ম্ম, সকলেরই একটা আর্থিক মূল্য আছে। মানের ক্ষতি, ধর্ম্মের ক্ষতি, সকলই অর্থে পূর্ণ হয়। আশিয়ার মানদণ্ড অর্থ নহে, আধ্যাত্মিক শক্তি ও কল্যাণ। আধ্যাত্মিক শক্তি ও কল্যাণের দিক্ দিয়া দেখিলে, এই সমরে জাপান সর্ব্ববিষয়ে লাভবান্ হইয়াছে। এই শক্তি ও কল্যাণের জন্যই জাপান এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে তাহার কোনো ক্ষতি হয় নাই। এখন সেই ক্ষতিপূরণের জন্য রুষের নিকট হইতে অর্থ দাবি করিয়া জাপান অকল্যাণের পন্থা অবলম্বন করিতে চাহে নাই। ইহা হিন্দু-আশিয় সাধনারই ফল।

এই জাপ-রুষ-সংগ্রামে জাপান কেবল আপনার অসাধারণ শক্তি ও অলোকসামান্য সংযম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু হিন্দু-আশিয় সাধনা বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, যাহা খৃষ্ট-য়ুরোপীয় সাধনা হইতে নিকৃষ্ট নহে, বিশ্বমানবের অঙ্গপুষ্টির জন্য যে সাধনার প্রতিষ্ঠাও অত্যাবশ্যক, যে সাধনা অকালে নির্ম্মূল হইলে বিশ্বমানবের অঙ্গহানি হইবে,—তাহাও জাপান বর্ত্তমান সময়ে প্রমাণিত করিয়াছে। ইহাই জাপ-রুষ-সমরে বিধাতার লীলা। ইহারই জন্য আমরাও সভ্যভাবেই জাপানের এই আত্মপ্রতিষ্ঠায় একটা গভীর আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতে পারি। আর জাপানের প্রতিষ্ঠায় হিন্দু-আশিয় সাধনার প্রতিষ্ঠা হইতেছে দেখিয়া আমাদের প্রাণেও নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মর্ম্মচ্ছেদ।

অঙ্গচ্ছেদে সকল সময়ে জীবনহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয় না। যাহার অঙ্গুলি "উরগক্ষত", তাহার পক্ষে অঙ্গচ্ছেদই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদে কাহারও কল্যাণ হয় না; সকলেরই জীবনহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অপেক্ষা বাঙালীর মর্ম্মচ্ছেদই অধিক মারাত্মক ব্যাপার! তাহার জন্যই বাঙালী দিনদিন এত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। সেকালের তুলনায় একালের বাঙালী জীবন্মৃত;—আত্মরক্ষায় নিতান্ত অসমর্থ।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জীবজগতের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, এমন কি উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর জীব এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে। যাহারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে না, তাহারা মৃত অথবা মৃতকল্প। মর্ম্মচ্ছেদ ভিন্ন জীবজগতে এরূপ মৃতকল্প অবস্থা উপস্থিত হয় না।

বাঙালীর মৃতকল্প অবস্থারও একমাত্র কারণ—মর্ম্মচ্ছেদ। মর্ম্মাহত বাঙালী তাহার দুঃখদুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতেও অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে! বাঙালী যদি আত্মরক্ষার জন্য কায়মনোবাক্যে লালায়িত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বাঙালী হইয়াই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে; অন্য কোন উপায়ে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সহজ এবং সরল কথাও দুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছে! বাঙালী আর বাঙালী নাই; সে তাহার স্বাভাবিক আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে;—ইহাই বাঙালীর মর্ম্মচ্ছেদ,—ইহাই মৃতকল্প অবস্থার মূল কারণ। সাহেব সাজিতে গিয়া বাঙালীর দুর্গতির একশেষ হইয়াছে।

বাঙালী পল্লিবাসী ছিল। নিতান্ত অনিবার্য্য কারণ উপস্থিত না হইলে, বাঙালী কখন নগরদর্শনের জন্য লালায়িত হইত না;—পল্লিনিকেতনে বাস করিয়া পরস্পরকে চিনিবার অবসর লাভ করিত; সকলে মিলিয়া সুখে-দুঃখে এক পরিবারের মত পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। ইহাই বাঙালীর পুরাতন পল্লিজীবনের একতার মূল। এই মূল এক্ষণে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!

ধনি দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এখনকার মত তখনও অর্থগত, বিদ্যাগত, ধর্ম্মগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এখনকার মত হৃদয়গত পার্থক্য বিদ্যমান না থাকায়, ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান সহজে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নেতৃপুরুষের আজ্ঞাপালন করিতে পারিত। আত্মরক্ষার তাহাই মূলশক্তি। সে শক্তি দিনদিন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহারও নেতৃত্বস্বীকার না করিলে, একতা সংস্থাপিত হইতে পারে না। হৃদয়-

বল ভিন্ন বাক্যবলে নেতৃত্বলাভ করা যায় না। এইজন্য বাঙালী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে!

গ্রামের লোকে গ্রামের কৃষিশিল্পের উপর নির্ভর করিত; সকলেই অল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; একালের মত এত দেশব্যাপী হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিত না! সকলেই অবসরসময়ে কোন-না-কোন শিল্পচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হইত; কাহাকেও বৃত্তির অভাবে অনশন অভ্যাস করিতে হইত না! এখন পল্লিবাসীর পক্ষে একমাত্র কৃষিকার্য্য ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিবার উপায় নাই;—গ্রামের লোকে আর গ্রামের শিল্প লইয়া সন্তুষ্ট হইতে সম্মত হয় না। গ্রামে যাহা উৎপন্ন হইতে পারে, গ্রামবাসী তাহা প্রার্থনা করে না; গ্রামবাসী যাহা প্রার্থনা করে, গ্রামে .কেন—সমগ্র দেশেও—তাহা উৎপন্ন হইবার উপায় নাই!

পল্লিজীবনই বাঙালীর সকল শক্তির মূল। যাহা বাঙালীর স্বাভাবিক শক্তি, পল্লিজীবনেই তাহা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহস ছিল, বাহুবল ছিল, সরলতা ছিল, সত্যনিষ্ঠা ছিল,—কর্ত্তব্যপালনে অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল! যে সকল গুণ থাকিলে মানবসমাজ অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে, পল্লিবাসী বাঙালীর মধ্যে তাহার কোন গুণেরই অভাব ছিল না। এখন বাঙালীর এই স্বাভাবিক শক্তি নানা কারণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহাকেও জানে না; কেহ কাহাকেও মানে না;—কেহ কাহারও উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যের শাসন করিতে পারে না! যাহারা এইরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা সহসা উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না।

নগরবাসী হইয়া বাঙালী তাহার স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে! নাগরিকগণের কুদৃষ্টান্তে প্রলুব্ধ হইয়া, অল্পকালের মধ্যেই বাঙালী অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্রের বিলাসবাসনা বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র; দরিদ্র বাঙালী বিলাসী হইয়া, কত-না বিড়ম্বিত হইতেছে!

আত্মসুখই বাঙালীর সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কথা চিন্তা করিবার অবসর নাই। যাহারা বাধ্য হইয়া পল্লিগ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা নায়কহীন হইয়া, কালস্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে। এই মর্ম্মচ্ছেদেই বাঙালী এত মৃতকল্প! তাহার নৈতিক সাহস তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; তাহার বাহুবল অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাহার সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠা কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কর্ত্তব্যপালনের অকৃত্রিম অধ্যবসায় এখন কেবল কর্ত্তব্যপালনের ভাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এরূপ মৃতকল্প ছত্রভঙ্গ মানবসমাজের পক্ষে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইংরেজ সওদাগরগণ এ দেশে প্রথম পদার্পণ করিবার সময়ে, বাঙালীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল না। তাহারা তখনও আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তাহারা ইংরেজের নিকট বিবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত; কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হইত না। ইংরেজদিগের পক্ষে বিক্রয় করিবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; দেশের লোকে তাহা ক্রয় করিতে না পারিলে, জীবন বিষময় বোধ করিত না।

ইংরেজ দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকিত; ইংরেজ ভিন্ন বাঙালী সে দোকানে ভিড় বাধাইবার জন্ম উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইত না! এখন আর সে অবস্থা বর্ত্তমান নাই। এখন ইংরেজের দোকান উঠিয়া গেলে, বাঙালী-জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে। যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না, তাহা দেশে উৎপন্ন হইত না। এখন তাহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে বলিয়াই ইংরেজের নিকট তাহা ক্রয় করিতে হয়। এখন আর সহসা সেই সকল দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করা সহজ নহে;—অভ্যাস এখন "মৌতাতে" পরিণত হইয়াছে! তখন "বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিব না" বলিয়া সভা করিবার প্রয়োজন ছিল না; এখন সভা করিয়া,—বক্তৃতা করিয়া,—দেবমন্দির স্পর্শ করিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াও,—বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার উপায় নাই। তাহা করিতে হইলেই, এদেশের লোককে আবার বাঙালী হইতে হইবে;—তাহারা বাঙালী হইতে সম্মত হইবে কি? ইংরেজ সাজিতে গিয়া, বাঙালী তাহার আত্মরক্ষার শক্তি হারাইয়া-ফেলিয়া, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্ম ইংরেজের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। বাঙালীকে আবার বাঙালী করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে বিদেশীয় দ্রব্য পরিহার করিবার জন্ম উত্তেজনা করিলে, সে চেষ্টা কদাচ সফল হইবার আশা নাই!

বাঙালীর পক্ষে বিদেশীয় দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গ্রামপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙালী যে ইংরেজ সাজিয়া অকারণে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে, তাহা স্বকৃত পাপের প্রত্যক্ষ প্রায়শ্চিত্ত। তাহার পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন স্বাভাবিক নহে। স্বদেশে যাহা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতেই বাঙালীর দিন চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু বাঙালী এখন আর তাহা লইয়া দিন চালাইতে পারিতেছে না;—ইহাই বাঙালীর মর্ম্মচ্ছেদ!

সংযমই মানবসভ্যতার একমাত্র সমুন্নত আদর্শ। এই আদর্শ সংস্থাপিত করিয়া, পুরাতন প্রাচ্যশিক্ষা মানবসমাজের ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। সে শিক্ষা বঙ্গদেশেও প্রচলিত ছিল। তাহার প্রভাবে বাঙালী আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, পরের সুখের জন্ম অকাতরে আত্মত্যাগ করিয়াছে। প্রতি গ্রামের পুরাতন দেবমন্দির, অতিথিশালা, দীর্ঘিকা ও সরোবর অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে।

ইংরেজিশিক্ষা বাঙালীর মর্ম্মচ্ছেদ সুসম্পন্ন করিয়া সম্ভোগকেই সভ্যতার প্রকৃত আদর্শ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া দিয়াছে। বাঙালীর শিক্ষায় মধ্যে এরূপ উপদেশ নিহিত ছিল না; বাঙালীর পারিবারিক বা সামাজিক রীতিনীতির মধ্যেও এরূপ উপদেশ বর্ত্তমান ছিল না। ইংরেজিশিক্ষাই ইহাকে এদেশে এত প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে প্রতারিত হইয়া, অনেক চিন্তাহীন লেখক বাঙালীর পারিবারিক ব্যবস্থাকেই বাঙালীর অধঃপতনের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাঙালীর অধঃপতনের মূলকারণ কি, ধীরভাবে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার

সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে, রোগের মূল অজ্ঞাত থাকিবে;—চিকিৎসা বিফল হইয়া পড়িবে!

যে জাতি যে ভাবে অনাদিকাল হইতে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই জাতির ইতিহাসে তাহার জীবনগঠনের নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই জাতি অন্য নিয়মে সহসা উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। জীবজগতের সর্ব্বত্র ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বথ অশ্বথের চিরপ্রচলিত নিয়মের অধীন হইয়াই সমুন্নতি লাভ করিতে পারে; অন্য বৃক্ষের নিয়মের অধীন হইয়া সমুন্নতি লাভ করিতে পারে না! বাঙালী বাঙালীর চিরপ্রচলিত নিয়মের অধীন হইয়াই সমুন্নতি লাভ করিতে পারিবে;—তাহাই বিশ্ববিধাতার বিধান। তাহাকে অতিক্রম করিলেই মর্ম্মচ্ছেদ উপস্থিত হইবে। বাঙালী না বুঝিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, বড় হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল; তাহাতেই বাঙালীর মর্ম্মচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। বাঁচিতে হইলে, বাঙালীকে আবার বাঙালী হইতে হইবে।

শিক্ষিত-বাঙালীর সহিত নির্ধন, নিরক্ষর, পল্লিবাসী বাঙালীর আন্তরিক আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যাহারা নির্ধন, যাহারা নিরক্ষর, যাহারা পল্লিবাসী, তাহারাই সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগের সহিত সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের পরিচয় ও আত্মীয়তা থাকায়, সেকালের সমগ্র বাঙালীজাতির পক্ষে সকল কার্য্যেই একতা-লাভের সম্ভাবনা ছিল। উপযুক্ত নায়ক প্রাপ্ত হইলে, তাহারা একমন একপ্রাণ হইয়া নানা কার্য্য সাধন করিতে পারিত;—ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এখন এই শ্রেণীর বাঙালী শিক্ষিত-বাঙালী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আমাদিগকে জানে না, আমরাও তাহাদিগকে জানি না;—এই কারণে তাহারা আমাদিগকে আর পূর্ব্ববৎ একমন একপ্রাণ হইয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। আমরা এতকাল তাহাদিগকে ছাড়িয়া, স্বদেশের উন্নতি-সাধনের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, ফললাভ করিতে পারি নাই। তাহাদিগকে আবার আপনার করিয়া লইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কৃত্রিম উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইবে না; সময়ে সময়ে জনসমাজের বৃহৎ-সমিতি গঠিত করিলেও, তাহা সিদ্ধ হইবে না। তাহারা কৌতূহলপরবশ হইয়া দেখিতে আসিয়া, কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যাহারা পল্লিবাসী, তাঁহারা আবার বাঙালী হইয়া জনসাধারণের সহিত পূর্ব্ববৎ আন্তরিক আত্মীয়তা সংস্থাপিত করিতে না পারিলে, বাঙালী শক্তিলাভ করিতে পারিবে না। গবর্মেণ্ট বঙ্গবিচ্ছেদে যতটুকু বিচ্ছেদ সাধন করিতেছেন, এই মর্ম্মচ্ছেদে তাহা অপেক্ষা অধিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। তাহা দূর করিতেই হইবে। আন্তরিক অনুরাগ ভিন্ন তাহা কদাচ সফল হইবে না।

কোন্ শ্রেণীর শিক্ষিত-বাঙালীর অনুরাগে এই মর্ম্মচ্ছেদ সহজে বিদূরিত হইতে পারে, সে কথা চিন্তা করিবামাত্র দেশের জমিদারদলকেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হয়। তাঁহারাই বাঙালীর বল, তাঁহারাই বাঙালীর

ভরসা, তাঁহারাই বাঙালীর প্রকৃত নায়ক। তাঁহাদিগকে ধরিয়াই বাঙালী একদিন শিক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহসে, বাহুবলে, সত্যনিষ্ঠায়, কর্ত্তব্যপালনের অধ্যবসায়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহাদিগকে ধরিয়াই আবার বড় হইয়া উঠিতে পারিবে। ইহার জন্ত জমিদারদলকে ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে;—তাঁহাদিগকে বাঙালী হইতে হইবে। যে শ্রেণীর আচারব্যবহার ইংরেজের পক্ষে দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয় না, বাঙালীর পক্ষে তাহাই অত্যন্ত দোষাবহ। জমিদার-দলের মধ্যে এই শ্রেণীর আচারব্যবহারের অভাব নাই। তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষিতসমাজে মিশিবার বাধা হয় না; কিন্তু অশিক্ষিতসমাজে মিশিবার পক্ষে তাহাই প্রধান অন্তরায়। তাহারা সাহেবী-আনা দেখিলে, আপনার লোক বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না! এই একমাত্র অপরাধে অনেক জমিদার আপন প্রজাবর্গের পক্ষে পর হইয়া উঠিয়াছেন! একটু ত্যাগ-স্বীকার করিবামাত্র তাঁহারা আবার আপন হইতে পারেন।

অন্যান্ত শিক্ষিত-বাঙালীও অল্পাধিক-মাত্রায় সাহেবী-আনা ধরিয়া স্বদেশের জন-সমাজের নিকট পর হইয়া উঠিয়াছেন। সাহেবী-আনার প্রধান দোষ এই যে,—তাহা আমাদিগকে স্বতন্ত্র ও স্বার্থপর করিয়া দেশের লোকের সহিত আন্তরিক সংযোগ-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। নিরক্ষর লোককে পশুর মত ভাবিতে ও পশুর মত ব্যবহার করিতে শিখা-ইয়া, ইংরেজি-শিক্ষা অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকেও স্বতন্ত্র করিয়া তুলি-য়াছে! যাহা বাঙালী জনসাধারণের নিকট অভদ্রব্যবহার বলিয়া সুপরিচিত, সেরূপ ব্যবহার শিক্ষিত-বাঙালীকেও আক্রমণ করিয়াছে। নিরক্ষর ও নির্ধন মুটেমজুরের সহিত সাহেব ও শিক্ষিত বাঙালীর ব্যবহার প্রায় একরূপ হইয়া উঠিয়াছে;—হঠকারি-তায়, অবজ্ঞায়, অত্যাচারে শিক্ষিত-বাঙালী সাহেবদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন! প্রভুভৃত্যের মধ্যে যে স্নেহের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; ধনিদরিদ্রের মধ্যে যে মিলনক্ষেত্র বর্ত্তমান ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। এখন আর আমাদের সুখদুঃখের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন বঙ্গবিচ্ছেদে হাহাকার করি, তাহারা তখন আমাদের আন্তরিক শোকের প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা যখন স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্ত উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ বিতরণ করি, তাহারা তখন প্রকৃতভাবে আমাদের আন্ত-রিকতায় আস্থাস্থাপন করিতে পারে না। আমরা সর্ব্বাগ্রে বিদেশীয়দ্রব্যে আসক্ত হইয়া স্বদেশশিল্পের সর্ব্বনাশ করিয়াছি; আমাদের বিদেশমোহ বিদূরিত হইয়াছে কি না, তাহাতে জনসাধারণের মনে সন্দেহের অভাব নাই!

ইংরেজিশিক্ষায় যে বঙ্গবিচ্ছেদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার তুলনায় ইংরেজশাসনের বঙ্গবিচ্ছেদ বিশেষ মারাত্মক নহে। শাসন-নীতি সুসংযত করিবার অধিকার আমাদের অনায়ত্ত। আমরা প্রতিবাদ করিতে পারি;—আবেদন করিতে পারি;—আন্দোলনে

জলস্থল আলোড়িত করিয়া তুলিতে পারি;—শাসনশক্তিকে কদাচ সুসংযত করিতে পারি না। সুতরাং ইংরেজশাসনে যে বঙ্গবিচ্ছেদ উপস্থিত হইতেছে, তাহা অনিবার্য্য। তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিবে, অনেক অকল্যাণ হইবে, অনেক অনর্থ উৎপন্ন হইবে;—প্রাণহানি ঘটিবে না। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষায় যে মর্ম্মচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতেই বাঙালীর প্রাণহানির সূত্রপাত হইয়াছে। তাহার গতিরোধের উপায় আবিষ্কার করিতে না পারিলে, ক্ষীণ প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িবে; এখনও আত্মরক্ষার সময় আছে;—অল্পদিনের মধ্যে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হইবে।

বাঙালীর ইতিহাসে অনেক রাজনৈতিক সন্ধিকাল উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙালী সেই সন্ধিকালে আত্মনির্ভর না করিয়া, পরমুখাপেক্ষী হইয়াই, রাজনৈতিক অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে নাই। বাঙালীর ইতি-হাসে আবার একটি সন্ধিকাল উপস্থিত হইয়াছে। ইহা রাজনৈতিক সন্ধিকাল না হইলেও, জাতীয়জীবনের ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সন্ধিকাল। সন্ধিকাল সমস্যার কাল; সেই কালে যে জাতি যেরূপ ভাবে সমস্যার মীমাংসা করিয়া লয়, তাহার ভবিষ্যৎ সেইরূপ ভাবেই গঠিত হইয়া থাকে। এখনকার সমস্যা বিষম সমস্যা। মর্ম্মচ্ছেদে বাঙালীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেকেই অল্পাধিকমাত্রায় সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছেন। কি উপায়ে ইহার গতিরোধ করা যাইতে পারে? এই সমস্যার মীমাংসায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, বাঙালীর ভবিষ্যৎ আশাভরসা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে।

আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রবুদ্ধ না হইলে, কোন জাতিই অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। বাঙালী বাঙালী না হইলে, তাহার আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রবুদ্ধ হইবার উপায় নাই। সকল দেশের ইতিহাসই এই সরল সিদ্ধান্তের পক্ষসমর্থন করিয়া থাকে। আমাদের ইতিহাসে ইহার কোন নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হইবার আশা নাই। বাঙালীকে আবার বাঙালী হইতে হইবে;—তাহাই একমাত্র পথ।

আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রবুদ্ধ হইবামাত্র স্বাবলম্বনপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে। স্বাবলম্বনই অভ্যুদয়লাভের মূলমন্ত্র। স্বাবলম্বন অকুতোভয়তায়, অধ্যবসায়ে জাতীয়জীবনে শক্তিসঞ্চার করে। ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, স্বাবলম্বনবিচ্যুত ভারত-বাসীর দুর্দ্দশার কাহিনী কাহারও চিত্তে সমবেদনার উদ্রেক করিতে পারে না। যাহাদের জন্মভূমি রত্নপ্রসবিনী, তাহারা স্বাবলম্বনবিচ্যুত হইয়া অনশনে ক্লিষ্ট হইলে, কে তাহার জন্য হাহাকার করিবে?

আমরা আমাদের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিব;—যতদিন তাহাতে কৃতকার্য্য না হই, ততদিন অন্য চিন্তা বিসর্জ্জন দিব;—ইহাই স্বাবলম্বনের প্রথম শিক্ষা। প্রথম শিক্ষা বড় কষ্টকর;—বালককে তাহা আয়ত্ত করিতে বহু বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হয়। আমাদিগকেও বহু বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া, এই প্রথমশিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলে, আমাদের

ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন কেবল কল্পনারাজ্যেই কুহক বিস্তার করিবে।

এক দিকে অকুতোভয়তা, অন্য দিকে অধ্যবসায়, এই দুইটি চিত্তবল না থাকিলে, স্বাবলম্বন আয়ত্ত হয় না;—তাহা কেবল গ্রন্থগত কথায় কথাই থাকিয়া যায়। বাঙালীর পক্ষে অকুতোভয়তা দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ বাঙালী জুজুর ভয়ে জড়সড়। কাল্পনিক ভয়ের নাম জুজুর ভয়। তাহাতে চিত্তবৃত্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে; চিন্তার স্বাধীনতা দূরীভূত হইয়া যায়, কার্য্যের স্বাধীনতা বিকশিত হইতে পারে না।

রাজপুরুষগণ যখন কোন বিষয়ে দেশের গণ্যমান্য লোকের মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তখনই বাঙালীর চিত্তদুর্ব্বলতার নিকৃষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে;—যাঁহারা পদস্থ বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জুজুর ভয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না! পদস্থ ব্যক্তিগণ একবার সাহস করিয়া জুজুর ভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলে, বাঙালীর চিত্ত-দুর্ব্বলতা দূর হইতে পারে। যে কার্য্যে অধ্যবসায় আবশ্যক, বাঙালী তাহাতে জয়লাভ করিতে পারে না বলিয়া বোধ হয় না। আবেদন-নিবেদনে বাঙালীর অধ্যবসায় এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। এই অধ্যবসায় পরাবলম্বনকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে;—ইহাকে একবার স্বাবলম্বন আশ্রয় করাইতে পারিলে, বাঙালীর আত্মোন্নতির চেষ্টা সফল হইতে পারে।

কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া করিতে হইবে, তাহার পন্থানির্দ্দেশের জন্য সভ্য-সমাজের ইতিহাস মানবজাতিকে নিয়ত উৎসাহদান করিতেছে। কে কি ছিল, কি হইয়াছে,—তাহা কাহারও অবিজ্ঞাত নাই। স্বাবলম্বনে দুর্ব্বল সবল হইয়াছে; দরিদ্র ধনশালী হইয়াছে; বর্ব্বর সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছে। স্বাবলম্বনের অভাবে সবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; ধন-শালী কাঙাল হইয়া হাহাকার করিতেছে; সুসভ্য মানবসমাজ বর্ব্বরতার কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে! বাঙালীর সম্মুখে ইহার উভয় দৃষ্টান্তই দেদীপ্যমান। তথাপি বাঙালী কেবল দাস্যবৃত্তিতেই আত্মো-ন্নতিসাধনের আয়োজন করিতেছে। দাস্যবৃত্তিতে কোন জাতিই অভ্যুদয়লাভ করিতে পারে নাই।

বাঙালী অর্থোপার্জ্জনের জন্যই বিদ্যাশিক্ষা করে। তথাপি বাঙালী অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃত পথে অগ্রসর না হইয়া, রাজদ্বারে কোলাহল করিয়া জীবনক্ষয় করিয়া থাকে! রাজপুরুষগণ আমাদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন না,—ইহাই বাঙালীর সর্ব্বপ্রধান আর্ত্তনাদ! আমরা আমাদিগকে যে সকল উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে পারি, তাহার জন্য যথাযোগ্য ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেকালে রাজপদলাভের জন্য এরূপ প্রবল পিপাসায় বাঙালী নিরন্তর এরূপ লাঞ্ছনাভোগ করে নাই।

বাঙালীকে আবার বাঙালী হইতে হইলে, স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে হইবে। তাহাতেই মর্ম্মচ্ছেদ বিদূরিত হইতে পারে।

কিন্তু স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবার পক্ষে অনেক বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান আছে। প্রথম ও প্রধান বাধা—আদর্শের বাধা। সকলেই সাম্যমন্ত্রে উন্মত্ত হইয়া একাকার হইবার জন্য লালায়িত। এই অর্থে পুরাকালে সাম্যশব্দ ব্যবহৃত হইত না। জগতের সকল ব্যাপারেই বৈষম্য দেদীপ্যমান;—মানবসমাজেও বিবিধ বৈষম্য চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে। বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের নামই সাম্য। বৈষম্য বিদূরিত করিবার নাম সাম্য নহে। বাঙালী পুরাতন কথার নূতন অর্থ কল্পনা করিয়া, বৈষম্য বিদূরিত করিবার জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মানবহস্তের অঙ্গুলিনিচয়ের মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত যে প্রত্যক্ষ বৈষম্য বর্ত্তমান আছে, আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসাবলে সেই পুরাতন বৈষম্য বিদূরিত করিয়া দিলে, মানবহস্ত তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। মানবসমাজের নরনারীর অবস্থাও সেইরূপ। দেশের সকল শ্রেণীর লোকেই ভদ্রলোক সাজিবার আশায় এক পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কৃষকের সন্তান কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁতি-কর্ম্মকার যন্ত্রশালা হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে; সকলেই ভদ্র সাজিবার জন্য আবেদনপত্র লইয়া কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছে! এই সাম্যমন্ত্র যে কত অনর্থের মূল, কেহ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না। স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য লালায়িত হইলে কি হইবে? কে তাহার উন্নতিসাধন করিবে? যাহারা শিল্পগৌরবে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভদ্র সাজিয়া, জনসমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে;—শিল্পী নাই;—শিল্পীর সন্তানকে শিল্পচর্চ্চায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র সে তাহাকে নিতান্ত গ্লানিজনক অনুরোধ মনে করিয়া নিরতিশয় উত্যক্ত হইয়া উঠিবে! যাহারা শিল্পচর্চ্চা করিলে অনায়াসে স্বদেশশিল্পের সমুন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাদিগকে শিল্পচর্চ্চায় নিযুক্ত করিতে না পারিলে, স্বদেশশিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা ইহাতে নিযুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র, মর্ম্মচ্ছেদের অনিবার্য্য অত্যাচারে তাহারা বাবু সাজিয়া জনসমাজে মিশিয়া পড়িয়াছে; অনেকে পুরাতন কুলোপাধি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে! বাঙালী পিতৃপুরুষের নামে লজ্জিত হইত না; এখন অনেক বাঙালী সে নাম গোপন করিবার জন্যই লালায়িত! এই মর্ম্মচ্ছেদ বিদূরিত না হইলে, শিল্পচর্চ্চার আধুনিক আয়োজন-আন্দোলন বিফল হইয়া পড়িবে। যাঁহারা স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা একবার স্বদেশের পুরাতন শিল্পগোষ্ঠীর বর্ত্তমান বংশধরগণকে শিল্পচর্চ্চায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র বুঝিতে পারিবেন,—মর্ম্মচ্ছেদ বাঙালীকে কতদূর অধঃপাতিত করিয়াছে!

কাহার কথা বলিব? উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লোকেরই আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিকার সাধন করিতে না পারিলে, বাঙালীর অভ্যুদয়লাভের আশা নাই। মনে করিলে বাঙালী আবার মানুষ

হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু মনে করিলেই, বাঙালীকে আবার বাঙালী হইতে হইবে ;—

বাঙালী তাহাতে নিতান্ত অসম্মত। ইহাই বাঙালীর প্রকৃত মর্ম্মচ্ছেদ!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

হবেই হবে।

বাউলের সুর।

নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করে' থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে
ওরে মন হবেই হবে।

পাষাণসমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে
আছে যারা বোবার মতন
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।

সময় হলো সময় হলো
যে যার আপন বোঝা তোলো
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে!
ওরে মন হবেই হবে।

দ্বিধা।

বেহাগ—একতালা।

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে ভাই॥
একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক্‌ বারেক ও দিক্‌
এ খেলা আর খেলিস্‌নে ভাই॥
মেলে কি না মেলে রতন
কর্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে ভাই।
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্‌নে ভাই॥

অভয়।

ভূপালি—একতালা।

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না॥
তরিখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না॥

শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব তবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের 'পরে পড়্‌ব না ॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ্ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সর্‌ব না ॥

১

স্বদেশ।

বেদনার মাঝে আজি জেগেছে চেতনা,
পেয়েছি তোমার দেখা হে মোর স্বদেশ!
নত-আঁখি জল-ভরা ছিন্নচীরবেশ
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছ কথা কহিছ না।
উদাসী প্রবাসী তুমি ঘরে আপনার,
'যথারণ্য তথা গৃহ' কুপুত্রের মাঝে।
অচেতন পশ্চিমের সুতীব্র সুরায়
মত্ততায় সন্তানেরা, লজ্জাহীন সাজে
লুণ্ঠিত ধূলায়, মুখে শৌণ্ডিকের ভাষা,
তোমার অমৃতবাণী লুপ্ত রসনায়।
অতীত গৌরব তব, ভবিষ্যের আশা,
আজিকার যাহা-কিছু—বিদেশীর পায়
নিঃশেষ দিয়াছি ঢেলে। একি হেরি আজ,
ভিখারীর বেশে তুমি ওগো রাজরাজ!

ব্রত।

ওগো বঙ্গকুলাঙ্গনা সতীলক্ষ্মীগণ,
আজি বঙ্গমাতা কাঁদি তোমাদের দ্বারে
হানিছেন কর। নিরাশ কোরো না তাঁরে,
ভিখারিণী জন্মভূমি, তবু মা যে হন
তোমাদের। শুন তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা।
আর কিছু নয়, শুধু চাহিছেন তিনি
রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত-উদ্‌যাপনা
তোমাদের ঘরে, যার পুণ্যফলে জিনি
লবে পৌরুষ-রতন— হৃত কোহিনূর
ভারতের। দেশহিতব্রতধারিণীর
কল্যাণীর বরমাল্যে দৈন্য হ'বে দূর
পুরুষের, স্তন্যে তাঁর শিশু হ'বে বীর,
রাখী তাঁর ভ্রাতৃহস্তে বল দিবে আনি,
তবে ভুলিবেন মাতা সর্ব্ব দুঃখগ্লানি।

ভিখারী।

সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-মাখা কণ্ঠে ভিক্ষাঝুলি,
ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে কে তুমি সন্ন্যাসী
ভিখারী শিবের সম! আজি পুরবাসী
বিস্ময়ে হেরিছে সবে! বাতায়ন খুলি
অন্তঃপুরলক্ষ্মীগণ অপূর্ব্ব সঙ্গীত
শুনিছেন তব। করুণায়—বেদনায়

শত উৎসধারা বক্ষে বক্ষে উৎসারিত।
গাহিতেছ বৈরাগ্যের গান বারংবার
মৌনব্রত কর্ম্মরত নবজীবনের
উদ্বোধনগীতি। মাগিতেছ প্রীতিভিক্ষা
শুধু, চাহিতেছ স্বার্থত্যাগ, সংযমের
অজিন-কৌপীন-বাস রিক্ত সজ্জা, দীক্ষা
অগ্নিমন্ত্রে তব। সুখ-স্বার্থ-হিংসা-দ্বেষ
গীতে তব ভুলে যাই হে মোর স্বদেশ!

৪

উপনয়ন।

আজি তব ভগ্ন-দেবালয়ে হোমানল
ভাল করি জ্বাল ওগো তাপস মহান্!
বাজাও তোমার শঙ্খ বাজাও বিষাণ,
তারস্বরে কর উচ্চারণ অবিরল
বীজমন্ত্র তব। এসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাল-বৃদ্ধ, যুবা-নারী
তব ভক্তদল—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক। ব্রহ্মচারী
আজি হ'তে মোরা; লভি নবজীবনের
দ্বিজত্ব নবীন শূদ্র-বিপ্র স্ত্রী-পুরুষে।
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
নির্ব্বিচারে। আজি এই মঙ্গলপ্রত্যুষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে যজ্ঞানল ল'য়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হ'য়ে।

৫

আগ্নেয়গিরি।

গভীর অতলস্পর্শ হৃদয়ের তলে
আগ্নেয়গিরির সম ধরিছ অনল।
আজি ভস্মধূমাচ্ছন্ন তুমি অচঞ্চল
হে মোর স্বদেশ! শুধু ধক্‌ধক্ জ্বলে
রাবণের চিতা বক্ষোমাঝে রাত্রিদিন।
প্রমোদপ্রাসাদ রচি' সুখের শয়নে
আলস্যে-বিলাসে কাটি গেছে কর্ম্মহীন
দীর্ঘদিবা। নিদ্রা আজি নাহিক নয়নে
ভোগ-অবসাদ-ক্লিষ্ট জর্জ্জরিত হিয়া।
নিশীথশয়ন ত্যজি আজি এ আঁধারে
তব পৃথ্বীতলে তপ্ত বক্ষ পাতি দিয়া
শুনিলাম কম্পমান মর্ম্মের মাঝারে
অব্যক্ত ক্রন্দন তব গুমরি গুমরি
উঠিতেছে মুহুর্মুহু। উঠিনু শিহরি!

৬

প্রলয়।

কতদিন বল আর রাখিবে সম্বরি
বক্ষোমাঝে রুদ্ধশ্বাস, বেদনা গভীর,
সন্তানের অবহেলা, ঘৃণা বিদেশীর
সহিবে নীরবে? কবে উঠিবে বিদরি
মেদিনী-অম্বরতল ক্রন্দনের স্বরে
ঢালি দিবে উচ্ছ্বসিত যুগযুগান্তের
অগ্নিপ্রস্রবণ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে
হতেছে সঞ্চিত নিত্য যাহা। প্রলয়ের

প্রবল আঘাতে বিলাসের কারাগার
নিমেষে ভাঙিয়া দিবে, দিবে চূর্ণ করি
বিলাসসম্ভার যত পণ্যবীথিকার।
সেই দিন ভারতের চিরবিভাবরী
হ'বে সুপ্রভাত, দ্বাদশ আদিত্যগণ
আনিবেন ভারতের মহাজাগরণ।

বঙ্গবিভাগে।

রাজার শাণিতখড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারেনি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ!
শুধু ভাঙিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ,
দিয়াছে চেতনা। আজি নবীন প্রভাতে
যুগযুগান্তের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছ, হেরিতেছ তরবারি-লেখা
বিদারণ-রেখাগুলি স্থিরদৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত-বক্ষোপরি। শুধু ক্ষুদ্র রেখা,
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূতদেহ তব
কুলিশকঠোর? এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাক্ তরঙ্গ ভৈরব
বঙ্গবক্ষঃক্ষতবিগলিত মেঘনাদ,
'রক্তগঙ্গা—পুণ্যস্পর্শ যার দিবে প্রাণ
সহস্র সন্তানে, দিবে বরাভয়দান।

শ্রীঃ—,

রাখি-বন্ধনের উৎসব।

আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতা বাঁধিয়া দিব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই:—ভাই ভাই একঠাঁই। বিজয়াদশমীর দিনে যেমন বাঙালী আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়া প্রণাম নমস্কার কোলাকুলি করিয়া আসে সেইরূপ প্রতি বৎসরে এই ৩০শে আশ্বিনের তিথিতে আমরা বাংলাদেশের সকল বিভাগেরই আত্মীয় বন্ধুবর্গের দক্ষিণ হস্তে এই মিলনের রাখি বাঁধিয়া আসিব। সে দিন বাঙালার পূর্ব্ব বিভাগের সহিত পশ্চিম বিভগের, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্ন-শ্রেণীর, খৃষ্টান মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলনস্মরণের দিন—অতএব সেদিন প্রভু ও ভৃত্য ধনী ও দরিদ্র জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পরস্পরের হস্তে রাখি বাঁধিয়া দিবেন। বর্ত্তমান বৎসরে এই ৩০ শে আশ্বিনে শুক্ল তৃতীয়া তিথি পড়িবে—এই তিথিকে আমরা রাখী তৃতীয়া নাম দিয়া উক্ত তিথিতে প্রতিবর্ষে বাঙালির মিলনোৎসব সম্পন্ন করিব। উক্ত দিনে সংযমস্বরূপ আমাদের অরন্ধন হইবে—চুলি না জালিয়া আমরা ফল দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিব। উক্তদিনে বাঙলার পূর্ব্ব-বিভাগের লোকেরা পশ্চিমবিভাগের নিকট ও পশ্চিমবিভাগের লোকেরা পূর্ব্ববিভাগের নিকট "ভাই ভাই একঠাঁই" এই লিখিত মন্ত্র-সহ রাখীসূত্র পাঠাইয়া দিবেন। রাজার খড়্গ যে বিধাতার বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারে না ইহাই উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের এই রাখীবন্ধনের উৎসব।

অনন্যতা।

তোমারে বরণ করি নিয়েছি যখন,
আর কারে নাহি খুঁজি; পাই বা না পাই
কোন প্রতিদান, তাহে নাহি আকিঞ্চন!
হৃদয়-কুসুম-রাশি শুধু দিতে চাই
দেবতারে! থাকে দৈন্য, করিয়া গোপন
পূর্ণ করি' ল'ব প্রেমে; কোন দুঃখ নাই—
ব্যর্থ যদি হয় সাধ; নিগূঢ় বেদন
তুলিবে প্রগাঢ় করি প্রেম আরো; তাই,
খুঁজি নাই অবগাহি' হৃদয়ের তল
কি যে চাই। শুধু মোর নিভৃত অন্তরে

রেখেছি একটি দীপ করিয়া উজ্জ্বল,
দিবা-সন্ধ্যা দেবতার আরতির তরে।
ভালবাসি—তাই মম জীবন সফল,
এতটুকু দৈন্যদুখ নাহি মোর ঘরে!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

রথ।

কাননের কোলে শ্যামল কোমল পথটি—
তাহারি উপরে চলিয়াছে ধীরে রথটি,
সমুখে সুদূরে উদিছে প্রভাতরবি,
হাসিছে জগৎ মধুর-সোনালি-ছবি,
পথতরুসারি ভরিয়া রয়েছে ফুলে,
শাখায় শাখায় দোয়েল-পাপিয়া বুলে;
নব উৎসাহে চলেছে নূতন রথটি,—
শান্ত-সরল, আলোক-উজল পথটি।

নগরের মাঝে রক্তপাটল পথটি—
তারি 'পর দিয়া ছুটিয়া চলেছে রথটি,
মাথার উপর জ্বলিছে প্রখররবি,
ধূলায় ধূসর পিঙ্গ জগৎছবি,
পথঘাটবাট মানুষে মানুষে ভরা,
কল কোলাহলে কাঁপিয়া উঠিছে ধরা;
অধীর আবেগে চলেছে ছুটিয়া রথটি—
ঘুরিয়া-ফিরিয়া চলিয়াছে বাঁকা পথটি।

সাগরের কূলে বালুকাধূসর পথটি—
তারি 'পরে এসে থামিয়া আসিল রথটি।
অস্ত-অচলে ডুবিছে ক্লান্ত রবি,
মৌনবিষাদে জগৎ তামসছবি,
প্রান্তরপথে নাহি চলে জনপ্রাণী;
নিভৃত আকাশে ধ্বনিছে ঘুমের বাণী;
মন্থরগতি থামিল জীর্ণ রথটি,—
সাগরে আসিয়া মিলাইয়া গেল পথটি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বঙ্গদর্শন।

বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা।

ইংরেজ অকারণে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয় নাই। প্রকাশ্যে যে কারণ দেখাইতেছে, তাহাই যে এই ব্যাপারের মুখ্য হেতু, ইহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দেশটা অতি বড় হইয়া পড়িয়াছে, লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, শাসনযন্ত্রের জটিলতাও তার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে;—এত বড় দেশ, এতগুলি লোক, এমন জটিল শাসনযন্ত্রের উপরে যথাযথ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে যথানিয়মে পরিচালিত করা একজন লাটের পক্ষে অসাধ্য,—এ কথার কোনো মূল্য নাই। কিছুদিন হইতে বাংলাশাসনে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এমন রাজপুরুষ বাংলার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইতেছেন, এই কারণে তাঁহাদের পক্ষে শাসনভার কিঞ্চিৎপরিমাণে গুরুতর হইতে পারে। কিন্তু এ রোগের ঔষধ যথাসম্ভব বাংলার রাজপুরুষগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া বাংলার সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করা, বাংলাকে বিখণ্ড করা নহে। আর দেশের প্রধানতম রাজপুরুষকে সাধারণভাবে শাসননীতির তত্ত্বাবধানই করিতে হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান করা ও প্রত্যেক কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করা তাঁহার সঙ্গত কর্ত্তব্য নহে। এ সকল ভার স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের উপরেই ন্যস্ত আছে। তবে আর লাটের ভার এত গুরু হইল কিরূপে? বাংলার ছোটলাট বাহিরের অনেক কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার এক যাণ্মাসিক শফরে যে শক্তিক্ষয় হয়, তাহা দেখিয়াও এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, বাংলার লাট বস্তুতই অতি গুরুভারে নিপীড়িত হইতেছেন। বর্ত্তমান লাটবাহাদুর ধর্ম্মব্যবসায়ীর পুত্র, ধর্ম্মপ্রচারে বৈজ্ঞিক প্রভাবে বিশেষ অনুরক্ত। তিনি তো কদাপি পাদ্রিসভার সভাপতিত্বগ্রহণে অবসরাভাব অনুভব করেন না! তবে কি করিয়া বলি, তিনি শাসনকার্য্য সম্যক্‌রূপে পরিদর্শন করিয়া উঠিতে পারেন না? মোট কথা এই, শাসনভারের গুরুত্ব একটা ছুতোমাত্র, ইহা বাংলাবিভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইহার মূলে গভীর, কুটিল রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সহজে কদাপি ইহা হইতে বিরত হইবে না।

বাংলাদেশ বিভক্ত হইবে, ইহা প্রথম হইতেই জানিতাম। বাংলার রাজনৈতিক শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ ইহা বহুকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। এই রাজনৈতিক শক্তিকে ইংরেজ ভয়ের চক্ষে দেখিতেছিল। বহুদিন হইতে নানা উপায়ে এই শক্তিকে সংযত করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। ক্যাম্বেলীশাসনে উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে এতদর্থেই সংগ্রামঘোষণা হয়। উড়িষ্যা ও বেহারে বাঙালী যাহাতে কোনোপ্রকারে প্রভাববিস্তার, করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্যও বহুকাল হইতেই বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। এই ভেদনীতি নূতন নহে। এই নীতিপ্রসাদে বেহারে বাঙালীর প্রতি সৌহার্দ্দহ্রাস হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইংরেজের কুটিলনীতি মূর্ত্তিমতী হইয়া উড়িষ্যার একটা কপট, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর স্বদেশহিতৈষার জাল পাতিয়া উৎকলীয়দিগের প্রাণে বাঙালীবিদ্বেষ জ্বালিতেছে। এই নীতিই আসামে আসামী ও বাঙালীর মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় একতাসাধনের অভিনব অন্তরায় উৎপাদন করিতেছে। এই ভেদনীতিপ্রতিষ্ঠার দ্বারা ইংরেজ এদেশ অধিকার করিয়াছিল; এই ভেদনীতি প্রচার করিয়াই দেশমধ্যে সে আপনার বর্ত্তমান অসংযত অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিতেছে। এই ভেদনীতির সফলতার উপরেই, ইংরেজ মনে করে, ভারতে তাহার প্রভুশক্তি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আত্মরক্ষার্থে সে এই ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছে,—আমাদের নিন্দাস্তুতিতে, আমাদের নিবেদন-আবেদনে বা আন্দোলন-আর্ত্তনাদে সে কদাপি ইহা পরিত্যাগ করিবে না, করিতে পারে না।

নিগূঢ় স্বার্থের প্রেরণায় ইংরেজ বাংলাকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয়, আমাদের চীৎকারে যে সে তাহা হইতে বিরত হইবে, এ কল্পনা আমি কদাপি করি নাই। আর এই স্বার্থ যেমন এদেশের রাজপুরুষদিগের, তেম্‌নি সমগ্র ইংরেজজাতির। বিলাতের লোকে বা বিলাতের মন্ত্রিদল আমাদের মুখ চাহিয়া এ ভেদনীতি বর্জ্জন করিতে যে ভারতের রাজপুরুষদিগকে কদাপি অনুরোধ করিবেন, এ কল্পনাও আমি কখনো করি নাই। আমরা এদেশের রাজপুরুষ ও বিলাতের ইংরেজমণ্ডলীর মধ্যে ভাবগত, আদর্শগত ও চরিত্রগত যতটা প্রভেদ আছে বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে সে প্রভেদ নাই। এখানকার অবস্থাগুণে ইংরেজের আচার-আচরণ কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় সত্য,—কিন্তু সেটা কেবল বাহ্যব্যাপার মাত্র। ইংরেজ এদেশে আপনার ভৃত্যকে গালি দিয়া বা প্রহার করিয়া আপনার প্রভুত্ব রক্ষা করে, স্বদেশে কথায় কথায় তাহাকে ধন্যবাদ করিয়া ভৃত্যের পরিচর্য্যা লইতে হয়। ইহা এজন্য নহে যে, এদেশে আসিয়া সে মন্দলোক হইয়া যায়, কিন্তু কেবল এই কারণে যে, বিলাতে ভৃত্যের অঙ্গে হাত তুলিলে তাঁহার আপনার পৃষ্ঠ নিরাপদ্ থাকে না,—এখানে কৃষ্ণকায় ভৃত্যকে পদদলিত করিলেও সে কদাপি তাহার প্রতিশোধ নিতে চায় না। এদেশে ইংরেজের

চরিত্র যদি বিকৃত হয়, তাহা আমাদের গুণে, তাহার আপনার দোষে নহে।

ফলত ইংরেজ কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই আপনার স্বার্থটা পূর্ণমাত্রায় 'বোঝে এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য সদসৎ সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। উদারনীতিকই হউক বা রক্ষণশীলই হউক, ইংরেজ সর্ব্বাগ্রে ইংরেজ। ইংরেজত্বকে বজায় রাখিয়া তবে সে উদারমতি বা রক্ষণশীল হইয়া থাকে। এইজন্য ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের যখনই বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই সে স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য উদারমতিও রক্ষণশীল হয়, রক্ষণশীলও উদারমতি হইয়া উঠে। সেখানে ইংরেজ এক। বাহিরে উদারমতি ও রক্ষণশীলে যতই বিরোধ হউক না কেন,—উদারনীতি ও রক্ষণনীতির উপরে ও অন্তরালে একটা সাধারণ ব্রিটিশনীতি বিদ্যমান আছে। ঐ নীতিই ইংরেজের ইতিহাসকে বিরলে বসিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। মন্ত্রিপরিবর্ত্তন, মতপরিবর্ত্তন, রাজনৈতিক দলাদলির ঘাতপ্রতিঘাতের অবিরাম আন্দোলন ও আবর্ত্তনের মধ্যে ঐ সনাতন ব্রিটিশনীতিই সাক্ষী ও আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। তাহারই উপরে ইংরেজরাজনীতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত। একদল মন্ত্রী যায়, আর একদল আসে, কিন্তু এই সনাতন নীতির অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করে না। এইজন্ত একদল পররাষ্ট্র হরণ করে ও হরণকালে বিপক্ষদলের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হৃতরাষ্ট্র আত্মসাৎ করিবার সময় কোনো দলেরই আপত্তি থাকে না। বুয়রবিগ্রহকালে উদারমতিদল বর্ত্তমান মন্ত্রিসমাজের বিরুদ্ধে কি আন্দোলনই না করিয়াছিল; কিন্তু চারিবৎসর পূর্ব্বে যদি উদারমতিগণ মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইত, এই অন্যায়সমরলব্ধ ট্র্যান্সভ্যাল ও অরেঞ্জ রিভার রিপব্লিক্‌কেও আত্মসাৎ করিতে তাহারা কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না। বিপক্ষের চৌর্য্যাপরাধের প্রতিবাদ করিতে উভয় পক্ষই পটু, কিন্তু চৌর্য্যলব্ধ পরধন স্বজাতিসাৎ করিবার সময়ে কেহই কদাপি পরাঙ্মুখ হন না। ইহারই নাম ইংরেজনীতি, এতদ্দ্বারাই সনাতন ব্রিটিশনীতির পরিচয় ও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সনাতন ব্রিটিশনীতির তথ্য যাঁহারা অবগত আছেন, বিলাতের রাজপুরুষেরা বা প্রজাসাধারণে যে কখনো বাংলাবিভাগের প্রস্তাব রদ করিবেন, তাঁহারা কখনো এ কল্পনা করেন নাই। এ বিষয়ে এদেশে আন্দোলন যেমন নিষ্ফল হইয়াছে, বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ নিশ্চয় নিষ্ফল হইয়া যাইবে; ইহা অভিজ্ঞ লোকে অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। উদারমতিদল এই সনাতন ব্রিটিশনীতির বিরুদ্ধে ভারতের হিতকামনায় যে আজ পর্য্যন্ত কোনো সাধুকার্য্য করিয়াছেন, ইতিহাসের স্মৃতিতে তাহা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। রিপন্-আমলে ইঁহারা লীটন্-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় কঠিন বিধি রদ করিয়াছিলেন বলিয়া, এবারেও যে মন্ত্রিত্ব পাইলেই বাংলাবিভাগের ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবেন, এ কল্পনাও নিতান্তই অসার ও অলীক। লীটন্-আমলে কেবল মুদ্রাযন্ত্রবিধিই যে প্রজার স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে সঙ্-

চিত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নহে। ফলত লীটন্‌-দরবারে যত রাজবিধি প্রচলিত হয়, তন্মধ্যে ভারতের জাতীয়জীবনের পক্ষে অস্ত্রবিধিই সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ছিল। ইতিপূর্ব্বে ভারতের সমগ্র প্রজামণ্ডলীকে ইংরেজ কখনো একবারে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হয় নাই। বৈধভাবে অস্ত্রধারণ ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রচালনা করিবার অধিকার প্রজার মৌলিক অধিকার। এ অধিকার হইতে যে দেশের প্রজামণ্ডলী বঞ্চিত হয়, কেবল তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবন নহে, কিন্তু মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হেয় ও হীন হইয়া পড়ে। ইংরেজরাজ লীটন্‌-আমলে ভারতের মনুষ্যত্বের মূলে এই বিষম আঘাত করেন। বিদেশীয় প্রজাকে নিরস্ত্র ও নির্ব্বীর্য্য করিয়া রাখা সনাতন ব্রিটিশনীতির অন্তর্ভূত। ইহার উপরে স্বজাতির যথেচ্ছ-অধিকার পররাষ্ট্রে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইংরেজ ইহা মনে করে। অস্ত্র-আইনের সঙ্গে ইংরেজের জাতীয়স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এইজন্য উদারমতি রিপন্‌ এই বিধানের প্রতিবিধানের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু স্বদলের ঔদার্য্যপ্রভাবে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিধানটি তুলিয়া দিলেন। ফলত মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিধানের দ্বারা ইংরেজ আপনার উপরে আপনি বিপদ্‌ ডাকিয়া আনিতেছিল। এই বিদেশী প্রজামণ্ডলীর গোপনীয় মনোভাব ইংরেজ কেবল মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যেই অবগত হইতে পারে। এইজন্য মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা ইংরেজের আত্মরক্ষার নিমিত্তই আবশ্যক। আত্মপ্রয়োজনেই রিপন্‌-শাসনে ইংরেজ লীটনের অদূরদর্শী বিপৎসঙ্কুল মুদ্রাযন্ত্রনীতিকে বর্জ্জন করিয়া প্রজামণ্ডলীর স্বাধীনভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিবার হৃত অধিকার তাহাদিগকে পুনরর্পণ করে, আমাদের বিশেষ কল্যাণকামনায় নহে। ইংরেজ যদি বোঝে যে, বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার কোনো বিশেষ বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে, সে সোৎসাহে অতিশয় ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভারতের শাসনকর্ত্তাগণকে অবিলম্বে অনুরোধ করিবে। অন্যথা আমরা যতই আন্দোলন-আর্ত্তনাদ করি না কেন, সে তৎপ্রতি কদাপি কর্ণপাত করিবে না।

এদেশের আন্দোলন যেমন নিষ্ফল হইয়াছে, এইজন্য বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। এই সকল নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তিক্ষয় না করিয়া, এখন আমাদিগকে আপনাদিগের শক্তিসংগ্রহ করিয়া, আত্মশক্তিপ্রয়োগে এই অনিষ্টনিবারণের আয়োজন করিতে হইবে।

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ আপনিই আমাদের বিলাতী আন্দোলনের পথ একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বঙ্গবিভাগের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, নূতন সুবাসৃষ্টির জন্য অভিনব রাজবিধি প্রণীত হইয়া লাটদরবারে পেশ করা হইয়াছে, সত্বরেই তাহা পাস্‌ হইয়াও যাইবে। এখন আর এজন্য বিলাতে আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদিগের রাজভক্ত স্বদেশহিতৈষিগণও মনে

করিবেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষত আমরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রবল আন্দোলন করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাতেই ইহার রদের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

কার্জ্জন্‌বাহাদুর এরূপভাবে তাড়াতাড়ি বাংলাবিভাগের আদেশ প্রচার করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন কি না, জানি না। তিনি আমাদিগের বিচারাধীন নহেন; ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাঁহার ভারতশাসনের যথাযথ বিচার করিবে। কিন্তু কাজটা ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহা দ্বারা বর্ত্তমান রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে ভবিষ্যৎ সন্ধির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা যদি, যেভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি, তাহা না করিতাম,—শিষ্টসন্তানের ন্যায় কঠোর বিমাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া যদি কেবল অশ্রুজলেই আমাদিগের মনোবেদনা নিঃশেষ নির্ব্বাপিত করিতাম, তবেও বা হয় ত ইংরেজ কখনো আমাদের দুঃখমোচনার্থ ইচ্ছুক হইতে পারিত। কিন্তু আমরা এই আন্দোলনে অভিনব ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব অস্ত্র ধারণ করিয়াছি। ইংরেজের শ্রুত্যাধারকে পরিত্যাগ করিয়া, আমরা তাহার অর্থাধারের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাচীন আত্মনিবেদনের পন্থা নিষ্ফল জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া, এখন আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। ইংরেজ আমাদের আবেদন-আর্ত্তনাদে কান দেয় নাই, এখন যদি আমরা তাহার বিরুদ্ধে পণ্যসংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি বলিয়া আমাদের অভিযোগে মনোনিবেশ করে ও আমাদিগকে ঈপ্সিতফলদানে শান্ত করিতে উদ্যত হয়, যে কুহকজালে তাহার প্রভুশক্তি এতকাল ভারতের অমিতসংখ্য প্রজামণ্ডলীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িতে আরম্ভ করিবে। পূর্ব্বে আমাদের আর্ত্তনাদে এই অনিষ্টপাত নিবারণ করা ইংরেজের পক্ষে বুদ্ধির কার্য্য হইত; এখন, এই আধুনিক রাজাজ্ঞাপ্রচারের পর, এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা, সাংঘাতিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইবে। লাট কার্জ্জন্ ইংরেজরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ স্বয়ং রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

তিনি আমাদিগেরও প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নষ্ট করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যদি রণে ভঙ্গ দিই, ভারতের প্রজামণ্ডলীর পক্ষে আর বহুকালমধ্যে রাজনৈতিক অধিকারপ্রতিষ্ঠার কোনোই সম্ভাবনা থাকিবে না।

অবস্থা এম্‌নি দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজকেও এখন বাংলাবিভাগ করিতেই হইবে; আমাদিগকেও তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিতে হইবে। বাংলাদেশ বিভক্ত হইলেও আমাদিগের এই আন্দোলন ও চেষ্টা নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। তবে এখন বিলাত-আপিল্ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় প্রজাসাধারণের নিকটে ইংরেজরাজের এই কু-অভিসন্ধির বিরুদ্ধে আবেদন-অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে।

ইংরেজ আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য বাংলাকে অযথা কারণে বিভাগ করিতেছে; আমরা আমাদের জাতীয়স্বার্থরক্ষার্থে যথাসম্ভব বাংলাকে একত্র করিয়া রাখিতে

চেষ্টা করিব। এইজন্ত বাংলায় একটা জাতীয়সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমিতি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, উভয় বিভাগের সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী অনুষ্ঠানকে একই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ও একই উপায়ে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইংরেজদরবারে যদি কখনো কোনো আবেদন-আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের শাসনাদি-সম্বন্ধেই হউক, আর পশ্চিমবঙ্গের শাসনাদি-সম্বন্ধেই হউক, এই সমিতিকেই করিতে হইবে। ইংরেজরাজ বাংলাকে দ্বিভাগ করিয়াছেন, করুন; রাজপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্ত্তনাদি তাঁহারা যে ভাবে হউক যদৃচ্ছা বিহিত করুন; আইনকানুন যখন যেরূপ ইচ্ছা, এই দুই ভাগে বিধিবদ্ধ করুন, কিন্তু আমরা একের কর্ত্তব্যকে উভয়ের কর্ত্তব্য মনে করিয়া, কার্য্যত যুক্তভাবে তাহা সাধন করিব। পূর্ব্ববঙ্গে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিব না, পশ্চিমবঙ্গেও করিব না,—আমাদের বেসরকারী স্বায়ত্তশাসন উভয় ভাগে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিব ও প্রতিষ্ঠিত করিব। এই বাংলা জাতীয়সমিতির অধীনে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জেলাসমিতি, ও জেলাসমিতির অধীনে প্রত্যেক সব্‌-ডিভিসনে সব্‌ডিভিসন্‌সমিতি, ও তাহার অধীনে গ্রাম্যসমিতিসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমগ্র বাংলাদেশকে, রাজশাসনবিভাগ-নির্ব্বিশেষে, লাটভক্তি ও লাটবিভক্তি উভয়কে উপেক্ষা করিয়া, এক বিশাল, স্বাধীন, সবল, স্বদেশসেবাপ্রাণিত, স্বজাতিহিতব্রত, আত্মশাসনজালে আবদ্ধ করিবে। এই সকল সমিতি স্বদেশচর্য্যার জন্ত আপনারা আপনাদিগের উপরে ইচ্ছা-কর নির্দ্ধারিত করিবে; আপনারা আপনাদের শাসনাদির ব্যবস্থা করিয়া লইবে; আপনারা দেশের সর্ব্ববিধ-অভাব-মোচনে রাজকীয় প্রসাদকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া, আপনাদের শক্তি, অর্থ ও সর্ব্ববিধ চেষ্টা নিয়োগ করিবে। এইরূপ একটা বিরাট্ বাংলা জাতীয়সমিতি গঠন করা, বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

ইংরেজ আমাদিগের রাজনৈতিক একতাকে ভাঙিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা তাহা ভাঙিতে দিব না। যাহাতে ইংরেজ এ অনিষ্টাপাতে অক্ষম হয়, যাহাতে বাংলার প্রজাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া একই যন্ত্রসাহায্যে সমগ্র বাংলার হিতসাধনে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্ত এই সমিতি গঠন করিতে হইবে। সেইরূপ ইংরেজ বাংলা ভাগ করিয়া দিয়া, এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইবার আয়োজন করিতেছে; তাহার প্রতিবিধানের জন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এদেশে বহুকালাবধি অপূর্ব্ব সৌহার্দ্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইদানীন্তন কালে ইংরেজের ইঙ্গিতে, রাজকীয় ভিক্ষার লোভে, কোনো কোনো স্থলে মুসলমানহিন্দুর এই প্রাচীন সৌখ্য নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল চেষ্টা এখনো অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলাবিভাগ করিয়া এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া তোলা

হইবে। আমাদিগকে এই চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে হইবে।

প্রথমত যে সূত্রে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ইহার এক সূত্র সরকারী চাকুরী, অপর সরকারী অবৈতনিক সম্মানার্হ পদ ও খ্যাতি। এই দুই লোভ যদি জয় করিতে পারি, তবে ইংরেজ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগের মধ্যে কোনো বিরোধ উৎপাদন করিতে পারিবে না। কুকুর যেমন পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট মাংসখণ্ড লইয়া পরস্পরের সঙ্গে বিষম কলহে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ইংরেজের উচ্ছিষ্ট সামান্ত রাজকর্ম্মের লোভে হিন্দুমুসলমানে বিষম কলহ উপস্থিত হইবে। এই অনিষ্টাশঙ্কা নিবারণ করিতে হইলে সরকারী কার্য্যের প্রতি দেশের লোকের মনে ঘৃণা ও উপেক্ষা উৎপাদন করিতে হইবে; যথাসম্ভব ইংরেজের দাসত্ব হইতে বিরত থাকিতে হইবে; এবং যাহারা অনন্যোপায় হইয়া উদরান্নের জন্ত এই দাসত্ব গ্রহণ করিবে, স্বদেশের জনসাধারণের চক্ষে তাহারা হীনবৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাজা যাহাকে সম্মান করিবে, আমরা সে সম্মান স্বীকার করিব না। রাজা যাহাকে মান্ত করিবে, আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিব। রাজার খেলাতখেতাব আমরা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিব। এই ভাব প্রাণপণে স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে প্রদীপ্ত করিয়া দিতে হইবে। এই উপায়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবাদের কারণ সমূলে বিনাশ করিয়া দিলে, ইংরেজ আর এই বিভাগের দ্বারা আমাদিগের জাতীয়-জীবনকে হীনবল করিতে পারিবে না।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমানের ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর সাহিত্য ও সাধনার সম্যক্ প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিতে হইবে। হিন্দু বিশ্বমানবের সাধনভাণ্ডারে যেরূপ আপনার মহার্য সাধনধন প্রদান করিয়াছে, মুসলমানও সেইরূপই করিয়াছে। মুসলমানও একদিন য়ুরোপের গুরু ছিল, মুসলমানও জগৎকে অনেক শিক্ষাদীক্ষা দান করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতীয়সভ্যতা যেমন হিন্দুর নিকটে, সেইরূপ মুসলমানের নিকটেও অশেষপ্রকারে ঋণী রহিয়াছে। উদারভাবে, মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া, জাতীয়জীবনের বিবর্ত্তনের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের ইতিহাসের অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। এই সকল উপায়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া নবভারতের জাতীয় একতাসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপেও বাংলা-বিভাগের দ্বারা যে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে, তাহা নিবারণ করিতে পারা যাইবে।

বিদেশীয়-পণ্য-ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গবিভাগনিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই চেষ্টা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে প্রবল হইয়াছে মাত্র, মূলত বঙ্গবিভাগের সঙ্গে ইহার কোনো সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই। বঙ্গবিভাগ

না হইলেও এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া রাখিতে হইত; বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলেও এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া রাখিতে হইবে; কারণ, এই চেষ্টার উপরে আমাদিগের সমগ্র জাতীয়জীবনের শক্তি ও মুক্তিসাধন নির্ভর করিতেছে। বিদেশীপণ্যপরিহারের যে সঙ্কল্প হইয়াছে, বঙ্গবিভাগের সঙ্গে তাহার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নাই; স্বতন্ত্রভাবেই এই বিষয়ের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সময়ান্তরে ইহার স্বতন্ত্র আলোচনা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মায়াবাদ।*

বাস্তবিক জগৎ আছে কি নাই, তাহার মীমাংসা করা বিশেষ আবশ্যক। যখন জগৎই সৃষ্টির জলন্ত পরিচয়, তখন বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা অবগত হওয়া চাই। জগৎসম্বন্ধে অনেক বাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মায়াবাদ অন্যতম। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে যখন আর্য্যজাতির সভ্যতার কিরণ দিগ্‌দিগন্তরব্যাপ্ত হইয়াছিল, যখন আর্য্যজাতি উন্নতমস্তিষ্কের পরিচালনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ভারতকে সর্ব্ববিদ্যার আধারভূমি করিয়াছিলেন, যখন বেদান্ত, সাংখ্য ইত্যাদি দর্শনসমূহ জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল, তখন আর্য্যঋষিরা পৃথিবীর সম্মুখে মায়াবাদের সুমহৎ সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা; তাহার পর কত দেশ সভ্য হইয়াছে, কত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বদর্শী প্রাচ্যঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর কেহ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিষ্ণু বল, ব্রহ্মা বল, রুদ্র বল, সূর্য্য বল, অগ্নি বল, বায়ু বল, চন্দ্র বল, যম বল, এই সমস্ত দেবগণ, ইঁহারাও মায়া। এ সংসারে যাহা-কিছু মহিমময় বলিয়া দেখিতেছ, কিংবা যাহাকে তুচ্ছ ঘৃণিত কীটের মত মনে করিতেছ, অধিক কি, তোমার চক্ষে বা অন্তরে যাহা-কিছুরই সত্তাবোধ হইতেছে, সে সমস্তই একমাত্র পরমেশ্বরের মায়া।

মায়াসম্বন্ধে অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে যে, মায়া যত অনিষ্টের মূল। কিন্তু যিনি মায়ারূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি যে মাতৃরূপে আমাদের পালন করিতেছেন, তাহা অনুভব করিতে পারিলে মায়াসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তসংস্কার দূর হইবে। মায়া কাহাকে বলে, তাহা আমাদের অবগত হইতে হইবে।

শাস্ত্র আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। প্রকৃতির দ্বিবিধ রূপ আছে—মায়া ও অবিদ্যা। যে প্রকৃতির ধর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বগুণ, তাহাই মায়া

---

* প্রবন্ধটি গীতা-সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। লেখক।

এবং যাহার ধর্ম্ম রজস্তমোমলিনীকৃত সত্বগুণ, তাহাই অবিদ্যা। মায়া ও অবিদ্যার পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে, নতুবা মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না এবং উক্ত ভ্রান্তসংস্কারও দূর হইবে না।

মায়াকে পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মায়া পরমেশ্বরের কিরূপ শক্তি, তাহা অবগত হওয়া উচিত। নিম্নে একটি উদাহরণের দ্বারা এ বিষয় বিশদীকৃত হইল। এক ব্যক্তি আলোক (light) লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছে। নানা-বিধ-যন্ত্রসাহায্যে এবং নানাবিধ উপায়ে সে ব্যক্তি আলোকের আলোচনা ও বহু গবেষণা করিয়াছে। তাহার ভূয়োদর্শনের ফলে সে ব্যক্তি 'চাক্ষুষমোহের' নিয়মসকল (Laws of optical illusion) শিক্ষা করিয়াছে। তাহার ভূয়োদর্শন হইতে সে ব্যক্তি ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে আলোক লইয়া এমন খেলা খেলিল, অর্থাৎ আলোকের এমন কৌশল প্রদর্শন করিল যে, উহার ফলে 'চাক্ষুষমোহ' (optical illusion) উৎপন্ন হইল এবং দর্শকেরা বিস্মিত হইয়া যাদুবিদ্যার কার্য্য অথবা ভোজবাজি বলিয়া অনুভব করিল। এখানে আমরা দেখিতেছি যে, ঐ ব্যক্তির ভূয়োদর্শন জ্ঞানে (wisdom) পরিণত হইয়াছে। পরে ঐ ব্যক্তি সেই জ্ঞানকে শক্তিতে পরিণত করিয়াছে এবং অবশেষে সেই শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিয়া 'চাক্ষুষমোহ' (optical illusion) উৎপন্ন করিল। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা যদি ঐশ্বরিক মনুষ্য (Divine man) বলিয়া কল্পনা করি, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধেও ঠিক এইপ্রকার বলা যাইতে পারে যে, বারংবার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া তাঁহার ভূয়োদর্শন জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। পরে সেই জ্ঞান শক্তিতে পরিণত এবং অবশেষে সেই শক্তি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞানও অনন্ত, সুতরাং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাকে ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিতে হয় না। তিনি অসীমজ্ঞানবান্। তাঁহার সেই জ্ঞানের ফলকেই (Result) মায়া বলে। এই জ্ঞান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর যখন মনে করেন, তখনই তাঁহার শক্তিপ্রয়োগে সৃষ্টি-স্থিতিলয় সাধিত করিতে পারেন। আমরা যেমন এমন খেলা করিতে পারি, যাহাতে অপরের নিকট 'চাক্ষুষমোহ' (optical illusion) বলিয়া বোধ হয়, ভগবান্‌ও সেইরূপ এমন খেলা খেলিতেছেন, যাহা আমাদের নিকট সৃষ্টি ও সৃষ্টির কার্য্য জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে আমরা মায়ার তিনটি ক্রম দেখিতে পাইতেছি, যথা—(১) জ্ঞান, (২) শক্তি, (৩) কার্য্য। মায়া ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী। মায়া ঈশ্বরের বশ-বর্ত্তিনী বলিয়া, ঈশ্বরকে মায়ী বা মায়াধীশ বলা হয়। ঈশ্বরের মায়ার উপর যে সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে, তাহা অবগত হওয়া উচিত। সেই মায়াকেই বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা শুদ্ধসত্বগুণময়ী।

আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ব আলোচনা করিলে অবগত হই যে, ঈশ্বরের শক্তি বিভিন্ন প্রকারে উপহিত হইয়া তত্বসকল উদ্ভূত

জন্মিলে অভিলাষ হয় ; সেই অভিলাষ কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসিয়া আক্রমণ করে। ক্রোধ হইতে মোহ হয় ; মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম জন্মে ; স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিবিনাশ হইলে আপনাকে বিনষ্ট হইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মায়া আমাদিগকে বন্ধন করে না, অবিদ্যাই আমাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের মায়ার উপর সম্পূর্ণ বশিত্ব আছে। কিন্তু জীবের সেরূপ নাই, জীব অবিদ্যার বশীভূত। মায়াদ্বারা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের প্রতি আসক্ত হইলে, অর্থাৎ মায়ার সহিত আসক্তি মিশ্রিত থাকিলে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়, উঁহার দ্বারা জীব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

অবিদ্যা দ্বারা আমরা আবদ্ধ হইলেও, ইহা দ্বারা আমাদের যে ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। অবিদ্যা দ্বারা মনুষ্যের পার্থক্যভাব (separated sense) এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার (self-assertion) চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্য স্বভাবত জ্ঞান বা সংবিৎ (consciousness) সম্পন্ন জীব। কিন্তু সে অবিদ্যার সাহায্যে যত আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তত তাহার আত্মজ্ঞান (self-consciousness) জন্মিতে থাকে। উক্ত আত্মজ্ঞান এই স্থূল জগতে স্থূল দেহাত্মবাদজ্ঞানে পরিণত হইয়া জীবকে সুখদুঃখ প্রদান করিতেছে। জীব অবিদ্যার প্রভাবে এই মায়াময় জগৎকে সত্য মনে করিয়া বদ্ধ হইতেছে।

এইজন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে আসক্তিই সংসারচক্রের নেমিস্বরূপ। এই আসক্তিকে নষ্ট করিতে পারিলে জীব অজ্ঞানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে। তখন তাহার আর জন্মমৃত্যু হইবে না। অবিদ্যার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলে জীব বিদ্যার বা মায়ার স্বরূপ অবগত হইবে। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন যে—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

ঈশোপনিষৎ।

অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

অবিদ্যাই জীবের বন্ধের কারণ এবং বিদ্যা বা মায়া মোক্ষের কারণ। যে দেবী মহামায়ারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত, যাঁহাকে বেদ হিরণ্যগর্ভের জনয়িত্রী বলিয়াছেন, সেই আদ্যা শক্তিই সংবিৎরূপিণী এবং মোক্ষপ্রদায়িনী। তন্ত্রশাস্ত্র এই আদ্যা শক্তিরই উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মোক্ষলাভ করিবার জন্য ভক্ত এই শক্তিরই আরাধনা করেন এবং ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বলিয়া থাকেন—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥"

যখন ভক্তগণ উঁহার স্বরূপ দেখিতে পান, তখন দেখেন যে, জগৎ বলিয়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। উহা আদ্যা শক্তিরই স্বরূপে নিমজ্জিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের শক্তির নামই আদ্যা শক্তি। সেই শক্তির স্বরূপ অবগত হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন জীব অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হয়।

পঞ্চদশী বলিয়াছেন যে, সৃষ্টিসম্বন্ধে

বিভিন্নবাদীদের মধ্যে উত্তমাধম ভাব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতেই বা কি, যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্যলাভ বা ভিক্ষাবৃত্তি জাগ্রৎপুরুষকে অধিকার করিতে পারে না। অর্থাৎ সৃষ্টি-সম্বন্ধে বিভিন্নবাদ বর্ত্তমান থাকিলেও অদ্বৈত-জ্ঞানীদের তাহাতে কিছু আসে-যায় না। এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিলে, জীব ভগবানে সর্ব্বভূত কিরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া থাকে।

মায়াবাদের নৈতিকফলসম্বন্ধে এইবার কিছু আলোচনা করা যাউক। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে ভবিষ্যৎ জীবনকে বাস্তব সত্য অবস্থা এবং এই জীবনকে ক্ষণস্থায়ী ছায়ারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য ঋষি-দিগের মতে যে-কোন প্রকাশমান অবস্থাকে মায়া বলা যায়, এমন কি, দেবতারাও স্বয়ং সেই এক সতের ক্ষণস্থায়ী বিকাশমাত্র। সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে এইখানেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; প্রাচ্য-মতানুসারে যাহাকে নীতি বলা যায়, তাহা নীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়-মাত্র। এই সংসার যে একটি বিস্তৃত নাট্যশালা এবং প্রত্যেক লোকে যে অভিনেতাস্বরূপ—এইরূপ ধারণা হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের নিকট কোন রূপক নহে; বরঞ্চ ধ্রুবসত্য। যে সকল রিপুর অভিনয় করিতে হয়, সেই রিপুগণকে সত্য ভাবিয়া যদি কোন অভিনেতা তাহা-দের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, আমরা যেমন সেই অভিনেতাকে উন্মত্ত বলিয়া থাকি, সেইরূপ যে সকল লোক এই অসার সংসারের পরিবারাদি ক্রীড়নককে আপনার ভাবিয়া অভিভূত হয়, প্রাচ্য মনীষি-গণ তাঁহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়া থাকেন। সেইজন্ত তাঁহারা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের অভিনয়ের অংশ ভাল করিয়া শিক্ষা কর এবং তোমাদের যথাশক্তি ভাল করিয়া অভিনয় করিতে চেষ্টা কর; কিন্তু মূর্খের ন্যায় তোমাদিগকে যথার্থ রাজা কিংবা যথার্থ ভিখারী, যথার্থ সাধু কিংবা যথার্থ পাপী বলিয়া কল্পনা করিও না; তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনের এই মিলনবিয়োগান্ত নাটক অভিনয়ের জন্ত তোমাদিগকে ঐরূপ অংশসকল দেওয়া হইয়াছে।

এই সংসারের সমুদয় বস্তুর বাস্তবত্বে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে এত কার্য্যক্ষম, ব্যস্ত, লোভী, অহঙ্কারী এবং স্বার্থপর হই-য়াছে, সেইজন্ত কার্য্যত আমরা এত জড়-বাদী হইয়াছি এবং এত সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে; যদি আমরা আমাদের অস্তিত্বের মায়িক বা স্বপ্নবৎ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতাম, তাহা হইলে আমরা আমাদের উৎসাহ, আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের গর্ব্ব হারাইয়া ফেলিতাম এবং অসভ্য-বন্যমনুষ্য-মধ্যে পরিগণিত হইতাম। সময়ে সময়ে ঘোর জড়বাদীও অস্তিত্বের বৃথাভিমান দ্বারা ব্যথিত হইয়া উঠে। ইহজীবনে কোন বিষয়ের সারত্বে জ্ঞান, অন্তঃপ্রবাহিত অসারত্ব-জ্ঞানের দ্বারা ক্রমাগত প্রতিহত হইয়া স্থির-ভাব ধারণ করিতেছে। ইহজীবনে এই ভাবের মিশ্রণের দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়াছে। যে দেবী মহামায়ারূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন,

কেবলমাত্র মহাপুরুষেরাই অপ্রকৃতিস্থ না হইয়া সেই দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হন।

প্রকৃতির সুমহান্ নিয়মই এইরূপ যে, লোকে যত বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে থাকে, ততই এই সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। যতই বুঝিতে পারে, ততই লোক ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়, ততই ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস করিতে থাকে এবং জ্ঞেয় হইতে অজ্ঞেয়কে বুঝিতে চেষ্টা করে। প্রতীচ্য দেশসকল "স্বাধীন ইচ্ছার" এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিজের কার্য্যে নিজের দায়িত্ব আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া এই পৃথিবীতে যেরূপ কার্য্য করা যায়, সেই অনুযায়ীও ভবিষ্যৎজীবনে পুরস্কৃত কিংবা দণ্ডিত হইতে হয়, এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচ্য বুধগণ অন্যপ্রকার নির্ণয় করিয়াছেন,—তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা জীবনরূপ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা মাত্র; তাঁহারা নিজেরা অংশসকল বিভাগ করেন না, দৃশ্যাবলী চিত্রিত করেন না, কিংবা সাজসজ্জাদিও প্রস্তুত করেন না; তাঁহারা ভাবেন যে, তাঁহাদের কেবল এইমাত্র দায়িত্ব আছে যে, তাঁহাদের যে অংশ অভিনয় করিতে হইবে, তাহা যেন বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনীত হয়। এই স্থানে কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ এবং মায়াবাদের একসঙ্গে অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কর্ম্মবাদমতে, আমাদের ইহজীবনের কর্ম্মের ফল এই জন্মেই হউক, কিংবা ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক, এই পৃথিবীতেই ভোগ করিতে হইবে। প্রাচ্য মনীষিগণ বলেন যে, যেমন কোন লোক স্বপ্নে যদি কাহাকে হত্যা করে, তবে সেই হত্যার জন্ম তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যেরূপ অন্যায় ও বৃথা, ইহজীবনের কর্ম্মের জন্য সংবিতের অন্য অবস্থায় আমাদের শাস্তি দেওয়া সেইরূপ অন্যায় ও বৃথা।

হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের স্বর্গ ও নরক আর কিছুই নহে, কেবল অনন্ত স্বপ্নমাত্র,—যাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদিগের নিকট উহা 'বাস্তব'; আমরা ইহজীবনে যে সকল মানসচ্ছবি (mental image) সৃষ্টি করিয়া থাকি, যখন আমরা ইহলোক ত্যাগ করি, তখন সেই সকল ছবি আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া লইয়া যাই। এই সকল মানসচ্ছবি পরে প্রতিফলিত হয় এবং আমাদের নিকট বাহ্যজগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে; এবং ইহজীবনে মন যেরূপ এক চিন্তা হইতে অন্য চিন্তায়, এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ধাবমান হয়, সেইরূপ পরজীবনেও মন স্বনিয়ম অনুসারে বাহ্যপ্রতিফলিত এক প্রতিবিম্ব হইতে অন্য প্রতিবিম্বে ধাবমান হইতে থাকে। সুতরাং ভবিষ্যৎ জীবন এই জীবনেরই প্রতিকম্পন মাত্র, এই জীবনই যেন পরজন্মে অন্তর্দিক্ হইতে বহির্দ্দিকে বাহির হইয়া আইসে,—যে সকল বিষয় সংস্কারভূত (Subjective) ছিল, তাহা ফলোন্মুখ (Objective) হয়। প্রাচ্যনরক আমাদিগকে এইভাবে দণ্ডিত করে যে, আমরা যে স্থানে যাইতেছি, যদি না দেখিয়া চলি, তবে সেই স্থানে আমাদের মস্তক গৃহভিত্তিতে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, যদি তুমি

মূর্খের ন্যায় মনুষ্যদিগকে ইহজন্মে শত্রু কর, তবে তোমার মৃত্যুর পর দেখিবে যে, তাহাদের ছবিসকল তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,—তখন তোমার কাছে তাঁহারা আর মানসচ্ছবিমাত্র নহে, কিন্তু ভয়ঙ্কর সত্য, জীবন্ত ও শত্রুতার জ্বলন্তমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইবে; সেই সময়ে তোমার পার্থিবকার্য্যের স্মৃতি তোমার সম্মুখে উদয় হইবে এবং তোমার বিবেক যদি তোমায় দোষী স্থির করে, তবে তোমার দৈত্যরূপী শত্রুসকল তোমায় বারংবার হত্যা করিবে, কিংবা অনন্ত হ্রদে নিক্ষেপ করিবে। যদি তুমি জ্ঞানীর ন্যায় ইহজন্মে মনোরম প্রতিবিম্বসকল প্রস্তুত করিয়া রাখ, তবে যে সকল বন্ধু তোমার পূর্ব্বে লোকান্তরগত হইয়াছেন, তাঁহারা তোমার চতুর্দ্দিকে স্বর্গোপম স্নেহ ও ভালবাসা বিস্তার করিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, মায়াবাদ হইতে এই উপদেশলাভ হয় যে, পরমেশ্বর জগৎ লইয়া এক খেলা খেলিতেছেন। এই জগৎ তাঁহারই মায়া, তাঁহারই শক্তির বিকার বা কার্য্য। এই মায়া তাঁহার বিস্তার এবং বিপুল জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা যখন তাঁহার মায়ায় আসক্ত হইয়া পড়ি, তখন বদ্ধজীবরূপে সুখদুঃখ ভোগ করিতে থাকি। কিন্তু অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদের বদ্ধভাব দূর হয়, আমরা তখন তাঁহার বিস্তার স্বরূপ অবগত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হই।

শ্রীঃ—

কারুদাস।

পাটনাজেলার পশ্চিম দিকে এবং বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মইনোয়া মহাপুর গ্রাম গোপজাতির একটি তীর্থস্থান। কারুদাস নামে আহীরযুবক দ্বাদশবর্ষকাল সেখানে ধেনু চরাইয়া শেষে সন্ন্যাসি-ফকীর হইয়াছিল। তাহার বৈরাগ্যের সঙ্গেই ইহার তীর্থমহিমা জড়িত। গোপজাতির জাতিগত পার্থক্য তাহাদের উৎসবগীতে যেরূপ স্পষ্টীকৃত, আর কিছুতে তেমন নয়। বীরোচিত সহজ-সরল-স্বভাব এবং আপদ্-বিপদে নির্ভীকতার ভিতর কেমন-একটা কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত ভাব তাহাদের জাতির নিজস্ব। সম্ভবত এই চরিত্র এবং ভাব আদিম পশুচারণ-ব্যবসায়ী ভ্রমণশীল জাতিমাত্রেরই একটা ন্যূনাধিক বিশেষত্ব।

কারুদাস প্রায় বারবছর গাই চরাইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে কাটাইয়া আসিতেছিল; এমন সময়ে একটা অদ্ভুতরকমের খেয়াল তাহার স্কন্ধে আবির্ভূত হইল। সন্ন্যাসীরা মনের সুখে "মেদ্‌নোফুলা ভাঙ্" অর্থাৎ

গঞ্জিকা সেবন করে, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব সে আনন্দে ভোর, কেবল কারুদাসের জীবনটাই বৃথায় গেল, আজ পর্য্যন্ত এক-ছিলিম গাঁজাও তাহার কপালে জুটিল না!

বারবরিষ চরাইলুঁ মইনোয়া মহাপুর গাই
কতি নেহী পিলেঁ। মেদনীফুলা ভাঙ্!
বইঠলে সিংহেশ্বরবাবাকে সিসি চঢ়ে
অনেক, হাম্ হইবো যোগী ফকীর।

সিংহেশ্বরবাবা কিনা মহাদেব স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, তথাপি পূতসলিল নদনদীসমূহের জলপূর্ণ সিসি ভক্তেরা তাঁহার পূজায় অর্পণ করে, অতএব আমিও যোগি-ফকীর হইব।

তখন সাধুসন্ন্যাসীর ভেক ধরিয়া কারুদাস মাতার কাছে বিদায় লইতে গেল। এবং তাঁহার "ভরমুখ আশিষ" প্রার্থনা করিল।

ধোতি কাড়্কে কারুদাস লেঙ্গঠ চঢ়ায়া,
ঔর দোহর কাড়কে ধোকরি বনায়া,
ঔর লাঠি কাটকে ডাণ্টা লেলেক বানা।
হঁয়াসে কারুদাস মায়ারামকে আইলো ভিড়।
শুনগে মাই মায়ারাম ভরমুখ দে আশিষ,
হাম্ ভেলো যোগী ফকীর।

ধুতি ছাড়িয়া কারুদাস কৌপীন পরিল, গাত্রবস্ত্র বা দোহর ছিঁড়িয়া ঝুলি প্রস্তুত করিল, আর লাঠি কাটিয়া ডাণ্টা বানাইয়া লইল। দেখিয়া-শুনিয়া মা বলিলেন,

কেয়া ঘটলো হো কারুদাস আনধন
ঔর কেয়া ঘটলো দুধভাত থোরি
সে তুম্ ভেলা যোগিয়া ফকীর।
কেকরা পর সঁপলে বাহ মইনোয়া মহাপুরমে গাই,
ঔর কেকরা পর সঁপলে বাহ হাময়
ঔর কেকরা পরা সঁপলে বাহ পরকে জেইনী
বড়া হোতো অপরাধ।

বাপ, তোর কি সম্পদ্হানি হইয়াছে, না ঘরে থালাপূর্ণ দুধভাতের অভাব ঘটিল যে, তুই যোগি-ফকীর হইলি? যদি ঘর ছাড়িয়া যাইবি, এই মইনোয়া মহাপুরে কাহার উপর গাইবাছুরের ভার দিয়া যাইবি, আর আমায় এবং পরের মেয়েকেই বা কাহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে চাস্? এমন কাজ করিস্ না, বড় অপরাধ হইবে।

উত্তরে কারুদাস মাতাকে বুঝাইল যে, তাহার ছোটভাই লচ্ছন তো ঘরে রহিল। সে-ই সব দেখিবে-শুনিবে। কিন্তু গঞ্জিকা-সংগ্রহের জন্য তাহার সন্ন্যাস ও সিংহেশ্বর-বাবার আশ্রয়গ্রহণ অনিবার্য্য।

এত্না কহেকে কারুদাস চলা সিংহেশ্বর-আস্থান।
সাতরাত সাতদিন তপসিয়া কিয়া
তইও না সিংহেশ্বরবাবা দেলা মোলাকাৎ।
তব্ কারুদাস চলা বসাহা বরেলকে পাস্
যা করকে কারুদাস গিরপড়া বসাহা বরেলকে গোর
পর
পহরো শরীর গিরলে রহে কারুদাস।
তব্ বোলে বসাহা বরেল।
কি বর্ মাঙ্গে কারুদাস সে হাম দেহী।
তব্ কারুদাস বোলে সে হাম সাতরাত
সাতদিন তপস্যা কৈলেঁ। সিংহেশ্বর-আস্থান
তইয়ো না সিংহেশ্বরবাবা দেলেন মোলাকাৎ!
একর ভেদ বাতায়ে দেও কি কোন্ সুরতসে
সিংহেশ্বরবাবাসে মোলাকাৎ হোয়।

তখন কারুদাস সিংহেশ্বরবাবার মন্দিরে গেল, এবং সাতরাত্রি সাতদিন ক্রমাগত তপস্যা করিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারিল না। আজি-

কালিকায় গিয়ে বড়লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে কোন একজন মধ্যস্থের শরণাপন্ন হইতে হয়। সেকালে গঞ্জিকাপ্রেমোন্মত্ত কারুদাস ভাবিয়া-চিন্তিয়া যে শেষে সিংহেশ্বরবাবার সচল যানটিকে ধরিয়া বসিয়াছিল, ইহাতে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। শিবের বলীবর্দ মন্ত্রীদের মতই চক্ষু বুজিয়া পরিপাকের বন্দোবস্ত করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রণা-কুশলত্ব শাস্ত্রে কোথাও বোধ করি কীর্ত্তিত হয় নাই। কারুদাস ঠাহরাইয়াছিল ভাল, সে একেবারে "বসাহা বরেল"টির পায়ের উপর পড়িল। প্রহরখানেক সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া সেই ভাবে পড়িয়া রহিল। তাহাতে বণ্ড-ঠাকুরটির করুণা উদ্রিক্ত হইল, এবং তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তাহা কখন নিতান্ত নিষ্ফল হয় না।

তব্ বোলে বসাহা বরেল—
এই সে সিংহেশ্বরবাবা নেহী দেতো মোলাকাৎ
বা করকে কামরথু দেও রোথ্, তব্
সিংহেশ্বরবাবা দেতো মোলাকাৎ।

বৃষভবর বলিলেন—কি ছাই ভিখারীর মত যাচ্ঞা করিতেছ? এমন করিয়া কি সিংহেশ্বরবাবার দর্শন মিলিবে? তাঁর "কামরথু"—পূজার্থীদের রোধ, তখন অবশ্য দেখা দিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, গো এবং গোপজাতিরাও আন্দোলনের মূলসূত্র বুঝে!

এত্‌না শুনকে কারুদাস হঁ য়াসে চলা।
বীচ্ জঙ্গল আগে কারুদাস রাস্তাপর
ঠাঢ়া হোয় [illegible] ধ্যান [illegible] বিষ্ণুমহারাজপর
যে হে বিষ্ণুমহারাজ [illegible] রাস্তা [illegible]
যে কামরথু আওয়ে সেকরা রোখি
সে হামারা বাৎ রাখে।

এমন গুরুতর ব্যাপারে কারুদাস সম্পূর্ণভাবে নিজের উপর নির্ভর করিতে পারিল না। সে জঙ্গলের মধ্যস্থলে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া বিষ্ণুমহারাজকে ধ্যানে প্রার্থনা করিল যে, শিবের যত পূজার্থী আসিবে, সকলেই যেন তাহার কথায় নিবৃত্ত হয়।

এত্‌না টেক্ লাগায়কে কারুদাস ঠাঢ়া ভেল।
যেত্‌না কামরথু আওয়ে তেতনাকে রোখনে চলা যায়।
এক কামরথুভি পার নেহি হোয় ও আগাসে।
তব্ সিংহেশ্বরবাবাকে মন্দিলসে
আগ্‌কে সমান ধা ছুট্‌নে লাগা।
তব্ পাণ্ডা সব বোলে কি একসিসি জলভি
নেহী চল সিংহেশ্বরবাবাকে আহান
এহিসে ধা ছুটেহে আগ্‌কে সমান।

কারুদাসের প্রার্থনা জয়যুক্ত হইল। যত "কামরথু" সে পথে আসিল, সকলেই তাহার কথায় সেখানে দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হয় না। তখন সিংহেশ্বরবাবার মন্দির হইতে আগুনের মত উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। পাণ্ডারা বলিল যে, দেবতার মাথায় একসিসি জলও চড়িল না, কাজেই এই বিষম তাপের উদ্ভব হইয়াছে। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া সিংহেশ্বরে মাথায় জল ঢালিল।

তব্ পাণ্ডা সব মিল করকে জল ভর করকে
চঢ়াওয়ে লাগ্‌লো।
তব্ সিংহেশ্বরবাবা ব্রাহ্মণকে রূপ্ হোকে
একসিসি জল লেকে ঠাঢ়া ভেল মন্দিলমে
আর কহে পাণ্ডাকে বুঝায়।
সাত সো কামরথু আইলা রোখলে ওহি
সে একো কামরথু নেহী পার হোয়ে দেহে।

তকরা বোলা সে আও যে বর মাঙ্গে
সে সিংহেশ্বরবাবা দেখীন।

ভক্তবৎসল সিংহেশ্বরবাবা আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি একসিসি জল হস্তে ব্রাহ্মণের বেশে মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডাদের বুঝাইয়া বলিলেন যে, একটা আহীর্ সাতশ কামরথুকে রুখিয়া রাখিয়াছে, একজনকেও আসিতে দিতেছে না। তোমরা গিয়া উহাকে লইয়া এসো, যে বর চায়, মহাদেব তাহাই দিবেন।

তব্ পাণ্ডা হঁয়াসে চলা।
আও আও ব্রাহ্মণ—আর পিছু পিছু পাণ্ডা।
থোরা দুর যাকে ব্রাহ্মণ লোপ হো গিয়া।
তব্ পাণ্ডা যাকে কারুদাসকে নজীগ পৌঁছা।
তব্ পাণ্ডা বোলে কারুদাসকে বুঝা
কি সাতশো কামরথু তু কাহে রোখলে হো
যো বর মাঙ্গ সো বর দেব
সিংহেশ্বরবাবাসে দেলা।
এত্না শুনকে কারুদাস কহে পাণ্ডাকে বুঝা
কি সিংহেশ্বরবাবা হাম্সে মোলাকাৎ দেতো
তব ছোড়বো সাতশো কামরথু।

পাণ্ডা সেখান হইতে চলিল, আগে ব্রাহ্মণ, পশ্চাতে পাণ্ডাজী। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। কারুদাসকে পাণ্ডা অনুযোগ করিলেন, কেন সে সাতশত পূজার্থীকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। যে বর সে চায়, সিংহেশ্বরবাবার দ্বারা তাহাই দেওয়ান হইবে। কিন্তু কারুদাস তখন বিষ্ণুর বলে বলীয়ান্ হইয়াছে, পাণ্ডাজীকে বড় আমল দিল না। বলিল যে, বাবা আমায় যদি দেখা দেন, তবেই সাতশো কামরথুকে ছাড়িয়া দিব, নহিলে নহে।

তব্ হঁয়াসে কারুদাস চলা উর সাতশো কামরথু।
মন্দিলকো দুয়ারিপর হেঁককে খাড়া ভেলু কারুদাস।
একো কামরথুকে মন্দিল নেই ছেলে দেও।
তব্ সিংহেশ্বরবাবা নিকলকে দর্শন দেলেন।
কারুদাস দেখকে পায়ের পর গির্ পড়া।

তখন কারুদাসের নেতৃত্বে সাতশত কামরথু মন্দিরাভিমুখে চলিল। সে গিয়া দ্বাররোধ করিয়া দাঁড়াইল, একটি পূজার্থীও মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। কাজেই নিরুপায় হইয়া সিংহেশ্বরবাবা তাঁহার জবরদস্ত ভক্তটিকে দেখা দিলেন। কারুদাস তাঁহার পদতলে পড়িল।

তব্ সিংহেশ্বরবাবা কহে কারুদাসকে বুঝায়
যোন বর মাঙ্গবে তোন্ বর হাম দেব।
তব্ কারুদাস বোলে সিংহেশ্বরবাবাকে সমঝায়
বাবা হাম্ এহী বর মাঙ্গে যে হম্
যেদনী ফুল ভাং খোজি তে সে হম্রো মিল যাই।
তব্ সিংহেশ্বরবাবা কহে কারুদাসকে বুঝায়
এ বরতো বহুৎ কঠিন হৈ কারুদাস
আপ্না মাতারি সে ভিচ্ছা লে আও মাঙ্গকে
যোগীক স্বরূপ হোকর তব্ এ বর হম্ দেব।
উর আপনা তিরিয়াকে বুঝায়কে আও।
নেহী ত এই সে বর হম্ দেব তোরা বহুৎ
অপরাধ হোতো।

তার পর সিংহেশ্বরবাবা কারুদাস যে-কোন বর প্রার্থনা করে, তাহাই দিতে চাহিলেন। তাহাতে গোপনন্দন জানাইল, এমন বরে তার দরকার যে, যেখানেই সে গঞ্জিকা চায়, সেখানেই যেন পাইতে পারে। দেবতা কি ভাবিলেন বলা যায় না, তবে প্রকাশ্যে বলিলেন, এটি বড়ই কঠিন বর। তুমি যোগিবেশে আপনার জননী ও ঘরণীর নিকট যাও, যার কাছে ভিক্ষা লইয়া

এবং স্ত্রীকে বুঝাইয়া এসো, নহিলে আমার দত্ত বর লইলে তোমার বড় অপরাধ হইবে। কাজেই কারুকে আবার ঘরে ফিরিতে হইল।

এত্না শুন্‌কে কারুদাস চলা যোগীকে স্বরূপ হোকে
মইনোয়া মহাপুর। গাইকে বাথান ঠার ভেল কারুদাস
ধরধর কাঁদে গাই বাথান ধরতি খোলটা
যে হে কারুদাস হামরা মৎ ছোড়।
নেহী তো হম্ প্রাণ তেয়াগ দেব।
এত্না শুন্‌কে কারুদাস গাইকে কহে বুঝায়
যে হে গাই হামরা নিরড় বহুৎ গোরখিয়া মিলগে
হাম্‌রা দে আশীর্ব্বাদ কি হাম্‌রা যোগীকা
তপস্যা রহে।
এত্না কহেকে কারুদাস ঠার ভেল আপন দুয়ারি।
বোলে কারুদাস দে মাতা দে ভিচ্ছা।
ভিতর ভেল বোলে মায়ারাম লচ্ছনকে বুঝায়া
যে হে ববুয়া লচ্ছন কোন্ তো যোগী তপসিয়া
আল হৈ
সো ভিচ্ছা দে দেও। এই সে হামারা বেটা কারুদাস
গলি গলি ভিচ্ছা মাঙ্গলে বুলৎ হোয়।
এত্না শুনকে লচ্ছন ভিচ্ছা দে দেলকো।
তব্ হুঁয়াসে কারুদাস চললো।

যোগীর বেশে কারুদাস জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেল। বাথানে গাভীরা তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল,—হে কারুদাস, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যেও না, কথা না শুন তো প্রাণত্যাগ করিব। এই দৃশ্যে বৈষ্ণবকবির গোষ্ঠবিহার মনে পড়ে, তবে আলেখ্য তেমন মার্জ্জিত নহে। শুনিয়া কারুদাস তাহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল, আমার মত "গোরখিয়া" তোমাদের অনেক মিলিবে, দেখিও আমার তপস্যা যেন সফল হয়। আপন বাড়ে উপনীত হইয়া মাতার উদ্দেশে ভিক্ষা চাহিল। মা তখন ভিতরে ছিলেন, তাঁহার কারু ঘরে ফিরিয়াছে বুঝিতে পারিলেন না। পুত্র লচ্ছনকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপ্, দেখ্, কে যোগিতপস্বী আসিয়াছে, তাহাকে ভিক্ষা দে। আমার কারুদাস ঐভাবে ভিক্ষা মাগিয়া গলি গলি ফিরিতেছে!" এই সামান্য কয়টি পংক্তিতে কেমন সুকৌশলে মাতৃহৃদয় চিত্রিত হইয়াছে! লচ্ছন ভাইকে চিনিতে পারিল না, ভিক্ষা দিল। কারুদাস অন্যত্র চলিল।

আগুমে স্ত্রী মেল গেল কারুদাসকো।
কারুদাসকে বহুৎ কহে বুঝায়—
যে হে স্বামি হামরা বহুৎ অপরাধ হোতা
কুছ হামরা বর দে দেও তো হামরা পরতীত হোত।
ঔর নেহী তো হামারা সঙ্গ লে লেও চলো সাৎ।
এত্না শুন্‌কে কারুদাস বোলে স্ত্রীকে বুঝায়
ইন্দারাপর তুলসী-চতরা হৈ, হুঁয়াপর
চল্ তোরা দিও পরতীত।

পথে স্ত্রীর সহিত দেখা হইল। সে ছাড়ে না, সঙ্গে যাইতে চাহে। তাহাতে কারুদাস তাহাকে অনেক বুঝাইল এবং ইন্দারার ধারে তুলসীচত্বরে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

তব্ হুঁয়া ইন্দারাপর খাড়া হোকে সুমরে
বাবা সিংহেশ্বরকে।
এ বাবা সিংহেশ্বর এহী ঘড়ী হামারা দর্শন দেও
ঔর দেও কুছ বর এ ঘড়ী হামারা
মহাসন ঘটতো। তব্ সিংহেশ্বরবাবা
সাধুস্বরূপ হোকে চলু ইন্দারাপর
ঠাড় ভেলা কারুদাসকে ভিড়।
বোল ত বাবা সিংহেশ্বর কারুদাসকে বুঝায়
কি তুলসীকে পাত্তা তোড়কে খিলায় দে
অপ্‌না তিরিয়াকে। ওহী সে তুলসীদাস
যোতা ইন্‌কে পাত্তা দে দো।

তব কারুদাস গাঁজা তোড়কে তিরিয়াকে
লেড়কো খিলায়।

কারুদাসের বিষম পরীক্ষা উপস্থিত, স্ত্রীকে কি বর দিবে, নিজে তখনও সিদ্ধিলাভ করে নাই। ইন্দারার ধারে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলচিত্তে সিংহেশ্বরবাবাকে স্মরণ করিল। ঠাকুর, এ মুহূর্ত্তে কিছু একটা বর আমায় দাও, নহিলে আমার মাহাত্ম্য লোপ পায়। দেবাদিদেব সাধুর রূপ ধরিয়া সেখানে অবতীর্ণ হইলেন। কারুদাসকে শিখাইয়া দিলেন যে, তুলসীর পাতা তুলিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইয়া দে। উহাতে উহার তুলসীদাস নামে পুত্র জন্মিবে।' এই আজ্ঞা কারু পালন করিল।

তব্ হঁয়াসে কারুদাস চললো
আপনা খাদা। ভামারা চুন চুন
কারুদাস লাগায় ধুনী। জমা করকে
তব্ কারুদাস কহে সিংহেশ্বরবাবাকে বুঝায়
বাবা সিংহেশ্বর হামকো অব বর দেও
হম্ তো ভিচ্ছা মাঙ্গকে লেইলি মায়সে।
বিনা আগিনকে ধুনী জল যায়
চুটকী মাজতে গাঁজা হো যায়।

সেথান হইতে কারুদাস আপনার ক্ষেত্রে গেল এবং শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া ধুনী প্রস্তুত করিল। তখন সিংহেশ্বরকে বলিল, বাবা,'আমি ত মাতার নিকট হইতে ভিক্ষা আনিয়াছি, এইবার আমায় বর দাও, যেন অগ্নি বিনা আমার ধুনী জলিয়া উঠে, আর আমি করতল মলিলেই যেন গাঁজা প্রস্তুত হয়! তথাস্তু! তাহাই হইল, কারুদাসের তপস্যা ফলিয়া গেল।

তব্ ধুনী লহর গেল। তব্ কারুদাস
চুটকী মলে লাগা,
তব চুটকী মাজেকো সাৎ গাঁজা হো গেল
তব্ কারুদাসকে ভেল পরতীত।

গঞ্জিকাধূম সেবন করিয়া কারুদাস সিংহেশ্বরবাবার মন্দিরে অতঃপর আড্ডা লইল। আর সিংহেশ্বরকে বুঝাইয়া বলিল যে, সে সেইখানে থাকিয়া "বসাহা বয়েল"কে ঘাস ছিলিয়া খাওয়াইবে। ঠাকুর সম্মত হইলেন। বলিয়া দিলেন যে, ভোরদিন যোগিতপস্বীর বেশে ভিক্ষা করিও, রাত্রে আমার শরণাপন্ন হইও।

গাঁজা পি করকে কারুদাস যা করকে
সিংহেশ্বরবাবাকে আস্থান ডেরা দেলকো।
ঔর কহে সিংহেশ্বরবাবাকো বুঝায়
হে বাবা সিংহেশ্বর হম্ হিঁয়া রহব
বসাহা বয়েলকে ঘাঁস গাড়কে খিলাইবো।
তব্ সিংহেশ্বরবাবা কহে কারুদাসকে বুঝায়
দিনভর যোগী তপস্বীয়া হো কর ভিচ্ছা মাঙ্গ
ঔর রাতকো হামারা শরণমে রহ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

দুর্গোৎসব।

হিন্দুশাস্ত্রে দুইখানি ক্ষুদ্রকলেবর গ্রন্থ আছে। সমস্ত শাস্ত্রপারাবার মন্থন করিয়া এই দুইটি রত্নের লাভ হইয়াছে। ইহাদের একটির নাম 'গীতা', অপরটির 'চণ্ডী'। উভয়ই সপ্তশত শ্লোকে নির্ম্মিত। এইজন্য গীতার অপর নাম 'গীতাসপ্তশতী' ও চণ্ডীর অন্য অভিধেয় 'দুর্গাসপ্তশতী।'

গীতায় বাসুদেব সমস্ত উপনিষৎ ও সমস্ত দর্শনশাস্ত্র ভূয়োভূয় মন্থন করিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়লক্ষণ ধর্ম্মের চরমতত্ত্ব মধ্যমপাণ্ডব অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করেন; চণ্ডীতে মেধোমুনি পরমপুরুষার্থ-প্রযোজক আত্মবিদ্যা ও লৌকিককুশলের উপায়ভূত সাধারণাশ্রয়ের রাজনীতিবিদ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য্য একই কথায় সমাধি ও সুরথকে শুনাইয়াছিলেন।

রাজনীতিসঙ্কুল যুদ্ধঘটনাই গীতার মূল, কিন্তু তাহাতে আত্মবিদ্যা যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, রাজনীতি সেরূপ হয় নাই। ফলত গীতার মূলে যুদ্ধকাণ্ড থাকিলেও, তাহাতে মুখ্যভাবে জ্ঞানকাণ্ডই আলোচিত হইয়াছে; জ্ঞান সেখানে মুখ্য, রাজনীতি গৌণ। অপরপক্ষে চণ্ডীর মূলে আত্মজ্ঞানের প্রস্তাবনা থাকিলেও, ফলতঃ বোধ হয়, রাজনীতিই সবিস্তর চিত্রিত হইয়াছে; আত্মবিদ্যার আলোচনা ততদূর হয় নাই। অতএব চণ্ডীতে রাজনীতি প্রধান, আত্মবিদ্যা অপ্রধান। বর্ত্তমান প্রবন্ধেই ইহা ক্রমশ পরিস্ফুট হইবে।

দুর্গোৎসবে দেবীর যে মূর্ত্তির আরাধনা করা হয়, তাহা দেখিলেই তাহাকে যুদ্ধোচিত বলিয়া সকলেরই মনে হইতে পারে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তিনি যে যুদ্ধদেবতা এবং পুরাকালে তিনি যে কেবল যুদ্ধবিজিগীষু রাজগণদ্বারা পূজিত হইতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তী কালে এই যুদ্ধদেবতার পূজা যুদ্ধজয়ার্থী ভিন্নও অপর লোকের মধ্যে কেন প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা পরে বলা যাইবে।

আমাদের শাস্ত্রেই অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বকালে ইন্দ্র এই দেবতার উদ্বোধন করিয়া রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, রামচন্দ্র তাহাতে সফলমনোরথ হন। অদ্যাপি এই দুর্গাদেবীর 'বোধন' করিবার শত্রুনাশই প্রয়োজন বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেবীর বোধনে প্রযুক্ত নিম্নলিখিত মন্ত্রকয়েকটিতে ইহাই বলিতেছে—

> রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
> অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তব কৃতঃ পুরা।
> অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্। *
> পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।

* "ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়াম্যহং" ইতি পাঠান্তরম্।

শক্রেণ সংবোধ্য চ রাজ্যমাপ্তং
যথা, তথাহং * ত্বাং প্রতিবোধয়ামি।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য-
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি ॥

পুরাকালে শত্রুবধই যে দুর্গাপূজার প্রধান প্রয়োজন ছিল, নিম্নোদ্ধৃত চণ্ডীর বচনগুলিও তাহা প্রমাণিত করিবে।

"যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥"
"শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্।
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে ॥" ইত্যাদি।

যুদ্ধজিগীষু রাজমণ্ডল সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, এই দিনত্রয়ে যুদ্ধদেবতার পরমসমারোহে অর্চ্চনা করিয়া দশমীর দিন শত্রুবিজয়ে অভিযান করিতেন। এইজন্য সেই তিথির নাম 'বিজয়া' দশমী। বিজয়া দশমীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন করিলে, বর্ষমধ্যে ঐ রাজার আর বিজয়লাভের সম্ভাবনা থাকে না—

"দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ।
তস্য সংবৎসরং রাজ্ঞঃ ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ ॥"

এই নিয়মের কখন অন্যথা হইত না। যদি কার্য্যগৌরবে কোন নৃপতি অভিযান করিতে অসমর্থ হইতেন, তবে তিনি কেবল ঐ নিয়মের রক্ষার জন্য নিজের ছত্র ও আয়ুধ প্রভৃতি মঙ্গলবস্তু বিজয়ার দিন বাহির করিতেন। শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

"কার্য্যবশাৎ যয়নগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ।
ছত্রায়ুধাদ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ ॥"
রাজমার্ত্তণ্ডঃ।

এই বিজয়যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও যুদ্ধদেবতা চণ্ডী দুর্গার পূজার অব্যবহিত পরে রাজগণ "অপরাজিতা" নামে আর এক যুদ্ধদেবতার পূজা করিতেন। এই দেবীর উপরিস্থিত হস্তদ্বয়ের দক্ষিণে খড়্গ, বামে চর্ম্ম; নিম্নস্থিত হস্তদ্বয়ের দক্ষিণে বর ও বামে অভয়। ইঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয়—

"শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং প্রস্থানে সংপ্রযচ্ছ মে।"

তদনন্তর এই "অপরাজিতা" দেবীর মূর্ত্তিস্বরূপ "অপরাজিতা" লতার † বলয় হস্তে ধারণ করিবার নিয়ম আছে; তাহার মন্ত্র এই—

"জয়দে বরদে দেবি দশম্যামপরাজিতে।
ধারয়ামি ভুজে দক্ষে জয়লাভাভিবৃদ্ধয়ে ॥"

নৃপতিবৃন্দের বিজয়প্রস্থানের পূর্ব্বে প্রাগুক্ত মহিষাসুরমর্দ্দিনী যুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চ্চনার প্রথম (?) প্রবর্ত্তয়িতার নাম রাজা সুরথ। এই যুদ্ধদেবতা চণ্ডীকে ও সুরথ কিজন্য তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা 'চণ্ডী'নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে, বলা হইয়াছে। আমরা আরও বলিয়াছি যে, ঐ পুস্তকে আত্মবিদ্যা ও রাজনীতিবিদ্যা উভয়ই উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে রাজনীতিই যেন মুখ্যভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এ কথার সমর্থন জন্য আমরা আপাতত কয়েকটি কথা বলিয়া, চণ্ডীকে ও কেন তাঁহাকে রাজগণ নির্ব্বন্ধসহকারে পূজা করিতেন, তাহা বলিব।

---

* "তস্মাদহং" ইতি পাঠান্তরম্।

† 'অপরাজিতা' লতার গুণ আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ লিখিত আছে—
"পিত্তোপদ্রব-বিষ-নাশিনং, চক্ষুর্হিতঞ্চ, ত্রিদোষশমনকারিকা।" ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ

রাজনীতি ও আত্মবিদ্যা এই উভয় তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে বলিয়া, চণ্ডীতে সুরথ ও সমাধি এই দুই অধিকারীকে গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই। মেধোমুনিকথিত বচনগুলি ঐ উভয় অর্থ প্রকাশ করে বলিয়াই রাজ্য-প্রার্থী সুরথ রাজ্য ও জ্ঞানার্থী সমাধি জ্ঞানের প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥"
"সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্নমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥"

যেমন 'সূর্য্য অস্ত হইয়াছে' এই কথা শ্রবণ করিয়া তস্কর চৌর্য্যসময়, ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দন-কাল ও পরদারলম্পট স্বেন্দ্রিয়চরিতার্থতার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অর্থ গ্রহণ করে—যদিও তদ্বাচক বাক্যটি পৃথক্ নহে; সেইরূপ যদিও মেধোমুনি সুরথ ও সমাধিকে পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ প্রদান করেন নাই, তথাপি সুরথ ও সমাধির হৃদয়বৃত্তি বা বাসনা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, তাঁহারা প্রত্যেকে ঐ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে যে, সেই দেবী প্রসন্না হইয়া 'বিজ্ঞান' ও 'ঋদ্ধি'—ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন—

"সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।"

সুরথ ও সমাধি নিজ নিজ রুচি অনুসারে যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহাই পাইলেন; দেবী তাঁহাদিগের প্রার্থনানুসারেই বর প্রদান করিয়াছিলেন।

সমাধি ও সুরথ যখন মেধোমুনির সহিত কথোপকথন করেন, * তিনি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বৈশ্য সমাধির সত্যসত্যই সংসারে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সুরথের হৃদয়ে তখন বিষয়ভোগলালসা বলবতী রহিয়াছে। বিষয়ভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দুর্লভ। তাই ভগবান্ মুনি রাজ্যনাশে ক্লিষ্টহৃদয় সুরথকে কৌশলে রাজনীতি ও প্রাপ্তনির্বেদ সমাধিকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন।

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

ইত্যাদি বচনদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই আত্মতত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের দুর্গোৎসবে অর্চ্চনীয় দেবীমূর্ত্তির সহিত এই আত্মতত্ত্বের দূর সম্বন্ধ, তাই 'দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে আমরা তাহার অবতারণা না করিয়া, যাহার সহিত নিকট সম্বন্ধ, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

মুনিকথিত রাজনীতি অনুসরণ করিয়াই সুরথ পুনর্ব্বার স্বরাজ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ও সেই দৃষ্টান্তেই পরবর্ত্তী নৃপতিগণ সেই রাজনীতি সেবন করিয়া আসিতেছেন।

চণ্ডী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখা যাইবে যে, সুরথ রাজনীতিনিপুণ ছিলেন না—যদিও তিনি পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিতেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলের রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি অতিন্যূনবল-কোলাবিধ্বংসি-শত্রুগণ-কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল;

* "উপাবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ।" চণ্ডী।

যখন সেই দুঃশীল অমাত্যগণ পুরস্থিত কোষ ও বল অপহরণ করিল, তখন সুরথ নিরুপায় হইয়া একাকী অশ্বারোহণে গহনবনে প্রবেশ করেন। সে স্থানে এক প্রশান্ত আশ্রম তাঁহার নয়নগোচর হয়, আশ্রমাধ্যক্ষ মুনির সৎকারে কয়েকদিন সেই স্থানেই অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাঁহার মন রাজ্যচিন্তায় নিমগ্ন; তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"তাঁহার পূর্ব্বপূর্ব্ব পুরুষের পরিপালিত সেই নগর আজ অসদ্বৃত্ত ভৃত্যগণ ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছে কি না? সেই নিয়ত মদমত্ত প্রধান হস্তী বৈরিহস্তগত হইয়া কোন্ ভোগই বা প্রাপ্ত হইবে?—যে সমস্ত লোক আমার প্রসাদ, ধন ও ভোজনে আমার অনুগত হইয়া ছিল, নিশ্চয় তাহারা অন্য শক্রর অনুবৃত্তি করিতেছে। অতি দুঃখের সহিত সঞ্চিত সেই কোষকে তাহারা নিয়ত অনুচিত ব্যয় করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিবে!" সুরথ এতাদৃশ চিন্তায় দিনযাপন করিতে করিতে একদিন সহসা সমাধি নামে এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার ধনলোলুপ স্ত্রী ও পুত্রগণ সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে; তিনি স্ত্রী, পুত্র ও ধন বিহীন হইয়া বনে আগমন করিয়াছেন; তিনি জানেন না যে, যে সকল ধনলুব্ধ, পিতৃস্নেহহীন পুত্র তাঁহাকে নিরাকৃত করিয়াছে, তাহাদের জন্য কেন তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগে,—তিনি বলিতে পারেন না যে, সেই দুর্বৃত্ত পুত্রগণ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলেও, সেই প্রতিকূল বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাঁহার হৃদয় প্রীতিপ্রবণ কেন।

অতঃপর সুরথ ও সমাধি আশ্রমাধ্যক্ষ মেধোমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, বিষয়ভোগের দোষ স্পষ্টত দেখা গেলেও আবার তাহাতে হৃদয় আকৃষ্ট হয় কেন—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি তদনুসারে দেবীমাহাত্ম্য বলিতে উপক্রম করিলেন। চণ্ডীর প্রারম্ভ এইরূপ। সমস্তক্ষিতিমণ্ডলেশ্বর * সুরথ যে ভাবে গহনবনে প্রবেশ করেন, তাহাতে তাঁহার রাজনীতিতে পটুতা ছিল না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অপরপক্ষে সমাধির হৃদয়ে বৈরাগ্যের ছবি সূচিত হইয়াছে। সুরথের মোটেই বিষয়বিতৃষ্ণা ছিল না, আমরা তাহা বলিতেছি না; কিন্তু যাহা ছিল, তাহা সমাধির নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া; তা ছাড়া, ঐ বিতৃষ্ণার মূল দৃঢ় ছিল না। যদি তাহাই হইত, তবে সমাধির ন্যায় সুরথও দেবীর নিকট রাজ্যপ্রার্থনা না করিয়া জ্ঞানপ্রার্থনাই করিতেন। আর হয় ত সমাধির অভিলষিত "বিজ্ঞান"কে বহু যুদ্ধঘটনার অবতারণা না করিয়া মেধোমুনি বিভিন্নপ্রকারে বলিতেন।

আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই—

"প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি",
"সদাঽপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি।" †

পরমনীতিরসজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্যগণও এই কথা বলিয়াছেন—

* "সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।"
† বেদান্তদর্শনের রামানুজভাষ্য, ভূমিকা।

"অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথা মতা।" *

ধম্মপদং, ১।

বস্তুতঃ প্রমাদ—অনবধানতা যে মৃত্যুর স্থান, তাহা কাহাকেও বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে না; অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, রাজগণ যে অত্যন্ত অনবধানতাতেই অত্যন্ত বিপন্ন হন, ভগবান্ মেধোমুনি দুর্গাসপ্তশতিকার মধুকৈটভযুদ্ধবর্ণনস্থলে তাহাই অপহৃতরাজ্য অনুতপ্ত নৃপতি সুরথকে বুঝাইয়া দিয়াছেন; সুরথ প্রবল নরপতি হইলেও রাজকার্য্যে সাবধান ছিলেন না, থাকিলে তাঁহার তাদৃশ দুর্গতি হইত না।

ত্রিভুবনরাজাধীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু পরিশ্রান্তচিত্তবৃত্তির ন্যায় যখন শেষশয়নোপরি 'তামসী' † নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন; যখন তাঁহার বহির্জগৎপ্রপঞ্চের কোন জ্ঞান ছিল না; যখন তিনি নিসর্গশত্রু দানবগণ পুনর্ব্বার ভুবনক্ষোভ উৎপাদন করিতেছে কি না, ইহা জানিবার যেন কোন আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করিয়া বহির্জগতের কোন শব্দ গ্রহণ করিতেন না; তখন যুদ্ধতম অভিযানসময়ে দুর্ব্বারভুজবীর্য্য মধুকৈটভ নামে দানবরাজদ্বয় বিষ্ণুর অতি সন্নিহিত ও অন্তরঙ্গ হইলেও ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হয়। মধুকৈটভের উৎপত্তিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—"বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ,"—বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন। ইহারও অর্থ তাহাই যে, যখন ভগবান্ বহির্দ্দেশের কোন সংবাদ রাখিতেন না, কেবল শেষশয়নোপরি শয়ন করিয়া তামসী নিদ্রায় বিলাসসুখানুভবে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণবিবর প্রভৃত মলদ্বারা যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; মধুকৈটভও তাদৃশ যোগ্য অবসর লাভ করিয়া যুদ্ধে অভ্যুদিত হয়। ইহাই অবলম্বন করিয়া মেধোমুনি উৎপ্রেক্ষায় বলিয়াছেন—

"বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ।"

মধুকৈটভ তাদৃশ প্রবলবেগে ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিলেও, ভগবানের সেই দুরন্ত নিদ্রার অপগম ও চৈতন্যোদয় হয় নাই। এজন্য ব্রহ্মাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহার পর সেই নিদ্রাভঙ্গ হইলেও বিষ্ণু শস্ত্রসংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই; শস্ত্র-অশস্ত্রের মধ্যে তাঁহার বাহুই কেবল সন্নিহিত ছিল। "বাহুপ্রহরণো বিষ্ণুঃ" এই কথার দ্বারা ভগবানের বীর্য্যাতিশয় প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ঐ দানবদ্বয়কে চক্রদ্বারা ছিন্ন করিলেন,—

"কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে।"

* সংস্কৃত :—অপ্রমাদোঽমৃতপদং, প্রমাদো মৃত্যোঃ পদম্
অপ্রমত্তা ন ম্রিয়ন্তে, যে প্রমত্তা যথা মৃতাঃ ॥
† "এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥"

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে তাঁহার অস্ত্রপ্রাচুর্য্য ছিল না, পরে কোনরূপে অস্ত্র সংগ্রহ করেন। অন্যথা বিষ্ণুর চক্রধারণ করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। মধুকৈটভ স্বয়ং বিষ্ণুকে নিজ মৃত্যুবর প্রদান করে। এ অবস্থায় অস্ত্র না থাকিলেও 'বাহুপ্রহরণ' বিষ্ণু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিতেন। অতএব এতাদৃশ প্রমত্ত—অনবহিত, অরক্ষিতযুদ্ধোপকরণ রাজারও রাজ্য যদি শত্রুদ্বারা আক্রান্ত না হয়, তবে কাহার হইবে।

এবংবিধ রাজার কেবল যে রাজ্যনাশ হয়, তাহা নহে; রাজ্যরক্ষার্থ ঐ সকল রাজাকে যুদ্ধে অধর্ম্মাচরণও করিতে হয়। মধুকৈটভের সহিত বিষ্ণুর কথোপকথনই ইহা প্রকাশ করিতেছে। বিষ্ণুর যুদ্ধকৌশল দর্শন করিয়া আনন্দিতচিত্ত বীরশ্রেষ্ঠ মধু-কৈটভ যখন বীরের ন্যায় তাঁহাকে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন ভগবান্ কাপুরুষের ন্যায়, ভীরুর ন্যায়, দুর্ব্বলের ন্যায়, অনায়াসে নির্লজ্জভাবে তাহাদের নিজ নিজ মৃত্যুবর প্রার্থনা করিলেন —

"ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম।"

বীরজনসংবাদে কেমন বীরস্মন্য ব্যক্তি এরূপ নীচ প্রস্তাব করিতে পারে, তাহা উদারহৃদয় মধুকৈটভের হৃদয়ে পূর্ব্বে স্থান পায় নাই। ভগবান্ তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া বধ করিলেন। বঞ্চনা করা যে অধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বসম্মত। "বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা" এই বলিয়া স্বয়ং মুনি ভগবানের বঞ্চনা করা স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব মধুকৈটভবৃত্তান্তে যায়া মুনি রাজা সুরথকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, রাজা সর্ব্বদা যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত রাখিয়া ও অপ্রমত্ত থাকিয়া নিরত নিপুণভাবে রাজকর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিবেন,—যাহাতে শত্রুপক্ষ স্বল্পমাত্রও প্রবেশ করিবার ছিদ্র না পায়।

অতঃপর যাহাতে দৃঢ়ভাবে রাজ্যরক্ষা করিতে পারা যায় ও যাহাতে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুরও বিনাশ হইতে পারে, ভগবান্ মেধোমুনি মহিষাসুরযুদ্ধবৃত্তান্তের অবতারণা করিয়া তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। এই মহিষাসুর-যুদ্ধবৃত্তান্তই চণ্ডীর প্রধান মর্ম্মস্থান; মহিষাসুরযুদ্ধোপলব্ধ রাজনীতিতত্ত্বই আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত জাতিকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। যে শক্তি মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছে, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসিগণ সেই শক্তিরই উপাসনা করিতেছেন। পৃথিবীর যত-কিছু সংকার্য্য আছে, তাহার জন্য ঐ শক্তিকেই আশ্রয় করিতে হইবে। তাহার ন্যায় পরম মঙ্গলনিদান আর কিছু আছে বলিয়া লেখকের বিশ্বাস নাই। পাঠকবর্গ স্বয়ং তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

দুরাত্মা মহিষাসুর বলবীর্য্যোন্নত দেবতা-দিগের কি না করিয়াছিল? তাহার প্রভাবে দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত; সমস্ত লোক জয় করিয়া স্বয়ং মহিষাসুর ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত; ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ স্বস্বাধিকার-বঞ্চিত; আজ তাঁহাদের পদে মহিষাসুর। সুলভ দুষ্ট বিজেতা বিজিতগণের উপর যাদৃশ

সদাচার প্রদর্শন করেন, মহিষাসুর দেবগণের প্রতি তৎসমুদায় প্রদর্শন করিতে বিরত হয় নাই। যতদূর হইতে পারে, পরপদানত দেবগণকে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা একেবারে হতাশ হন নাই। যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেও, তাঁহারা চিরকালের জন্য স্বর্গসুখসম্ভোগ ভুলিতে পারেন নাই।

মহিষাসুরকৃত পরাভব এক জনের, দুই-জনের বা তিনজনের ছিল না। তাহা জাতীয় পরাভব বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; সমস্ত দেবজাতিই তাহাতে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইন্দ্র-চন্দ্র, যম-বরুণ, সূর্য্য-মারুত প্রভৃতি দেবগণ প্রথমে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধ করিয়া পরাভূত ও হৃতাধিকার হন। অতএব তখন স্বাধিকারলাভে কোন্ উপায় গৃহীত হইবে, ইহা তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। যখন তাঁহারা স্ববুদ্ধিতে ঐ উপায় আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন মহাজনের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক ঐকমত্যে সেই বিষয়কে পুনর্ব্বার বিচার করিয়া দেখাই স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর দেবগণ সকলদেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া মহিষাসুরঘটিত নিখিল বৃত্তান্তের প্রকাশ করিয়া তাহার পরাভব জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই মহামন্ত্রণাপরিষদে ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে স্বমত প্রকাশ করিলেন যে, শত্রু মহিষাসুরের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধাভিযানই বিধেয়; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তাহা সমর্থিত করিলে, একবাক্যে ঐ মত পরিগৃহীত হইল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—চতুর্থ উপায় দণ্ড—যুদ্ধপ্রয়োগ করিয়া দেবগণ পূর্ব্বে বহুবার পরাভূত হইলেও, কিপ্রকারে তাঁহারা পুনর্ব্বার ঐ চতুর্থ উপায়কেই বিধেয় বলিয়া নির্ণয় করিলেন? ইহার সমাধানই আমাদের পরম মঙ্গলময় পথ, ইহা লৌকিক ও পারলৌকিক কুশললাভের একমাত্র উপায়। মহামন্ত্রণাপরিষৎ এ প্রশ্নের সুচিন্তিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তাহা এইরূপ:—মহিষাসুরের প্রতি চতুর্থ উপায় দণ্ডই প্রযোজ্য, কিন্তু তাহা পৃথক পৃথক্ নহে, সকলে একত্র সম্মিলিত হও; সকলে হৃদয়ের ভিন্নভাব পরিত্যাগ কর; সকলে ঐক্য অবলম্বন কর; সকলের শক্তি, সকলের তেজ একত্র সংযুক্ত হউক; সকলে মিলিয়া একত্র চেষ্টা কর; আর কিছুই করিতে হইবে না, আর কিছু অন্বেষণ করিতে হইবে না, আর কোন প্রতীকারচিন্তা করিতে হইবে না। সত্য কথা, পূর্ব্বে মহিষাসুরের প্রতি প্রযুক্ত দণ্ড বিফল হইয়া গিয়াছিল; ইহা সেই উপায়—দণ্ডের অপরাধ নহে, প্রয়োগানভিজ্ঞ দণ্ডপ্রয়োক্তার অপরাধ। এই যে সমষ্টিশক্তিরূপ উপায় উপদিষ্ট হইতেছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর। ব্যষ্টিশক্তি অতি দুর্ব্বলা হয় হউক, কিন্তু ঐ ব্যষ্টিশক্তি যদি সমষ্টিরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে বিশ্বকেও বিনাশ করিতে পারে, ব্রহ্মাণ্ডকেও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, সামান্য তৃণখণ্ডোপম শত্রুর কথা ত আসিতেই পারে না। অতএব সমষ্টিশক্তির উপাসনা কর, তাহাই প্রবল বৈরীর প্রতি সমুচিত চতুর্থ উপায় দণ্ড,

এবং ইহাই অন্তসময়ে চিরলক্ষ্মীলাভের একমাত্র উপায়; ইহাই সংসারের পরমশ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পথ। যতদিন সর্ব্ববিধ কার্য্যে এই সমষ্টিরূপা মহাশক্তির আরাধনা না হইবে, ততদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিলে অভিলষিতসিদ্ধির ত কোন আশা নাই, প্রত্যুত প্রতি চরণক্ষেপে বিপন্ন হইতে হইবে।

শত্রুর প্রতিই হউক্ বা আর যে-কোন কার্য্যেই হউক, অলসভাবে বসিয়া কালক্ষেপ করিলে চলিবে না; যত সত্বর সম্ভব, ঐ শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। বদ্ধমূল তরুবরকে সহজে উৎপাটিত করিতে পারা যায় না; বারিপ্রবাহে দেশ প্লাবিত হইয়া গেলে সেতুবন্ধনের আর প্রয়োজন কি? এই কথাটি দেবীমাহাত্ম্যবক্তা মুনিবর, মহামন্ত্রণাপরিষদে প্রতীকারার্থ সমাগত দেবতাবৃন্দের বচনশ্রবণান্তরই বিষ্ণুর তেজোনির্গমনঘটনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেলাই শ্রেয়স্কর।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত মহিষাসুরের কোন বিবাদ হয় নাই। মহিষাসুরকৃত ইন্দ্রাদির পরাভবে, তাঁহারা ইন্দ্রাদির পক্ষ অবলম্বন করিয়া সম্যক্রূপে স্বজাতিবৎসলতা দেখাইয়াছেন। দেবগণের সেই বিষমাবস্থায় তাঁহারা যদি মহিষাসুরের পক্ষ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বজাতিদ্রোহপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন না, আর মহিষাসুরও নিহত হইত না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যে মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়া জগতের লোককে অভ্যুদয়ের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও হইত না। আর এই যে আমরা বর্ষে বর্ষে পরমানন্দে দুর্গোৎসবে মত্ত হইয়া সেই শক্তির আরাধনা করিতেছি, তাহাও সম্ভাবিত হইত না। যেমন মহিষের পক্ষ অবলম্বন করিলে এতগুলি অভাব উপস্থিত হইত, সেইরূপ যদি তাঁহারা কোন পক্ষই গ্রহণ না করিয়া উদাসীন থাকিতেন, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত দোষ হইত। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন, জাতীয় পরাভব বা জাতীয় অভ্যুদয়ের সময়ে কাহারও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। সকলকেই স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে।

যখন দেবতাবৃন্দের মহতী সভায় পূর্ব্বোল্লিখিত পন্থাই অনুসরণীয় বলিয়া নির্ণীত হইল, তখন যাহা হইল, মুনিবরের বচন উদাহৃত করিয়া আমরা তাহা দেখাইতেছি—

> "ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
> নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
> অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
> নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥"

'অনন্তর অতি কোপপূর্ণ চক্রী, ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইল। এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি অপরাপর দেবতাদের শরীর হইতেও সুমহৎ তেজ নির্গত হইল এবং সেই সমস্ত তেজ ঐক্যপ্রাপ্ত হইল।'

দেবতাদের ব্যষ্টিভূত যে তেজ একদিন হীনপ্রভ ও নিষ্ফল হইয়াছিল, সেই সমস্ত তেজই আজ কেবল একত্ব অবলম্বন করিয়া—সমষ্টিভূত হইয়া অপূর্ব্ব মহিমা পোষণ

করিতে লাগিল। যাহার প্রভাবে দেখিতে দেখিতেই—

"চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা, চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥"

'সমস্ত লোক ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, সমুদ্রসকল কম্পিত হইল, পৃথিবী ও পর্ব্বতসমুদায় বিচলিত হইল।'

সেই 'জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তর', 'সর্ব্বদেবশরীরজ' 'অতুল তেজ'কে ক্ষণমধ্যেই "জ্বলন্তমিব পর্ব্বতং" দেখিয়া তৎস্থিত দেবগণ সোৎসাহে ও সোল্লাসে 'জয় জয়' শব্দে অসকৃৎ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

দেবগণের শরীর হইতে পূর্ব্বকথিত যে তেজ বহির্গত হইয়া একত্র মিশ্রিত হইয়াছিল,—তাঁহাদের ব্যক্তিগত যে শক্তি একত্র সমষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছিল,—সেই মহাশক্তিই মহিষাসুরনাশিনী এবং সেই মহাশক্তিই দুর্গোৎসবের দুর্গামূর্ত্তি। মহামনীষী মুনিবর তাহাই স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

"অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ত্বিষা ॥
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং, মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ, নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ, তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ, কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥"

'ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের ন্যায় শক্র প্রভৃতি অপরাপর দেবগণেরও শরীর হইতে সুমহৎ তেজ নির্গত হইয়া একত্র হইল। দেবগণ দর্শন করিলেন যে, ঐ মহাতেজঃকূট জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় জ্বালাকলাপদ্বারা দিগন্তরকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। সর্ব্বদেবশরীরোৎপন্ন সেই নিরুপম তেজ একস্থ হইয়া নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল ও তাহার দীপ্তিতে লোকত্রয় ব্যাপ্ত হইল। শম্ভুর শরীর হইতে যে তেজ নির্গত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ঐ নারীমূর্ত্তির বদনমণ্ডল গঠিত হয়। এইরূপ যমের তেজে তাঁহার কেশকলাপ, বিষ্ণুর তেজে বাহু, চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও ঊরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণদ্বয়, সূর্য্যের তেজে পাদাঙ্গুলি, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দশনপংক্তি, বহ্নির তেজে নয়নত্রয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় সন্ধ্যার তেজে ভ্রুযুগল, পবনতেজে শ্রবণদ্বয় এবং সেই 'শিবা'—কল্যাণকারিণী দেবীর অন্যান্য অবয়ব অপরাপর দেবতাগণের তেজে উৎপন্ন হয়। মহিষাসুরনিপীড়িত অমরগণ সেই সমস্ত দেবতার 'তেজোরাশিসমুদ্ভবা' নারীকে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।'*

* এই অঙ্গসংস্থান দেখিয়া বোধ হয়, সেই মহাশক্তির যেখানে শক্তির বিনিয়োগ অনুকূল, তাহাই করিতে হইবে।

আমাদের পাঠকবর্গের হৃদয়ে, বোধ হয়, আর কোন আশঙ্কাই নাই যে, দেবগণের একত্র সম্মিলিত শক্তিকেই নারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সেই সম্মিলিত শক্তির মহোপকারিত্ব দেখিয়াই সর্ব্বত্র তাহার প্রচলনোদ্দেশ্যে দুর্গোৎসবে তদুপাসনার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

দেবগণের মহামন্ত্রণাপরিষদের পরামর্শে সমুৎপন্ন 'সমস্তদেবানাং তেজোরাশি-সমুদ্ভবা' দেবী অতঃপর তাঁহাদের কীদৃশ উপকার সাধন করিয়াছিলেন, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

যখন দেবগণের ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিশক্তিরূপে পরিণত হইল, তখন তাঁহারা শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান অনিবার্য্য, এবং প্রধানত মূলে এইজন্যই তাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সেই মহাশক্তির অপর কোন কার্য্যে বিনিয়োগ না করিয়া যুদ্ধোৎসবেই করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ করিতে হইলে অস্ত্রের সংগ্রহ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাঁহারা সে অস্ত্রের জন্য অন্যত্র যান নাই; যাঁহার নিকট যাহা ছিল, তাহাই তিনি সেই মহাশক্তিকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সম্মাননা করিলেন—

"শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥"

*   *   *

*   *   *

অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ

'পিনাকপাণি মহেশ্বর নিজের শূল হইতে অপর একখানি শূল নিষ্কাশন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন; কৃষ্ণ নিজ চক্র হইতে অপর চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। * * * এইরূপ অন্যান্য সুরগণও ভূষণ ও আয়ুধ দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিলে তিনি মুহুর্মুহু অট্টহাসে ও উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।'

এতাদৃশ সমষ্টিশক্তির প্রভাব সুদুঃসহ। স্বয়ং মহিষাসুরের ভুজবীর্য্য দুর্ব্বার হইলেও, তাহার চিক্ষুর-চামর, বাষ্কল-বিড়ালাদি বহু বহু রণকুশল সেনানী থাকিলেও, এবং অগণ্য সৈন্যব্যূহ প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেও, মহিষাসুরকে বিজয়লক্ষ্মীভোগের আশা ত্যাগ করিয়া শোণিতধারায় সমরাঙ্গন সুরঞ্জিত করিতে হইয়াছিল; দৈত্যসৈন্য হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; দেবতারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন; দেবভবনে বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল।

অতঃপর শক্রাদি দেবগণ যাঁহার প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষ মহিষাসুরের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন, ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। চণ্ডীর এ অংশ অতি মনোরম। দেবতারা বুঝিয়াছিলেন—কেবল যুদ্ধবিগ্রহ নহে, সর্ব্বত্রই এই শক্তির উপাসনার আবশ্যকতা আছে, এবং তাহা না করিলে মহাবিপত্তি হইবেই হইবে। বিশেষত বিপৎকালে ইনিই একমাত্র আদরণীয়া। ইনিই বিপদ্ বিনাশ করিয়া কল্যাণ আনয়ন করিতে পারেন। চণ্ডীর পরম বিচক্ষণ মুনি শক্রাদি দেবগণের মুখে এই কথাই বলাইয়াছেন—

"দেব্যুবাচ।
ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্।
দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা॥
দেবা উচুঃ।
ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ॥
যদি চাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ॥*
যশ্চ "মর্ত্ত্যঃ" স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে॥"

'দেবী বলিয়াছিলেন—দেবগণ, তোমাদের আমার নিকটে যাহা অভিলষিত থাকে, প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের এই সকল স্তবে সুপূজিত হইয়া অতি প্রীতিসহকারে তাহা প্রদান করিব।

দেবগণ বলিয়াছিলেন—ভগবতি, যখন মহিষাসুর বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আপনি আমাদের সমস্তই সম্পন্ন করিয়াছেন, আর কিছু অবশিষ্ট নাই; তবে যদি, হে মহেশ্বরি, আপনি আমাদিগকে বরপ্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের এই প্রার্থনা যে, যখন যখন আমরা আপনাকে স্মরণ করিব, আপনি সেই সেই সময়ে সমাগত হইয়া আমাদের পরম বিপত্তির বিনাশসাধন করিবেন; আর যে-কোন মর্ত্ত্য এই সকল স্তোত্রদ্বারা, হে অমলাননে, হে অম্বিকে, তোমায় স্তুতি করিবে, তাহার বিত্ত ও লক্ষ্মীর প্রাচুর্য্যবিধান করিয়া ধন ও স্ত্রী প্রভৃতি সম্পদের সর্ব্বদা অভ্যুন্নতির জন্য আমাদের প্রতি আপনি প্রসন্না হইবেন।'

বলা বাহুল্য, দেবী ইঁহাদিগকে ঐ বরই দিয়াছিলেন।

এই শক্তি যে দেবগণের ন্যায় মনুষ্য-সমাজেরও উপকারসাধন করেন, তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য মহামুনি 'যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বরদান-কথার অবতারণা করিয়াছেন।

ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যে পর্য্যন্ত যে বস্তুর গুণগৌরব বিশেষভাবে জানা না যায়, তাবৎকাল তাহার প্রতি লোকের গাঢ় অনুরাগ বা বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। বস্তুর গুণ যতই অধিক অধিক শ্রুতিগোচর হয়, তাহার প্রতি প্রবৃত্তিও ততই অধিকরূপে জন্মে। এই ভাবিয়া দেবীমাহাত্ম্যকার সেই মহাশক্তির গুণবর্ণন করিবার জন্য—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

ইত্যাদি বিবিধমাহাত্ম্যসূচক স্তোত্রসমূহ উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।

যেমন তালবৃক্ষে একটি কাক আসিয়া উপবিষ্ট হইবার পর একটি তাল পড়িয়া গেলে, ঐ তালের পতনের প্রতি তৎপাতনা-সমর্থ কাককে আমরা কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি না, সেইরূপ হয় ত কেহ ভাবিতে পারেন যে, বস্তুত ঐ মহাশক্তি মহিষাসুরকে বধ করিতে পারেন নাই,

* এই কথাটি আরও একবার উক্ত হইয়াছে—
"ত্বয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥"

তাহা কারণান্তরে বিনষ্ট হইয়াছে। লোকের এই ভ্রম অপনোদনের জন্য ও মহাশক্তির শক্তিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার জন্য শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অপর দুই মহাবল দানবরাজের বধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আমাদের শিখিবার মূলত দুইটি বিষয় দেখিতে পাই। যথা—

প্রথম।—স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে কল্যাণ হয় না। দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—মহাশক্তি পার্ব্বতী সুচারুবেশে, মনোরম হিমাচল-শিখরে বিহরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া চণ্ড ও মুণ্ড নামে শুম্ভ-নিশুম্ভের দুই ভৃত্য তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রভুর নিকট নিবেদন করে। শুম্ভ-নিশুম্ভ তদনুসারে প্রথমত লোভপ্রদর্শনে কৃতকার্য্য না হইয়া বলাৎকারে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে ও তদনন্তর নিহত হয়।

ভারতবাসী সমস্ত সহ্য করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। ভারতীয় সাহিত্যে রমণীর প্রতি অত্যাচারকারীর দুরন্ত পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, সীতার প্রতি অত্যাচার করিয়া রাবণ সবংশে নিহত। মহাভারতেও তাই—দ্রৌপদীর পীড়নকারী কৌরবগণ সমূলে বিনষ্ট। শুনিয়াছি, বঙ্গের প্রতাপাদিত্য কোন রমণীর স্তনচ্ছেদ করার পর ক্রমশ অধঃপতিত হন। ভারতীয় ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে এ দৃষ্টান্ত বহুল-পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়।—রোগশেষ ও ঋণশেষের ন্যায় শত্রুর শেষ রাখিলে কিরূপ বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত। ইহা রক্তবীজের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত হইতে পাওয়া যায়। রক্তবীজ শুম্ভ ও নিশুম্ভের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। দেবী-মাহাত্ম্যবক্তা বলিয়াছেন—রক্তবীজের শরীর হইতে যত-বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গেই আবার তত গুলি রক্তবীজ জন্ম-গ্রহণ করিবে; এইরূপ ইহাদেরও শরীর হইতে রক্তবিন্দু ভূপতিত হইলে তদনুরূপ রক্তবীজের উৎপত্তি হইবে। যখন ইহার সহিত যুদ্ধ চলিল, তখন রক্তবীজের রক্তোৎ-পন্ন অপরাপর রক্তবীজে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন কালিকা বদনবিস্তার করিয়া জিহ্বা বহির্গত করিলে, একএকটি রক্তবীজকে ধরিয়া ঐ জিহ্বার উপর ছেদন করিতে আরম্ভ করায় পৃথিবীর সহিত তাহার রক্তের যোগ হইল না এবং উক্ত নিয়মানুসারে নূতন রক্তবীজও সৃষ্ট হইতে পারিল না। এই প্রণালীতে একটির পর একটি করিয়া সমস্ত রক্তবীজের বধ হয়। এই ঘটনাদ্বারা আমরা এইটুকু ভিন্ন অপর কিছুই বুঝিতে পারি না যে, সম্যক্‌প্রকারে শত্রুর মূল উৎ-পাটন করিয়া ফেলিবে, তাহা না হইলে সেই শত্রু পুনর্ব্বার নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া আক্রমণ করিতে পারে।

শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী দেবী যে মহিষাসুর-মর্দ্দিনীর ন্যায় দেবসমূহের সম্মিলিত-শক্তি-স্বরূপা ও তাহা হইতে অভিন্ন, ইহা পূর্ব্বে সামান্যত বলিয়া মেধোমুনি আবার স্পষ্টরূপে বিশেষভাবেও বলিয়াছেন—

"এবমিয়ন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ।

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ হন্তুমাযযৌ॥"

'হে রাজন্, এই সময়ে অসুরদিগের বিনাশার্থ ও অমরশ্রেষ্ঠগণের কল্যাণের জন্ম ব্রহ্মা, শঙ্কর, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের অতিবীর্য্যবলান্বিত শক্তিসকল তাঁহাদের শরীর হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া স্ব স্ব রূপে চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। যে দেবতার যাদৃশ রূপ, ভূষণ ও বাহন, তাঁহাদের শক্তি সেইপ্রকারই রূপাদি গ্রহণ করিয়া অসুরবধে আগমন করিয়াছিলেন।'

শুম্ভনিশুম্ভবধের পর দেবীমাহাত্ম্যে সেই মহাশক্তির পুনর্ব্বার স্তুতি করিয়া তাঁহার মহোপকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা সে সমস্ত অনুবাদ করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। এই শক্তি পূর্ব্বে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে যে তিনি "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা," "সর্ব্বার্থসাধিকা," "সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতা," তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব দেবতাদিগের কণ্ঠের সহিত আমরাও বলি—

"বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি—
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥"

এই শক্তির প্রভাব এতাদৃশ অদ্ভুত বলিয়াই ইঁহার চরিত্র—

"শ্রুতং হরতি পাপানি, তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।"

এইজন্যই তদ্ঘটিত যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে—

"বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে।"

দেবীর এই চরিত্র শ্রবণ করিলে স্বভাবতই চিত্ত ঐক্যের দিকে—সমষ্টিশক্তির অনুকূলে ধাবিত হয় বলিয়াই, তাঁহার এই চরিত্র নৃপতিগণের পরস্পর সম্মেলনভঙ্গ হইলে আবার সুন্দররূপে মৈত্রী উৎপাদন করিয়া দিতে পারে। ইহাই লিখিত হইয়াছে—

"সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্।"

এই দেবীর এত গুণ আছে বলিয়াই মধ্যে মধ্যে (অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশীতে) "দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী"পাঠের বিধান হইয়াছে; অসমর্থ লোকেরা অন্তত বৎসরান্তেও যেন একবার ঐ দেবীমাহাত্ম্য আলোচনা করে। এইজন্য মুনি লিখিয়াছেন—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

কিন্তু হায়! লোকে বৎসরান্তেও একবার দেবীমাহাত্ম্য আলোচনা করে না, করিলেও হয় ত তাহার তাৎপর্য্য অন্বেষণ করে না। এইজন্যই সেই শক্তি 'রুষ্টা' হইয়া 'সকলান্ অভীষ্টান্ প্রতিহন্তি।' আমরা অত্যন্ত মূঢ়, তাই পুরস্থিত রত্নকে দেখিতেছি না, দেখিলেও হয় ত গ্রহণ করিতেছি না, গ্রহণ করিলেও হয় ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না।

এই শক্তি যে সাধারণের লক্ষ্মীপ্রদা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বিনিয়োগে কাল ও স্থান বিবেচনা করিতে হয়। যেমন অগ্নি আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য পরমোপকারী হইলেও অসাবধানে স্থাপিত হইলে অচিরে সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে,

এই শক্তিও সেইরূপ সুস্থানে ও সুকালে প্রযুক্ত হইলে প্রভূতোপকার করিতে পারে, অন্যথা মহান্ অনর্থের উৎপত্তি হয়। ইহাই কথিত হইয়াছে—

"সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥
ভবকালে সৈব নৃণাং লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥'

দুর্গোৎসবে উপাস্যা দেবী কে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই পূজার কতদূর আবশ্যকতা আছে। এই মহাশক্তি দেবীর সর্ব্বত্রই প্রয়োজন আছে বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হইতে বেদ পর্য্যন্ত ঐ মন্ত্রোপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। হিতোপদেশ খুলিলেই দেখিতে পাইব, গ্রন্থকার শিক্ষা দিতেছেন—

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥
সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥"

বাল্যকালে যাহা ক্ষুদ্রগ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারই মূলচিত্র আমাদের পরমপবিত্র বেদের উজ্জ্বলাক্ষরে সন্নিবেশিত দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের গ্রন্থকর্ত্তা আমাদিগকে সমস্ত বেদ শুনাইয়া সর্ব্বশেষে ঐ মহাশক্তির উপাসনামন্ত্রেই আমাদিগকে দীক্ষিত হইতে বলিয়াছেন—

"সঙ্গচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং; সং বো মনাংসি জানতাম্।"*

'তোমরা একত্র মিলিত হও, তোমরা একই বাক্য উচ্চারণ কর এবং তোমাদের মন এক হউক।'

এই ঐক্যরূপা মহাশক্তি বিবিধ কষ্ট বিনাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'দুর্গা'। শাস্ত্রকারগণ দুর্গানামের এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।
তং ননাশ পুরা তেন বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা॥

শব্দকল্পদ্রুম।

দুর্গশব্দের অর্থ বিপত্তি ও আকারের অর্থ নাশ; পুরাকালে দুর্গকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'দুর্গা' নামে কীর্ত্তিত করিয়াছেন।

দেবীমাহাত্ম্যে দেখিতে পাই, 'দুর্গম' নামক অসুরকে বধ করায় তাঁহার নাম দুর্গা—

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

পূর্ব্বোক্ত বচনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য করিলে বলিতে হইবে, 'দুর্গ' ও 'দুর্গম' একই, এবং তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে দুঃখকারণ বলিয়া অসুররূপে কথিত হইয়াছে।†

---

* ঋগ্বেদ দশমমণ্ডলের শেষসূক্তে এই কথাই বহুপ্রকারে উক্ত হইয়াছে।

† দুর্গানামের ব্যুৎপত্তি বহুপ্রকার আছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্বত্রই একরূপ প্রতীত হয়। যথা—

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্মৃত্যুক্তিশ্রবণাদ্যস্যা এতে নশ্যন্তি নিশ্চিতম্।
ততো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিণা পরিকীর্ত্তিতা॥

অন্যান্য নির্ব্বচনের জন্য শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

পাঠকগণ এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন, দুর্গোৎসবের এত আকর্ষণ কেন ও কিজন্যই বা শাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহাকে নিত্য ও কাম্য এই উভয়বিধ কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। দুর্গোৎসব যাহাতে সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে, তজ্জন্য শাস্ত্রজ্ঞগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যতদূর পারিয়াছিলেন, সেই শক্তির মূর্ত্তিনির্ম্মাণ ও তাঁহার সাজসজ্জা ও অর্চ্চনাদির বহুবিধ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার গুরুতরত্ব-সাধনে প্রয়াসী ছিলেন।

দুর্গোৎসবের ন্যায় আড়ম্বরবহুল পূজা আর নাই। দুর্গার সহিত কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নন্দি, ভৃঙ্গী, শিব ও গঙ্গা প্রভৃতির মূর্ত্তিনির্ম্মাণে দুর্গাপূজা আরও মহত্তর হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াছি, কোন কোন স্থানে উল্লিখিত মূর্ত্তি ভিন্ন কালী ও নরসিংহ-মূর্ত্তিও দুর্গাপ্রতিমামধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। মূর্ত্তি নির্ম্মিত না হইলেও, দুর্গোৎসবে অন্তত গন্ধপুষ্পদ্বারাও পূজিত না হন, এমন দেবতার সংখ্যা নিতান্ত অল্পই আছে। দুর্গোৎসবপূজাপদ্ধতিতে বহু বহু দেবতার পূজার বিধান দেখা যায়। খুব সম্ভব, দুর্গা-পূজার গৌরববর্দ্ধনের জন্য এইরূপ আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালপ্রভাবে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরে এতদূর আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আমরা তাঁহার আবরণ ভেদ করিয়া যথার্থ বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ভগবান্ প্রসন্ন হউন, আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হউক,—যেন আমরা সেই মহাশক্তি দুর্গাদেবীকে পরম-যত্নে আবাহন করিয়া, বৎসরান্তে তিনচারি-দিনের জন্য নহে,—সর্ব্বক্ষণেই ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে অর্চ্চনা করিয়া স্তুতি করিতে পারি—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।"

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

শুভক্ষণ।

১

ওগো মা—
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ ল'য়ে
রহিব বল কি মতে?
বলে' দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,

পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস ?
মাগো, কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে
মুখপানে কেন চাস্ ?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে সুদূর পুরে ;—
শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্ মাঠ হ'তে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে !
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বল কি মতে ?

ত্যাগ।

১

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার 'পরে।
মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে
চাহিস্ কিসের তরে !

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে' আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জা'ন না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে?

কোচিন।

১৩

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, আমি আবার সেই দ্বীপটির মধ্যে—সেই আমার সুপ্ত প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যখন সূর্য্য অস্তপ্রায়, সেই সময়ে এখান হইতে চিরবিদায় লইবার জন্য আমি উদ্যোগ করিলাম। সেই ৪০দাঁড়ের নৌকায় উঠিয়া কোচিনরাজ্যের দক্ষিণতম নগর "ত্রিচূড়"-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে আরো একরাত্রির পথ যাইতে হইবে।

প্রত্যেক জলযাত্রার আরম্ভে, আমার নৌকা ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ বেগে চলিয়াছিল, এবারও সেইরূপ বেগে চলিল। বিশ্রামের পর দাঁড়ীরা নববলে বলীয়ান্ হইয়া, কোদালি-কোদালি মাটি উঠাইবার মত, প্রত্যেক দাঁড়ের আঘাতে রাশি-রাশি জল উঠাইয়া চলিতে লাগিল। দাঁড়ীদের সাহায্যার্থে আমরা পাল তুলিয়া দিলাম। তালীবনসমাচ্ছন্ন দুই কূলের মধ্য দিয়া বিলের মধ্যে আবার প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য—আমাদের অস্তগামী সূর্য্য রক্তিম স্বর্ণ-আভার মধ্যে অবতরণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইল; এবং পরক্ষণেই, ঐ অদূরে, চির উদ্ভিজ্জের পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমাদের এই প্রশান্ত জগতের উপর, অতীব মধুর বর্ণে রঞ্জিত নির্ম্মেঘ অমল আকাশ প্রসারিত। আমরা এখন মৎস্যজীবীর রাজ্যে—জেলে-নৌকার মধ্যে—মৎস্যজালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই ভারতীয় বিলের চারিধারে, তালীবনের পর্দ্দা থাকায় সেই আদিমকালের হ্রদবাসী মৎস্যজীবীর জীবন এখানে বেশ সুরক্ষিত রহিয়াছে।

কল্যকার মত আজও আমার মাঝিমাল্লারা মুখ বুজিয়া সমস্বরে তান ধরিয়াছে; এই তান,—এই প্রশান্ত সময়ের সহিত বেশ

খাপ্ খাইয়াছে। পবনদেবের কৃপায় আমাদের নৌকা পালভরে চলিতেছে; দাঁড়ীরা ঔদাস্যের সহিত অলসভাবে দাঁড় ফেলিতেছে। অন্য নৌকাতেও জেলেরা গান ধরিয়াছে; যে স্বরে গান গাইতেছে, তাহা মানবকণ্ঠস্বর বলিয়া মনে হয় না,—মনে হয় যেন, গির্জ্জাঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে ও চারিদিক্ হইতে এই শব্দযোনি জলরাশির উপর আসিয়া পৌঁছিতেছে।...

যে-সব সাদাসিধা সরলপ্রাণ বিশ্বস্তচিত্ত অসংখ্য লোক আমাকে ঘিরিয়া আছে—মনে হয় যেন উহারা হরিৎ-শ্যামল তালীবনের ছায়াময় সমাধিগর্ভ হইতে সশরীরে পুনরুত্থান করিয়া, এই "খয়রাৎ-ডাঙা"য় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!—বিভিন্ন পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ খৃষ্টান্, হিন্দু কিংবা ইহুদি; কিন্তু ইহারা সকলেই সমান শ্রদ্ধার পাত্র, একই সত্য উহাদের সকলেরই পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।...যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এমন কঠোরভাবে রক্ষিত, তাহারও মধ্য হইতে যদি আমি দুরধিগম্য সত্যের দুইএক টুক্‌রা পাইতে পারি—এই শিশুসুলভ আশা আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল!... কিন্তু না;—যেমন অন্যত্র, তেম্‌নি এখানেও, চিরবিদেশী ও চিরপান্থ হইয়াই আমাকে থাকিতে হইল;—প্রাণী ও পদার্থসমূহের বাহ্যভাবদর্শনে নেত্রের তৃপ্তিসাধন ভিন্ন আমি আর কিছুই করিতে পারিলাম না। তা ছাড়া, আমার যাত্রা শেষ হইয়াছে—আমি চলিলাম; গান গাইতে-গাইতে ও দোলাইতে-দোলাইতে, একখানি সুন্দর নৌকা করিয়া আমাকে লইয়া চলিল। ইহাতেও আমার আনন্দ; এইটুকুই আমার সৌভাগ্য; ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।...

দিগ্‌বলয়ের চারিধারে অরণ্যের নীল যবনিকা;—এই নীলিমা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল; অস্তাচলদিগন্তের ক্ষণস্থায়ী নীলিমা ক্রমে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। ইতস্তত, অপেক্ষাকৃত বিশাল এক-একটি তালবৃক্ষের নিঃসঙ্গ ছায়াচিত্র বৈচিত্র্যহীন অরণ্যরেখার উপরিভাগে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত। সম্মুখে তারকাবলী। মুমূর্ষু সোনালি-গোলাপি আভার মধ্যে শুক্রগ্রহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং তাহার পার্শ্বে নব-ইন্দু সমুদিত। এরূপ চন্দ্র সব-সময়ে দেখা যায় না;—কোন বিশেষ সময়ে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিমল-স্বচ্ছ নভোমণ্ডলেই দৃষ্ট হয়;—একটি ভাস্বর শীর্ণসূত্র বক্রাকারে অঙ্কিত; কিন্তু সমস্তই বেশ পরিস্ফুট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য;—মনে হয় যেন পশ্চাৎ হইতে আলোকিত; বেশ বুঝা যায়, উহা একটা সামান্য চক্রমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটি গোলক, যাহা নিরাধার হইয়া মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। কোন-একটা পদার্থ বিনা-অবলম্বনে রহিয়াছে—মনে করিতে গেলে,—আমাদের অর্জ্জিত সংস্কার যাহাই হউক—ভারসাম্য ও গুরুত্বের যে স্বাভাবিক সংস্কার আমাদের মনোমধ্যে নিহিত আছে, সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বশে আমাদের চিত্ত একটু আকুল হইয়া উঠে।

অন্ধকার হইয়া আসিল। মৎস্যদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য জেলেরা তাহাদের মশাল জ্বালিল; গান থামিল; এবং সমস্তই নিদ্রামগ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কেবল, আমার ৪০জন দাঁড়ীর দাঁড় জলের উপর যন্ত্রবৎ অবিরাম পড়িতেছে;—প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহারা আমাকে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে লইয়া যাইতেছে।

১৪.

তালীবনের পশ্চাতে হঠাৎ যেন একটা আগুন জলিয়া উঠিল;—ইহা সূর্য্যের উদয়। সারারাত্রি আমার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া-ঠেকিয়া অবশেষে লালমাটির একটি ছোট পাহাড়ের নীচে আসিয়া লাগিল। এইখানে বিল শেষ হইয়াছে। ইহাই ত্রিচুড়ের ঘাট;—শতশত নৌকায় সমাচ্ছন্ন। উহাদের সম্মুখভাগ "গণ্ডোলার" মত। এই নৌকাগুলি এখনও নিদ্রামগ্ন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অতীব নিষ্ঠাবান্ ও অতীব রক্ষণশীল ত্রিচুড়নগর এখান হইতে আরো অর্দ্ধক্রোশ দূরে—তরুপুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত। বয়েল-গাড়ি করিয়া যখন আমি সেখানে পৌছিলাম, তখন সেখানকার লোকেরা সবে-মাত্র জাগিয়াছে। এই সব চুনকামকরা কাঠের বাড়ীর ঊর্দ্ধে তালবৃক্ষসকল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছে। একটা ঠাণ্ডা খোড়ো বাতাস উঠিয়া, রক্তিম মেঘপুঞ্জের ন্যায় ধূলিরাশি উড়াইয়া, গাছপালাদিগকে ঝাঁকাইতেছে। সেটাই তামার—শস্যদানার ছোট-ছোট দোকান; আভূমিলম্বিতকুন্তল বটবৃক্ষশ্রেণী,—সমস্তই মালাবারপ্রদেশের অন্যান্য নগরেরই মত। এই সকল নগর,—আধুনিক পদার্থসমূহ হইতে বহু দূরে—তরুপুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, বহুকাল হইতে স্বকীয় জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ত্রিচুড়ের মন্দিরটি অতীব প্রকাণ্ড ও ভীষণ-দর্শন। এই ত্রিচুড়নগরের অপর নাম—"তিরু-শিবার-পেরিয়া-বুর"—অর্থাৎ শিবের পবিত্র মহানগরী।

এই মন্দিরের সম্মুখস্থ ভূমিতে আমি অবতরণ করিলাম। ইহা মন্দিরও বটে, দুর্গও বটে। এক সময়ে ইহা সেই দুর্দ্দান্ত মহিশূরসুলতান টিপুর অবরোধ সহ্য করিয়াছিল। দুর্গের ঢালুমাটির উপর দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। এখন এই ভূমির উপর অলস মেষদল ও গবয়াদি নিদ্রা যাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের একটা দ্বারদেশে বসিয়া ধ্যান ও প্রাতঃসূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি আসিতেছি দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উহারা আমার দিকে অগ্রসর হইল। এই বিদেশী না-জানি কি মনে করিয়া এখানে আসিতেছে!...কিন্তু আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—আমি সব জানি, আমি কেবল মন্দিরচূড়ার কারুকার্য্য দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি;—যথাযোগ্য দূর হইতে আমি উহা দর্শন করিব। তখন তাহারা হাসিমুখে আমাকে অভিবাদন করিল এবং নিশ্চিন্তমনে আবার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। গুরুভার প্রাচীরগুলা সুধালেপের দ্বারা ধবলীকৃত; কিন্তু যাহার উপর খোদাই-কাজ-করা চারিটা চূড়া আছে,—চারিদিকের সেই চারিটা দ্বার, ভারতীয় প্রস্তরের ন্যায় শ্যামলবর্ণ। দূর-অতীতের এই পুরাতন শ্যামল চূড়াগুলি প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিত;—বহুল ক্ষুদ্রস্তম্ভ ও বর্ব্বর মূর্ত্তিসমূহে পরিপূর্ণ।

এই যে শীতকালের ঝড়ঝটিকা এখানকার সকল পদার্থকেই উৎপীড়ন করে—আভূমিলম্বিতকুন্তল বৃহৎ বটবৃক্ষদিগকে ঝাঁকা-

ইয়া দেয়—পথে-ঘাটে লাল ধূলা উড়াইয়া দেয়—ইহার প্রভাব কি এই শিবপুরীতে কিছুমাত্র প্রকটিত হয় নাই? পথের ধারে-ধারে সর্ব্বত্রই বর্ষীয়ান্ তরুগণের তলদেশে পূজা-অর্চ্চনার জন্য একএকটি শান্তিময় নিভৃত স্থান রহিয়াছে। আমাদের দেশে, যেখানে মৃত্তিকস্তূপের উপর ক্রুশ-দণ্ড স্থাপিত হয়—সেই সব চত্বরভূমির উপর—চৌমাথা রাস্তার উপর, এখানে ছোট-ছোট প্রস্তরবেদিকা, বিগ্রহশিলা, প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠিত।

রাস্তায় পথিক খুবই কম। স্বকীয় নগ্নতার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত,—কেশগুচ্ছ আকটিবিলম্বিত—শিব কিংবা বিষ্ণুর তিলকচিহ্নে ললাট চিত্রিত—স্বপ্নময় ঢুলুঢুলু নেত্র—এইরূপ কতকগুলি লোক মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে; প্রায় সকলেরই বক্ষোদেশে উচ্চবর্ণের চিহ্নস্বরূপ উপবীত রহিয়াছে। কতকগুলি রমণী ইন্দারায় জল লইতে আসিয়াছে। তাহাদের বঙ্কিম দেহভঙ্গী;—স্কন্ধের উপর ঝক্‌ঝকে তাঁবার কলস রহিয়াছে। স্তনযুগলের একটিতে বক্ষের বসন ঝুলিয়া উঠিয়াছে;—অপরটি (প্রায়ই ডানদিক্‌কার) নগ্ন রহিয়াছে। এই সব তরুণীর তরুণ বক্ষোদেশ য়ুরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা একটু বেশি পরিপুষ্ট,—নিতম্বের তুলনায় একটু বেশি অতিরিক্ত;—কিন্তু উহার গঠন অনিন্দ্য-সুন্দর। বহু পুরাকাল হইতে হিন্দুরা তাহাদের প্রস্তর ও ধাতুময় মূর্ত্তিসকল যেরূপভাবে গঠন করে—উহাতে নারীসৌন্দর্য্যের উপকরণগুলি যেরূপ অতিরঞ্জিত করে—এই রমণীরাই সেই-সব প্রতিমূর্ত্তির জীবন্ত আদর্শ। পথিমধ্যে তাহাদের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদের নয়নকোণের চোরা-চাহনি তোমার দৃষ্টির উপর নিপতিত হয়;—তাহাদের সেই দৃষ্টি বড়ই মধুর, কিন্তু নিতান্ত উদাসীন—নিতান্ত অন্যধরণের;—যেন উহা কালো বিদ্যুতের অনিচ্ছাকৃত সোহাগ-আলিঙ্গন; কিন্তু পরক্ষণেই সেই দৃষ্টি আবার নিম্নদিকে নত হইয়া পড়ে। বিদেশী পথিকের নিকট এদেশের বৃহৎ মন্দির যেরূপ দুর্জ্ঞেয়, সমস্ত পদার্থই যেরূপ দুর্জ্ঞেয়—এই রমণীরাও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

সীমান্তদেশে পৌঁছান পর্য্যন্ত আমি কোচিনরাজের অতিথি হইয়া ছিলাম;—তিনি আমাকে যেখানে লইয়া গিয়াছেন, আমি সেইখানেই গিয়াছি। প্রভাতে ত্রিচূড় দিয়া যাত্রা করিবার সময়, তিনি কৃপা করিয়া সমস্তই পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আমার পথপ্রদর্শক, আমার আহার-সামগ্রী—সমস্তই প্রস্তুত ছিল। এমন কি, যে তিনঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, গ্রাম-জঙ্গল বনের মধ্য দিয়া, বয়েল-গাড়িতে আমায় "সোরনুরে" যাইতে হইবে—সেই গাড়িরও বন্দোবস্ত তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিদেশী পর্য্যটকেরা যেখানে কখনই যায় না,—সোরানুর ছাড়াইলেই—আহা! আমি সেই চিত্তবিমোহন ভারতখণ্ডের বাহিরে চলিয়া যাইব; মাদ্রাজ যাইবার জন্য, আবার সেই সাধারণ রেলপথ ধরিয়া ডাকগাড়ির ষ্টেশনে আমায় উঠিতে হইবে।*

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* পূর্ব্বসংখ্যার ভ্রমসংশোধন।
৩১১ পৃষ্ঠার শেষে যেখানে "ইহদিঘরের উপরে" আছে, সেই স্থলে "ইহুদিগির্জ্জার উপরে" হইবে।

স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়।

[স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও কাল্পনিক পদার্থ; নিম্নোক্ত কথাগুলি পড়িবার সময় বর্ত্তমান বাস্তবিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ-কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।]

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিম্নশিক্ষা (primary education) সম্পূর্ণভাবে গবর্মেণ্টের হাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহার সম্পর্কমাত্র নাই। মধ্যশিক্ষার সহিতও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সম্পর্ক নাই; কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা কোন্ বিষয়ে কতটুকু অভিজ্ঞতা থাকিলে কালেজে উচ্চশিক্ষালাভের অধিকার পাইবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই দেখেন। উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি ও বেসরকারি কালেজ আছে; উহাতে পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দেশ করিয়া ও পরীক্ষান্তে উপাধিপ্রদান দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগ্রহণের যন্ত্রমাত্র; শিক্ষাদান তাহার কাজ নহে। ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে পারেন, এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে মাত্র।

উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রতি বিশেষ কিছু নাই; সরকার কয়েকটি post-graduate research scholarship দিয়া থাকেন, আর প্রেমচাঁদবৃত্তি আছে; এতদ্দ্বারা কালেজছাড়ার পর কয়েকবৎসর যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাচর্চ্চা চলে মাত্র।

ফলে নিম্নশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। বাংলা পাঠশালায় নিম্নশিক্ষা পাইয়া যাহারা ইংরাজি-স্কুলে মধ্যশিক্ষার জন্য প্রবেশ করে, তাহাদিগকে নূতন করিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হয়। পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যা বড় কাজে লাগে না। কিছুদিন হইল, গবর্মেণ্ট নিম্নশিক্ষার সহিত মধ্যশিক্ষার মিশাইবার যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা সকলে গ্রহণ করে নাই; গ্রহণ করিলেও উহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। আবার মধ্যশিক্ষার উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকায় যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কালেজে প্রবেশ করে, তাহারা কালেজে প্রবেশের উপযুক্ত হয় না। ছাত্রেরা এফ্. এ. পরীক্ষাটা একরকমে উত্তীর্ণ হয়; কিন্তু বি. এ. পরীক্ষায় গিয়া ধরা পড়ে। শতকরা বিশজন উত্তীর্ণ হইলেই যথেষ্ট হয়।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য জীবিকার সংস্থান; কাজেই বি.-এ.-পরীক্ষান্তে এম্. এ. হইবার জন্য অধিক লোক অপেক্ষা করে না, বি. এ. পরীক্ষাতেই শিক্ষার সমাপ্তি হয়।

এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং, এই তিন ব্যবসায়শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থীর এস্থলে একমাত্র উদ্দেশ্য জীবিকাসংস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনধীন কতিপয় টেক্‌নিকাল্ স্কুল আছে;

সম্বলিত কৃষিকালেজ এখনও কাল্পনিক বস্তু।

অন্ত কোন ব্যবসায়শিক্ষার কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই।

অতএব বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ—

(১) নিম্নশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা পরস্পর অসম্বদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন; এতদ্দ্বারা শক্তির ও সময়ের অপচয় ঘটে।

(২) উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা নাই।

(৩) বিবিধ শিল্পবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক শিক্ষার আবশ্যকমত ব্যবস্থা নাই।

(৪) পাণ্ডিত্যলাভের জন্য অল্প লোকেই শিক্ষার্থী হয়; যাঁহারা পাণ্ডিত্যলাভের ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদেরও অর্জ্জিত বিদ্যা তেমন ফলপ্রসূ হয় না।

(৫) সমুদয় শিক্ষাপ্রণালী বিদেশের আমদানি; জাতীয়প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যের অভাবে শিক্ষা প্রায় ব্যর্থ হয়।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এই দোষগুলি পরিহারের চেষ্টা করিতে হইবে।

(১) নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) জীবিকার্থীর জন্য ও দেশের ধনাগমের জন্য শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষা যাহাতে জাতীয়প্রকৃতির অনুযায়ী হইয়া ফলপ্রসূ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এস্থলে শিক্ষার ফল অর্থে জ্ঞানচর্চ্চা, জ্ঞানবর্দ্ধন ও জ্ঞানপ্রচার।

নিম্নশিক্ষা ও মধ্যশিক্ষা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন ও মধ্য শিক্ষার জন্য নিজব্যয়ে একটি আদর্শস্কুল স্থাপন করিবেন, উহার নিম্নের শ্রেণীতে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চতর শ্রেণীতে মধ্যশিক্ষা প্রদত্ত হইবে। উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ রহিবে না। মোটামুটি পাঁচ হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই আদর্শস্কুলের পাঠ্যনির্দ্দেশ করিবেন ও শিক্ষকনিয়োগাদি দ্বারা স্কুলে আদর্শশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এই বিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয় বহন করিবেন।

সহর ও মফস্বলের যে সকল স্কুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে এই আদর্শবিদ্যালয়ের অনুসরণ করিবেন। এইরূপ স্কুল দেশ ছড়াইয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ আদর্শস্কুল পরিচালনায় অত্যধিক ব্যয়ের আশঙ্কা নাই। তবে সহর-মফস্বলের অন্যান্য স্কুলগুলি আদর্শানুরূপ চালিত হইতেছে কি না, তাহার পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে পরিদর্শকনিয়োগ আবশ্যক হইতে পারে। তাহাও ভবিষ্যতে।

এই সকল স্কুলে শিক্ষান্তে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কালেজে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

উচ্চশিক্ষা।

উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শকালেজস্থাপনের আবশ্যকতা এখন নাই। সহর-মফস্বলের বেসরকারি তৈয়ারি কালেজগুলির মধ্যে যদি কেহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা

স্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহারাই সম্প্রতি উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় কালেজ চালাইবার ব্যয়ভার হইতে আপাতত নিষ্কৃতি পাইবেন। পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ ও পরীক্ষাগ্রহণান্তে প্রশংসাপত্রদান ও আবশ্যকমত কালেজগুলির পরিদর্শন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্যমধ্যে থাকিবে। পরীক্ষার্থীদের প্রদত্ত ফী দ্বারা ব্যয়ের অধিকাংশ চলিতে পারে। এখানেও প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পরীক্ষাযন্ত্র হইবে মাত্র। কিন্তু এই বন্দোবস্ত এখন কিছুদিনের জন্য।

নিজ রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে পাঠ্যবিষয়নির্ব্বাচনে ছাত্রদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃষ্ট হইলে ও প্রবেশিকার standard উচ্চ থাকিলে এখনকার কালেজে চারিবৎসরের অধ্যয়নের ফল তিনবৎসরে পাওয়া যাইতে পারে। কালেজে অধ্যয়নসমাপ্তির পর যাঁহারা বাহির হইবেন, তাঁহাদের মর্য্যাদা বর্ত্তমান বি.-এ.-উপাধিধারীর অনুরূপ হইতে পারে। যদি কোন বেসরকারি কালেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে অবশ্য অনুরূপ বন্দোবস্তের দরকার হইবে।

অধিকাংশ ছাত্রই এই স্থলে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্যবসায় ও শিল্পশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারে অথবা গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যাঁহারা উচ্চতর শিক্ষা ও বিদ্যার্জ্জনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইবে না।

উচ্চতর শিক্ষা।

এই অল্পসংখ্যক জ্ঞানার্থী ছাত্রের জন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে ও তজ্জন্য যথোচিত ব্যয়ভারস্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সংখ্যায় অল্প হইলেও, এই সকল জ্ঞানার্থী ছাত্রই দেশের শিরোভূষণ হইয়া জাতীয়প্রকৃতিগঠনে ও জাতির উন্নতিবিধানে সমর্থ হইবেন।

ইঁহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যয়ে laboratory, museum, library সমন্বিত পাঠশালা স্থাপন আবশ্যক এবং সেইখানে স্বদেশী ও আবশ্যক হইলে বিদেশ হইতে আনীত জ্ঞানিসমাজে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে। ইঁহারা অধ্যাপনা করিবেন ও ছাত্রদিগের জ্ঞানার্জ্জনে ও নূতনসত্যাবিষ্কারে পথপ্রদর্শন ও সাহায্য করিবেন। অধ্যাপকেরা স্বয়ং জ্ঞানার্জ্জনে ও জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত থাকিবেন। এই পাঠাগারে শিক্ষার দুইটা স্তর হইতে পারে।

(১) প্রথম দুইবৎসর ছাত্রেরা অধ্যাপকের অধীন থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন। দুইবৎসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ইঁহাদের মর্য্যাদা বর্ত্তমান M.-A.-গণের অনুরূপ হইবে, কিন্তু শিক্ষার standard উচ্চতর হওয়া উচিত।

(২) যে কতিপয় ব্যক্তি জ্ঞানচর্চ্চায় জীবনযাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা অধ্যাপকগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া

জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা ও অবসর পাইবেন। তাঁহাদের জীবিকার জন্য যথোচিত বৃত্তি বা বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এক এক ব্যক্তি কেবল এক এক বিষয় লইয়া নিযুক্ত থাকিবেন। বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি ইঁহাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। এই পাঠাগারের ব্যবস্থা এরূপ হইবে, যাহাতে দেশে বর্ত্তমান টোল এবং মাদ্রাসা প্রভৃতির কৃতবিদ্য ছাত্রগণ বা অধ্যাপকগণও এখানে আসিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সুযোগ পাইতে পারেন।

ব্যাবহারিক শিক্ষা।

(১) দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত করা আবশ্যক। (২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সরকারি চাকরির বা সরকারি আদালতে ওকালতি প্রভৃতির আশা রাখিবেন না; অতএব তাঁহাদের জীবিকার সংস্থান আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যাই বেশী।

বৈষয়িক শিক্ষা।—জমিদারী বা মহাজনী কার্য্যের জন্য বৈষয়িক শিক্ষার প্রয়োজন। সম্প্রতি কর্ম্ম পাইবার ঐ একটা প্রধান পথ হইবে। ইহাতে আইনের জ্ঞান হইতে জরিপ-পরিমিতির জ্ঞান পর্য্যন্ত আবশ্যক। হিসাব-রাখা হইতে shorthand ও type-writing পর্য্যন্ত দরকার।

আইনশিক্ষা।—ওকালতির পথ রুদ্ধ; অতএব আইনশিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইবে না। তবে Jurisprudence ও law of the land যেটুকু ভাষা আবশ্যক, [illegible] liberal educationএর অঙ্গীভূত করিয়া সাধারণ-শিক্ষার মধ্যেই বেলা চলিবে।

চিকিৎসা।—বেসরকারি চিকিৎসা-বিদ্যালয় যাহা আছে বা স্থাপিত হইবে, সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে আনিয়া তদ্দ্বারা চালান যাইতে পারে।

অন্যান্য ব্যবসায়।—এস্থলে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া শিল্পাদি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য দুইটা কিংবা তিনটা স্তরনির্দ্দেশ আবশ্যক।

নিম্নস্তরে কৃষি ও দেশে প্রচলিত ব্যবসায়-গুলির (তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতির) উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। সহরে ও মফস্বলে ছোট ছোট স্কুল সাধারণের খরচে স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ কয়েকটি স্কুল এখনও বর্ত্তমান আছে।

উচ্চস্তরে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান (mechanics, physics, chemistry, political economy, geography) প্রভৃতির ভিত্তির উপর বিবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে। এস্থলেও বিদেশ হইতে আনীত অথবা বিদেশে শিক্ষিত শিক্ষক আবশ্যক। দেশে যে সকল শিল্প নাই, তাহার প্রবর্ত্তনা ও যাহা আছে, তাহার উন্নতি মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

অন্যান্য।

ব্যায়াম।—শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালীর উৎকর্ষসাধন করিলে ছাত্রদিগকে কেবল পুঁথির উপর সমস্ত সময় দিতে হইবে না, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থায় তাহারা যথেষ্ট অবসর

পাইবে। অল্পব্যয়ে সাধ্য দেশের উপযোগী ব্যায়ামচর্চার অবসর দেওয়া উচিত।

ধর্ম।—আনুষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য রাখা উচিত। ছাত্রদিগকে আপন ধর্মচর্চার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে।

নীতি।—পুঁথিদ্বারা নীতিশিক্ষা হয় না। গুরুশিষ্যের মধ্যে দেশের পুরাতন সম্বন্ধস্থাপন আবশ্যক। উহাই প্রশস্ত পথ। ছাত্রদিগকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকের অনুচরস্বে বা ভৃত্যস্বে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। পুঁথিতে স্বদেশের ও বিদেশের মহাপুরুষদের উন্নতচরিত্রের উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।

স্বদেশী ভাব।—বিদ্যারম্ভ হইতেই অল্পে অল্পে ছাত্রদিগকে সাধ্যমত স্বজাতিসেবায় নিযুক্ত করা আবশ্যক। সেবাকর্ম দ্বারা স্বদেশী ভাবে জাগ্রত করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য।

(১) নিম্ন ও মধ্যশিক্ষার জন্য আদর্শবিদ্যালয় স্থাপনা ও পরিচালনা। ঐ আদর্শে পরিচালিত সহরের ও মফস্বলের অন্যান্য স্কুলের পরিদর্শনের ব্যবস্থা। এই কার্য্যের জন্য ব্যয় আবশ্যক।

(২) উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শকালেজস্থাপনা সম্প্রতি আবশ্যক নাই। যে সকল বেসরকারি কালেজ ইচ্ছাপূর্ব্বক বা কোন কারণে বাধ্য হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করিবেন, তাঁহারাই উচ্চশিক্ষার ভার লইতে পারেন। তাঁহাদের জন্য পাঠ্যনির্দ্দেশ ও পরীক্ষাগ্রহণাদির ব্যবস্থা করিতে অল্পই ব্যয় হইবে।

যদি কোন বেসরকারি কালেজ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছাড়িয়া না আসিতে চাহেন, তাহা হইলেও সম্প্রতি কালেজস্থাপনের আবশ্যকতা দেখি না। তবে যদি অধিক ছাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও ছাত্রদত্ত বেতনে কালেজের ব্যয়নির্ব্বাহের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কালেজপ্রতিষ্ঠা বিবেচনাধীন হইবে। স্বদেশী স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থাসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। উহাদের কিয়দংশ technical school বা collegeএ যাইবে। অপর অংশ বেসরকারি কালেজে ex-student রূপে ভর্ত্তি হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে। তাহাদের স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে মাত্র।

(৩) উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠাগার ও তৎসংসৃষ্ট library, laboratory, museum প্রভৃতির স্থাপনা। তজ্জন্য অধ্যাপকনিয়োগ ও জ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা। এই কর্ম বহুব্যয়সাধ্য। আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ক্রমশ অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যমধ্যে রাখিতে হইবে।

(৪) নিম্ন ও উচ্চ স্তরের ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা। ইহার জন্যও প্রচুর ব্যয় আবশ্যক। এখানেও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব (১), (৩) ও (৪) এর জন্য আপাতত ব্যয় আবশ্যক। যেরূপ অর্থসংগ্রহের আশা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে

এই তিন কার্য্যই আরম্ভ করা যাইতে পারে।

শেষ কথা।

সম্প্রতি তিনটা বৃহৎ ব্যাপার আমরা হাতে লইয়াছি। (১) শিল্পশিক্ষা ও শিল্পের উন্নতির জন্য National Fund; (২) Federation Hall; (৩) National University। তিনটা বৃহৎ কার্য্য এক বৃহত্তর কার্য্যের অঙ্গ করিয়া লইতে পারিলে ব্যয়সংক্ষেপ ও শক্তির অপচয়নাশ ঘটিতে পারে।

National Fundএর সংগৃহীত অর্থ জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যাবহারিক শিল্পশিক্ষার জন্য ব্যয়ে বাধা দেখি না। উভয় Fundএর কর্তৃপক্ষ পরামর্শ করিয়া ঐকমত্যে উপস্থিত হইতে পারেন।

Liberal ও technical শিক্ষার জন্য যে পাঠাগার, library, museum, laboratory, workshop প্রভৃতি হইবে, তাহা Federation Hallএর কিয়দংশে স্থান পাইতে পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণ আবশ্যক না হইতেও পারে।

এই তিন কাজকে এক কাজের অঙ্গ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

দান।

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—
চাই নি সাহস করে'—
সন্ধেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে—
আমি চাই নি সাহস করে'।
ভেবেছিলাম সকাল হ'লে
যখন পারে যাবে চলে'
ছিন্নমালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে'।
তাই আমি কাঙালের মত
এসেছিলেম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস করে'।

এ ত মালা নয়গো, এ যে
তোমার তরবারি।

জ্বলে' ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি !
তরুণ আলো জান্‌লা বেয়ে
পড়্‌ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে
"কি পেলি তুই নারি ?"
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি !

তাই ত আমি ভাবি বসে'
এ কি তোমার দান !
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান !
ওগো এ কি তোমার দান !
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে ?
রাখ্‌তে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ !

তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান !

আজকে হ'তে জগৎমাঝে
ছাড়্‌ব আমি ভয়,
আজ হ'তে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয় !
মরণকে মোর দোসর করে'
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে'
রাখ্‌ব পরাণময় !

তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধনক্ষয়।
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি'
করব না আর সাজ—
নাই বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ!
আমি করবনা আর সাজ।
ধূলোয় বসে' তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে
মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ
আমি করব না আর সাজ।

দীনবন্ধু মিত্র।

খৃঃ ১৮৬১ সনের জুলাইমাসে আমি হেয়ার-স্কুলের পঞ্চমশ্রেণীতে পড়িতাম। তখন স্কুলের নাম ছিল "কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল", কিন্তু সাধারণত লোকে মানবহিতৈষী ডেভিড হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাকে "হেয়ারস্কুল" বলিত। সার্ জন্ লরেন্স ১৮৬৭ সনে স্কুল দেখিতে আসেন এবং স্কুলের শিক্ষকগণের অনুরোধে তিনি "কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল" নামের পরিবর্ত্তে "হেয়ারস্কুল" নাম দিবার আদেশ দেন। ১৮৬৭ সন হইতে সরকারী কাগজপত্রেও স্কুলের নাম "হেয়ারস্কুল" হইয়াছে। শুনিয়াছি, দীনবন্ধুবাবু হেয়ারস্কুলে ইংরাজি-শিক্ষা আরম্ভ করেন। দীনবন্ধুবাবু ১৮৩০ সনে শুভক্ষণে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৫৫ সনে হিন্দুকলেজে পাঠসমাপনান্তে চাকুরী গ্রহণ করেন। আমি তাঁহার অপেক্ষা ১৮ বৎসরের ছোট; আমি ১৮৫৭ সনে হেয়ারস্কুলে ইংরাজিপাঠ আরম্ভ করি। তখন দীনবন্ধুবাবুর প্রতিষ্ঠার সাধারণত্বের কোন চিহ্ন দৃশ্যমান হয় নাই; তাঁহাকে প্রথমশিক্ষা দিয়া হেয়ারস্কুলের যে গৌরব, তাহা তখনও জাজ্বল্যমান হওয়ার সময় আইসে নাই। ১৮৬১ সনে প্রথম সকলে

জানিতে পারিল যে, দীনবন্ধু হেয়ারস্কুলের গৌরবের এক অদ্বিতীয় মূল,—তিনি হেয়ার-স্কুলের শিক্ষিতছাত্রমধ্যে একটি অমূল্য রত্ন; ১৮৬১ সনেই আমরা শুনিলাম যে, "নীলদর্পণের" রচয়িতা দীনবন্ধু। কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের বিচারে লংসাহেবের এক-হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস কারাবাস নীলদর্পণপ্রচার ও নীলকরদিগের অত্যাচারের বিবরণ সর্ব্বসাধারণের নিকট জ্ঞাপনের কারণীভূত হইল। আমি তখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতাম, রাজনৈতিক বা আইন আদালত-সম্বন্ধীয় বিষয়ের ধার ধারিতাম না। স্কুলের পাঠ্য পড়িতাম ও খেলাধুলা করিতাম; কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি দুই-চারিখানি বাঙ্গলাপুস্তকই তখন আমাদের বাহিরের পড়ার বাঙ্গলাপুস্তক ছিল। তখন আমাদের পাঠ্য অন্য কোন বাঙ্গলা-পুস্তক—নাটক বা উপন্যাস—ছিল না বলিতে পারা যায়। অন্তত আমি তখনও মদন-মোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক পড়ি নাই। কাদম্বরী ও রাসেলাসের ভাষার গুরুত্ব আমাদের পাঠের প্রতিবন্ধক ছিল। বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চ-বিংশতি ও শকুন্তলা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সীতার বনবাস তখনও প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়কুমারের ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার অনায়াসপাঠ্য ছিল না। তখন মধুসূদনও যশোমার্গে পদার্পণ করেন নাই। পাঁচালী শুনিয়াই দাশরথি রায়ের ও ঈশ্বর গুপ্তের গুণাবলীর যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইতাম। আজকালের মত "স্বদেশী" ও "বিদেশী" কোন কথারই সহিত আমরা তখন সংসৃষ্ট থাকিতাম না। কিন্তু তখন নীলদর্পণ ও লংসাহেবের বিচারের কথা শুনা বালকগণেরও অপরিহার্য্য ছিল। নীলদর্পণ ও তাহার প্রণেতার উপর সহজেই আমার শ্রদ্ধা হইল। বিশেষত দীনবন্ধু ও আমরা বাঙালী, দীনবন্ধু আমাদের স্বজাতি স্বশ্রেণীর এবং দীনবন্ধু ও আমরা কালিদাস মিত্রের সন্তান। আবার তিনি ও আমাদের পরিবারস্থ অনেকেই হেয়ারস্কুলের ছাত্র। ১৮৬১ সনে দীনবন্ধু আমাদের শ্লাঘার পাত্র হইলেন।

তখন অনেকেই খবরের কাগজ পড়িত না; আমাদের মত বালকদের ত কথাই নাই। বস্তুত পড়িবার মত বাঙ্গলা খবরের কাগজও ছিল না। হরিশের প্রসিদ্ধ Hindu Patriot ইংরাজিতে; আমরা পড়িতে পারিতাম না। তখন প্রতি ঘটনায় বটতলা হইতে ছড়ার পুস্তকও প্রকাশিত হইত না। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহগান দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, শান্তিপুরে ধুতীর পাড়েও উঠিয়াছিল। কিন্তু বিধবার বিবাহ লইয়া দেশ তোলপাড় হইয়া-ছিল; তাহাই তাঁহার দেশপ্রসিদ্ধির প্রধান কারণ; বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয় ও উপক্রমণিকা ব্যাকরণ দ্বিতীয় কারণ। নীলদর্পণের ও লংসাহেবের বিচারের কথা প্রচারের কারণ কমই ছিল। তাহাতে আবার আমরা বালক ছিলাম। "প্রভাকরের" অনেকাংশ ও "রসরাজ" ও "পরিদর্শন" বালকদের অপাঠ্য ছিল। বয়স্কদের নিকট অনেক কথা শুনা যাইত। লংসাহেবের

বিচার বা অবিচার, ওয়েলসসাহেবের দুর্নাম, তাঁহার বিরুদ্ধে শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে মহাসভা, মহাভারতের অনুবাদপ্রকাশদ্বারা চিরস্মরণীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের লংসাহেবের জরিমানার ১০০০৲ টাকা দেওয়া, এই সকল কথা লইয়া সহরে হুলুস্থুল পড়িয়াছিল। আমি বালক হইলেও অনেক কথা শুনিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে "নীলদর্পণ" পড়িবার আমার অত্যন্ত সাধ হইল। ধার করিয়া লইয়া "নীলদর্পণ" পড়িলাম। আমারও নীলকরদের উপর ঘৃণার আধিক্য ও গ্রন্থকারের উপর সমধিক শ্রদ্ধা জন্মিল।

১৮৬১ সনের নীলদর্পণবিষয়ক বৃত্তান্ত আমাদের জানিবার আর একটি মূল—"ধীরাজ।" ধীরাজ রসাল হাস্যোদ্দীপক গান বাঁধিয়া ভদ্রমণ্ডলীমাত্রেই গাইতে লাগিলেন। আমাদের মত বালকদের সে গান শুনিবার বাধা ছিল না; আমি অনেকবার সেই গান শুনিয়াছিলাম। তখন তাঁহার গান মুখস্থ হইয়াছিল, কারণ কবিত্ব থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার গানে হাস্য ও করুণ রস উদ্দীপনের অনেক কথা ছিল। কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গিয়াছি, অনেকেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন; গানগুলি ছাপা আছে কি না, জানি না। ধীরাজের গানের "কুইন্ রুইন্ হ'ল তোমার সোনার ইণ্ডিয়া" এই একছত্রমাত্র এখন মনে আছে। আমি গান গাহিতে পারি না, গানও মনে থাকে না।

১৮৬১ সনে আগ্রহের সহিত "নীলদর্পণ" পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমি নীলদর্পণের রসাস্বাদন করিতে পারিয়াছিলাম মনে হয় না। স্থানে স্থানে খুব হাসিয়াছিলাম, কাঁদিয়াছিলাম ও ক্রোধে আলোড়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িতে ভাললাগা ও প্রকৃত রসাস্বাদন দুইটি পৃথক্ পদার্থ। এ কথা সত্য, গ্রন্থের কোন একটি গুণ না থাকিলে তাহা মানবহৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল সুন্দর গল্প একটি সামান্য পদার্থ; রসের পরিপুষ্টি পৃথক্ পদার্থ। আমার এখন বিশ্বাস যে, প্রথম যখন নীলদর্পণ পড়ি, তখন কেবল গল্পদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম,—তখন কেবল রোষ, হাস্য ও করুণার উদ্রেক হইয়াছিল। নীলদর্পণের প্রকৃত রস প্রায় পনর-বৎসর পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিয়া আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু "পারিয়াছিলাম" বলাও অহঙ্কারের কথা। অনেক-সময়ে আমরা মনে করি যে, কবির কবিত্বে প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা পারি নাই। কলেজে মিল্টন্, শেক্সপীয়ার প্রভৃতি পড়িয়াছিলাম। এখনও সময়ে সময়ে পড়ি। সেকালের ও একালের পড়াতে অনেক প্রভেদ। এখনকার শকুন্তলা ও তখনকার শকুন্তলা যেন দুইটি পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, ১৮৬১ সন হইতে দীনবন্ধুর গ্রন্থ পড়িবার ইচ্ছা প্রবল হইল এবং ক্রমান্বয়ে "নবীন তপস্বিনী", "বিয়েপাগলা বুড়ো" এবং "সধবার একাদশী" পড়িলাম। "সধবার একাদশী" আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাহাতে কি দোষ আছে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, আর কখন বিচারচক্ষে দোষ দেখিবার নিমিত্ত আয়াসও করি নাই। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, তাহাতে

গুণ অনেক, দোষও অনেক। "সধবার একাদশী" তাৎকালিক "ইয়ং বেঙ্গলের" চিত্র। চিত্রটি অতিরঞ্জিত হইতে পারে; কবির হস্তে কেনই বা অতিরঞ্জিত হইবে না? কিন্তু দোষ যতই থাকুক না কেন, "সধবার একাদশী"কে আমি কখন দূষণীয় গ্রন্থ মনে করি নাই। "সধবার একাদশী"র অনেক কথা মনে হইলে এখনও আমার খুব হাসি পায়। যখন "লীলাবতী" প্রকাশিত হয়, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম; তখন উহা পড়িতে পারি নাই, অনেক পরে পড়িয়াছিলাম; বেশ ভালও লাগিয়াছিল।

১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারিমাসে সরস্বতী-পূজার রাত্রে কলিকাতার শ্যামবাজারে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি "সধবার একাদশী"র অভিনয় প্রথম দেখি। সেই দিন আমাদের এম্. এ. পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। প্রথমত বি. এ., তাহার পরমাসেই এম্. এ. পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ক্রমাগত কয়েকমাস পরিশ্রম করায়, সরস্বতী-পূজার দিনও কলম বন্ধ হওয়ার কারণ-সত্ত্বেও "ইউস্ এণ্ড অ্যাবিউস্ অফ্ সেটায়র" (Use and abuse of satire) বিষয়ক প্রবন্ধে বাট্‌লারের হুডিব্রাস্ (Hudibras), ড্রাইডনের The Hind and the Panther, Absalom and Achitophel প্রভৃতির, পোপের Dunciad, বাইরনের English Bards and Scotch Reviewers, এবং লাটিন কবি হরেস ও জুভিনেলের অমূল্য কবিতাসমূহে মাথামুণ্ড লিখিয়া দিনপাতান্তে রাত্রিকালে নিদ্রার খুব প্রয়োজন। কিন্তু দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী"র অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা নিদ্রা অপেক্ষা অনেক প্রবল হইয়াছিল। দিনের বেলায় যে রস আমাকে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবৃত করিয়াছিল, তাহা নিদ্রাদেবীকেও তাড়াইয়া দিল। বিদ্রূপের (Satire) বশীভূত হইয়া আমি সমাজ-বিষয়ক হাস্যোদ্দীপক নাটকের অভিনয় দেখিতে চলিলাম। নিদ্রাদেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়া আমি রামবাবুর বাটীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বাঙ্‌লার নব্যধরণের নাটকের সৃষ্টি-কর্ত্তা; সেদিন কবিবর "গিরিশ" স্বয়ং—নিমচাঁদ। "সধবার একাদশী" পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষত "নিমচাঁদের" অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম।

বয়োবৃদ্ধিবশত ক্রমশ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখন ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল; অভিনয়ের নৈপুণ্যজন্য গিরিশের উপরও বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। গিরিশবাবুর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ আমার সহাধ্যায়ী ও চির-বন্ধু, সুতরাং অনতিপরেই আমি গিরিশবাবুর সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার শ্রদ্ধেয় পরমবন্ধু। কিন্তু বিশেষ আগ্রহসত্ত্বেও দীনবন্ধুর সহিত আলাপ-পরিচয়ে কিছু বিলম্ব হইল।

দুইতিনমাস পরেই যোড়াবাজারের

রাজবাটীতে কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেবের বৈঠকখানায় আমার সু-অদৃষ্টবশত দীনবন্ধুর দর্শন পাইলাম। নীলদর্পণ ও সধবার একাদশীর রচয়িতাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সহিত কথাবার্তার জন্য যে মহান্ আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা সেই দিন তৃপ্ত হইল। তাঁহার পরিচিত হইলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য মনে করিলাম; কিন্তু দীনবন্ধুর কথা-বার্তায়, অমায়িকতা ও সরলতায়, বিশেষত বাক্‌পটুতায় ও রসিকতায় আমি এরূপ আকৃষ্ট হইলাম যে, বয়স্ ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে পার্থক্যসত্ত্বেও আমি তদবধি অনেক সময়ই তাঁহার নিকট থাকিতাম। স্কুলে ও কলেজে শিক্ষকদিগের আদেশে কবিতা লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সংস্কৃতপরীক্ষায় অনুষ্টুপ্‌ছন্দ রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তদতিরিক্ত কখন কবিতা লিখি নাই, নাটকের কথা দূরে থাকুক। কবিত্বশিক্ষার জন্য নহে, কেবল কবির প্রতি শ্রদ্ধার জন্য ও দীনবন্ধুবাবুর অসীম আকর্ষণশক্তির প্রভাবে আমি তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতে লাগিলাম। প্রায়ই সন্ধ্যার পর কুমার ব্রজেন্দ্র-নারায়ণের বৈঠকখানায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং আমিও অন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইতাম। আমাদের ন্যায় ছাত্রদের তথায় যাওয়ার অনেক প্রতিবন্ধক ছিল; এমন কি, দীনবন্ধুবাবু এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কুমার ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ স্বয়ং আমাকে সময়ে সময়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। কিন্তু সে সকল বিঘ্ন বিঘ্ন বলিয়া মনে করিতাম না। তখন দীনবন্ধুবাবু কলিকাতার মুপারনিউমররি ইন্‌স্‌পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার। বহুবাজিপাড়ায় তখন তাঁহার বাসা এবং সময়ে সময়ে প্রাতঃকালে আমি তাঁহার বাসায় যাইতাম। এই সময়ে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

দীনবন্ধুবাবু আমাকে কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা জানি না, জানিবার ইচ্ছাও হয় নাই, বিশেষ অবকাশ ও হয় নাই। তাদৃশ ব্যক্তির ভালবাসা প্রার্থনীয় হইলেও, আমার এমন কোন গুণ ছিল না যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন। আমি তাঁহার পরিচয়প্রার্থী ছিলাম। যখন আমাকে তিনি সুরধুনীকাব্যের প্রুফ্‌ শীট্ দেখিতে দিলেন, তখন আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। সুরধুনীকাব্যের প্রথমভাগের প্রুফ্‌শীট্ আমি একবার আদ্যোপান্ত দেখিয়াছিলাম। কাব্যে কবির কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে এবং অনেকস্থলের বর্ণনা জীবন্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রুফ্‌-শীট্ দেখিবার সময় কাব্য আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং," সুরধুনীকাব্যে কাব্যের এই লক্ষণের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এরূপ কাব্যে মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ থাকিতে পারে না, দীনবন্ধুবাবু মহাকাব্যও লিখিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই কাব্যে রসাত্মক বর্ণনার কিছুই অভাব দেখিতে পাই না।

১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারিমাসে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্টশিপ্ পরীক্ষার পর দীনবন্ধুবাবুর সহিত মিশিবার আমার অবকাশ বাড়িল। আমাদের দেশের তখন নিয়ম ছিল যে, কি স্কুলে কি কলেজে, যতদিন পঠদ্দশা, ততদিন আমরা বালক। আমি

১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারিমাসে বালকত্ব হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং দীনবন্ধুবাবুও বোধ হয় আমাকে ভিন্নভাবে দেখিতে লাগিলেন। তিনি লুসাইযুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলে এবং আমারও অবকাশবৃদ্ধি হইলে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি পাইল। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার বরাহনগরের বাসায় যাইতাম। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ, হাস্যোদ্দীপক সরস কথা কেহই ভুলিতে পারে না, আমিও কখন ভুলিব না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তাঁহার কথা কিছুই লিখিয়া রাখি নাই; তখন মনে করি নাই যে, ভবিষ্যতে দীনবন্ধু-বাবুর কোন কথা আমি লিখিব। বোধ হয় লিখিয়া রাখার উপকারিতাও তখন বুঝি নাই। বস্ওয়েল্ জন্‌সনের অনেক কথাই লিখিয়া রাখিয়া পরে প্রকাশ করায় জগতে একটি সুপাঠ্য জীবনী প্রকাশ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু আমাদের দেশে সে রীতি নাই। বিদ্যাসাগরমহাশয়েরও কথা লিখিয়া রাখিব অনেকবার মনে করিয়াও লিখিয়া রাখি নাই। এখন সেই অপরাধের জন্য অনেকসময় আত্মগ্লানি হয়। যাঁহাদের "সদসি বাক্‌পটুতা" অসামান্য, যাঁহাদের কথা শুনিতে শুনিতে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যাইতে হয়, তাঁহাদের কথা সংগ্রহ করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি সাহিত্যজগতের পরম হিতকারী। আমি অবকাশ পাইয়াও সাহিত্যজগতের সে উপকার করিতে পারিলাম না।

সুরধুনীকাব্যের দ্বিতীয়ভাগ হস্ত-লেখায় ১৮৭২ কি ১৮৭৩ সনে দেখি। দীনবন্ধুবাবু সপ্তমসর্গটি আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে বলেন। আমি উহার প্রুফ্‌শীট্ দেখিয়াছিলাম কি না স্মরণ নাই, কিন্তু সপ্তম-সর্গের আলোচিত বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আমি সেই সময়ে বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিতেছিলাম। দীনবন্ধুবাবু তাহা জানিতেন, তিনি আমাকে সঙ্কলনবিষয়ে সময়ে সময়ে উপদেশ দিতেন এবং তজ্জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমাকে সপ্তমসর্গ ভাল করিয়া দেখিতে বলেন। বিদ্যাপতি বাঙ্গালার একজন আদিকবি বলিয়া সকলের তৎকালে সংস্কার ছিল, আমারও তখন সেই সংস্কার ছিল। পাঁচছয়বৎসর পরে রাজকৃষ্ণবাবুর গবেষণায় জানা যায় যে, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি। সুতরাং ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সনে বিদ্যাপতির পদের সঙ্কলনকর্ত্তার নবদ্বীপের সংসৃষ্টতা দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। নবদ্বীপচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া ও তাঁহার সময়ের নবদ্বীপে স্মৃতি ও দর্শনের প্রভাব আতিশয্য বলিয়া বাঙালীমাত্রেই নবদ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দীনবন্ধুবাবুও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমিও আকৃষ্ট হইয়া-ছিলাম।

আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, দুইতিন-বৎসর হইতে দীনবন্ধুবাবু বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের জুন-মাসে আমি প্রথম শুনি যে, এই ভয়ানক রোগে তিনি আক্রান্ত। কিন্তু তিনি রোগের ভয়ে কাব্যরচনা ত্যাগ করেন নাই। পীড়া গুরুভাব অবলম্বন করিলেও তাঁহার রসনা ও হস্ত কাব্যরস বিকীর্ণ করিতে ছাড়ে নাই। বাঙ্গালার দুরদৃষ্টবশত ৪৩বৎসর বয়সে দীনবন্ধু

এ জীবন ত্যাগ করিলেন। আমি তখন বিজ্ঞাপতিসঙ্কলনে ব্যাপৃত। সে কার্য্যে আমি তাঁহার অভাব সর্ব্বদাই দেখিতে পাইলাম।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

রামায়ণের রচনাকাল।

শব্দার্থবিচার।

"ভাবাব্ধিঃ কাতিগম্ভীরঃ কাহং মন্দমতিস্ততঃ।
হাস্যতামুপহাস্যত্বং যাস্যামি পিশুনাত্মনাম্॥"

মহাভারত পাঠ করিবার সময়ে শব্দার্থ-বিচারপদ্ধতির আলোচনা না করিয়া, পাঠকবর্গ অনেকস্থলে "ব্যাসকূট"নামক রচনাকাঠিন্যের কল্পনা করিয়া থাকেন। রামায়ণেও সেরূপ রচনাকাঠিন্যের অভাব নাই। এক রচনাযুগের গ্রন্থ অন্য রচনাযুগে নানা রচনাকাঠিন্যের পরিচয় প্রদান করে। শব্দার্থবিচারপদ্ধতির অভাবে নিতান্ত সরল রচনাও কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয়। রামায়ণ কোন্ পুরাতন সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, তাহার আর একটি প্রমাণের অবতারণা করিয়া, শব্দার্থবিচারে হস্তক্ষেপ করিব।

সীতাহরণের পূর্ব্বে, মারীচের সাহচর্য্য-লাভের আশায়, রাবণ মারীচের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। মারীচ তৎকালে স্বজাতি-সুলভ হিংস্রস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তশুদ্ধিলাভার্থ তপশ্চরণে নিযুক্ত ছিলেন। রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসোচিত অসাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃপুন প্রবৃত্তিদান করিলে, মারীচ তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রই মারীচের সন্ন্যাসগ্রহণের একমাত্র কারণ; তিনি তাড়কাবধের সময়ে মারীচকে (নিদারুণ তাড়না করেন, তাহাতে অতিমা[ত্র] সন্ত্রস্ত হইয়াই মারীচ চরিত্রসংশোধনে প্রবৃ[ত্ত] হইয়াছিলেন। তিনি যে রামভয়ে কতদূ[র] ভীত, তাহা বুঝাইবার জন্য রাবণকে বলিয়াছিলেন—

"রকারাদীনি নামানি রামত্রস্তস্য রাবণ।
রত্নানি চ রথাশ্চৈব সন্ত্রাসং জনয়ন্তি মে॥"৩।৩৯।১

'হে রাবণ! অধিক আর কি বলিব? আমি এতদূর রামত্রস্ত যে, যাহাতে র-বর্ণের সংস্রব আছে, এমন শব্দের উচ্চারণেও সন্ত্রা[স] উপস্থিত হয়। রত্ন এবং রথ ঐশ্বর্য্যবিজ্ঞাপক হইলেও, আমার পক্ষে সন্ত্রাসোৎপাদক!'

এই শ্লোকের "র-কারাদীনি"শব্দ রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের একটি উৎকৃ[ষ্ট] প্রমাণ। সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণের উত্ত[র] "কার"-প্রত্যয় কল্পনা করিয়া, অ-কার, ক-কার ইত্যাদি শব্দগঠনের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। সকল বর্ণেই কার-[illegible] সংযুক্ত হইত। কাত্যায়নের [illegible] পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়,—[illegible] র-বর্ণে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কাত্যায়ন এম

বার্ত্তিকের অবতারণা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

"বর্ণাৎ কারঃ। রাৎ ইফঃ।"

সকল বর্ণেই "কার"-প্রত্যয় সংযুক্ত হইয়া থাকে; কেবল র-বর্ণে হয় না। র-বর্ণে "ইফ"-প্রত্যয় সংযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে "র-কার" না বলিয়া, "রেফ" বলিতে হয়।* উত্তরকালের সংস্কৃতসাহিত্যে রেফশব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে; র-কারের ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেহ তাহার ব্যবহার করেন নাই। পতঞ্জলির "ব্যাকরণমহাভাষ্যে" বহুবার র-কার বলিবার প্রয়োজন ছিল; তিনি একবারও র-কারশব্দের ব্যবহার করেন নাই; সকল স্থলেই রেফ-শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। † রামায়ণের "রকারাদীনি"-শব্দের ব্যবহার রামায়ণের অতি প্রাচীনত্বই সূচিত করিতেছে;—তাহা যে কাত্যায়নের বহুপূর্ব্বকালবর্ত্তী পুরাতন গ্রন্থ, তাহারই পরিচয় প্রকাশিত করিতেছে। শব্দার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

"উপকৃত্যং যজেত্তম অভিষেকার্থমুত্তমম্।
সর্ব্বং নিবর্ত্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ম্।" ২,২০,৪

এই শ্লোক রামায়ণের রচনাকাঠিন্যের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। "কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ং" বলিলে কিরূপ কার্য্য সূচিত হইয়াছে, তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। নিরব্যয়-শব্দের অর্থ কি? দুইটি নিষেধাত্মক উপসর্গই বা যুগপৎ ব্যবহৃত হইয়াছে কেন? সংস্কৃতসাহিত্যে এরূপ রচনারীতির অধিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণের টীকাকারগণ এই রচনাকাঠিন্যের টীকা করেন নাই; নিরব্যয়শব্দেরও ব্যাখ্যা করেন নাই। শব্দের অর্থ কালক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান না করিলে, ইহাকে রচনাকাঠিন্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা "ব্যয়" নহে, তাহার নাম "অব্যয়।" যাহা "অব্যয়" নহে, তাহারই নাম "নিরব্যয়।" সুতরাং "ব্যয়" এবং "নিরব্যয়" একই অর্থ সূচিত করিতেছে। তথাপি "ব্যয়" না বলিয়া, "নিরব্যয়" বলিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আছে। "ব্যয়" বলিলে যাহা বুঝায়, "নিরব্যয়" বলিলে তাহা অপেক্ষা অধিক ভাব ব্যক্ত হয়। দুইটি নিষেধাত্মক উপসর্গের ব্যবহারে একটি ভাবাত্মক অর্থ ব্যক্ত করা রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা!

সংস্কৃত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যে ব্যয় এবং অপব্যয় নামক দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে,—একটির অর্থ অপরটির বিপরীত! যাহা ব্যয় নহে, তাহারই নাম অপব্যয়। সঙ্গত কার্য্যে ব্যয়ের নাম ব্যয়; অসঙ্গত কার্য্যে ব্যয়ের নাম অপব্যয়। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের নাম ব্যয়; তাহার বাহুল্যের নাম অপব্যয়। এক্ষণে এইরূপ অর্থই সর্ব্বত্র সুপরিচিত। অমরকোষে "অর্থস্ত্যাপগমে ব্যয়ঃ" এই সংক্ষিপ্ত অর্থই উল্লিখিত।

---

* পাণিনিসূত্রে র-পর, ব-পর ইত্যাদি শব্দে রকার পর, বকার পর ইত্যাদি ব্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে কার-প্রত্যয় কল্পিত হইয়াছিল কি না, পাণিনিসূত্রে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু কাত্যায়ন বার্ত্তিক করায় সন্দেহ উপস্থিত হয়। ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়াই, বার্ত্তিক সংযুক্ত হইয়া থাকিবে।

† রেফস্য... পরোপাদেশোঽনুনাসিকদ্বির্বচনপরসবর্ণপ্রতিষেধঃ। ইতিঃমহাভাষ্যম্।

তদনুসারে অর্থের সর্ব্বপ্রকার "অপগমকেই" ব্যয় বলা যাইতে পারে ;— যে বিষয়ে ব্যয় করিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। কিন্তু অর্থের সর্ব্বপ্রকার "অপগমকেই" কি ব্যয় বলা যাইতে পারে ? তাহাই কি আর্য্যসমাজের মত ও বিশ্বাসের উৎকর্ষবিজ্ঞাপক ? ইহাই কি ব্যয়শব্দের চিরপরিচিত অর্থ ?

"কাত্যায়ন বলেন, তাহা নহে। কেবল "ধর্ম্মার্থে বিনিয়োগের" নামই ব্যয় ; আর সর্ব্বপ্রকারের "অর্থাপগমের" নাম অপব্যয় !* গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থব্যয় করাও ব্যয় নহে ; তাহারও নাম অপব্যয়। রামায়ণে এই পুরাতন অর্থেই ব্যয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামবনবাসের কথা ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, লক্ষ্মণ অভিষেকানন্দে নিমগ্ন হইয়া, বিবিধ মাঙ্গলিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। সেদিন রামানুরক্ত ভক্ত ভ্রাতার বড় আনন্দের দিন ;—আকাশে আনন্দ-কিরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ; নগরতোরণে আনন্দবাদিত্র বাদিত হইয়া উঠিয়াছে ;— নাগরিকগণের হর্ষোৎফুল্ল বদনমণ্ডলে আনন্দের হাস্যচ্ছটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ;— তাহাতে লক্ষ্মণের আনন্দই যেন বন্যাস্রোতের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত ! এই আনন্দ শিশিরশোভার ন্যায় দেখিতে না দেখিতে বিলীন হইয়া গেল ! রামচন্দ্র যখন পিতার নিকট হইতে কৌশল্যার নিকটে গমন করেন, তখন ক্রোধে লক্ষ্মণের বাক্‌স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল ;—লোচনযুগল বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—তিনি কেবল অভ্যাসবশেই নীরবে রামচন্দ্রের অনুগমন করিলেন। রামচন্দ্র তখনও সেই রামচন্দ্র,— আর্য্যসমাজের আদর্শপুত্র,—শান্ত, সুধীর, সুশীল বালকের ন্যায় অভিষেচনভাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া, বিপ্রগণকে প্রণাম করিয়া, বালক-বৃদ্ধ ও পুররক্ষিগণকে সস্মিতবদনে সুমিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করিতে করিতে, ধীরপদবিক্ষেপে মাতৃভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যামন্দিরে উপনীত হইবার পর, কৌশল্যার আর্ত্তনাদ লক্ষ্মণকে সহসা মুখর করিয়া তুলিল। সময়োচিত উত্তেজনায় আগ্নেয়গিরির গলিত গৈরিকপ্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ! লক্ষ্মণ বুঝিলেন—এ সংসারে মৃদুস্বভাব লোকেরাই পদে পদে পরাভূত হইয়া থাকে ;—"মৃদুর্হি পরিভূয়তে"! এই চিত্তদুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য লক্ষ্মণ কত কথা বলিলেন ; তাহার সকল কথা উল্লেখযোগ্য নহে ! সময়োচিত বলিয়াই, সে সকল কথা কাব্যমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণকে শান্ত করিতে বিলক্ষণ আয়াস স্বীকার করিতে হইল, তাঁহাকে নানা কথায় আশ্বস্ত করিয়া, বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত করিবার আশায়, রাম কহিলেন,—অভিষেকার্থ যে

* ব্যয়ো ধর্ম্মাদিষু বিনিয়োগঃ ।১।৩।৩৬

ব্যয়শব্দে যে পুরাকালে অর্থের সর্ব্বপ্রকার অপগম সূচিত হইত না, কেবল "ধর্ম্মাদিষু বিনিয়োগঃ" বুঝাইত, তাহা প্রসঙ্গক্রমে কাত্যায়নকর্ত্তৃক উল্লিখিত না হইলে, রামায়ণোক্ত নিরব্যয়শব্দের প্রকৃতঅর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইত। রামায়ণের কোন টীকাকারই এই শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই।

দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই নিবর্ত্তিত কর—

"সর্ব্বং নিবর্ত্তয় ক্ষিপ্রম্।"

আর কিছু না বলিলে, লক্ষ্মণ হয় ত তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে অভিষেচনভাণ্ডকেই সর্ব্বাগ্রে চূর্ণ করিতেন; পুষ্পরাশি আবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন;—দধিদুগ্ধ শৃগাল-কুকুরকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন! সেই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য, রামচন্দ্র উপর্য্যুপরি দুইটি বাক্যের প্রয়োগ করিলেন;—দ্বিতীয়বাক্য প্রথমবাক্যের ভাষ্যমাত্র।

"সর্ব্বং নিবর্ত্তয় ক্ষিপ্রং"

অর্থাৎ—

"কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ম্।"

অভিষেকের প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে। যাহা অভিষেকার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাকে নিবর্ত্তিত কর,—বিষয়ান্তরে বিনিযুক্ত কর;—কিন্তু সাবধান, যাহাতে ধর্ম্মার্থে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার কোনরূপ অধর্ম্ম্য ব্যাপারে বিনিযুক্ত না হয়, সেইরূপ করিয়াই নিবর্ত্তিত করিও। উপর্য্যুপরি দুইটি নিষেধাত্মক উপসর্গের প্রয়োগ ভিন্ন এই ভাব এত সংক্ষেপে, এত সুকৌশলে, এত বিশদভাবে ব্যক্ত হইত না।

ইহাতে লক্ষ্মণ আপাতত হঠকারিতা পরিত্যাগ করিতেন; কি করিতে হইবে না এবং কি করিতে হইবে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু কেমন করিয়া আজ্ঞা-পালন করিতে হইবে, সহসা তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল,—সদসদাত্মিকা বুদ্ধি ব্যামোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তিনি কেবল ভক্ত ভ্রাতার ন্যায় নিয়োগপালনের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, মনে মনে বলিতেছিলেন—

"মুহুর্হি পরিতপ্যতে!"

রামচন্দ্র বুঝাইয়া বলিলেন,—অভিষেক হইল না বলিয়াই যে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নিরস্ত হইয়া গেল, তাহা নহে। অভিষেক হইল না বলিয়া, অভিষেকমূলক ধর্ম্মকর্ম্মের প্রয়োজন তিরোহিত হইল। কিন্তু বনগমনের পূর্ব্বে কল্যাণকামনায় যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। এই কথা বুঝাইবার জন্য রামচন্দ্র পুনরপি কহিলেন—

সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ॥" ২।২২।৫

প্রথম বাক্যের পর লক্ষ্মণ যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। "কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ম্" এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া, কিরূপে তাহা করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, লক্ষ্মণ যেন অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইজন্য, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়কে প্রবুদ্ধ করিবার আশায়, দ্বিতীয় বাক্যের আরম্ভেই রামচন্দ্র সস্নেহে সম্বোধন করিলেন,—"সৌমিত্রে!" এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া, লক্ষ্মণ বুঝিলেন—তাঁহাকে কি করিতে হইবে। একটিমাত্র সস্নেহ সম্বোধনে এই ভাব কত পরিস্ফুট হইয়াছে!

ব্যয়শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা জানিবামাত্র রচনাকাঠিন্য দূরীভূত হইয়া যায়। না জানিলে, এমন সরল রচনাও কত কঠিন,—কত অসংবদ্ধ,—কত প্রলাপপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়! রামায়ণে এরূপ রচনাকাঠিন্যের অভাব নাই।

"কৃতোদ্বাহন্তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরুদ্গণম্।
ধর্ষয়ামাস দুর্মেধা হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা॥" ১।২৩।১১

এই শ্লোকের "উদ্বাহ"শব্দ অর্থবোধের বাধা উপস্থিত করে। পাঠ করিবামাত্র মনে হয়,—দেবেশ বুঝি বিবাহ করিয়া মরুদ্গণের সহিত গমন করিবার সময়েই ধর্ষিত হইয়া, হুঙ্কার করিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণোক্ত মদনভস্মকাহিনীর একটি শ্লোক। আদ্যন্তের বিচার করিয়া, ইহার মধ্যে 'মহেশ্বরের বিবাহের কথা বাহির করিবার উপায় নাই। উদ্বাহশব্দ এক্ষণে কেবল বিবাহব্যাপারকেই স্মরণ করাইয়া থাকে। ইহা উদ্বাহশব্দের যোগার্থ নহে, রূঢ়্যর্থমাত্র! এক সময়ে যোগার্থমাত্রই প্রচলিত ছিল; তাহার সহিত কালক্রমে রূঢ়্যর্থ সংযুক্ত থাকিয়া, (পরে যোগার্থ লুপ্ত হইলে) কেবল রূঢ়্যর্থই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনিযুগে "স্বকরণ"শব্দে বিবাহ বুঝাইত।* ঐ শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। রামায়ণের রচনাকালে উদ্বাহশব্দে উত্থান এবং বিবাহ, এই দুইটি অর্থই ব্যক্ত হইত। তখনও উত্থান-অর্থ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া, এই শ্লোকে "কৃতোত্থান" বুঝাইবার জন্য "কৃতোদ্বাহ" ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাতন একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই; নূতনও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে;—রামায়ণ সেই পরিবর্ত্তন-যুগের গ্রন্থ!

"বলিহোমার্চ্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া॥" ৩।১।৬

রামলক্ষ্মণসীতা দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে সকল দৃশ্য দর্শন করিয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগুরু এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে "পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া" বলিয়া যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—পদ্মিনী-শব্দের অর্থ সরোবর,—টীকাকারও তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেবল পদ্মিনী কেন, নলিনীশব্দও রামায়ণে কেবল সরোবর-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পদ্মিনী—নলিনী—পুষ্করিণী—এই সকল শব্দের মধ্যে কেবল পুষ্করিণীশব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যাহাতে পুষ্কর আছে, তাহারই নাম পুষ্করিণী;—সরোবর;—এই অর্থই অদ্যাপি পুষ্করিণীশব্দের একমাত্র অর্থ। কিন্তু পদ্মিনী ও নলিনী শব্দের পুরাতন অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! অমরকোষে পদ্মিনীশব্দ উল্লিখিত আছে;—তাহার অর্থ সরোবর নহে। অমরসিংহের সময়ে সরোবর অর্থ বিলুপ্ত হইলেও, পদ্ম-অর্থ বিকশিত হয় নাই! উত্তরকালে পদ্ম-অর্থেও পদ্মিনীশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।†

যাহাতে পুষ্কর থাকিত, সেইরূপ সরোবরই পুষ্করিণীনামে কথিত হইত। পদ্মিনী ও নলিনী শব্দেরও পুরাতন অর্থ

* উপাৎ যমঃ স্বকরণে। ১।৩।৫৬ পাণিগ্রহণবিশিষ্টমিহ স্বকরণং গৃহ্যতে, ন স্বকরণমাত্রম্। ভার্য্যাম্ উপযচ্ছতে। স্বকরণমিতি কিম্? দেবদত্তো যজ্ঞদত্তস্য ভার্য্যামুপযচ্ছতি।" কাশিকা বৃত্তির এই ব্যাখ্যায় সূত্রার্থ সুব্যক্ত হইয়াছে। বিবাহ বুঝাইলেই উপপূর্ব্বক যম্-ধাতুর আত্মনেপদ হইত; অন্য অর্থে হইত না।

† পদ্ম-অর্থে পদ্মিনীশব্দের ব্যবহার মেদিনীকোষে ও আধুনিক সংস্কৃত কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অর্থই এক্ষণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

সেইরূপ। ক্রমে এই অর্থের পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে পুষ্করিণীমাত্রেই পদ্মিনী—নলিনী—পুষ্করিণী—নামে কথিত হইত; পরে পদ্মিনী এবং নলিনী শব্দের এই অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—পুষ্করিণীশব্দই প্রচলিত আছে।

"পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া"—

"পদ্মযুক্ত পদ্মিনী" বলায় বুঝাইতেছে যে—রামায়ণের রচনাকালে পদ্মিনীশব্দে পুষ্করিণী বুঝাইলেও, পদ্মসরোবর বুঝাইত না; পুরাতন অর্থ কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। পদ্মিনী বলিতে পদ্মযুক্ত সরোবর বুঝাইলে, "সপদ্ময়া"-বিশেষণটি পুনরুক্তিদোষের কারণ বলিয়া নিন্দিত হইত! এখন যেমন পুষ্করিণী বলিতে যে-কোন সরোবরকে বুঝায়, রামায়ণের রচনাকালে পদ্মিনী বলিতে সেইরূপ যে-কোন সরোবরকে বুঝাইত; বিশেষ করিয়া বলিবার জন্যই সপদ্ময়া-বিশেষণটি ব্যবহৃত হইয়াছে। পুষ্করিণী খনন করিবার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছিল; পদ্ম রক্ষা করিবারও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল;—এখন সে পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সরোবর খনিত হয় না; অথচ লোকে তাহাকে পুষ্করিণী বলিতে ত্রুটি করে না।* তাহার উৎসর্গব্যাপারে মন্ত্রপাঠ করিবার সময়ে, তাহাকে পুষ্করিণীনামে অভিহিত করা যায় না বলিয়াই, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি সঙ্কল্পবাচনে জলাশয়শব্দের উল্লেখ করেন; পুষ্করিণীশব্দের উল্লেখ করেন না। এই উৎসর্গরীতির মধ্যেও পুষ্করিণীশব্দের পুরাতন অর্থের আভাস প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

পদ্ম ভারতবর্ষের চিরপরিচিত পুষ্প। তাহার অনেক প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে পদ্মিনীশব্দও স্থানলাভ করিয়াছে! পদ্ম জাতিবাচক সাধারণ নাম। সকল-প্রকার পদ্মই পদ্মনামে কথিত হইতে পারে। কিন্তু শ্বেতরক্তভেদে পদ্ম দ্বিবিধ;—নীল-পদ্মের কথা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না! তাহা কবিকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়। অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায়—

"বা পুংসি পদ্মং নলিনম্ অরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥
পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিসপ্রসূনরাজীবপুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥"

টীকাকার ভানুজিদীক্ষিত এই সকল প্রতিশব্দকে "ষোড়শ পদ্মসামান্যস্য" বলিয়া গিয়াছেন; এবং "দ্বে শুভ্রকমলস্য" বলিয়া "পুণ্ডরীক-সিতাম্ভোজ"শব্দের পরিচয় প্রদান করিয়া, "রক্তসরোরুহ—রক্তোৎপল—কোকনদ"-শব্দের ব্যাখ্যায় "ত্রীণি রক্তকমলস্য" বলিয়া গিয়াছেন। শ্বেত রক্ত উভয় শ্রেণীর পদ্মই "কমল"নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

"কমলোত্তমসংছন্নাঃ পুষ্করাণি চ ভামিনি।" ২।৯৫।১৩

অযোধ্যাকাণ্ডের এই শ্লোকার্দ্ধে কমল ও পুষ্কর শব্দ যুগপৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ-

* পুষ্করিণী একটি সুবৃহৎ সরোবর। তাহার আয়তন নির্দ্দিষ্ট ছিল। রামায়ণের রচনাকালেও পুষ্করিণীর আয়তন বৃহৎ ছিল। তাহার কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এক্ষণে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ কত পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে, এই প্রবন্ধে কেবল তাহারই যৎসামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পার্থক্য না থাকিলে, ইহাকে পুনরুক্তি-দোষের দৃষ্টান্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। টীকাকারগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা

"কমলপুষ্করে রক্তসিতপদ্মে"

বলিয়া পুরাতন অর্থের উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়াছেন,—রক্তপদ্মের নাম কমল; শ্বেত-পদ্মের নাম পুষ্কর। অমরকোষমাত্র সম্বল করিয়া রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে হইলে, ইহাকে পুনরুক্তিদোষের দৃষ্টান্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইত। রামায়ণে যে সকল বৃক্ষলতাদির উল্লেখ আছে, তাহারাও রামায়ণের রচনাকালকে সমধিক পুরাতন বলিয়াই সাক্ষ্যদান করে। তাহার বিশেষ বিচার যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

পাণিনিসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনিযুগের প্রচলিত সাহিত্যে শব্দার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যবিচার প্রচলিত ছিল; তাহা ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উদাহরণ "মতি"শব্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায়,—বুদ্ধি-শব্দের চতুর্দ্দশ প্রতিশব্দের মধ্যে "মতি" একটি প্রতিশব্দমাত্র! পাণিনিযুগে মতি-শব্দে কেবল সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধিই * সূচিত হইত। রামায়ণে সেই পুরাতন অর্থেই মতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম॥" ১।৮।৮

এক সময়ে যে সকল শব্দে যোগার্থ-মাত্রই ব্যক্ত হইত, উত্তরকালে তাহাতে কেবল রূঢ়ার্থ ব্যক্ত হইতেছে;—যোগার্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! উদাহশব্দে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে সকল শব্দ কেবল রূঢ়ার্থই প্রকাশিত করিত, উত্তরকালে সেরূপ শব্দের রূঢ়ার্থ লুপ্ত হইয়া যোগার্থ প্রবল হইয়াছে;—সংস্কৃত-সাহিত্যে তাহারও নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রেণীর শব্দার্থবিচারেও রামায়ণের প্রাচীনত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

"ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি।
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী॥"১।৪৮।৩০

অহল্যার প্রতি গৌতমের এই অভিশাপবাক্যে "বাতভক্ষ্যা "এবং "নিরাহারা" শব্দে কিরূপ অর্থ সূচিত হইতেছে, তাহার বিচার আবশ্যক। বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই দুইটি শব্দ কিভাবে আধুনিক অভিধানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান

* পাণিনিসূত্র ।৩.২।১৮৮

রামায়ণে মতিশব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল স্থলেই সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধি সূচিত হইয়াছে; কোন কোন স্থলে "নিশ্চিন্তা"-বিশেষণও ব্যবহৃত হইয়াছে।

"মুক্তিবেবং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিকক্ষার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥" ১।৪৮।১৯

এই শ্লোকেও মতিশব্দ সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধিই ব্যক্ত করিতেছে। শব্দার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যবিচার উত্তরকালে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অমরকোষ সঙ্কলিত হইবার সময়ে সেরূপ অর্থপার্থক্য প্রচলিত থাকিলে, মতিশব্দের ব্যাখ্যায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতাম। একপর্য্যায়ভুক্ত বিবিধ শব্দের মধ্যে যে অর্থপার্থক্য প্রচলিত ছিল, কালে তাহা বিলুপ্ত হইবার পর, সংস্কৃতসাহিত্যের রচনা ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা যথাক্রমনিবদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সুললিত। তাহার প্রধান কারণ শব্দপ্রয়োগকৌশল। যে শব্দে যে ভাব সর্ব্বাপেক্ষা সুব্যক্ত হইতে পারে, সেই শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবামাত্র রচনালালিত্য বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই কবিগুরুর প্রধান গৌরব।

আবশ্যক। "শব্দকল্পদ্রুমে" বাতভক্ষ্যশব্দের উল্লেখ নাই; নিরাহারশব্দের উল্লেখ আছে। নিরাহারশব্দ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—

"নির্গত আহারো যস্ত। আহাররহিতঃ।"

যথা,—

"নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।"

—ইতি তর্পণপ্রকরণীয়াহ্নিকাচারধৃতবচনম্।

ইহাই কি নিরাহারশব্দের প্রকৃত অর্থ? ইহাই প্রকৃত অর্থ হইলে, অহল্যার পক্ষে শাপান্তকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণের সম্ভাবনা থাকে না; অনুতপ্ত হইবার পক্ষেও অধিক অবসর উপস্থিত হয় না! রামায়ণের টীকাকার কিন্তু এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

"নিরাহারা অন্নপানাদিরহিতা।"

এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ আছে। এরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে, পদ্মপুরাণের অহল্যাকাহিনীর সহিত রামায়ণের অহল্যাকাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। রামায়ণের অহল্যা মানবী—ভস্মশায়িনী—প্রায়শ্চিত্তচারিণী! পদ্মপুরাণের অহল্যা পাষাণী,—একেবারে জড়পিণ্ড! নিরাহারা বলিতে আহারকৃচ্ছ্রতা বুঝাইলে, পৌরাণিক কাহিনী খণ্ডিত হইয়া যায়! যে পাষাণী, তাহার আবার আহার কি, আহারকৃচ্ছ্রতাই বা কি? সুতরাং উভয় কাহিনীর সামঞ্জস্যরক্ষার্থ টীকাকার নিরাহারশব্দে অনাহারই ধরিয়া লইয়াছেন।*

রামায়ণে বাতভক্ষ্য ও নিরাহার শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল স্থলেই এই সকল শব্দ সংজ্ঞাশব্দরূপে রূঢ্যর্থ প্রকাশিত করিতেছে; কোন স্থলেই যোগার্থ প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।

"স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষ্যো জলাশয়ে।"৩।১১।১২

তথাহি—

"মুনয়ঃ সলিলাহারা বায়ুভক্ষ্যাস্তথাপরে।
আকাশনিলয়াশ্চৈব তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ।"৩।৬।৪

এই সকল শ্লোকেও রূঢ্যর্থ প্রকাশিত হইতেছে। সে অর্থ কালক্রমে বিলুপ্ত হইবার পর আধুনিক অর্থ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। নিরাহারশব্দে যে অনাহার বুঝাইত না, তাহার একটি সুপরিচিত উদাহরণ—

"নিরাহারো যতাহারো"

নিরাহারশব্দে অনাহার বুঝাইলে, এই দুইটি বিশেষণ একত্র ব্যবহৃত হইতে পারিত না। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও এই শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাভারতের সুবিখ্যাত টীকাকার নিরাহারশব্দের ব্যাখ্যায় পুরাতন অর্থেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

"বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ শুষ্যন্ননিমিষো মুনিঃ।
ইতস্ততঃ পরিচরন্ দীপ্তপাবকসপ্রভঃ।" ১।১৩।১৪

মহাভারতের এই শ্লোকে একজন মুনিই

* "এবং ব্যক্তত্বা বাল্মীকিবচনে স্থিতে শৈলী ভবেতি শাপো রামপাদস্পর্শাৎ শিলাত্বমুক্তিরিতি পুরাণকথা কল্পান্তরমনুসৃতা ইতি বোধ্যম্।" ইতি ভূষণ-টীকা।

রামায়ণের টীকাকারগণ রামানুজসম্প্রদায়ভুক্ত—রামানুরক্ত। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক-মতসংস্থাপন-কামনায় স্বসম্প্রদায়ভুক্ত পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক শব্দার্থই স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার অধীন হইয়াছে। নিরাহারশব্দে অনাহার বুঝিলে, পুরাণকথার সহিত সামঞ্জস্যরক্ষার চেষ্টা করা যায়—এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই টীকাকার পরিতৃপ্ত হইয়াছেন; নিরাহারশব্দের অন্য কোন অর্থ আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। মহাভারতের টীকাকার এরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করেন নাই।

বায়ুভক্ষ্য এবং নিরাহার বলিয়া কথিত হইয়াছেন; তিনিই আবার ইতস্তত "পরিচরণ" করিতেন বলিয়া উল্লিখিত। নিরাহার-শব্দে অনাহার বুঝাইলে, এরূপ বর্ণনা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠিত! যিনি বায়ুমাত্র আহার করেন, তিনি নিরাহার বলিয়া কথিত হইতে পারেন না; তাঁহার পক্ষে ইতস্তত "পরিচরণ" করিবারও প্রয়োজন উপস্থিত হয় না! মহাভারতের সুবিজ্ঞ টীকাকার সেরূপ অসঙ্গত ব্যাখ্যার অবতারণা করেন নাই। তিনি এই সকল শব্দকে পারিভাষিক-অর্থ-বিজ্ঞাপক সংজ্ঞাশব্দরূপেই ব্যাখ্যাত করিয়া গিয়াছেন; তাহাতেই ব্যাসবিরচিত মহাকাব্যের প্রকৃত মর্ম্ম সুব্যক্ত হইয়াছে! নীলকণ্ঠ বলেন,—"যিনি দেহস্থ বায়ুসকলকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার নাম বায়ুভক্ষ্য।" "যিনি বিলাসভোগ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন"—এমন কি, প্রাণধারণের জন্যও কোন দ্রব্যের "আহরণ" করেন না,—"তাঁহারই নাম নিরাহার।" তিনি ভোজনকালে ইতস্তত "পরিচরণ" অর্থাৎ "যথাপ্রাপ্ত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই অর্থ গ্রহণ করিলে, রামায়ণে এবং মহাভারতে ব্যবহৃত এই সকল শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়া পড়ে। গ্রহণ না করিলে, প্রতিপদে অসঙ্গতির মধ্যে নিপতিত হইতে হয়।*

ভোজ্য এবং ভোগ্য নামক দুইটি শব্দ বঙ্গসাহিত্যেও সুপরিচিত। কাহাকে ভোজ্য বলিব, কাহাকেই বা ভোগ্য বলিব, তাহার অনুশাসন ব্যক্ত করিবার জন্য পাণিনি একটি সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় পর্য্যন্ত যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার রচনারীতির আলোচনা করিয়াই এই সূত্র বিরচিত হয়। সূত্রটি এই—

"ভোজ্যং ভক্ষ্যে।" ৭।৩।৬৯

ভোজ্য এবং ভোগ্য এই উভয় শব্দই উপভোগার্থ ব্যক্ত করে। উপভোগের উপায় ও প্রকার ভেদে কোন দ্রব্য বা বিষয় ভোজ্যনামে, কোন দ্রব্য বা বিষয় ভোগ্যনামে কথিত হয়। পাণিনি বলেন,—যাহা ভক্ষ্য, তাহাকেই ভোজ্য বলা হয়; যাহা ভক্ষ্য নহে, তাহা ভোগ্য।

ভোজ্য বুঝাইবার জন্য ভক্ষ্যশব্দের ব্যবহার করায়, কাত্যায়ন পাণিনির দোষপ্রদর্শনের চেষ্টায় বলিয়াছিলেন;—এখানে ভক্ষ্য না বলিয়া, "অভ্যবহার" বলিতে

* বায়ুভক্ষ্যো জিতপবনঃ। আহরণম্ আহারঃ, বিষয়ভোগঃ, তচ্ছূন্যো নিরাহারঃ। অনিমিষো জিতনিদ্রঃ। ইতস্ততো বৃক্ষাদিভ্যঃ শীর্ণং পর্ণাদিকং পরিতঃ কালে সর্ব্বদা চরন্ অশ্নন্। ইতি নীলকণ্ঠঃ।—মহাভারতের সুবিজ্ঞ টীকাকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পুরাতন কৃচ্ছ সাধনের নিয়ম স্মরণ করিয়াই, পারিভাষিক অর্থের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সদোপবাসশব্দে যে আদৌ উপবাস বুঝাইত না, কেবল আহারসংযমের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি সূচিত করিত, মহাভারতেই তাহার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মবাক্যে ভীষ্মদেব এই শব্দের পারিভাষিক অর্থই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"অন্তরা প্রাতরাশঞ্চ সায়মাশং তথৈব চ।
সদোপবাসী স ভবেৎ যো ন ভুংক্তেঽন্তরা পুনঃ।" শান্তি ২২১।১০

এই সকল প্রমাণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—উপবাস, নিরাহার ইত্যাদি শব্দ পারিভাষিক অর্থই ব্যক্ত করিত, তাহাদের যোগার্থ গৃহীত হইত না। উত্তরকালের আর্য্যসমাজ যোগার্থ গ্রহণ করিয়া, নানারূপ নিষ্ঠুর দেশাচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

হইবে; যাহাকে অভ্যবহারের ... গলাধঃকরণ করিতে হয় না, তাহাকে ভক্ষ্য বলা অসঙ্গত।*

কাত্যায়নের এই বার্ত্তিক সুসঙ্গত হইলে, "অব্‌ভক্ষ্য," "বায়ুভক্ষ্য" ইত্যাদি কথা অশিষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ, তাহাতে অভ্যবহার নাই! পতঞ্জলি ... বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, কাত্যায়নের বার্ত্তিককে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন ... । তিনি "অব্‌ভক্ষ্য-বায়ুভক্ষ্য"-শব্দের উল্লেখ করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,—ভোজ্য এবং ভক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য নাই।

ত্রিমুনিব্যাকরণের এই বিচারবিতর্কের মধ্যেই ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। পাণিনিযুগে ভোজ্যশব্দ ভক্ষ্যার্থেই ব্যবহৃত হইত; তখনও ভক্ষ্য বলিতে কেবল অভ্যবহারকেই বুঝাইত না। কাত্যায়নযুগে এই অর্থ কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পতঞ্জলি তাহা স্মরণ করিয়া, দৃষ্টান্তের উল্লেখে কাত্যায়নের বার্ত্তিকের সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। কাত্যায়নের সময় হইতেই যে বায়ুভক্ষ্যশব্দের রূঢ়ার্থ বিলুপ্ত হইয়া তাহাতে অনাহার সূচিত হইতে আরম্ভ করে, তাহাই সুব্যক্ত হইতেছে। রামায়ণের বাতভক্ষ্য ও নিরাহার শব্দে অনাহার বুঝাইলে, রামায়ণকে কাত্যায়নযুগের গ্রন্থ—বা তাহারও পরবর্ত্তী সাহিত্যযুগের গ্রন্থ—বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতে এই সকল শব্দ যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল শব্দের অনাহার-বিজ্ঞাপক আধুনিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না; তাহাতে মহাকবির রচনা অসঙ্গত ও দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে।

রামায়ণের রচনাকালে ভোজ্য এবং ভক্ষ্য শব্দের পুরাতন প্রয়োগরীতির পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখনও পুরাতন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই; নূতন আসিয়া সম্পূর্ণরূপে পুরাতনের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। পাণিনিযুগে যাহা ভক্ষ্য, তাহাই ভোজ্য বলিয়া কথিত হইত; কাত্যায়নযুগে কেবল অভ্যবহারের যোগ্য পদার্থই ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইত। সুতরাং পাণিনিযুগে ভোজ্য-ভক্ষ্যের অর্থপার্থক্য ছিল না; কাত্যায়নযুগে অর্থপার্থক্য প্রচলিত হইয়াছিল।† ইহা অবশ্যই সহসা সংঘটিত হয় নাই। যখন এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তখন কিছুদিন উভয় প্রয়োগরীতিই প্রচলিত ছিল। পরে পুরাতন বিলুপ্ত হইয়া, নূতন প্রবল হইয়াছে। রামায়ণ সেই পরিবর্ত্তনযুগের গ্রন্থ।

"ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্ত্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ।
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ॥"১।১৩।১০

এই শ্লোকে ভক্ষ্যশব্দে অন্ন এবং পানীয় তুল্যভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে;—অন্নও ভক্ষ্য, পানীয়ও ভক্ষ্য।

"স দূরে চাশ্রমং গত্বা তাড়কেয়মুপাগমৎ।
মারীচেনাচ্চিতো রাজা ভক্ষ্যভোজ্যৈরমানুষৈঃ॥"৩,৩১।৩৬

এই শ্লোকে, পার্থক্যসূচনার্থ ভোজ্য এবং ভক্ষ্য উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামা-

† ভোজ্য এবং ভোগ্য এই দুইটি প্রচলিত শব্দের প্রয়োগরীতি বিচার করিবার জন্যই পাণিনিসূত্র রচিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে ভক্ষ্যশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

স্থলে এরূপ প্রয়োগের অভাব নাই। এই সকল প্রয়োগের তুলনায় সমালোচনা করিলে, শব্দার্থের ক্রমবিবর্ত্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না।

"চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥" ১।৫।১৬

অযোধ্যাবর্ণনায় এই শ্লোকে যে বিমানশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে পুরাকালের অট্টালিকারচনারীতির একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। বিমান-শব্দের পুরাতন অর্থ—সপ্তভূমিগৃহ—তাহা "ব্যাল্‌কনির" ন্যায় সেকালের অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধন করিয়া, সমুন্নত রচনারুচির পরিচয় প্রদান করিত। নিঘণ্টু গ্রন্থে বিমান-শব্দের দুইটিমাত্র অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"বিমানোঽস্ত্রী ব্যোমযানে সপ্তভূমৌ চ সদ্মনি।"

গৃহের "সপ্তভূমি" এবং দেবযান, এই উভয় পদার্থই বিমানশব্দে ব্যক্ত হইত। অমর-কোষে কেবল ব্যোমযানই বিমানশব্দের একমাত্র অর্থ বলিয়া উল্লিখিত!

"তত্র নানাপ্রকারেষু বিমানেষু বলকৃতাঃ।
স্পর্দ্ধমানাস্তদান্যোন্যং নিষেদুঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ॥" ১।১৪।২৬

তথা—

"তানি ভগ্নবিমানানি নিপেতুর্ধরণীতলে॥" ৫।৫৪।২৩

এই সকল স্থলে, বিমানশব্দে সপ্তভূমিগৃহই ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে রামায়ণের শব্দার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, রামায়ণের রচনাকাল যে কত পুরাতন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শব্দার্থের পরিবর্ত্তন সহসা সংঘটিত হয় না; সুতরাং শব্দার্থবিচারের ক্লেশস্বীকার করিলে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা নাই। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

তীর্থযাত্রী।

হে অদৃশ্য হে সুদূর সুন্দর আমার,
পরম আকাঙ্ক্ষা তুমি অন্তরমাঝার।
তোমা-পানে লক্ষ্য রাখি শান্তনত্রহিয়া
বিরহ অতৃপ্তিদুঃখ চলেছি বহিয়া—
দুরন্তীর্থযাত্রি-সম মহাশ্রান্তিভার
চলেছি বহিয়া যেন আনন্দ অপার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ঈশ্বর ও পূর্ব্বমীমাংসা।

আমাদের প্রসিদ্ধ ছয়টি দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদান্তিক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর স্বীকার করিবার দুইটি প্রয়োজন দেখা যায়; প্রথম—জগতের উৎপত্তিসমর্থন, * দ্বিতীয়—বেদের প্রামাণ্য-রক্ষা †। নৈয়ায়িকেরা বেদের প্রামাণ্য-রক্ষার জন্য ঈশ্বরস্বীকার করেন না: জগৎ নির্ম্মাণ করিবার জন্য। ‡ পাতঞ্জলমতে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনদ্বয়ের একটিও নহে, কিন্তু সমাধিসাধনের জন্য। § কাপিল বা সাঙ্খ্যবিদ্‌গণের মতে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণই পাওয়া যায় না * *। পূর্ব্বমীমাংসক-মতে ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নাই এবং তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই।

পূর্ব্বমীমাংসকগণ কোন্ যুক্তি ও তর্কবলে ঈশ্বরের অপলাপ করিয়াছেন, দর্শনপ্রিয় পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণ জন্য, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই নাতিবিস্তররূপে নিবদ্ধ হইবে।

ঐ সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রদর্শনের পূর্ব্বে আমাদিগকে সংক্ষেপে একটি কথার আলোচনা করিয়া লইতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, মীমাংসকেরা ঈশ্বর স্বীকারই করিয়া থাকেন, অস্বীকার করেন না। পূর্ব্বস্থলীনিবাসী পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও স্বকৃত মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশের টীকায় এই মতই প্রকাশ

* "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বেদান্তদর্শন, ১অ, ১পা, ২সূ ও বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদকৃত ভাষ্যের সৃষ্টিসংহার-প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

† "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" (বেদান্তদর্শন, ১অ, ১পা, ৩সূ) "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" (বৈশেষিকদর্শন, ১অ, ১আ, ৩ সূ)।

‡ "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ," (ন্যায়দর্শন ১অ, ১আ, ৭সূ) এই সূত্রদ্বারা আপ্তোপদেশহেতুই শব্দের প্রামাণ্য, ইহা বুঝা যাইতেছে; "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ" (ন্যায়দর্শন ২অ, ১আ, ৬৮ সূ) এই সূত্রদ্বারাও ঐ কথা পাওয়া যাইতেছে। "আপ্তাঃ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ"—বাৎস্যায়নের এই কথায় ঋষিরাই 'আপ্ত' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতএব এই ঋষিরা উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বেদের প্রামাণ্য। পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ", "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ" ইত্যাদি (ন্যা॰ দ॰ ৪অ, ১আ, ১৯—২১) সূত্রে ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

§ "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা", যোগদর্শন, ১পা, ২৩ সূ; "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" ২পা, ৩১ সূ।

* * "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ", "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ", ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য (সা॰ দ॰ ১অ, ৯২—৯৫)।

করিয়া গিয়াছেন। অতএব এ কথাটা পরিষ্কার করিয়া লওয়ার দরকার।

লৌগাক্ষিভাস্করবিরচিত মীমাংসার্থ-সংগ্রহে লিখিত আছে—

"ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু (ধর্ম্মঃ) নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"

আপোদেবপ্রণীত মীমাংসান্যায়প্রকাশেও এই কথাই আছে—

"শ্রীগোবিন্দার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু (ধর্ম্মঃ) নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ।"

শ্রীযুক্ত ন্যায়পঞ্চাননমহাশয় ইহাই অবলম্বন করিয়া এবং জৈমিনিসূত্রে ও শবর-[illegible] অর্থ—স[illegible]ঈশ্বরপ্রত্যাখ্যান কৃত ভাষ্যে স্পষ্টবাক্যে [illegible] দেখিতে না পাইয়া মীমাংসকমতেও ঈশ্বর স্বীকৃত হয় বলিয়াছেন।

অন্যপক্ষে আমরা বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই, বাদরায়ণ প্রথমে "ফল-মত উপপত্তেঃ" (২পা, ২৮ সূ) এই সূত্রদ্বারা "ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা"—নিজের এই মত সংস্থাপিত করিয়াছেন; তদনন্তর 'কর্ম্মই কর্ম্মের ফলদান করে, ঈশ্বর নহেন"—জৈমি-নির এই মত "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব" (৩অ, ২পা, ৪০ সূ) এই সূত্রদ্বারা উত্থাপিত করিয়া "পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ" (৩অ, ২পা, ৪১ সূ) এই সূত্রে যুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জৈমিনি ঈশ্বরস্বীকার করেন না। শবরাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত ব্যাসসূত্রগুলির ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্যেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, মীমাং-সকেরা ঈশ্বরস্বীকার করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ উপস্থিত করিতে পারা যায়; যথা—

"তথাচ ন্যায়বিদঃ সাখ্যমীমাংসকাদয়োঽসংসোরিণঃ (ঈশ্বরস্তু) অভাবং যুক্তিশতৈঃ প্রতিপাদয়ন্তি।"

২য় অধ্যায়, প্রথম ব্রাহ্মণ।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ হইতেও এ কথা প্রমাণিত করিতে পারা যায়। ব্যকটাধ্বরিকৃত বিশ্বগুণাদর্শেও এই মত দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

এদিকে মীমাংসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মতে ঈশ্বর নাই বলিয়াই উত্তর পাই। কুমারিলভট্টের শ্লোকবার্ত্তিকে ও পার্থসারথিমিশ্রের শাস্ত্রদীপিকায় ঈশ্বরের প্রাপ্ত [illegible] অভাববিষয়ে বহু যুক্তি ও তর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা প্রধানত এই দুই গ্রন্থ হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিব। শবরস্বামী স্পষ্টবাক্যে "ঈশ্বর নাই" এ কথা না বলিলেও বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ (পূর্ব্বপ্রদর্শিতাৎ) কারণাদবগচ্ছামো ন কৃত্বা সম্বন্ধং ব্যবহারার্থং কেনচিদ্বেদাঃ প্রণীতা ইতি।"

'সেইজন্য আমরা জানিতেছি যে, ব্যবহারসিদ্ধির জন্য শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ করিয়া কেহ বেদসকল প্রণয়ন করে নাই।'

বেদান্তী প্রভৃতি দার্শনিকের মতে বেদ নিত্য নহে, তাহা ঈশ্বরনামে প্রসিদ্ধ পরম-পুরুষ দ্বারা বিরচিত। শবরস্বামী পূর্ব্বোক্ত কথাদ্বারা তাহাই খণ্ডিত করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদ কেহ রচনা করে নাই। হিন্দু দার্শনিকগণ প্রধানত দুই কারণে ঈশ্বর-স্বীকার করেন—প্রথম জগৎসৃষ্টি, দ্বিতীয় বেদপ্রণয়ন। মীমাংসকেরা সৃষ্টিপ্রলয় স্বীকার করেন না, সুতরাং সেজন্য ঈশ্বরের

অপেক্ষা নাই; বেদও তাঁহাদের মতে নিত্য (নিম্নে কিঞ্চিৎ যুক্তি প্রদর্শিত হইবে)। অতএব সেজন্যও ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। জৈমিনিও "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সম্বন্ধঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া ভঙ্গীতে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নাই। কুমারিলভট্ট প্রভৃতি বেদের এই নিত্যত্ব আরও বিশদরূপে স্থাপন করিতে গিয়া সূত্রকার ও ভাষ্যকারের সূচিত ঈশ্বরাভাব যুক্তিদ্বারা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

লৌগাক্ষিভাস্কর ও আপোদেবের উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ের এই তাৎপর্য্য যে, কামনাপূর্ব্বক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা দ্বারা সংসারবন্ধন এবং কামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহা মুক্তির জন্য হয়। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

"প্রার্থ্যমানং ফলং জ্ঞাতং ন চানিচ্ছোর্ভবিষ্যতীতি।"
মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, ১১১ শ্লোক।

পার্থসারথিমিশ্রও তাঁহার ন্যায়রত্নে নিম্নলিখিত গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ" ইত্যাদি।

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আমরা প্রবন্ধের উপসংহারে বলিব।

ঈশ্বরের কথা মীমাংসাদর্শনে এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে:—অগ্নিহোত্রাদি যাগ ধর্ম্ম ও হিংসাদি অধর্ম্ম, ইহা কেবল বেদই আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মে বেদই একমাত্র প্রমাণ, অন্য প্রমাণের এখানে গতি নাই। বেদার্থমীমাংসার জন্যই জৈমিনীয়দর্শনের উৎপত্তি, অতএব বেদের প্রামাণ্যেই এই দর্শনের প্রামাণ্য। বেদের প্রামাণ্য না থাকিলে জৈমিনীয়-দর্শনেরও প্রামাণ্য থাকিবে না। এইজন্য পরমর্ষি জৈমিনি "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (মী০ দ০ ১অ, ২ সূ) এই সূত্রে 'এক বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ' ইহা সামান্যরূপে বলিয়া ও "তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ" (১অ, ৩সূ) এই সূত্রে 'বেদই যে ধর্ম্মে প্রমাণ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত' ইহা কহিয়া "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সম্বন্ধঃ" ইত্যাদি (১অ, ৫সূ) সূত্রদ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া অব্যাহতরূপে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছেন; এবং ইহার মধ্যে শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া ঈশ্বরকেও অসিদ্ধ করিয়াছেন।

মীমাংসকদিগের অভিপ্রায় এই—শব্দ উচ্চারণ করিলে অর্থের জ্ঞান হয়, অতএব শব্দ জ্ঞাপক ও অর্থ জ্ঞাপ্য। সুতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকলক্ষণ সম্বন্ধ। এখন দেখিতে হইবে, শব্দার্থের এই সম্বন্ধটিকে কোন পুরুষে স্থাপিত করিয়াছে কি না?—অর্থাৎ তাহা পুরুষকৃত—পৌরুষেয়, বা স্বাভাবিক। শব্দার্থের এই তত্ত্বটি নির্ণীত হইলে বেদেরও প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য নিশ্চিত হইবে; কেন না, বেদ শব্দময়, অর্থের সহিত ঐ শব্দের সম্বন্ধ আছে। এখন এই সম্বন্ধ যদি পুরুষকৃত—পৌরুষেয় হয়, তবে পুরুষের স্বভাবসুলভ ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষের সম্ভাবনা থাকায় বেদের প্রামাণ্য নিরবদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অতএব ঐ সম্বন্ধটি পৌরুষেয় কি স্বাভাবিক—অপৌরুষেয়, তাহার নির্ণয় আবশ্যক। এখন যদি ঐ সম্বন্ধটিকে পৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার

করা যায়, তবে সেই সম্বন্ধকারী পুরুষ সাধারণ মানব হইতে পারেন না, এইজন্ত কোনপ্রকারে ঈশ্বরকে স্বীকার করিলেও করিতে পারা যাইত; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ অপৌরুষেয় —স্বাভাবিক—নিত্য; বেদের সহিত তদর্থের সম্বন্ধও এইপ্রকার, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্ত ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারা যায় না। তার পর, জগতের সৃষ্টিকর্তৃরূপে ঈশ্বর থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না; কেন না, সৃষ্টি বা প্রলয় নামে কিছু আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

এস্থানে আপত্তি উঠিতে পারে—শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক হয়, তবে শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই সকল শব্দের অর্থ-প্রতীতি হওয়া আবশুক; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না; শব্দ উচ্চারিত হইলেও, অনেক সময়ে অর্থবোধ হয় না। তার পর দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তা যদি বলিয়া দেয়— অমুক শব্দের অমুক অর্থ, তখন অর্থবোধ হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বক্তা শব্দের সহিত স্বয়ং অর্থের সম্বন্ধ করিয়া ঐ শব্দ উচ্চারণ করে। অতএব শব্দার্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা যায়—'অমুক শব্দের অমুক অর্থ' ইহা বলিয়া বক্তা স্বয়ং শব্দার্থের সম্বন্ধ করে না; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ সম্বন্ধকে বলিয়া দেয় মাত্র। এইজন্তই, যদি কেহ গো-পদের অর্থ অশ্ব চান, তবে তাঁহাকে অপর ব্যক্তি নিষেধ করিয়া বলে—'না, গো-পদের অর্থ অশ্ব নহে।' যদি পুরুষ স্বয়ং শব্দার্থের সম্বন্ধকর্ত্তা হইত, তবে সে যে পদের যে অর্থ বলিত, সে পদের তাহাই অর্থ হইত। এই নিয়মানুসারে গো-পদের অশ্বও অর্থ হইতে পারে; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। শব্দার্থ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলেও কখন-কখন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দের অর্থবোধ না হইতেও পারে; কারণ শব্দার্থসম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াই অর্থের বোধ উৎপাদন করে; যতক্ষণ ঐ সম্বন্ধ জ্ঞাত না হয়, ততক্ষণ অর্থবোধ হয় না। অতএব যে ব্যক্তি যে শব্দের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ জানে না, তাহার সেই শব্দের যে অর্থবোধ হইবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

আর এক কথা—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মধ্যে এতাদৃশ কোন কাল নাই, যখন কোন শব্দের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ ছিল না। যদি তোমার মতে থাকে, তবে তোমারই অভিলষিত শব্দার্থের সম্বন্ধকরণ হইতে পারে না। কেন না, যখন কেহ কোন শব্দের সহিত কোন অর্থের সম্বন্ধ করিবে, তখন তাহাকে অবশ্তই ঐ সম্বন্ধ কোন শব্দদ্বারা করিতে হইবে;—যে-কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে পারিবে না যে, অমুক শব্দের অমুক অর্থ। এখন এই সম্বন্ধকারী পুরুষ যে শব্দদ্বারা একটি শব্দের সহিত একটি অর্থের সম্বন্ধ করিল, সেই শব্দটির সহিত তাহার অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা করিবার জন্ত অবশ্ত একটি শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল; আবার এই শব্দের অর্থসম্বন্ধ করিতে আর একটি শব্দ আবশুক হইয়াছিল; এইরূপ বলিলে অনবস্থাদোষ

আসিয়া পড়ে—একটির পর একটি, তার পর অন্যটি, এইরূপে আমরা কোনপ্রকারেই কোন একটি শেষস্থানে উপস্থিত হইতে পারি না। এই দোষ নিবারণের জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কুমারিলভট্ট শ্লোক-বার্ত্তিকের 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার'নামক অংশে বহুপ্রকার বিচারভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যকবোধে আমরা সে সমস্ত প্রদর্শন না করিয়া, কেবল ঐ সম্বন্ধ যে ঈশ্বরকৃত নহে, তাহাই উদ্ধৃত করিব; কেন না, এই প্রসঙ্গেই ঈশ্বরের সদ্ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ঈশ্বরবাদিগণ বলেন—সৃষ্টির আদিসময়ে ভগবান্ সর্ব্বস্রষ্টা প্রজাপতি স্থাবরজঙ্গমরূপ জগৎ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া এবং ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত কৃতসম্বন্ধ শব্দদ্বারা বেদ রচনা করিয়া মরীচি প্রভৃতিকে প্রদান করেন; যথা—

"প্রজাপতির্বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ";

প্রজাপতির্বেদানসৃজৎ" ইত্যাদি।

অতএব শব্দার্থসম্বন্ধ স্বাভাবিক হইতে পারে না।

মীমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলেন—সৃষ্টির 'আদিসময়' নামে কোন সময় আছে বলিয়া কল্পনাই করিতে পারা যায় না, তাহার নির্ণয় ত দূরের কথা। তুমি যে সর্ব্বস্রষ্টা প্রজাপতির উল্লেখ করিতেছ, সে সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন? তাঁহার আধার কি ছিল? তখনও ত পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি হয় নাই, যাহাতে তিনি থাকিতে পারিতেন। সে সময়ে তাঁহার আকৃতিই বা কিরূপ ছিল? তিনি অশরীর, এ কথা বলিতে পার না, কেন না, তাহা হইলে সৃষ্টির ইচ্ছায় তাঁহার প্রযত্নই হইতে পারে না। শরীর না থাকিলে প্রযত্ন হয় না। তিনি সশরীর, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, শরীর ভৌতিক ও ভূতগণের (পৃথিব্যাদির) তখনও সৃষ্টি হয় নাই।

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থা, এই প্রলয়ে তোমরা সকল বস্তুরই অভাব স্বীকার কর। এখন বল, সেই সময়ে যে প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন, ইহা কে জানিল, যে ব্যক্তি অন্যকেও ঐ কথা বলিয়া দিতে পারে? ইহার সদুত্তর না পাইলে নিশ্চয় করা যায় না যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। তার পর, প্রলয়ে যদি কিছুই না থাকে, তবে প্রজাপতির জগন্নির্ম্মাণে ইচ্ছাই হইতে পারে না; যেহেতু যাহার সাহায্যে তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন, প্রলয়ে তাহার কিছুই নাই; দেখিতে পাওয়া যায়, সহায়সাধন থাকিলেই লোকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, না থাকিলে হয় না। তুমি এ কথা বলিতে পার না যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া যাইবে, তাঁহার আবার প্রবৃত্তির আবশ্যকতা কি। ঈশ্বর যখন শরীরহীন, তখন যে তাঁহার ইচ্ছাই হইতে পারে না; শরীর থাকিলেই ইচ্ছা হয়, অন্যথা হয় না। তুমি যদি আবার বল—ঈশ্বরের শরীর আছে; তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই। তুমি উত্তর দাও—যে শরীর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর সশরীর হইলেন, তাঁহার সেই শরীরের নির্ম্মাতা কে? তিনি

নিজেই তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না; কেন না, নিজের শরীর নিজে নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, ইহা আমরা কোথাও দেখি নাই, আর তার প্রমাণও নাই। যদি বল, ঈশ্বরের ঐ শরীর আর কেহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তবে এই নির্ম্মাতার শরীরকে কে উৎপাদিত করিল, এবং সেই উৎপাদয়িতার শরীরের কে স্রষ্টা হইল? এইরূপে অনন্তকাল চলিলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না।

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, এই সংসার দুঃখজ্বালাপূর্ণ। অন্যপক্ষে, তোমরা বলিয়া থাক, ঈশ্বর পরমকরুণাকর। যদি সত্য-সত্যই ঈশ্বর করুণার্দ্র হন, তবে তিনি সংসারকে প্রাণীদের দুঃখপ্রদ করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? অতএব বলিতে হয়, তিনি নির্দ্দয়। জীবের কর্ম্মরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মও সে সময়ে ছিল না, যাহার অনুসরণে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর নিজের ঐ নির্দ্দয়ত্বরূপ দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। অতএব তোমরা যে বলিয়া থাক, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সাধন গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন, তাহাও হইতে পারে না; কেন না, সে সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মই থাকে না। ঊর্ণনাভিও নিঃসাধন হইয়া স্বকোশ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় না, ক্ষুদ্রজন্তুভক্ষণজনিত প্রবর্ত্তমান লালাই তাহার সাধন হয়।

তুমি এ কথাও বলিতে পার না যে, অনুকম্পা করিয়া ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন। যেহেতু সে সময়ে অনুকম্পাপাত্রেরই অভাব। দুঃখদর্শন করিলে অনুকম্পা হয়, কিন্তু সে সময়ে মুক্তপুরুষগণের ন্যায় শরীর-হীন আত্মার দুঃখই থাকে না, যাহা দেখিলে অনুকম্পা হইতে পারে। যদি বল—সৃষ্টির আদিকালে যেমন দুঃখের অভাব আছে, তদ্রূপ, সুখেরও অভাব আছে, ঐ সুখের অভাব দেখিলে অবশ্যই ঈশ্বরের অনুকম্পা হইতে পারে; তবে আমরা বলিব—তাহা হইলে অনুকম্পাপ্রবৃত্ত ঈশ্বর সমস্ত সংসারকে সুখময় করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, দুঃখের লেশও থাকিত না; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নাই। ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, দুঃখ বিনা সুখকে কোনরূপেই সৃষ্টি করিতে পারা যায় না, তাই ঈশ্বর দুঃখেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কেন না, যাঁহার নিখিল সাধন-সহায় স্বায়ত্ত, তাঁহার পক্ষে কোন কর্ম্ম দুষ্কর হয় বলিয়া সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি ঈশ্বরকেও অন্যত্র হইতে সাধন সংগ্রহ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, আমাদের ন্যায় তিনিও পরাধীন।

ঈশ্বরবাদিগণকে একটি প্রশ্ন করিতেছি, তাঁহারা উত্তরপ্রদান করুন—সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের কোন্ প্রয়োজনটি অসিদ্ধ ছিল, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ করিলেন? সকলেই জানেন—

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।"

শ্লোকবার্ত্তিক।

জগন্নির্ম্মাণে ঈশ্বরপ্রবৃত্তি কোন প্রয়োজনকে অনুসরণ করে নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে বলিতে হইবে, অচেতন হইতে ঈশ্বরের কোন ভেদ নাই। তোমরা বলিয়া থাক, ভগবান্ লীলাভারে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও সঙ্গত হয় না। লীলা হইলেও তাহা বিনোদনসুখের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। তোমা-

দের মতে ঈশ্বর পূর্ণকাম—পূর্ণসুখ; এখন বল, যদি ঈশ্বর লীলাখেলার জন্যই জগন্নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে জগন্নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ঈশ্বরের তাদৃশ লীলাজন্য-সুখের অভাব ছিল, যাহা তন্নির্ম্মাণের পরে পূর্ণ হইল। ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় কি না? স্বীকার করিলেই ঈশ্বরকে যে তোমরা পূর্ণকাম, পূর্ণস্বরূপ বল, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। আরও, লীলাখেলা স্বল্পমাত্রায় হইলেই তাহা প্রীতিকর হয়, কিন্তু এই ভূধর-সমুদ্রাদিসৃষ্টিরূপ মহাব্যাপার লীলাখেলা না হইয়া বরং তাঁহার প্রভূত কষ্টই উৎপাদন করে, সুখের কথা ত দূরে!

এইরূপে যেমন জগতের সৃষ্টি সম্ভাবিত হয় না, প্রলয় বা সংহারেও তদ্রূপ কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। কিজন্য ঈশ্বরের সংহারে ইচ্ছা হইবে, বুঝা যায় না। পরমেশ্বর সকরুণ, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই করুণানিমিত্ত, অতএব সংহারও তাঁহার করুণানিমিত্ত,—ইহা বলিতে পার না। সৃষ্টি ও সংহার দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ কার্য্য, ইহারা করুণারূপ এক কারণে উৎপন্ন হইতে পারে না। আরও, সংহারসময়ে কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকে, যে অন্যকে শুনাইতে পারে যে, ঈশ্বর সংহার করিয়াছেন। তুমি বলিতে পার—সৃষ্টির অনন্তরই উৎপন্ন পুরুষ যেমন পুরুষান্তরকে দেখিতে পায়, তেমন ঈশ্বরকেও সে দেখিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের কার্য্য অন্যকে বলিতে পারে। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নয়; সে সময়ে ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেও, ঈশ্বর যে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, তাহা সে দেখিতে পায় না, নিজের জন্ম নিজে দেখা যায় না। যখন ঐ ব্যক্তি নিজের জন্মবৃত্তান্তই জানিতে পারে না, তখন যে জগতের জন্ম জানিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি বল—ঈশ্বরের বাক্যে সে জানিতে পারিবে যে, তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও হইতে পারে না; যদি ঈশ্বর তাহাকে বলিয়া দেন যে, 'আমি তোমাকে উৎপাদিত করিয়াছি,' তবে ঈশ্বরের নিজের ঐশ্বর্য্য নিজে প্রকাশ করা হইবে। যে ব্যক্তি নিজের ঐশ্বর্য্য এইরূপে প্রকাশ করে, তাহার কথায় বিশ্বাস কি? বেদবাক্যদ্বারাও তাঁহার জগৎসৃষ্টিকারিত্ব জানা যায় না; সত্য কথা, বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"প্রজাপতির্বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, সোঽকাময়ত প্রজাঃ পশূন্ সৃজেয়,...ততো বৈ স প্রজাঃ পশূনসৃজৎ" ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—বেদ প্রজাপতি-বিরচিত কি না? যদি হয়, তবে প্রজাপতির কথায় বিশ্বাস কি?—যিনি স্বয়ং নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন! আর যদি প্রজাপতি বেদ রচনা না করিয়া থাকেন, তবে বেদের নিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে যে বেদ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল, তাহাতে "প্রজাঃ পশূনসৃজৎ" ইত্যাদি সৃষ্টিবিষয়ক যে সকল কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে কিরূপে বেদের প্রামাণ্য রক্ষিত হইবে। এইজন্য তাদৃশ বচনসমূহের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা চলে না। ইহাদের তাৎপর্য্য অন্যত্র;—ইহারা বস্তুত সৃষ্টি বা প্রলয় প্রকাশ না করিয়া বিত্তান্তরের প্ররোচনামাত্র উৎপাদন করে।

শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসে সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রসিদ্ধি থাকিলেও, ঐ প্রসিদ্ধি বাধিত হয়। যে সকল প্রসিদ্ধি প্রমাণমূলক, তাহাদের বাধ হয় না। কিন্তু সৃষ্টিসংহারবিষয়ক প্রসিদ্ধি তাদৃশ নহে। অর্থবাদবাক্যের স্তুতিতেই তাৎপর্য্য;—যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য নাই; তাহারা কোন প্রস্তুত বিষয়ের নিন্দা বা প্রশংসা মাত্র প্রকাশ করে।* এতাদৃশ কতকগুলি অর্থবাদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারাতেই সৃষ্টি ও সংহার বস্তুত 'আছে বলিয়া' লোকের বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা না করিলে এরূপ ভ্রম অতি সুলভ। মহাভারত প্রভৃতিতেও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্টিসংহারের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে; বস্তুত সৃষ্টি ও সংহার নামে কিছু নাই।—

"স্তুতিবাক্যকৃতশ্চৈব জনানাং মতিবিভ্রমঃ।
পৌর্ব্বাপর্য্যাপরামৃষ্টঃ শব্দোঽন্যাং কুরুতে মতিম্। ৬৩
উপাখ্যানাদিমাত্রেণ বৃত্তিবেদবদেব নঃ।
ধর্ম্মাদৌ ভারতাদীনাং ভ্রান্তিস্তেভ্যোঽপ্যতো ভবেৎ। ৬৪
আখ্যানানুপযোগিত্বাৎ তেষু সর্ব্বেষু বিদ্যতে।
স্তুতিনিন্দাশ্রয়ঃ কশ্চিদ্বেদস্তচ্চোদিতোঽপি বা। ৬৫

শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার।

যদি বল—আমাদের এই সৃষ্টিপ্রলয়-প্রবাহ অনাদি, বেদ প্রতি সৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও প্রবাহরূপে তাহাও অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি, সৃষ্টিকালে পরমাণু থাকায় জগতের উপাদানেরও অভাব নাই, অতএব সৃষ্টি হইতে পারে। তবে আমরাও বলি—লোকে যেরূপ সৃষ্টিপ্রলয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপই কল্পনা করা উচিত। প্রতিক্ষণই কিছু উৎপন্ন হইতেছে,—ইহাই সৃষ্টি; প্রতিক্ষণই কিছু বিলীন হইতেছে,—ইহাই প্রলয়। যুগপৎ সমস্ত সৃষ্ট বা বিলীন হয় বলিয়া কল্পনা করিলে তাহা দৃষ্টানুসারী হয় না। সর্ব্বোচ্ছেদরূপ প্রলয়ে কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বরের যে তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রলয়ে সমস্ত পদার্থের অভাব হয় বলিয়া তখন আত্মার কোনরূপ সুখদুঃখ-ভোগ হইতে পারে না, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেন না, কর্ম্মযুক্ত আত্মার ভোগহীন স্থিতি যুক্তিযুক্ত হয় না। এক এক আত্মার পূর্ব্বপূর্ব্বানুষ্ঠিত বহু কর্ম্ম থাকিতে পারে; তাহাদের মধ্যে যখন একটি কর্ম্মের ফল প্রবৃত্ত হয়, তখন অপর কর্ম্মফল নিরুদ্ধ থাকে;—অর্থাৎ ঠিক সেই সময়েই অপর একটি কর্ম্ম ফলপ্রসব করে না। কিন্তু প্রলয়াবস্থায় কর্ম্মফল কেন যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকিবে,

---

* বেদবাক্য পঞ্চধা বিভক্ত, যথা—বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। অর্থবাদ দ্বিবিধ—বিধিশেষ ও নিষেধশেষ। বিধিশেষঃ অর্থবাদ বিধেয় বস্তুর স্তুতি এবং নিষেধশেষ অর্থবাদ নিষিদ্ধ বস্তুর নিন্দা প্রকাশ করে। যথা—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত"—[বায়ুদেবতার জন্য শ্বেত-(ছাগল) বধ করিবে]—এই বিধিবাক্যের শেষে অর্থবাদ পঠিত হইয়াছে;—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েন উপধাবতি, স এবং ভূতিং গময়তি," —(বায়ু অতি ক্ষিপ্রপ্রসাদিনী দেবতা, যে তাহার আলম্ভনকারী স্বভাগ্যে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু তাহাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন)। এই অর্থবাদবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য যে, যেহেতু বায়ুদেবতা শীঘ্র ফলপ্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহার উদ্দেশে শ্বেতালম্ভন প্রশস্ত। ঐ অর্থবাদবাক্যের যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। বিধিবাক্যের সহিত ঐক্যসমাধান করিয়া উহাদের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। অর্থবাদসম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে। প্রবন্ধান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

তাহার কারণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই যে ঐ সমস্ত কর্ম্মফল নিরুদ্ধ থাকিবে, তাহাও সঙ্গত নহে। প্রলয়কালে সর্ব্বকর্ম্মের ফলের অনুপভোগ কোন কর্ম্মেরও ফল নহে। এমনও কোন প্রমাণ নাই যে, সে সময়ে সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হয়। যদি সত্যসত্যই বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে পুনর্ব্বার সৃষ্টির আশা পরিত্যাগ করিতে হয়; কেন না, কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ। যদি বল—প্রলয়কালে কর্ম্মসকল তিরোহিত থাকিয়া তদনন্তর অভিব্যক্ত হয় ও তাহা দ্বারা ভূতসৃষ্টি আরব্ধ হয়; তবে আমরাও বলিতেছি—উত্তর কর—প্রলয়ানন্তর কর্ম্ম যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার কারণ কি? ঈশ্বরেচ্ছা কারণ হইতে পারে না, তাহা হইলে ঈশ্বরেচ্ছাদ্বারাই সৃষ্টি হইয়া যাউক, তাহার মধ্যে আবার কর্ম্মকে প্রবেশ করাইয়া লাভ কি? আর যদি-বা ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ হয়, তবুও সঙ্গতি নাই; ঐ ঈশ্বরেচ্ছা যে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ কি? অকারণই তাহা হয়, বলিতে পারা যায় না। ঈশ্বরেচ্ছার উৎপত্তিতে কর্ম্মও কারণ হইতে পারে না, কেন না, তখন সেই কর্ম্ম প্রতিবদ্ধ—তাহার তখন কার্য্যকারিত্ব নাই। কর্ম্মকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও দোষোদ্ধার হইল না;—'ঈশ্বরেচ্ছার কারণ কর্ম্মাভিব্যক্তি ও কর্ম্মাভিব্যক্তির কারণ ঈশ্বরেচ্ছা'—এই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ উপস্থিত হয়। আবার যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, যাহাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছার কোন কারণ আছে; তবে আর একটি দোষ আসিয়া পড়ে;—ঐ কারণটি নিত্য কি অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তবে তাহার কার্য্যও নিত্য হইবে, অতএব ঈশ্বরেচ্ছাও নিত্য হইল, সুতরাং সর্ব্বদাই সৃষ্টি হউক। যদি কারণটি অনিত্য হয়, তাহা হইলে যখন ঐ কারণ উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আবার কোন্ কারণকে অবলম্বন করিবে? এইরূপ একের পর অপর কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে অনবস্থা উপস্থিত হইবে। যদি-বা তোমাদের মতে ধরিয়াই লওয়া যায় যে, ঈশ্বরেচ্ছার কোন একটি উপযুক্ত কারণ আছে, তবে তাহাতেই ভূতসৃষ্টি হউক না কেন, আবার ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতিকে স্বীকার করা কিজন্য? অতএব সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই প্রমাণশূন্য।

যখন সৃষ্টি ও প্রলয়ই থাকিল না, তখন তৎকর্ত্তৃত্বরূপে ঈশ্বরও নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এস্থানেও ঈশ্বরের অভাবসম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের প্রতি কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্ন দেখা যায়;—পদসঞ্চারণে ভিন্ন প্রযত্ন এবং হস্তসঞ্চালনে ভিন্ন প্রযত্ন। যদি সৃষ্টিবিষয়ে ঈশ্বরের প্রযত্ন নিত্য হয় (তোমাদের মতে), তবে ঐ প্রযত্ন এক কি অনেক? যদি একটিমাত্র প্রযত্ন থাকে, তবে তাহা দ্বারা বিবিধ কার্য্য করা যাইতে পারে না। আর যদি বল, ঈশ্বরের প্রযত্ন অনেক এবং তাহারা নিত্য, তবে প্রলয়কারণভূত পরমাণুবিশ্লেষক প্রযত্নের সৃষ্টিসময়েও, এবং সৃষ্টিকারণভূত পরমাণুসংযোজক প্রযত্নের প্রলয়কালেও অবস্থিতিহেতু উভয় প্রযত্নের পরস্পর বিরোধ থাকায় সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই হইতে পারে না।

তোমরা অনুমান করিয়া থাক—যে যে পদার্থ সাবয়ব, তাহারা সকলই কার্য্য; এই পৃথিবী প্রভৃতিও সাবয়ব, অতএব ইহারাও কার্য্য; কার্য্যের অবশ্য একজন কর্ত্তা থাকিবে, অতএব এই পৃথিব্যাদির যে কর্ত্তা, সেই আমাদের ঈশ্বর। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা-প্রযত্নাদি যে সমস্ত গুণ কর্ত্তার থাকা আবশ্যক, ঈশ্বরের তাহা সম্ভাবিত হয় না। যখন তাহাই না হইল, তখন কি-প্রকারে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে এবং কিরূপেই পৃথিব্যাদির কর্ত্তৃত্ব আমাদের সম্ভব হয় না বলিয়া ঈশ্বর বলিয়া আর একটি পদার্থ সিদ্ধ হইবে?* অতএব সৃষ্টি ও প্রলয়ের ন্যায় ঈশ্বরেও কোন প্রমাণ নাই।

ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের এমন কি অনুপপন্ন রহিয়াছে, যাহা ঈশ্বরশক্তি দ্বারা উপপন্ন হইবে। যাঁহারা শব্দার্থের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা না করিয়া ও স্ববিরুদ্ধ যুক্তিতর্কসমূহে কর্ণপাত না করিয়া মুগ্ধবুদ্ধিতে সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সৃষ্টিপ্রলয় সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে পারেন। আমাদের মতে যখন সৃষ্টিপ্রলয়ই নাই, তখন ঈশ্বরস্বীকারের আর কোন প্রয়োজন নাই। বেদপ্রামাণ্যরক্ষার জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরস্বীকার করেন, সেজন্যও আমাদের ঈশ্বরের অপেক্ষা নাই। শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব-ব্যবস্থাপন দ্বারাই বেদে পুরুষমূলক ভ্রমপ্রমাদ-প্রবঞ্চনাদির অনবকাশ প্রতিপাদিত ও তাহা দ্বারাই প্রামাণ্য রক্ষিত হইয়াছে। কর্ম্মফলপ্রদানের জন্যও ঈশ্বরস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ বলিতেছেন—"জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত"—'স্বর্গেচ্ছু জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে।' ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ্টোমযাগরূপ ধর্ম্মদ্বারাই স্বর্গফল হয়; ঈশ্বরকে ইহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না। তুমি হয় ত বলিবে—যাগ ত দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা হইতে বহুকাল পরে কিরূপে ফল পাওয়া যাইতে পারে। মৃতদম্পতির পুত্রোৎপত্তি ত কখন শুনা যায় নি! তাহার উত্তর এই—যদি বেদকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তবে যাহাতে বেদের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়, তাহা আমাদের উভয়কেই করিতে হইবে। যাগ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইলেও, তাহার একটি ব্যাপার বা শক্তি অবস্থান করে, ইহা আমরা স্বীকার করি। যেমন অঙ্গার শান্ত হইলেও তজ্জন্য উষ্ণতা জলে অনুবৃত্ত হয়, সেইরূপ যাগ বিনষ্ট হইলেও যাগজন্য একটি শক্তি (অপূর্ব্ব) আত্মাতে অনুবৃত্ত হয় এবং কালান্তরে তাহা হইতেই ফলপ্রাপ্তি হয়, এজন্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। সৃষ্টি, সংহার ও কর্ম্মফলপ্রাপ্তি, এই তিনটি ভিন্ন অপর কোন দুষ্কর কার্য্য সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার জন্য ঈশ্বর স্বীকার

* নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যেরূপ অনুমানদ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, মীমাংসকগণও সেইরূপ অনুমানদ্বারাও ঈশ্বরকে নিষিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহুল্য ও নীরস হইবে মনে করিয়া আমরা মীমাংসকগণের অনুমানবাক্যের অনুবাদ করিতে বিরত থাকিলাম। শাস্ত্রদীপিকার সৃষ্টিসংহারবাদ ও শ্লোকবার্ত্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার অংশ দ্রষ্টব্য।

করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরে যেমন কোন প্রমাণ নাই, তদ্রূপ তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই।

ঈশ্বরসম্বন্ধে মীমাংসকেরা কি বলেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে জানাইলাম। সম্প্রতি, ঈশ্বরস্বীকার করিলে মীমাংসকগণের কি ক্ষতি হইত বা ঈশ্বরস্বীকার না করিয়াই বা তাঁহাদের কি লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

লৌকিকের ন্যায় পারলৌকিক কার্য্যসমূহেও কালবিশেষে কোন একটি প্রবল ভাব সমাজে আদৃত হয় ও অপরগুলি তৎকালে মলিন হইয়া যায়। যে কালে যে ধর্ম্ম সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয়, তখন তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে উদ্ঘোষিত করিবার জন্য তদবলম্বিগণের স্বভাবতই প্রযত্ন হইয়া থাকে। সে সময়ে যদি কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে অনর্থ প্রাপ্ত হইল বলিয়া সকরুণ মনীষিগণের হৃদয় কাতর হয়; তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যান, যাহাতে লোকে সেই শ্রেয়ঃপথ হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়। আর্য্যাদের মধ্যে যখন এক কর্ম্মবিধিই অভ্যুদয়জনক—নিঃশ্রেয়সপ্রদ বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, প্রধান প্রধান লোকসমূহ যখন কর্ম্মবিধিকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, মীমাংসাদর্শনের তখনই আবশ্যকতা হইয়াছিল। যদি এক কর্ম্মবিধিই পরমপুরুষার্থপ্রদ বলিয়া মীমাংসকগণের ধারণা হইয়া থাকে, তবে যাহাতে সকলেই সেই মত গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা যথোচিত চেষ্টা করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। মীমাংসকেরা যখন ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা বিশেষ প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কর্ম্মবিধিই শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরোপাসনা নিষ্ফল; তজ্জন্য নিঃসন্দেহে সকলকে কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, তাঁহারা পূর্ব্বপ্রচলিত ঈশ্বরবাদকে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন; অন্যথা লোকে হয় ত কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করিত না বা করিলেও তাহাতে স্থির থাকিতে পারিত না। বিশ্বগুণাদর্শে ব্যঙ্কটাধ্বরিও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—

> "ভগবদনভ্যুপগমনং দৈবতচিহ্নাদিনিহ্নবশ্চৈষাম্।
> কর্ম্মশ্রদ্ধাবিবর্দ্ধকতৎপ্রাধান্যপ্রদর্শনায়ৈব॥"*

ঈশ্বরোপাসনার ন্যায় কর্ম্মবিধিও নিঃশ্রেয়সপ্রদ। অতএব ঈশ্বর না থাকিলেও যদি অভিলষিতসিদ্ধি হইয়া যায়, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিবার আর আবশ্যকতা থাকে না। আমরা বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আসিতেছি, তাই সহসা ঈশ্বরাভাব শুনিলে আমাদের হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু যাঁহাদের বাল্যকাল হইতে কর্ম্মবিধি পরিচিত, ঈশ্বর-অস্বীকারে তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না।

কর্ম্ম ও ঈশ্বর এই উভয়ের উপাসনাকেই যাঁহারা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন,

* মীমাংসকেরা দেবতার মূর্ত্তিও স্বীকার করেন না। মীমাংসাদর্শনের নবমাধ্যায়ে দেবতার মূর্ত্তি খণ্ডিত হইয়াছে।

তাঁহারা উভয় উপাসনা হইতেই নিজের অনুকূলরূপে অংশবিশেষের গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া অভিনব মত আবিষ্কার করিয়া যুগপৎ উভয় পথকেই আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা এই মতানুবর্ত্তী, প্রাগুক্ত মীমাংসার্থসংগ্রহাদিকার তাঁহাদেরই অন্যতম। এইজন্যই তাঁহারা লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"

বস্তুত যথার্থ মীমাংসকেরা যে ঈশ্বরস্বীকার করেন না, তাহা দেখান হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

নবজীবন।

We await the flashing sword of the lightening which shall cleave the darkness. For the terrible husk must be broken, and the rain-drops of a new vigour must refresh the earth before new flowers can spring up to cover it with their bloom. But it must be from Asia herself, along the ancient roadways of the race, that the Great Voice shall be heard—victory from within, or a mighty death without.—*Ideals of the East.*

বাঙালী নবজীবন লাভ করিয়াছে। বহুশতাব্দীর পরাধীনতায় নিরন্তর পরপদপীড়িত হইয়া যাহা হেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছিল, বাঙালী আবার সেই দেবদুর্লভ মহারত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন এবং ইংলণ্ডের শিক্ষা যে নবশক্তি স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে, বিশ্ববিধাতার আশীর্ব্বাদে তাহাই বাঙালীকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। তাহার প্রথম প্রকাশ প্রভাতের কনককিরণের মত ধীরে ধীরে অপূর্ব্বশোভায় ফুটিয়া উঠিতেছে।

এখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। এখনও বিভীষিকা সম্পূর্ণরূপে পলায়ন করে নাই। এখনও পেচকরব সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। এখনও কোন কোন বিলাসী বাঙালী বিলাসনিদ্রার শেষমুহূর্ত্তের সুখস্বপ্নের প্রলোভন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তথাপি অনেকেই জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কলরবে গ্রাম-নগর-রাজধানী পুলকিত-কলেবরে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

এই জাগরণ সহসা সংঘটিত হয় নাই। আঘাতের পর আঘাতে,—আলোড়নের পর আলোড়নে,—আহ্বানের পর আহ্বানে,—বহুদিনের অব্যাহত আন্দোলনের পর আন্দোলনে এই জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। সেইজন্যই ইতিহাস ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না।

যাহা এতদিন নিষ্ফল চেষ্টা বলিয়া স্বদেশে-বিদেশে প্রতিনিয়ত উপহাস সহ্য করিয়া নীরবে কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত ছিল, সেই স্বদেশসেবার পুণ্যব্রত সময় পাইয়া সাফল্য-লাভের পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা এতদিন কবিকল্পনার ভিতর দিয়া অব্যক্তবেদনারূপে ফুটিয়া উঠিতে গিয়া স্বদেশে-বিদেশে দুর্বোধ বলিয়া তিরস্কার সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিল, সেই স্বদেশপ্রীতি সময় পাইয়া সকল হৃদয়কে অধিকার করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। যাহা এতদিন বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিতর দিয়া বাঙালীকে তাহার সুখদুঃখের মূলকারণ বুঝাইতে গিয়া স্বদেশে-বিদেশে ইতিহাসলেখককে তীব্রতাড়নায় ব্যতিব্যস্ত করিত, সেই স্বদেশশক্তি সময় পাইয়া সকলকেই কর্ত্তব্যপালনের জন্য অকুতোভয়ে আহ্বান করিতেছে।

একের চিন্তা অনেকের চিন্তায়,—অনেকের চিন্তা সকলের চিন্তায়—পরিণত হইয়াছে। একের লক্ষ্য অনেকের লক্ষ্যে,—অনেকের লক্ষ্য সকলের লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। একের আহ্বান অনেকের আহ্বানে,—অনেকের আহ্বান সকলের আহ্বানে—পরিণত হইয়াছে। তাহাতেই গ্রাম-নগর-রাজধানী পুলকিতকলেবরে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

যাঁহারা ইহাকে অস্বীকার করিয়া স্বদেশ-দ্রোহে লিপ্ত হইতেছেন,—যাঁহারা ইহাকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিয়া রাজধর্ম্মে পতিত হইতেছেন,—ইতিহাস তাঁহাদের কথায় এবং কার্য্যের সমাদর করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডের ইতিহাস যেরূপ চরিত্রবলের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, বাঙালীর মধ্যে সেইরূপ চরিত্রবলই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের শাসন এবং ইংলণ্ডের শিক্ষা সাফল্য-লাভ করিবার সময় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই জাগরণ মহাজাগরণ,—বাঙালীর ইতিহাসের অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব ঘটনা। ইহাতেই বাঙালীর ললাটকলঙ্ক অপসৃত হইবার সুসময় উপস্থিত হইবে। "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"—বলিয়া স্বদেশের বিপ্রবর্গ মন্দিরে মন্দিরে শুভ শঙ্খনাদ করিয়া যে শুভসঙ্কল্পের মহামন্ত্র ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছেন, তাহার সঙ্গে বহুযুগের অপরিতৃপ্ত পুণ্যপিপাসা আকুলকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।

ইহা কদাচ সহসা সংঘটিত হইতে পারে না। যে জীবজগতে নগণ্য ধূলিকণা নগণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না,—যে জীব-জগতে শিশিরবিন্দু ক্ষুদ্র বলিয়া তাচ্ছীল্যলাভ করিতে পারে না,—যে জীবজগতে পদ-দলিত দূর্ব্বাদলও দুর্ব্বল বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে না,—সেই জীবজগতের কোন ঘটনাকেই তুচ্ছ বলিয়া উপহাস করিতে সাহস হয় না। বিধাতার মঙ্গলহস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তৃণের সহিত তৃণ—গুচ্ছের সহিত গুচ্ছ—একত্র মিলিয়া গুণত্বপ্রাপ্ত হইবামাত্র মত্তহস্তীকেও নিগড়নিবদ্ধ করিবার শক্তিলাভ করিয়া থাকে।

মানবসমাজের অবস্থাও সেইরূপ। বিচ্ছেদে শক্তিক্ষয়,—মিলনে শক্তিসঞ্চয়। বিচ্ছেদে চিরপরাভব—মিলনে বিশ্ববিজয়। বিচ্ছেদে চিরকলঙ্ক,—মিলনে পরম গৌরব। স্বভাব-সুলভ প্রবৃত্তিবশে মানবসমাজ শক্তিপ্রিয়,—

বিজয়প্রিয়,—গৌরবপ্রিয়,—তাহার জন্যই মানবসমাজ মিলনপ্রিয়। তাহার জন্যই মানবসমাজে পরিবারবন্ধনের ব্যবস্থা,—সমাজবন্ধনের ব্যবস্থা;—স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ নামক বিবিধ বন্ধনব্যবস্থার আড়ম্বর।

মিলনের শক্তিক্ষেত্রের পরিচয়লাভ করিয়া, মানবসমাজ মিলনভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, শৈশবেই বিজয়মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিল। তপস্যার একনিষ্ঠায় উত্তরোত্তর শক্তিলাভ করিয়া কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে; কেহ বা তপস্যাবিচ্যুত হইয়া অকৃত্রিম উপহাসের পাত্র হইয়া রহিয়াছে। মূলপ্রবৃত্তি কোন সমাজ হইতেই একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। যাহারা তপস্যাভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইবার পথে অধঃক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাদেরও অভ্যুত্থিত হইবার আশা আছে। শক্তিলাভ করিতে পারিলে, তাহারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগকে আবার পুরাতন পুণ্যপথে আরোহণ করিতে হইবে।

এক দিনে বা একটি ঘটনায় তাহার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে পারে না। যাহারা বহুযুগ নিদ্রামগ্ন, একদিনে বা একটি ঘটনায় তাহারা সহসা জাগিয়া-উঠিয়া বিশ্ববিজয়ে ধাবিত হইতে পারে না। বিশ্ববিজয়ের পূর্ব্বে আত্মজয় সম্পন্ন করিতে হয়। আত্মজয়ের পূর্ব্বে আত্মত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। আত্মত্যাগের পূর্ব্বে হৃদয়বল সঞ্চিত করিতে হয়। হৃদয়বল সঞ্চিত করিবার পূর্ব্বে আলোচনায়-আন্দোলনে হৃদয়দৌর্ব্বল্যের মূলকারণ আবিষ্কৃত করিয়া তাহাকে সর্ব্ব-প্রযত্নে পরিহার করিবার জন্য আত্মচেষ্টার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা এইরূপে যথাক্রমে সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারা অধঃপতিত হইয়া থাকিলেও পুনরায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারে।

বাঙালীর আলোচনা-আন্দোলনের অভাব ছিল না; আত্মচেষ্টার অভাবেই বাঙালী জানিয়া-শুনিয়াও হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করিতে পারে নাই। সেইজন্য বাঙালীর আলোচনা-আন্দোলন প্রথামাত্রে পর্য্যবসিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা প্রতিদিবসের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, সভামণ্ডপকেই আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে তাহা এখন সভা ছাড়িয়া গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে, স্থান প্রাপ্ত হইতেছে; এক স্থান ছাড়িয়া অনেক স্থানে,—অনেক স্থান ছাড়িয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতেই বাঙালীর আত্মচেষ্টা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবার আশা হইয়াছে।

বাঙালী বিচ্ছিন্ন হইয়াই উৎসন্নে গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা,—অনেক ঘটনার কথা,—অনেক অকথ্য কলঙ্কের কথা! বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া বাঙালী যেদিন আত্মশক্তি লাভ করিবার সন্ধিকাল প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেদিনও আত্ম-চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে সাহস করে নাই। সেদিন বাঙালী কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় পরশক্তির কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিল। যাহাদের সহায়তায় বহু বিপ্লবের অবসানে বাঙালী শান্তিলাভ করিয়াছে, বাঙালী তাহাদিগকে আপন স্কন্ধে বহন

করিয়া আনিয়াই রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিল। শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে, ভক্তিতে বিগলিত হইয়া বাঙালী তাহাদের মন্ত্রী সাজিয়া, দালাল সাজিয়া, গোমস্তা সাজিয়া, লাঠিয়াল সাজিয়া, ভারতবিজয়ের সহায়তা-সাধনের জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে;—স্বদেশের ইতিহাসবিখ্যাত শিল্পবাণিজ্যের সর্ব্বনাশ সাধিত করিয়াও বিদেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে ইতস্তত করে নাই! একদিনের জন্যও বাঙালীর প্রভুভক্তি পরাভূত হয় নাই; বরং রাজাকে অবতার জ্ঞান করিয়া বাঙালী কাতরনয়নে ভিক্ষা-পাত্রহস্তে রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে! মুষ্টিভিক্ষার আশা পাইলে, আশামাত্র লইয়াই বাঙালী কত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে;—আত্মশক্তির ছায়া পাইলে, ছায়াকে কায়াদান করিবার আশায় বাঙালী কত প্রাণপণে অবৈতনিক রাজকার্য্যের ভার বহন করিয়াছে! এক রাজপুরুষ যাহা দান করেন, অন্য রাজপুরুষ আসিয়া তাহার প্রত্যাহার করিলে, বাঙালী সেই হস্তবিচ্যুত অধিকারের উদ্ধারসাধনের আশায় পুনঃ-পুন পরিশ্রান্ত হইয়াও রাজদ্বার পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে নাই। অবশেষে আঘাতের পর আঘাতে, রাজদ্বার উন্মুক্ত না হইয়া, মাতৃভূমির মঙ্গলদ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী বুঝিয়াছে,—বাঙালী যাহার জন্য কাতরক্রন্দনে রাজদ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ছায়া,—অধিকার নহে;—অধিকারের ছদ্মবেশ! প্রধান রাজপুরুষ স্বয়ং আয়াস-স্বীকার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন,—প্রাতঃ-স্মরণীয়া মহারাণীর ইতিহাসবিখ্যাত ঘোষণা-পত্রও ছায়া;—তাহাও—তাহাও—অধিকার-পত্র নহে, অধিকারপত্রের ছদ্মবেশ! ইহাতে বাঙালী বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রধান রাজপুরুষের ভ্রমপ্রদর্শনের জন্য তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময়ে সকলেই চাহিয়া দেখিল,—স্বায়ত্তশাসন, উচ্চশিক্ষা, অভ্যুদয়সাধক মিলনক্ষেত্র,—সমস্তই একে একে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে;—জনসাধা-রণের কাতরক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, তাহা-দের পরাধীনতার কথা হাড়ে হাড়ে ক্ষোদিত করিয়া দিয়া, অকূলসাগরে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। পরশক্তির উপর বিশ্বাস এইরূপে একবার বিচলিত হইবামাত্র, আত্মশক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

এত কালের পর! তথাপি ইহাই পরম লাভ বলিয়া বাঙালী আত্মচেষ্টার আশ্রয়-গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মচেষ্টা ভিন্ন কোন জাতি অভ্যুদয়লাভ করিতে পারে না। তাহাই আত্মশক্তির মূল। রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রাজশক্তির মুখাপেক্ষী না হইয়া, প্রজাশক্তি আত্মচেষ্টায় কিরূপে অভ্যুদয়লাভ করিতে পারে, আধুনিক সভ্যসমাজ তাহার বিবিধ পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। বাঙালী জাগিয়া-উঠিয়া, সেই পথে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। রাজপুরুষগণ না বুঝিয়া, ইহাকে রাজবিদ্রোহ ভাবিয়া, আতঙ্কে অধীর হইয়া, হাস্যাস্পদ হইতেছেন!

আবেদনে-আন্দোলনে রাজপ্রসাদ লাভ করিলেও, তাহা পুনরায় হস্তচ্যুত হইতে কতক্ষণ? যাহা রাজপ্রসাদে বর্দ্ধিত হয় না,—রাজরোষেও বিনষ্ট হইতে পারে না, বাঙালী সেই প্রজাশক্তি লাভ করিবার জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা বৃটিশসাম্রাজ্যের—সমগ্র সভ্যসমাজের—সর্ব্ববাদিসম্মত ন্যায়ানুমোদিত অক্ষুণ্ণ অধিকার। তাহাকে রাজবিদ্রোহ বলিয়া তিরস্কার করিবার উপায় নাই।

বাঙালী আর কখন এমন করিয়া এই মহারত্ন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই। এই ব্যাকুলতা একের নহে, অনেকের;—অনেকের নহে, সকলের। ইহাই যে বাঙালীর আন্তরিক ব্যাকুলতা, তাহা বুঝিবার জন্য ধীরভাবে চেষ্টা না করিয়া, রাজপুরুষগণ অধীর হইয়া বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিতে গিয়া উত্তরোত্তর পরাভূত হইতেছেন। ইহা কোন অধিকার কাড়িয়া লইবার ধর্ম্ম নহে; ইহা কেবল আত্মত্যাগের সরল ধর্ম্ম। আত্মত্যাগের সরল ধর্ম্ম একবার ত্যাগের লক্ষ্য পাইবামাত্র প্রবল হইয়া পড়ে। রাজরোষ যাহার মস্তকে পতিত হয়, সে অমর হইয়া যায়;—একের দৃষ্টান্তে সহস্রের আত্মত্যাগের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে! রাজপুরুষগণ না বুঝিয়া রাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া এই নবধর্ম্মকে উত্তরোত্তর প্রবল করিয়া তুলিতেছেন।

এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া; বাঙালী পার্থক্যত্যাগ করিয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা অসাধ্যসাধন নহে;—ইহাই স্বাভাবিক। জাতিভেদে, ধর্ম্মভেদে, বহুভাগে বিভক্ত বলিয়া, বাঙালীর পক্ষে একতালাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই। জাতিতে অনেক, ধর্ম্মে অনেক,—তাহা মানবসমাজের অনিবার্য্য পার্থক্য। তথাপি এক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক দেশে বসতি করিতে গিয়া, এক সুখদুঃখের অধীন হইয়া, সকল বাঙালীই মাতৃভাষায়, মাতৃধর্ম্মে, মাতৃসেবায় এক। এই নবধর্ম্মই বাঙালীকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৌরব দান করিয়াছে। ইহাকে সকলে মিলিয়া প্রকৃত-পথে পরিচালিত করিতে পারিলেই বাঙালী নবজীবনলাভের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিবে। তাহার জন্য শক্তিসঞ্চয় আবশ্যক।

সে শক্তির নাম আত্মশক্তি। তাহা কদাচ বাহির হইতে আসিতে পারে না। তাহা কেবল অন্তরের অন্তস্তলেই জন্মগ্রহণ করে। একবার জন্মগ্রহণ করিলে, তাহা আর সহসা বিনষ্ট হইতে পারে না। কারণ, তাহা একের নহে, অনেকের; অনেকের নহে, সকলের। এই শক্তি বাঙালীকে প্রকৃতপথে পরিচালিত করিলে, ধরাতল শীতল হইবে—পত্রপুষ্পবিকশিত হইয়া উঠিবে। ইহাকে উপেক্ষা করিলে, বাঙালীর অভ্যুদয়লাভের আশা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইবে।

নবজীবনের প্রথম প্রভাতে সুবিমল সৌভাগ্যগগনের সুনীল চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ,—এত কালের এত ব্যর্থ চেষ্টা, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই; নিষ্ফল চেষ্টাই সাফল্যদান করিয়াছে। যাহা উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই শ্রদ্ধার বিষয় হইয়া

উঠিয়াছে। যে আন্দোলন রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া লাঞ্ছনার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই মাতৃদ্বারে আসিয়া বাঙালীর অশ্রুতপূর্ব্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে। রাজাজ্ঞায় দ্বিখণ্ডিত হইয়াও, বঙ্গভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়সংযুক্ত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল রাজশক্তি সুসংযত প্রজাশক্তির সমক্ষে চরিত্রগৌরবে মলিন হইয়া উঠিয়াছে! আত্মচেষ্টা ভিন্ন পরানুকম্পায় কেহ কখন এরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে না।

আত্মচেষ্টাই আত্মশক্তিবিকাশের একমাত্র সহায়। আত্মচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু তাহাই আবার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। অনুকূল অবস্থায় স্বাভাবিক এবং সহজ;—প্রতিকূল অবস্থায় অস্বাভাবিক এবং কঠিন।

জন্মগ্রহণ করিবামাত্র শিশুসন্তান আত্মচেষ্টার পরিচয় প্রদান করে। তাহা স্বাভাবিক এবং সহজ। সে তাহার ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারিত করিয়া, আহার অন্বেষণের আশায় বদনব্যাদান করে! শক্তির অভাবে, আহার সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, বুভুক্ষাজ্ঞাপন করিয়াই তাহাকে নিরস্ত হইতে হয়! স্নেহময়ী জননী আসিয়া তরল স্তন্যে ক্ষুধানিবারণ না করিলে, তাহাকে বুভুক্ষাজ্ঞাপন করিয়াই জীবনবিসর্জ্জন করিতে হয়। শিশু যেরূপ লঘুপাক তরল খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করিতে পারে, তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্যরূপ খাদ্য দান করিলে,—অথবা লঘুপাক তরল খাদ্যও অপরিমিতমাত্রায় গলাধঃকরণ করাইয়া দিলে,—শিশুর পক্ষে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে!

বাঙালীর বর্ত্তমান অবস্থা শিশুর মতই অসহায়। বাঙালী আপাততঃ পরিমিতমাত্রায় লঘুপাক তরল খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করিতে পারিবে; কঠিন ও গুরুপাক দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবে না। এরূপ অসহায় অবস্থায়,—আত্মচেষ্টার প্রথম প্রভাতে,—যাঁহারা বাঙালীর জন্য কঠিন ও গুরুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তাঁহারা হিতৈষী হইয়াও অজ্ঞাতসারে বাঙালীর অকালমৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিবেন। হিতৈষীর অভাব নাই। অনেক অকৃত্রিম হিতৈষী বাঙালীকে রাতারাতি মানুষ করিয়া তুলিবার আশায়, কত কঠিন ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করাইয়া বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন! তাহা হইতে বাঙালীকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এখন কিছুদিনের জন্য ধনকুবেরগণের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি আবশ্যক। তাঁহারাই নিঃসম্বল বাঙালীর প্রকৃত পিতামাতা। তাঁহাদের আনুকূল্যলাভ করিতে না পারিলে, বাঙালী কেবল বুভুক্ষাজ্ঞাপন করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িবে। এখন কিছুদিনের জন্য অভিজ্ঞগণের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি আবশ্যক। তাঁহারাই অনভিজ্ঞ বাঙালীর প্রকৃত পরিচালক। তাঁহাদের সদুপদেশ লাভ না করিলে, বাঙালী গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িবে!

স্বদেশ সকলের নিকটেই কিছু-না-কিছু সেবা প্রার্থনা করে;—সকলের নিকটে একশ্রেণীর সেবা প্রার্থনা করে না। শক্তিভেদে স্বদেশসেবার প্রকারভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহার যে শ্রেণীর শক্তি, প্রয়োজন

উপস্থিত হইলে তাহাকে সেই শ্রেণীর সমস্ত শক্তি নিঃশেষে মাতৃসেবায় উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়। এইজন্য স্বদেশসেবা বীরের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বীর যেমন স্বদেশসেবার জন্য ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করে না, সঙ্কটকে সঙ্কট জ্ঞান করে না, বরং প্রয়োজন হইলে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে; যাহারা যুদ্ধ করে না, তাহাদিগকেও ঠিক সেই ভাবেই সকল ক্লেশ—সকল সঙ্কট তুচ্ছ করিয়া, প্রয়োজন হইলে স্বদেশসেবার জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। দেশের সমস্ত নরনারী এই-ভাবে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিলে, তাহার সম্মুখ হইতে পর্ব্বত-প্রমাণ বিঘ্নবাধাও ধূলিকণার ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া চলিয়া যায়! ইহাই আত্মচেষ্টার পরিণত ফল। ইহাকে লাভ করিতে না পারিলে, আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে না।

ভারতবাসীর নিকট একদিন এইরূপ আত্মোৎসর্গ সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া সুপরিচিত ছিল। মানবসমাজে যাহারাই অভ্যুদয়লাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এইরূপ আত্মোৎসর্গের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শক্তিলাভের অন্য মন্ত্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস এ বিষয়ে তর্কের প্রশ্রয়দান করে না। পুরাকালের ভারতবর্ষের লোকেও এ বিষয়ে তর্কের প্রশ্রয় দান করিত না। পুরাণকাহিনী ইহারই মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিত; ভাটগণ ইহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বীরগণকে উৎসাহদান করিত; প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনায় ইহারই মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

শিশু যখন আত্মচেষ্টার প্রথম পদবিক্ষেপ করিবার আয়োজন করে, তখন তাহাকে কত-না লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়! কতবার ভূপতিত হইয়া—কখন বা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া,—তাহাকে মানুষ হইয়া উঠিতে হয়। মানবসমাজের অবস্থাও সেইরূপ। অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়,—অনেক ব্যর্থ-চেষ্টার অদৃষ্ট বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। সমুচিত হৃদয়বল না থাকিলে, এই অবস্থায় মানবসমাজ সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে! ইহা অগ্নিপরীক্ষা অপেক্ষাও কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, আত্মচেষ্টায় আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হইতে পারে না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রধান মন্ত্র অধ্যবসায়,—তাহারই নাম তপস্যা।

উদ্দীপনায় আত্মচেষ্টার আরম্ভ হইতে পারে; সমুচিত অধ্যবসায় না থাকিলে, আত্মচেষ্টা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। যাহাকে নিয়ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হয়, তাহার প্রধান বল অধ্যবসায়। মৌখিক উত্তেজনায় সে বল জন্মগ্রহণ করে না; তাহাতে লালসা জন্মগ্রহণ করিতে পারে,—শক্তি বিকশিত হয় না। দৃঢ়বিশ্বাস ভিন্ন অধ্যবসায়লাভের অন্য উপায় নাই। যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, সেই পথই পথ, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসেই অধ্যবসায় লাভ করিতে পারা যায়। তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইলেই অধ্যবসায় অবসন্ন হইয়া পড়ে!

পরাধীন জাতির পক্ষে অভ্যুদয়সাধক অধ্যবসায় লাভ করা আপাতত কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, কঠিন নহে। কারণ, পরাধীন জাতির পক্ষে অভ্যুদয়লাভের একটি ভিন্ন দুইটি পথ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা রাজানুকম্পার সুগম সুবিস্তৃত রাজবর্ত্ম নহে; -তাহা আত্মচেষ্টার নতোন্নত বন্ধুর পরিপথ! যাহার সম্মুখে একটি ভিন্ন দুইটি পথ বর্ত্তমান নাই, সংশয় আসিয়া তাহার অধ্যবসায়কে অবসন্ন করিতে পারে না।

রাজানুকম্পা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাতে ধরিয়া উন্নতিসোপানে উত্তোলিত না করিয়া দিলে, পরাধীনের পক্ষে রাজাকে রাজধর্ম্ম পালন করিবার জন্য বাধ্য করিবার উপায় নাই। সুতরাং পরাধীন জাতি রাজানুকম্পালাভের সুখাবাসে বসিয়া বসিয়া সময়ক্ষয় করিতে পারে না; তাহাকে সময় থাকিতে আত্মচেষ্টার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। সময় থাকিতে! কারণ,—সময় ফুরাইয়া গেলে, আত্মচেষ্টার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়।

বাঙালীর আত্মচেষ্টার সময় যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে! আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; শিক্ষা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে; রাজশাসনে বাঙালীজাতি ক্রমে ক্রমে অপদার্থ হইয়া উঠিতেছে! এখনই আত্মচেষ্টার শেষ অবসর; বুঝি-বা এখনই তাহা অনেকের পক্ষে কঠিন,—কাহারও কাহারও পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! এখনও যে-পরিমাণ চরিত্রবল বর্ত্তমান আছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। এখনও যে-পরিমাণ আত্মত্যাগের সামর্থ্য আছে, অল্প দিনের মধ্যে তাহাও দূরীভূত হইবে। প্রতি দশবৎসরে অন্নহীন বাঙালী রাজকার্য্যে নিয়োগলাভের আশায় অধিক আগ্রহে ধাবিত হইতেছে;—রাজপদ লাভ করিবার আশায়, রাজপুরুষগণের মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া রাজপদ রক্ষা করিবার আশায়, কখন বা কেবল রাজপুরুষগণের শুভদৃষ্টি-আকর্ষণের আয়োজনে, কত বাঙালী অবলীলাক্রমে স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইয়া, কত অকার্য্যে-কুকার্য্যে লিপ্ত হইতেও লজ্জিত হইতেছে না! উপাধিলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যাধির ন্যায় সংক্রামকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধনশালিগণকে অপদার্থ করিয়া তুলিতেছে। দুইদশজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ভিন্ন অনেকের নিকটেই উপাধিশূন্য জীবন যেন দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই স্রোত প্রবাহিত থাকিলে, অল্পদিনের মধ্যেই ধনীর সন্তান উপাধি-লালসায়, দরিদ্রের সন্তান রাজপদলালসায় রাজদ্বারে প্রণত হইয়া পড়িবে। তখন আর আত্মচেষ্টার নামগন্ধও বর্ত্তমান থাকিবে না! জাগিতে হয় ত এখনই,—আত্মসংশোধন করিতে হয় ত এখনই,—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ত এখনই,—ইহার পর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া বাঙালীকে একেবারে রসাতলগামী করিবে!

কাহার অনুগ্রহলাভের আশায় বাঙালী আত্মচেষ্টার শেষ অবসর প্রত্যাখ্যান করিয়া নিশ্চিন্তমনে নীরবে দিন গণনা করিবে? রাজপুরুষগণ আর বাঙালীকে মানুষ বলিয়া মনে করেন না! যাঁহারা দেশের শাসনকর্ত্তা, তাঁহারাও পদগৌরব বিস্মৃত হইয়া, বাঙালীকে প্রকাশ্যভাবে অবমাননা করিবার

জন্যই অধীর হইয়া উঠিতেছেন। ভদ্রতা তিরোহিত হইয়া যাইতেছে; সদ্ভাব দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে; উদারনীতি স্বয়েজ-প্রণালীতে নিমজ্জিত হইতেছে; ভারতবর্ষের কথা উপস্থিত হইলে, পার্লিয়ামেণ্টের সভাগণ আসন ছাড়িয়া ক্রীড়াগৃহে পলায়ন করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন! এরূপ অবস্থায় বাঙালী তাহার স্বদেশের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারিলে, তাহাকে কিছুই করিতে হইত না। কিন্তু স্বদেশের কথা চিন্তা করিতে হইলেই, বাঙালীকে আত্মচেষ্টার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রসাদ লাভ করিবার আশা দিনদিন তিরোহিত হইতেছে; যাহা লাভ করিয়া অধিকারলাভ করিল বলিয়া বাঙালী উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও দিনদিন হস্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছে; রাজশক্তি হৃদয়হীন লৌহদণ্ডের ন্যায় বাঙালীর আকুল আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া তাহার জন্মভূমিকে বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে;—মহাসভায় তাহার বিচার হইবারও অবসর দান করে নাই! শোকার্ত্ত বাঙালীকে আশ্বস্ত করিবার আশায় রাজপুরুষগণ সগর্ব্বে বাঙালীকে তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন,—যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, ইহাকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে; ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিলে কোনস্থানেই সুবিচার লাভ করিতে পারিবে না! পরাধীনকে তাহার অক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অভদ্রতা মিশ্রিত হইয়া পড়ে! বাঙালী অক্ষম;—সে কথা বাঙালীর অপরিজ্ঞাত নাই। কিন্তু যাহারা শাসনকৌশলে বাঙালীকে এমন অক্ষম করিয়া তুলিয়াছে, ইহা তাহাদের শাসননীতির কি শোচনীয় পরিণাম!

আধুনিক সভ্যসমাজে ইংরাজের নাম সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়াছে। ইংরাজের বাহুবলকে তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; ইংরাজের উদারনীতিই তাহার একমাত্র কারণ। এই কারণে, যে দেশে যাহারা উদারনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহারাই ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসননীতি প্রজার কল্যাণকামনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই শাসননীতি ভারতবর্ষে আসিয়া কত না কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে! বক্তৃতায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজমুকুটের সমুজ্জ্বল রত্নপদক বলিয়া করতালি লাভ করিতেছে;—ব্যবহারে ভারতবর্ষ ইংরাজের গৃহপালিত কুক্কুরের মতও সমাদর লাভ করিতেছে না! ইহা অপেক্ষা ইংরাজশাসননীতির আর কি শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইতে পারে?

বাঙালী চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে;—ইংলণ্ডের এবং সমগ্র বৃটিশসাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা মহাসভার সভ্যগণকে ভারতবর্ষের কল্যাণসাধনের জন্য যথোপযুক্তভাবে জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই! বাঙালীর আত্মচেষ্টা এ পর্য্যন্ত যে সকল চিরপরিচিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়! দেশের অবস্থা,—দেশের আকাঙ্ক্ষা,—দেশের অভাব,—রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর করিবার প্রধান উপায় সংবাদপত্র এবং সভা। বাঙালী ইংরাজের

কাছেই তাহার শিক্ষালাভ করিয়া, সেই উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া, ইংরাজের কাছেই উপহাস ও তিরস্কার লাভ করিয়াছে! রাজপ্রতিনিধির শুভাগমনের সংবাদে দেশের লোকে চাঁদা তুলিয়া, তোরণ সাজাইয়া, আতস পোড়াইয়া, প্রদীপ জ্বালাইয়া, উপঢৌকনহস্তে রাজপ্রতিনিধির সমীপবর্ত্তী হইয়া যখন তিরস্কার এবং উপহাস লাভ করে, তখন জনসাধারণ যে কি মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া থাকে, তাহা মানবভাষায় ব্যক্ত হয় না। বাঙালী বহুবার এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে!

উপর্য্যুপরি বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া, বাঙালী এতদিনের পর বলিয়া উঠিয়াছে,—আর না—যথেষ্ট হইয়াছে,—এবার কেবল আত্মচেষ্টা। ইহা রাজবিদ্রোহ নহে: ইহা অনুদার শাসননীতির অনিবার্য্য ঐতিহাসিক পরিণাম! চিকিৎসায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া, ব্যাধিগ্রস্ত মানবগণ শৈলে শৈলে পরিভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাও সেইরূপ আত্মচেষ্টা। ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম,—রাজানুকম্পালাভের জন্য অরণ্যে রোদন করিবার ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম। এই পরিণাম বাঙালীর নিকট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে;—তাহাকে আর কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য উত্তেজনা করিবার প্রয়োজন নাই। এখন বাঙালী পথ পাইয়া সেই পথে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ পথে হয় না, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কোন্ পথে হইতে পারে, তাহাই ধীরভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আঘাতের পর আঘাতে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইলে, একদিন না একদিন আত্মশক্তিলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সহসা জাগিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সহসা আত্মশক্তি লাভ করা অসম্ভব। তাহা তপস্যালব্ধ অমৃতফল;—তপস্যা ভিন্ন, ইচ্ছা করিলেই, সহসা আত্মশক্তি লাভ করা যায় না। তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে আত্মাকে লাভ করিতে হয়। কিন্তু—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—

বলহীন সহসা আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বাঙালী বিচ্ছিন্ন বলিয়াই বলহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এতকাল বাঙালী যে তাহার আত্মতত্ত্ব ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কল্পনাবলে কবিকাহিনী রচনা করিয়া, নিরন্তর মৃগতৃষ্ণিকার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে;—বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকিলে, কেহ কখন প্রকৃত আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ করিতে পারে না!

এবার ঘটনাক্রমে বাঙালী একবার সম্মিলনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবামাত্র, আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ করিয়াছে। বাঙালী দুর্ব্বল,—বাঙালী পরাধীন,—বাঙালী কলহকোলাহলে বিচ্ছিন্ন,—বাঙালী ঈর্ষাদ্বেষে জরাজীর্ণ;—এই সকল কারণেই বাঙালী আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভে অসমর্থ ছিল। এখন বাঙালী বুঝিয়াছে,—বিচ্ছিন্ন থাকিবার কারণ নাই;—ধনিদরিদ্র এক; পণ্ডিতমূর্খ এক; হিন্দু-মুসলমান এক। এক সুখদুঃখ, এক আশা-নিরাশা, এক ভাষা-সাহিত্য, এক জন্মভূমি সকলকেই এক সূত্রে বাঁধিয়া

রাখিয়াছে। বাঙালী পতিত; তথাপি উত্থিত হইতে পারে। বাঙালী বিচ্ছিন্ন; তথাপি সংযুক্ত হইতে পারে। বাঙালা বহুভাগে বিভক্ত; তথাপি এক হইয়া উঠিতে কতক্ষণ? এক হইয়া উঠিতে পারিলে, বাঙালীরও অভ্যুদয়লাভের আশা আছে। ইহাই বাঙালীর আত্মতত্ত্ব। না বুঝিয়া বাঙালীই বাঙালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে; না জানিয়া বাঙালী তাহার মাতৃভূমির মঙ্গলদ্বার ছাড়িয়া দূরে দূরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া পরিশ্রান্ত হয়; না চিনিয়া বাঙালী তাহার আপন ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিয়া, পরকে আপন করিতে গিয়া, নিয়ত আত্মাবমাননা সহ্য করে। আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ করিয়া বাঙালী তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থতত্ত্বে অন্ধ হইয়া বাঙালীর আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাহারাও অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিবে,—জাতিগত স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ কত অকিঞ্চিৎকর। তাহা বুঝিতে অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হইবে না। যাহা সকলের স্বার্থ, তাহাই প্রত্যেকের স্বার্থ; যাহা সকলের সমষ্টিগত স্বার্থের অমঙ্গল আনয়ন করে, তাহা কাহারও প্রকৃত স্বার্থ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা আত্মদ্রোহ;—তাহাই স্বদেশদ্রোহ। তাহার জন্যই বাঙালীর কত সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! আবার কি বাঙালী স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইবে?

বাঙালার রক্তশোষণ করিয়া আত্মপোষণ করা যাহাদের বাণিজ্যনীতি, তাহারা বাঙালীকে ভুলাইয়া রাখিয়া স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টায় প্রাণপণে বাধা প্রদান করিবে। ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালী স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনে বাধাপ্রদান করিলে, তাহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। যাহারা তাহাতে অগ্রসর হইবে, তাহারা অল্পকালের মধ্যেই আত্মভ্রম বুঝিতে পারিবে। আত্মশক্তিই যে সকলের অভ্যুদয়লাভের একমাত্র পথ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া, সকলকেই সমানভাবে তপস্যায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্য তপস্যায় নিযুক্ত হইতে হইলে, দুই শ্রেণীর তপস্যায় নিযুক্ত হইতে হয়। এক শ্রেণীর তপস্যার নাম সংযম; অপর শ্রেণীর তপস্যার নাম মনন। এই উভয় শ্রেণীর তপস্যার সাধারণ নাম সাধন। অভ্যাসে সাধিত হয় বলিয়াই তাহার নাম সাধন।

যে সকল কারণে, যে সকল কার্য্যে, যে সকল অভ্যাসে, আত্মশক্তির অপচয় সাধিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সাধক তাহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য সংযমের অভ্যাস করেন। সংযমে শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়; সংযমে অপচয় অপসারিত হইয়া শক্তিসঞ্চয়ের সূত্রপাত হয়। সাধক তাহার জন্য আত্মনিগ্রহ করিতেও ত্রুটি করেন না। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য, প্রায়শ্চিত্ত,—সমস্তই সংযমের অন্তর্গত। সংযমের প্রধান লক্ষ্য ত্যাগ;—সারাৎসারকে লাভ করিবার জন্য অসারের ত্যাগ। তাহা আপাতত কঠোর বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, সত্যসত্যই কঠোর নহে। যে ভাণ্ডে অমৃত সঞ্চিত হইবে, তাহার ছিদ্ররোধ করা কর্ত্তব্য

কি না, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না।

বাঙালী আত্মশক্তিলাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে সংযম অবলম্বন করিয়া ত্যাগস্বীকারের কঠোরতা সহ্য করিতে হইবে। যাঁহারা প্রধানপুরুষ,—যাঁহাদের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাতসারে শনৈঃশনৈ জনসাধারণের অনুকরণীয় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, তাঁহারা জ্ঞানবলে আত্মশক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইলেও, তাঁহাদিগকেও লোকশিক্ষার্থ আচারে ব্যবহারে, কথায়-কার্য্যে সংযমের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। বিলাসেই বাঙালী এত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে! যে সকল দ্রব্যের আদৌ প্রয়োজন ছিল না, অভ্যাসে তাহারও প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য সকলকেই যথাসাধ্য যত্ন করিতে হইবে। যাহার আদৌ প্রয়োজন ছিল না, তাহাকে ত্যাগ করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে!

অর্থই বাঙালীর নিকট পরমার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তাহাতে সংযম ভাসিয়া গিয়াছে; সম্ভোগ প্রবল প্রতাপে জাগিয়া উঠিয়াছে! সংযম কঠোর; সম্ভোগ প্রলোভনময়। প্রলুব্ধ বাঙালী যে-কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! অতি অল্পদিনের মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের নিকৃষ্ট পন্থাকে অধিক আগ্রহে অবলম্বন করিতে গিয়া, বাঙালী তাহার সাহস, সত্যনিষ্ঠা এবং আত্মসম্মান অতলজলে বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে সমাজে ধনের সম্মানই যথার্থ সম্মান বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, সে সমাজের নির্ধনেরাও সম্মানলালসায় ধনী সাজিবার জন্য বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ন্যায়পথে থাকিয়া যে অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে, তাহাতে ধনী সাজিবার সুবিধা না হইলে, অন্যায়পথেও অর্থোপার্জ্জনের সূত্রপাত হয়! ক্রমে চরিত্রবল বিনষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া পশুত্বের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মপ্রচারক অথবা ধর্ম্মাধিকরণ লোকসমাজের অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারে না। জনসমাজ কেবল প্রথারক্ষার্থ ধর্ম্ম স্বীকার করে; কেবল দণ্ডভয়েই ধর্ম্মাধিকরণ স্বীকার করে; কিন্তু ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাধিকরণকে গোপনে পদদলিত করিয়া অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে বিরত হয় না!

যাহার অর্থ নাই, সে সমাজে হেয় হইয়া পড়ে! তাহার সকল গুণ একমাত্র দারিদ্র্য-দোষেই বিস্মৃত হইয়া যায়। ধনি-দরিদ্রের হৃদয়বন্ধন এইরূপেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। বাঙালীর মধ্যেও তাহারই সূত্রপাত হইয়াছে। যে দেশে ধন কখনও সম্মানের পরিমাপক বলিয়া পরিচিত ছিল না, সে দেশ হইতেও আন্তরিকতা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে;—কেবল বাহ্যাড়ম্বরই তাহার শূন্যস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

হিন্দুর সহিত সদ্ভাবে ও সমাদরে একত্র বসতি করিয়া মুসলমান তাহার হিন্দু প্রতিবেশীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে জাতিভেদ এবং ধর্ম্মভেদ থাকিতেও, হৃদয়ভেদ ছিল না। ক্রমে হিন্দুমুসলমান কি শিক্ষা শিখিল,—তাহারা নিরক্ষর এবং নির্ধন স্বদেশবাসীকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল!

যাহারা ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া শস্য উৎপন্ন করে,—যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া ধনীর ধনমান রক্ষা করিয়া থাকে,—যাহারা বিনিদ্র-নয়নে রজনীযাপন করিয়া লোকসমাজের দস্যুভয় নিবারণ করে,—অভ্যাসদোষে ধন-কুবেরগণ তাহাদিগকেই অবজ্ঞা করিতে শিখিয়া আত্মাবমাননা করিতেছে! এই অভ্যাসদোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

হিন্দুমুসলমানের সাম্রাজ্যকলহ এখন ইতিহাসের জীর্ণদপ্তরে নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে। মোগলপাঠানের গৃহকলহের ন্যায় তাহাও সাম্রাজ্যকলহ মাত্র। সে কলহের অবসানে, হিন্দুমুসলমান এক হইয়া উঠিয়া একত্র জন্মভূমির সেবা করিয়া আসিয়াছে। আজ যে সকল মুসলমান ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তায় মতিভ্রান্ত হইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে হৃদয়গতপার্থক্যসৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা অজ্ঞাতসারে স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইতেছে। আজ বাঙ্গলাদেশই যাহাদের স্বদেশ, তাহারা যে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছে, তাহাকে স্বদেশদ্রোহ ভিন্ন আর কি বলিয়া অভিহিত করিব? সকল হিন্দুই পরাধীন; সকল মুসলমান পরাধীন নহে। এখনও ভারতবর্ষের বাহিরে মুসলমানের স্বাধীন-রাজ্য বর্ত্তমান আছে। তাহারা স্বদেশের জন্য এখনও অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করে; তাহাদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা বাঙ্গলাদেশে বাস করিয়া স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইতেছে, তাহারা যে সমগ্র মুসলমানসমাজের অকৃত্রিম কৃপাপাত্র, তাহাতে সংশয় নাই। বাঙ্গালী মুসলমানের হিন্দু ভিন্ন আত্মীয় নাই; বিপদে পড়িলে হিন্দু ভিন্ন দাঁড়াইবার স্থান নাই; জীবিকার্জ্জনের জন্য হিন্দু ভিন্ন সহায় নাই; ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দু ভিন্ন মহাজন নাই। সেই মুসলমানসমাজের এক শ্রেণীর লোক যখন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে হৃদয়ভেদ উপস্থিত করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছে, তখন তাহাদিগকে কৃপাপাত্র ভিন্ন কি বলিব? হিন্দুমুসলমান বঙ্গমাতার যমজসন্তান,—উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন; উভয়ের আশাভরসা এক সূত্রে গ্রথিত।

রাজদ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষাকে কাহারও পক্ষেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহা সকল দেশেই অক্ষম অপদার্থ লোকের অনন্য-গতি বলিয়া সুপরিচিত। স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া, স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষাকেই সকল দেশের ইতিহাস প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া ঘোষণা করে। যে সকল মতিভ্রান্ত মুসলমান গোলামীকেই মুসলমানসমাজের বড় হইয়া উঠিবার রাজপথ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তাহাদের পুত্রপৌত্রগণ ইহার জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করিতে পারিবে না। আজ যাহারা স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইতে লজ্জিত হইতেছে না, তাহাদের পুত্রপৌত্রেরাই এ সকল কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবে! এই সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যক। ইহা কি সত্য-সত্যই এত কঠিন যে, মাতৃভূমির মঙ্গলদ্বারে দাঁড়াইয়া হিন্দুমুসলমান এই অকীর্ত্তিকর স্বদেশদ্রোহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না?

বিলাস ত্যাগ করিতে পারিলে, অসদ্ভাব ত্যাগ করিতে পারিলে, অভ্যাসদোষ ত্যাগ করিতে পারিলে, স্বদেশদ্রোহ ত্যাগ করিতে

পারিলে, বাঙালী অল্পদিনের মধ্যেই এক হইয়া উঠিয়া শক্তিলাভ করিতে পারিবে। এইরূপে শক্তির অপচয়ের পথ রুদ্ধ হইলে বাঙালীই বাঙালীকে শক্তিদান করিতে পারিবে; একের দৃষ্টান্ত অনেককে,—অনেকের দৃষ্টান্ত সকলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিবে।

জনসাধারণ যাহাকে গৌরবদান করে, রাজা তাহাকে দণ্ডদান করিলেও, তাহার গৌরব তিরোহিত হয় না। জনসাধারণ যাহাকে গৌরবদান করে না, রাজা তাহার আপাদমস্তক উপাধিবিজড়িত করিয়াও, যথার্থ গৌরবদান করিতে পারেন না। এই ভাব বাঙালীর মধ্যে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; ইহাতেই ধনকুবেরগণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সবল হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা দেশের,—দেশ তাঁহাদের,—এই আশ্রিত-আশ্রয়দাতার চিরপরিচিত স্নেহের সম্বন্ধ ইতিহাসের সম্বন্ধ। রাজা কেবল সস্নেহে করমর্দ্দন করিয়া আপ্যায়ন করিতে পারেন; দেশের লোকেই দেশের লোককে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া স্বদেশের কীর্ত্তিমন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারে। ধনিদরিদ্রের এই সুখের সম্বন্ধ পুনঃসংস্থাপিত হইবামাত্র, সকলেই আত্মশক্তি লাভ করিতে পারিবে। তাহাই নবজীবনলাভের সুপরিপক্ক অমৃতফল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

১

হৈদরাবাদের অভিমুখে।

আর সে তৃণশ্যামলা ভূমি নাই; আর সে তালজাতীয় বৃক্ষাদি নাই; আর সে লাল মাটি দেখা যায় না। বেশ একটু শীত পড়িয়াছে।...পণ্ডিচেরি ও মান্দ্রাজের হরিৎশ্যামল প্রদেশ ছাড়িয়া আসিবার পর,—সমস্তরাত্রি ভ্রমণ করিয়া আজ যখন প্রথম জাগ্রত হইলাম, তখন এই সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সেই "চিরকেলে" "কাকদিগের কাকা-ধ্বনি ছাড়া আর সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঝাঁজাপোড়া মাটি, ধূসরবর্ণের মাঠ, জোয়ারিশস্যের ক্ষেত, পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নারিকেলের পরিবর্ত্তে শুধু কতকগুলা বিরল মুসব্বর-তরু, শীর্ণকায় তাপশুষ্ক খর্জ্জুরবৃক্ষ—গ্রামপল্লির চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতেছে। মনে হয়, এখানকার গ্রামগুলিও যেন একটা কৃত্রিম আরবী-ভাব ধারণ করিয়াছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী মরুভূমির সহিত, বিবাদময় প্রদেশসমূহের সহিত যে ইস্‌লামজাতির চিরসম্বন্ধ, সেই ইস্‌লামজাতি এখানে আসিয়া যেন তাহাদের জাতীয়ভাবটি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।

পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন। লোকদিগের গাত্র আর নগ্ন দেখা যায় না, পরন্তু শুভ্র পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। আর সে দীর্ঘ-লম্বিত কেশগুচ্ছ দেখা যায় না, পরন্তু মস্তক উষ্ণীষের দ্বারা আচ্ছাদিত।

মাঠময়দানের উপর দিয়া যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যেন শুষ্কতার বৃদ্ধি হইতেছে। যে-সব ধান্য-ক্ষেত্রের উপর হলকর্ষণের রেখাচিহ্ন বিদ্যমান, সেই ক্ষেতগুলি যেন আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া গিয়াছে। জোয়ারি-ক্ষেতগুলি অপেক্ষাকৃত তাপসহ হইলেও, তাহার অধিকাংশই "হলুদে-মারিয়া" গিয়াছে। যে-সব ক্ষেত এখনো টিকিয়া আছে, সেই সব ক্ষেতের অল্প-স্বল্প শস্য পাছে পাখী ও ইঁদুরে খাইয়া ফেলে, সেইজন্য কৃষকেরা মাচার উপর বসিয়া পাহারা দিতেছে। হায় হায়! বেচারা মানুষ, দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া, ক্ষুধাক্লিষ্ট দুঃসাহসী পশুর গ্রাস হইতে দুইচারিমুঠা শস্য বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে যুঝাযুঝি করিতেছে।

শীতরাত্রির অবসানে সূর্য্যদেব চুল্লি-জ্বলন্ত প্রখর তাপ ভূমির উপর নির্দ্দয়ভাবে ঢালিয়া দিলেন। আকাশ স্বচ্ছ নীলবর্ণ ধারণ করিয়া একটা বিশাল নীলকান্তমণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

দিবাবসানে, এখানকার ভূভাগ, এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিল। অফুরন্ত তাপদগ্ধ জোয়ারি-ক্ষেতের উপরে, তাপদগ্ধ জঙ্গলের মধ্যে, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শ্যামল পাষাণস্তূপ;— বিচিত্র আকারের, বস্তুপিণ্ড, অসংলগ্ন বড়-বড় গণ্ডশৈল। মনে হয়—যতপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে,—অদৃঢ়ভাবে—কোন-এক পদার্থকে বসানো যাইতে পারে, সেইরূপ করিয়া উহাদিগকে বসানো হইয়াছে। কোনোটা একেবারে খাড়া হইয়া আছে; কোনোটা ঝুঁকিয়া আছে; এবং এই বিচিত্র-আকারের প্রস্তরগুলি এরূপভাবে পুঞ্জীভূত যে, উহাতে কতকটা পর্ব্বতের সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আবার উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিকই পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ।

অবশেষে, সূর্য্যাস্তসময়ে হৈদরাবাদ দৃষ্টিগোচর হইল। শাদা ধূলায় আচ্ছন্ন—সব শাদা। সেই মুসলমানী-ধরণের খিলানওয়ালা ছাদ; সেই লঘুগঠনের ধ্বজচূড়াসমূহ (minaret)। চতুর্দ্দিকস্থ তরুপল্লব শুষ্ক ও মুমূর্ষু। মনে হয় যেন, ঋতুনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে;—গ্রীষ্মসায়াহ্নে যেন বিষণ্ণ শরতের আবির্ভাব। নগরের পাদদেশ দিয়া যে নদীটি বহিয়া যাইতেছে, উহার তল-পরিসর বৃহৎ মূলনদীর ন্যায়; কিন্তু উহার জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে; উহার জল এত নিম্নতলে যে, প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। হাতীরা দলে-দলে (তটভূমিরই ন্যায় ধূসরবর্ণ) ধীরপদক্ষেপে একেবারে নীচে নামিয়া যাইতেছে। নদীতে অবতরণ করিয়া উহারা জলপান করিবে—স্নান করিবে।

দিবাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে, নগরের পশ্চাদ্ভাগে, পশ্চিমদিক্‌টা যেন আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। ভস্মাচ্ছন্ন নীলিমায় নগরের সমস্ত শুভ্রতা যেন নির্ব্বাপিত হইল। এ-হেন সুন্দর আকাশে, এই সময়ে বাদুড়েরা নিঃশব্দে সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

২

হৈদরাবাদে।

কিন্তু যাহাই হউক, প্রতিবেশী রাজপুতের ন্যায়, এই রাজ্যের লোকেরা এখনও ক্ষুধার জ্বালায় ততটা অভিভূত হয় নাই এবং পল্লী-স্থানতুল্য উঁহাদের রাজধানীটি আজ উৎসব-আনন্দে আকণ্ঠ নিমগ্ন;—উহারা নিজামের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সমস্ত গৃহের পতাকায়, এবং রাজপথে রেশম-মখমল-মণ্ডিত যে-সব বিজয়তোরণ স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের শিরোদেশে, এই কথাগুলি বড় বড় সোনালি অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে:—"আমাদের নিজামবাহাদুর দীর্ঘজীবী হউন।"

শুভ্রবর্ণ হৈদরাবাদ। একটি শুষ্কপ্রায় নদী সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে; হাতীরা দলে-দলে নদীতে নাবিয়া উহার শীতল জলে অবগাহন করিতেছে। এখনো কেন নিজাম স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন না —তাই, উৎসবমত্ত হৈদরাবাদ,—ধ্বজপতাকা-ভূষিত হৈদরাবাদ, একসপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

যে বিশাল প্রস্তরসেতু দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হয়, সেই সেতুর মুখে স্বর্ণপত্র-খচিত লাল "ক্রেপ্"-বস্ত্রে মণ্ডিত একটি দ্বারপ্রকোষ্ঠ প্রসারিত;—তাহারি ঝালরে লেখা রহিয়াছে;—"স্বাগত নিজাম-বাহাদুর।"

এই সেতুর উপর দিয়া কত বর্ণের কত লোক পদব্রজে, কত লোক যানে, কত লোক বাহনে চলিয়াছে;—কতপ্রকার যান, কতপ্রকার বাহন, কতই সমারোহ, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! বিবাদময় বিজনতার মধ্য দিয়া যখন আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন প্রত্যাশা করি নাই, যে-নগর ক্ষেত্র-ভূমির মধ্যে,—প্রস্তরময় ধূসর মাঠময়দানের মধ্যে বিলীন, সেই নগরটিকে এমন জীবন-উদ্যমে পূর্ণ দেখিব, এমন উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত দেখিব, এমন উৎসবানন্দে মত্ত দেখিব।

শাদা-শাদা, সোজা-সোজা, বড়-বড় রাস্তা—লোকের জনতায় সমাচ্ছন্ন। ফুলের রঙের আভায় যেরূপ নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ভেদ লক্ষিত হয়, এই সব লোকদিগের মুখবর্ণেও সেইরূপ সূক্ষ্ম ভেদ বিদ্যমান। দেখা যায় প্রথমেই উষ্ণীষের অনন্ত বৈচিত্র্য ও বিলাসলীলা দেখিয়া; পাগ্‌ড়ির সোনালি রং,—"সামন্"-মাছের রং—পিচ-ফুলের রং। কোনোটায় কুমুদফুলের, কোনোটায় "অ্যামারান্থ"-ফুলের, কোনোটায় "নার্সিসাস্"-ফুলের, কোনোটায় "বটর্‌কপ্"-ফুলের রং। পাগ্‌ড়িগুলা প্রকাণ্ড-বড়;—ছোট-ছোট একপ্রকার ছুঁচাল-মুখ টুপির চারিধারে জড়াইয়া বাঁধা; এবং পাগ্‌ড়ির আঁচ্লাটা, পিছনদিকে, পরিচ্ছদের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ ব্যবধানে স্থাপিত রাজ-পথের বিজয়তোরণগুলা গৃহসমূহের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তোরণের উপরে সোনালি-"অর্দ্ধচন্দ্র"-সমন্বিত মসজিদ-শ্রেণীর ধ্বজচূড়া (minaret)। কোথাও বা, এই তোরণের সহিত—রেশমমণ্ডিত ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত লঘুধরণের দ্বারপ্রকোষ্ঠ সংযোজিত নিজামের স্বাগত-অভ্যর্থনার জন্য এই সমস্ত

স্থাপিত হইয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে—রাজপথসমূহের কেন্দ্রদেশে,—চৌমাথা রাস্তার উপর, একটা বিরাট্‌-প্রকাণ্ড "চারমুখো" তোরণ,—যাহার ধ্বজচূড়া সহরের সমস্ত ধ্বজচূড়া ছাড়াইয়া, মস্‌জিদের শীর্ণকায় ধ্বজচূড়া ছাড়াইয়া, হৈদরাবাদের শুভ্র ধূলারাশি ছাড়াইয়া, সুনির্ম্মল ধ্রুব আকাশে একেবারে সিধা উঠিয়াছে।

সাঁধাসিধা ছুঁচাল-মুখ আর্‌বী-খিলান্‌গুলা ভারতে আসিয়া একটু জটিলভাব ধারণ করিয়াছে,—এখন উহাতে কোথাও বা ফুলধারার কাজ—কোথাও বা খাঁজ-কাটা কাজ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় শিল্পীরা মূল-আদর্শের নক্‌সাকে শ্রীসম্পদে আরো যেন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক গৃহের প্রথম-তলে কত যে বিচিত্রধরণের ছোট-ছোট খিলান সারি-সারি চলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। খিলানগুলা খুব ছুঁচাল অথবা খুব "খ্যাব্‌ড়া"-ধরণের; কোনোটা গোলাপ-পাপড়ির আকারে,—কোনোটা বা ত্রিপত্র কিংবা বহুপত্র তৃণের আকারে গঠিত। বরাবর রাস্তার ধারে-ধারে, খোলা বারণ্ডার নীচে, দোকানিদারেরা গদি ও গালিচার উপর উপবিষ্ট। দোকানের পশ্চাদ্ভাগে, প্রাচীরের গায়ে বাহির-খিলানের অনুকরণে খিলানের একটা নক্‌সা কাটা—সবুজ, নীল কিংবা সোনালি রঙে রঞ্জিত; এবং উহাতে প্রায়ই ময়ূরাদির ন্যায় কোন বৃহৎ পক্ষীর বিস্তারিত পুচ্ছের অনুকৃতি দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। কোথাও রত্নাদির অলঙ্কার, কোথাও মুক্তার কণ্ঠহার, কোথাও বা বলয়াদি বিক্রীত হইতেছে। সকল দোকানেই,—বহুমূল্য রত্নাদির পার্শ্বে কাচের জিনিষ, এবং খাঁটি সোনার পার্শ্বে ঝুঁটা-চুম্‌কির জিনিষ ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। সুগন্ধিদ্রব্যের দোকানে—পুরাতন চীনের বুয়েমের মধ্যে বিবিধ ফুলের আতর সংরক্ষিত। একটা দোকানে চুম্‌কি-বসানো, জরির কাজ-করা ঝক্‌মকে তুকি-চটিজুতা রহিয়াছে। গণ্ডোলা-নৌকার মুখের মত উহাদের অগ্রভাগ উপরদিকে বাঁকানো। মধ্যে-মধ্যে ফুলের দোকান; ছিন্নবৃন্ত গোলাপফুল ছোট-ছোট পাহাড়ের মত স্তূপাকারে সজ্জিত; বালকেরা জুঁই-ফুলের রাশীকৃত স্তূপ হইতে ফুল উঠাইয়া-লইয়া মুক্তা গাঁথিবার মত মালা গাঁথিতেছে। কোথাও বা অস্ত্রাদি বিক্রীত হইতেছে;—বর্শা, দুই-হাতে-ধরিবার বড়-বড় তলোয়ার, একটা বিশেষ-আকারের বাঘ-মারা ছোরা। যখন বাঘ মুখব্যাদান করিয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে, তখন এই ছোরা তাহার গলায় বসাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও বা ঝুঁটা-জরির বরের পোষাক,—চুম্‌কি-বসানো বর-কনের টোপর বিক্রীত হইতেছে। আর এক স্থানে, (গৃহাদির সম্মুখে, খানিকটা "পদ-পথ" জুড়িয়া) কতকগুলি লোক মিহি কাপড়ের উপর নক্‌সা ছাপিতেছে। এই কাপড়গুলা বাষ্পবৎ স্বচ্ছ; লাল, সবুজ কিংবা হল্‌দে জমির উপর,—রূপালি কিংবা সোনালি রঙের ছোট-ছোট নক্‌সা; এই নক্‌সাগুলি আদৌ স্থায়ী নহে; এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে সমস্তই ধুইয়া যায়; কিন্তু উহার বর্ণবিন্যাস অতি চমৎকার; এই সকল কাপড় অতি "খেলো" হইলেও, যখন এই যুবকযু-

সেবী শিল্পীদিগের হস্ত হইতে বাহির হইয়া আইসে, তখন যেন উহা কোন পরীর মোহন অবগুণ্ঠন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সোনা, সোনা, এখানে সর্ব্বত্রই সোনা; অথবা তাহার অভাবে ঝুঁটা-জরি, সোনালি পাত—এমন কোন-কিছু—যাহা দীপ্ত ভানুর উজ্জ্বল কিরণে ঝিক্‌মিক্ করে, কিংবা কুতূহলী দর্শকের নেত্ররঞ্জন করে।

এখানকার ধূলা শুভ্র, গৃহগুলি শুভ্র এবং লোকের পরিচ্ছদ শুভ্র। তুষারবৎ শুভ্রতা—রাজপথে, জনতার মধ্যে, দোকান-হাটে; এবং লোকদিগের অম্লান-শুভ্র পরিচ্ছদের উপর—বৃহদাকার মল্‌মল্-পাগ্‌ড়ির সমস্ত "সারিগম" মন্দ্রগ্রাম হইতে তারগ্রাম পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

রমণীরা অদৃশ্য; (কেন না, ইহা মুসলমান-রাজ্য) একটা শাদা ঘেরাটোপে উহাদের আপাদমস্তক আবৃত; বিড়ালগর্ত্তের ন্যায় প্রায়ই উহাতে এক্‌একটা ছিদ্র কাটা;—তাহার মধ্য হইতে, কোলের-শিশুর মত ছোট-ছোট সুন্দর মাথা বাহির হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দীর্ঘপ্রবাসী নৃপতির মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য যে-সমস্ত রেশম, মল্‌মল্, মখ্‌মলের সাজসজ্জা স্থানে-স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহারা সকলেই যেন নীরবভাষায় বলিতেছে:—"নিজামের জয় হউক্!" সমস্ত হৈদরাবাদ আজ উন্নাসভরে নিজামের প্রতীক্ষা করিতেছে। এক সপ্তাহ হইতে সমস্তই প্রস্তুত হইয়া আছে;—এমন কি, সজ্জিত পুষ্পগুলি সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া যাইতেছে। এখন নিজাম আসিরিক-আড়ম্বর-সহকারে কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন;—১২খানা সোনার গাড়ি তাঁহার পিছনে-পিছনে চলিয়াছে। তিনি স্বরাজ্যে আর ফিরিয়া আসেন না, কোন সংবাদ দেন না, যাহা খেয়াল হইতেছে তাহাই করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ইহাতে বিস্মিত নহে;—কেন না, তাহারা সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে। তাই, নিরাশ না হইয়া তাহারা ক্রমাগত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তা ছাড়া, এই সকল লঘুবস্ত্রের সাজসজ্জা যে বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবে, তাহারও কোন আশঙ্কা নাই; কেন না, আকাশ এখন একেবারেই নির্মেঘ।

প্রতিদিন, যেমন বেলা অধিক হইতে থাকে—সেই পরিমাণে, সমস্ত নগরীর ধূলিরাশি, জনকোলাহল, সঙ্গীতাদিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে; অবশেষে, রাত্রিসমাগমে সমস্তই উপশান্ত হইয়া যায়।

ঘোড়ার গাড়ি, বলদের গাড়ি ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। রহস্যময়ী পর্দ্দা-মহিলাদের জন্য, ডিঙির আকারে বাঁখারির গাড়ি—পর্দ্দায় সমস্ত ঢাকা। পর্দ্দায় স্থানে-স্থানে ছিদ্র। সেই ছিদ্রের মধ্য হইতে রূপসীগণ সুচিত্রিত "ডাগর আঁখির" তীক্ষ্ণ-বাণবর্ষণ জনতার উপর করিতেছেন। কোথাও কোন সুপুরুষ অশ্বারোহী ছুঁচাল-টুপির চারিধারে-জড়ানো আলাদিন-ধাঁচার পাগ্‌ড়ি পরিয়া, জিনের পাশে বাঁকা আঁট্‌-কাইয়া—খুব ছুটিয়া চলিয়াছে। বণিক্-দলের উটগুলা দীর্ঘরেখাকারে সারি-সারি চলিয়াছে। ধূলাধূসরিত, কর্দ্দমলিপ্ত মহুর-হাতীরা কর্ম্মান্তে ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিলাসী হাতীরা সানাই-বাদ্য-সহকারে বর-যাত্রীর সঙ্গে চলিয়াছে;—পৃষ্ঠের উপর, বাসাচ্ছাদিত হাওদার মধ্যে—বর প্রচ্ছন্ন।

পাল্কীবাহকদের, মন্ত্রপাঠের ন্যায়, একঘেয়ে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে; জরির কাজ-করা রাশি-রাশি তাকিয়া-বালিশের উপর, চস্মাধারী কোন বৃদ্ধকে, অথবা কোন গম্ভীরমূর্ত্তি মোল্লাকে চড়াইয়া, উহারা চটুল পদক্ষেপে চলিয়াছে। ফকিরেরা কড়ি-সমাচ্ছন্ন কাঁথা পরিয়া, পথে-পথে ভ্রমণ করিতেছে;—এই সব আকুলচিত্ত উন্মাদ-গ্রস্ত লোকেরা সাধু বলিয়া সমাদৃত;—এখন হইতেই উঁহাদের নেত্র অন্তত্র—পরলোকের দিকে নিয়োজিত। বৃদ্ধ দরবেশদিগের সুদীর্ঘ কেশকলাপ;—সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন। উহারা ঘণ্টা নাড়িতে-নাড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছে। ইয়েমেন্‌বাসী আরবেরা দলে-দলে ভ্রমণ করিতেছে; নিজাম উহাদিগকে সযত্নে নিজ-রাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন; উহারা যাহাতে স্থায়ী হইয়া প্রজাদের মধ্যে মিশিয়া যায়—ইহাই নিজামের মনোগত অভিপ্রায়। ঐ দেখ, দূর-অঞ্চলের কোন অশ্বারোহী সর্দ্দার,—জংলি-মূর্ত্তি, মহাকায়—ঘোড়াকে বিচিত্র-ভঙ্গীতে দৌড় করাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে কতকগুলা বল্লমধারী ঘোড়-সওয়ার।

ধূপের সৌরভ,—সাজসজ্জার দোকানে পর্ব্বতাকারে সজ্জিত গোলাপফুলের সৌরভ,—যুঁথিতরা শাদা জুঁয়ের সৌরভ, তুষার-পাতের ন্যায় রাস্তার ধূলির উপর আসিয়া পড়িতেছে।...কে তবে বলিবে, পশ্চিমাঞ্চল হইতে দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে—স্বকীয় বিকট দশন বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ ইহারই মধ্যে সীমান্তদেশ পার হইয়াছে। না-জানি তবে কোন্ জলাশয়ের জলসেকে,—কোন্ বিশেষ-রক্ষিত উদ্যানে এই সমস্ত ফুল ফুটানো হইয়াছে!

অবশেষে, সূর্য্যাস্তসময়ে, "সহস্র-এক রজনীর" ব্যক্তিগণ গৃহ হইতে বাহির হইতে লাগিল—সেই সব সৌখীন লোক, যাহাদের নেত্র নীলাঞ্জনে চিত্রিত, যাহাদের শ্মশ্রুজাল সিন্দুর-রঙ্গে রঞ্জিত, যাহারা কিংখাপের পোষাক কিংবা জরি-বসানো মখ্‌মলের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছে, কণ্ঠে মণিমুক্তার কণ্ঠহার ধারণ করিয়াছে, এবং যাহাদের বামহস্তের মুষ্টির উপর একএকটা পোষাপাখী রহিয়াছে।

"স্বাগত নিজামবাহাদুর!"—এই কথা-গুলি আবার একটা দ্বারপ্রকোষ্ঠের চূড়া-দেশে লিখিত দেখিলাম; সেই চূড়াদেশে নারাঙ্গি-রঙের একটা ক্রেপ্-কাপড় টানা—তাহাতে লেবু হলুদে ও গন্ধকি-হলুদে রঙের ঝালর ঝুলিতেছে, ঝালরের উপর সবুজ-রঙের চুম্‌কি বসানো। এই দ্বারপ্রকোষ্ঠের পরেই—স্বর্ণচূড়া ও স্বর্ণ-"অর্দ্ধচন্দ্র"-বিশিষ্ট, তুষার-শুভ্র একটা মস্‌জিদ্। এই সান্ধ্য-নমাজের সময়ে, ভক্ত মুসলমানেরা এই মস্‌জিদে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। উহাদের শুভ্র পরিচ্ছদ,—মাথায় মল্‌মলের কাপড় জড়ানো পাগ্‌ড়ি;—দূর হইতে মনে হয়—যেন বিচিত্র-রঙের একপ্রকার খুব বড়-বড় ফুল ছড়ান রহিয়াছে।...

কিন্তু এই সময়ে একটা জনরব উঠিল,—নিজামের আসিতে এখনও বিলম্ব আছে;

রামাদানের মাস নিশ্চয়ই পার হইয়া যাইবে, আরো বিলম্ব হইতে পারে। কবে আসিবেন, বোধ হয় আগামী মাসে আসিবেন, কিংবা আল্লাই জানেন।...

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুক্তিপাশ।

ওগো নিশীথে কখন্ এসেছিলে তুমি
কখন্ যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে!
আমি চরণশবদ পাই নি শুনিতে
ছিলেম কিসের ধেয়ানে
তাহা কে জানে!
রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ
কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
তাই মনে মনে ভাবিতেছিলেম
এখনো রয়েছে যামিনী,—
যেমন বন্ধ আছিল সকলি
বুঝি বা রয়েছে তেমনি।
হে মোর গোপনবিহারি,
ঘুমায়েছিলেম যখন, তুমি কি
গিয়েছিলে মোরে নেহারি?

আজ নয়ন মেলিয়া এ কি হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।
ওগো যে আঁধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
আধা নাই তার আধা নাই,
আমি বাঁধা নাই।

তখনি উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার-জালানা
সকলি দিয়েছে খুলিয়া ;—
আকাশ-বাতাস ঘরে আসে মোর
বিজয়পতাকা তুলিয়া !
হে বিজয়ি বীর অজানা,
কখন্ যে তুমি জয় করে' যাও
কে পায় তাহার ঠিকানা।

আমি ঘরে বাঁধা ছিনু, এবার আমারে
আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
সব বাঁধা খুলে দিয়ে মুক্তিবাঁধনে
বাঁধিলে আমারে হরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে' রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরাণবঁধু হে—
কখন্ যে তুমি দিয়ে চলে' যাও
পরাণে পরশমধু হে।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা।*

বন্দে মাতরম্। বাংলানামে দেশ; তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়্লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব্ব-বাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্লেন। প্রবেশ করে' মা সেখানে শতমুখী হ'লেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশ্লেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্লেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বস্লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্তে লাগ্লেন। ফলে-ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্তে লাগ্ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরমসুখে বাস কর্তে লাগ্ল।

এমনসময় মর্ত্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়্তে লাগ্ল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য কর্তে লাগ্ল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চলা হ'লেন। লক্ষ্মী ভাব্লেন— হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়্তে হ'ল। তখন বাংলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী; বাংলায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাংলা ছেড়ে চল্লেম। রাজা কেঁদে বল্লেন,—না মা, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না; যাতে বাংলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি কর্ছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্লেন। দরবারে বসে' পশ্চিমদেশে কনোজে লোক পাঠালেন, কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ-জন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাংলা-দেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস কর্তে লাগ্ল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি—সদাচার ফিরে এল। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বস্লেন। ধনে-ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা, লক্ষ্মী আবার চঞ্চলা হ'লেন। বাংলার ধন দেখে, ধান দেখে মোছলমান বাংলায় এলেন। তখন বাংলার রাজা ছিলেন; তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ-সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাংলার রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতধর্ম্ম নষ্ট হ'তে লাগ্ল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মস্জিদ্ তুল্তে লাগ্লেন। অর্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু-মোছলমানে এক-গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস করে' মারামারি-কাটাকাটি কর্তে লাগ্ল। লক্ষ্মী ভাব্লেন হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়্তে হ'ল। তখন বাংলাতে গৌড়ের পাঠানবাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম

* গত ৩০শে আশ্বিন রাখীসংক্রান্তিদিবসে কোন পল্লিগ্রামে অর্দ্ধসহস্রাধিক পল্লিনারীর সম্মিলনে অনুষ্ঠান-সহকারে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পঠিত হইয়াছিল।

ছিল হুসেনশা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন—আমি বাংলার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেম্‌নি; হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল, আমি বাংলা ছেড়ে চল্‌লেম। পাঠান রাজা কেঁদে বল্লেন—মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌ব; তাদের ভাই-ভাই একঠাঁই কর্‌ব; তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না। মালক্ষ্মী বল্লেন—আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাক্‌ব; দিল্লীতে মোগল বাদশা হবে; দিল্লীর বাদশা বাংলার রাজা হবেন; সেই রাজা হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌বেন; তখন হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান করে' রাজমন্ত্রী কর্‌লেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন-সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ'লেন। তিনি যবনব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগলবাদশা বাংলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল,—ঝগড়াবিবাদ মিটে গেল। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে-ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। এইরূপে বহুদিন গেল। লক্ষ্মী চঞ্চলা, তিনি আবার চঞ্চলা হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন; তাঁর নাম ছিল আলমগির। তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাত কর্‌তে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ কর্‌তে লাগ্‌ল। সাতসমুদ্র পার হ'য়ে খৃষ্টান ইংরেজ-সদাগর বাংলায় বাণিজ্য কর্‌তে এলো। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর করে' নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিলেন। তাদের বাংলার দেওয়ান করে' দিলেন। বাংলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। ইংরেজসদাগর হয়েছিল বাংলার দেওয়ান, এখন তারাই হ'ল বাংলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে বাস কর্‌ল না। বাংলাদেশের ধন নিয়ে সাতসমুদ্রপারে আপন দেশে নিয়ে চল্‌ল। সদাগরের জাত কিনা, খুব বুদ্ধি, মেজাজ ঠাণ্ডা, একটু লোভী। তাঁরা চোরডাকাত দমন কর্‌লেন, প্রজার নানান্ সুবিধা করে' দিলেন, আবার নিজের দেশ হ'তে খেলেনা এনে, পুঁতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্‌লেন। লক্ষ্মী যখন চঞ্চলা হন, তখন মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়। বাংলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ামানুষে শিশু সাজ্‌ল; ইংরেজের খেলেনা-পুঁতুল নিয়ে ছেলেখেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাংলার প্রজা কাঞ্চনবদলে সেই কাঁচ নিতে লাগ্‌ল। দেশের জিনিষে লোকের মন উঠে না। বিদেশের ঝুঁটোমণির রঙের বাহার দেখে দেশের সাচ্চামাণিকে অনাদর কর্‌তে লাগ্‌ল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজ্‌তে লাগ্‌ল। রাজা হাততালি দিতে লাগ্‌লেন; দেশের বুড়োরা হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী, বল্‌লেন—আর না, আমি বাংলার লক্ষ্মী

আমার আর বাংলায় থাকা চল্‌লো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চল্‌লেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাতকোটি বাঙালি কেঁদে উঠ্‌ল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন বলে' রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল, সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগির-বাদশার তক্তে বসে' সে আপনাকে আলমগিরের নাতি-হেন ঠাওরা'ত। সে বল্‌লে—এরা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছে; সাতকোটির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি শোনা যায় না; থাক্, এদের দুদল করে' দিচ্ছি; এক দিকে থাক্ মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই একঠাই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করে' দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই বলে' তিনি বাঙালীকে দুদল করে' দিলেন,—এক দিকে গেল হিঁদু, এক দিকে গেল মোছলমান। পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাক্‌ল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখ্‌লেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাংলায় থাকা চল্‌ল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেম্‌নি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'ল, তখন আর আমার বাংলায় থাকা চল্‌ল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিনমাসের তিরিশে, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দ্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাংলা দুখান হবে। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচকোটি বাঙালি আছাড় খেয়ে ভুঁয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকৃতে লাগ্‌ল—মা, তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। বিদেশী রাজা আমাদের মন বোঝেন না। তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করতে চাইলেন। আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না। মা, তুমি কৃপা কর। আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব। আর পুঁতুলখেলা করব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না। মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাংলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া কর্‌লেন। কালীঘাটের মাকালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মাকালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সেদিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্যোগ। ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু করে' হাওয়া। পঞ্চাশহাজার বাঙালী মাকালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে—মা, আমাদের রক্ষা কর। বাংলার লক্ষ্মী যেন বাংলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাকতে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা বলে' উঠ্‌লেন—জয় হউক, জয় হউক;—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাক্‌বেন। তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না। ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না। তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান্, এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্। লক্ষ্মী তোমাদের কৃপা করবেন। লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাংলার লক্ষ্মী

ঐদিন বাংলা ছাড়্ছিলেন। ঐদিন বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় অচলা হ'লেন। বাংলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে-ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বাংলার মেয়েরা ঐদিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বল্‌ল না। ঘট পেতে হরীতকীহাতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। হাতে হাতে হল্‌দে-সুতোর রাখী বাঁধ্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বচ্ছর-বচ্ছর ঐদিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ-দিন উনুন জ্বল্‌বে না। হাতে হাতে হল্‌দে-সুতোর রাখী বাঁধ্‌বে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে' শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম করে' পাটালিপ্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাক্‌বেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই॥

মালক্ষ্মি, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। শাঁখা থাক্‌তে চুড়ি পর্‌বো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়্‌শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

বাংলার ঘর, বাংলার মাঠ,
বাংলার বন, বাংলার হাট,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন্,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্।

বন্দে মাতরম্।

অনুষ্ঠান।

প্রতিবৎসর আশ্বিনের সংক্রান্তিতে বঙ্গ-বিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহে নারীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগী ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বালিবে না। ফলমূল,

চিড়ামুড়ি, অথবা পূর্ব্বদিনের ভিজা-ভাত, ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ ঘটস্থাপনা করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দূর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে শঙ্খধ্বনির পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম-হস্তের প্রকোষ্ঠে হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিবেন। রাখিবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালিপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

শ্রীঃ—

অজবিলাপ।

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া
কৃতপূর্ব্বং তব কিং জহাসি মাম্।
নন্বু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ॥ ৫২॥

মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু,
মোরে ফেলে কেন চলে' গেলে তুমি তবু!
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি।

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃত-
শ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু করোতি মারুত-
স্ত্বদুপাবর্ত্তনশঙ্কি মে মনঃ॥ ৫৩॥

কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
মন্দপবন কাঁপায় যখন এসে,
হে সুতনু তব প্রাণ ফিরে এল বলে'
থেকে থেকে মোর দুরাশায় হিয়া দোলে

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তম-
স্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ॥ ৫৪॥

হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা
জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা।
রজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জলে।

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনম্॥ ৫৫॥

ও মুখে অলক দোলে মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে;
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে।

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ॥ ৫৬॥

শর্ব্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদপরে,
বিরহ তাহারা মিলনের আশে সহে,
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে!

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ
প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ।
অহমেকরসস্তথাপি তে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ॥ ৬৫॥

সমসুখদুখ তব সজিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আত্মজধন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার,
নিঠুর, তবুও একি তব ব্যবহার!

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।

গতমাভরণপ্রয়োজনং
পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬ ॥

ধৃতি হ'ল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হ'ল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হ'ল গত,
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মত।

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭ ॥

গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম,
ললিতকলায় ছিলে যে শিষ্যাসম,
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
বল গো আমার কি না সে হরিল, প্রিয়ে !

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈ-
র্মম সর্ব্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৮ ॥

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদধনে
সুখ বলি' অজ গণ্য না করে মনে।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে
আমার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে।

উণাদি-তত্ত্ব।

"উণাদয়ো বহুলম্।"

সংস্কৃত-শব্দসাধনের জন্য "উণ্"-ইত্যাদি কতকগুলি প্রত্যয় প্রচলিত আছে। ধাতুর উত্তর ঐ সকল প্রত্যয়যোগে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রত্যয়গুলিকে সংক্ষেপে "উণাদি" বলা হইয়া থাকে; "উণাদি"-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলিও "উণাদি"-নামে কথিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক "উণাদি"-শব্দেই ধাতু এবং প্রত্যয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। ধাতুকে "প্রকৃতি" এবং উণ্-ইত্যাদিকে "প্রত্যয়" বলা হয়। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রাচীন মতের সমালোচনা আবশ্যক।

বৈয়াকরণগণের মতে নরঃ নরৌ নরাঃ, ভবতি, ভবতঃ, ভবন্তি, ইত্যাদি শব্দ নিত্য,—স্বতঃসিদ্ধ,—চিরকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিভক্তিহীন নর-শব্দ হইতে নরঃ, নরৌ, নরাঃ, এবং বিভক্তিহীন ভূ-ধাতু হইতে ভবতি, ভবতঃ, ভবন্তি, উৎপন্ন হয় নাই। ব্যাকরণে নর-শব্দের উত্তর সু-ঔ-জস্ এবং ভূ-ধাতুর উত্তর তিপ্-তস্-অন্তি বিভক্তি যোগ করিয়া পদ নিষ্পন্ন করিবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেই প্রয়োজনসাধনের জন্যই নিত্য শব্দগুলির অবয়ব কল্পনা করিতে হইয়াছে। সেই অবয়বের প্রথমাংশের নাম "প্রকৃতি", শেষাংশের নাম "প্রত্যয়"। প্রকৃতিপ্রত্যয় নিত্য নহে; তাহা শাস্ত্রের কল্পনামাত্র।

আধুনিক লেখকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা যে,—ভাষার শৈশব-অবস্থায় লোকে বিভক্তিহীন প্রকৃতি—ভূ, কৃ, অস্ ইত্যাদি—ব্যবহার করিত। তাহাই সভ্যতার সমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়যোগে ভবতি, করোতি, অস্তি রূপে পূর্ণতালাভ করিয়াছে। প্রাচীন শব্দবিদ্‌গণ এরূপ অনুমানের পক্ষসমর্থন করেন নাই।

যে সকল পুরাতন বৈয়াকরণের গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ভগবান্ পাণিনি সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। উত্তরকালেও অনেক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন,—প্রকৃতি ও প্রত্যয় কল্পনামাত্র; প্রচলিত সকল শব্দই নিত্য,—স্বতঃসিদ্ধ,—চিরপ্রচলিত।

পাণিনিসূত্রের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইবার জন্য, প্রথমেই "অথ শব্দানুশাসনং" বলিয়া যে সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, এই ব্যাকরণে শব্দের অনুশাসন করা হইবে। অনু-শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। শব্দগুলি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে, তাহার ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশের নিয়ম উদ্ভাবনের জন্যই ব্যাকরণশাস্ত্র রচিত হইবে—ইহাই ফলিতার্থ। অন্যান্য বৈয়াকরণগণেরও এ বিষয়ে মতদ্বৈধ

নাই। তাঁহাদিগের মতে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—

"প্রথমং ক্রিয়তে উচ্চার্য্যতে ইতি প্রকৃতির্ধাত্বাদি।"

শব্দের অবয়বনির্ণয় করিবার জন্য প্রথমে যে অংশ কল্পিত বা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহারই নাম প্রকৃতি। যথা নর, ভূ, কৃ ইত্যাদি।

"প্রতীয়তে বিধীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ স্বাদি ত্যাদি।"

প্রকৃতির উত্তর বিধান করা হয়, এইজন্যই ইহাকে "প্রত্যয়" বলা হয়।

"প্রত্যয়ঃ পরশ্চ।" ৩।১।১—২।

এই দুইটি সূত্রে প্রত্যয়ের স্থান প্রকৃতির পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কেবল বহুচ্‌প্রত্যয়, প্রত্যয় হইয়াও, প্রকৃতির পরে সংযুক্ত না হইয়া, প্রকৃতির পূর্ব্বে সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা বহুপটুঃ, বহুমৃদুঃ, বহুগুড়ঃ।*

বৈয়াকরণগণের প্রকৃতিপ্রত্যয়ের সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও পুরুষ নামক সুপরিচিত সংজ্ঞার সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, পুরুষের সান্নিধ্যে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া, সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। ব্যাকরণের প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে শব্দ নিষ্পন্ন করে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্য; শব্দবিদ্‌গণের প্রকৃতি কল্পিত। সাংখ্যমতে পুরুষ নিত্য, অবিকৃত, উদাসীন। শব্দবিদ্‌গণের প্রত্যয় কেবল প্রকৃতির বিকারসাধন করিয়াই তৃপ্ত হয় না, নিজেও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য ভাষায় প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সহিত সংস্কৃতভাষার প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কল্পনার একরূপ কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষার শব্দসংখ্যার আধিক্য ও সাহিত্যের বিপুলতা উপস্থিত হইলে, অর্থবোধের সুবিধার জন্য শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহার অনুরোধেই ভাষাকে নানা নিয়মের অধীন করিতে হয়। এইরূপে নিয়মাধীন করিতে হইলে, প্রচলিত শব্দগুলিকে নিত্য বা সিদ্ধ মনে করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান দ্বারা ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশের নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতে হয়। একবার এইরূপে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলে, ভাষার পরিবর্ত্তন নিয়ন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ভাষা স্বৈরিণীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল থাকিলেও, নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবার পর সংযত হইতে বাধ্য হয়। কোন্ সময়ে সংস্কৃতভাষা এইরূপে নিয়মাধীন হইয়া সুসংযত হইয়াছিল, তাহার কথা অতীতের স্বপ্নসাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতশব্দের ব্যুৎপত্তিই ইহার প্রধান প্রমাণ। সম্‌-পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর যোগে সংস্কৃত-শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভূষণ-অর্থে সুটের অর্থাৎ স-কারের আগম হইয়াছে। সংস্কৃত বলিতে মার্জ্জিত বুঝায়। পূর্ব্বে যে ভাষাই প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহাই মার্জ্জিত ও সুসংযত হইয়া সংস্কৃত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যের উপক্রমণিকাতে এই কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ভাষা সক্তুর ন্যায় ঝাড়িতে ঝাড়িতে

সংস্কারসম্পন্ন হইয়া সংস্কৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই নাম—বৈয়াকরণ। যথা—

"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।"*

অত্র কৈয়টঃ।—"ধীরা ইতি বৈয়াকরণাঃ। বাচমক্রতেতি অপশব্দেভ্যো বিবিক্তাং কৃতবন্তঃ।"

সংস্কৃতভাষা, যাহা হইতে সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অসংস্কৃত ছিল। তাহার যে সকল শব্দ সংস্কারসম্পন্ন না হইয়া অসংস্কৃত রহিয়া গিয়াছে, তাহার নাম অপশব্দ। শব্দশাসন করিবার সময়ে অপশব্দেরও কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অপশব্দ অসাধু, প্রাকৃত, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত। জনসাধারণ তাহারই ব্যবহার করিত। শিক্ষিতসম্প্রদায় অপশব্দ পরিহার করিয়া সংস্কৃতশব্দেরই ব্যবহার করিতেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রেও কঠিন শাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহা ব্রাহ্মণকে অপশব্দ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিত।

নাপভাষিতবৈ। ন ম্লেচ্ছিতবৈ।

অপভাষা বা ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবে না—এইরূপ শাস্ত্রশাসন বর্ত্তমান ছিল।

অতি পুরাকাল হইতেই আর্য্যসমাজে বেদের প্রচলন থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ পুরাকালে তাহা প্রথম উদিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকায় আধুনিক লেখকগণ নানা কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন। যত দিনের লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বেদ ও আর্য্যসমাজ নিত্যসহচর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ বেদসর্ব্বস্ব। বাল্যে গুরুগৃহে উপনীত হইয়া দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর গৃহস্থাশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া আবার সেই বেদের সেবায় সংসারধর্ম্ম সাধন করিয়া পরিণতজীবনে বানপ্রস্থ আশ্রমে ও জীবনসন্ধ্যায় যতিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আর্য্যগণ আমরণ বেদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ সংসারাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া উপনয়নকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিরূপে আজীবন কেবল বেদের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বেদবিরোধী শাস্ত্রের কেহ আদর করিতেন না।

বেদের ভাষা সংস্কৃতভাষা। তাহা জনসাধারণের ভাষা ছিল না। অধুনা কেহ কেহ বেদকে কৃষকসঙ্গীত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত কৃষক যে বৈদিকভাষায় সঙ্গীতস্পৃহা চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইবে, ইহা এক হাস্যাস্পদ অনুমানমাত্র। সমুচিত শিক্ষা ভিন্ন বৈদিকভাষায় অধিকারলাভ করা দূরে থাকুক, একটি বর্ণও যথাযথ উচ্চারণ করিবার উপায় নাই। বেদে যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা অশিক্ষিত কৃষকের চিত্তক্ষেত্রে সমুদ্ভূতই হইতে পারে না। বেদে যে সকল আচার, রীতিনীতি ও শিল্পাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অশিক্ষিত কৃষকসমাজের কল্পনার অতীত। তাহা সমুন্নত সভ্যাবস্থাই অভিব্যক্ত করে। আর্য্যশব্দ

* মহাভাষ্যম্।

কৃষকরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে কেন? ঋ-ধাতুর উত্তর ণ্যৎ-প্রত্যয়-যোগে আর্য্যশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ঋহলোর্ণ্যৎ ।৩।১।১২৪

পাণিনি এই ভাবেই আর্য্যশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণের নানা সূত্র ধরিয়া একই শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা অসম্ভব নহে। এরূপ স্থলে কোন্ ব্যুৎপত্তিকে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? প্রাচীনগণ বলেন, শব্দার্থ অভিধানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট; ব্যাকরণ কেবল তাহাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য ব্যুৎপত্তি-নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সমস্ত প্রাচীন অভিধান পূজ্য এই অর্থেই আর্য্যশব্দের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছে। ঋ-ধাতু গমনার্থক—জ্ঞানার্থক—সুতরাং শ্রেষ্ঠার্থেই আর্য্যশব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাকে অর্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া নূতন অভিধান রচনা করিবার অধিকার কোথায়? ইহা আধুনিক প্রগল্ভতা-মাত্র।

আর্য্যসমাজে বেদের পঠনপাঠন ও অর্থ-বোধ অবিকৃত ও চিরপ্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে আর্য্য মনীষিগণ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। সেই প্রয়োজনসাধনের জন্য বেদের পদপাঠ ও সংহিতাপাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক স্বরের যথাযথ উচ্চারণ অবিকৃতভাবে চিরপ্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাসূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথাযথ অনুষ্ঠান চিরপ্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে কল্পসূত্র প্রচলিত হইয়াছিল। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও স্থলবিশেষে স্বরের পরিবর্ত্তনপ্রণালী চিরনির্দ্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকরণসূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শব্দের প্রকৃত-অর্থ-রক্ষার্থ নিরুক্তি, ছন্দের প্রকৃতপ্রকৃতিজ্ঞাপনার্থ ছন্দ এবং ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতকালনির্ণয়ার্থ জ্যোতিষের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল শাস্ত্র ষড়ঙ্গনামে সুপরিচিত। বেদরক্ষাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বেদরক্ষার এই সকল আয়োজনের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু মনীষীর বহু গবেষণার ফলে এই সকল কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহাকে আকস্মিক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। বেদ যেমন নিত্য-সহচর ছিল, বেদাঙ্গও সেইরূপ বেদরক্ষার নিত্যরক্ষিবর্গরূপে আর্য্যসমাজে প্রহরীর ন্যায় বিনিদ্রনয়নে দণ্ডায়মান ছিল। যথাযথ-উচ্চারণবিহীন অর্থজ্ঞানশূন্য বেদপাঠ আর্য্য-সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত ছিল। যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য, তাঁহাকে প্রাচীনগণ "বৃষল" বলিতে ও ভারবাহী বলীবর্দ্দের সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
যস্ত বিপ্রস্ত তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে।
তস্মাৎ বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
একদেশোহপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্ব্বো ন শক্যতে।" যমঃ।

সংস্কৃতভাষা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কেবল বেদেই যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম বৈদিকসংস্কৃত। যাহা লৌকিক ও শিক্ষিত-সমাজের প্রচলিত ভাষা, তাহার নাম লৌকিক-সংস্কৃত বা ভাষা। পাণিনি এই উভয়শ্রেণীর সংস্কৃতশব্দেরই অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতশব্দের অনুশাসন কোন্ পুরাকালে আরব্ধ হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

প্রথমে প্রত্যেক শব্দকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা করিবার "প্রতিপদপাঠ"প্রণালী প্রচলিত থাকিবার কিংবদন্তী বর্ত্তমান আছে। বোধ হয়, সেই অবস্থা বর্ত্তমান থাকিবার সময়ে শব্দার্থশিক্ষার্থ বেদবাক্যের নিঘণ্টু ও নিরুক্তি নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু নিত্যশব্দ অসংখ্য বলিয়া ঐ উপায়ে শব্দজ্ঞান উপার্জ্জন করিবার অসুবিধা শীঘ্রই অনুভূত হইয়া থাকিবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিপ্রত্যয়ে পরিকল্পনা করিয়া সামান্য ও বিশেষ লক্ষণযুক্ত সূত্রদ্বারা অসংখ্য শব্দব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তপ্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়াছে। প্রকৃতির সংখ্যা অনন্ত হইলেও প্রত্যয়ের সংখ্যা পরিমিত—এই কারণে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রত্যয় কল্পনা করিয়া, অসংখ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিবিচার করা সহজ হইয়াছিল। ইহাই যে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস, একটি পুরাতন আখ্যায়িকায় তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ পতঞ্জলি সেই আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। সুরগুরু বৃহস্পতি দিব্যবর্ষসহস্রকাল ইন্দ্রদেবকে পৃথক্‌রূপে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় স্বয়ং বৃহস্পতি, শিষ্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, শিক্ষাকাল দিব্য সহস্র-বর্ষ। তথাপি কি ফল হইয়াছিল? শব্দ-শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই! আমাদের আয়ুকাল কত? যে অধিক বাঁচে, তাহারও পরমায়ু শতবর্ষমাত্র। সুতরাং শব্দজ্ঞানলাভের সংক্ষিপ্ত উপায়ের উদ্ভাবনা আবশ্যক। এই উপায় উদ্ভাবনা করিবার জন্যই, সামান্য ও বিশেষ লক্ষণযুক্ত ব্যাকরণসূত্র রচিত হইয়াছিল। তথাপি প্রতিপদপাঠপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। উণাদিসূত্রে ও ব্যাকরণে যেখানে নিপাতের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রত্যেক শব্দকে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে হইতেছে। তাহা প্রতিপদপাঠপ্রণালীর প্রকারান্তরমাত্র।*

ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইবার পর প্রকৃতি-প্রত্যয় পরিকল্পিত হইয়া প্রকৃতিপ্রত্যয়ের শ্রেণীবিভাগ সাধিত হইয়াছিল। তদনুসারে প্রকৃতি নানাভাগে বিভক্ত, যথা—প্রাতিপদিক, ধাতু, অব্যয় ইত্যাদি। প্রত্যয়ও নানাভাগে বিভক্ত, যথা—সুপ্, তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রী, বিকরণ ও আগম ইত্যাদি।

প্রাতিপদিকে বিভক্তি যুক্ত হইলেও নিষ্পন্ন শব্দে প্রাতিপদিকের অর্থ সাধারণত যুক্ত থাকে।১ কেবল সমাসে কখন কখন সে অর্থ

* অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি, কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্ত্তব্যঃ? গৌ-রশ্বঃ-পুরুষো-হস্তী-শকুনি-মৃগো-ব্রাহ্মণ-ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ? নেত্যাহ। অনভ্যুপায় এষ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ। এবং হি শ্রূয়তে। বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ। নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা, ইন্দ্রশ্চ অধ্যেতা, দিব্যং বর্ষসহস্রং অধ্যয়নকালো ন চান্তং জগাম। কিং পুনরদ্যত্বে? যঃ সর্ব্বথা চিরং জীবতি, স বর্ষশতং জীবতি।

(১) যে সকল শব্দে ধাত্বর্থ কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উদাহরণ যথা—

কারু (কৃ+উণ্—শিল্পী) ১।১। ডু কৃঞ্ করণে।
বায়ু (বা+উণ্) ১।১। বা গতিগন্ধনয়োঃ।
জায়ু (জি+উণ্—ঔষধ) ১।১। জি অভিভবে।

লুপ্ত হইয়া পড়ে।২ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হইলে, নিষ্পন্ন শব্দে ধাত্বর্থ বিলুপ্ত হয় না।৩ ধাতুর উত্তর কোন কোন প্রত্যয় সংযুক্ত হইলে নিষ্পন্ন শব্দগুলি প্রাতিপদিকে পরিণত হইয়া পুনরায় প্রত্যয় গ্রহণ করে।৪ সে অবস্থাতেও ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ করে না। এই শ্রেণীর প্রত্যয়ের সাধারণ নাম কৃৎ; কৃৎ-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার সাধারণ নাম কৃদন্ত। ইহাই ব্যাকরণের নিয়ম।

উণাদি-প্রত্যয়কেও বৈয়াকরণগণ কৃৎ-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং পাণিনি কৃৎ-প্রকরণেই তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ কৃৎপ্রত্যয়ের সহিত উণাদির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, বৈষম্যের অভাব নাই। অন্যান্য কৃৎপ্রত্যয়ের ন্যায় উণাদিপ্রত্যয়ও ধাতুর উত্তর সংযুক্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য কৃদন্তশব্দের ন্যায় উণাদি-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ প্রাতিপদিকের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রত্যয় গ্রহণ করিতে পারে। এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ যেমন ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ করে না, উণাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দ সেরূপ নহে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ শব্দই ধাত্বর্থ পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালীতে শব্দগঠনের পরিচয় প্রদান করে। উণাদিপ্রত্যয়ান্ত সকল শব্দই রূঢ়ি। *

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

(২) যে সকল স্থলে ধাত্বর্থ কিছুই রক্ষিত হয় নাই, তাহার উদাহরণ যথা—

কর্ু (কৃৎ+উ) ১।১৭। কৃতি ছেদনে (টাকুয়া)

নাকু (নম্+উ) বল্মীক।১।১৯। নম্ প্রহ্বত্বে।

আদ্বিষম্ (অদ্+টিষচ্) মাংস। অদ্ ভক্ষণে ১।৪৭।

কপিল (কম্+ইলচ্) ১।৫৩। কমু কান্তৌ (বর্ণভেদঃ)

(৩) যে সকল স্থলে ধাতুর আকার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদাহরণ যথা—

কর্ু—টাকুয়া।

নাকু—বল্মীক।

(৪) যে সকল স্থলে উণাদিসূত্রলিখিত প্রত্যয় যোগ করিলে প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ নিষ্পন্ন হয় না, তাহার উদাহরণ প্রায় অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

* এই সকল কারণে পাণিনি বলিয়া গিয়াছেন :—

"উণাদয়ো বহুলম্।" ৩।৩।১

বহুলং-শব্দের অর্থ এই যে—কোনস্থলে প্রবৃত্তি, কোনস্থলে অপ্রবৃত্তি, কোনস্থলে বিকল্প, কোনস্থলে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

প্রেমের স্বরূপ।

১

আঁখির পিপাসা যদি প্রেম হ'ত কভু—
রুধিতাম নয়ন ঢাকিয়া!
বাসনার নদী যদি প্রেম বুঝিতাম,
গতি তার দিতাম ফিরিয়া!

২

হ'ত যদি প্রেম—বহ্নি, দিতাম তাহারে
আঁখিজলে নির্ব্বাপিত করি;
বুঝিতাম প্রেম যদি রুদ্র-রবি-তাপ,
মেঘে তারে দিতাম আবরি'।

৩

হ'ত যদি প্রেম শুধু পণ্য বিপণির,
বিনা পণে দিতাম বিকিয়া।
নিশীথের স্বপ্ন যদি প্রেম বুঝিতাম,
দিনোদয়ে যেতাম ভুলিয়া!

৪

হ'ত যদি মায়াপুরে মায়ামৃগ প্রেম,
নাহি তার ছুটিতাম পাছে!
বুঝিতাম যদি প্রেম আকাশকুসুম,
দুরাশায় না যেতাম কাছে।

৫

শিরায় শোণিত প্রেম, নিশ্বাসে সমীর,
দর্শনে আলোক হ'য়ে জাগে;
পরশে পরশমণি, দুঃখে অশ্রুজল,
পুষ্প-অর্ঘ্য দেবতার আগে!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন

বিদ্যা এবং জ্ঞান।*

যদি-চ একণে আমার শরীর ইচ্ছানুরূপ কণ্ঠের দৌড় দেওয়াইতে পারিবার মতো সবল নহে, তথাপি এই উপলক্ষে কয়েকটি ভাবিবার বিষয় দেশস্থ বিদ্বজ্জনের (বিশেষত অধোভূ-জনের) জ্ঞানগোচর করিবার প্রত্যাশায় বহুদিনের পর আমি আজ এইরূপ কৃতবিদ্য-মণ্ডলীর মাঝখানে প্রবন্ধহস্তে সমাগত হইয়াছি। আমার বক্তব্য বিষয়টির সংজ্ঞা-নির্ব্বাচনের দায় এড়াইবার জন্য আমি সোজা কথা বাছিয়া-বাছিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি বিদ্যা এবং জ্ঞান। কিন্তু তবুও শ্রোতৃবর্গের মনোমধ্যে এইরূপ একটা তর্ক উঠিতে পারে যে, বিদ্যা এবং জ্ঞান এক না দুই! এ তর্কের মীমাংসাকার্য্য লোকের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ, কেন না, লোকের ভাবা লোকে যেমন জানে, এমন আর কেহই না। লোকে কি বলে?

যাঁহারা বিদ্যাধনে ধনী, তাঁহাদিগকে বলে সুপণ্ডিত; যাঁহারা জ্ঞানরত্নের খনি, তাঁহা-দিগকে বলে পরম জ্ঞানী; যাঁহারা দুইই একাধারে, তাঁহাদিগকে বলে সোনায় সোহাগা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যা এবং জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ অবশ্যই কিছু-না-কিছু আছে। সেই প্রভেদটির গুরুত্বের প্রতি আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব মনে করিয়াছি; আর সেই সঙ্গে বিদ্যা এবং জ্ঞানের দুই বিভিন্ন পথের ঠিকানা নির্দ্দেশ করিব, এটাও আমার একটা মনোগত অভিপ্রায়।

বিদ্যা নানা, আর, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন সত্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত। জ্ঞান এক, আর, সেই এক জ্ঞানের লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় সত্য। বিদ্যা এবং জ্ঞানের লক্ষ্য যেমন ভিন্ন—পথও তেমনি ভিন্ন। বিদ্যার পথ হ'চ্চে অন্বয়ব্যতিরেকের পথ; জ্ঞানের পথ হ'চ্চে যোগের পথ। ব'ললাম "অন্বয়ব্যতিরেক"; তাহা পদার্থটা কি? পদার্থটা তাহা আর-কিছু না—জ্ঞাতব্য বস্তুতে স্বজাতীয়-লক্ষণের অন্বয় (যেমন জলেতে তরলতা-লক্ষণের অন্বয়), আর, সেই সঙ্গে তাহা হইতে বিজাতীয়-লক্ষণের ব্যতিরেক (যেমন জল হইতে কাঠিন্য-লক্ষণের ব্যতিরেক)। বিদ্যা এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেকের প্রণালী অনুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বস্তু-সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অবধারণ করে।

একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, তদ্দৃষ্টে

* পঠিত প্রবন্ধ।

সহজেই বিদ্যা এবং জ্ঞানের দ্বিবিধ পথের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারিবে।

বিদ্যাবিহীন মনোবৃত্তির নিকটে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, সবই সমান—সবই ঘটিবাটির ন্যায় প্রয়োজনমতে কাজ চালাইবার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই না। বিদ্যা কিন্তু গৃহিণী খুব গোছালো। বিদ্যা পাঁচরকমের পাঞ্চভৌতিক পদার্থ পাঁচ ইন্দ্রিয়সূত্রে বাঁধিয়া পৃথক পৃথক পাঁচ থাকে সাজাইয়া রাখে। ইহাতে ফল দাঁড়ায় দুইদিকে দুই বিপরীত-তরো। এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন আকাশখণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন বায়বাপদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন আগ্নেয়-পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন জলীয় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন মৃন্ময় পদার্থ, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাজাত্যের বন্ধন আঁটিয়া যায়; এটা হয় অন্বয়ের গুণে; আর-এক দিকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, এই সকল বিজাতীয় পদার্থ পরস্পরের সংস্রব হইতে পৃথক্‌কৃত হয়; এটা হয় ব্যতিরেকের গুণে। এইরূপ একটা সমগ্র বস্তুকে ভাঙিয়া তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ নানা অবয়বে বিভক্ত করিবার সময় বিদ্যা খুব সহজে তাহাতে কৃতকার্য্য হয়; কিন্তু তাহার পরে যখন সেই বিশ্লেষিত অবয়বগুলা জোড়াতাড়া দিয়া একটা সমগ্র বস্তু গড়িয়া দাঁড় করাইতে যায়, তখন বিচারকর্ত্তার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহার কৃত্রিমতা বাহির হইয়া পড়ে। বিচারকর্ত্তা বিদ্যাকে বলেন এই যে, প্রথমে তুমি তূলা হইতে সহস্র সূত্র সহস্রধা বিশ্লেষিত করিয়া তাহাদের মেলামেশা'র পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছ; এখন বলিতেছ যে, সহস্র মিলিয়া এক হইয়াছে—একটা পট হইয়াছে। উহার মধ্যে একত্ব যে কোন্‌খানটায়, তাহা তো আমি দেখিতে পাইতেছি'না। যতই প্রখর হইতে প্রখরতর অণুবীক্ষণের প্রদীপ ধরিয়া উহার ভিতরে অনুসন্ধান চালনা করা যায়, ততই অসংখ্য অসংখ্য ছিদ্রের ভিতর ছিদ্র বাহির হইতে থাকে, এই তো আমি দেখিতেছি। তুমি যাহা করিতেছ, তাহাও আমি দেখিতেছি;—তুমি তোমার নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একত্ব'র প্রলেপ দিয়া ঐ ফোঁপরা বস্তুটার অসংখ্য ছিদ্রজাল ভরাট করিয়া দিতেছ, আর, তাহাকেই বলিতেছ যোগ। যাহাকে তুমি বলিতেছ পাঁচের যোগ, তাহা তোমার কল্পনার যোগ; যাহাকে বলিতেছ পাঁচের একত্ব, তাহা তোমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একত্ব। বিচারকর্ত্তার এইরূপ নিক্তির ওজনের বিচারে দাঁড়াইতেছে এই যে, বিদ্যা'র প্রকল্পিত যোগ একপ্রকার জোড়াতাড়া-দিয়া ঘটাইয়া-তোলা যোগ, তা বই তাহা প্রকৃত যোগ নহে। ওরূপ একটা কৃত্রিমধরণের যোগ'কে যোগ না বলিয়া বলা উচিত সংগ্রহ; বলিবও আমি তাই। ফলে, বিদ্যা প্রথমে বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নতা হইতে যাত্রারম্ভ করে বলিয়া, পরে সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকৃত যোগে পৌঁছিতে পারে না। জ্ঞান কিন্তু আর-এক প্রদেশ হইতে যাত্রারম্ভ করে। জ্ঞান গোড়াতেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে; আর, সেইজন্য, জ্ঞানচক্ষুর অনিরুদ্ধ দৃষ্টিতে জল-স্থল-আকাশ-অনিলানল, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, প্রাণ-মন-বুদ্ধি, দেবমনুষ্য, পশুপক্ষি-কীটপতঙ্গ, গুল্মগুল্ম-তরুলতা,

ধাতুপ্রত্যয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্ত-মধ্য এবং অন্তর-বাহির সমস্ত লইয়া এক অদ্বিতীয় সত্য বিরাজমান, আর, সেই অদ্বিতীয় সত্যের একতাগুণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক এবং অন্তর-বাহির যোগে-যোগে ওতপ্রোত। যে যোগের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহা সংগ্রহেরই আর-এক নাম, এ যোগ সে যোগ নহে; এ যোগ প্রকৃতপক্ষেই যোগ। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, বিদ্যার পথ অন্বয়-ব্যতিরেকের পথ, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের পথ যোগের পথ। এ তো গেল প্রবন্ধের ভূমিকা,—এখন কোন্ স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করা যাইবে, সেইটিই বিবেচ্য। ভাবিয়া দেখিলাম যে, বিদ্যার পথ সকলেরই নিকটে সুপরিচিত; জ্ঞানের পথ অনেকের নিকটে হয় তো অপরিচিত। এরূপ স্থলে বিদ্যার বাঁধা-রাস্তার মধ্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া জ্ঞানের নিভৃত গুহাগহ্বরের পথাভিমুখে ধীরে-ধীরে পা-বাড়ানোই পরামর্শসিদ্ধ; অতএব তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্।

বিদ্যারাণী নীতিজ্ঞা কম নহেন—যদি-চ তাঁহার নীতি কলি'র শিখাইয়া-দেওয়া একালের নীতি—একপ্রকার চাণক্যের নীতি! সে নীতির মর্ম্মকথা হ'চ্চে Divide & conquer—ভাগ-ভাগ কর, আর জেতো। বিদ্যা যখন গণিতরাজ্য জয় করিতে বাহির হ'ন, তখন তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিতের খণ্ডপ্রদেশগুলা পরস্পরের সংস্রব হইতে বিশ্লেষিত করিয়া একে-একে সেগুলা'কে হাতের মুঠার মধ্যে আনয়ন করেন; এইরূপ করিয়া সমগ্র গণিতরাজ্য অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ফ্যালেন। যে-কোনো বিদ্যা হউক্ না কেন, তাহা রীতিমত উপার্জ্জন করিতে হইলে তাহাকে আশ-পাশের আর-আর সমস্ত বিদ্যা হইতে, যতদূর পারা যায়, পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহারই উপরে মনোযোগের সমস্ত ভর সমর্পণ করা কর্ত্তব্য; এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য, যেন উপার্জ্জিতব্য বিদ্যার সঙ্গে আর-কোনো বিদ্যা'র ঘুণাক্ষরেও কোনো সম্পর্ক নাই। বীজগণিতও গণিত, জ্যামিতিও গণিত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিবার সময় এরূপ অনন্যপরায়ণমানসে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, যেন বীজগণিতের সঙ্গে জ্যামিতির মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। বলিলাম "কর্ত্তব্য"—কিন্তু কাহার পক্ষে কর্ত্তব্য? পাঠদশায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য—বিশেষত যাঁহারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে! অন্বয়ব্যতিরেকের পথ বিদ্যা-উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ, তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু তাহা জ্ঞানোদয়ের পথ নহে। জ্ঞানোদয়ের পথ ঠিক্ তাহার বিপরীত। জ্ঞানোদয়ের পথ যোগের পথ।

ঊনবিংশশতাব্দীর বিদ্যা'র আদিগুরু দেকার্ত্ত বীজগণিতের সমীকরণপদ্ধতি জ্যামিতির অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গণিতের গৌরবমাহাত্ম্য কত যে উচ্চে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার পূর্ব্বের আমলের বীজগণিত এবং জ্যামিতির মাঝখানে প্রাচীর একটা দাঁড়-করানো ছিল বিপর্য্যয়-কঠিন। দেকার্ত্ত সেই বিচ্ছেদের প্রাচীরটা ভাঙিয়া-চুরিয়া

তাহার জায়গায় সৌহার্দবিনিময়ের দিব্য একটা সুগম পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বিভিন্নশ্রেণীর বিদ্যার মধ্যে যোগের এইরূপ গোড়াপত্তন তাঁহার মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই কাজ। তিনি যদি ঐ কার্য্যটিতে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে গণিতবিদ্যা আজিও ভূতলে হামাগুড়ি দিত। সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, সকল বিদ্যারই নিগূঢ় মর্ম্মস্থান দিয়া আর-আর নানা বিদ্যার সহিত সম্মিলনের নানা পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, আর, সে-সকল সুড়ঙ্গপথের রহস্য-উদ্‌ঘাটন জ্ঞানোদয়েরই ফল, তা বই, তাহা পাণ্ডিত্যের ফল নহে! ফলে, পণ্ডিত হইলেই কিছু আর জ্ঞানী হওয়া যায় না; জ্যোতিষ জানিলেই কিছু আর নিউটন্ হওয়া যায় না.; কবিতা লিখিতে জানিলেই কিছু আর শেক্‌স্‌পীয়র্ হওয়া যায় না! এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, নিউটন্-শেক্‌স্‌পীয়র্ প্রভৃতি প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগকে অসামান্য বিদ্বান্ বা অসামান্য পণ্ডিত বলিলে তাঁহাদের প্রকৃত মর্য্যাদা মাটি করা হয়; কেন না, বিদ্যা বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায়, তাঁহাদের বিদ্যা সেরকমের বিদ্যা নহে—শেখা বিদ্যা নহে! তাঁহাদের বিদ্যা একপ্রকার অশেখা বিদ্যা। তাহা অশিক্ষিত গোড়া'র জ্ঞানের উদ্বোধন—চৈতন্যের উদয়! শেখা-বিদ্যার নিকটে ভিন্ন-ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় স্ব-স্ব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অধিকারের গণ্ডির মধ্যেই অবরুদ্ধ; পরন্তু সে-সমস্তের মর্ম্মে-মর্ম্মে পরস্পরের সহিত সৌহার্দবিনিময়ের যেরূপ নানামুখ পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান খুঁজিয়া-পাওয়া অশেখা-বিদ্যারই কাজ—মূল জ্ঞানেরই কাজ।

জ্যোতিষের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যার (Mechanicsএর) যে বিশেষ কোনোপ্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে, এরূপ একটা কথা নিউটনের পূর্ব্বের আমলের পণ্ডিতসমাজে উত্থাপনেরই যোগ্য ছিল না। নিউটন্ নূতন এই একটা বিস্ময়জনক সমাচার পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝখানে উপস্থিত করিলেন যে, যে কারণে বৃন্তচ্যুত ফল ভূতলে নিপতিত হয়, সেই কারণে গ্রহচন্দ্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল স্ব স্ব পরিধিপথে চলাফেরা করে। এরূপ একটা বিশাল জগৎ-জোড়া কথা কে বলিতে পারে? সেই মহাপুরুষই বলিতে পারেন,—যাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞানদৃষ্টিতে সুদূর নভোমণ্ডলের শতসহস্রযোজনব্যাপী গ্রহচন্দ্রাদি আপেল্-ফলেরই জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এটা কি কম একটা কথা! ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সব সত্যই এক সত্য! অতবড় একটা স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালব্যাপী কথা নিউটন্ কোথা হইতে পাইলেন? বাহির হইতে পা'ন নাই, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বাহির হইতে পাইবেন কেমন করিয়া? "সব সত্যই এক সত্য" এটা যে একটা অন্তরাত্মার নিগূঢ় কথা! অন্তরের কথা কি বাহির হইতে পাওয়া যাইতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে মনুষ্য আপনার অন্তর্নিহিত চৈতন্যও পথে-ঘাটে কুড়াইয়া পাইতে পারিত! ফল কথা এই যে, পাইয়াছিলেন নিউটন্ তাহা অশেখা-বিদ্যার হস্ত হইতে—যাচাই করিয়াছিলেন শেখা-বিদ্যার বাজারে। যাচাই-কার্য্য আর-কিছু না—যাথার্থ্যপরীক্ষা অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে

Verification। নিউটনের ঐ যে একটি প্রাণের কথা যে, সত্যের নিকটে বড়-ছোটো নাই—দূর-নিকট নাই; পরন্তু যে সত্য মহাকাশের মহামহা জ্যোতির্মণ্ডলে বিরাজমান, সেই সত্যই ক্ষুদ্র একটা আপেলফলে মাথা গুঁজিয়া রহিয়াছে; তাঁহার ঐই প্রাণের কথাটি যখন তাঁহার জ্ঞানের আলোকে মাধ্যাকর্ষণবেশে সাজিয়া বাহির হইল, আর, তাহার পরে যখন নানাপ্রকার সুপরীক্ষিত বৃত্তান্তের প্রমাণবলে বলী হইয়া সেই কথাটি তাঁহার জ্ঞানের মধ্য হইতে পণ্ডিতসমাজে এবং পণ্ডিতসমাজের মধ্য হইতে সাধারণ লোকসমাজে উথলিয়া পড়িল, তখন জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যা'র মাঝখানে এতকাল ধরিয়া যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সেই দুর্নিবার বানের তোড়ে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল! তখন দেশবিদেশের পণ্ডিতবর্গের চক্ষু ফুটিল, সকলেই তাঁহারা তখন জানিতে পারিলেন যে, জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যা হরিহরাত্মা। তার সাক্ষী নিউটনের উত্তরাধিকারী লাপ্লাস্ তাঁহার নবপ্রণীত জ্যোতিগ্রন্থের নাম দিলেন Cœlestial Mechanics—নাভসিক যন্ত্রবিদ্যা। জ্ঞান তলে-তলে কার্য্য করিয়া বিদ্যার বিশ্লেষিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যোগের কিরূপ বন্ধন আঁটিয়া দেয়, তাহার আর-একটি নমুনা দেখাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বড়-বড় জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এইরূপ একটা অকালপক্ক মত বিদ্যার বাজারে চালাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন জীবশ্রেণী পরস্পরের সংস্রব হইতে কঠিন প্রাচীর দিয়া আগ্লানো রহিয়াছে যে, কোনোগতিকেই এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারে না। ডার্বিন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একজোড়া লম্বপুচ্ছ পায়রা লইয়া তাহাদের পরপরবর্ত্তী বংশের মধ্য হইতে বেশী-বেশী লম্বপুচ্ছ বাছিয়া-বাছিয়া জোড় মিলাইয়া অবশেষে এরূপ একঝাঁক মাত্রাতীত লম্বপুচ্ছ ফলাইয়া তুলিলেন যে, তেমনতরো নূতন-সৃষ্টিগোচের পক্ষীকে দীর্ঘপুচ্ছ পায়রা বলিলেও বলা যাইতে পারে, হ্রস্বপুচ্ছ ময়ূর বলিলেও বলা যাইতে পারে! ডার্বিনের পূর্ব্বাচার্য্যেরা সকলেই জানিতেন যে, প্রকৃতিরাজ্যে ঐরূপ মাঝামাঝিশ্রেণীর জীব অনেক আছে; তার সাক্ষী—টেপর্'কে বড় বরাহ বলিলেও হয়, ছোটো হস্তী বলিলেও হয়; জেব্রা'কে উচ্চশ্রেণীর গাধা বলিলেও হয়, নিম্নশ্রেণীর ঘোড়া বলিলেও হয়; তাহা জানিয়াও তাঁহারা বরাহ, টেপর্, হস্তীকে, তথৈব গাধা, জেব্রা এবং ঘোড়া'কে তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রাচীর দিয়া ঘেরাও করিয়া প্রাণপণ যত্নে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। ডার্বিনের উদ্ভাবিত নূতন পায়রা'র ঝাঁকের পাখা'র ঝাপটে সে সমস্ত প্রভেদের প্রাচীর চকিতের মধ্যে সমভূম হইয়া গেল। ডার্বিন্ অনেককাল ধরিয়া অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত দেশবিদেশের নানাশ্রেণীর জীবজন্তুর জাতিবৈচিত্র্যের গোড়া'র বৃত্তান্ত তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি নিজে যেরূপ প্রণালীতে পায়রার

বংশে মনুষ্যত্বের সমুদ্ভাবন করিয়া তুলিয়াছেন, প্রকৃতিমাতা স্বয়ং সেইরূপ প্রণালীতে নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর জীবের বংশে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর জীব সমুদ্ভাবন করিয়া আসিয়াছেন। সে প্রণালী আর-কিছু না—সুপাত্র বাছিয়া-বাছিয়া যোড়মিলানো। ডারবিন্ তাঁহারনিজের কৃত পাত্রনির্ব্বাচনের নাম দিয়াছেন Artificial Selection—কৃত্রিম পাত্রনির্ব্বাচন; আর প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্ত পাত্রনির্ব্বাচনের নাম দিয়াছেন Natural Selection—নৈসর্গিক পাত্রনির্ব্বাচন। ইহা শুনিয়া শ্রোতার মনে সহজেই এইরূপ একটি জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে, নৈসর্গিক পাত্রনির্ব্বাচনের গোড়া'র সূত্রই বা কি, আর, চরমগতিই বা কিরূপ? ডারবিন্ বলেন এই যে, জীবমাত্রই আপনার সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চারিদিকের প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, আর, যাহারা সংগ্রামে জয়ী হয়, সেই যোগ্যতম জীবেরাই উদ্বৃত্ত হয়। তবেই হইতেছে যে, প্রকৃতিমাতা যোগ্যতম পাত্রের নির্ব্বাচনকর্ত্রী। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, নৈসর্গিক পাত্রনির্ব্বাচনের গোড়া'র সূত্র হ'চ্চে সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, আর, তাহার চরমগতি হ'চ্চে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন! অতএব জীবশ্রেণীর ক্রমবিকাশ অলঙ্ঘনীয়; কেন না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের জীবদিগের মধ্যে যে-যে-শ্রেণীর জীব যোগ্যতম, সেই সেই শ্রেণীর জীবেরাই পরপরবর্ত্তী যুগেউদ্বৃত্ত হয়।

এই জায়গাটিতে আমি একটি গল্প সাজাইয়া তাহার সাহায্যে ডারুইনের সিদ্ধান্তের একটা মূল আদর্শ আপনাদের মনোনেত্রের সম্মুখে দাঁড় করাইতেছি—তাহা হইলেই তাহার মুখ্য অবয়বগুলির মধ্যে কোথায় কিরূপ গ্রন্থিবন্ধনের জোড়জোড়, তাহা সহজেই আপনাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। গল্পটি এই:—

ছয়সমুদ্রপারে সপ্তম সমুদ্রের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে; সেখানে মনুষ্য বা অন্য কোনো জীবজন্তুর উপদ্রব নাই, কেবল একপাল শৃঙ্গহীন গোরু মুক্তভাবে চরিয়া বেড়ায়। সেই উপদ্বীপের মধ্যস্থলে ক্রোশখানেক বিস্তৃত একটি মাঠ আছে, তাহাতেই কেবল তৃণ জন্মে; তা বই, উপদ্বীপের অন্য কোনো প্রদেশে তৃণ জন্মে না। তবেই হইতেছে যে, সেই মাঠটাই গোরুগুলার একমাত্র চরিবার স্থান। গোরুগুলা দিব্য সুখে খায়দায়-থাকে—কাহারো সঙ্গে কাহারো বিবাদ-বিসংবাদ নাই—সকলের সঙ্গেই সকলের প্রাণে-প্রাণে হৃদ্যতা—চরিবার মাঠটি শান্তির আলয়। এইরূপে কিয়ৎকাল নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। এই প্রথম পর্য্যায়ের কালাংশটিকে বলা যাইতে পারে—শৃঙ্গহীন গোজাতির সত্যযুগ! পরযুগের প্রারম্ভে অজস্র -বংশবৃদ্ধি-গতিকে তাহাদের ব্যক্তিসংখ্যা এরূপ মাত্রাতীত অধিক হইয়া উঠিল যে, তাহারা সকলে মিলিয়া মাঠে মধ্যাহ্নভোজন করিবার সময় তাহাদের মাথায়-মাথায় ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল! তাহাদের মধ্যে দুইএকটি গোরু এবং বাছুরের কপালের প্রান্তপ্রদেশ অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল বলিয়া তাহাদের প্রাত্যহিক মধ্যাহ্নভোজনের কোনো ব্যাঘাত ঘটিল না; তাহারা সেইরূপ কপালগুণে ভিড় ঠেলিয়া

মুখ বাড়াইয়া নির্বিঘ্নে তৃণভক্ষণ করিতে লাগিল; যাহাদের কপালের গাঁট অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহারা হটিয়া যাইতে থাকিল। বংশবৃদ্ধিগতিকে কঠিনমৌলি গোরুগুলার যতই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ভোজনকালে তাহাদের সহিত কপালের বলে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কোমলমৌলি শ্রেণীর অধিকাধিকসংখ্যক গোরু মাঠ হইতে বাহিরে পড়িয়া যাইতে লাগিল, আর, তাহার ফল হইল এই যে, স্বল্পাহারগতিকে কোমলমৌলি গোরুগুলা দিনদিন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া ক্রমশই জীবিকানির্ব্বাহে অধিকাধিক অপটু হইয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ংকাল পরে যখন বংশবৃদ্ধিগতিকে কঠিনমৌলি গরুর দল মাঠের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া চরিতে আরম্ভ করিল, তখন কোমলমৌলি গোরুগুলার দল-কে-দল অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। আরো কিছুকাল পরে যখন কঠিনমৌলি গোরুর দল মাঠের বারো-আনা অংশ জুড়িয়া চরিতে আরম্ভ করিল, তখন সারা উপদ্বীপে একটিও কোমলমৌলি গোরু অবশিষ্ট রহিল না; সকলেই তাহারা অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিল।

গোদ্বীপের সত্যযুগে কোমলমৌলি গোরুদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া যখন তাহাদের মাথায়-মাথায় ঠেকাঠেকি আরম্ভ হইয়াছিল, তখনকার সে অবস্থা struggle for existence এর অবস্থা—আত্মরক্ষার জন্য প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ চেষ্টাপরায়ণতার অবস্থা। তাহার পরে যখন কঠিনমৌলি গোরুদের বংশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর, সেই সঙ্গে কোমলমৌলি গোরুদের বংশ ক্রমশই লোপ পাইতে লাগিল—তখনকার সেই যে অযোগ্য হইতে যোগ্যের পার্থক্যসংঘটন, তাহারই নাম Natural selection—নৈসর্গিক পাত্রনির্ব্বাচন। আর, সেই নৈসর্গিক পাত্রনির্ব্বাচনের অনিবার্য্য ফল যাহা পরিশেষে ফলিত হইল—কিনা কোমলমৌলি গোবংশের উচ্ছেদ এবং কঠিনমৌলি গোবংশের উদ্বর্ত্তন, তাহারই নাম survival of the fittest—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। গোদ্বীপশাস্ত্রীয় সত্যযুগের অবসানকালে উপদ্বীপনিবাসী গোজাতি কঠিনমৌলি শ্রেণী পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিল। গোদ্বীপের ত্রেতাযুগে কঠিনমৌলি গোশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি হইয়া এবারে তাহাদের মাথায়-মাথায় ঠেকাঠেকি শুধু নয়, কিন্তু রীতিমত ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইল; কেন না, ত্রেতাযুগের গোরুদের সবারই ললাটগ্রন্থি বিপর্য্যয়-কঠিন। তাহাদের মধ্যে যে-দুটি-একটি গোরুর ললাটগ্রন্থি অত্যল্পস্ফুট শৃঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগ্যতম পাত্র; কাজেই ত্রেতাযুগের অবসানকালে তাহারাই উদ্বৃত্ত হইল। গোদ্বীপের দ্বাপরযুগে যখন অত্যল্পস্ফুটশৃঙ্গ গোবংশ মাত্রাতীত পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি শুধু নয়, কিন্তু বেঁধাবিঁধি এবং সেই সঙ্গে রক্তারক্তি কিয়ৎপরিমাণে চলিতে থাকিল, তখন তাহাদের মধ্যে যে-দুটি-একটি গোরুর শৃঙ্গ সুপরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগ্যতম পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই কারণে শৃঙ্গী গোবংশ দ্বাপরান্তে উদ্বৃত্ত হইয়া গোদ্বীপের কলিযুগে সংক্রামিত

হইল। এখানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন দ্বীপ, তেমনি যুগ। আমাদের এই জম্বুদ্বীপ একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী—গোদ্বীপ একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ। কাজেই গোদ্বীপের এক যুগ, জম্বুদ্বীপের এক শতাব্দীও নহে। এইখানে গল্প সমাপ্ত হইল—আমার কথাটি ফুরাইল।

এ যাহা আমি এতক্ষণ ধরিয়া বাখানিলাম, এটা যদি-চ কাল্পনিক উপন্যাস বই নহে, কিন্তু ডারুইন্ যেরূপ অকাট্যপ্রমাণ দ্বারা উহার সম্ভাবনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ কৃত্রিম ঘটনাটি বাস্তবিক হইবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না।

ডার্বিনের এই নূতন সিদ্ধান্তটিকে জীব-জগতের গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া আধুনিক বিবৃত্তিবাদী পণ্ডিতেরা —Evolutionist এরা—এইরূপ একটি ব্যাপকরকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিভিন্নশ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই জীবাঙ্কুরের (Protoplasm এর) ভিন্নধা বিকাশ, আর, সেই ভিন্নধা বিকাশের মূল-প্রবর্ত্তক Struggle for existence—সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা। আধুনিক বিবৃত্তিবাদের এই মোট মন্তব্যকথাটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে খুবই নূতন, পরন্তু আমাদের দিক্ দিয়া আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহাদের ঐ নূতন কথাটি বহু পুরাতন কথা ; তার সাক্ষী—সাংখ্যদর্শনের একটি গোড়া'র কথা এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই মূলপ্রকৃতির ভিন্নধা বিকাশ, আর,সেই ভিন্নধা বিকাশের মূলপ্রবর্ত্তক রজোগুণ। রজোগুণ পদার্থটা আর-কিছু না—দুঃখ এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্ম-চেষ্টা। দুঃখ এবং কর্ম্মচেষ্টাকে এক সঙ্গে জোড়া দিলেই দুয়ে মিলিয়া হইয়া দাঁড়ায় Struggle for existence—সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা। তবেই হই-তেছে যে, Struggle for existence রজোগুণের আর-এক নাম। বলিতে কি—প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্তের দ্বার উদ্ঘাটন করি-বার অব্যর্থ চাবি ত্রিগুণতত্ত্বের ন্যায় দ্বিতীয় আর-একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার! ত্রিধাতু-নির্ম্মিত অমন একটি চমৎকার চাবি যখন আমাদের হাতের কাছে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, তখন তাহাকে কাজে না খাটাইয়া কেমন করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? অতএব তাহার চেষ্টা দেখা যা'ক্।

মনে কর, পুষ্করিণী শুখাইয়া গিয়াছে, আর, তাহার তলপঙ্কে একটা মৎস্য মৃতবৎ পড়িয়া আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই যেমন ত্রিগুণাত্মক, বেচারা মৎস্যটিও তেমনি ত্রিগুণাত্মক! সত্ত্ব, রজ এবং তম, এই তিন গুণ মৎস্যটির ভিতরে পুঁটুলিবাঁধা রহিয়াছে ;—আছে তিন গুণই পুঁটুলিবাঁধা, তবে কিনা মৎস্যটির এক্ষণকার অসাড় এবং নিশ্চেষ্ট শরীরে তমোগুণেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। তমোগুণ তো আর গাছে ফলে না—অসাড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার নামই তমোগুণ। কিন্তু মৎস্যটি কি একেবারেই অসাড়, একেবারেই নিশ্চেষ্ট? তাহা হইতে পারে না ; কেন না, যদিও মৎস্যটি মড়া'র মতো পড়িয়া আছে, তথাপি সে বাঁচিয়া আছে—মরে নাই ;—বাঁচিয়া যখন আছে, তখন, অবশ্যই তাহার তমোগুণের ঘন অ-ন্ধকারে রজোগুণ কিনা দুঃখ এবং ছট্-

চাপা পড়িয়া রহিয়াছে—যদি-চ সাতহাত জলের নীচে। তা শুধু না—মৎস্যটির তমোগুণের আড়ালে যেমন রজোগুণ লুকাইয়া আছে, রজোগুণের আড়ালে তেমনি সত্ত্বগুণ লুকাইয়া আছে—দুঃখ এবং ছটফটানির আড়ালে দুঃখের ঔষধ লুকাইয়া আছে। দুঃখের ঔষধ সে যে কি তাহা জানিতে হইলে, দুঃখের কারণ কি তাহা জানা আবশ্যক। দুঃখের কারণ হ'চ্চে অভাববোধ। মৎস্যটির অভাববোধ হইতেছে কিসের প্রতিকে? অবশ্য জল হইতে বিযুক্ত-হওয়া-প্রতিকে। "জল পাইলে বাঁচি" এই কথাটি মৎস্যের অভাববোধের হাড়ে-হাড়ে জাগিতেছে। মৎস্যটির দুঃখের ঔষধ যে কি, তাহা বোঝা গেল। সে ঔষধ আর-কিছু না—জলের সংস্পর্শ। জলের সংস্পর্শ ঘটিবে কেমন করিয়া—জল যে অনেকহাত দূরে! স্বপ্নে তাহা ঘটিতে পারিবার বাধা নাই। মৎস্যটির অভাববোধের অন্তস্তলে তাহার নৈসর্গিক সংস্কার, ইংরাজিতে যাহাকে বলে instinct, সেই নৈসর্গিক সংস্কার জলের স্বপ্ন দেখিতেছে, আর, মৎস্যটি সেই স্বপ্নের জলে সাঁতার দিয়া কিয়ৎপরিমাণে সুখ অনুভব করিতেছে—যদি-চ তাহা একপ্রকার দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। মৎস্যটি ভুলিতে পারে নাই—ঐ যে জলের প্রকাশ এবং সন্তরণসুখ, উহাও প্রকাশ, উহাও সুখ; যদি-চ উহা স্বপ্নের প্রকাশ বই—স্বপ্নের সুখ বই—জাগ্রত প্রকাশ নহে, জাগ্রত সুখ নহে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা যেমন তমোগুণের ধর্ম্ম, দুঃখ এবং ছটফটানি যেমন রজোগুণের ধর্ম্ম, সুখ এবং প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। মৎস্যটির নিশ্চেষ্ট এবং অসাড় শরীরে তমোগুণের খুবই প্রাদুর্ভাব, তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে, তা ছাড়া, উহার ভিতরে খানাতল্লাসি করিয়া আর-দুইটি নিগূঢ়রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল এই যে, উহার তমোগুণের আড়ালে রজোগুণ লুকাইয়া আছে, তথৈব রজোগুণের আড়ালে সত্ত্বগুণ লুকাইয়া আছে। অতঃপর মনে কর যে, মৎস্যটিকে পঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া একটা জলপূর্ণ পুষ্করিণীর অনতিদূরে শুকডাঙায় ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মৎস্যটির রজোগুণ যাহা এ দীর্ঘকাল তমোগুণের ঘন পরিচ্ছদে মুখ মুড়িমুড়ি দিয়া লুকাইয়া ছিল, এক্ষণে তাহা প্রকাশ্যে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল, আর, সেই-গতিকে মৎস্যটির লাফানি-ঝাঁপানি আরম্ভ হইল; ইহারই নাম Struggle for existence—সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। এই সময়ে মৎস্যের ভিতরে আর-একটি ব্যাপার আরম্ভ হইল—সত্ত্বগুণের প্রভাব অল্প-অল্প করিয়া জানান্ দিতে লাগিল। মৎস্যটির হাড়ে-হাড়ে জাগিতেছে সেই যে স্বপ্নরূপী জলের প্রকাশ এবং সন্তরণসুখ, যাহা মৎস্যটির নৈসর্গিক সংস্কারের (instinctএর) অবিচ্ছেদ্য সহচর, সেই সত্ত্বগুণের ব্যাপারটি অন্ধকারের প্রদীপ হইয়া মৎস্যটিকে ক্রমাগতই জলপূর্ণ পুষ্করিণীর অভিমুখবর্ত্তী পথ দেখাইতে লাগিল। মৎস্যটি সেই "নৈসর্গিকসংস্কাররূপী সত্ত্বগুণের আলোকে পথ চিনিয়া-চিনিয়া" লাফাইতে-লাফাইতে পুষ্করিণীর পাড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার আর-কিছুকাল পরে তাহার চক্ষের সাম্‌নে পুষ্করিণীতে

জল থইথই করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যে-জল তাহার সুখস্বপ্নে ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা প্রকাশ পাইতেছিল, এক্ষণে সেই জল তাহার চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান। এই সময়ে মৎস্যটির অন্তরের সুখস্বপ্ন বাহিরের জলপ্রকাশে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল! এইরূপ প্রকাশ এবং আনন্দের অভিব্যক্তির নামই সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব। সত্ত্বগুণের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া মৎস্যটিকে সোধা রাস্তা দেখাইয়া দিল, আর অমনি তৎক্ষণাৎ মৎস্যটি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পাইয়া বাঁচিল! ত্রিগুণের লীলা নিম্নশ্রেণীর জীবে তো এইরূপ মনুষ্যে কিরূপ তাহা দেখা যা'ক।

মনে কর, শেষরাত্রে একজন কবির ঘুম ভাঙিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাঞ্চল্যের কারণ অবশ্য অভাববোধ। আলোকের অভাবেরই নাম অন্ধকার; সুতরাং অন্ধকারবোধ একপ্রকার অভাব-বোধ; সেই অভাববোধই মনের চঞ্চলতার কারণ। কবির মনের ঐ যে চঞ্চলতা, উহা আর-কিছু না, আলোকের জন্য ছট্‌ফটানি: ইহারি আর-এক নাম রজোগুণের প্রাদুর্ভাব। কালিদাসের শকুন্তলায় একটি সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা এই :—

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

একদিকে ওষধিগণের পতি অস্তশিখরে যাইতেছেন, আর-এক দিকে সূর্য্য প্রকাশিত অরুণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বাহির হইতেছেন। কবি এই শ্লোকটি আওড়াইতে আওড়াইতে মনোমধ্যে একপ্রকার স্বপ্নের সূর্য্যালোক জাগাইয়া-তুলিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে লাগিলেন। তাহার পরে যখন রজনীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া দিবসের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, এবং আর-কিছুকাল পরে যখন সবিতাদেব হিরণ্ময় জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন কবির মনের স্বপ্নালোক জাগ্রত বিশ্বালোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। সুষুপ্তিকালে কবির তমোগুণের ঘনপরিচ্ছদে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ মুখ মুড়িসুড়ি দিয়া লুকাইয়া ছিল: সুপ্তিভঙ্গে রজোগুণ অর্থাৎ মনের ক্ষোভ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল; তাহার পরে সত্ত্বগুণ অর্থাৎ অন্তরের আলোক বিশ্বের আলোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। ত্রিগুণের লীলা জীবরাজ্যে দেখিলাম—মনুষ্যে দেখিলাম—দেখিতে কেবল বাকি জড়জগতে। জড়বস্তুর ভিতরে সত্তা আছে এবং শক্তি আছে—এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু তা ছাড়া, জড়বস্তুর শক্তির মূলে যে, শক্তির নিয়ামক এবং পথপ্রদর্শক আছে—রজোগুণের গতি-স্ফূর্ত্তির মূলে যে সত্ত্বগুণের আলোক আছে, এ কথা স্বীকার করিতে অনেকে ভারবোধ করেন—ভারবোধ করিবারই কথা, কেন না, বাস্তবিকই জড়বস্তু তমোগুণপ্রধান। জড়-বস্তুর শক্তিস্ফূর্ত্তি দেখিলে, গতিক্রিয়া দেখিলে, সহসা মনে হয়, যেন তাহার গতিক্রিয়ার কোনো পথপ্রদর্শক বা নিয়ামক তাহার ভিতরে নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, জড়বস্তুর গতিক্রিয়া নিতান্ত অন্ধ নহে; পরন্তু তাহার ভিতরে

তাহার প্রবর্ত্তক যেমন আছে—নিয়ামকও তেমনি আছে; চালাইবার চাবুক যেমন আছে—থামাইবার রাশও তেমনি আছে।

স্পেন্সর্ প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতেরা রজোগুণকে সত্ত্বগুণের সংস্রব হইতে সমূলে বিশ্লেষিত করিয়া এইরূপ একটা একদিক্-ঘেঁসা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন যে, অল্পতম বাধার পথে চলাই (Least resistance এর পথে চলাই) গতির মূলনিয়ম। ইহাতে গতিক্রিয়ার নিষ্পাদনে সত্ত্বগুণের যে কোনো-প্রকার হস্ত আছে, তাহা প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হইয়াছে। স্পেন্সর্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা বাধাগ্রস্ত গতির নিয়মকে গতির মূলনিয়ম বলিতেছেন কোন্ যুক্তিতে? বাধাই কি গতির সর্ব্বস্ব? মনে কর, দুই বন্ধু রাম এবং শ্যাম কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ভারতভ্রমণে বাহির হইলেন। রাম বলিলেন "আসামে যাই চল"; শ্যাম বলিলেন—"দক্ষিণপ্রদেশ অনেকের নিকটে অপরিজ্ঞাত—কন্যাকুমারীতে যাই চল." শেষে দুজনা'র মধ্যে রফাসুরত এইরূপ মন্ত্রণা ধার্য্য হইল যে, "মান্দ্রাজে যাওয়া যা'ক্—মান্দ্রাজ দক্ষিণ-অঞ্চলও বটে, পূর্ব্ব অঞ্চলও বটে।" এরূপ স্থলে, বৈজ্ঞানিক ভাষায়—মান্দ্রাজমুখো পথই অল্পতম বাধার পথ। এখানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দুজনার যাত্রারম্ভ-সময়ের পৃথক্ পৃথক্ মনের গতিই গোড়া'র কথা—উভয়ের বাধাগ্রস্ত একথা মনের গতি তাহার পরের কথা। আমি চাহিতেছি অব্যাহত গতির নিয়ম; তুমি আমাকে আনিয়া দিতেছ বাধাগ্রস্ত গতির নিয়ম, আর, তাহাকেই বলিতেছ গতির মূলনিয়ম। ফলে, অব্যাহত গতির নিয়ম ডিঙাইয়া বাধাগ্রস্ত গতির নিয়মকে প্রাধান্য দেওয়া একপ্রকার ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। স্পেন্সর্ প্রভৃতি নব্যশ্রেণীর আধুনিক পণ্ডিতগণের চাইতে নিউটন্ ঢের উঁচুদরের জ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে আর-ভুল নাই; তাই তিনি গোড়া'র কথা গোড়াতেই উত্থাপন করিয়া গোড়াতেই তাহার সমুচিত মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন্ গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, অব্যাহত গতি সরলরেখার পথ অবলম্বন করে, আর, ঐ মূল কথাটির বলে এটাও তিনি বিধিমতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বক্রপথগামী বস্তুরাও প্রতি-মুহূর্ত্তে সরলরেখাপথে গমনোদ্যত।
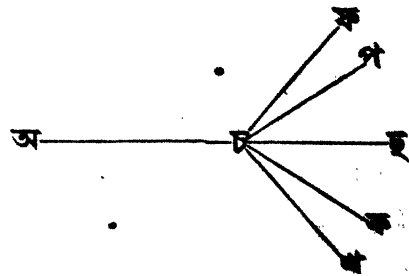
মনে কর একটা বস্তু (চ) অব্যাহত গতি, আর, সেইজন্য তাহা সরলপথে (অচছ-পথে) চলিতেছে। সরলপথে যখন চলিতেছে, তখন কাজেই তাহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অতিবাহিত পথের সমসূত্রবর্ত্তী পথে চলিতে হইতেছে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, অতিবাহিত (অচ) পথের সমসূত্রবর্ত্তী পথ একটিমাত্র (চছ)—অসমসূত্রবর্ত্তী পথ অসংখ্য

(চক, চখ, চগ, চঙ ইত্যাদি)। কাজেই চলমান বস্তুটাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অসংখ্য বিভিন্নমুখ পথের মধ্য হইতে সমসূত্র পথটি বাছিয়া-লইয়া সেই পথে চলিতে হইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য বিভিন্নমুখ পথের মধ্য হইতে সমসূত্রবর্ত্তী পথটি চিনিয়া-লওয়া অন্ধব্যক্তির কার্য্য, না চক্ষুমান্ ব্যক্তির কার্য্য? অবশ্য তাহা চক্ষুমান্ ব্যক্তির কার্য্য। তবেই হইতেছে যে, চলমান বস্তুটা'র ভিতরে অবশ্যই এমন একটা-কিছু আছে, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে গন্তব্য সমসূত্রপথটি চিনাইয়া দিতেছে। তা শুধু না—ভিতরের সেই পথপ্রদর্শকটির ন্যায়বোধ আছে। সে বলিতেছে যে, সমসূত্রপথের ডাহিনে যদি যাও, তবে বামদিক্ কি অপরাধ করিল? বামে যদি যাও, তবে ডাহিনদিক্ কি অপরাধ করিল? ঊর্দ্ধে যদি যাও, তবে নিম্নদিক্ কি অপরাধ করিল? নিম্নে যদি যাও, তবে ঊর্দ্ধদিক্ কি অপরাধ করিল? অতএব চলিতে যখন হইতে-ই-হে, তখন ডাহিনে-বামে বা অধ-ঊর্দ্ধে না হেলিয়া সমসূত্রে চলাই ন্যায়সঙ্গত। প্রথম দ্রষ্টব্য এখানে এই যে, চলমান বস্তুটার ভিতরে একটা ছট্‌ফটানি আছে—রজোগুণের কামড়ানি আছে, সেই-জন্য সে স্থানপরিবর্ত্তন না করিয়া একমুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, তাহার ভিতরে রজোগুণের উত্তেজনা তো আছেই, তা ছাড়া, গন্তব্য-দিকের একটা প্রকাশ আছে—সত্ত্বগুণের আলোক আছে; আর, সেইজন্য তাহার ডাহিনে-বামে উচ্চে-নীচে অসমসূত্র পথ প্রযুক্ত রহিয়াছে যদিচ সহস্রধা—সে কিন্তু তাহার কোনোটার দিকে না হেলিয়া ন্যায়-সঙ্গত সমসূত্রপথটি বাছিয়া-লইয়া সেই পথেই চলিতেছে! ফল কথা এই যে, গতির সম্ভাবনীয়তার পক্ষে বাধা যেমন প্রয়োজনীয়, প্রবর্ত্তক তেমনি প্রয়োজনীয়; প্রবর্ত্তক যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়ামক তেমনি প্রয়োজনীয়! গতির বাধা হ'চ্চে তমোগুণ, যেহেতু বাধা জড়ধর্ম্মী; গতির প্রবর্ত্তক হ'চ্চে রজোগুণ, যেহেতু তাহা একপ্রকার ছট্‌ফটানি; গতির নিয়ামক হ'চ্চে সত্ত্বগুণ, যেহেতু তাহা একপ্রকার প্রকাশ—গন্তব্যদিকের প্রকাশ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সূক্ষ্ম ঈথরই হউক আর স্থূল পৃথিবীই হউক—একটা না-একটা কোনো জড়বস্তুর (অথবা যাহা একই কথা—তমোগুণের) আশ্রয় ব্যতিরেকে গতি থাকিতে পারে না; তেমনি আবার স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য ভিতরের ছট্‌ফটানি বা রজোগুণের উত্তেজনা ব্যতিরেকে গতি থাকিতে পারে না; তথৈব, দিঙ্‌নিরূপণ ব্যতিরেকে (অথবা যাহা একই কথা—সত্ত্বগুণের আলোকে গন্তব্যদিকের প্রকাশ ব্যতিরেকে) গতি থাকিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, গতিক্রিয়ার ব্যাপারটিতে গতির বাধারূপী তমোগুণ, গতির প্রবর্ত্তকরূপী রজোগুণ এবং গতির নিয়ামকরূপী সত্ত্বগুণ, তিনের পরস্পরাশ্রয়িতা অপরিহার্য্য। তবেই হইতেছে যে, সমস্ত জড়জগৎ ত্রিগুণাত্মক, কেন না, গতি জড়বস্তুর শক্তিস্ফূর্ত্তিরই আর-এক নাম।

সত্ত্বরজস্তমোগুণ কোথায় কি ভাবে কার্য্য করে—নিম্নশ্রেণীর জীবেই বা কি

ভাবে কার্য্য করে, মনুষ্যের মনোমধ্যেই বা কি ভাবে কার্য্য করে, জড়জগতেই বা কি ভাবে কার্য্য করে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখাইলাম। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, এটা যেমন সত্য যে, সব বস্তুতে সত্বরজস্তম সব গুণই আছে, এটাও তেমনি সত্য যে, সব বস্তুতে সব গুণের প্রাদুর্ভাবের মাত্রা সমান নহে। বিশেষতঃ সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব মনুষ্যের মধ্যে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কোনো জীবের মধ্যেই নহে। এ তো জানাই আছে যে, অভাবের অনুভব হইতে ক্রন্দন বাহির হয় শৃগালকুকুরাদি অনেকানেক জীবের; পক্ষান্তরে, ভাবের উদয় হইতে হাস্য বাহির হয় কেবল মনুষ্যেরই মুখে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ভাবের উদয় একপ্রকার অন্তরের আলোক; হাস্য আনন্দের অভিব্যক্তি; আর, প্রকাশ এবং আনন্দ দুইই সত্বগুণের নির্ঘাত পরিচয়-লক্ষণ। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব মনুষ্যের মধ্যে যেমন, এমন আর কোনো জীবেই নহে। আর-একটি দ্রষ্টব্য এই যে, পশ্বাদি জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যের অভাববোধ তো আছেই, তা ছাড়া, মনুষ্যের নূতন আর-একতরো বোধ আছে, যাহা অন্য কোনো জীবেরই নাই। সেটা হ'চ্চে ভাববোধ;—যেমন সৌন্দর্য্যবোধ, মঙ্গলবোধ, সত্যবোধ, ন্যায়বোধ, ধর্ম্মবোধ ইত্যাদি। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, অভাববোধ নূতন উদ্ভাবনের মাতা—Necessity is the mother of invention। অধিকন্তু আমি বলি এই যে, নূতন উদ্ভাবনের মাতা যেমন অভাবের অনুভূতি, নূতন উদ্ভাবনের পিতা তেমনি ভাবের উদয়। অভাবের অনুভূতি পশ্বাদি জন্তুর খুবই আছে, কিন্তু সে এক্‌লা-নারী হইতে কোনোপ্রকার নূতন উদ্ভাবনের জন্ম ঘটিতে আজ পর্য্যন্তও দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে, অভাবের অনুভূতি যখন মনুষ্যের মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাবের উদয়'কে পতিত্বে বরণ করে, তখনই যথাসময়ে তাহার গর্ভে নূতন উদ্ভাবনা জন্মগ্রহণ করে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্যের ভাব, মঙ্গলের ভাব, সত্যের ভাব, ধর্ম্মের ভাব, এই এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবের আলোকে বিশেষ বিশেষ মহাত্মারা বিশেষ বিশেষ অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করেন; তার সাক্ষী—কালিদাস সৌন্দর্য্যের আলোকে শকুন্তলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; প্লেটো মঙ্গলের আলোকে নূতন একপ্রকার সাধারণতন্ত্র (Republic) সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বেকন্ সত্যের আলোকে নব আট্‌লান্টিস্ উপদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কোনো লোকপূজ্য মহাপুরুষ ধর্ম্মের আলোকে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল ভাবের আলোক সত্বগুণেরই অভিব্যক্তি। যদি-চ সত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব কেবল মনুষ্যের মধ্যেই সম্ভবে, তথাপি সত্বগুণের যথাসম্ভব ন্যূনাধিক প্রাদুর্ভাব সকল জীবেই দেখিতে পাওয়া যায়—এমন কি, জড়বস্তুতেও। তার সাক্ষী—পিপীলিকাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যায় যে, [illegible]কার সামাজিক সুব্যবস্থার আলোক তাহাদেরও মনোমধ্যে ঝিক্‌মিকি দিতেছে—যদি-চ স্বপ্নের ন্যায় অপরিস্ফুটভাবে; সে ঝাপ্‌সা আলোকও

সত্ত্বগুণেরই আলোক। তেমনি আবার বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে বটবৃক্ষের ভাব যাহা পুঁজি করা রহিয়াছে, তাহাও সত্ত্বগুণের একপ্রকার ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি।

ডার্বিন্ জীবরাজ্যে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইয়াছেন খুবই স্পষ্ট; তাঁহার তাহা দেখিতে পাইবারই কথা, যেহেতু পশ্বাদি জীব বাস্তবিকই রজোগুণপ্রধান; কিন্তু তদ্ব্যতীত সেই রজোগুণের পর্দার আড়ালে যে, সত্ত্বগুণ, লুকাইয়া-লুকাইয়া কার্য্য করিতেছে, আর, মনুষ্যের অন্তঃকরণে তাহা যে রীতিমত আসর জমকাইয়া বসিয়া আছে, এ কথাটির প্রতি তিনি বিহিতবিধানে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবজগতে 'লড়াই-ঝগড়া'র প্রাদুর্ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার অনিবার্য্য ফল যাহার নাম দিয়াছেন ডার্বিন্ যোগ্যতমের উদ্বর্তন, তাহা জীবপ্রকৃতির কেবল একটামাত্র দিক্—ক্ষত্রিয়ভাবের দিক্—রজোগুণের দিক্। কিন্তু তদ্ব্যতীত আর-একটা দিক্ আছে—সেটাও বিবেচ্য; সেটা হ'চ্চে ব্রাহ্মণভাবের দিক্—সত্ত্বগুণের দিক্। এ যাহা আমি বলিতেছি, ইহার দৃষ্টান্ত আমি পুস্তকে দেখিয়াছি নানাতর; পরন্তু একটি দৃষ্টান্ত যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেটি অতি চমৎকার।

বছরদশেক পূর্ব্বে আমি আমার চক্ষের সাম্নে একটি মনোমুগ্ধকরী ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। গঙ্গার কিনারা-বাঁধা একটা অট্টালিকার বারাণ্ডায় ভৃত্যবর্গেরা থালা-পাথর পরিষ্কার করিবার সময় উচ্ছিষ্ট অন্নাদি গঙ্গার তীরোপান্তে ঝাড়িয়া ফেলিত; সেই সময়ে ম্যালা কাক জমা হইয়া সেই সমস্ত পরিত্যক্ত ভক্ষ্যসামগ্রী খুঁটিয়া খাইত। একদিন তাহাদের ভোজনকালে বৃহৎ একটা দাঁড়-কাক তাহাদের মধ্যে উড়িয়া-আসিয়া জুড়িয়া-বসিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিল। তাহার প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-যমদূত-বোধে আর-আর কাকেরা তাহার নিকট হইতে অনেকহাত দূরে সরিয়া বসিল। বলিব কি, দাঁড়-কাকটির মতো দয়াবান্ মহাপুরুষ আমি আমার জন্মে দেখি নাই; সে দুইচারিটি ঠোকর খাইতেছে, আর, ভিন্নজাতীয় কাকগুলাকে খাইতে জায়গা ছাড়িয়া-দিয়া পাঁচছয়হাত অন্তরে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিতেছে; ক্রমাগত এইরূপে আসা-যাওয়া করিয়া ভোজ্যসামগ্রীর নিরেনব্বই অংশ নিরেনব্বই কাককে খাইতে দিয়া একাংশ-মাত্র আপনি খাইল, তাহাতে তাহার পেট ভরিল কি না সন্দেহ—কেন না, তাহার শরীরের আয়তন আর-আর কাকের অপেক্ষা দ্বিগুণ লম্বা-চওড়া। ইচ্ছা করিলে সে একা-আপনি সব-ক'টি ভাত স্বচ্ছন্দে উদরস্থ করিতে পারিত—কেন যে তাহা করিল না, তাহা সে-ই জানে, আর অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষই জানেন। ডার্বিনের আইন মানিয়া চলিতে হইলে দাঁড়কাক'টার উচিত ছিল—অযোগ্য কাক-গুলা'কে ঠোকরে-ঠোকরে উচ্ছিন্ন করিয়া আপনি একাকী উদ্বৃত্ত হওয়া। প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই:—ডার্বিন কিম্বা-আর বৈবাহিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় সমস্ত বিশ-

ব্রহ্মাণ্ডকে অভেদদৃষ্টিতে দেখিতেছেন না—জীবে-জীবে প্রভেদ আছে, এ কথা তিনি মানেন। এটা যখন তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় প্রভেদ আছে, তখন সেই সঙ্গে এটাও তাঁহার স্বীকার করা উচিত যে, মাতা-পুত্রে প্রভেদ আছে। প্রকৃতি হ'চ্চেন মাতা, আর, জীবগণ হ'চ্চে প্রকৃতিমাতার পুত্র, এবং পরস্পরের ভ্রাতা। সময়ে-সময়ে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিতেও দেখা যায়, আর সেইগতিকে যোগ্যতম ভ্রাতার উদ্বর্তন ঘটিতেও দেখা যায়। কিন্তু তা বলিয়া মাতার মনোগত অভিপ্রায় এরূপ হইতে পারে না যে, যোগ্যতম ভ্রাতা অযোগ্য ভ্রাতাদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া আপনি একাকী উদ্বৃত্ত হউক্। উল্টা বরং মাতার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, যোগ্যতম ভ্রাতা অযোগ্য ভ্রাতাদিগের অভাবপূরণ করিয়া তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া লউক্। নিম্নশ্রেণীর জীবের মতো ছোটো ছেলেরা মাতা'র মর্ম্মগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারুক, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় বড় ছেলেদের তাহা বুঝিতে না পারিবার কোনো কারণ নাই। কেন না, প্রকৃতিমাতা নিজহস্তে যে-কোনো কার্য্য করেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, তাঁহার কাজই হ'চ্চে অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া-লওয়া। তার সাক্ষী—ব্যাঙাচিগুলা জলে কিল্‌বিল্ করে, অথচ ডাঙার একপ্রকার স্বপ্ন তাহাদের ভিতরে-ভিতরে কার্য্য করিয়া ক্রমে-ক্রমে তাহাদের হস্তপদ ফুটাইয়া তোলে, আর, সেইগতিকে ব্যাঙাচি ব্যাঙ্ হইয়া উঠিয়া ডাঙায় বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে। অন্যান্য অবোধ জীবেরা নিতান্ত ছোটো ছেলে, সুতরাং ছুরন্তপনা তাহাদিগকে শোভা পায়, কিন্তু মনুষ্য যখন প্রকৃতিমাতার মর্ম্মগত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অযোগ্য ভ্রাতাদিগের উচ্ছেদের উপরে আপনার যোগ্যতমত্বের গোড়াপত্তন করিতে যায়, তখন প্রকৃতিমাতা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকে শিক্ষাদান করেন এমনি নির্ঘাতরকমের যে, মনুষ্য জন্মে তাহা ভুলিতে পারে না। ডার্বিনের এই যে শক্ত আইন "যোগ্যতমের উদ্বর্তন", ইহা লোকসমাজে প্রচলিত হইলে লোকে যে কিরূপ "দৌর্ভিক্ষ্যাৎ যাস্তি দৌর্ভিক্ষ্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং"—দৌর্ভিক্ষ্য হইতে দৌর্ভিক্ষ্যে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে পদনিক্ষেপ করে, ফরাসীস্ বিপ্লবের সময় তাহা পারিনগরের পুরবাসীদিগের কাহারো জানিতে বাকি ছিল না। অযোগ্য রাজবংশ এবং রাজ-পারিষদবর্গকে শাসাইয়া প্রথমে মিরাবো'র দল যোগ্যতম হইয়া উঠিলেন; তাহার পরে বিধিমতপ্রকারে রাজবংশ ধ্বংস করিয়া রবস্পিয়র্ যোগ্যতম হইয়া উঠিলেন; তাহার পরে সারারাজ্যের অযোগ্যদিগকে তোপের ধমকে দূরে বহিষ্কৃত করিয়া-দিয়া নেপোলিয়ন্-মহাবীর আপনার যোগ্যতমত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যাহাই হোক্ না কেন—ফরাসীস্ বিপ্লবের রজোগুণ-প্রধান উন্মত্ত তরঙ্গকোলাহলের গভীর অন্তস্তলে সত্বগুণের রত্নপ্রদীপ সুমহান্ স্বর্গীয় আলোক বিকীর্ণ করিতে এক মুহূর্ত্তও ক্ষান্ত ছিল না, এবং এখনো পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত

সভ্যজাতির কুটিল রাজনৈতিক পাকচক্রের ভিতরে-ভিতরে সে-ই সে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে—যদি-চ বাহিরে তাহার চিহ্ন বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে আলোক হ'চ্চে ফরাসীস্ বিপ্লবের মূলমন্ত্র ; তাহা যে কি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন—সাম্য, সৌহার্দ্দ, মুক্তি। কিন্তু এই যে জ্যোতির্ম্ময় মহামন্ত্র সাম্য-সৌহার্দ্দ-মুক্তি, ইহার সাধনপদ্ধতি কি ঐ ? অযোগ্য ভ্রাতাদিগকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া যোগ্যতমেরা নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুক্—এই কি উহার সাধনপদ্ধতি ? ফরাসীস্ বিপ্লবের সময় ঐ মহামন্ত্রের সাধকেরা প্রকৃত সাধনপদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনকেই সার জ্ঞান করিয়া তাহারই পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা অকূল বিপত্তি-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া সারা হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি অযোগ্য ভ্রাতাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত না হইয়া তাঁহাদিগকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ওরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না ;—তাহা তো হইতই না, তা ছাড়া, তাহার একশতাব্দী পরে যোগ্যতম বিস্মার্কের নিকটে হীনতাস্বী গার করিতে হইত না।

অধুনাতন কালের নূতন বিবৃতিবাদের মোট বক্তব্য কথা যে কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি : তাহা এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই জীবাঙ্কুরের (Protoplasm-এর) ভিন্নধা বিকাশ, আর, সেই বিকাশের মূলপ্রবর্ত্তক Struggle for Existence, এক কথায় রজোগুণ। কিন্তু সে বিকাশের নিয়ামক যে কে—পথপ্রদর্শক যে কে—সে বিষয়ে ডার্বিন্ একটি কথারও উচ্চবাচ্য করেন নাই। আমাদের দিক্ দিয়া আমরা দেখিতেছি যে, একদিকে যেমন রজোগুণের চাবুক সেই বিকাশকে পথের মাঝে-মাঝে খেপাইয়া তুলিতেছে, আর-এক দিকে তেমনি সত্ত্বগুণের রাশ তাহাকে ঠিক্‌পথে বাগাইয়া-আনিয়া ধীরে-ধীরে মনুষ্যত্বের উন্নত সোপানে পৌঁছাইয়া দিতেছে। আমাদের দেশের সাংখ্যশাস্ত্র ডারুইনের শাস্ত্রের ন্যায় একদিক্-ঘ্যাঁসা নহে। সাংখ্যশাস্ত্রের মোট বক্তব্য কথা এই যে, একদিকে মূলপ্রকৃতি হইতে অনুলোমপথের মধ্য দিয়া স্থূলের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে, আর-এক দিকে স্থূল হইতে প্রতিলোমপথের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে ; অথবা যাহা একই কথা—অনুলোমপথে তমোগুণের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে ; প্রতিলোমপথে সত্ত্বগুণের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে ; এবং উভয় পথেই রজোগুণ স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। সাংখ্যের মোট বক্তব্য কথাটি আরো সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—যদি-চ তাহা শুনিতে অনেকের নিকটে হেঁয়ালির মতো ঠেকিবে। খুব সংক্ষেপে যদি বলিতে হয়, তবে তাহা এই :—সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম হ'চ্চে প্রকাশ ; তমোগুণের ধর্ম্ম হ'চ্চে অপ্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম্ম হ'চ্চে প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, এইরূপ ছট্‌ফটানি। প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে নাবা হ'চ্চে অনুলোমপদ্ধতি ; অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে ওঠা হ'চ্চে প্রতিলোমপদ্ধতি।—কথাটি খুব সংটে বলিলাম ;

সুতরাং উহার ভাষ্য এবং টীকা করা আবশ্যক; পরন্তু এ যাত্রায় তাহা আমা কর্তৃক সম্ভাবনীয় নহে, যেহেতু তাহা সময়-সাপেক্ষ।

ত্রিগুণতত্ত্বসম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা বলিলাম, ইহাতে অন্তত এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ডার্বিনের শাস্ত্রের দীপালোক অপেক্ষা আমাদের দেশীয়শাস্ত্রের সূর্য্যালোক প্রকৃতির নিগূঢ়রহস্যের গভীর মর্ম্মস্থানের তলা পর্য্যন্ত অনেকদূর যায়। আমাদের দেশীয়শাস্ত্রের মতে শুধুকেবল জীবজগৎ নহে, পরন্তু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তু ন্যূনাধিক-পরিমাণে স্বস্ব-সত্তা-সমর্থনের জন্য চেষ্টাপরায়ণ; কেন না, সকল বস্তুতেই অপর দুই গুণের সঙ্গে রজোগুণ ন্যূনাধিকপরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। আধুনিক বিবৃত্তিবাদ এবং পুরাতন সাংখ্যের মধ্যে যদি-চ আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তথাপি প্রকৃতির ক্রমবিকাশ-পরায়ণতা এবং রজোগুণের (অর্থাৎ দুঃখ এবং কর্ম্মচেষ্টার) প্রবৃত্তিশীলতা, এই দুইটি গোড়ার ব্যাপারের প্রধানতা-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কতকটা যেন মিল আছে বলিয়া মনে হয়; এটা অন্তত বেশ্ বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের পুরাতন আচার্য্যেরা যেখান হইতে যেরূপ করিয়া প্রকৃতির ক্রমবিকাশের এবং রজোগুণের প্রবৃত্তিশীলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন, আধুনিক বিবৃত্তিবাদীরা ঐ দুই বিষয়ের সন্ধান সেইখান হইতেই তেমনি করিয়া পাইয়াছেন, তা বই, উনবিংশশতাব্দীর বিদ্যাবুদ্ধির নিকট হইতে ধার করিয়া পান নাই। এ কথা যদি সত্য হইত যে, নিউটন্-ডার্বিন্ প্রভৃতি মৌলিকশ্রেণীর আবিষ্কর্তারা বিদ্যার বাঁধা-রাস্তা দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব গম্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এক্ষণকার বিদ্যালয়ের অধ্যেতারা যে পথ অবলম্বন করিয়া কেহ বা বি.-এ. হ'ন, কেহ বা বিদ্যাবাগীশ হ'ন, কেহ বা বি.-এ.-বিদ্যাবাগীশ হ'ন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে কেহ বা নিউটন্, কেহ বা ডার্বিন্, কেহ বা শেক্স্পীয়র্ হইতে পারিতেন; তাহা তাঁহারা না হইতেছেন কেন? কে তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে? দূরে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে আমি সাক্ষী মান্য করিতেছি। তিনি কি তাঁহার অপূর্ব্ব নূতন সিদ্ধান্তটি উনবিংশশতাব্দীর বিদ্যার নিকট ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছেন? কখনই না। এটা অবশ্য সত্য যে, উনবিংশশতাব্দীর যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁহার অন্তরের নিগূঢ়কথাটির যাথার্থ্য পণ্ডিতগণকে যেমন করিয়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি তাহা রীতিমত verify করিয়াছেন। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লাপ্লাসের নাভসিক সিদ্ধান্ত (Nebular Theory) আকাশের অপরিসীম জ্যোতির্জগৎকে যোগসূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়াছে; আমাদের চক্ষের সাম্‌নে ডার্বিনের বৈকারিক সিদ্ধান্ত (Theory of Evolution) পৃথিবীর জীবজগৎকে যোগসূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়াছে; গাঁথিতে কেবল বাকি লাপ্লাসের নাভসিক সিদ্ধান্ত এবং ডার্বিনের বৈকারিক সিদ্ধান্ত উভয়কে ঐকতানিক যোগসূত্রে

আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বসুমহাশয় কি সেই সুমহৎ কার্য্যের জন্য ভারতীমাতার প্রিয় ভারত-ভূমিতে করুণাময় বিধাতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন? এক সময়ে ভারতীমাতা আমাদের দেশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য এবং মহাপুরুষগণকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন কত-না যত্নে? ভারতের ক্রন্দনধ্বনিতে সেই সকল পুরাতন কথা কি তাঁহার স্মরণে জাগিয়া উঠিয়াছে? এতদিনের পর কি তাঁহার আসন টলিয়াছে—তাই তিনি এত দেশ থাকিতে পূর্ব্বের এক কোণে কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিলেন? এ প্রশ্ন আমি এত পূর্ব্বাহ্নে সভার মাঝখানে খাটাইতে সাহসী নহি। বাক্যে কাজ নাই—আশার অঙ্কুর যাহা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে, তাহা ঈশ্বরেচ্ছায় কালের-ভালোয় বাঁচিয়া-বর্ত্তিয়া থাকিয়া দিবালোকে সমুত্থান করুক্—তাহা হইলেই বাঁচি।

এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা বলিলাম, তাহাতে অর্জ্জুনসারথি যেমন বিরাটপুত্র উত্তর-রথীকে সাহায্যপ্রদান করিয়াছিলেন, জ্ঞান তেমনি কিরূপে বিত্তাকে গুপ্তভাবে সাহায্য-প্রদান করে, তাহার কতকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে জ্ঞান তাহার নিজাধিকারে কিরূপ প্রণালীতে পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্।

আগামী বারে সমাপ্য।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

গলকুণ্ডা।

হৈদরাবাদের কোন-এক উপনগর যেখানে শেষ হইয়াছে—সেই বাঁকের মুখে একটা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে :—"গলকুণ্ডার পথ"। ভগ্নাবশেষের পথ, নিস্তব্ধতার পথ ;—এরূপ লিখিলেও ক্ষতি ছিল না।

ঘোড়াদের দুল্‌কি-চালে পথে খুব ধূলা উড়িয়াছে। এই বিজন পথের ধারে ধারে এখনো দেখা যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র "পোড়ো" মস্‌জিদ, আর কতকগুলি সরু-সরু ক্ষুদ্র ধবল-মন্দির—যাহা একটু ভগ্নদশাপন্ন হইলেও অতীব শোভন ও সুষমাবিশিষ্ট। তাহার পর আর কিছুই নাই ;—কেবল পাংশুবর্ণ ভাসমান বিস্তীর্ণ ময়দান, আর কতকগুলা পাষাণস্তূপ ছোট-ছোট পাহাড়ের আকারে, ঢিবির আকারে, "পিরামিডের" আকারে, ইতস্তত বিকীর্ণ এবং দেখিতে এরূপ অদ্ভুত যে, উহাদিগকে এই পৃথিবীর কোন পদার্থ বলিয়া মনেই হয় না।

গাড়িতে একঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, একটা জনশূন্য আ-তল-তক হ্রদের ধারে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই

পশ্চাদ্ভাগে প্রাচীরবৎ একটা বৃহৎ মৃত-নগরের দিগন্তব্যাপী উপচ্ছায়া। অত্রত্য ময়দানভূমির ন্যায় ইহাও ভীষণ ধূসরবর্ণ। ইহাই সেই গলকুণ্ডা, যাহা তিন শতাব্দী ধরিয়া এশিয়ার একটি পরমাশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য-পদার্থ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল।

কে না জানে, ভগ্নাবশেষের অবস্থাতেই—নগরপ্রাসাদাদি মানুষের সমস্ত কীর্ত্তিমন্দির-গুলিই আসল অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই যে মৃতনগরের উপচ্ছায়াটি দেখা যাইতেছে, ইহা বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার নগর প্রথম-প্রাকারটি অন্যূন ৩০ফীট্ উচ্চ। বুরুজ, অগ্নিক্ষেপের জন্য রন্ধ্রময় স্থান, প্রস্তরময় আবৃত প্রহরিস্থান—সমস্তই উহাতে বিদ্যমান; এবং উহা আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিতে-চলিতে সুদূর মরুভূমিতে গিয়া শেষ হইয়াছে। এমনই ত প্রাকারটি ভীমদর্শন—তাহার উপর আবার একটা বিরাট্‌কায় প্রকাণ্ড দুর্গনগর সমুত্থিত;—আসলে পর্ব্বত, কিন্তু মানুষ ইহাকে এইরূপ কাজে লাগাইয়াছে। ইহা সেই শ্রেণীর পর্ব্বত—সেই পাষাণস্তূপ, যাহা অত্রত্য ভূভাগের একটা বিস্ময়জনক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। পূর্ব্বতন রাজাদিগের ও জনসাধারণের চিত্তে বিরাট্ পদার্থের জন্য—অলৌকিক পদার্থের জন্য যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিলারাশির মধ্যে অসংখ্য প্রাচীর পরম্পরকে বেষ্টন করিয়া আছে—পরম্পরের উপর চাপিয়া আছে;—উহাদের দন্তর রেখাবলী পরস্পরের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। যে সকল গণ্ডশৈল দুঃসাহসীর ন্যায় অতিমাত্র ঝুঁকিয়া আছে, তাহাদের ঠিক্ ধারেই বুরুজসকল সম্মুখে প্রসারিত;—নীচে অতলস্পর্শ খাত। উচ্চতার বিভিন্ন ধাপে,—কত মস্‌জিদ, কত জটিল-নক্‌সার খিলান, কত প্রকাণ্ড পোস্তার গাঁথুনি। খেয়ালের ঝোঁকেই হউক্, কিংবা কোন উপধর্ম্মের খাতিরেই হউক্,—সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপর একটা গণ্ডশৈল এরূপভাবে স্থাপিত যে, মনে হয় যেন একটা গোলাকার পণ্ড চূড়ার উপরে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে।

এই মৃতনগরের প্রবেশপথে ধাতু ও পাথরের গোলাগুলি স্তূপাকারে সজ্জিত এবং পুরাকালীন সমস্ত যুদ্ধ-আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে।—ইহাদেরি পাশাপাশি "পুনরাবৃত্তি-কারী" আধুনিক বন্দুকসকল পুঞ্জীকৃত। নিজামের সিপাইশাস্ত্রীরা পাহারা দিতেছে। প্রবেশপথে উহাদিগকে প্রবেশানুমতিপত্র দেখাইতে হয়। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষের মধ্যে ইচ্ছা করিলেই প্রবেশ করা যায় না;—এখনও উহা দুষ্প্রবেশ্য দুর্গরূপে বিদ্যমান। শোনা যায়, নিজাম তাঁহার গুপ্তনিধি এইখানেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

এই গলকুণ্ডার দ্বারগুলি অতীব ভীষণ;—বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন উহা উদ্ঘাটিত হয় না। প্রাকারভিত্তির গভীরদেশে দ্বারের ভাঁজ্‌ওয়ালা জোড়া-কপাট্‌গুলি দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন, ধাতুপত্রে মণ্ডিত এবং লম্বা-লম্বা ছোরার মত তীক্ষ্ণধার লৌহকণ্টকে সমাকীর্ণ। পূর্ব্বকালে হস্তিগণ আত্মবিনোদনার্থ নগরের মধ্যে দলে-দলে প্রবেশপূর্ব্বক দন্তের দ্বারা অনেক কাঠের কাজ নষ্ট

করিয়া বিস্তর ক্ষতি করিত। উহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্যই দ্বারের কপাট গুলি এইরূপ ভীষণ বর্ম্মে আবৃত। আমার ক্ষুদ্র যানবাহন যখন এই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল (যদিও কোচ্ম্যানের মাথার জরির পাগ্‌ড়ি ছিল এবং সহিস একটা লম্বা চামর লইয়া ঘোড়ার গাত্র হইতে মাছি তাড়াইতেছিল), তখনই আমাদের য়ুরোপীয় ক্ষুদ্রতা ও দীনহীনতা সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল!...

এই-সব স্থূলকায় প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই যে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, সেই রাস্তাটিতেই যা-কিছু লোকের বসতি। কতকগুলি নিঃস্ব লোক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাসা করিয়া আছে এবং সেইখানে উহারা দুর্গরক্ষী সৈনিকদিগের ব্যবহারার্থ দুইচারিখানি সামান্য দোকান খুলিয়াছে।

তা ছাড়া, এই বিশাল ঘেরের মধ্যে আর সমস্তই শূন্য ও নিস্তব্ধ। গলকণ্ডা এখন শুধু ভস্মাচ্ছন্ন একটা শ্মশানক্ষেত্র,—স্বস্থানচ্যুত গণ্ডশৈলে সমাকীর্ণ। প্রকাণ্ডকায় স্থূল পশুর পৃষ্ঠদেশের ন্যায় সেই সব পাষাণস্তূপ—যাহা মানবগঠিত পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর ঘাতপ্রতিরোধী—ইতস্তত উত্থিত হইয়াছে; সেই সব গোলাকার মসৃণ গণ্ডশৈল,—যাহা সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত—পর্ব্বতের ন্যায় ইতস্তত মাথা তুলিয়া আছে। *

এই দুর্গনগরের দ্বারগুলিও নিম্নস্থ প্রাকারদ্বারের ন্যায় ভীমদর্শন ও লৌহ-কণ্টকে আচ্ছাদিত। দুর্গাদি অতিক্রম করিয়া, গণ্ডশৈলসমূহ অতিক্রম করিয়া, কখন খোলা-পথে,—কখন বা অন্ধকার-সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সমস্তই এরূপ বিশাল যে, দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। যে ভারতে প্রকাণ্ড পদার্থ দেখিয়া আর বিস্ময় উৎপন্ন হয় না, সেই ভারতের পক্ষেও এ সমস্ত প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। দন্তুর প্রাকারাবলী, নৈসর্গিক গণ্ডশৈলসমূহ পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি উত্থিত হইয়া সমস্ত স্থানটিকে দুর্গম দুষ্প্রবেশ্য করিয়া তুলিয়াছে। অবরোধের সময়ে, জলরক্ষণেরই জন্য কতকগুলি গভীর-নিখাত চৌবাচ্ছা রহিয়াছে। এই গভীর গহ্বরগুলি শৈলগাত্র খনন করিয়া নির্ম্মিত। তা ছাড়া, কতকগুলা কালো-কালো গর্ত্ত রহিয়াছে—যাহা সুরঙ্গপথের মুখ। এই সুরঙ্গটি পর্ব্বতের হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যখন শত্রুর আক্রমণে হতাশ হইয়া পলায়ন ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না, তখন এই সুরঙ্গটিই পলায়নের প্রকৃষ্ট পথ। শেষদিন পর্য্যন্ত যাহাতে ভজনার ব্যাঘাত না হয়, এইজন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রত্যেক শিখরে একএকটি মসজিদ রহিয়াছে। যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কল্পনাচক্ষে বাস্তববৎ প্রত্যক্ষ

* নিজামরাজ্যের এই সব গণ্ডশৈলসম্বন্ধে একটা পৌরাণিকী কথা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সৃষ্টি শেষ হইয়া গেলে ঈশ্বর যখন দেখিলেন, কতকগুলা অতিরিক্ত উপকরণ উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তখন তিনি এই সমস্ত লইয়া, হাতে গোলা পাকাইয়া, সেই সব গোলকগুলি পৃথিবীর উপর—এই প্রদেশে—ইতস্তত নিক্ষেপ করিলেন।

করিয়াই যেন সমস্ত আয়োজন পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত।

আধুনিক কামানসৃষ্টির তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গল্কণ্ডার প্রবলপরাক্রান্ত সুল্‌তানগণ এই দুর্গ হইতে কিরূপে দূরীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন।

যতই উচ্চে উঠা যায়, ততই মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ,—ততই যেন চতুর্দ্দিকস্থ মরুদৃশ্যের বিষাদময় মণ্ডলপরিধিটি বিস্তৃত হইতে থাকে। শিখরস্থ ইমারৎগুলি উচ্চতা-অনুসারে একদিকে যেমন অধিকতর ভীমদর্শন, তেমনি আবার ভগ্নদশাপন্ন। উহারা এতটা ঝুঁকিয়া আছে যে, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়;—মনে হয় যেন নীচে পড়িবার জন্য উন্মুখ। কত ভাঙা খিলান;—তাহাতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ফাট্ ধরিয়াছে। কতকগুলি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য অথবা নির্ম্মাণকাল কিছুই নির্ণয় করা যায় না। ইস্‌লামের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে কতকগুলা দেবমূর্ত্তি—বানরমুণ্ডধারী কতকগুলা হনুমান্,—বাদুড়দিগের সহিত গুহাগহ্বরের মধ্যে একত্র বাস করিতেছে। ছোট-ছোট ধূপবর্ত্তিকার ধূমগন্ধে স্থানটি আমোদিত। রহস্যময় ভক্তগণ এখনও বোধ হয় সময়ে-সময়ে এই ধূপবর্ত্তিকাগুলি এখানে গোপনে লইয়া আইসে।

সর্ব্বোচ্চ-শিখরে, শেষ ছাদটির উপর একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে এবং একটি চবুক (Kiosk)*—যেখান হইতে পূর্ব্বতন সুল্‌তানেরা সমস্ত দেশ পরিবীক্ষণ এবং দিগন্ত-নিঃসৃত শত্রুবাহিনীর আগমন নিরীক্ষণ করিতেন। মাঠ-ময়দান উদ্যান-উপবন প্রভৃতি যে সমস্ত দৃশ্য এখান হইতে দেখা যায়, সমস্তই তখনকার কালে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ এই সমস্ত ক্ষেত্র নির্জীব ও প্রাণশূন্য।

দেশের হাওয়া বদ্‌লাইয়াছে। আর এখন বৃষ্টি হয় না। বেশ মনে হয়, অল্পবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অবনতি হইতেছে—ভারত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত গণ্ডশৈল ও প্রাকারাবলীর পরপারে অবস্থিত দুর্গনগরটি, মহানিস্তব্ধতার মধ্যে,—ভূতল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নগরের বহিঃপ্রাচীর,—নিজামের সংরক্ষিত সেই দন্তর প্রাচীরটি, প্রাচীন গল্কণ্ডার—সেই পরমাশ্চর্য্য হীরকখনি গল্কণ্ডার গঠন-রেখাভঙ্গী অঙ্কিত করিবার জন্যই যেন আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে লাভ কি? বাহিরের বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্রেরই অনুরূপ এই যে মরুময় কটিবন্ধটি—ইহাকে বিশেষ করিয়া প্রাচীরে ঘিরিয়া রাখায় কি ফল? এখানেও সেই একই ধূসর মরুভূমি—সেই একই মসৃণ গণ্ডশৈলপুঞ্জ—যাহা দেখিয়া মনে হয়, যেন ভস্মরাশির উপর কতকগুলা বৃহৎকায় পশু দলে-দলে বসিয়া আছে। সুদূর প্রান্তে হৈদরাবাদ দীর্ঘ শাদা-রেখার ন্যায় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; এবং ময়দান-ভূমির সীমান্তদেশে এই সব গণ্ডশৈল—ছিন্নাভ পর্ব্বতের আকারে, বিচিত্রভঙ্গী

* চবুক—চতুস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। বোধ হয় এই ফার্সি শব্দ (Kiosk) "চবুক"শব্দেরই অপভ্রংশ। Kiosk—garden summer-house অর্থাৎ "হাওয়া-খানা"।—অনুবাদক।

দুর্গের আকারে ইতস্তত পুঞ্জীকৃত হইয়া ধ্বংসনগরের বিভ্রমটিকে যেন আরো দীর্ঘীকৃত করিয়া সুদূর অসীমে প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু এই মৃতনগরের প্রাচীর ছাড়াইয়া অদূরে কতকগুলি বড়-বড় গম্বুজ রহিয়াছে, যাহা সুধালেপের দ্বারা সযত্নে ধবলীকৃত এবং যাহাতে ভগ্নাবশেষের ভাব কিছুমাত্র নাই। ছোট-ছোট বনের মধ্য হইতে এই গম্বুজগুলি সমুত্থিত। এই সব বনের উদ্ভিজ্জ এরূপ সরস ও তাজা যে, এই তাপদগ্ধ শুষ্কভূমিতে কিরূপে উৎপন্ন হইল, ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এগুলি গলকণ্ডার প্রাচীন রাজাদিগের সমাধিমন্দির। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রতি ভারতবাসীর যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি, তাহারি প্রভাবে এই সকল সমাধিমন্দির অক্ষত রহিয়াছে। আবার সম্প্রতি উহার চারিধারে সমাধি-উদ্যান স্থাপিত হইয়াছে।

এই পরীরাজ্যের অনেক সুলতান সুলতানাই এই সব গম্বুজতলে চিরনিদ্রায় মগ্ন। কেবল উঁহাদের মধ্যে একজন এই নীরব সঙ্গীদিগের সহবাস হইতে বঞ্চিত; ইনি গলকণ্ডার শেষ সুলতান। ইনি পূর্ব্ব হইতেই স্বকীয় পারত্রিক নিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়ী ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার সমাধিমন্দির হইতেও তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিলেন। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া প্রবাসেই ইহলীলা সংবরণ করেন।

এই চিরবিশ্রামের স্থানগুলি অতীব সুন্দর। আমাদের দেশের ন্যায় এই প্রাচ্য সমাধিক্ষেত্রেও সেই "সাইপ্রেস্"-ঝাউগাছগুলি দেখিতে পাওয়া যায়;—কেবল ভারতের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে একটু ম্লানপ্রভ হইয়াছে, এইমাত্র। ফ্রান্সের "লেকেনো" উদ্যানের ন্যায়, অত্রত্য উদ্যানেও, সরু-সরু বালির পথগুলি সোজা চলিয়াছে; উহার ধারে-ধারে আলবালভূমিতে সারি-সারি গোলাপগাছ। কতকগুলি রমণী ও কতকগুলি বালিকা এই কৃত্রিম মরু-উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। উহারা প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বেলা মাটির কলসীতে কোন কূপবিশেষের দুর্লভ জল আনিয়া এই সব গাছের তলায় ঢালিয়া দেয়; এবং এই সব অতলস্পর্শ গভীর কূপ হইতে পুরুষেরা অতি কষ্টে উহাদের জন্য জল উত্তোলন করে।

দূর হইতে মনে হয়, যেন এই সব সুধালিপ্ত গম্বুজগুলি জীবন-উত্তমে পূর্ণ। কিন্তু এই সব বিশাল মসজিদের অভ্যন্তরে একটিও চিত্র নাই, একটিও অলঙ্কার নাই। পূর্ব্বেকার সমস্ত বিলাসসামগ্রী এক্ষণে ধূসর জরাজীর্ণতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

তথাপি, এই সব শূন্যগর্ভ গম্বুজের নীচে, সমাধিস্থানের প্রত্যেক প্রস্তর-বেদিকার উপর, এখনও পুষ্পমাল্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর হইতে যে রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই রাজবংশীয় রাজাদিগের প্রতি শ্লাঘ্য ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পাপুষ্পাঞ্জলি।

তাপদগ্ধ মরুভূমির মধ্যে শুধু জলসেকের বলে এই যে উদ্যানগুলি সংরক্ষিত—ইহাদের কি-একটা অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি আছে; ইহাতে হয় দেখিলে, সায়াহ্নে ফিরিবার

মন-একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এই উদ্যানে সাইপ্রেস্-ঝাউ প্রতিবেশী নীবনের সহিত একত্র বাস করিতেছে; এবং গোলাপ-আলবালের চারিধারে, আমাদের দেশে প্রজাপতিরা যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসে, এখানে সেইরূপ মনিয়া-চড়াই ফুলের উপর উড়িয়া-উড়িয়া বসিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উৎসব।*

সংসারে প্রতিদিন যাহা পাই, তাহা ভালমন্দে ক্ষণিকে-নিত্যে স্বার্থে-পরমার্থে মিশ্রিত-জড়িত খণ্ডিত পদার্থ। তাহা আমাদের সম্মুখে আসে এবং যায়, গড়িয়া উঠে এবং ভাঙিয়া পড়ে, এক হইতে যায় এবং আর হইয়া উঠে। আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না—কখনো তাহাকে মায়া বলিয়া ধিক্কার দিই, কখনো তাহাকে পরমপদার্থ বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরি। বস্তুত নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে কখনো স্থিরসত্যের দিকে দৃষ্টিরক্ষা করা যায় না।

তাই বৎসরে একএকদিন বিষয়ব্যাপার হইতে মনকে বাহিরে আনিয়া সমস্ত বিষয়ের কেন্দ্রগত সত্যের প্রতি লক্ষ্যকে নিবদ্ধ করিতে হয়। যে সত্যের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার বিলয়, যেখানে সমস্ত ভালমন্দের মূল তাৎপর্য্য, যে সত্য "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" অনেকের মধ্যে এক স্বরূপে বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন, তাঁহাকেই উপলব্ধি করিবার দিন উৎসবের দিন। সেই পরমসত্যই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আজ তাঁহাকে এই আবর্ত্তমান বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে একবার স্থির হইয়া দেখ। বাহিরে এই সংখ্যাহীন অণুপরমাণুর অশ্রান্ত স্পন্দনের মধ্যে দেখ, অন্তহীন গ্রহনক্ষত্রের নিরন্তর ঘূর্ণনের মাঝখানে দেখ, পক্ষ-মাস-ঋতু-সংবৎসরের ফলপুষ্পশস্যপ্রবাহী গতায়াতের মধ্যে দেখ, মানবের নিয়তপরিবর্ত্তিত জন্মমৃত্যু-সম্পদ্‌বিপদ্‌-উত্থানপতনের মধ্যে দেখ। এই যে পৃথিবী জুড়িয়া মানবের ইতিহাস মথিত মহাসমুদ্রের ন্যায় কোথাও বা রক্তে আবিল, কোথাও বা কল্লোলে ফেনিল, কোথাও বা বিঘ্নশৈলে প্রতিহত, কোথাও বা অবাধবেগে প্রবাহিত হইয়া লক্ষকোটি তরঙ্গে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, ইহার গভীরতম মর্ম্মস্থানে অচলপ্রতিষ্ঠ স্তব্ধতায় বিরাজমান যে সত্যপুরুষ ক্ষুব্ধ প্রয়াসকে শান্ত সফলতার দিকে, উদ্বেল উন্মত্ততাকে সুমহৎ পরিণামের দিকে অব্যর্থনিয়মে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে আজ একবার দেখ। তোমার নিত্যচঞ্চল অন্তঃকরণের মাঝখানে

* ১৩১২ সালের ৭ই পৌষের উৎসবে বোলপুর শান্তিনিকেতনে পঠিত।

আজ একবার গূঢ়ভাবে অবগাহন কর—সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, উৎসাহ-অবসাদ কেমনি উঠিতেছে-পড়িতেছে, প্রবৃত্তিসকল নানা লক্ষ্যের দিকে নানা আকর্ষণে কখনো উন্মত্ত, কখনো নিবৃত্ত হইতেছে; কখনো বা কোথা হইতে বায়ুকোণে এক অভাবনীয় ঝঞ্ঝা উঠিয়া আকস্মিক উৎপাতে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে, কখনো বা মৃত্যুর ন্যায় এক আকস্মিক সুপ্তি সমস্ত চেতনাকে অভিভূত-আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে—এই আমাদের চিত্তরাজ্যের সমস্ত অচিন্তনীয়তার মধ্যে, ভাবরাজ্যের সমস্ত অভাবনীয়তার মাঝখানে তাঁহাকে দেখ, যাঁহাকে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে"—মধ্যস্থলে সমাসীন যে মহান্ পুরুষকে সমস্ত দেবগণ উপাসনা করিতেছেন।

জীবনের মধ্যে মধ্যে বিশেষ দিনের, বিশেষ অবকাশের ইহাই প্রয়োজন। সেদিন খণ্ডের দিক্ হইতে অখণ্ডে আসিবার উৎসব। নিজের দিক্ হইতে বিশ্বের দিকে আসিবার উৎসব। যে মূলে বিচিত্রের ঐক্য, যে সত্যে সকলের যোগ, যে এক আনন্দে সমস্ত জ্যোতির্ময় নিখিলের সহিত আমাদের অচ্ছেদ্য সম্মিলন, সেই মূলে, সেই সত্যে, সেই আনন্দে চিত্তকে আবাহন করিবার উৎসব।

যে পরম সত্যের কথা বলিতেছি, যে সত্যে তৃণলতা হইতে জ্যোতিষ্কলোক আসিয়া মিলিয়াছে, সেই সত্যকে আমরা যখন উৎসবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করি, তখন সেই উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিষকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ডপদার্থ, প্রত্যেক খণ্ডঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে—তখনই প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকি, রাগিণীর সন্ধান পাই না—প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন শব্দ আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, অর্থের সমগ্রতা অন্তরালেই থাকে;—ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখন আমরা দেখিতে পাই—

> নিখিলে তব কি মহোৎসব! বন্দন করে বিশ্ব
> শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভর শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা

সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণ-করতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে-বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি—আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্টপরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর, ধনিদরিদ্র, পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য—এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই

অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? "আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি"—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ—সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম—আনন্দ। আমরা ত লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি—অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদবেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদপর্য্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে—তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরো পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ, তাহার প্রেম উদ্বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্ম প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই—কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে, তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই যে যাহা কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, সৌন্দর্য্যে। জগৎপ্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরণা আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকি-

তেছে, সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। প্রয়োজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া, ফুল ফুটিয়া, পাতা গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া-উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। সূর্য্যোদয়ে-সূর্য্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্ত্তমান বিচিত্র রঙের পাগ্‌লামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। প্রভাতে পাখীদের শত শত কণ্ঠ হইতে উচ্ছ্বসিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারিদিক্‌ হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ,—সৌন্দর্য্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য্য। এইজন্য উৎসবদিনে, আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি—প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্য্যের দিন।

আজ সৌন্দর্য্যের দিন। সৌন্দর্য্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্যপ্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহুল্যপ্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্যপ্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কি, আর কাহারই বা কি। কিন্তু একদিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য্য, আর একদিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্য্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সঙ্গীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্য্যের দ্বারা, সৌন্দর্য্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, সৌন্দর্য্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধি-দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এইদিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম

তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন— ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মত ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরিক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সঙ্গীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উদ্বেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়! প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্য্যলাভ করিবে কি করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্ব্বাসিত, হঠাৎ একদিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব। হে বিশ্বব্রহ্মপ্রাঙ্গণের উৎসবদেবতা! আমি কে? আজ উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কি আছে? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনা-বাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজো পৌঁছিয়াছে? তাহার বাধা কি একটি? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সাম্লাইতে পারিল? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই তাহাকে আহ্বান কর। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান কর। ফিরাও, —ফিরাও,—তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও! দুর্ব্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা কর! বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্য্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিরজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেল। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্র-নতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই

তুমি অপসারিত করিয়া দাও—কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্ব্বনিম্নস্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসবসভার মহাসঙ্গীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহঙ্কার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্ম্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্ব্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্য্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য্য আলোক দেয়, কিন্তু তোমার স্বহস্তলিখিত আলোকলিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে তোমার উদার বায়ু নিশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার কর—তোমার উৎসবপ্রাঙ্গণের ধূলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না মানুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে, তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান—আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।

একটি কুন্দের প্রতি।

অয়ি কুন্দ! আজিকে এ হিমানীর স্তব্ধ সন্ধ্যাক্ষণে
একমাত্র তব মূর্ত্তি হেরি মম গৃহের প্রাঙ্গণে
ভাবিতেছি বসি' বসি'—সমস্ত সুগন্ধিপুষ্পহীন
শীতবাতে একাকী ফুটেছ কেন? কোন্‌চিন্তালীন
হ'য়ে আছ হরিৎপল্লববক্ষে খুলিয়া তোমার
সপ্তদলে অবরুদ্ধ সুরভি হৃদয় সুকুমার?

বসন্ত-বল্লভ-হারা যামিনীর শশিমুখ হ'তে
ঝরি' পড়ে অশ্রুজ্যোৎস্না অন্তরীক্ষ সিক্ত সে আলোতে
তারি এক বিন্দু বুঝি সুকঠিন মর্ত্ত্যের পরশে
বিচূর্ণ হইয়া আজি কুন্দসম মুরতি বিকশে?

নথ নীলাকাশবক্ষে দীপ্ত শুভ্র তারকার প্রায়
অশ্রুতুষারের মূর্ত্তি ধ'রেছ কি কুন্দ হেথায় ?

কিম্বা তুমি হে শোভনে ! কান্তহীনা যামিনীর প্রাণ
ভয়ে ভয়ে ফুটি' আছ—পাছে কোথা পাও অপমান ?
এ জগতে নাথহারা তাহার আশ্রয় নাহি হায় !
মধুর বেদনাটুকু তাই ও কি প্রকাশিতে চায় !
রিক্ত ভূষা বিধবার মৃদু কুন্দ-সুরভি পরাণ
অনুভবে পাই আজি ; ভরি' উঠে মোর হৃদয়খান।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দুঃখমূর্ত্তি।

দুখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে !
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে !
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামি,
তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে' দাও না দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।

নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক্ জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক্, তব
কঠিন বাহুবাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে'
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে

চাব না কিছু, কব না কথা,
চাহিয়া রব বদনে হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক্ জল নয়নে হে!

তূলার চাষ

কাপাসসম্বন্ধে কয়েকটি স্থূলকথা।

(১) কাপাস উষ্ণপ্রধান দেশেরই ফসল। মার্কিণ, ভারতবর্ষ ও মিশরেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তূলা উৎপন্ন হয়।

(২) কাপাসের জন্য ডাঙা বা উচ্চ জমীর প্রয়োজন। জমীতে জল বাধিলে কাপাস হয় না।

(৩) অন্যান্য ফসলের যেমন একএকটি ক্ষেত্র একসঙ্গে পাকে, কাপাস সেরূপ নহে। কাপাসের একই গাছে একই সময়ে ফলও ফাটিতে থাকে, ফুলও ফুটিতে থাকে। ফল ফাটিলে ভিতর হইতে তূলা বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। যেমন ক্রমশ ফল ফাটে, তেমনি ক্রমশ তূলা সংগ্রহ করিতে হয়।

(৪) একএকটি কাপাসের ক্ষেত্রের তূলা ৩।৪বারে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাতে প্রায় ১।০মাস-২মাস লাগে।

(৫) তূলার গাছকেও কাপাস বলে, আর বীজসংযুক্ত তূলাকেও বাজারে কাপাস বলে।

(৬) কাপাসের পিণ্ডি হইতে পাঁচ-আনা ভাগ তূলা। বাকী এগার-আনা কিংবা বার-আনা বীজ।

(৭) কাপাসের বীজ পেষণ করিলে উত্তম তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈলদ্বারা রন্ধন চলিতে পারে এবং সাবাং, গ্লিসিরীন্, কৃত্রিম মাখম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সাধারণত উহা অলিভ্‌তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

(৮) একমণ কাপাসের বীজ হইতে নিম্নলিখিত সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

খোসা	—	।১
তৈল	—	/৬
খৈল	—	।৩

(৯) কাপাসের খৈল গরুর অতি উত্তম খাদ্য। ইহা আবার জমীর উৎকৃষ্ট সার। রেড়ীর খৈলের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

(১০) আমাদের দেশে কাপাসবীজ হইতে তৈল বাহির করিবার কলকারখানা নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতগবর্মেণ্ট অনুসন্ধান করিতেছিলেন যে, মার্কিনী কলকারখানা এদেশীয় বীজপেষণের উপযুক্ত কি না এবং এদেশীয় কাপাসের বীজে

তৈলের পরিমাণই বা কি? এই দুই প্রশ্নেরই অনুকূল উত্তর পাওয়া গিয়াছিল।

(১১) কাপাসের বীজ হইতে তৈল বাহির না করিয়া শুধু বীজগুলি ভাঙিয়া বা ভিজাইয়াও গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়। বোম্বাই-অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশে কৃষকেরা এইরূপেই উহার ব্যবহার করে। ঢেঁকীতে মোটামুটি কুটিয়া লইয়াও উহা জমীতে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রায় সকলপ্রকার ফলমূলফসলের জন্যই উহা উপকারী। আমেরিকায় কাপাসের ক্ষেত্রেই সারের জন্য ও কাপাসের বীজ এবং কাপাসের খৈল ব্যবহৃত হয়। আখ, আলু, কপী প্রভৃতির জন্য একরে ১৫৴৹ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধান, গম প্রভৃতির জন্য ৫৸৹ কিংবা ৭৴৹ যথেষ্ট। কাপাস-বীজের দাম মণকরা ১৲ হইতে ১।৹ মাত্র। এক একর ৮৹হাতী বিঘায় প্রায় তিনবিঘা।

(১২) কাপাসবীজের খোসাই অর্দ্ধেক। এই খোসা অতি অপদার্থ সামগ্রী। সুতরাং একমণ খৈলে যে কাজ হয়, খোসাসমেত বীজ এক মণে সে-পরিমাণ উপকার হয় না। সার-হিসাবে ১৴৹ খৈল ও ২।৹ মণ বীজ প্রায় সমান ফলপ্রদ।

(১৩) কাপাসের তুলার সূত্রগুলি (fibre) দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, শক্ত অথচ কোমল, এবং চিক্কণ হওয়া আবশ্যক। ভাল তুলা ২ইঞ্চি লম্বা হয়। যাহার সূত্র ⅝ ইঞ্চিরও কম, তাহা মিলে ব্যবহার হয় না। ছোট এবং লম্বা, শক্ত এবং দুর্ব্বল, কোমল এবং কর্কশ প্রভৃতি বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট তুলা একত্রে মিশান করা উচিত নহে।

(১৪) একএকগাছি সূত্র একএকটি cell। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে একএকটি সূত্রকে একএকটি চেপটা নলের মত দেখায়। যে তুলা যত উৎকৃষ্ট, তাহার নলে তত অধিক পাক (twist) লক্ষিত হয়।

(১৫) ভারতের তুলার প্রধান দোষ—ইহার সূত্র ছোট ও মোটা। বাজারে যে তুলা প্রেরিত হয়, তাহাতে অত্যন্ত অধিক আবর্জ্জনা থাকে। এই আবর্জ্জনার মধ্যে কাদা, মাটী, কাপাসের বীজ ও কাপাসের পাতাই প্রধান।

(১৬) মিশরে তুলা হয় নীলনদের বদ্বীপে (Delta)। মার্কিণে তুলা হয় যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-অঞ্চলে—উহার মধ্যে টেক্সাস্-প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাপাসের চাষ।

(১৭) মিশর ও মার্কিণে চৈত্রবৈশাখমাসে তুলার বীজ বপন করে এবং ভাদ্রমাসে ফুল হইতে আরম্ভ হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে ফল পাকিয়া ফাটিতে থাকে ও তুলাসংগ্রহ হয়। তাহার পরে গাছও শীতে মরিয়া যায় ও মরা গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। মিশরে বৃষ্টিই নাই বলিলে হয়—নীলনদের খাল হইতে ষ্টীম্‌পম্প্ দিয়া জল উঠাইয়া কাপাসের ক্ষেতে জল দিতে হয়। নদীতে ভাদ্রমাসে বন্যা আসে। বন্যা আসিলে আর জল পম্প্ করিতে হয় না—বাঁধ কাটিলেই ক্ষেতে জল আসে। মার্কিণে জল দিতে হয় না, বৃষ্টির উপর কাপাসের নির্ভর। বৈশাখ হইতে ভাদ্র-আশ্বিন পর্য্যন্ত মাসে গড়ে ৩ইঞ্চি বৃষ্টি হয়।

(১৮) অতিবৃষ্টি কাপাসের পক্ষে অনিষ্টকর, বিশেষ বপনের পরেই বৃষ্টি বেশী

হইলে বীজ পচিয়া যায়, এবং জমীতে ঘাস বাধিলে নিড়াইবার সুবিধা হয় না। ইহাতে ছোট ছোট গাছগুলি আর বাড়ে না। আবার তুলা ফুটিবার সময়ে বৃষ্টি একেবারে না হওয়ারই দরকার। বৃষ্টি হইলে তুলা দাগী হয় ও বাজারে দাম কম হয়।

(১৯) এখন বাঙ্গালাদেশে তুলা নাই বলিলে চলে, কিন্তু পূর্ব্বে অধিকাংশ স্থানেই তুলা হইত। সকল স্থানের তুলা ভাল ছিল না—কিন্তু ঢাকার ফৌটিকাপাস পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রদত্ত হইল।

(২০) বঙ্গদেশে যে কাপাস হইত, তাহাতেই সম্ভবত বাঙ্গালীর বস্ত্রের অভাব পূর্ণ হইত। কিন্তু যখন ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশীয় সদাগরেরা বঙ্গদেশ হইতে বস্ত্র ইউরোপে চালান দিতে লাগিলেন, তখন শুধু বাঙ্গলার কাপাসে কুলাইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ব্যবসায় বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তখন যে-পরিমাণ তুলার প্রয়োজন হইত, তাহার ৯ আনা মাত্র বঙ্গদেশজাত, আর বাকী চৌদ্দ আনা বোম্বাই, মান্দ্রাজী ও কানপুরী তুলা। ঐ সময়ে এক ঢাকা হইতেই বৎসরে ৫০লক্ষ টাকার মস্‌লিন্ ইউরোপে প্রেরিত হইত।

ভিন্নভিন্নজাতীয় কাপাস।

নিম্নলিখিত তালিকায় ভিন্নভিন্নদেশীয় কাপাসের গুণ এবং পরিমাণ হিসাবে যথাক্রমে স্থান নিরূপিত হইল:—

গুণানুসারে।	পরিমাণানুসারে।
(১) সি আইলাণ্ড	(১) মার্কিণী
(২) মিশরী	(২) ভারতীয়
(৩) ব্রাজীল এবং পেরু দেশীয়	(৩) মিশরী
(৪) মার্কিণী	(৪) ব্রাজীল এবং পেরু দেশীয়
(৫) ভারতীয়	(৫) সি আইলাণ্ড

সি-আইলাণ্ড কাপাসই পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয় কাপাসই সর্ব্বনিকৃষ্ট। মার্কিণের অন্তর্ব্বর্ত্তী দক্ষিণ-কেরোলীনা-প্রদেশের সন্নিহিত কয়েকটি দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম "সি আইলাণ্ড"। তাহাদেরই নামানুসারে সেথামকার কাপাস "সি-আইলাণ্ড"-কাপাস নামে ব্যবসাবাণিজ্যে পরিচিত হইয়াছে। এখন আটলান্টিকের উপকূলবর্ত্তী মার্কিণের কয়েকটি প্রদেশেও ইহার চাস হইতেছে। কিন্তু উহার আদিম উৎপত্তিস্থান ওএষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বার্ব্বাডোস্। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের নিকট ইহা বার্ব্বাডোস্-কাপাস (Gossypium Barbadense) নামেই পরিচিত। এই তুলার রং ঈষৎ হরিদ্রাভ বা "ক্রিম"। সমুদ্র হইতে দূরে এই তুলা হয় না।

গুণানুসারে মার্কিণী কাপাস ৪র্থস্থানীয়, কিন্তু পরিমাণানুসারে ইহা প্রথমস্থানীয়। মার্কিণেও "সি-আইলাণ্ড"-কাপাস উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু ব্যবসাজগতে মার্কিণী কাপাস' বলিলে সি আইলাণ্ড বুঝায় না—অর্লিয়ান্স, টেক্সাস্ ও আপ্‌লাণ্ড কাপাস বুঝায়। উদ্ভিদবিদ্ পণ্ডিতেরা উহাদের Gossypium Hirsutum বলেন। আমেরিকার উষ্ণ প্রদেশেই ইহাদের জন্মভূমি। উপরি-উক্ত তিনপ্রকারের মধ্যে অর্লিয়ান্সজাতীয় কাপাসই শ্রেষ্ঠ। মিসিসিপি ও লুসিয়ানা

প্রদেশে ইহার প্রধান আবাদ। ইহার তুলা পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ।

ভারতীয় কাপাসকে পণ্ডিতেরা ওষধিজাতীয় (Gossypium Herbacium) বলেন অর্থাৎ প্রতিবৎসরই উহা ফুলফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। এখন সি আইলাণ্ড ও মার্কিণী কাপাসও ওষধিজাতীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু মূলে ইহারা উভয়েই গাছকাপাস (perennial) ছিল।

নিম্নে প্রধান প্রধান ভারতীয় কাপাস ও তাহাদের উৎপত্তিস্থান প্রদত্ত হইল :—

হিঙ্গনঘাট (মধ্যপ্রদেশ)
উমরা (বোম্বাই, বেরার, হায়দ্রাবাদ)
ঢুলেরা (বোম্বাই)
ব্রোচ (ঐ)
ধড়ওয়াড় (ঐ)
কুমটা (ঐ)
বেঙ্গল (পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম,
অযোধ্যা, রাজপুতানা,
মধ্য-ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ)
আসাম (আসাম)

—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ইহাদের বীজবপন করিতে হয়।

পশ্চিমে (মান্দ্রাজ, হায়দ্রাবাদ)
কোকনদ (মান্দ্রাজ)
তিন্নিভেলী (ঐ)
কেইম্বাটুর বা সালেম (ঐ)

—আশ্বিনকার্ত্তিকমাসে ইহাদের বীজবপন করিতে হয়।

ভারতীয় কাপাসের ভিতর মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধা, নিমরজলার হিঙ্গনঘাট কাপাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিঙ্গনঘাটের নীচেই গুজরাটঅঞ্চলের ব্রোচদেশী কাপাস। আরও নানাজাতীয় কাপাস আছে, কিন্তু বেঙ্গল সর্ব্বনিকৃষ্ট। বেঙ্গল বলিতে শুধু বাঙলার কাপাস বুঝায় না—পঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানেরও কাপাস বুঝায়। বেঙ্গলের অতি সামান্যপরিমাণই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশজাত।

ব্রাজীল ও পেরুর কাপাস—গাছকাপাস (G. Peruvianum)। এই গাছ কয়েকবৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু ২য় ও ৩য় বৎসরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুলা প্রদান করে—তাহার পরে ফলন কমিয়া যায়। এই শ্রেণীর কাপাসের মধ্যে পার্ণাম উত্তম। ব্রাজীলের অন্তর্বর্ত্তী পার্ণামবুকো বন্দরের নাম হইতে উহার নাম হইয়াছে।

ভারতবর্ষে, সিংহলে, আরবদেশে, মিশরে এবং চীনদেশেও একপ্রকার গাছ-(G. Arboreum)-কাপাস আছে, যাহার ফুল লাল। এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার গাছকাপাসও আমাদের দেশে আছে। ব্রাজীলীয় পার্ণামকাপাসের গাছও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

মিশরে গালিনী বলিয়া একপ্রকার কাপাস আছে, তাহা সি আইলাণ্ডের বীজ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু আসল সি আইলাণ্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে ইহার ফলন প্রচুর। মিশরী কাপাস বলিলে এখন প্রধানত এই কাপাসই বুঝায়। আর একপ্রকার কাপাসের নাম মিশরী "ব্রাউন্" বা মিটাফিফী। ইহার তুলা কমলা বা পিঙ্গলবর্ণ। মিশরেই ইহার আদিমনিবাস। এতদ্ব্যতীত দুইপ্রকার মিশরী শ্বেতকাপাস আছে, তাহার একটি মূলে মার্কিণী কাপাসের বীজ হইতে

উৎপন্ন (G. Hirsutum), আর দ্বিতীয়টি ব্রাজীলদেশীয় কাপাসের বীজ হইতে উৎপন্ন (G. Peruvianum)। ইহারা উভয়েই মূল মার্কিণী ও ব্রাজীল কাপাস হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় ও মার্কিণী কাপাসের বীজের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঈষৎসবুজবর্ণ লোম দৃষ্ট হয়। ইহাকে বীজের মখমল বলে। সি আইলাণ্ড ও ব্রাজীলীয় কাপাসের বীজের উপর মখমল নাই। ঐ বীজ "নেড়া"। ব্রাজীলীয় কাপাসের বীজের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহার বীজগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র না হইয়া ফলের মধ্যস্থ সমস্ত বীজ একসঙ্গে গায়ে গায়ে লাগান (clustered)।

ভারতীয় কাপাসের ফুলের মধ্যে গাঢ় লাল। মার্কিণী কাপাসের ফুলের মধ্যে পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ। সি আইলাণ্ডের ফুলের মধ্যে ঈষৎ লাল।

ভারতীয় কাপাসের পাতা মানুষের হাতের ন্যায় ৫অঙ্গুলিবিশিষ্ট। মার্কিণী ও সি আইলাণ্ড কাপাসের পাতা সাধারণত ৩অঙ্গুলিবিশিষ্ট।

ভারতীয় কাপাসকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম শ্রেণীর গাছ ক্ষেতে ৫।৬মাসকাল থাকে (জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত)। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাপাস ক্ষেতে ১০।১১মাসকাল থাকে (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় হইতে চৈত্র-বৈশাখ পর্য্যন্ত)। প্রথমশ্রেণী কাপাসের পাতার আঙুলগুলি সরু সরু, তুলা অতি শুভ্রবর্ণ ও ফলনও বেশী, কিন্তু তুলার সূত্রগুলি ছোট ছোট ও মোটা। দ্বিতীয়শ্রেণীর কাপাস ঠিক বিপরীত— ইহার পাতার অঙ্গুলিগুলি মোটা মোটা, তুলা ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, ফলন কম, কিন্তু তুলা ভাল। হিঙ্গনঘাট ১মশ্রেণীর অন্তর্গত ও ব্রোচ ২য়শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু মোটের উপরে ২য়শ্রেণীর কাপাসই ভাল। বেহারে সারণ প্রভৃতি জেলায় একপ্রকার কাপাস আছে, দ্বিতীয়শ্রেণীর ন্যায় তাহা ১০।১১মাস ক্ষেতে থাকে, পাতার আঙুলগুলিও মোটা মোটা, কিন্তু তুলা অতি নিকৃষ্ট। বাণিজ্য-জগতে ইহা নিতান্তই নগণ্য।

কোন স্থানে একপ্রকার কাপাস হয় বা হইত বলিয়া যে অন্যপ্রকার কাপাসও হইবে, তাহার কোন কথা নাই। অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্নভিন্নজাতীয় কাপাসের অনুকূল হইতে পারে, অথবা একেবারেই কাপাসের উপযোগী না হইতে পারে।

ভারতে মার্কিণী-তুলা-চাষের চেষ্টা।

এখন বঙ্গদেশে তুলা বড় হয় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে তুলার অভাব নাই। তবে এই তুলা ভাল নহে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতে ভারতবর্ষে মার্কিণী তুলার চাষের বিস্তর চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও বিশেষ ফল হয় নাই। এই সমুদায় চেষ্টার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার দক্ষিণ-অঞ্চল হইতে দশজন লোক আনান হয়, তাঁহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অবশেষে এদেশ মার্কিণী তুলার চাষের অনুকূল নহে বলিয়া স্থির করেন। তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে, এদেশীয় কৃষকেরা তাঁহাদের চেষ্টার প্রতিকূলতা করিয়াছিল। এ কথার অর্থ বোঝা কঠিন।

শোনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই ভারতের কৃষককে মার্কিণী তুলার চাষের গূঢ়তত্ত্ব শিখান নাই। কিন্তু ভারতের রাজকোষ হইতে অর্থগ্রহণ করিতে তাঁহাদের লজ্জা করে নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক না শিখানর কথাটা সম্ভবত মিথ্যা বাহাদুরী মাত্র, তাঁহারা কিছু করিতে পারেন নাই, এই কথাই সত্য।

১৮৬৭।৬৮ সালে আবার মার্কিণী কাপাস স্থাপন করিবার চেষ্টা হয় এবং বেরারে একজন কার্পাস-কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনিও অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ষান্তে জমী একেবারে শুষ্ক হইয়া যাওয়াতেই ভারতবর্ষে অন্তত ঐ সকল প্রদেশে মার্কিণী তুলা হইবে না। এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় বঙ্গদেশসম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

এই সকল চেষ্টার একমাত্র ফল বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত কর্ণাটের ধড়ওয়াড়া তুলা। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বর্ষাকাল, কিন্তু মান্দ্রাজের বর্ষাকাল কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত। কর্ণাট-অঞ্চলে এই দুই বর্ষার সন্ধিস্থান। ইহাই সেখানে মার্কিণী তুলার চাষের অনুকূল কারণ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। সচরাচর ভারতে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-মাসে কাপাসের বীজবপন করা হয়। কিন্তু ধড়ওয়াড়ে যে মার্কিণী কাপাসের আবাদ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বীজবপন ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত চলে। তখনও কিছু কিছু বৃষ্টি থাকে, তার পরেই কার্ত্তিকমাস হইতে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া পৌষ পর্য্যন্ত চলে। মান্দ্রাজে সচরাচর আশ্বিনেই কাপাসের বীজ বপন করে, কিন্তু বোম্বাইর অন্যান্য স্থানে কিংবা মধ্যপ্রদেশে তাহা চলে না। কারণ, বর্ষান্তে জমী অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়।

গত ২।৩বৎসর ধরিয়া বঙ্গ ও বেহারে মার্কিণী, মিশরী, সি আইলণ্ড, ব্রোচ, হিঙ্গনঘাট, ধড়ওয়াড় প্রভৃতি তুলার চাষের চেষ্টা গবর্মেণ্ট হইতেই চলিতেছে, কিন্তু এই কয়েক বৎসরেই অতিবৃষ্টির জন্য মোটের উপরে ফল ভাল হয় নাই।

সফলতার অন্তরায়।

কেহ যেন মনে না করেন যে, মার্কিণী কাপাসে অনেক বৃষ্টির প্রয়োজন। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশে, যেখানে তুলার চাষ হইয়া থাকে, সেখানে বৈশাখে (এপ্রেল) বীজবপন করে, আশ্বিন-কার্ত্তিকে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) তুলাসংগ্রহ করে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র এই পাঁচমাসে গড়ে ৫ইঞ্চি করিয়া বৃষ্টি হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ৩।৪ইঞ্চি করিয়া জল হইলেই ভাল,— ক্ষেত নিড়াইবার সুবিধা হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ ভাদ্রে ৬।৭ইঞ্চি জল হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিছু কম হইলেই ভাল। ঠিক এই অবস্থাটি ভারতের অল্পস্থানেই দেখা যায়। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সাধারণত বৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে প্রথম দুটি মাসে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত প্রবল। অনেক স্থানে মাসে ১০।১৫ইঞ্চি। এইটিই আমাদের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। বর্দ্ধমানজেলার পশ্চিম হইতেই জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বে বৃষ্টি আর

নাই বলিলেই চলে। ঐ সকল স্থানে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের পূর্ব্বে শুধু কাপাস কেন, কোন বীজই বপন করা বড় সম্ভব নহে। অবশ্য উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে এবং নদীয়া, ২৪পরগণা প্রভৃতি স্থানে চৈত্র বৈশাখেই বৃষ্টি হয়, কিন্তু এই সকল স্থানে, বিশেষ পূর্ব্বাঞ্চলে বৃষ্টি এত বেশী যে, তাহা কাপাসের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে রৌদ্র হওয়া ভাল—মুষলধারে বৃষ্টি অপকারী। কাপাসের ফুল ফুটিবার সময়ে, বিশেষ ফল ফাটিবার সময়েও বৃষ্টিতে সমূহ ক্ষতি হয়। সে সময়ে বৃষ্টি একেবারে না হওয়াই ভাল। ভারতের যে যে প্রদেশে বৎসরে বৃষ্টি ৩০।৪০ইঞ্চির বেশী নয়, সেই সেই প্রদেশেই কাপাসের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের বৃষ্টি অত্যন্ত প্রবল। রঙ্পুর, মৈমনসিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে বৎসরে ৮০ হইতে ১০০ ইঞ্চি বা ততোধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। এত বৃষ্টি তুলাচাষের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাইপ্রদেশে তুলার চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এক খান্দেশেই ১১লক্ষ ০০হাজার একর কাপাস। এখানে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ ২২ইঞ্চিমাত্র। বাঙ্লার মধ্যে সারণজেলায় তুলার চাষ বেশী, কিন্তু মোটে ১০হাজার একর মাত্র। সারণের বাৎসরিক বৃষ্টিপরিমাণ ৪১ইঞ্চি। ইহার অপেক্ষা কম বৃষ্টি বাঙ্লার কোথাও নাই। বোম্বাই-প্রদেশেরই কনকান-অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টি ৯০ ইঞ্চি হইতে ১২০ ইঞ্চি। এখানে একেবারেই কাপাস হয় না।

চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় অঞ্চলে ও গারো-পাহাড়ে অত্যন্ত বেশী বৃষ্টি অথচ সেখানে যথেষ্ট তুলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই তুলা অতি নিকৃষ্ট—পশমের সঙ্গে মিশাল করিবার জন্য তাহা জর্ম্মাণীতে চালান যায়। পার্ব্বতীয় প্রদেশে বেশী বৃষ্টি হইলেও জমীতে জল বাধে না। ঐ অঞ্চলে কাপাস জন্মিবার সম্ভবত সেও একটি কারণ।

তুলার চাষ পূর্ব্বে ত বঙ্গদেশে ছিল, উঠিয়া গেল কেন? বিদেশী প্রতিযোগিতাকে ইহার কারণ বলিতে পারা যায় না,—যখন ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশে এখনও তুলার চাষ চলিতেছে। বরং বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশেরই অন্যান্য ফসলের প্রতিযোগিতাবশতই তুলার চাষ উঠিয়া গিয়াছে। যদি পাট বা তামাক দিয়া বেশী লাভ হয়, লোকে কাপাস করিবে কেন?

"বেঙ্গল"কাপাসের ফলন একর প্রতি ১/ মণ এবং দাম পৃথিবীর মধ্যে সকল তুলার অপেক্ষা কম। কিন্তু গুজরাটী ব্রোচ, যাহা ভারতের মধ্যে প্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা, তাহাই দেখা যাউক। ব্রোচতুলার একরপ্রতি ফলন গড়ে ১৷৷০ মণ—দাম ২১৲ কিংবা ২৬৲। জমীর খাজনা ৬৲সমেত ফসলটি প্রস্তুত করিবার খরচ ২০।২২ টাকা—রায়তের প্রায় কিছুই থাকে না। ইহার সঙ্গে বাঙ্লার রায়তের পাটের তুলনা করুন। গড়ে একরে ১৫/ পাট হয়—দাম ন্যূনকল্পে ৭৫৲। খরচখরচা ৪০৲ টাকা বাদ দিলেও ২৫৲ থাকে। তাহাকে কাপাসের চাষ করিতে পরামর্শ দেওয়া বোধ হয় ঠিক হইবে না। তবে পাটের চাষে লোক চাই বেশী ও

খরচ অনেক। এই কারণে এখন যে জমীতে পাট দেওয়া যাইতেছে না, সেখানে পরীক্ষা-স্বরূপে কাপাস দিয়া দেখা যাইতে পারে।

যদি মার্কিণী, মিশর বা সি আইলাণ্ড কাপাসে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবেই বাঙ্‌লার কৃষক কাপাসের চাষ গ্রহণ করিবে, নতুবা নহে। উহাদের দামও বেশী, ফলনও বেশী। মিশরী কাপাসের দাম আমাদের বেঙ্গলকাপাসের তিনগুণ ও ফলন অন্তত ২।৬গুণ। মার্কিণী কাপাসের দাম আমাদের বেঙ্গলকাপাসের দেড়া ও ফলন অন্তত দ্বিগুণ। মার্কিণে তুলা উৎপন্ন হয় গড়ে একরে ২।০ মণ। কিন্তু উপযুক্ত সারপ্রয়োগ দ্বারা অনেক সময়ে ৬/০ কিংবা ৭/০ তুলাও উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের লোকে সে সকল সারের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। এ কাজটি দরিদ্র ও মূর্খ কৃষকদের উপরে নির্ভর করিলে চলিবে না। গবর্মেণ্টকে এবং দেশের ভদ্রলোককে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমি স্বদেশী আন্দোলনকে অন্তরের সহিত নমস্কার করি, কিন্তু কতক-গুলি চাষাকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি খানিকটা জমীতে, যে-কোন-প্রকারে হৌক্, কাপাসের বীজ বপন করাইলেই স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা হইবে না এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের গর্ব্বও খর্ব্ব হইবে না।

বঙ্গদেশে আপাতত কোন্‌কোন্‌জাতীয় কাপাসের চাষ করা উচিত ?

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে বিদেশী কাপাসের চাষ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভাল ফল হয় নাই। ইহার মধ্যে এক ব্যতি-ক্রমস্থল বোম্বাইএর ধড়ওয়াড় কাপাস। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর সময়ে মার্কিণী কাপাস এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, ধড়ওয়ার তাহার একমাত্র সাক্ষী। সম্প্রতি বঙ্গদেশে আবার যে ভাল কাপাস প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা এ পর্য্যন্ত একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহারই মধ্যে ধড়ওয়াড় অপর-অপর-জাতীয় কাপাস অপেক্ষা সুফল প্রদান করিয়াছে।

কিন্তু আর একটি কাপাস আছে, তাহার প্রতি আজ পর্য্যন্তও কেহ বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। ইহা মানভূম-সিংভূমের বড়িয়া কাপাস। ইহাও সম্ভবত ধড়ওয়াড়ের ন্যায় মার্কিণী বীজমূলক এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর চেষ্টার প্রমাণ। ইহার গাছগুলি ২।৩হাত উচ্চ, ফলগুলি বড় বড়, তুলা উৎকৃষ্ট, কিন্তু এই কাপাসের চাষ এত সামান্য যে, বাণিজ্যজগতে উহার নামই নাই। সিংভূমে বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে ৫৫ইঞ্চি। এই কাপাসটি উত্তর বা পূর্ব্ববঙ্গে হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ, কিন্তু জলপাইগুড়ি বা বরিশালে কাপাস উৎপাদন করিতে না পারিলে চলিবে না—এমনও কিছু কথা নাই। এই কাপাসটি যখন মানভূম-সিংভূমে প্রতিষ্ঠিত, তখন ছোট-নাগপুরের অন্যান্য জেলাতে এবং বেহারের দক্ষিণাংশ, সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি স্থানে যে সুন্দররূপ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই অঞ্চলে বিস্তর জমী পতিত রহিয়াছে এবং সেখানে জমীতে সার দিয়া ভালরূপে

এই কাপাসের চাষ করিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। এই কাপাসের গাছ রাখিলে কয়েকবৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু ফল ক্রমে ছোট হইয়া যায় ও তুলাও ক্রমে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর জমী চষিয়া নূতন করিয়া বীজবপনই শ্রেয়।

সিংভূম-অঞ্চলে আর একটি কাপাস আছে, তাহার নাম বড়েয়া। এই বড়েয়া, আর উপরিলিখিত বড়িয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতি। বড়িয়ার বীজবপন হয় জ্যৈষ্ঠে ও তুলাসংগ্রহ হয় পৌষমাঘে। বড়েয়ার বীজ আশ্বিনমাসে বপন করা হয় ও তাহার তুলাসংগ্রহ হয় বৈশাখে। বড়েয়া অতি নিকৃষ্ট কাপাস।

দরভাঙার অন্তর্গত দলসিংসরাইএর নিকটে মনিয়ারপুর ও কল্যাণপুরে Shaw Wallace Co গাছকাপাসের চাষ করিতেছেন। তাঁহাদের এই কাপাসের নাম D 3/8। ইহার বীজ তাঁহাদের নিকটে পাওয়া যায়, দাম ৮৲ সের। ৵১ এক সেরে ছয় একর জমী বপন করা চলে। ১০ফীট দূরে দূরে লাইন করিতে হয় ও লাইনে ১০ফীট অন্তরে অন্তরে গাছ রাখিতে হয়। ইহাতে একরে প্রায় ৪০০ গাছ হয়। তাঁহারা বলেন, প্রথম বৎসরে প্রতি গাছে একছটাক হইতে অর্দ্ধপোয়া তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, ২য় বর্ষে অর্দ্ধপোয়া হইতে দেড়পোয়া এবং ৩য় বৎসর হইতে গাছ প্রতি ৵১ হইতে ৵৩ তুলা উৎপন্ন হইতেছে। খরচ প্রথম বৎসরে প্রতি একর ২০৲, তার পরে প্রতি বৎসর ১৫৲ করিয়া। তুলার মণ ১৫৲ ধরিলেও তৃতীয় বৎসর হইতে একর প্রতি ন্যূনকল্পে খরচ বাদে লাভ ৬৫৲।

বীজনির্ব্বাচন।

নূতন মার্কিণী বা মিশরী বীজ লাগাইয়া সুফল না হইলে উদ্যম পরিত্যাগ না করিয়া যে কয়টি গাছ হইবে, তাহারই মধ্য হইতে সকলের অপেক্ষা ভাল গাছটির বীজ রাখিতে হইবে ও পরের বৎসর ঐ বীজ বপন করিতে হইবে। আবার মন্দ গাছগুলি বাদ দিয়া ভাল ভাল কয়েকটি গাছেরই বীজ রাখিতে হইবে। তুলা সকল গাছগুলি হইতেই সংগ্রহ করিতে দোষ নাই, কিন্তু পরের বৎসরে বপনের জন্য বীজ কেবল উৎকৃষ্ট গাছ হইতেই রাখিতে হইবে। এইরূপে ৫বৎসরের মধ্যেই আমাদের অবস্থার উপযোগী নূতন-জাতীয় কাপাস সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

সি-আইলাণ্ড-কাপাস মূলে গাছকাপাস (perennial) ছিল এবং শীতকালে উহার ফুলফল হইত। যখন ঐ কাপাস মার্কিণে চাষ করিবার প্রথম চেষ্টা হইল, তখন ফুল-ফল হইবার পূর্ব্বেই গাছগুলি সেখানকার দারুণ শীতে মরিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া পুনঃপুন চেষ্টা হইতে লাগিল ও দৈবাৎ যে দুএকটি গাছে মরিবার পূর্ব্বেই ফল পাকিল, তাহারই বীজ বপন করিয়া করিয়া ক্রমে নূতন ওষধিজাতীয় (annual) সি-আইল্যাণ্ড কাপাসের সৃষ্টি হইল। শুধু তাহাই নহে, ক্রমাগত যত্নের সহিত বীজনির্ব্বাচনদ্বারা মূল সি আইলাণ্ড অপেক্ষা মার্কিণী সি-আইলাণ্ডের সূত্র আরও সুদীর্ঘ ও মূল্যবান্ হইয়াছে। এই "উন্নত সি আইলাণ্ড" তুলার পাউণ্ড (৵॥০ সের) দেড়টাকা মূল্যেও বিক্রয় হয়। ব্যর্থের ভিতরে সফলতার বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু

এইপ্রকার উন্নতি আমাদের মূর্খ অনশনক্লিষ্ট কৃষকদিগের নিকট আশা করা বিড়ম্বনামাত্র।

বিশেষ আনন্দের সংবাদ।

সিন্ধুদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ঠিক মিশরেরই অনুরূপ। বৎসরে বৃষ্টির পরিমাণ ৫।° ইঞ্চি। এখানে খাল হইতে জলসেচনের দ্বারা মিশরী কাপাসের চাষ করিয়া বোম্বাই-এর কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে ক্ষেতে সকল অপেক্ষা ভাল ফসল হইয়াছে, সেই ক্ষেতে একরে খরচ ৩০৲ টাকা বাদে প্রায় ১৯০৲ লাভ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে মিশরী কাপাসের চাষ কতদূর ফলপ্রদ হইবে, তাহা বলা কঠিন।

জমী।

নীচু জমীতে অর্থাৎ যেখানে জল বাধে, সেখানে কাপাস একেবারেই হয় না। আউসধান, ভুট্টা, রেড়ী, অড়হর প্রভৃতির জন্য যে জমী উপযোগী, সেই জমীতেই কাপাস হইতে পারে। মোটা কথা এই যে, আমনধানের ক্ষেত কাপাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

জমী উচ্চ হইলে ও উহাতে জল না বাধিলে সকলপ্রকার জমীতেই কাপাস্ হইয়া থাকে, তবে দো-আঁস (বেলে ও এঁটেল জমীর মাঝামাঝি) বা যাহাতে মাটী অপেক্ষা বালীর অংশ বেশী, সেইপ্রকার জমীই উৎকৃষ্ট। বেলে-জমীতে রস কম থাকে, সেইজন্য গাছ তত বড় হয় না ও ছোটতেই অকালপক্ক হইয়া ফুলফল ধরিতে থাকে। এঁটেল জমীতে গাছ খুব বড় বড় হয়, কিন্তু তাদৃশ ফল ও তুলা হয় না।

কাপাস বুনিবার সময়।

মিশরে ও মার্কিণে এপ্রেল বা বৈশাখমাসে তুলার বীজবপন করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, মধ্যভারতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলে বীজবপন হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে। বেহার ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত যে সকল জেলাতে কিছু কিছু তুলা হয়, সেখানেও বীজবপন করে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে। তাহার পূর্ব্বে বৃষ্টিও হয় না, জমীও তৈয়ার হয় না। পূর্ব্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গে বৈশাখ কেন, চৈত্রেই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় ও সেই সময়েই অর্থাৎ পাটবপন করিবার সময়েই কাপাসেরও বীজবপন কর্ত্তব্য। বেশী বৃষ্টির সময়ে বীজবপন অযুক্ত। গাছ বড় হইলে বৃষ্টিতে তত ক্ষতি করে না।

আশ্বিনমাসেও বীজবপন করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু নিজ বাঙ্‌লায় ইহাতে বিপদ্ আছে। এই সময়ে এখানে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টিতে ফুটন্ত তুলার ক্ষতি হইবে। বেহার কিংবা উড়িষ্যায় এই সময়ে বৃষ্টি হয় না—কালবৈশাখী জিনিষটা ঐ সকল অঞ্চলে নাই। যেখানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, এমন কি, চৈত্রেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় পূর্ব্ববঙ্গে হইয়াই থাকে—সেখানে আশ্বিনকার্ত্তিকে কাপাসবপন উচিত নহে। ছোটনাগপুর ও তাহার সন্নিহিত বেহারের দক্ষিণাংশের জমী ঢেউখেলান, নিজ বাঙ্‌লার ন্যায় সমতল নহে। ঐ সকল স্থানে বৃষ্টিও অপেক্ষাকৃত কম ও বৃষ্টি হইলেও জমীতে জল দাঁড়ায় না। এই অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠেই কাপাসের বীজবপন করা কর্ত্তব্য। সকল স্থানের অবস্থা একপ্রকার নহে। সুতরাং বীজবপনের সময়সম্বন্ধে

সকল স্থানের জন্য এক সাধারণ নিয়ম করা অসম্ভব।

বীজবপনের প্রণালী ও বীজের পরিমাণ।

বঙ্গের অনেকস্থলেই ছিটাইয়া বীজবপন করা হয়। কিন্তু সেটি সুপ্রথা নহে। মার্কিণ বা মিশরের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষেরই অন্যান্য অঞ্চলে লাইন করিয়া বীজবপন করে। ইহাতে নিড়াইবার ও জমী উস্কাইবার সুবিধা হয়।

যদি বর্ষার পূর্ব্বে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখে কাপাস লাগান যায়, তবে জমীতে ২ফীট (বা ১॥০হাত) অন্তরে আলী বাঁধিয়া তাহারই উপরে বীজবপন করা উচিত। জমীর যে দিকে ঢালু বা গড়ান থাকিবে, সেই মুখে আলী দেওয়া উচিত। কেন না, ইহাতে বৃষ্টির জল জমীতে না বাধিয়া দুটি আলীর ভিতরে যে জুলী থাকিবে, তদ্দ্বারা গড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। জমীতে জল না দাঁড়ায়, এইটিই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যের বিষয়।

জমী যত ভাল হইবে, ততই গাছ ভাল ও বড় হইবে, সুতরাং ততই দূরে দূরে গাছ রাখিতে হইবে। জমী অনুর্ব্বর হইলে গাছ ছোট ছোট হয়, সুতরাং অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন গাছ থাকিলেও ক্ষতি হয় না। সকল ফসলসম্বন্ধেই এই নিয়ম, সুতরাং কাপাসসম্বন্ধেও তাহার অন্যথা হইবার নহে। আবার কাপাস নানাজাতীয়। কোনকোনটির গাছ স্বভাবতই বড়, কোন্কোনটির গাছ ছোট। যে-যে-জাতীয় কাপাসের গাছ বড়, তাহার লাইনও দুই-দুইফীট অন্তর না হইয়া ৩।৪ফীট অন্তর হওয়া উচিত, এবং লাইনে লাইনে যে গাছ থাকে, তাহাও ১ফুট-১॥০ফীট অন্তর অন্তর না হইয়া ২ফীট বা ততোধিক হইতে পারে। মোটের উপরে ২ফীট অন্তর অন্তর লাইন ও প্রতি লাইনে (একহাত) ১॥০ফীট অন্তরে অন্তরে গাছ রক্ষা করা উচিত। মার্কিন্‌দেশে ৩।৪ফীট অন্তরে অন্তরে লাইন ও লাইনে ২।৩ফীট অন্তরে অন্তরে গাছ রাখে। সিংভূমের বড়িয়াকাপাসও এইরূপেই বপন করিতে হইবে।

গাছকাপাস লাগাইতে হইলে ৮।১০ফীট অন্তরে অন্তরে গাছ বসান উচিত।

লাইনে বীজবপন দুইপ্রকারে করা যাইতে পারে। একফুট-দেড়ফীট অন্তরে অন্তরে ৪।৫টি বীজ বপন করা যাইতে পারে। অথবা লাইনে অবিচ্ছেদে বীজবপন করা যাইতে পারে।

বীজ অধিক মাটীর নীচে চাপা পড়িলে অঙ্কুর-উদ্গম হয় না। এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বা দুই অঙ্গুলি পরিমাণ মাটী উপরে থাকিলেই যথেষ্ট।

বীজ ভাল হইলে ও সমস্তগুলি গজাইলে এক একরে (৮০হাতী বিঘার ৩ বিঘা) ⁄৩ বীজই যথেষ্ট। বপনের দূরত্ব অনুসারে বীজের পরিমাণ। গাছকাপাস ⁄১এ ছয় একর জমীর বপন চলিতে পারে। কিন্তু অনেক বীজ গজায় না, বা জলে পচিয়া যায়। এ কারণে বীজ বেশী করিয়া বপন করা উচিত ও কিছু হাতে রাখা কর্ত্তব্য।

বপনের পরে।

বীজবপনের ৫।৭দিনের মধ্যেই অঙ্কুর

উৎপন্ন হয়। চারা বাহির হইবার ১০।১৫ দিন পরে দুর্ব্বল গাছগুলিকে উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এক স্থানে একের অধিক গাছ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। ক্ষেত অবশ্য পরিষ্কার রাখিতে হইবে অর্থাৎ ২।৩বার নিড়াইয়া দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ঘাস-আগাছা প্রভৃতি না থাকিলেও লাইনের মাঝে মাঝে ২।৩বার লাঙল, কোদালী বা খুরপী দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া দিতে হইবে। এইটি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা আবশ্যক।

কাপাসের গাছের ছোট অবস্থায় অনেক সময়ে পোপোকা লাগে ও বিশেষ ক্ষতি করে। এরূপ স্থলে উক্ত পোকার উপদ্রব কমিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তার পরে যে গাছগুলি বাঁচিয়া যায়, তাহার মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, সেইটি বিবেচ্য।

কাপাসগাছের গোড়া বড় নরম, ঝড়ে-বাতাসে ভাঙিয়া যায়। গাছ কিছু বড় হইলেই কোদালী দিয়া গোড়ায় মাটী বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি যেমন এক এক ক্ষেত একসঙ্গে পাকে ও একসঙ্গে সমস্ত গাছ কাটিয়া মাড়িয়া ফললাভ করা যায়, কাপাস সেরূপ নহে। উহা ফলের গাছের মত। আম, জাম, আতা, পেয়ারা, লিচু যেমন ক্রমে পাকে ও ক্রমে তাহাদের ফল সংগ্রহ করিতে হয়, কাপাসও সেইরূপ ক্রমে পাকে ও ফুটে ও প্রতি ৮।১০দিন অন্তর অন্তর ক্ষেত্রের তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। তুলা ফুটিতে আরম্ভ হইলে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১॥মাস-দুইমাস লাগে। এই সময়ে এক-প্রকার লালবর্ণের মাছি লাগিয়া তুলার বিশেষ অপকার করে। তুলাসংগ্রহের সময়ে দাগী তুলা ও ভাল তুলা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঝুড়ি বা থলিয়াতে রাখা উচিত। এবং বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন—যেন শুষ্কপত্রাদি তুলার সঙ্গে লাগিয়া না থাকে। তুলাই সংগ্রহ করিতে হইবে, কাটা ফলের খোলা বা খোসা গাছেই থাকিবে।

কাপাসের সার।

মার্কিণে গড়ে একরে ২/০মণ কিংবা ২।০মণ তুলা উৎপন্ন হয়। কিন্তু উপযুক্ত সারপ্রয়োগ দ্বারা অনেক সময়ে ৬/০ কিংবা ৭/০ মণও উৎপন্ন হয়। এইরূপ হইলে অবশ্য কাপাস করিয়া যথেষ্ট লাভ আছে। মার্কিণে পরীক্ষাদ্বারা দেখা হইয়াছে যে, কাপাসের জন্য সার যতই দেওয়া যায়, ততই বেশী লাভ।

সকল ফসলের জন্যই প্রায় গোবরসারের প্রয়োজন। কাপাসের পক্ষেও এই কথা। প্রতি একরে ৫।৭গাড়ি গোবর দেওয়া উচিত। এই গোবর অন্তত ৫।৬ মাসের পুরাতন হওয়া চাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই সার নানা কারণে অতি অল্পই পাওয়া যায়। যাহা হৌক, মার্কিণী ও মিশরী কাপাসের জমীতে গোবরের সার দেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন।

কাপাসের জমীতে গোবর ত দিতেই হইবে, কিন্তু আরও একটি সারের প্রয়োজন আছে, তাহার নাম সুপার্ ফস্ফেট্ (Super phosphate)। এইটি কাপাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা কাশীপুরে

ওয়ালভী কোম্পানীর নিকট পাওয়া যায় —দাম ২৷০ করিয়া মণ। একরে ৪/০মণ সুপার্ ফস্‌ফেট্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। যে লাইনে লাইনে বীজবপন হইবে, সেই লাইনে লাইনে ছড়াইয়া কোদালীদ্বারা মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া উচিত। যে ফসল ছিটাইয়া বপন হয়, সেই ফসলের জন্যই সুপার্ জমীতে ছিটাইয়া দিতে হয়—এটি সাধারণ নিয়ম।

সুপারের বিলাতী নাম শুনিয়া কেহ ইহার বিরোধী হইবেন না। বিজ্ঞানের স্বদেশবিদেশ নাই। সুপারে উদ্ভিদের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান নিহিত আছে। সকল সভ্যদেশেই উহার প্রচুর ব্যবহার হইতেছে—কোটি-কোটি-মণ ব্যবহার হইতেছে। আমাদের দেশেও উহার প্রচলনের অতীব প্রয়োজন। প্রায় সকল ফসলের জন্যই উহা উপকারী—বিশেষ কাপাসের জন্য।

কাপাসচাষে (এক একর=৮০হাতী বিঘার তিন বিঘা) একরপ্রতি খরচ ও লাভ।

পাঁচবার লাঙল দেওয়ার খরচ।—১ একর একবার চষিতে ৩খান লাঙলের প্রয়োজন, ৫বার চষিতে ১৫খান লাঙল। টাকায় ৩খান হিসাবে—	৫৲
বীজ /৮ সের—	।৵
গাছ পাতলা করিবার খরচ ৪জন লোক ।০ হিসাবে—	১৲
নিড়াইবার খরচ ১২জন লোক	৩৲
দুইবার কোদালীদ্বারা জমী উল্টাইয়া দেওয়া প্রতিবারে ১২জন লোক মোট ২৪জন	৬৲
তুলাসংগ্রহের খরচ ১০জন লোক—	২৷০
গোবরসার ৫০/	২৷০
সুপার ৪/০ মণ ২৷০ হিসাবে	৯৲
এক একর জমীর খাজনা	৪৷০
মোট প্রায়—	৩৪৲

সকল স্থানের মজুরী বা জমীর খাজনা একপ্রকার নহে। সুতরাং এই হিসাব সর্ব্বত্র খাটিবে না। বেহার ও ছোটনাগপুরে এক একর জমীর খাজনা ৪৷০ স্থলে ৷০ ও লোকের মজুরী ।০ স্থলে /১০। লাভের কথা পূর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে। আমাদের দেশী কাপাস করিয়া লাভ বোধ হয় বিশেষ কিছুই থাকিবে না, তবে সিংভূমের বড়িয়া কাপাস করিলে বোধ হয় লাভ হইবে। ঐ তুলার মণ ১৭৲ টাকা ধরিলে ও একরে ফলন ৩৷৪মণ হইলে অবশ্য বেশই লাভ থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে কত তুলা জন্মে, কত জমীতে কাপাসচাষ হয়, ইত্যাদি। (Statistics)

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মার্কিণ, মিশর এবং ভারতেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুলা উৎপন্ন হয়। ১৮৯৮ খৃঃ হইতে ১৯০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এই তিনটি দেশে কত তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা দৃষ্ট হইবে। অঙ্কগুলিকে "কোটি পাউণ্ড" বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক পাউণ্ড=½ সের, এককোটি পাউণ্ড=১লক্ষ ২৫হাজার মণ।

বৎসর।	মার্কিন্।	ভারত।	মিশর।
১৮৯৮	৫২৮	৮৫	৬৫
১৮৯৯	৫৮০	৯৭	৫৫
১৯০০	৪৭৬	৬০	৬৪
১৯০১	৫৩০	৮৫	৫৪
১৯০২	৫৪৩	৯৩	৬৫
১৯০৩	৫৩৬	১০৭	৫৮
১৯০৪	৫০৭	১৩৬	?

বর্ত্তমান সময়ে এই তিনটি দেশে গড়ে কত জমীতে কাপাসের চাষ হয় ও একরপ্রতি ফলন কত, তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

দেশ।	আবাদী জমীর পরিমাণ। (একর)	একরপ্রতি ফলন। (মণ)
মার্কিন্	২ কোটি ৮০ লক্ষ	২।০
ভারত	১ কোটি ৯০ লক্ষ	১৴০
মিশর	১৩ লক্ষ ৭০ হাজার	৫৴০

অর্থাৎ গড়ে মিশরে ভারত অপেক্ষা একরপ্রতি ফলন ৫গুণ। মিশরী তুলার দামও ভারতের তুলার দ্বিগুণেরও অধিক। মার্কিণে ভারত অপেক্ষা ৫।৬গুণ বেশী তুলা উৎপন্ন হয়। তাহার দাম ভারতের তুলার দামের দেড়া। মার্কিণে যে তুলা জন্মে, তাহার কিঞ্চিদধিক ½ সেই দেশেই খরচ হয় ও সিকিপরিমাণ ইংলণ্ডে যায়। ভারতের অর্দ্ধেক প্রায় বোম্বের মিলেই ব্যবহৃত হয়, ইংলণ্ডে অতি অল্পই যায়, বাকী যায় জর্ম্মণী ও জাপানে। মিশরের তুলার প্রায় আট আনা ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এই কয় বৎসরে ইংলণ্ডে কত কোটি-পাউণ্ড তুলা কোন্ কোন্ দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল :—

বৎসর।	মার্কিন্।	ভারত।	মিশর।	অন্যান্য দেশ।	একুন।
১৮৯৮	১৮১	২·৭	২৮	২·০	২১৩·৭
১৮৯৯	১২০	৩·১	৩৪	১·৮	১৬১·২
১৯০০	১৩৭	৩·৭	৩১	৪·৬	১৭৬·৩
১৯০১	১৪৮	৩·৮	২৭	২·৯	১৮২·৭
১৯০২	১৩৬	৩·৩	৩৬	৬·৫	১৮১·৮
১৯০৩	১৩৬	৮·২	৩০	৫·৪	১৭৯·৬
১৯০৪	১৪৯	৯·৫	৩২	৪·৪	১৯৪·৯

১৯০০ হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত মিশর হইতে ইংলণ্ডে যে তুলা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বার্ষিক মূল্য গড়ে ৯২ লক্ষ ৪৫ হাজার পাউণ্ড বা ১৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

মার্কিণে তুলার চাষ কিপ্রকার বৃদ্ধি হইতেছে, নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা দৃষ্টি-গোচর হইবে :—

১৮৭৯-৮০	...	১,২৫,৯৫,০০০	একর
১৮৮৯-৯০	...	২,০১,৭২,০০০	"
১৮৯৯-১৯০০	...	২,৪৪,০৩,০০০	"
১৯০৪-০৫	...	২,৮০,১৭,০০০	"

ভারতেও তুলার চাষ বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশের ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে, যথা :—

বৎসর।	সমগ্র ভারত। (একর)	বঙ্গদেশ। (একর)
১৮৯২-৯৩	১,৩৪,২২,০০০	২,৩০,০০০
১৮৯৯-১৯০০	১,১৮,৮৬,০০০	১,৬০,০০০
১৯০৩-০৪	১,৮০,৪৩,০০০	৯৫,০০০
১৯০৪-০৫	১,৯০,১৪,০০০	৮৯,০০০

বার-তের বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে-পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত, এখন তাহার দশআনা উঠিয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারতে যে-পরিমাণ তুলার চাষ হয়, বঙ্গদেশে (বাঙ্‌লা-বেহার-উড়িষ্যা) তাহার ২০০ ভাগের একভাগও নহে। কিন্তু সমগ্র ভারতে যে-পরিমাণ ধান্ত জন্মে, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ ও যে-পরিমাণ পাট জন্মে, তাহার ৯৮ ভাগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়। এখানে বঙ্গদেশ অর্থে বিগত ১৬ই অক্টোবরের বিভাগের পূর্ব্বে বঙ্গের ছোটলাটের শাসনাধীন সমগ্র প্রদেশের কথাই বুঝিতে হইবে।

ঢাকাই মস্‌লিনের কাপাস।

ঢাকাতে এখন কাপাসের চাষ নাই বলিলেই হয়। স্থানে স্থানে লোকের বাড়ীতে একপ্রকার গাছকাপাস (perennial) আছে, কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, ঐ গাছকাপাসের তুলা হইতেই মস্‌লিন্ উৎপন্ন হইত, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মস্‌লিনের কাপাসের মাঠে রীতিমত চাষ হইত।

এই ঢাকাই কাপাসের নাম ছিল 'ফোটী'। বৎসরে উহা দুইবার উৎপন্ন হইত—আশ্বিনমাসে বপন করিয়া বৈশাখে তুলা ফুটিত, এবং বৈশাখে বপন করিয়া আশ্বিনে তুলা ফুটিত। বৈশাখী তুলাই শ্রেষ্ঠ ছিল, অর্থাৎ ঐ তুলায় তৈয়ারী কাপড় ধৌত হইলেও ঠিক থাকিত, আর আশ্বিনা তুলার সূতা ধোপে মোটা হইত। তাঁতীরা উভয় তুলাই অন্তত ৬মাস না রাখিয়া সূতা কাটিত না, কিন্তু আশ্বিনা তুলা আরও কিছু বেশীদিন ঘরে রাখিত। অনেকসময়ে শীতকালে বৃষ্টির অভাব এবং চৈত্রবৈশাখের ঝ বৈশাখী তুলার বড় ক্ষতি হইত। আশ্বিনী তুলায় তত লোকসানের ভয় ছিল না। তবে উচ্চভূমি অর্থাৎ যেখানে বন্যার জল না উঠিতে পারে, কেবল এমন স্থানেই উহার চাষ সম্ভব ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই বর্ষা বেশী। এইজন্য ঐ অঞ্চল তুলাচাষের অনুপযুক্তই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ঢাকার প্রবল বর্ষাতেও আশ্বিনী ফোটীর বিশেষ ক্ষতি হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকাই কাপাসের (অর্থাৎ বীজসংযুক্ত তুলার) দর প্রতি মণ এইরূপ ছিল :—

	১৭৬৪ খৃঃ	১৭৭৭ খৃঃ	১৭৮৯ খৃঃ
বৈশাখী ফোটী	২৲—২৸০	২॥০—৩৲	৬—৬।০
আশ্বিনী ফোটী	২৲	২॥০	৫৸০

অর্থাৎ আশ্বিনী ফোটীর দাম বৈশাখী ফোটী অপেক্ষা গড়ে ॥০ কম থাকিত।

ঢাকার সন্নিকটে এবং ঢাকাজেলার উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলেই ভাল তুলা হইত, পশ্চিমাংশের তুলা তত ভাল ছিল না।

আট হইতে বার চাষ দিয়া কৃষকেরা জমী প্রস্তুত করিত ও একহাত অন্তর লাইন

করিয়া করিয়া বীজবপন করিত। এক এক লাইনে ৪ইঞ্চি দূরে দূরে বীজবপন করিত। গাছগুলি কিছু বড় হইলে যেগুলি ভাল ভাল, সেইগুলি বাদে বাকী মর্ধ্যে গাছগুলিকে মারিয়া ফেলিত। প্রতি চারি-বৎসরের মধ্যে এক বৎসরের কাপাসের জমী পতিত রাখিবার নিয়ম ছিল। বপনের জন্য যে বীজ থাকিত, তাহার তুলা বিচ্ছিন্ন করা হইত না, তুলাসমেত বীজ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া ঘৃত বা তৈলের কলসীতে উনানের উপরে ঝুলাইয়া রাখিত এবং যথাকালে বপন করিত।

রেসিডেণ্ট জনবেব এককণা জমীতে ঢাকাই কাপাসচাষের হিসাব দিয়াছেন। দৈর্ঘ্যে বার নল ও প্রস্থে দশ নল হইলে এক কণা হইত। ১২ নলে প্রায় ১০০ ফীট। অর্থাৎ এক কণা এক একরের তিন ভাগের এক ভাগ, অথবা ৮০হাতী বিঘার এক বিঘার সঙ্গে প্রায় সমান। এককণা কাপাসচাষের ব্যয় ও লাভ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, কাপাসের চাষে বড়-একটা লাভ ছিল না। তখন কড়ীর চলন ছিল। ৪কাহন কড়ীকে ১৲ টাকা বলিয়া ধরিতে হইবে :—

	কাহন	পণ
জমীর খাজনা . . .	৫ কাহন	০ পণ
জমী প্রস্তুত করিতে ৯জন লোকের মজুরী, প্রতি জনের দিন ৮ পণ হিসাবে … …	৪ „	৮ „
বীজ /৩ (তিন সের), প্রতি সের ১ কাহন হিসাবে … …	৩ „	০ „
বীজবপনের জন্য ৭জন লোকের মজুরী …	৩ „	৮ „
গাছের গোড়ায় মাটী বাধিয়া দেওয়ার জন্য ৫জন লোকের মজুরী … …	২ „	৮ „
চারিবার নিড়াইবার খরচ …	১০ „	০ „
মাঝে মাঝে ক্ষেতে মাটী উস্কাইয়া দিবার খরচ, ৪জন লোকের মজুরী …	২ „	০ „
তুলাসংগ্রহের খরচ, ১৫ জন লোকের মজুরী … …	৭ „	৮ „
মোট	৩৮ কাহন	০ পণ
অথবা ৯৷৷০ টাকা।		

বৎসর অনুকূল ও জমী ভাল হইলে এককণা জমীতে ৩৷০ কাপাস উৎপন্ন হইত। ইহার মূল্য ৪৲ হিসাবে … ১২৲ টাকা
খরচবাদে লাভ
প্রতি কণা … ২৷৷০ টাকা মাত্র।
একর প্রতি লাভ … ৭৷৷০ টাকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং এবং অন্যান্য সদাগরেরা এক ঢাকাসহর হইতেই বৎসরে ২৫লক্ষ টাকার মস্‌লিন ক্রয় করিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই মাঞ্চেষ্টারের প্রতি-যোগিতাবশত ঢাকার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। এখন ঢাকায় তাঁতীর আর সেপ্রকার

নাই, মস্‌লিন্‌ও আর হয় না বলিলেই হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন যুবরাজ (বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহাকে তিনখানি মস্‌লিন্ উপহার প্রদত্ত হয়, উহার প্রত্যেকখানি ২০গজ লম্বা ও ১গজ প্রশস্ত, ওজনে ৩।০ আউন্স, মূল্য প্রায় ১০০৲ টাকা। কিন্তু জাহাঙ্গীরবাদশাহের সময়ে যে মস্‌লিন্ হইত, তার ১৭ গজের ওজন প্রায় ২আউন্স ও মূল্য ৪০০৲ টাকা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বালিকা বধূ।

ওগো বর, ওগো বঁধূ!
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু!

জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তার হ'লে একাকার
মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধূলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরণের কাজ।
জানে না করিতে সাজ।

কহে এরে গুরুজনে
"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা,
ভীত হ'য়ে তাহা শোনে।

কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তায়—
"পালিবে পরাণপণে
যাহা কহে গুরুজনে।"

বাসকশয়ন'পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভখন বৃথা চলি যায়,
যে হার তাহারে পরালে, সে হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন'পরে।

শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে
—দশদিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধূলা কোথা পড়ে' থাকে তার,
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস
এই দেখিতেই বুঝি ভালবাস,
খেলাঘরদ্বারে দাঁড়াইয়া আছ,
কি যে পাও পরিচয়!
মোরা মিছে করি ভয়।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে
তুমি বুঝিয়াছ মনে!

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জান জান তুমি—ধূলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জ্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু!

ভীমচুল্‌হা।

ভীমচুল্‌হা-পাহাড় পালামৌ-জেলায় বিখ্যাত। তাহার একাংশ কোয়েল-নদী-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া স্রোতোবেগে অহুদিন প্রহৃত হইতেছে। পরপারে নিবিড় তালীবনরাজি এবং মহুয়া ও শালগাছের সারি। দূরে প্রকৃতির দুর্গপ্রাকারতুল্য রোহিতাশ্বপর্ব্বতের সুনীল ছায়া দিগন্তবিস্তৃত হইয়া দৃষ্টি-রেখা প্রহত করিতেছে। কথিত আছে, এই ভীমকান্ত স্থানটির বৃত্তে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং ভীমসেন একদা এখানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পদচিহ্ন সেখানকার পাষাণপ্রান্তে এখনও বর্ত্তমান এবং পাকাদির জন্ত তিনি যে চুল্লী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিন সুদীর্ঘ শিলাখণ্ড কালজয় করিয়া তাহা সূচিত করিতেছে।

কিন্তু দ্বাপরযুগের, বিশেষত বীর বৃকোদরের কথা বেদব্যাসঠাকুরের মুখেই শোভা পায়। উভয়কে প্রণাম করিয়া আমরা এইস্থানসংক্রান্ত ক্ষুদ্র একটি কাহিনীর পরিচয় দিব।

সিপাহীবিদ্রোহের প্রায় পাঁচবৎসর পূর্ব্বের কথা। পাহাড়গুলির কাদননামক গ্রামে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচসাত ক্রোশের ভিতর অনেকগুলি বস্তিতে হলুস্থুল

পড়িয়া গিয়াছে। জায়গীরদার রামশরণ সিং সরকারী পরোয়ানা পাইয়াছেন—লেফ্‌টেনাণ্ট ভৌণ্টসাহেব রামগড়ের পথে সদলে তীরচুল্‌হার শিকার খেলিতে আসিতেছেন, প্রয়োজনীয় রসদ যেন ঠিক্‌ থাকে। সেকালে বাঙ্‌লা-বেহার-উড়িষ্যার ভিতর যে কয়টি স্থান নিতান্ত অনধিগম্য ছিল, পালামৌ তাহার অন্যতম। বাস্তবিক রেলওয়ে খুলিবার আগে সেদিন পর্য্যন্ত এই দুর্গমতা নিবিড়শৈলবনাকীর্ণ বিরলবসতি এই প্রদেশটিকে কেমনতর একটা রহস্যের মোহে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল সৌখীন শিকারপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় সাহেব-সুবার তেমনতর স্থানে শুভাগমন হইতে পারে, তখনকার দিনে লোকে ইহা বুঝিত না। ছোট-বড় জমিদারেরা রসদসরবরাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া কাজেই শঙ্কিতচিত্তে জঙ্গী হাকিমপ্রবরের এই অভিযানদিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। লেফ্‌টেনাণ্টসাহেবের গাড়োয়ানামক স্থানে পৌঁছিবার খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতক কতক লোকজন তীরচুল্‌হার দর্শন দিল। সংখ্যায় ইহাদের পঙ্গপালের সহিত কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও একদিনেই জায়গীরদার এবং গরিব প্রজাবর্গ বুঝিল, অনিষ্টসাধনে মানুষের পক্ষে মানুষ যত পটু, পশুজাতি ততটা নহে। কারণ, পঙ্গপাল উপস্থিতমত ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়াই চলিয়া যায়, কিন্তু সাহেবের সিপাহী, চাপরাসী, আর্দ্দালিরা শুধু চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয়ে সন্তুষ্ট নহে। কবির ভাষায় তারা—"খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে।"

রামশরণ সিং বয়সে প্রবীণ এবং ধর্ম্মভীরু লোক। গৃহে অতিথিসৎকার তাঁর নিত্যকর্ম্ম। সেইজন্য শোণবর্ষার রাজা তাঁহাকে "মদৎ" পাঠাইতে চাহিলে, তিনি তাহা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহীদের অশিষ্টতা এবং স্বার্থপরতার সীমা ছিল না। স্বয়ং রামশরণ শিবিরে গিয়া বুঝাইলে-সুঝাইলে তাহারা একটু নরম হইতেছিল, কিন্তু ইহা কয়বার সম্ভব? শেষে ফল এই দাঁড়াইল যে, পাটোয়ারি বরাহিলেরা যে কেহ হুকুম তামিল করিতে একবার সে-মুখো হইল, লাঞ্ছনা-অবমাননার ভয়ে সে আর সেদিকে ঘেঁষিতে চায় না।

রামশরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিউশরণ বলিষ্ঠ এবং উদ্ধত যুবক। অহোরাত্র নিকটের ও দূরের পাহাড়জঙ্গলে শিকার খেলিয়া বেড়ানই তাহার প্রধান কাজ। তাহার একটি ছোটখাট শিকারের দলও ছিল এবং মৃগয়াপ্রিয় কোন রাজা কি জমিদারের নিমন্ত্রণ পাইলে শিউশরণ সদলবলে তাহা রক্ষার্থ ছুটিয়া যাইত। ছেলের মেজাজ বাপের অবিদিত ছিল না। সেইজন্য রামশরণ তাঁহার "শিউ"কে রসদসরবরাহের সম্পর্কে আসিতে দেন নাই এবং শিউশরণ সাহেবদের শিকারে যোগ দেয়, এমন ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না।

রামশরণ সিপাহীদের দুর্ব্যবহারের কথা শিউশরণকে জানিতে দেন নাই, কিন্তু তাহাদের বাড়াবাড়িতে ক্রমশ কিছুই আর গোপন রহিল না। বৃদ্ধ জায়গীরদার শ্রান্তক্লান্তদেহে বিশ্রাম করিতে গেলে অপরাহ্নে

শিউশরণ নিজে তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সাহেবের লোক-জনকে মিষ্টকথায় বলিয়া আসিবে যে, তাহারা অতিথি হইয়া কেন সেরূপ অত্যাচার করিতেছে। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। সিপাহীরা বুঝিয়া লইল, বৃদ্ধ নিজে কিছু বলিতে না পারিয়া ছেলেকে পাঠাইয়া তাহাদের অপমান করিতেছে। শিউশরণ বলবান্ হইলেও তরুণ এবং একাকী, তাহারা সংখ্যায় পনরজন। অতএব জায়গীরদারপুত্রকে নিতান্ত অসহায় জানিয়া হাস্যবিদ্রূপ এবং কটূক্তিতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। শিউশরণ যদি বলে, "মু সাম্‌হারকে বাত্‌ বোল্‌না", তাহারা এক-স্বরে দুর্বাক্য বলিয়া তাহার উত্তর দেয়।

পিতার মনে ক্লেশ দিবার ভয়ে শিউশরণ বারংবার উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করিতেছিল। কিন্তু শেষে আর পারিল না। তখন করতলন্যস্ত ক্ষুদ্র বাঁশীতে আওয়াজ দিল। অমনি কোথা হইতে তাহার সশস্ত্র ক্ষুদ্র সেনা বিদ্যুদ্বেগে শিবির আক্রমণ করিল এবং নেতার আদেশ অপেক্ষা না করিয়াই বিচ্ছিন্ন ও অপ্রস্তুত লোকগুলাকে দেখিতে দেখিতে বাঁধিয়া ফেলিল।

শিউশরণ তখন বজ্রগম্ভীরস্বরে দলের সর্দারকে আদেশ দিল যে, বন্দীদের সকলকে ভীমচুল্‌হার নীচে নদীর শীতল খরস্রোতে সমস্ত রাত্রি আগ্রীব ডুবাইয়া রাখে। প্রত্যূষে নিজে দেখিয়া সে যথাবিহিত হুকুম দিবে।

২

গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে শিউশরণ জমাদার ভাইয়াসাহেবের তরফ হইতে এক জরুরি নিমন্ত্রণচিঠি পাইল। প্রভাতে মাবোয়ার শিকারে তাহাকে যোগ না দিলে নহে। লেফ্‌টেনাণ্ট ভোণ্ট গাড়োয়া হইতে ভীমচুল্‌হার পথে কোথাও অপেক্ষা করিবেন, পূর্ব্বে এমন কথা ছিল না। কিন্তু মাবোয়ার একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া কয়দিন লোক-ভীতি জন্মাইতেছে, পুলিশের মুখে এ খবর তাঁহার গোচর হইল। অমনি স্থির হইয়া গেল, পরদিন কোয়েলতীরবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে শিকার খেলিতে হইবে। জমাদার ভাইয়াসাহেব স্বয়ং লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্রোণ্টের সঙ্গে "ভেট্‌ মোলাকাতে"র জন্য গাড়োয়ায় হাজির ছিলেন, একদিনের ভিতর সকল বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিতে তিনি আদিষ্ট হইলেন। কাজেই প্রতিবেশী এবং মৃগয়াভিজ্ঞ শিউশরণকে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

শিকারের খবর আসিলে শিউশরণের কেমন-একটা মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হইত। ভাইয়াসাহেবের চিঠি পাইয়া সে বন্দীদের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। পিতা পাছে আপত্তি করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার অনুমতি না লইয়া অল্পসংখ্যক সঙ্গি-সহ রাত্রেই ঘোটকারোহণে বাহির হইয়া গেল। পথ বড় দুর্গম এবং শ্বাপদ-সঙ্কুল, মশাল জ্বালাইয়া ধীরে ধীরে যাইতে হইল।

এদিকে প্রভাতে রামশরণ অতিথি-শিবিরে গিয়া দেখিলেন, সিপাহীরা কেহ নাই, সাহেবের দ্রব্যাদি তাঁহারই লোকজনের পাহারায় রহিয়াছে। পরে সবিশেষ অবগত হইয়া প্রমাদ গণিলেন এবং স্বয়ং ভীমচুল্‌হার ঘাটে গিয়া বন্দীদের সলিলকারা

হইতে মুক্ত করিলেন। শিউশরণের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সিপাহীরা গলিয়া প্রায় জল হইয়া গিয়াছিল! রামশরণ শেষে অনুরুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার শিউশরণ যেন সাহেবের কাছে কালিকার ঘটনার গল্প না করে। প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি তখনই পুত্রের কাছে অশ্বারোহী রওনা করিলেন।

এই দিনের শিকারে তরুণ শিউশরণের দীর্ঘ-বলিষ্ঠ দেহ এবং তাহার অসামান্য শৌর্য্য-বীর্য্য লেফ্টেনাণ্টসাহেবের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। নদীতীরের পাহাড়জঙ্গল-মধ্যে বন্যশূকর বিস্তর। একটা ভালুক ও গোটাদুই শম্বর হরিণও পাওয়া গেল, কিন্তু বাঘ মিলিল না। সাহেব মৃগয়ালব্ধ পশু-পক্ষীতে খুসী হইয়াই শিবিরে ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে শিউশরণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ক্রোশখানেক দূরে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রটার খবর পাওয়া গিয়াছে। ডোণ্ট এজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু যুবক শিকারীর কথায় অবিশ্বাসের স্থল ছিল না। তখন সঙ্গের লোকজনকে অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া তিনি অগ্রগামী শিউশরণের সঙ্গে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

শিউশরণ ডোণ্টসাহেবকে যেখানে লইয়া গেল, সে অতি ভয়ানক স্থান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলবাহু কোয়েলনদীহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ স্রোতোধারাকে বিভিন্নমুখী এবং তীব্র তেজস্বিনী কলনাদিনীতে পরিণত করিয়াছে। তাহার উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ বন-বিটপিসকল ছায়াবিস্তার করিয়া স্থানটিকে মধ্যাহ্নেও নিশীথবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই অজ্ঞাতপথ তৃণসাবৃত বনের প্রান্তভাগে না গেলে সুপ্ত শার্দ্দূলের সাক্ষাৎ মিলিবে না।

অতি কষ্টে উভয়ে সে পথ উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু নিঃশব্দে নহে। পিচ্ছিল, কোথাও কোথাও সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকার এবং অসম প্রস্তর-কঙ্করময় পথ। দুজনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পদশব্দ গোপন করিতে পারিলেন না। ইহাতে বাঘটা জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং উৎকর্ণ হইয়া শব্দের দিক্ লক্ষ্য করিতেছিল। আততায়িযুগলের সঙ্গে চোখো-চোখি হইবামাত্র এক লম্ফে সে তাহাদের সম্মুখীন হইল।

ভাবিবার, পরামর্শ করিবার সময় ছিল না। ডোণ্টসাহেব অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, পিস্তল উঠাইয়া গুলি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার লাফ দিল এবং দৃতাত্র শিউশরণের মনে হইল, অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল।

পিস্তল ছুড়িয়াই লেফ্টেনাণ্টসাহেব পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, অতএব লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আহত বাঘটাকে আর এক-বার গুলি করিবার সুযোগ ঘটিল। এই-বারকার গুলি তাহার কানে লাগিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন সেই নদীতীরে অপেক্ষা-কৃত উন্মুক্ত বনপথে নরে-ব্যাঘ্রে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে ডোণ্ট-সাহেব মার্জ্জারকবলিতমূষিকবৎ বেদনা-ক্লিষ্ট-বিকটদেহ-শার্দ্দূলমুখে খণ্ডবিখণ্ড হইতে বসিলেন।

শিউশরণ প্রথমেই দেখিল, সহসা অত

নিকটে গুলি করিয়া সাহেব বড় ভুল করিয়া বসিয়াছে। সে-অবস্থায় সে-নিজে মুক্ত-কৃপাণহস্তে শিকারের সম্মুখীন হইতে পারিলে নিমেষমধ্যে এরূপ সঙীন বিপদ্ উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, ডাহিন হস্তে কিরীচ এবং বামে নেপালী ছোরা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সে বাঘকে অমিত-তেজে আক্রমণ করিল। সে অব্যর্থ সন্ধান। চকিতে শিকারের সম্মুখস্থ একটা পদ ছিন্ন হইয়া গেল এবং নেপালী ছোরা তাহার বিশাল উদরগহ্বর বিদীর্ণ করিয়া দিল। ডৌণ্টসাহেবের স্কন্ধে এবং মস্তকে নখদন্তা-ঘাত সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই ব্যাঘ্রের প্রাণ-বায়ু নিঃশেষ হইল।

লেফ্‌টেনাণ্টসাহেব অজস্র শোণিত-পাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, বুঝিলেন, শিউশরণের শার্চ্য এবং ক্ষিপ্রকারিতার গুণেই আজ তাঁহার প্রাণ বাঁচিয়াছে। শিউ-শরণ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলে Thank you বলিয়া তাহার করমর্দ্দন করিতে করিতে সাহেব মূর্চ্ছিত হইলেন।

এমন সময়ে সাহেবের লোকজন আসিয়া পড়িল। সকলের পরামর্শে বিশেষ ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া সেই দিনই চিকিৎসার্থ তাঁহাকে নেমলিগঞ্জ রওনা করা হইল।

৩

পাঁচবৎসর পরে মেজরপদে উন্নীত হইয়া ডৌণ্টসাহেব সিপাহীবিদ্রোহদমন জন্য রোটাসদুর্গে আসিয়াছেন। কোতারসিং পলাতক, কিন্তু তাঁহার প্রধান অনুচরের কেহ কেহ ধরা পড়িয়া বিচারার্থ তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ শিউশরণ সিং সকলের। অগ্রে, ঠাহর করিয়া ডৌণ্ট চিনিতে পারি-লেন এবং তাহার হস্তপদের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহার বিরুদ্ধে বিস্তর প্রমাণ। সাক্ষীরা একবাক্যে বলিতেছে—শিউশরণ আগুনের শিখার মত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া লোকদের উত্তেজিত করিয়াছে এবং কোতারসিংহের সে দক্ষিণবাহুস্বরূপ ছিল। মেজরসাহেব সে সব বিশ্বাস করিলেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু তিনি অধঃস্তন কর্ম্ম-চারীদের বলিলেন যে, শিউশরণ তাঁর পরি-চিত, সম্রান্ত ব্যক্তি। শিউশরণকে খালাস দিয়া তিনি তাহাকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়া-ছিলেন। সে-দলের কাহারও কোন শাস্তি হয় নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

লীলাবসান। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

এই পুস্তকের আকারটি নাটকের মত, অর্থাৎ ইহা কতিপয় অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থকার ইহার নাম নাটক না দিয়া দৃশ্যকাব্য দিয়াছেন। তাহা ভালই হইয়াছে। কারণ, যে সকল বিশেষ গুণ থাকিলে অভিনয়োপযোগী নাটক হয়, ইহাতে সে সকলের অভাব। তবে ইহা কাব্যলক্ষণযুক্ত বটে। লেখক তাঁহার গ্রন্থে একটি কবিত্বময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্রখানি সূর্য্যালোকবিভাসিত নহে, পরন্তু তাহা কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিম্নে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বনভূমির ন্যায় গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন। চিত্রখানি নিখুঁত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকাপুরীর ধ্বংসই এ কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান হইয়াছে, অধর্ম্মের পরাজয়ে পাণ্ডবের ধর্ম্মরাজ্যের সমুত্থান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য সমাপ্ত, এখন তিনি স্বীয় লীলার অবসান করিবেন। কাব্যের প্রথমেই এই সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। জরাব্যাধকর্ত্তৃক শরাহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান হইল, এই গম্ভীর সুরে কাব্যের সমাপ্তি। সমগ্র চিত্রখানির উপর যে মৃত্যুর,—ধ্বংসের একটি করাল ছায়া পড়িয়াছে—ইহাই কবির নিপুণতার পরিচায়ক।

পুস্তকের অঙ্কিত চরিত্রগুলি অতি পুরাতন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বহু কবিকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইলেও, সে গুলির মধ্যে লেখক একটি নবীন প্রাণসঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে মানবীয়তা দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাবী অনর্থের সূচনায় বসুদেব ও দেবকীর কাতরতা, দ্বারকা ছাড়িতে হইবে বলিয়া রেবতী প্রভৃতির দুঃখ, সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের রহস্যময়তায় বলরামের সংশয় প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেবতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণও ব্যথিতচিত্ত, তিনি বলিতেছেন—

> অয়ি শান্তে শ্যামল ধরণি,
> প্রসূনপাদপময়ী, তব প্রান্তভূমে
> বহে উচ্চ ঊর্ম্মিময় ফেনিল সাগর,
> অতি শুভ্র, অতি স্নিগ্ধ, অতি মুখরিত।
> জনাকীর্ণ নগরীর তীব্র কোলাহল,
> প্রাসাদ, বিপণি, হর্ম্ম্য,
> প্রীতিময়ী জননীর প্রিয়সম্ভাষণ,
> পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন—
> প্রেমানন্দ প্রীতিবেরা; এ হেন বন্ধন
> না পারে তেজিতে যদি মানব দুর্ব্বল,
> কেন অনুযোগ, কেন শাস্তি,
> কেন সে বীভৎস ছবি রৌরব নরক?
> উদাত্তসমরবাবে,
> নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের তত্ত্ব ফাল্গুনি অর্জ্জুনে
> যেইজন শিখাইল,
> তার চিত্ত অজেয় তাপসপূর্ণ।

মোটের উপর, কাব্যামোদী পাঠক "লীলাবসান" পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

বিদ্যা এবং জ্ঞান।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

যথার্থ কথা যদি বলিতে হয়, তবে বিদ্যার এই যে মূলমন্ত্র "ভাগ-ভাগ কর, আর জেতো", এটা একপ্রকার ডাকিনীমন্ত্র। উহার সাধনে আপাততঃ জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উল্টাফল ফলে। ঐ রক্তশোষক মন্ত্রের বলে জ্ঞাতব্য সত্যের নানা দিকের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পরের বন্ধন হইতে বিযোজিত হইয়া আস্ত-সত্য শবদেহে পরিণত হয়। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে ফের-আবার সেই সমস্ত নির্জীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়াতাড়া দিয়া একটা সজীব-সত্য গড়িয়া দাঁড়-করানো বিদ্যার ক্ষমতার অসাধ্য হইয়া পড়ে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, মস্তিষ্কবিৎ পণ্ডিতেরা নির্জীব মস্তিষ্কতত্ত্ব জোড়াতাড়া দিয়া জ্ঞানের মর্ম্মস্থানে পৌঁছি-বার সেতুনির্ম্মাণ করিতে এতকাল ধরিয়া এত যে চেষ্টা করিতেছেন, সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি। তবেই হইতেছে যে, বিদ্যার ডাকিনীমন্ত্র একপ্রকার রূপার কাটি, তাহা মারিতে পারে কিন্তু বাঁচাইতে পারে না। সোনার কাটি হ'চ্চে জ্ঞানের যোগমন্ত্র, তাহাই কেবল মৃতশরীরে জীবনসঞ্চার করিতে পারে। আমি এখানে যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহা গোড়া'র জ্ঞান; তা বই, তাহা শাখাজ্ঞানও নহে—শেখাজ্ঞানও নহে।

মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান অমূল্যরত্ন; অথচ মনুষ্য তাহা বিনামূল্যে পাইয়াছে। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যকে আমরা বলি জ্ঞানবান্ জীব। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান বিদ্যার ন্যায় শেখা-জ্ঞান নহে; তাহা একান্তপক্ষেই অশেখা-জ্ঞান। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান যদি বিদ্যা-রূপী হইত, তাহা হইলে শুধুকেবল বিদ্বান্ লোকদিগকেই আমরা বলিতাম জ্ঞানবান্ জীব। কিন্তু করি আমরা কি? আমরা পণ্ডিতমূর্খের প্রভেদের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া পৃথিবীসুদ্ধ সকল মনুষ্যকেই জ্ঞানবান্ জীব বলিয়া অবধারণ করি। ইহাতেই বুঝিতে

পাওয়া যাইতেছে যে, মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান বিদ্যা নহে। বিদ্যা যদি নহে, তবে তাহা পদার্থটা কি? পদার্থটা তাহা যে কি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। মৌমাছি ঐ তো একরত্তি ক্ষুদ্রজীব; তা বলিলে কি হয়—ও একটি মস্ত কারিকর; কিন্তু কারি-করি কাহাকে বলে, তাহা জানে না; জানিবে কেমন করিয়া? যে জানিবে, সে যে ও'র ভিতরে নাই। ও'র ভিতরে চেতনা আছে ভরপূর, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু চেতনা থাকিলে কি হইবে (Sen-sation থাকিলে কি হইবে)? চেতনার মাথার উপরে যে চৈতন্য নাই (Conscious-ness নাই)। মণি আর মাণিক্য কিছু-আর এক নহে। মণি অপেক্ষা মাণিক্যের মূল্য ঢের বেশী। চেতন অপেক্ষা চৈতন্যের মূল্য ঢের বেশী। চেতন দেখে—কিন্তু কি দেখিতেছে তাহাও বলিতে পারে না, কে দেখিতেছে তাহাও বলিতে পারে না। চৈতন্য যেমন দেখে, তেমনি সেই সঙ্গে কি দেখি-তেছে এবং কে দেখিতেছে, তাহা তাহার নিকট অপ্রকাশ থাকে না। চৈতন্য আপনি আপনার সাক্ষী এবং তাহার আয়ত্তের মধ্যে যখন যাহা উপস্থিত হয়, তাহারও সাক্ষী। পশ্বাদি জন্তুর মাথার মণি চেতন; মনুষ্যের মাথার মণি চৈতন্য! মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান যে পদার্থটা কি—এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারা গেল। তাহা চৈতন্য।

চৈতন্যের এক চক্ষু মনশ্চক্ষু। চৈতন্যের তিন চক্ষু—এক চক্ষু মনশ্চক্ষু, আর চক্ষু ধীচক্ষু, মাঝের চক্ষু প্রজ্ঞাচক্ষু। মন বাহিরে-বাহিরে দৌড়ায়—মনশ্চক্ষু বহির্মুখ। বুদ্ধি ভিতরে-ভিতরে চিন্তা করে—ধীচক্ষু অন্তর্মুখ। প্রজ্ঞাচক্ষু ভিতর-বাহির মিলা-ইয়া একীভূত করে, প্রজ্ঞাচক্ষু যোগমুখ অর্থাৎ অন্তর-বাহিরের যোগের প্রতি উন্মুখ। জীবচৈতন্যের প্রজ্ঞাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ মিলিয়া এক অদ্বি-তীয় অখণ্ড মোটসত্য,—সর্ব্বাঙ্গীণ সমগ্র সত্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়।

ফল কথা এই যে, সত্যজ্ঞানই জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞান নহে। সত্যের সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে জ্ঞান জ্ঞানই হইতে পারে না। শরীর যেমন চায় অন্ন, জ্ঞান তেমনি চায় সত্য। শাখাজ্ঞান চায় শাখাসত্য, মোট-জ্ঞান চায় মোটসত্য। জ্যোতির্বিদ্যা চায় জ্যোতিষসত্য, রসায়নবিদ্যা চায় রাসায়নিক সত্য; ডাক্তারিবিদ্যা চায় ডাক্তারিসত্য; কবিরাজিবিদ্যা চায় কবিরাজিসত্য। তেমনি মোটজ্ঞান চায় মোটসত্য। প্রজ্ঞাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে জীবচৈতন্য সর্ব্বাঙ্গীণ সমগ্র সত্যের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে। সমগ্র সত্য কিরূপ সত্য? তাহা কোনোপ্রকার একদিক্-ঘ্যাঁষা ছিন্ন সত্য নহে (Abstract Truth নহে), তাহা বুঝিতেই পারা যাই-তেছে! তাহা শূন্য আকাশ বা শূন্য কাল নহে; তাহা মনের ভাবমাত্র নহে; তাহা অনির্দ্দেশ্য সত্তা বা অন্ধশক্তি নহে। সে যে সত্য সমগ্র সত্য, তাহা সব সত্য একাধারে। প্রবর্দ্ধক কাচের মধ্য দিয়া (Magnifying glassএর মধ্য দিয়া) সূর্য্যরশ্মি একঠাঁই পুঞ্জী-কৃত হইলে, সেই পুঞ্জ রশ্মিপুঞ্জটিতে আমরা যখন দেখি ক্ষিতি-গতি-তেজ-বর্ণ-আলোক

একাধারে কেন্দ্রীভূত, তখন তাহাতে কি প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ঐ যে পাঁচ উপাধি স্থিতি, গতি, তেজ, বর্ণ, আলোক, উহা সমগ্র সূর্য্যমণ্ডলে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত; কেন না, সমগ্র সূর্য্যমণ্ডল সমস্ত সৌরকিরণের মূলাধার। তেমনি আমরা যখন আপনা-আপনাতে দেখি সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য একাধারে কেন্দ্রীভূত, তখন তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ঐ যে পাঁচ মৌলিক উপাধি সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য, উহা সমগ্র সত্যে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। অতএব এটা স্থির যে, সমগ্র সত্যে অটল ধ্রুবসত্তা, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী মহতী শক্তি, জীবন্ত প্রাণ, জাগ্রত চেতন এবং জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত; এক কথায়—সমগ্র সত্য পরমাত্মা স্বয়ং। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মোটজ্ঞান চায় মোটসত্য—সর্ব্বাঙ্গীণ সমগ্র সত্য। এক্ষণে দেখিতেছি যে, সমগ্র সত্য পরমাত্মা স্বয়ং। তবেই হইতেছে যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মা চায় পরমাত্মা; জীবচৈতন্য চায় ব্রহ্মচৈতন্য।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, কোথায় ব্রহ্মচৈতন্যের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মচৈতন্য জলে-স্থলে, আকাশে-অন্তরিক্ষে, অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন তত্রা; কেন না, তিনি সমগ্র সত্য —তিনি সব সত্য।

আমরা যদি একবার আমাদের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ঘূর্ণীর পাকে পড়িলে নৌকা যেমন সুবিস্তীর্ণ পরিধিপথে চক্র দিতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর পরিধিপথে চক্র দিতে দিতে কেন্দ্রস্থানে আসিয়া পড়ে, সৃষ্টির বিকাশ তেমনি গ্রহাদিচক্র ঘুরিয়া জীবচক্রে এবং জীবচক্র ঘুরিয়া মনুষ্যে-মনুষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। সৃষ্টির বিকাশ কিসের বিকাশ? সমগ্র সত্যে যাহা গোড়া হইতেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহারই উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশ। তবেই হইতেছে যে, সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য, এই পাঁচ মৌলিক উপাধি যাহা পরমাত্মাতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, তাহাই তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে, প্রাণের আনন্দে এবং জ্ঞানের নিয়মে দশদিকে উথলিয়া পড়িতেছে। তার সাক্ষী;— গ্রহাদিচক্রে আমরা দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির বিকাশ; উদ্ভিদচক্রে দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির উপরে প্রাণের বিকাশ; জীবচক্রে দেখিতে পাই সত্তা, শক্তি এবং প্রাণের উপরে চেতনের বিকাশ; মনুষ্যে দেখিতে পাই সত্তা, শক্তি, প্রাণ এবং চেতনের উপরে চৈতন্যের বিকাশ। এইরূপ দেখিতেছি যে, সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য, এই পাঁচ মৌলিক উপাধি যাহা সমগ্র সত্যে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহা আকাশের গ্রহাদিচক্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া উদ্ভিদ এবং জীবচক্রের মধ্য দিয়া একে-একে ফুটিয়া সমস্তই মনুষ্যে-মনুষ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-পরিমাণে একত্রে জমাটবদ্ধ হইতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য, সমস্তই মনুষ্যে-মনুষ্যে কেন্দ্রীভূত—যদি-চ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিমাণে। তবেই হইতেছে যে, এক-একটি মনুষ্য এক-একটি ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড, আর, তাহাই পাল্টিয়া বলিলে দাঁড়ায় এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট্ মনুষ্য। অতএব এটা স্থির যে, জীব-

চৈতন্ত যেমন ক্ষুদ্র মনুষ্যের সারসর্ব্বস্ব, ব্রহ্মচৈতন্ত তেমনি বিরাট্ মনুষ্যের সারসর্ব্বস্ব; তৃতীয়, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, জীবচৈতন্ত তেমনি ব্রহ্মচৈতন্তের অন্তর্গত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এক অদ্বিতীয় সমগ্র সত্য হইতে—ব্রহ্মচৈতন্ত হইতে—জীবচৈতন্ত কোনোকালে পৃথক্কৃত হয় নাই; কেন না, তাঁহা হইতে পৃথক্কৃত হওয়ার নামই বিনাশ পাওয়া। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক জীবচৈতন্তের অন্তঃকরণে, যেন সে মূল হইতে পৃথক্কৃত, এইরূপ একটা অন্ধতা লাগিয়া রহিয়াছে, আর, সেই অন্ধতাশক্তিকে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া-কাঁদিয়া সারা হইতেছে। মাতা যখন ক্রোড়স্থ শিশুকে ক্রোড় হইতে নাবাইয়া কপাটের আড়ালে লুকাইয়া থাকেন, তখন শিশুটি "মাতা এখানে নাই" মনে করিয়া ঘুর্কি খাইতে বসিয়া যায়। ঘুর্কির নেশা আবাদনে ভুলিয়া প্রথম-প্রথম বেশ্ সে ঠাণ্ডা থাকে। কিছুকাল পরেই মাতার জন্ত তাহার প্রাণে অভাববোধ জাগিয়া উঠে, আর অমি সে কাঁদিয়া ওঠে। মাতা তখন ঘোমটায় মুখ ঢাকা দিয়া শিশুটির সাম্নে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখা'ন। শিশুটি তখন মাতার হাতপা জড়াইয়া-ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্ত কাঁদিতে থাকে। মাতা যেই তাহাকে ক্রোড়ে ল'ন, শিশুটি সেই অমি মাতার মুখদর্শনের জন্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহার মুখ হইতে ঘোমটা সরাইয়া ফ্যালে; তখন মাতা পুনঃপুন শিশুটির মুখচুম্বন করেন। শিশু যেমন মাতা'কে চায়, মাতাও তেমনি শিশুকে চা'ন; শ্রোতৃমণ্ডলী যেমন গায়ককে চা'ন, গায়কও তেমনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে চা'ন। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মাকে চায়, পরমাত্মাও তেমনি জীবাত্মাকে চা'ন। পরমাত্মা তাই এক শক্তিদ্বারা জীবাত্মাকে আপনা হইতে পৃথক্ মনে করাইয়া তাহার দর্শনক্ষুধা জাগাইয়া তোলেন, আর-এক শক্তিদ্বারা সেই ক্ষুধার অন্ন হইয়া জীবাত্মার নিকটে প্রকাশিত হ'ন।

অতএব জীবচৈতন্ত যে আপনাকে ব্রহ্মচৈতন্ত হইতে পৃথক্কৃত মনে করে, তাহা তাহার মনে করিবারই কথা; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রহ্মচৈতন্তের একতাসূত্রে সমস্ত জীবচৈতন্তের পরস্পরের প্রতি, সর্ব্বভূতের প্রতি এবং সর্ব্বমূলাধার ব্রহ্মচৈতন্তের প্রতি প্রাণের টান রহিয়াছে মর্ম্মে-মর্ম্মে নিগূঢ়। সেই প্রাণের টান যোগের প্রবর্ত্তক। কিন্তু অশ্বারোহীর হস্তে চাবুকও চাই, রাশও চাই; অশ্বের প্রবর্ত্তকও চাই, নিয়ামকও চাই। যোগের প্রবর্ত্তক যেমন প্রাণের টান, যোগের নিয়ামক তেমনি জ্ঞানের অধ্যক্ষতা। ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের প্রথম যোগ হ'চ্চে শরীরবন্ধন; দ্বিতীয় যোগ হ'চ্চে বিবাহবন্ধন; তৃতীয় যোগ কুলবন্ধন; চতুর্থ যোগ সমাজবন্ধন; পঞ্চম যোগ ধর্ম্মবন্ধন; ষষ্ঠ যোগ ব্রহ্মচৈতন্তের সহিত জীবচৈতন্তের ঐক্যবন্ধন। এই সমস্ত যোগের ব্যাপার'কে যদি জ্ঞানদ্বারা নিয়মিত না করিয়া আপাতদর্শী বুদ্ধিবিভার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হয়। আনাড়ি বুদ্ধি "যোগের বন্ধন খুব শক্ত করিয়া আঁটিতেছি" মনে করিয়া অন্তঃপ্রাণের বদ্ধি-চ[illegible] করে না একটুও;

কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা—হইয়া দাঁড়ায় তাহা বজ্র-আঁটুনির ফস্কা গেরো। আপাত-দর্শী বুদ্ধির কর্ত্তাগিরির উপদ্রবে একদিকে যে-পরিমাণে রাজভোগের পারিপাট্যে শরীরে মেদমাংস ঘনীভূত হইতে থাকে, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে অস্থিমাংসের সহিত প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতে থাকে। একদিকে যে-পরিমাণে দাম্পত্যবন্ধনের আঁটা-আঁটি হয়, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে ভ্রাতৃস্নেহের বন্ধন আল্গিয়া যায়। একদিকে যে-পরিমাণে কুলবন্ধনের আঁটাআঁটি-গতিকে কৌলীন্যমর্য্যাদা দম্ভে স্ফীত হইয়া ওঠে, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে উচ্চনীচ শ্রেণীর পরস্পরের সৌহার্দ্দবিনিময়ের পথে কাঁটা পড়িয়া যায়। একদিকে যে-পরিমাণে সমাজ-বন্ধনের আঁটাআঁটি-গতিকে লোকাচারকে মাথা'র উপরে চড়াইয়া দেওয়া হয়, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। একদিকে যে-পরিমাণে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবন্ধনের আঁটাআঁটি-গতিকে গোঁড়ামি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে সাধারণত মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের ভদ্রব্যবহারের পথে কাঁটা পড়িয়া যায়। এইজন্য বলি যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের নৌকার হাল্ আনাড়ি মাঝির হস্তে সঁপিয়া না দিয়া জ্ঞান'কে কাণ্ডারীপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; কেন না, দুই দুই পথের দুই-দুই আতিশয্যের (রাগাতিশয্যের এবং ত্যাগাতিশয্যের) মধ্যের পথ দিয়া নৌকা চালাইয়া সর্ব্বপ্রকার যোগের সহিত যোগ-রক্ষা করা জ্ঞানেরই কাজ। সত্যদর্শী জ্ঞানের কার্য্য আপাতদর্শী বিদ্যাবুদ্ধিকে দিয়া সস্তা-মূল্যে করাইয়া লইতে গেলে কাজেই উল্টা-ফল ফলে। জ্ঞানকে যদি মন-অশ্বে আরোহণ করানো যায়, তাহা হইলে জ্ঞানতুরঙ্গী মন-অশ্বের স্ফূর্ত্তি এবং সংযম দুয়েরই প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া রাশ এমনি ঠিক্‌ঠাকিক বাগাইয়া ধরে যে, ঘোড়া'র চলন এবং সোয়ারের চালন একতানে মিলিয়া-গিয়া দেখিতে দেখায় যেন ঘোড়া এবং ঘোড়সোয়ার দুয়ে এক, একে দুই। তাহার পরিবর্ত্তে যদি আপাতদর্শী বুদ্ধিকে মন-অশ্বে আরোহণ করানো যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি রাশ টানিয়া ধরিবার সময় এমনি বলপূর্ব্বক টানিয়া ধরে যে, ঘোড়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া পা-ছোঁড়া-ছুঁড়ি করিতে আরম্ভ করে; তেমনি আবার রাশ আল্‌গা দিবার সময় এত আল্‌গা দ্যায় যে, ঘোড়া উন্মত্তবেগে যেখানে-সেখানে ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। অহঙ্কারে-ভরা বুদ্ধি আপনার গোঁ ছাড়ে না, আর, মনের গায়ে বুদ্ধির সেই অহঙ্কারের বাতাস লাগিয়া মনও আপনার গোঁ ছাড়ে না। পক্ষান্তরে, মনের সোয়ার যেমন পরিশুদ্ধ জ্ঞান, জ্ঞানের সোয়ার তেমনি সত্য; জ্ঞান সত্যের বাগ মানে, তাই মনের গায়ে জ্ঞানের সেই সুবিনীতভাবের বাতাস লাগিয়া মনও জ্ঞানের বাগ মানে। বুদ্ধির প্রধান একটি দোষ অহঙ্কার। বুদ্ধি তাই আপনাকে জানে বুদ্ধিমান্—মনকে জানে উন্মাদ; আর সেইরূপ বোধের বশবর্ত্তী হইয়া মনের উপরে কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে যায়। মানিলাম মন ক্ষিপ্ত, মন উন্মাদ; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, মনকে পাগ্‌লাগারদে পুরিয়া তাহার উন্মাদরোগ'কে রীতিমত পাকাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার

কোনো অর্থ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, ঠিক্ একটা মাঝের পথ আছে—তাহা বিদ্যা-বুদ্ধির কঠিন ব্যবস্থাবন্ধনের পথও নহে, আর, মনের অসংযত স্ফূর্ত্তির পথও নহে। মাঝের চক্ষু সেই মাঝের পথ দেখাইয়া দায়। মাঝের চক্ষু যে কোন্ চক্ষু, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বলিয়াছি যে, জীবচৈতন্যের এক চক্ষু মনশ্চক্ষু—তাহা বহির্ম্মুখ; আর চক্ষু ধীচক্ষু—তাহা অন্তর্ম্মুখ; মাঝের চক্ষু প্রজ্ঞাচক্ষু—তাহা যোগমুখ অর্থাৎ অন্তর-বাহিরের যোগের প্রতি উন্মুখ। এই মাঝের চক্ষুই মাঝের পথ দেখাইয়া দায়। এ তো জানাই আছে যে, সেতারের তার বেশী আঁটিয়া বাঁধিলেও ঠিক্ সুর বাহির হয় না—কম আঁটিয়া বাঁধিলেও ঠিক্ সুর বাহির হয় না। সুর বাঁধিবার সময় সেতারের কান ক'-ফের মুচ্ড়াইতে হইবে—বাদকের কানই তাহা বলিয়া দিতে পারে, তা বই, সঙ্গীতের ব্যাকরণ তাহা বলিয়া দিতে পারে না। তেমনি বিভিন্ন ধাপের বিভিন্নপ্রকার যোগ কতটা চড়া বা নরম সুরে বাঁধিলে ঠিক্ হয়, তাহার মাত্রানির্দ্ধারণ করিয়া দিবা'র কর্ত্তা সাধকের অন্তরাত্মা; তা ভিন্ন, আর-কাহারো সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ফল কথা এই যে, মনুষ্যের প্রাণের গভীরে ব্রহ্মচৈতন্যের আলোক ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় সঙ্গোপিত রহিয়াছে; সেই প্রাণের আলোক যখন সুষুপ্তিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, তখন তাহারই নাম জ্ঞানের প্রকাশ বা চৈতন্যের উদয়; আর সেই চৈতন্যের উদয়ই বিভ্রান্ত পথিককে সেই মধ্যের পথ দেখাইয়া দায়,—যেখানে নানা পথের নানা ফাঁক্ড়া-যোগ ঐকতানিক যোগে সম্মিলিত। এইরূপ ঐকতানিক যোগ ভিন্ন-ভিন্ন নানা যোগের মধ্যের পথ দিয়া নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় পরিপূর্ণ সত্যে ঠাকে—ব্রহ্মচৈতন্যে ঠাকে। শাস্ত্রেও লেখা আছে—

> যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
> যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

দুঃখবিনাশক যোগ তাঁহারি হয়, যাঁহার আহারবিহার, কর্ম্মচেষ্টা এবং নিদ্রাজাগরণ, সমস্তই যোগসঙ্গত।

সকল দেশেরই শাস্ত্রে আবহমানকাল হইতে এই একটি কথা খাদের সুরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে যে, অন্তরাত্মার গভীরতম আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবার মতো সার-সত্য বিদ্যাবুদ্ধির বলে পাওয়া যাইতে পারে না; তাহা পাইতে হইলে তাহার প্রধান উপায় চিত্তশুদ্ধি। আমাদের দেশের ব্রহ্ম-জ্ঞানশাস্ত্রের গোড়াতেই রহিয়াছে যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানে সাধকের অধিকারই জন্মিতে পারে না। জগৎপূজ্য মহাপুরুষ ঈশা বলিয়াছেন যে, শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিরাই ধন্য, কেন না, তাঁহারা পরমাত্মার দর্শন পাইবেন। আরো তিনি বলিয়াছেন এই যে, যাঁহার চিত্ত বালকের ন্যায় নির্ম্মল, স্বর্গরাজ্যে তাঁহারই অধিকার। বেদে আছে—"পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেনাম্ভিষ্ঠেৎ"—পাণ্ডিত্য ঝাড়িয়া-ফেলিয়া বালকের ন্যায় হইবে। যোগশাস্ত্রে আছে, সত্ত্বগুণের উদ্রেকে সাধকের চিত্ত স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হইলে তাহাতেই প্রকৃত সত্যের ছাপ পড়ে।

এই গুরুতর বিষয়টি বাহুল্যরূপে উপদেশ

দিবা'র আমার অধিকারও নাই—ক্ষমতাও নাই। এইজন্য, চিত্তশুদ্ধির আদর্শ আমার যাহা মনে হয় পরম উৎকৃষ্ট, তাহাই সংক্ষেপে আপনাদের জ্ঞানগোচর করিয়া আজিকার মতো আপনাদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

স্বচ্ছ জলাশয়ের ন্যায় ভিতর-বাহির এক হওয়াই আমার মনে হয় চিত্তশুদ্ধির প্রধান আদর্শ; আর সেই সঙ্গে আমার মনে হয় যে, পারমার্থ্যধ্যান চিত্তশুদ্ধির পরম সহায়। কেন না, সাধকের অন্তরের ধ্যানের আলোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জাগ্রত আলোকের সহিত একতানে মিলিত হইলে অন্তর-বাহিরের একত্বের সীধা পথ প্রমুক্ত হইয়া যাইতে পারে। আর, সকল শাস্ত্রই এ বিষয়ে একবাক্য যে, সাধকের অন্তর-বাহির এক হইলেই—প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া, এবং মুখের চাওয়া এক হইলেই—অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ ব্যাপিয়া এক সত্য প্রকাশমান হয়—ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়, সদানন্দ বিরাজমান হয়, সমস্ত ক্ষোভ মিটিয়া যায়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সদ্ভাবের অন্তরায়।

হিন্দুমুসলমানে সদ্ভাবস্থাপন—আজকাল আমাদের প্রায় সকল সর্ব্বজনীন সদনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হইয়াছে; দশে মিলিয়া দেশের কাজে রত হইতে হইলেই কতকটা শক্তি এই দিকে ব্যয়িত করিতে হয়। বর্ত্তমান স্বদেশীব্রতের উদ্‌যাপনসময়েও উদ্যমের কিয়দংশ এই দিকে নিয়োজিত রাখিতে হইয়াছে। কেন—তাহা ভাবিবার বিষয়।

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এদেশে বহুকালাবধি অপূর্ব্ব সৌহার্দ্দ বিদ্যমান রহিয়াছে।"* শুধু সৌহার্দ্দ কেন? দীর্ঘকালব্যাপী সংস্রবসম্পর্কের ফলে এই দুই জাতির প্রকৃতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মগত বৈলক্ষণ্যের মধ্য হইতে এরূপ একটি সাম্য ও সামঞ্জস্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা আবশ্যকমত দুইকে সর্ব্বতোভাবে এক করিয়া ফেলিয়াছে—এই সামঞ্জস্যের নিকট হিন্দুর হিন্দুত্ব স্বাধ্যায়রূপে কতকটা পরাজয় মানিয়াছে, মুসলমানের মুসলমানত্বও আপনাকে প্রয়োজনানুরূপ অবস্থান্তরিত করিয়া লইয়াছে। "হিন্দু ও মুসলমানের সমাজের মধ্যে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল। কবীরপন্থী, নানকপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এখনও ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।" + বস্তুত এই দুই সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থার

* "বঙ্গদেশের স্বদেশ ব্যবস্থা।"

\+ "স্বদেশী সমাজ।"

সাম্য ও সম্পর্কমূলক সদ্ভাবের অভাব নাই।

অপেক্ষাকৃত শক্তিহীনের উপর বলবত্তরের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা নিতান্তই স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থায় বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত হইয়া তদানীন্তন রাজশক্তিকে হীন করিয়া তুলিলেই ভারতরাজলক্ষ্মী অধিকতর শক্তিসম্পন্ন মুসলমানের আশ্রয়গামিনী হইয়াছিলেন, এই স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য হিন্দু সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল—তাই আপনার চিরগৌরবময় সিংহাসনে মুসলমানশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া,—বিজয়ীর বিজয়মণ্ডিত মুকুটে অভিষেকমাল্য পরাইয়া হিন্দু কখন আপনাকে ক্ষুণ্ণ বিবেচনা করে নাই। যাহাতে মুসলমান-রাজশক্তি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ও থাকিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে মুসলমানের সহিত হিন্দুও যথাসাধ্য আপনার শক্তিব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হিন্দুমুসলমান একই রণপতাকার নিম্নে অবস্থান করিয়া হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে রাজশত্রুর প্রতিকূলে অস্ত্রচালনা করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। হিন্দু, মুসলমানের হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, এরূপ ঘটনারও অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোগলশক্তির সহায়তায় রাজপুতের বিরুদ্ধে রাজপুতের অসিচালনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যায়, ভারতে মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের কতটা ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই একত্রাবস্থানজনিত অবশ্যম্ভাবী ঘনিষ্ঠতা উভয়ের মধ্যে ক্ষীণাদপি ক্ষীণ পার্থক্যের রেখাও মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে কি রাজ্যশাসনের মন্ত্রণাকার্য্যে, কি দেশজয় ও রাজ্যরক্ষার যুদ্ধব্যাপারে, সর্ব্বত্রই একযোগে নিযোজিত রাখিয়াছিল।

ভারতে হিন্দুশক্তির সহিত মুসলমানশক্তির অসদ্ভাবমূলক কোন সর্ব্বনাশকারী সংঘর্ষ কখন সংঘটিত হয় নাই। হিন্দুমুসলমানে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহের কথা ইতিহাস বিবৃত করে, তাহা রাজশক্তিলাভক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতামাত্র। রাজকীয়ক্ষমতালাভের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই রাজপুত ও মারাঠা শক্তির সহিত মুসলমানশক্তির সংঘাত ঘটাইয়াছিল,—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও সমতার অভাব ছিল বলিয়া নহে। রাজশক্তি করকবলিত করিতে মুসলমানের সহিত মুসলমানের সংঘর্ষ যেমন ঘটিতে পারে, হিন্দুর সহিত হিন্দুর সংঘর্ষ যেমন সম্ভবপর, তেমনি মুসলমানের সহিত হিন্দুর সংঘর্ষ কোন অংশেই বিচিত্র বিবেচিত হইতে পারে না। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দি—রাঠোররাজ জয়চন্দ্রের সহিত চৌহান পৃথ্বীরাজের যে সর্ব্বনাশকারী সমর হিন্দুশক্তির হীনতা সাধিত করিয়া ভারতে মুসলমানক্ষমতাস্থাপনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল, তাহা কি হিন্দুত্বের উপর হিন্দুত্বের বিদ্বেষপ্রসূত? পক্ষান্তরে, মোসলেমশক্তিকেন্দ্র আরবতুরস্কের কথা দূরে থাক্—এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সহিত মুসলমানের সংঘাতদৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। শেরশূরের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মোগলসম্রাট্ হুমায়ুনকে পথে পথে ফিরিতে হইয়াছিল—সেটা কি মুসলমানের উপর মুসলমানের

বিদ্বেষের ফলে, না এক রাজশক্তির উপর অন্য রাজশক্তির প্রভুত্বস্থাপনের চেষ্টায়? স্বভাবত রাষ্ট্রীয়শান্তিপ্রিয় আকবরকেও আহম্মদনগরের বীররমণী চাঁদস্থলতানার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে হইয়াছিল কেন? মুসলমানপুঙ্গব সম্রাট্ আওরঙ্গজিব, মুসলমান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া কি মুসলমানের সহিত মুসলমানের অসদ্ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, না মোগলের রাজকীয় গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছিল? ফলত রাজা বা রাজশক্তিলাভের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা স্বজাতিগত বা বিজাতিগত সাম্য-বৈলক্ষণ্যের বিচার করিয়া অসিগ্রহণ করে না। তাই, ভারতে হিন্দুমুসলমানের যে সকল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহা মুসলমানদের উপর হিন্দুদের আক্রমণ নহে —তদানীন্তন রাজশক্তিহস্তান্তরকরণের প্রয়াসমাত্র। রাজশক্তি তখন মুসলমানের হস্তে ন্যস্ত ছিল বলিয়াই হিন্দুকে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—অন্যথা হিন্দুর সহিত হিন্দুর সংঘর্ষের কথাই শুনা যাইত। বস্তুত, বিগ্রহধর্মের যে নীতি মুসলমান শেরশাহকে মুসলমান হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রণোদিত করিতে পারে, রাজপুত ও মারাঠাশক্তি সেই নীতির অনুসরণ করিয়া মুসলমানশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে তাহা কখন বিজাতিবিদ্বেষের দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ভারতে মুসলমানভাগ্যবিপর্য্যয়ের শেষ দৃষ্টান্ত হইতেও হিন্দুমুসলমানের সমপ্রাণতা ও একযোগ কার্য্যকারিতার বেশ একটা (মর্ম্মস্পর্শী!) স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর সহিত আপনার শক্তি মিলিত করিয়া, রাজকার্য্যে হিন্দুর আন্তরিক সহায়তা লাভ করিয়া, যে মুসলমান ভারতে আপনার রাজকীয় মহিমা পর্ব্বতপ্রমাণ উন্নত করিয়াছিল, নিদারুণ অধঃপতনের সময়েও মুসলমান সেই হিন্দুসংযোগী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই। তাই ভ্রান্তমতি মিরজাফর যখন সিরাজের মস্তক হইতে মুকুট কাড়িয়া লইয়া ইংরাজের শিরে পরাইবার উপক্রম করিল, তখনও সে তাহারই মত কুহকমুগ্ধ কতকগুলি হিন্দুপ্রধানের সহায়তা গ্রহণ করিতে অবহেলা করে নাই। পক্ষান্তরে, প্রভুভক্ত হিন্দুশক্তি মোহনলাল ও মিরমদনপ্রমুখ বিশ্বস্ত বীরের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক মোস্লেমপ্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। হিন্দুমুসলমানের একযোগ সহায়তা গ্রহণ করিয়াই ইংরাজ হিন্দুমুসলমানের প্রভু হইতে পারিয়াছেন, তাই ভারতের তাজ আজ—মুসলমানেরও নয়, হিন্দুরও নয়—ইংরাজের শির শোভিত করিতেছে। হিন্দুমুসলমান উভয়েরই এইরূপে মতিচ্ছন্ন না হইলে আজ ভারতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত না, কে বলিতে পারে?

বিজিত ও বিজেতার মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংস্থাপিত না হইলে, বিজয়ী শক্তি যতই বিপুল হউক্ না, রাজধর্ম্ম কখন তাহাকে দীর্ঘকালের জন্য কোথাও প্রতিষ্ঠান্বিত থাকিতে দেয় না। মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে রাজাপ্রজাসম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর যদি ক্রমে তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও

অনুরক্ত না হইত, তাহা হইলে মুসলমান আপনাকে ভারতীয় রাজতন্ত্রে এতদিন অতিরিক্ত রাখিতে পারিত কি না, সন্দেহ। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সাম্যের জন্ত বস্তুতই কোন নূতন সরঞ্জাম করিতে হইবে না।

হিন্দুমুসলমানে সদ্ভাব সংস্থাপিত করিতে হইবে—উদ্দেশ্যটা যতই সাধু ও সরল হউক না কেন, যে পক্ষ হইতে প্রথম এই সুরটা তোলা হয়, তাহাকে কখনই ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বোধ হয় না—আমাদের মনে হয়, আমাদের ক্ষতি সাধিতেই কোন শত্রুপক্ষ আমাদের মধ্যে এইরূপ ধুয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। সদ্ভাবের অভাব ঘটিলেই সদ্ভাবস্থাপন আবশ্যক হইয়া পড়ে—সদ্ভাব যেখানে স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে সদ্ভাবস্থাপনচেষ্টার সার্থকতা নাই। কোন সৌম্য-শান্ত নির্ব্বিঘ্ন-নিশ্চিন্ত পল্লির মধ্যে, কোথাও কিছু নাই, যদি হঠাৎ শান্তিরক্ষার ঘটা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সেই পল্লিবাসিগণের মনে কল্পিত আশঙ্কা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া যেমন তথায় একটা উগ্র অশান্তি ও বৈষম্য উৎপাদন করে, সেইরূপ আবহমানকাল হইতে প্রীতিবদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতিস্থাপনের চেষ্টাও তাহাদিগের মধ্যে প্রীতির অমূলক অভাবজ্ঞান উৎপাদিত করিয়া তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তোলে, ইহা বিচিত্র নহে। অক্ষত অঙ্গে প্রশমন-প্রলেপের আয়োজনে শরীরধর্ম্ম স্বভাবতই আপনার ব্যাধিহীনতায় সন্দিহান হইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয়, হিন্দুমুসলমানে প্রীতিস্থাপনের এই চীৎকারও সম্পর্কিত সমাজদ্বয়ের ভিতর একটা অশান্তির ভাব আনয়ন করিয়াছে। রাজশক্তি তৃতীয়হস্তে না থাকিলে অবস্থা ভিন্নমূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু যে সময়ে হিন্দুমুসলমান তুল্যরূপে একই বিজাতীয় শাসনচক্রের আবর্ত্তনবিবর্ত্তনের মধ্যে পতিত, সেই সময়ে এই প্রীতিস্থাপনের প্রয়াসে অপেক্ষাকৃত শক্তিসম্পন্ন প্রজা হীনবল অপর প্রজাটির প্রতি আপনার সঙ্গত যথাযথ ব্যবহারে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। (বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যা, বুদ্ধি, চিত্ত, সর্ব্ববিষয়েই হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে বোধ হয় দ্বিমত নাই।) তাই, যেমনি এই উভয়ের মধ্যে কল্পিত অপ্রিয় ব্যবহারের প্রতিকারপন্থা পরিগৃহীত হইল, অমনি অপেক্ষাকৃত উন্নত হিন্দু মনে করিল, সে হয় ত হীনবল মুসলমানের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। লুপ্তবিবেক মুসলমান ভাবিল, তবে বাস্তবিকই হিন্দু তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে—নচেৎ প্রতিকারের চেষ্টা আবশ্যক হইল কেন? ফলে ইহাই হইয়াছে যে, শিক্ষা-মহীয়ান্ উদীয়মান সমাজটি কিছু-বা লজ্জিত কিছু-বা অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যদ্ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক যতই চিত্ত ও বিদ্যাবলহীন অন্য সম্প্রদায়টিকে আপনার প্রীতিপ্রসারিত বাহুদ্বয়ে বেষ্টিত করিতে যাইতেছে, ততই সে আপনার বিবেকহীনতার ফলে আপনাকে দূরে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছে—নিয়তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে অধুনা তাহার ভাগ্য যে উহার সহিত একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ, উহা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা যে নিতান্তই অসম্ভব, এ কথা উপলব্ধি করিবার হৃদয় তাহার নাই। আশা এই যে, রাজদ্বারে

তাহার জন্ত বিশিষ্টভাবে ভিক্ষাদানের বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু একবার নয়, বারবার যে সে আপনার বর্ত্তমান ভাগ্যদেবতার দ্বার হইতে শূন্ত ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার মজ্জাগত জড়তা এ কথা তাহাকে আদৌ স্মরণ করাইতে পারিতেছে না। সুশিক্ষার অরুণকিরণ যতদিন না এই জড়তার আবেশ ভাঙ্গিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত মুসলমানের চেতনা হইবে না।

সুতরাং হিন্দুমুসলমানে প্রীতিস্থাপনপ্রয়াস অন্তমুখ হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করিলেই আশানুযায়ী ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

রাজশক্তি মুসলমানহস্তচ্যুত হইলে নূতন অভ্যাগতের কুহকমন্ত্রে হিন্দু যেমন আপনাকে ভুলিয়াছিল, তেমনি সে মুসলমানের দিকেও লক্ষ্য করিতে পারে নাই—এ কথা সুধী হিন্দুও অস্বীকার করিবে না। যুগপৎ রাজশক্তি ও হিন্দুর সহায়তা হারাইয়া মুসলমানকে একেবারেই অবসন্ন ও হীনবল হইতে হইয়াছে। এখন মোহ কাটিয়া হিন্দুর চক্ষু ফুটিয়াছে, তাই আত্মশক্তির পুনর্বিকাশের পথে স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে—কিন্তু এদিকেও জঞ্জাল বাধিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, কোন প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষার চেষ্টায় এক হাত উঠে, অন্তটি উঠিতে পারে না;—সেটা যেন শিথিলতা ও জড়তায় অবসন্ন—এই ব্যাধির চিকিৎসা আবশ্যক। রীতিমত শিক্ষাবল না পাইলে মুসলমান কখন হিন্দুর সহিত আত্মোন্নতি-উদ্যমে যোগদান করিতে পারিবে না। হিন্দুমুসলমানে প্রীতিস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আগ্রহের কতকটা এইদিকে পরিচালিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। দুইটা হাতই সবল থাকিলে হনন ও রক্ষণ উভয় কাজই চলিতে পারে, কিন্তু একটি বলহীন হইলেই, হনন ত সম্ভবপর হয় না, রক্ষণও দুরূহ হইয়া পড়ে।

বাঙালী বিভক্ত হইল অর্থাৎ বাঙালীকে ভাগ করা হইল—অন্ত কথায়, হিন্দু হইতে মুসলমান এবং মুসলমান হইতে হিন্দু কতকটা বিচ্ছিন্ন হইল—একের উন্নতি অন্তের উদ্যম-অনুশীলনের বিষয়ীভূত রহিল না একের অবনতিতে অন্তের শক্তি ব্যয়িত করিবার আবশ্যকতা ঘুচিয়া গেল—সমগ্র বাঙালীর সমস্ত হিন্দুমুসলমান লইয়া একটা বাঙালীজাতি-(Bengalee Nation)-গঠনের সম্ভাবনা রহিল না। এখন সম্ভব হয়, নূতন ব্যবস্থায়, নূতন ধরণে, হিন্দু, তুমি আপনাকে একটা স্বতন্ত্র জাতি-(Nation)-রূপে পরিণত কর—আর মুসলমান, তুমিও তোমার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে জাতীয়তাসৃষ্টির সরঞ্জাম করিতে থাক। সোজা ও সরল কথায় এই ব্যবচ্ছেদের বন্দোবস্ত এইরূপ। এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এমন সোজা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র প্রতিবাদ উঠিল কেন? হিন্দু বাঙালী বুঝিল, মুসলমান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশীল হইবার যে কল্পনা, তাহা নিতান্তই অসার ও ভিত্তিশূন্ত—সহস্রাধিকবর্ষব্যাপী সংস্রব ও সম্পর্কজনিত সাম্যের সূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া একেবারে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। মুসলমানের

মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত বা অন্যবিধ উপায়ে কতকটা প্রকৃতিস্থ, তাঁহারাও বুঝিলেন, এরূপ পার্থক্যের রেখা টানিয়া আলাহিদা থাকা তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বা প্রশস্ত নহে, বরঞ্চ ইহা মুসলমানের পক্ষেই বিশিষ্টরূপে অনিষ্টকর। সরকারবাহাদুর কিন্তু বরাবরই ইহার উল্টা বুঝিতেছেন ও বলিতেছেন—(সরকারী হিসাবে) হিন্দুও অবুঝ, মুসলমান ত (অশিক্ষিত, সুতরাং) অজ্ঞ আছেই।

যাহা হউক, অবুঝ হিন্দুমুসলমান বুঝিল না, তাই বাঙালী বিভক্ত হইলেও যাহাতে তাহাদের মধ্যে কোন অমিল না ঘটে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে সাম্যশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া কলহবিবাদের অবতারণা না করে, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায় ও পন্থা উদ্ভাবিত হইতেছে। গত অগ্রহায়ণসংখ্যার বঙ্গদর্শনে "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা"র প্রবন্ধের লেখক "হিন্দুমুসলমানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধাইবার আয়োজনের" প্রতিবিধানকল্পে কয়েকটি সুচিন্তাপ্রসূত অবলম্বনীয় ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যবস্থাগুলি প্রবীণ লেখকের পরিপক্ক বুদ্ধির উপযুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপায়গুলি অবলম্বিত হইবার পথে শিক্ষিত ব্যক্তিকেই উপলব্ধি করিতে হয়। লেখক বলিতেছেন, "হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইবার এক সূত্র সরকারী চাকুরী" —"কুক্কুরপরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট মাংসখণ্ড"-জ্ঞানে "ইংরেজের উচ্ছিষ্ট সামান্য রাজকর্ম্মলাভের লোভকে" ঘৃণা করিতে হইবে। কথাটা প্রবীণতাজনিত সুবুদ্ধির পরিচায়কই বটে। কিন্তু মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে কখন এই উপায় ফলপ্রদ হইতে পারে না। চাকুরীর লোভেই হউক বা যেজন্যই হউক, বিদ্যার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হইয়া হিন্দু যতটুকু শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে অন্তত তাহার এই জ্ঞানটুকু জন্মিয়াছে যে, ডিগ্রিলাভ করিলেই চাকুরীলাভ ঘটে না— ভারতে ইংরাজের রাজত্বে ইংরাজী বিদ্যা মাত্রই অর্থকরী নহে, সে বিদ্যারও ভিন্ন ভিন্ন আকার আছে। তাই হয় ত এখন শিক্ষিতবহুল হিন্দুসমাজ সরকারী চাকুরীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। মুসলমানের মধ্যেও যখন শিক্ষা সম্যক্ প্রসরলাভ করিবে— যখন মুসলমান বুঝিবে, বি.-এ. পাস্ করিলেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া যায় না— যখন ৩০টাকা বেতনের কোন রাজকর্ম্মে শতজন এম্.-এ. হিন্দুর সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশজন মুসলমান এম্.-এ.-রও আবেদন পড়িবে, তখন আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না—তখন মুসলমানের লোলুপদৃষ্টি আপনা হইতেই সরকারী চাকুরীর দিক্ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্যত্র পতিত হইবে। এখন যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতমুসলমান রাজকার্য্যপ্রাপ্তির প্রলোভনে মুগ্ধ হয়, সেটা অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নহে।

উক্ত প্রবন্ধের লেখকের মতে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাধিবার অপর সূত্র :—"সরকারী অবৈতনিক সম্মানার্হ পদ ও খ্যাতি"। অতএব "রাজার্ষি খেলাতখেতাব আমরা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিব"। এই সূত্রে হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিশেষ কোন বিবাদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না, তাহার কারণ আছে। এখনও আমা-

...র দেশে রাজতহবিলে টাকার প্রবাহ না থাকিলে রাজখেতাব পাইবার সম্ভাবনা খুব কম—মুসলমানের অর্থাভাব তাহাকে হিন্দুর সহিত এ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইতে দিবে না। তা ছাড়া, রাজসম্মানলাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতি সংকীর্ণসীমায় আবদ্ধ থাকে, তাহাতে সাধারণের মধ্যে কলহ বা মনোমালিন্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে দুইচারিজন লোক রাজ-খেতাবের জন্য লালায়িত হন, তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা কেন—তাঁহাদিগের প্রতি একেবারে চক্ষু মুদ্রিত করিলেও চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত মোটের উপর বিবেচনা করিলে, রাজার খেলাতখেতাবকে ঘৃণার চক্ষে দেখা সামান্য শিক্ষাবলের কার্য্য নহে—ইহার অনুরূপ শিক্ষাবল মুসলমানের হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

"মুসলমানহিন্দুর এই প্রাচীন সৌখ্য নষ্ট করিবার চেষ্টায়" প্রতিরোধকল্পে, "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা"র লেখক আরও বলিতেছেন—"হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমানের ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর সাহিত্য ও সাধনার সম্যক্ প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিতে হইবে।" এই সারবান্ উপায়ের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া আমরাও ইতিপূর্ব্বে এ কথা বারবার বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখানেও "শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী" লইয়া কথা। অধুনা হিন্দুর চক্ষে আপনাকে জগতের শিক্ষাগুরুরূপে ধরিতে পারে, এমন ক্ষমতা মুসলমানের নাই—শিক্ষার মুখে তাহার এই শক্তি আসিবে, আশা করা যায়। মুসলমানের এই চিত্র খুঁজিয়া লইতে হিন্দু একটু চেষ্টাবান্ হইলে ভাল হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্তত একটুকু পারসীশিক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়ে। বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

প্রাচ্যের প্রবীণ বিদ্যামন্দির ধূলিসাৎ করিয়া অধুনা ভারতে পাশ্চাত্যধরণে যে নবীন শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহার প্রাঙ্গণে পাঠরত বিদ্যার্থীর বিদ্যা সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে না—তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও সে আপনাকে সম্যক্ সমুন্নত করিতে পারিতেছে না—লোকশিক্ষার সহিত লোকপ্রকৃতির যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সে সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখে না—আমাদের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—তাই আমাদের উপযোগী, শিক্ষার নূতন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছে। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী যদি ভারতে হিন্দুর উন্নতির অন্তরায় ঘটাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা মুসলমানের মধ্যে আরও শোচনীয়রূপে আপনার অনিষ্টের বীজ উপ্ত করিবে। মুসলমানের শিক্ষিতজীবনের এখনও বাল্যাবস্থা—সুতরাং শিক্ষার এই নূতন অনুষ্ঠানে মুসলমানের শিক্ষার কোন বিশিষ্ট ব্যবস্থা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানপক্ষ হইতে এরূপ একটা দাবী হয় ত অন্যায় আব্দার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু যেখানে অধিকারপ্রাপ্তির আশা থাকে, অভাবজনিত দীনতা সেখানে সঙ্কোচ ও লজ্জার শির চূর্ণ করিয়া আপনার অভাব ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠা-

বোধ হয় না—করিলেও চলে না। জাতীয় শিক্ষাসমিতি এখনও গঠনের পথে—যথাসময়ে এ বিষয়ের বিহিত ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা যাইবে।

মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা।

তাঁতসম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

আজকালকার বাংলা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রায়ই তাঁতসম্বন্ধে কিছু-না-কিছু গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি পড়িলে মনে হয়, তাঁতের মত লাভের জিনিষ আর নাই। বলা বাহুল্য, লেখক অধিকাংশ-স্থলেই হয় কোন সখের (amateur) তন্তু-বায়, নয় তন্তুগুণে আকৃষ্ট স্বদেশপ্রেমিক যুবক। ইঁহাদিগের গবেষণার উদ্দেশ্য আর যাহাই হউক, প্রধান—দেশে তাঁতের বহুল-প্রচলন। উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু তাহার সফলতা কি-পরিমাণ হইয়াছে বা অবিলম্বে হওয়ার সম্ভব, তাহা বলিবার শক্তি এখনো কাহারো নাই। তবে, ঐ-শ্রেণীর পত্রের বা প্রবন্ধের একটি প্রত্যক্ষ ফল আমরা দেখিতেছি। অনেকে দুএকখানি করিয়া তাঁত বসাইয়া তাহাতে সাধারণের বয়ন-কার্য্য শিখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বাংলার পূর্ব্বপশ্চিমখণ্ডের সুদূরবর্ত্তী পল্লি হইতেও ভদ্রসন্তানগণ এই সকল স্থানে আসিয়া উৎসাহের সহিত তাঁতের সকলরকম কাজ শিখিতেছেন।

সংবাদপত্রের স্তম্ভে অঙ্ক কষিয়া দেখান হইয়াছে—শ্রীরামপুরের তাঁতে উত্তম প্রমাণ-ধুতি দৈনিক একজোড়া (কাহারো কাহারো হিসাবে দুইজোড়া) বোনা যায়; সুতরাং মাসে অন্যূন ত্রিশজোড়া বোনা গেল, এবং তাহার মজুরী জোড়া প্রতি এক হইতে দেড় টাকা হিসাবে ধরিলে মাসে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয় হইল, ইত্যাদি। উৎসাহশীল শিক্ষা-নবিশগণ কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া দেখিতেছেন যে, সুনিপুণ তাঁতিশিক্ষকও শ্রীরামপুরের তাঁতে আটঘণ্টার পরিশ্রমে প্রমাণ মাঝারী ধুতি একখানির বেশী কিছুতেই নামাইতে পারিতেছে না। ইহার উপর সূতা "পাট" করা, "পোড়েনের" সূতার "নলী-কাটা," "টানা-কাড়ান" ইত্যাদি অনেক সময়-সাপেক্ষ কাজ করিয়া না লইলে বুনানি চলিতেই পারে না। অর্থাৎ একখানি তাঁতে একজন তাঁতী দৈনিক একখানি করিয়া ধুতি বুনিবার চেষ্টা করিলে, জোগাড়ী কাজের জন্য আর একজন লোককে সম্পূর্ণ-সময় শুধু ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতে হয়। অর্থাৎ পনরজোড়া কাপড় বুনিয়া পনর-কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করিতে হইলে দুইজন লোককে অনন্যকর্ম্মা হইয়া ঐ কাজই করিতে হয়। ভদ্র শিক্ষানবিশের এই জ্ঞানলাভ হইবামাত্র নিরুৎসাহ হইয়া পড়া অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাস্তবিক পক্ষে, তাঁতের প্রসরবৃদ্ধি করিবার যে পদ্ধতি সম্প্রতি আমাদের দেশে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মূলেই ভুল। যে-কোন একটা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে, সেই ব্যবসায়ের উৎকৃষ্ট লাভজনক কোন একটি কারখানায় যাইতে হয়। কারখানার পদ্ধতি দেখিয়া যেমন শিক্ষানবিশের সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তেমনি সেই সঙ্গে কি উপায়ে লাভবান্ হইতে পারা যায়, তাহাও শিক্ষা করে। যদি তাঁতে কাপড় বুনিবার কোন কারখানা স্থাপিত হইত এবং তাহাতে বেশ লাভজনক ব্যবসায় চালাইতে পারা যাইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া শিক্ষানবিশ অনেক বেশী শিখিতে পারিত, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তাঁতীর বাড়ী ভিন্ন সেরূপ ব্যবসায় আর কোথাও দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁতীর বাড়ীতে যাইয়া যাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সামান্য লাভের প্রত্যাশা থাকিলেও তাঁতিগণই তাহাতে তুষ্ট হইতে পারে, সেরূপ মজুরী উপার্জ্জনের জন্য যে অধিক লোকে ঝুঁকিবে, তাহা বোধ হয় না।

আসল কথা, বিদেশী কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আপামর সাধারণের বস্ত্রের যোগাড় তাঁত হইতে করাইতে হইলে, তাঁতীদিগের সনাতনপদ্ধতি ধরিয়া রাখিলে সে আশা শীঘ্রই দুরাশা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রচলিত পদ্ধতির দ্বারা ঐ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না বলিয়াই তাঁতীর ব্যবসায়ের এত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁতীর আপনার তাঁতের জন্য যে সূতা আবশ্যক হয়, তাহা নিজের বাড়ীর স্ত্রীলোকের দ্বারা "পাট" করাইয়া ও অন্যান্য যোগাড়ী কাজ স্ত্রীলোক ও বালকের দ্বারা করাইয়া লইয়া তবে সে তাঁত চালাইতে সক্ষম হয়। শ্রমবিভাগ দ্বারা অতি জটিল কার্য্যও সরল ও সুলভ হইয়া থাকে, ইহা অর্থনীতির প্রতিপন্ন সত্য। তাঁতের কার্য্যে সে নীতির ব্যতিক্রম হইবার কোনই কারণ নাই। যদি কোন উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্ররূপে "পাট" করিবার কার্য্যনির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে কাপড়ের মূল্য আপনা হইতেই কমিয়া আসিবে। তাঁতিগণ যে উপায়ে সূতা "পাট" করিয়া থাকে, তাহা শ্রীযুত হেন্‌রি ঘোষ মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে অতি উত্তম করিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে একএকটি করিয়া সূতা মাড় দিয়া "নাগায়" জড়ান হয়; সুতরাং প্রতি সূতাই সমানভাবে "পাট" হইয়া যায়। অত্যন্ত সরু সূতার পক্ষে বোধ হয় এইরূপ "পাট" অপরিহার্য্য; কিন্তু মোটা সূতার জন্য প্রতি সূতার উপর এতটা মনোযোগ না দিলেও চলিতে পারে বলিয়াই মনে হয়। সূতা মাড় দিয়া "পাট" করিবার জন্য কয়েকটি কল সম্প্রতি এখানেই উদ্ভাবিত হইয়াছে; বিলাতে বরাবর কলে "পাট" করিবার বন্দোবস্তই চলিত আছে। এখানকার নবাবিষ্কৃত কলগুলি পরীক্ষায় কিরূপ উত্‌রাইয়াছে; তাহা এখনো জানা যায় নাই। কিন্তু ঐরূপ কলে যে কার্য্য বহুগুণে সংক্ষিপ্ত ও সুলভ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে একখানি তাঁতের জন্য এইরূপ সূতা মাজিবার কল অথবা "টানা দেওয়া"র কল রাখিলে ঐ সকল কলের

যথেষ্ট কাজ দিতে পারা যায় না। অধিক-সংখ্যক তাঁত একত্রে চলিলে, তাহাদের জোগাড়ী কাজ সরবরাহ করার জন্ত এই সকল কলের দ্বারা যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ হইবার কথা।

মাদ্রাজ শিল্পবিস্তালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চ্যাটার্টন্‌সাহেব সম্প্রতি ভারতীয় বস্ত্রশিল্প-বিষয়ে এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। বিবরণীর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া দুর্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। একএকটি স্বতন্ত্র পরিবার লইয়া একএকটি কারখানা গঠিত এবং তাহাতেই তাহার পর্য্যবসান ;—প্রসারিত হইবার কোন সুযোগই নাই। এই সকল ক্ষুদ্র কারখানার অভাবমোচনের জন্ত সময়-ও-শ্রম-সংক্ষেপকারী কোন কৌশল অবলম্বনের অবকাশ বা চেষ্টা ইহাতে সম্ভব নহে। যদি এই সঙ্কীর্ণ পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বহুসংখ্যক তাঁত লইয়া বাণিজ্যানুমোদিত পদ্ধতি (commercial method) অনুসারে একএকটি কারখানা স্থাপিত হয় এবং তাহার জোগাড়ী কাজ সরবরাহ করিবার জন্ত একএকটি সূতা মাজিবার কল তাহাতে সংলগ্ন করা হয়, তাহা হইলে এই সকল কারখানা অত্যন্ত লাভজনক হইতে পারিবে এবং বিদেশী কলের কাপড়ের সহিত তাঁতের কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে—ইহা চ্যাটার্টন্‌মহোদয়ের দৃঢ়-বিশ্বাস। তাঁতিগণ ঘরে বসিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহার অপেক্ষা কিছু কিছু বেশী মজুরী দিয়া এইরূপ কারখানার কাজ করাইয়া লইলেও মোটের উপর লাভ থাকিয়া যাইবে, ইহাই অনুমান হয়।

আমাদের দেশে সম্প্রতি তাঁতের কার্য্য ভদ্রসন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা অপেক্ষা এইরূপ ছোট ছোট কারখানা খুলিয়া তাঁতের কাপড় সুলভ অথচ তাঁতীকে লাভবান্ করিবার চেষ্টা করা অনেক অধিক আবশ্যক হইয়াছে।* তাঁতের পাঠশালা (!) যাঁহারা খুলিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য—শিক্ষাগারগুলি কাপড় বুনিবার কারখানায় পরিণত করেন ও উৎপন্ন কাপড়ের মূল্যদ্বারা লাভ করিবার উদ্দেশ্যের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা নিজেই যদি এ কার্য্যে লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রলুব্ধ ছাত্রগণকে তাঁত নাড়াচাড়া করিতে শিখাইবার যে কি উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

সূতা মাজিবার স্বতন্ত্র কারখানা স্থাপিত হইলে আরো অশেষপ্রকারে বস্ত্রশিল্পের সাহায্য হইতে পারে। মাড়-দেওয়া সূতা কিনিতে পাইলে, জাপানের ন্যায় আমাদের দেশেও বহুসংখ্যক উৎসাহী গৃহস্থ যে ঘরে তাঁত রাখিয়া নিজের বস্ত্রের অভাব কতক-পরিমাণে মোচন করিবার চেষ্টা করিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঘরে যদি কতক-পরিমাণে অভাবমোচনের জোগাড় করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বাজারের আমদানির উপর নির্ভরের ভাব অনেকটা কমিয়া যাইবারই সম্ভাবনা অধিক। এবং যে-পরিমাণ

* কারখানার পদ্ধতি চলিতে আরম্ভ হইলে এবং মাড়-দেওয়া সূতা অল্পমূল্যে কিনিতে পাইলে, ভদ্রলোককে তাঁতের কাজ শিখাইবার সার্থকতা দেখা যাইবে।

কাপড় এইরূপে ঘরে ঘরে জোগাড় হইতে থাকিবে, স্বদেশীয় কাপড়ের উৎপত্তি কম হইবার জন্ম যে সকল অসুবিধা ও ব্যবসাদারি সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে তাহারও সেই পরিমাণে লাঘব হইবে। কিন্তু ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সূতা "পাট" করিবার স্বতন্ত্র কারখানা একান্ত আবশ্যক। "পাট"-করা সূতা কিনিতে পাওয়া গেলে, তাঁত বুনিবার কাজ আর গৃহস্থের পক্ষে তত ভয়াবহ ব্যাপার থাকিবে না। সেলাইয়ের কল ঘরে রাখিয়া জামার জোগাড় করিবার বন্দোবস্ত অপেক্ষা তাঁত রাখিয়া কাপড়ের জোগাড় করা অধিক অসম্ভব বোধ হইবে না।

আমাদের দেশে পল্লিগ্রামের গৃহস্থ ভদ্রলোক আপন আপন সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াও বহুসময় অবসর পাইয়া থাকেন। "পাট"-করা সূতা কিনিতে পাইলে তাঁহারা অনায়াসে বাড়ীতে এক-একখানি তাঁত (hand-loom) রাখিয়া নিজ নিজ অভাব অনেকটা কুলাইয়া লইতে পারেন। গ্রামস্থ কোন ধনী মহাজন যদি সূতা মাজিবার কল, "টানা-কাড়িবার" কল ও কয়েকখানি তাঁত লইয়া গিয়া এক-একটি কারখানা খুলিয়া দেন, তাহা হইলে গ্রামের মধ্যস্থলে এক-একটি দৃষ্টান্ত খাড়া হয় ও গৃহস্থের সংসারে তাঁত প্রবর্ত্তিত হইবার বিলম্ব হয় না। শুনিয়াছি, জাপানে এই-রূপেই গৃহে গৃহে তাঁত বসিয়াছে এবং বিদেশী বস্ত্রবাণিজ্য একক্কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। জাপানের দৃষ্টান্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, বিদেশী কলের সহিত দেশী তাঁতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ কঠিন নহে। তবে শ্রমবিভাগের সুবন্দোবস্ত না হইলে এ সকল কথা আকাশ-কুসুমবৎ রহিয়া যাইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।*

জাতীয় ধনভাণ্ডার দ্বারা তাঁতের শিক্ষাগার খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এই শিক্ষাগার কিরূপে গঠিত হইবে এবং কি প্রণালীতে চালিত হইবে, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গীয়-ভূম্যধিকারি-সমিতির উদ্যোগে বিগত দুইতিনমাস ধরিয়া একটি ছোটখাট শিক্ষাগার চালিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারা শ্রীরামপুরের "ঠক্‌ঠকি"-(fly-shuttle)-তাঁতের প্রচলন কতটা বৃদ্ধি পাইল, তাহা এখনো জ্ঞাতব্য রহিয়াছে। বাহির হইতে যতটা জানা গিয়াছে, ভদ্রলোক শিক্ষানবিশের সংখ্যাই অধিক ছিল, "জোলা" অথবা তাঁতী শিক্ষানবিশ থাকিলেও দুইতিনজনের অধিক ছিল কি না, সন্দেহ। ভদ্র ছাত্রগণ যে কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়া ফিরিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁতী অথবা "জোলা" ছাত্রদ্বারা "ঠক্‌ঠকী"-তাঁত-প্রচলনের কার্য্যে সাহায্য হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু

* গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁত রাখিয়া সংসারের কাপড় কতকপরিমাণে সরবরাহ করিবার রীতি বাংলাদেশেই দেখা যায় না; কিন্তু ভারতে সকল প্রদেশে সেরূপ নহে। আমাদের প্রতিবেশী আসামবাসীদের মধ্যে প্রায় প্রতি ভদ্রগৃহেই তাঁত চলিয়া থাকে। শুনা যায়, একস্ট্রা আসিষ্টান্ট, কমিশনার প্রভৃতির ন্যায় পদস্থ কর্ম্মচারীর গৃহেও পরিজনবর্গ অবকাশমত তাঁত বুনিয়া থাকেন। সুতরাং বাংলায় ঐ রীতি চলিবার যে সকল বাধা আছে, তাহা যে অনতিক্রমণীয়, তাহা স্বীকার করা যায় না।

আমাদের দেশের শ্রমজীবী শিল্পিগণ নবীনতার এতই বিরোধী যে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পলোকেই সহসা কাহারো কথার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীরামপুরী তাঁতের কাজ শিখিবার জন্য আসিতে প্রস্তুত হয়। আর, যাহারাও আসিয়া শিখিয়া যায়, তাহারাই যে বিশেষ কোন অতিরিক্ত-লাভজনক কৌশল শিখিয়া যায়, তাহাও নহে। সুতরাং জমিদারসমিতির চালিত বিদ্যালয়ের আদর্শে কোন বিদ্যালয় দ্বারা বিশেষ কোন ফললাভের প্রত্যাশা করা যায় না। বিদ্যালয়হিসাবে বাংলার যাহা অভাব, তাহা "ঠক্‌ঠকী" অথবা ঐরূপ বিশেষ কোন তাঁতের কাজ শিখাইবার স্থান নহে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালিত বস্ত্রশিল্পের আদর্শবিদ্যালয়। মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত চ্যাটার্টন্‌-সাহেবের অধ্যক্ষতায় যেরূপ একটি বিদ্যালয় চলিতেছে, আমেদনগরে শ্রীযুক্ত চার্চ্চিল্‌-সাহেবের তত্ত্বাবধানে যেরূপ আর একটি বিদ্যালয় চলিতেছে, বাংলায় সেই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অভাব এখনো রহিয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন তাঁতের কার্য্য শিক্ষা দিয়াই কার্য্যশেষ হয় না; শিল্পের উন্নতিকল্পে সময়-ও-শ্রমসংক্ষেপকারী নানাবিধ কৌশলবিষয়েও পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এইরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি শুধু তাঁতের কাজ শিখিয়া বাহির হয়, তাহা নহে, কিরূপে অল্পব্যয়ে অধিক কার্য্য আদায় হয়, তাহাও শিখিয়া যায়। "ঠক্‌ঠকী"-তাঁতে কেবল ধুতিই বোনা হয়; কিন্তু দেশের লোক শুধু ধুতির দ্বারাই অঙ্গ আচ্ছাদন করে না,—অন্যবিধ কাপড়চোপড়ও আবশ্যক। ক্যানানোরের তাঁতী যে সকল জামার কাপড় যেমন বুনিতে পারে, তাহা অপর স্থানের তাঁতী অনায়াসেই শিখিতে পারে। ঐরূপ অমৃতসরের পশমের কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেশমের কাজ, এ সকলের কোনটাই বাঙালীর নিকট কঠিন নহে। শিক্ষার্থীর রুচি, সুযোগ, সুবিধা অনুসারে কোন্‌টা কাহার পক্ষে পছন্দসই এবং লাভজনক হইবে, কে বলিতে পারে! আর, রেশম-পশম ইত্যাদি নানারূপ কার্য্য বাংলায় চালাইতে পারিলে কত যুবকের জীবিকাসংস্থান হইবে, এবং দেশের সর্ব্ববিধ বস্ত্রের অভাব কত অধিক দূরীভূত হইবে, তাহা একটু ভাবিলেই অনুমান করা যায়।" আদর্শবিদ্যালয়ে যদি এই সকল বিষয়েও তাঁতের নমুনা রক্ষিত হয় এবং নিপুণ কারিকর দিয়া কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা হয়, শিক্ষানবিশকে আর ভারতের নানাস্থান ঘুরিয়া শিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় না। পাশ্চাত্যদেশে নানারূপ শ্রমসংক্ষেপকারী তাঁত (hand-loom) উদ্ভাবিত হইয়াছে ও ঐ সকল তাঁতের সাহায্যে নানারূপ সূতী, রেশমী, পশমী কাপড় প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ঐ সকল তাঁত ও তাহার কার্য্য-প্রণালী যাঁহারা শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষের অভাব ও উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া নূতন তাঁত ও তাহার আনুষঙ্গিক নূতন শিল্পপদ্ধতির প্রচলনের দ্বারা দেশের মহান্‌ উপকার সাধিত হইতে পারে। বস্ত্রশিল্পের উন্নতিই বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ হওয়া উচিত। এত-বড়

মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতির অনুমোদিত একটি শিক্ষাগারের আবশ্যকতা আছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বস্তুত, মাদ্রাজ ও আমেদনগরের বিদ্যালয়ের অনুরূপ একটি আদর্শবিদ্যালয়ের অভাব সম্প্রতি বাংলায় বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে। মাদ্রাজের বিদ্যালয়টি সরকারী, আমেদনগরের বিদ্যালয় স্তর্ দিনসা মাণিকজি পেটিটের স্থাপিত। বাঙালসরকার এ পর্য্যন্ত এরূপ বিদ্যালয়স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝেন নাই, সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারের সজল অথচ রোষকষায়িত কটাক্ষপাতের সম্মুখে যে শীঘ্র তাহা বুঝিতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। স্তর্ দিনসার মত স্বদেশহিতৈষী ধনী মহাজন আমাদের দেশে এখনো দেখা যাইতেছে না। সুতরাং দেশের এই মহৎ অভাবমোচনের ভার জাতীয়ভাণ্ডারকেই লইতে হইবে। জাতীয়ভাণ্ডার বাঙালিজাতির অক্ষয়কীর্ত্তি। ইহা দ্বারা যদি দেশের মধ্যস্থলে বস্ত্রশিল্পের একটি আদর্শশিক্ষাগার স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ইহার উদ্দেশ্য সার্থক এবং তাহার ফল সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইবে, সন্দেহ নাই। জাতীয়ভাণ্ডারে যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার আয়ে এরূপ কোন আদর্শশিক্ষাগার চালিত হইতে পারে কি না, তাহা এখনো বলিতে পারা যায় না। কিন্তু দেশের ধনী বদান্য মহাশয়গণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলে ভাণ্ডারের অর্থের অভাব যে অচিরাৎ মোচিত হইবে, তাহা আশা করা যায়।

জাতীয়ভাণ্ডারকর্তৃক স্থাপিত শিল্পবিদ্যালয়ের গঠনাদিবিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনসম্পর্কে দেশের অগ্রণীগণ সকলে মিলিত হইয়া যেরূপ আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতীয়ভাণ্ডারের অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্তও তদ্রূপ আলোচনা হইয়া সিদ্ধান্ত স্থির হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশের যাহা গর্ব্বের বস্তু, তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ ভুলক্রমে তাহার অসদ্ব্যবহার হইতে দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত হইবে, এবং তজ্জন্ত সমগ্র দেশবাসীকে পরিতপ্ত হইতে হইবে। এবিষয়ে যে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আদর্শবিদ্যালয়ের প্রস্তাব অন্ত পাঁচরকম প্রস্তাবের সহিত ভাণ্ডারের সদস্যগণকর্তৃক আলোচিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীর, ম—

লীলা।

আমি শরৎশেষের মেঘের মত
তোমার গগনকোণে
সদাই ফিরি অকারণে!
তুমি আমার চিরদিনের
দিনমণি গো—
আজো তোমার কিরণপাতে
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে
দেয় নি মোরে বাষ্প করে'
তোমার পরশনি—
তোমা হ'তে পৃথক্ হ'য়ে
বৎসর মাস গণি।

যদি এমনি তোমার ইচ্ছা, যদি
এমনি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব!
ল'য়ে আমার তুচ্ছ ক্ষণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে;
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,
বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা,—
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।

ওগো আমার যবে ইচ্ছা হবে
সাঙ্গ কোরো খেলা
ঘোরা নিশীথরাত্রিবেলা।
অশ্রুধারে ঝরে' যাব
অন্ধকারে গো—
প্রভাতকালে রবে কেবল
নির্ম্মলতা শুভ্রশীতল,
রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
হাস্বে চারিধারে,—
মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
জ্যোতিসাগরপারে।

সাধ।

দীর্ঘরাত্রি শেষে যাপি' প্রথম প্রভাতে
যবে মনে হয় নাথ তোমাতে আমাতে
আর হইবে না দেখা, অমনি তখন
সাধ যায় হ'য়ে পুন ঘুমে অচেতন।
সকল বিরহব্যথা সব দুঃখভার
চকিতে ভুলিয়া যাক্ হৃদয় আমার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারতবর্ষীয় জীবনজাল।

[আর্য্যা নিবেদিতার লিখিত]

আর্য্যা নিবেদিতার "ভারতবর্ষীয় জীবন-জাল" নামক গ্রন্থখানির কথা আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। দীপশিখা যেমন একই কালে আপনাকে এবং বহুদূর-বর্ত্তী অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিয়া তোলে, তেমনি এই পুস্তকখানি আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে আপনার রশ্মি প্রেরণ করিয়াছে এবং সেই রশ্মির সাহায্যে আমাদিগের অতীত ইতিহাসের অন্ধকারকে কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়াছে।

আর্য্যা নিবেদিতা এক স্থানে লিখিয়াছেন— "জাতীয়চরিত্রের মধ্যেই জাতীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্তবার্ত্তা আমরা পাই, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে এ কথা যত সত্য, এমন আর কোন দেশের সম্বন্ধেই নহে।"

বস্তুত কথাটি সত্য বলিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে খাটাইয়া লওয়া শক্ত। কারণ, জাতীয়-চরিত্রের খণ্ডতা-খর্ব্বতার মধ্যে তাহার পশ্চাতের সহিত অলক্ষ্য যোগসূত্র এবং সম্মুখের দিকে বিকাশোন্মুখ সার্থকতাকে একই সময়ে দেখিতে পাওয়া কঠিন। আমাদের সমাজে, আমাদের ধর্ম্মে, আমাদের আচারে-ব্যবহারে যে বহু প্রাচীনকালের একটি প্রতিভা কাজ করিয়াছে এবং এখনকার নানা বিকৃতির মধ্যেও যে তাহা দুর্লভ নহে, তাহা আছে— এ কথাটি আমরাই উপলব্ধি করিতে পারি না, বিদেশীর পক্ষে পারা যে কি কঠিন, তাহা সকলেই বুঝিবেন।

ভারতবর্ষের বিশেষত্ব কোথায়, নিবেদিতা ধরিয়াছেন। আমাদের ইতিহাস এমন বাঁধাধরা নয় যে, তাহাকে একটা-কোন কলের মধ্যে নাম-তারিখ-রাজারাজড়া-সুদ্ধ ফেলিলেই তৈরি হইয়া উঠিবে। বস্তুত কোন ঘটনাবৈচিত্র্য বা মারকাটহাঙ্গামা আমাদের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, কাজেই ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা নিদারুণ ক্লেশের, সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও আমাদের একটা ইতিহাস আছেই, তাহা কোন ইতিহাস হইতে খাটো নয়। তাহাকে চিনিতে গেলে ভারতবর্ষীয় মনের পরিচয় গোড়ায় পাওয়া চাই। সেই মনকে খনন করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা আচারে-বিচারে, প্রথায়-অনুষ্ঠানে, ক্রিয়াকাণ্ডে, ধর্ম্মে-সাহিত্যে, দর্শনে-পুরাণে ছড়াইয়া আছে। তাহা আমাদিগকে যে কি সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছে, আমরা জানি না—কিন্তু তাহা আছে, এবং তাহার শক্তিই যে আমাদের ঐক্যের ভিত্তিমূল একদিন হইবে, তাহা বুঝিবার সময় আজকাল আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তাই নিবেদিতা গোড়াতেই আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরাই সভ্যতার মূলধনকে সঞ্চয়

করিয়া রাখে। বহুকালের আচাররীতি-নীতিকে প্রতিদিন অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত, ভক্তির সহিত রক্ষা করা তাহাদেরই ধর্ম্ম। সভ্যতার ধন তাহাদেরই কোলে প্রতিদিন মানুষ হইতে থাকে, সুতরাং তাহারা কি, তাহাদের মন বিশেষভাবে কি—তাহা জানিলেই সমাজের ভিতরকার ভাবটির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথম অরুণালোকের অমৃতাশীর্ব্বাদের তলে গৃহদেবতার অভিবাদন ও গাভীদোহন কর্ম্ম হইতে দিবসের প্রতি তুচ্ছকর্ম্ম এবং সন্ধ্যারতি পর্য্যন্ত যে একটি অবিচ্ছিন্ন অপরিমেয় মঙ্গলভাব,—তা ছাড়া নানা অনুষ্ঠান, পূজা ও ব্রতপালনের যে একটি বিরল শুভ্র ত্যাগকঠিন মাধুর্য্য, যাহার মধ্যে আমাদের কন্যাগণ, বধূগণ ও মাতৃগণ বর্দ্ধিত হন, আমরা তাহাকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি নাম দিয়া উপহাস করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু লক্ষ্মী আপনাকে শুষ্কতা ও হতশ্রীর মধ্যে প্রকাশ করেন না;—যে তাঁহার অধিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাঁহার অলোকসুন্দর কান্তি ও নন্দননিন্দী মাধুর্য্য যাহার অন্তরাত্মাকে সজীব-সঞ্জীবিত করিয়াছে, সেই কবির নিকটে সেই শ্রী দিব্যমূর্ত্তি মায় দেখা দেন,—আজ বিদেশী রমণীর লেখনীর মধ্যে সেই মহিমার আভাস পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম এবং তাঁহার পরিপূর্ণ নারীহৃদয়ের নিকটে মস্তক অবনত করিলাম।

আমাদের প্রতিভার মূলমন্ত্র হচ্চে—বৈচিত্র্যের মধ্যে একতে আনয়ন। এই একতে রক্ষা করিতে গিয়া বৈচিত্র্যধর্ম্মকে মূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের ছিল না,—কারণ তাহা প্রকৃতি ও ধর্ম্মের নিয়মবিরুদ্ধ—বরং যাহাতে সকলেই যথাযথ স্থান পায়, কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ না বাধে এবং স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াও এক হইতে পারে, এইরূপ একটি বৃহৎ ব্যবস্থা ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। তাহার পরিচয় পাইতে গেলে বিশেষভাবে আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেলিতে হয়। নিবেদিতা তাহাই করিয়াছেন। এইজন্ত বিদেশীর নিকটে যাহা নিতান্তপক্ষে কুরীতি ঠেকে, আমাদের কাছে যে তাহার মূল্য আছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। অন্তঃপুর-রীতি, চিরবৈধব্য, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি লইয়া যাঁহারা নাসা কুঞ্চিত করেন এবং পাশ্চাত্যদের শিখানো বুলি আওড়ান, তাঁহারা দেখিতে পান না যে, আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কোথায় এবং কতখানি! দেশকেই তাঁহারা যথার্থরূপে চিনিতে ও বুঝিতে সক্ষম হন নাই।

হিন্দুমাতা, হিন্দুসতী ও হিন্দুবিধবার সম্বন্ধে যে তিনটি চিত্র নিবেদিতা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আভাসে-ইঙ্গিতে এই পরিবারের ঐক্য কিরূপে আমরা গাঁথিয়াছি, এবং এই নানা সম্বন্ধজালে আপনাকে জড়াইয়া একই সময়ে ত্যাগকে সকলের এবং কর্ম্ম ও ত্যাগকে আপনার অধিকারে করিয়াছি,—ভারতবর্ষীয় সেই বৃহৎ প্রতিভার পর্দ্দা একটুখানি উত্তোলন করিয়া এই গৃহনাট্যের বৈচিত্র্যমধ্যে তাঁহার পরমসাধনার একটি গৌরব আমরা দেখিয়া লইলাম।

এই পরিবার যে আমাদের পক্ষে কতখানি, ইহা সুগঠিত হইলে আমাদের সমাজ যে কি-পরিমাণ নির্ভর পায়, স্থিতি পায় —আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব ও কল্যাণচর্চ্চা যে ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে, এবং ইহার জন্যই, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে আমাদের মধ্যে এই সকল রীতিনীতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনাতে আপনি কেন্দ্রবদ্ধ ব্যক্তিত্ব-স্বাধীন ইউরোপ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। পরিবারের একীকরণের জন্য স্ত্রীর চেয়ে আমাদের দেশে মা বড়। গৃহ বলিতে বোঝায় 'মা', তিনিই গৃহের কেন্দ্রস্থল। ইউরোপে পতিবিয়োগে অন্য পতি গ্রহণ করা স্ত্রীর পক্ষে দূষণীয় নহে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ মা বলিতে যে আমাদের উদ্বেল ভক্তির উচ্ছ্বাস, এই মা নামে আমরা যে এক—পরিবারে এক, সমাজে এক —এই যে গৃহের ঐক্য যাঁহার দ্বারা হইতেছে, তিনি যদি পতিবিয়োগে অন্য পতি গ্রহণ করিতেন, যদি বৈধব্যের একাকিত্বের সুদৃঢ় অটল গাম্ভীর্য্য না থাকিত, বিবাহের নিয়ম যদি অলঙ্ঘনীয় না হইত, তবে কি সেই ঐক্য, সেই মাধুর্য্য —যাহাই বলি না কেন,—কিছুই রক্ষিত হইতে পারিত ?

এমনি করিয়া সমস্ত রীতিকেই দেশের আভ্যন্তরীণ আদর্শের আলোকে সহজভাবেই দেখা যায়। অবশ্য ঐখানে তাহা দেখিতে বসা কোনক্রমেই চলিবে না। আসলে পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই বিরূপতা ও বিকৃতি আছে। একটা রীতি যখন আমাদের মধ্যে বদ্ধ হইয়া উঠিল, তাহারই পশ্চাতে যে আমাদের দেশের প্রকৃতি ও প্রতিভা বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের সামাজিক বহিরাবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের যেটুকু যোগ, তাহা যাহাতে সুসংবদ্ধ, সুনিশ্চিত, সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, যাহাতে আমরা যথাযথভাবে আমাদের আন্তর ও বাহ্য সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারি, তজ্জন্য যে সেই রীতি সৃষ্ট হইয়াছে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না। তাহার বিকৃতি দেখিয়া তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হই, বিকৃতির বাহিরে তাহার কোন চেহারাই আমাদের চোখে ফোটে না। আসলে রীতি বা ব্যবস্থা কোনকালেই চিরন্তন নহে, কালভেদে তাহার বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু নিত্যতা আছে প্রকৃতি হইতেই যে তাহা সম্ভূত হইয়াছিল, এবং সেই প্রকৃতির আনুকূল্যহেতুই যে তাহার গৌরব, আমরা তাহা ভুলিয়া বসি।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে কথা বলা আবশ্যক হইবে, দেখিতে পাইতেছি। সকলেই জানেন যে, আমাদের বর্ত্তমান অবনতির কারণ যখনই যিনি দেখান, 'জাতিভেদ' ছাড়া আর কিছুই তাঁহার চোখে পড়েনা। স্বীকার করি, ঐক্যকে ভুলিয়া গিয়া পার্থক্যের প্রাচীরগুলি চোখের সামনে উৎকটভাবে তুলিয়া ধরিতে আমরা লজ্জিত হইতেছি না, কিন্তু 'জাতিভেদ'প্রথাটার উপর সকলপ্রকার দোষ চাপানোর পূর্ব্বে (যাহার জন্য সে বেচারী অনেকস্থলে কিছুমাত্র দোষী অথবা দায়ী নহে) অন্তত সুবুদ্ধির জন্য দুটা-একটা প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত।

আমরা যদি মানুষে মানুষে মঙ্গলসম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাই, বিদ্বেষকে গোড়া ঘেঁষিয়া সমভূম করিতে চাই, তবে কর্ম্মভেদ, বৃত্তিভেদ রাখিতেই হইবে—তাহাতে কর্ম্মের উপর যে নিষ্কামধর্ম্ম, তাহার লাভে অধিকারী হইব—কর্ম্মকেই মনুষ্যত্বের চরমলক্ষ্য করিব না। যেখানে সাম্য নাই, সেখানে উদার সাম্যনীতি প্রচার করিয়া পরে তলে তলে অসম্ভ অসাম্যনীতি সৃষ্টি করিব না এবং সত্যের নূতন শাস্ত্র তৈয়ার করিতে বসিব না। সুতরাং সাম্য যেখানে নাই, সেখানে সবিনয়ে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব এবং ক্রমে তাহার ব্যবধান দূর করিতে প্রয়াসী হইব। সুতরাং বর্ণভেদ আমাদের মধ্যে কোন-না-কোন আকারে থাকিবেই।

আমরা একত্র কাজ করিতে পারি না, ইহার কারণ জাতিভেদ, ইহা কোনমতেই মানা চলে না। সে দোষ আমাদের মধ্যেই আছে—বাহিরের কোন প্রথায়, কোন রীতিনীতিতে নাই। জাতিরক্ষার অর্থ আত্মসম্মান এবং পূর্ব্বপুরুষের কুলের সম্মান রক্ষা বই আর কিছুই নহে। তাহা যে ধর্ম্মের অধিকার, মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে কখন কাহাকেও খর্ব্ব করিয়াছে, এ কথাও মানিতে পারি না। যদি দুএক ক্ষেত্রে করিয়া থাকে, তবে তাহা জাতিভেদপ্রথার দোষ নহে, ইহা সুনিশ্চিত। বরং যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সমাজে রক্ষিত হইতে পারে, এইজন্যই আমাদের সমাজ জাতির মধ্যে কর্ম্মভেদ করিয়া দিয়াছিল; ব্রাহ্মণই একমাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে, ধর্ম্মকর্ম্মে আর কাহারও অধিকার নাই, এমন কথা কখন বলে নাই। এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি আমাদের যাঁহারা অবতারের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ নন। ব্রাহ্মণেরা চিরকাল ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা সেই সকল রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের অত সম্মান, তাহাতে যে তাঁহাদের মৌরসীপাট্টা, এমন কথা কিছুই নাই। তা ছাড়া, অধিকারভেদ-বৃত্তিভেদে একত্র কাজে যে কি অন্তরায় হইতে পারে, তাহাও বুঝা যায় না, বরং সুবিধা হইবারই কথা। কারণ জাতিভেদে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, কাজেই কাহারও সঙ্গে কাহারও খটকা বাধিবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে তো বলই হওয়া উচিত, দুর্ব্বলতা নয়; সুতরাং একত্র কাজ যে আজকাল আমরা করিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের ভিতরকার মজ্জাগত পরপ্রিয়তা ও পরানুকরণ—আমাদের প্রথার দোষ কখনই নহে!

তবেই উপস্থিত দুর্যোগের কারণ দেখিতে পাইতেছি! আমাদের যাহাতে প্রতিভা ছিল, আমাদের যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, সেখানে এখন বিদেশীকে স্বচ্ছন্দে বসিতে দিয়াছি, এবং তাহারই অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহারই মুখপানে তাকাইয়া আছি। আমরা হয় নিশ্চেষ্ট, নয় অন্ধভাবে সচেষ্ট, হয় পরনির্ভরশীল, নয় পরানুকারী। যেমন একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যাক্ না কেন;—এদিকে আমরা দেশকে না জানিয়া তাহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা হারাইয়া 'দেশের দুঃখ

দূর কর, সমাজসংস্কার কর, ধর্ম্মের আমূল পরিবর্ত্তন কর' প্রভৃতি পাশ্চাত্যবুলি আওড়াইয়া ফিরিতেছি, অথচ দেশের জিনিষ একপ্রকার উঠিয়া যাইতেছে,—আমাদের আবশ্যক ঘটিবাটি-কাপড়চোপড় সমস্তই বিদেশী সরবরাহ করিতেছে। এখন সেদিকে যে অর্থের টানাটানির জন্ত আমরা দৃষ্টি দিতেছি না, তা নয়—রুচি বদল হইয়া গেছে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা চিরকালই দেশের জিনিষ, দেশের শিল্পসামগ্রী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তাঁহাদিগের দ্বারাই যাহাতে সেগুলি রক্ষিত হয়, যাহাতে পুনরায় আমাদের গৃহে দেশীয় শ্রী ফিরিয়া আসে, তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। পূর্ব্বে চরকায় সূতাকাটা তাহাদের নিত্য-অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ছিল, এখন সেইরূপ অনেক কর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। তন্তুবায়ের কাজ নাই। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত করিয়াছিল আমাদের ধর্ম্ম—পাশ্চাত্য শিল্পাদির আড়ম্বর দেখিয়া দেশীয় আর্টের বিরলতা, উপকরণের স্বল্পতা এবং সরল শ্রীর দিকে অন্ধ হইলে চলিবে না।

আমাদের কেহ কেহ আবার মনে করিতেছি যে, বুঝি পাশ্চাত্যের সঙ্গে কোন যোগ রাখাই অন্যায়। যেমন সে কথা বলাও ভুল, তেমনি ভুল ভাবা যে, অনুকরণ করারই নাম সার্থকতা। আমরা হয় এটা নয় ওটা, এ দুয়ের একটা ভাবিতেছি। যখন বলা যায় যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, সত্য জানার যে উপায় পাশ্চাত্যেরা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে তলাইয়া দেখিতে হইবে—তখন অনেকে মনে করেন, বুঝি উহাদের সঙ্গে টক্কর দিবার অভিপ্রায়েই বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবার কথা হইতেছে, যেন বিজ্ঞানচর্চ্চা করার অপর কোন হেতুই নাই; কেহ কেহ বা পিছপাও হন,—ভাবেন যে, কাজ নাই, পাছে সনাতন ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ কোন কালে ভীরু ছিল না। নূতনকে চিরকালই সে নির্ভয়ে গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজের অদ্ভুত প্রতিভাবলে আপনার করিয়া লইয়াছে। এই প্রতিভা তাহার দর্শনে, চিন্তায়, সমাজব্যবস্থায় পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত। এখনই যে কেন সে পাশ্চাত্যের জিনিষ আপনার উপায়ে নিজের করিয়া লইতে পারিবে না, তাহা বুঝা যায় না।

এখনকার কালের প্রধান সমস্যা তো তাহাই! কি উপায়ে একটা বৃহৎ জাতীয়ভাব আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে, কেবল অনুভূতিতে নহে—প্রতিদিনের কর্ম্মক্ষেত্রে, সামাজিক ব্যবহার এবং অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানাদিতে। অনেকে মনে করেন যে, তাহা হওয়া অসম্ভব। কারণ, প্রথমত জাতিভেদ, দ্বিতীয়ত একই দেশে নানা জাতির সমাবেশ। ইহাতে যে ভারতবর্ষের শাপে বর হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা বড় কেহ ভাবিয়া দেখেন না।

এক হিন্দুমুসলমান ধরিয়াই অনেকে মনে করেন, বিশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হচ্চে এই দুই জাতির ধর্ম্মভাবের লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের চিত্রেই ইতি-

হাদের পৃষ্ঠাগুলি তাঁহারা আগাগোড়া পূর্ণ করেন। অথচ চিরকাল হিন্দু মুসলমান একত্র—পাশাপাশি এক গ্রামে রহিয়াছে, পরস্পরের সুখে-দুঃখে সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছে, মুসলমান-পীর-ফকিরের নিকটে হিন্দু ধর্ম্ম শিখিতে গিয়াছে, হিন্দুসন্ন্যাসীর দ্বারে মুসলমান দেখা দিয়াছে, মুসলমানরাজ্যে হিন্দু—সেনাপতি, মন্ত্রী রহিয়াছে, হিন্দুরাজ্যে মুসলমান বড় বড় কর্ত্তৃত্বের পদ পাইয়া আসিয়াছে। মুসলমানগণের ধর্ম্মের মধ্যেও আছে যে, 'ঈশ্বর সকলেরই ঈশ্বর, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নহেন'—সুতরাং হিন্দুর সহিত তাহার যা ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া, তাহা অবিশ্বাস এবং বিশ্বাস লইয়া—'দীন' এবং 'ধর্ম্ম' লইয়া। এমন কিছু মুসলমানধর্ম্মে নাই; যাহা হিন্দুধর্ম্মের কোন-না-কোন অংশে নাই, পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করা পাশ্চাত্যদের একটি অজ্ঞতা বই আর কিছুই নয়। সুফীধর্ম্ম অনেকেই জানেন,—বেদান্তমতের সহিত তাহার অতি নিকট সম্পর্ক। মুসলমানগণের মধ্যে এই ধর্ম্মের অভ্যুদয় হওয়াতেই প্রমাণ যে, হিন্দু-ভাবের দর্শনের প্রভাব তাহার উপর কার্য্য করিয়াছে।

মহম্মদ, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ এবং শঙ্করাচার্য্য—এই চারি যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা পরস্পরের পথে কণ্টকরোপণ করেন নাই—কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে এশিয়ারই একটি বিশিষ্ট প্রতিভার নমুনা—যাঁহাদের অদ্ভুত ইন্দ্রজালময় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে একএকটি বৃহৎ মণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল—যাহা পুনঃপুন এশিয়ার সভ্যতা এবং চিন্তা ও সাধনাকে এক প্রমাণ করিয়াছে।

এশিয়ার মধ্যে বিশেষভাবে সেই ঐক্য হিন্দুধর্ম্মের, ভারতবর্ষের। হিন্দুধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাহার মধ্যে অসংখ্য মতের সমাবেশ, কোন্‌টা যে হিন্দুধর্ম্ম এবং কোন্‌টা যে নয়, তাহা আদরেই বলা চলে না। বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ হইতে চার্ব্বাকের সংশয়-বাদ পর্য্যন্ত,—নিরাকার-নির্গুণের ভজনা হইতে তেত্রিশকোটি দেবদেবীর ভজনা পর্য্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্ম্ম। এইজন্য চীন-মঙ্গল যেখানেই যাওয়া যায়, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের ছাপ সর্ব্বত্রই,—কন্যাকুমারিকা এবং জাপানের কোয়ানইয়ন ভারতবর্ষের মা-কালী এবং চীন কারো—কে আগে, কে পরে, ইতিহাসের জানিবার বিষয়—কিন্তু এশিয়ার সর্ব্বত্র যে ভারতবর্ষের ছাপ লাগিয়া আছে, ইহা সুনিশ্চিত। আর্য্য চিন্তাস্রোত যে এক সময়ে সমস্ত এশিয়াখণ্ডকে প্লাবিত করিয়াছিল—এবং যে সেমিটিক্‌জাতি বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার এক হিসাবে প্রবর্ত্তক, তাহারাও যে কতটা সেই চিন্তা-প্রবাহের নিকটে ঋণী, জেনীস্‌, জেনোয়া, ক্রুজেড্‌ প্রভৃতির যথার্থ ইতিহাস বাহির হইলে তাহা বুঝা যাইবে। বস্তুত তাওইজ্‌ম্‌ জোরো আষ্টারের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাজাল—সুফিইজ্‌ম্‌ সেই বৃহৎ ধারারই একএকটি শাখাপ্রশাখা, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

এ যেমন ব্যাপকভাবে সমস্ত এশিয়ার ঐক্যকে সপ্রমাণ করিতেছে, তেমনি সেই এক আর্য্যধর্ম্ম হইতেই কালে কালে যে কত ধর্ম্মের উৎপত্তি এই ভারতবর্ষেই ঘটিয়াছে—অথচ সেই মূলভাবের সহিত বিবেচনা

করিয়া দেখিলে তাহাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ, বাংলায় শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম, শিখগুরুদের ধর্ম্ম, রামদাস-তুকারামের ধর্ম্ম, রামানুজের ধর্ম্ম—সমস্তই বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় এবং সমস্তের সঙ্গেই সেই গোড়ার ঋষিযুগের চিন্তা, দর্শন ও সাধনার যোগ আছে। এই-রূপে এক একটি প্রদেশে এক এক বিচিত্র ভাবপ্লাবন উপস্থিত হইয়া সে প্রদেশকে নূতন, সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া দিয়া গেছে, মহারাষ্ট্র ও শিখের অভ্যুত্থান, বাংলার বৈষ্ণব-যুগ, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে এক সময়ে সমস্ত এশিয়ায় একটা ভাববিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম কি বাস্তবিক আর্য্যধর্ম্ম হইতে কোন অংশে তফাৎ ছিল, না তাহারই রসে পুষ্ট ফুলের মত তাহারই শাখায় উদ্গত হইয়া-ছিল? বৌদ্ধ সূত্রাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুর মত ও চিন্তার সারাংশগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ছড়াইয়া পড়িতে-ছিল। সেই এক মহাপুরুষের চারিদিকে একটি বিচিত্র মণ্ডলী বা সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল,—যাহা সর্ব্বাংশেই সুসমঞ্জসীভূত, কেন্দ্রবদ্ধ। সেই মণ্ডলীর ভাবাবেগ চীন, জাপান, সিরিয়া ইজিপ্ট সর্ব্বত্র পথ কাটিয়া চলিল, ব্যবসা-বাণিজ্য পত্তন করিল, স্বরাজ্যে হাঁসপাতাল, পশুচিকিৎসা আরম্ভ করিল এবং নানা পথঘাট ও কূপ রচনা করিল—এ সকলই তাহার নব-জীবনের উৎসাহজনিত স্ফূর্ত্তির ফল।

ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে স্থান দিয়াও যে মিলনের একটি পথ অবারিত রাখিয়াছে, তাহার কারণ তত্ত্ব, বিচারের দিক্ দিয়া পর-স্পর স্বতন্ত্র যতই হৌক্ না কেন, ভারতবর্ষের সাধনা এক। বুদ্ধ বলিলেন যে, কর্ম্মমাত্রেই শৃঙ্খল, বাসনাই কর্ম্মের মূল, অতএব অনন্ত কর্ম্মশৃঙ্খলা, জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণা হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে বাসনা ত্যাগ কর। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিরা সে কথা বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়া-ছেন যে, যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে, আপনার মধ্যে শুদ্ধবুদ্ধ নিত্য চৈতন্য আত্মার সাক্ষাৎ-কার হইলে ভববন্ধন আপনি ছিন্ন হইবে, জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইবে—কিন্তু তাহা হইলেই গোড়ায় আত্মা হইতে অনাত্মে নিজেকে সম্প্রসারণ করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, মায়াপাশ ছেদন করিতে হইবে—সেই বুদ্ধের কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমাত্রেরই মিল কোথায়? তত্ত্বাংশে অমিল এবং প্রভেদ থাকিলেও সাধনের রাস্তা সকলেই সেই এক ধরিয়াছেন। সেই নিবৃত্তিভাবের দ্বারাই যে সমস্ত সমাজও পরিচালিত, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

বুদ্ধের পর শঙ্করাচার্য্য তৎকালীন পুরা-ণের মন্ত্রতন্ত্র-জটিলতা ও নানা বিগ্রহাদি ভেদ করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষের 'আইডিয়া'কে জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি একটি সমন্বয় গড়িয়া তুলিলেন। লোকধর্ম্মের সহিত প্রাচীনধর্ম্মের যে ব্যবধান রচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা তিনি ভাঙিয়া দিলেন এবং পুনরায় সেই লোকধর্ম্মের সহিত প্রাচীনের কোথায় যোগ, তাহা প্রদর্শন করি-লেন। মায়া, কর্ম্ম প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রচলিত লৌকিক কথাগুলির ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার কার্য্যের যে কতটা মূল্য, ভারতবর্ষ-

ব্যাপী তাঁহার অদ্বৈতবাদের প্রভাব দেখিলেই বুঝা যাইবে—অন্ত কোন সমালোচনাই এ সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

শঙ্করের পর রামানুজ, মাধবাচার্য্য, রামদাস, তুকারাম, শিখগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবলবেগে যেখানেই ধর্ম্মভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সেখানেই নব নব জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়াছি। সে সকল ধর্ম্ম বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে সেই একটা কড়া এবং পরিষ্কার তত্ত্বের ভাব রহিয়াছে,—যাহা একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট নহে, পরন্তু নানা ভাবের সমন্বয়সাধনে তৎপর। এখনও আমাদের দর্শনে যে নানা সমন্বয় চলিবে এবং এই উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

তবেই ভারতবর্ষীয় চিন্তার ফল শেষটা দাঁড়াইতেছে এই:—বিশেষ কোন মত বা সম্প্রদায় নহে, সমন্বয়—বিশেষ গির্জ্জা নহে, বরং আধ্যাত্মিক কালচারের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নূতন ব্যাপার এখন আসিয়া পড়িয়াছে, এখন আর একটা বৃহৎ সমন্বয়পাশে বাঁধিয়া-তুলিয়া ইহাদিগকেও সেই ভারতবর্ষীয় ঐক্যক্ষেত্রের অন্তর্গত করিয়া লইতে হইবে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, মুসলমান-সময়ে আকবর-শাজাহান প্রভৃতির মধ্যে সেইরূপ একটা সমন্বয়প্রতিষ্ঠার ভাব জাগিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানেরা আমাদের শাস্ত্রাদি, চিন্তা ও সাধনার সহিত একেবারেই কোন সংস্রব রাখেন নাই, তজ্জন্ত সেই সমন্বয়ের প্রস্তাব তেমন কার্য্যকর ও ফলদায়ক হইল না। তথাপি সুফিইজ্‌ম্ প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যে, কিয়ৎপরিমাণে ভারতবর্ষের ভাব মুসলমানের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। তা ছাড়া, আচারব্যবহার-রীতিনীতির বৈষম্যও এতটা মিলিয়া আসিতেছে যে, হিন্দুর সামাজিক ভাবও মুসলমানকে আক্রমণ করিতেছে; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যে বৃহৎ সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাই এক হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস। নিবেদিতা সেই ইতিহাসের আভাস তাঁহার পুস্তকে দিয়াছেন। এইজন্ত সমস্ত ভারতবাসীর হইয়া আমি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারিলাম না।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, গীতাই আমাদের 'Gospel'। গীতা সমস্ত ভাব, সমস্ত মতকেই স্থান দিয়াছে, গীতার সমন্বয় অতি আশ্চর্য্য। এবং পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সাধনার পথ যে নিষ্কামকর্ম্মের পথ, তাহাও গীতারই উপদেশ। নিবেদিতা লিখিতেছেন—

"Spirituality is with it no retreat from men and things but a burning fire of knowledge that destroys bondage, consumes sluggishness and egoism, and penetrates everywhere. Not the withdrawn but the transfigured life, radiant with power and energy triumphant in its selflessness, is *religion*."

ইউরোপ তাহার বহুতর জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে হতবুদ্ধি হইয়া সম্প্রতি ঐক্যান্বেষণ করি-

ভেছে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের নিগূঢ় সত্যসকলের যোগ রহিয়াছে—যদিও আমরা কোনকালেই বিজ্ঞানচর্চ্চা করি নাই—এখন আমরা যদি সজীব হইয়া উঠি এবং পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র ঐক্যের 'আইডিয়া' মাথায় লইয়া কাজ সুরু করিয়া দিই, তবেই সমস্ত মনুষ্যসমাজকে আমাদের কি দিবার আছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। ইউরোপে ধর্ম্মবিশ্বাস, সমাজ প্রভৃতি সমস্তই নূতন ও বৃহৎ হইবার আশায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভারতবর্ষের এখন যাহা করিবার আছে, তাহা ভারতবর্ষ কি করিয়া উঠিতে পারিবে!

রোমান্‌সাম্রাজ্যের মধ্যে এক সময়ে এইপ্রকার একটি বৃহৎ সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইজিপ্ট্, সিরিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ, জুডিয়া, গ্রীস্—এসকল দেশের অন্তর্নিহিত ভাব ও বিশ্বাস মেডিটারেনিয়ান্‌বাসীরা জড় করিয়াছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য-দেশে সেইপ্রকার একটি জগদ্ব্যাপী সমন্বয়ের প্রয়োজন, সেই সমন্বয় ভারতবর্ষ আনিয়া দিবে—এই আশা আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হোক্। দীর্ঘকালব্যাপী ভারতবর্ষের সাধনা ব্যর্থ হইবে না!

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অনুকূল নহে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি—"A nation becomes whatever she believes herself to be"—একটি জাতি আপনার সম্বন্ধে যাহা আন্তরিক বিশ্বাস করে, তাহাই হইয়া উঠে। ভারতবর্ষ কি বিশ্বাস করিতেছে?

খৃষ্টানধর্ম্মে রোমান্‌ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম যেমন একাংশমাত্র, ক্যাথলিক্ না হইলেও তাহাকে ক্রীশ্চান্ বলা চলে, তেমনি আমাদের—religious system—ধর্ম্মের মতবাদ অংশটুকু সেই সামাজিক, ব্যাবহারিক, অর্থনৈতিক প্রকাণ্ড ধর্ম্মব্যাপারের নিকটে অতিশয় ক্ষুদ্র। আসলে ধর্ম্ম মানে religion নহে, যদিও আমরা তাহাই বলিয়া আসিয়াছি। ধর্ম্ম বলিতে সেই বৃহৎ ব্যাপারটি বোঝায়—যাহা সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক, যাহাকে বরং national good—জাতীয়মঙ্গল নাম দেওয়া যাইতে পারে। সেই ধর্ম্মরক্ষা করিলে আমরা পল্লিসমাজ হইতে বৃহৎ ভারতবর্ষীয় অথবা 'স্বদেশী সমাজে' উপনীত হইতে পারিব, পরানুবর্ত্তিতা ও অনুকরণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজের দেশে নিজে দাঁড়াইব, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, একই স্বদেশী সত্তা অনুভব করিব।

আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, এই ধর্ম্ম এক-সময়ে সমস্ত লোককে কি মঙ্গল দান করিয়াছে,—ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, কূপ ও জলাশয় খনন, অতিথিশালানির্ম্মাণ, পথঘাটরচনা প্রভৃতি বিবিধ পূর্ত্তকর্ম্ম, মঙ্গলকর্ম্ম এই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল এবং সমস্ত লোকে, আপামর সাধারণে এই কর্ত্তব্যগুলি বিভক্ত ছিল। এখন সেইরূপ একটি দেশ-ব্যাপী সংসদ্ গড়িতে হইবে, তাহাতে হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমান সেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে এবং এইরূপে সমগ্র দেশের ভাব, সমগ্র জাতির ঐক্যভাব আপনিই দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে।

উপসংহারে নিবেদিতা বলিতেছেন :—

"At this moment, however, a new suspicion is making itself

heard, a suspicion that behind all these interpretations—the social reform, the political agitation, religious movements and economic grievances—there stands a greater reality, dominating and co-ordinating the whole, the Indian national idea, of which each is a part. It begins to be thought that there is a religious idea that may be called Indian, but it is of no single sect, that there is a social idea, which is the property of no caste or groups, that there is a historic evolution, in which all are united, and that is the thing within all these which alone is to be called '*India*.'"

শ্রীম:—

অনাহত।

দাঁড়িয়ে আছে আধেকখোলা
বাতায়নের ধারে
নূতন বধূ বুঝি?
আস্‌বে কখন্ চুড়ি-ওলা
তোমার গৃহদ্বারে
ল'য়ে তাহার পুঁজি।
দেখ্‌চ চেয়ে গোরুর গাড়ি
উড়িয়ে চলে ধূলি
খর-রোদের কালে;
দূর নদীতে দিচ্ছে পাড়ি
বোঝাই নৌকাগুলি
বাতাস লাগে পালে।

আধেকখোলা বিজনঘরে
ঘোম্‌টাছায়ায় ঢাকা
একলা বাতায়নে

বিশ্ব তোমার আঁখির 'পরে
কেমন পড়ে আঁকা
তাই ভাবি যে মনে।
ছায়াময় সে ভুবনখানি
স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন সে পিতামহীর বাণী
নাইক আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা।

আমি ভাবি, হঠাৎ যদি
বৈশাখের দিন
বাতাস বহে বেগে—
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শৃঙ্খে বাঁধনহীন,
পাগল উঠে জেগে,—
যদি তোমার ঢাকাঘরে
যত আগল আছে
সকলি যায় দূরে—
ঐ যে বসন নেমে পড়ে
তোমার আঁখির কাছে
ও যদি যায় উড়ে,—
তীব্র তড়িৎহাসি হেসে
বজ্রভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে ঢুকি'
জগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তিমূর্ত্তি ধরে'
দাঁড়ায় মুখোমুখি—
কোথায় থাকে আধেকঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপনমাথা

আপনগড়া মায়া,—
উড়িয়া যায় সবি !

তখন তোমার ঘোম্‌টা-খোলা
কালো চোখের কোণে
কাঁপে কিসের আলো,
ডুবে তোমার আপ্‌না-ভোলা
প্রাণের আন্দোলনে
সকল মন্দভালো।
বক্ষে তোমার আঘাত করে
উত্তাল নর্ত্তনে
রক্ততরঙ্গিণী।
অঙ্গে তোমার কি সুর তুলে
চঞ্চল কম্পনে
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী !

আজকে তুমি আপনাকে
আধেক আড়াল করে'
দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে
দেখ্‌তেছ এই জগৎটাকে
কি যে মায়ায় ভরে'
তাহাই ভাবি মনে।
অর্থবিহীন খেলার মত
তোমার পথের মাঝে
চল্‌ছে যাওয়া-আসা,
উঠে ফুটে মিলায় কত
ক্ষুদ্র দিনের কাজে
ক্ষুদ্র কাঁদা-হাসা !

জন্মান্তরবাদ এবং অলৌকিক-শক্তি-পিপাসা।

বহুদিন পূর্ব্বে 'আদিম ধর্ম্মভাব এবং যোগের অঙ্কুর' প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। এ প্রবন্ধটি তাহার অনুবর্ত্তী হইলেও সেটির প্রতি নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইবে না। সে প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার একটি কথার পুনরুল্লেখ করিব মাত্র। লিখিয়াছিলাম যে—(১) জন্মান্তরবাদ এবং (২) ভূত নামাইয়া ও যাদুমন্ত্রবলে শক্তিলাভের বিশ্বাস হইতে যোগ প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রকৃতিবিশ্লেষণ করিবার পর যোগবিকাশের ইতিহাস লিখিব।

১। জন্মান্তরবাদ।

এদেশের কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি জাতির মধ্যে তাহাদের আদিম ধর্ম্মভাব বহু-পরিমাণে অক্ষুণ্ণ আছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জ্ঞান এবং সভ্যতার তুলনায় উহাদিগকে বর্ব্বর এবং অসভ্য বলিয়া থাকি। আমাদের মত উহাদের সমাজে বহুপ্রকার মতবাদ নাই। উহারা যে কত দিন হইতে কোন্ দেশে আছে, তাহা জানা নাই বলিয়া উহারা আদিম জাতি বলিয়াও উল্লিখিত হয়। নহিলে সৃষ্টির ইতিহাসে কে আদিম এবং কে আধুনিক, তাহা বলিতে পারা যায় না।

পৃথিবীর এই আদিম, অসভ্য এবং বর্ব্বর জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ মরিয়া জীব বা উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ করে। অনেক জীব বা উদ্ভিদের বহুজাতির বংশপ্রবর্ত্তক বলিয়াও খ্যাতি আছে। সুন্দর লোক মরিলে ময়ূর হয়, ধূর্ত্তলোক মরিলে শৃগাল হয়, সাহসী যোদ্ধা মরিলে সিংহ হয় প্রভৃতি বিশ্বাস আত্মার অন্যদেহসংক্রমণের বিশ্বাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

মঙ্গলবাদী আর্য্যেরা যখন প্রতিবেশী-দের এই বিশ্বাস অলক্ষ্যভাবে আত্মস্থ করিয়াছিলেন, তখন অন্যদেহসংক্রমণ পর্য্যন্তই শেষ পরিণতি বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। সকলেরই উদ্ধার আছে, সকলেরই মঙ্গল হইবে; কাজেই আত্মার লক্ষযোনিপরিভ্রমণের পর, হয় মনুষ্যজন্ম, না হয় দেবত্বলাভ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। অনার্য্যের জন্মান্তরবাদ এবং আমাদের সংসারচক্রবাদে এই প্রভেদ।

"শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী",—সে কথা ত ঠিক; কিন্তু কে কোন্ শরীরে প্রবেশ করে? দুষ্টেরা দুষ্ট জন্তু হয়, সাধুরাও ভাল জন্তু হয়; ইহাই অসভ্যের বিশ্বাস। সংসারচক্রবাদেও তাই, তবে শেষ পরিণাম লইয়া যা কথা। প্রথমত কিন্তু—

> রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
> তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥

নীচশরীরে প্রবেশ করিলে নরকভোগ হয়; কাজেই এই মতে পুণ্যকর্ম্মের প্রতি

আদরবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু নীচ-শরীর গ্রহণ করিলে যে নরকযন্ত্রণাভোগ হয়, নৈষধকারের কলি তাহা মনে করেন না। কলির তর্কে কিন্তু খুব ক্ষুরধার আছে। শাস্ত্রে বলে যে, জন্ম হইলেই যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণার প্রথম নরকময় অবস্থা ক্লেদাদি-পূর্ণ জঠরবাস। শিশু বা ভ্রূণপিণ্ড যখন গর্ভস্থ, তখন ত তাহার জ্ঞান বলিয়া জিনিষটারই জন্ম হয় নাই; কাজেই আমাদের অনুরাগ এবং ঘৃণাদির বিচারে তাহার অবস্থাকে দুঃখময় বলা চলে না। কেহ যদি কৃমি হয়, তবে কৃমির অনুরাগবিরাগের অনুভূতিদ্বারাই তাহার সুখদুঃখের মাপ হওয়া উচিত। শরীরান্তরগ্রহণে নীচত্বজ্ঞান-জনিত নরকভোগ কোথায়? নৈষধকার বোধ হয় তাঁহার খণ্ডনখাদ্য লিখিবার পর কলিকে নৈয়ায়িক সাজাইয়াছিলেন।

কলি অতি ঘোর পাষণ্ড; তাহার নরকভয় না থাকিতে পারে; কিন্তু মুমুক্ষুরা এখনো গাহিয়া থাকেন—"দিও না আবার মাগো, জঠরযন্ত্রণা মোরে।" নীচ পশুজন্ম কেহ চায় না; এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের পরেই চিরমুক্তি বলিয়া একটা-কিছু প্রার্থনা করে। কিন্তু কি উপায়ে তাহা লাভ হইতে পারে?

মরণের সময় যে যে-জন্তু দেখিয়া মরে, সে সেই জন্তু হয়, বর্ব্বরজাতির মধ্যে এ-প্রকারের বিশ্বাসও কোথাও কোথাও আছে। এ বিশ্বাসটাও প্রকারান্তরে আর্য্যদের পৌরাণিক ধর্ম্মমতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভরত চিরজন্ম তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি নিষ্পাপ, তবুও মরণের সময় হরিণটির কথা মনে ছিল বলিয়া, তাঁহাকে হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইল। মরণকালের চিন্তাটুকু সমগ্র জীবনের কর্ম্ম অপেক্ষা ওজনে ভারি, এই বিশ্বাস হইতেই অনেক দুরাচার মৃত্যুর দরজায় দাঁড়াইয়া একবার হরিনাম করিয়া যমদূতকে ঠকাইতে চায়। পাদ্রি-সাহেবেরাও হাঁসপাতালি ও জেলে অনেক হিদেন্‌কে মৃত্যুকালে খ্রীষ্টমন্ত্র দিয়া অনন্ত-নরকের শঙ্কা হইতে উদ্ধার করেন। হ্যাম্‌লেটের খুড়া মহাপাপিষ্ঠ; তবুও সে যখন উপাসনায় বসিয়াছিল, হ্যাম্‌লেট্‌ তখন তাহাকে বধ করিলেন না; কেন না, তাহা হইলে পাপিষ্ঠকে স্বর্গে পাঠাইবার উপকার করা হইত। সকল দেশেই এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মরণকালে পশু ভাবিলে যদি পশু হইতে হয়, তবে ব্রহ্ম ভাবিলে একেবারে ব্রহ্ম হওয়া যাইতে পারে; এই হইল তর্কের ফল। ব্রহ্মের যখন জন্মমরণ নাই, তখন ব্রহ্ম হইয়াই জন্মমরণ তিরোহিত করা যাইতে পারে। আত্মা এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ, এবং মায়া কাটাইয়া সেইটি বুঝিয়া ফেলাই মুক্তি; অদ্বৈতবাদের এই সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব অল্পদেশের লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। কিন্তু মরণের সময় ব্রহ্ম ভাবিলে ব্রহ্ম হওয়া যায়, এই বিশ্বাসটা দৃঢ় থাকাতে, অতি সূক্ষ্ম অদ্বৈতবাদটি এদেশের আপামর-সাধারণের মধ্যে সহজ বিশ্বাসের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

অন্তরে ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় করিয়া লোকানুরাগের কার্য্যে যদি ব্রতী হও, যদি পুণ্যময়

সংসারধর্ম্ম কর, তাহাতে ঠিক্ মুক্তি হইবে না। কারণ লোকানুরাগ থাকিলে তুমি "লোক" হইবে, সংসারধর্ম্ম করিলে তুমি সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ঈশ্বরবিশ্বাসে বললাভ করিয়া সংসার করার নাম মোক্ষধর্ম্ম নহে। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করা চাই, মন হইতে সকল কথা ফেলিয়া দিয়া কেবল পরমাত্ম-ধ্যান করা চাই। এটা নিতান্তই অসাধ্য-সাধনা। মনের যেমন গঠন, তাহাতে অন্য কথা মনে পড়িবেই পড়িবে। এই অসাধ্য-সাধনার জন্য একটা অনৈসর্গিক যোগবলের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। যোগের প্রক্রিয়াগুলির সমালোচনায় তাহা স্পষ্টতর করিব।

যোগানুশাসনের ১ম পাদের ৩য় সূত্রে আছে—

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্";

এবং সর্ব্বশেষ সূত্রে আছে—

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।"

মানুষের যত-কিছু গুণ আছে, যাহা-কিছু ধারণা বা চিন্তা আছে, সে সকল উড়াইয়া দিয়া আপনার চিন্ময়স্বরূপে অবস্থিতিই কৈবল্য। জন্মান্তরবাদ হইতে যদি সংসার-চক্রবাদের উৎপত্তি না হইত, তবে এই কৈবল্যের সৃষ্টি এবং এই কৈবল্যলাভের উপায়ভূত যোগপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইত না।

২৷ অলৌকিক-শক্তি-পিপাসা।

মানুষ যথেষ্টশক্তিশালী হইলেও প্রাকৃতিক শক্তির কাছে তাহাকে পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি যত পরিমাণে বহিঃ শক্তিকে পরাভূত বা নিয়মিত করিতে পারে, সে ব্যক্তি তত সভ্য বলিয়া গণিত। প্রাকৃতিক শক্তিকে কিয়ৎপরিমাণে নিয়মিত করিতে না পারিলে জীবনধারণ করা অসম্ভব; কাজেই উহার উপর সম্পূর্ণ প্রভুতাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা মনুষ্যের মনে স্বাভাবিক। মানুষের বাহিরে শত্রু, ভিতরে শত্রু। আপনার প্রবৃত্তিগুলির উত্তেজনায় বহু দুঃখভোগ করিতে হয়; সেগুলিকেও নিয়মিত করিবার প্রয়োজন। যত্ন করিলেও অসীম শক্তিপুঞ্জ পদানত হয় না, কিন্তু জ্ঞানবিকাশ এবং প্রবৃত্তিগুলি নিয়মিত করিতে পারিলে আপনার মনের মধ্যে স্বর্গরচনা করা যাইতে পারে। উহা হইতে যে নৈতিকশক্তি লাভ করা যায়, তাহার কাছে শারীরিক শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। সহজ পথে চলিয়াই মানুষ এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে। উন্নতচরিত্র পুরুষেরা জ্ঞান এবং চরিত্রবলের মাহাত্ম্য উহা সুস্পষ্ট অনুভব করেন। গুহাতিগুহ তন্ত্র বা প্রাণায়ামের দ্বারা উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় না। এই আত্মশক্তির মহিমা-সম্বন্ধে শান্তিপর্ব্বের অমূল্য উপদেশে যাহা পাই, একালের যোগশাস্ত্রানভিজ্ঞ ইংরাজ-কবিবচনেও তাহাই পাই।

Self-reverence, self-knowledge, self-control—
These three alone lead life to sovereign power,
Yet not for power (power of herself
Would come uncalled for), but to live by law,
Acting the law we live by without fear.

সেকালের-একালের সহজ পথের পথিক জ্ঞানীদের এই অভিজ্ঞতার কথাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযমে ক্ষমতালাভ হয়; কিন্তু এই ক্ষমতার জন্য সাধনা নহে;—ক্ষমতাটা আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে।

যাহারা অলস এবং কর্ম্মভীরু, তাহারা কুবেরের ভাণ্ডার হইতে অর্থপ্রত্যাশা করে; আকাশের দিকে তাকাইয়া সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান এবং বল লাভ করিতে চায়; ভূত নামাইয়া জ্ঞানাতীত তত্ত্ব লাভ করিতে চায়, ভূতের বলে বলীয়ান্ হইতে চায়। শ্রমশীল অপেক্ষা অলসের আকাঙ্ক্ষা অধিক, অর্জ্জনক্লেশানভিজ্ঞেরা নিমেষের মধ্যে স্বপ্নলব্ধ সম্পদে রাজাধিরাজ হইবার কল্পনা করে। ঐ ত কর্ম্মশীল যুবা, এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়াও অতি অল্পমাত্র ধন সঞ্চয় করিল; সকলপ্রকার স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন করিয়াও জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুপুরে চলিয়া গেল। এমন কি কোন উপায় নাই, যদ্দ্বারা ধূলিমাটিকে সোনা করা যাইতে পারে; যদ্দ্বারা গুপ্তধনলাভের মত কিছু লাভ করিয়া জরা এবং মৃত্যুকে পরিহার করা যাইতে পারে?

এ পৃথিবীর এমনি বিধান যে, যে ব্যক্তি আলস্যসুখলাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ করে, তাহাকে অধিকতর কষ্টকর শ্রমে জীবনক্ষয় করিতে হয়। উপার্জ্জনের ক্লেশ পরিহার করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে হইলে, সুখশান্তি হারাইয়া, রাত্রিজাগরণ করিয়া, নিরন্তর শঙ্কিত থাকিয়া, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। কুম্ভকরেচকাদি করিয়া স্বাস্থ্যলাভ, ইচ্ছামৃত্যু বা অমরত্ব লাভের চেষ্টা কি কঠোর পীড়াদায়ক!

প্রাণায়ামে বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক কারণ আছে। মানুষ দেখিতে পায় যে, শ্বাসরোধ হইলেই মানুষ মরে। তাহা হইলেই যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। দেখিতে পায় যে, পরিশ্রম করিলেই লোকে হাঁৎফাঁৎ করিয়া নিশ্বাস ফেলে, এবং অতিপরিশ্রমে শরীরেরও ক্ষয় হয়। তখন একটা অদ্ভুত জীবনতত্ত্বে বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, সমগ্র মানুষের জীবন হয় ত কোন-একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শ্বাসপ্রশ্বাসের সমষ্টি। তাহা হইলেই যদি কোন উপায়ে ঐ শ্বাসপ্রশ্বাসকে বেশ নিয়মিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং কুম্ভকাদিদ্বারা সর্ব্বদাই অনেক 'হাতের পাঁচ' বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে "শতং সমাঃ" কেন, একেবারে অমর হওয়াও যাইতে পারে। কত মহাপুরুষ নাকি লক্ষ লক্ষ বৎসর নিশ্বাস ধারণ করিয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছেন।

যখন সর্ব্বচিন্তানিরপেক্ষ হইয়া আত্মচিন্তার কথা উঠিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে অদ্ভুত প্রক্রিয়া এবং মন্ত্র বলে ক্ষমতালাভের কথা হইয়াছিল, তখন সহজপথের পথিকদের আত্মজ্ঞান এবং আত্মসংযমের কথার নূতন অর্থ হইয়াছিল। তত্ত্বকথার সম্বন্ধে মহাপুরুষেরা যখন বলেন যে, যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায়, যাহার কর্ণ আছে সে শুনিতে পায়; তখন অনেকে বুঝিয়া থাকেন যে, আমাদের স্বোপার্জ্জিত চক্ষু দুইটি ছাড়া একটা দেবদত্ত সত্যিকার চক্ষু ফুটিয়া উঠে এবং তাহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি পাহাড়পাথরের মত

দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা লাভ করিতে হইলেই অলৌকিক উপায় চাই, ভূত চাই, মন্ত্রতন্ত্র চাই। তখন sovereign powerএর নূতন অর্থ হয়। তখন নাকের ডগায় দৃষ্টি রাখিয়া, স্বরূপশূন্য সমাধি করিয়া, সত্য-সত্যই "হস্তিবল" (যোগ ৩, ২৫ সূ), ভুবনজ্ঞান (ঐ ২৭ সূ), এবং তারাব্যূহজ্ঞান (ঐ ২৮ সূ) লাভ হয়; এবং "মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্" (ঐ ৩৩ সূ) ঘটে।

চরমলক্ষ্য নাকি কৈবল্য, কাজেই ঐ করিত ক্ষমতার সম্বন্ধেও মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতার কথা বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ Not for power, power of herself would come uncalled for—অর্থাৎ খাঁটি সোনা মাটির মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

আদর্শের হিসাবে ক্ষমতা চাই না বটে, কিন্তু এই ক্ষমতালাভের আশাই প্রথমত যোগপ্রণোদক ছিল। অসীম ক্ষমতালাভের দুরাশা হইতেই ভূতের আশ্রয়গ্রহণ এবং অলৌকিক সাধনার অবলম্বন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দোল।

মানবমনের নিভৃতকুঞ্জে
দুলিছে হৃদয়দোল।
হৃদয়দেবতা হাসিতেছে বসি
উদাসীন আলাভোলা।
কখন সমুখে কখন বা পিছে
হৃদি-হিন্দোলা দোদুল দুলিছে
পলকের মাঝে লাগিছে বাঁধন
পলকে হতেছে খোলা
মানবমনের গোপনকুঞ্জে
দুলিছে হৃদয়দোলা।

ঊর্দ্ধে দুলিছে অসীম আকাশ
নিম্নে দুলিছে সিন্ধু
নিখিল নিরত নিজ নিজ পথে
তপন তারকা ইন্দু

কবে বেজেছিল সৃজনবাঁশরী
সেই সে মোহন ধ্বনি অনুসরি'
বিশ্বজগৎ দুলিতেছে সাথে
বৃহৎ হইতে বিন্দু
ঊর্দ্ধে দুলিছে অসীম জগৎ
নিম্নে দুলিছে সিন্ধু
ভিতরে বাহিরে চিরদিন ধরে'
দুলিছে জগৎ-দোলা
জগৎ-দেবতা হাসিতেছে বসে'
উদাসীন আপাভোলা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ইলেক্ট্রন্।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে গিল্‌বার্টসাহেব ও তাহার অনেক পরে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়াছিলেন,—প্রত্যেক জিনিষেই ধনাত্মক (Positive) ও ঋণাত্মক (Negative) নামক দুইপ্রকার বিদ্যুৎ আছে। যে জিনিষে ধনাত্মক বিদ্যুতের আধিক্য থাকে, তাহাকে আমরা ধনাত্মকবিদ্যুৎপূর্ণ বলি এবং যাহাতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ অধিক-পরিমাণে থাকে, তাহাকে ঋণাত্মকবিদ্যুৎপূর্ণ বলিয়া থাকি। এই দুইজাতীয় বিদ্যুতের পরিমাণ কোন জিনিষে সমান থাকিলে, তাহাতে আর বিদ্যুতের লক্ষণ দেখা যায় না, কারণ তখন ধনাত্মক বিদ্যুৎ সমপরিমাণ ঋণাত্মককে টানিয়া রাখে।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্কম্যাক্সওয়েল্ বলিয়াছিলেন—জলের যেমন নিজের কোন শক্তি নাই, বিদ্যুতেরও সেইপ্রকার কোনই শক্তি নাই। জল উঁচুস্থানে রাখিলে বা তাহাতে সবলে চাপাদি দিলে, তাহা দ্বারা যেমন অনেক কাজ করাইয়া লওয়া যায়, বিদ্যুৎকেও আমরা সেই-প্রকারে চালাইয়া কাজ করাইয়া লইয়া থাকি। আমরা তাপ-আলোক উৎপন্ন করিবার উপায় জানি, ম্যাক্সওয়েল্ বলিয়াছিলেন—বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার উপায় আমরা জানি না। এই জিনিষটা প্রস্তুতই আছে, তাহাকে কোনপ্রকারে গতিসম্পন্ন করিতে পারিলেই, আমরা তাহার কাজ দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখন সল্‌ফিউরিক এসিডে তাম্র ও দস্তার পাত ডুবানো

যায়, তখন বিদ্যুৎ প্রস্তুত হয় না, স্বাভাবিক বিদ্যুৎকে সচল করানো হয় মাত্র।

আজ ত্রিশবৎসর ধরিয়া ম্যাক্সওয়েলের শিষ্যগণ বিদ্যুতের পূর্ব্বোক্ত মতবাদটি প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিষটা যে কি, তাহা এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পরিষ্কার জানা যাইত না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা বলিতেন,—সম্ভবত জড়েরই কোন বিশেষ আকার বা ধর্ম্মকে আমরা বিদ্যুৎরূপে দেখি।

এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্তটিই নাড়াচাড়া করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি যে একটি নূতন মতবাদের কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে উহার সত্যতায় ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। এই নব সিদ্ধান্তিগণের মতে বিদ্যুৎ জড়ের বিশেষ আকার বা ধর্ম্মের বিকাশ নয়; বিদ্যুৎই অবস্থাবিশেষে পড়িয়া জড়ের উৎপত্তি করে।

নূতন সিদ্ধান্তটি বুঝিতে হইলে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ জিনিষগুলি কি, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। ধনাত্মক বিদ্যুতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধান্তিগণ বলেন —জিনিষটার খুঁটিনাটি আজও ঠিক্ জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বব্যাপী ঈথরের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেরই বিশেষ গুণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অংশগুলির আয়তন সাধারণ পরমাণু (Atoms) অপেক্ষা বৃহত্তর নয়, কিন্তু পরমাণুমাত্রেরই যেপ্রকার গুরুত্ব দেখা যায়, ধনাত্মক বিদ্যুতের সেপ্রকার গুরুত্বের আজও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক টম্‌সন্, রদার্‌ফোর্ড ও সনর অলিভার লজ্ প্রভৃতি আধুনিক বড় বৈজ্ঞানিকেরা এ, সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

অতি অল্পদিনমধ্যে ঋণাত্মক বিদ্যুতের অনেক তথ্য জানা গেছে। এই জিনিষটা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড়কণার আকারে অবস্থান করে। বৈজ্ঞানিকগণ এগুলিকে ইলেক্ট্রন্ (Electron) নামে অভিহিত করিতেছেন। বায়ুশূন্য পাত্রের দুই প্রান্তে তার লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, প্রবাহের সহিত ইলেক্ট্রন্‌গুলিকে অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে দেখা যায়, এবং এই প্রবাহ কোনপ্রকারে অবরুদ্ধ হইলে, প্রবাহস্থ কোটি কোটি ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনের আঘাতে অবরোধক জিনিষটা উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং শেষে তাহা হইতে একপ্রকার আলোকও বাহির হইতে দেখা যায়। রন্‌জেন্‌রশ্মি বা x-Rays কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্লাটিনম্ প্রভৃতি গুরুভারবিশিষ্ট পদার্থদ্বারা ইলেক্ট্রনের প্রবাহ অবরুদ্ধ হইলে, ঐ রশ্মির উৎপত্তি হয়। লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রন্ দ্রুতগতিতে আসিয়া ধাক্কা দিতে থাকিলে, প্লাটিনমের অণুগুলি চঞ্চল হইয়া পার্শ্বের ঈথরকণাসকলকে কাঁপাইয়া তুলে, এই কম্পনজাত আলোকই রনজেন্‌রশ্মি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইলেক্ট্রনের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। একটি পরমাণু যে অতি ক্ষুদ্র স্থান অবরোধ করে, তাহার মধ্যে কোটি কোটি ইলেক্ট্রন্ অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারে। এইজন্য ঐ অতি ক্ষুদ্র কণাগুলির প্রবাহ যে-কোন পদার্থদ্বারা

অবরুদ্ধ হয় না। আলুমিনিয়ম্ প্রভৃতি লঘু-ধাতুর ফলক ইলেক্ট্রন্‌প্রবাহের পথে ধরিলে, চালুনির ছিদ্র দিয়া ময়দার গুঁড়া বাহির হওয়ার মত অধিকাংশ ইলেক্ট্রন্‌ই অবাধে বাহির হইয়া পড়ে।

লৌহখণ্ডের নিকট চুম্বক রাখিলে লৌহ আপনা হইতেই চুম্বকের নিকটে আসে। ইলেক্ট্রনের প্রবাহের সম্প্রতি ঐপ্রকার একটা গুণ দেখা গেছে। বায়ুহীন নলের ভিতর-কার ইলেক্ট্রন্‌প্রবাহের নিকট একখণ্ড চুম্বক রাখ,—প্রবাহের পথ বাঁকিয়া চুম্বকের নিকটে আসিবে। কতখানি চৌম্বকশক্তিতে প্রবাহের পথ কতটা বাঁকিয়া যায়, হিসাব করিয়া কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ইলেক্ট্রন্‌সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের পরীক্ষায় জানা গেছে, ইলেক্ট্রন্‌গুলি এত লঘু জিনিষ যে, তাহাদের আটশতটির ভার একটি হাইড্রোজেন্-পরমাণুর ভারের সমান।

ধাতু ইত্যাদি পরিচালক পদার্থের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ কিপ্রকারে চলাফেরা করে, বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত তাহা নিশ্চিত বলিতে পারিতেন না। আজকাল ইলেক্ট্রন্ লইয়া বিদ্যুৎপরিচালনের যে একটি ব্যাখ্যান দেওয়া হইতেছে, তাহা অনেকটা নিশ্চিতের দিকে অগ্রসর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক টম্‌সন্ ও লজ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন—তারের ভিতর দিয়া যখন বিদ্যুৎ যায়, সেই সময় বিদ্যুৎময় ছোট ছোট ইলেক্ট্রন্‌গুলি ধাতুনির্ম্মিত তারের অণুগুলিতে তাহাদের বিদ্যুৎ চালিয়া দেয় এবং পরে তাহারাই আবার পার্শ্বস্থ অণুতে সেই বিদ্যুৎ চালাইয়া এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের উৎপত্তি করে। অধ্যাপক লজ্ তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—দূরস্থান হইতে ইষ্টকাদি বহিয়া আনিতে হইলে, শ্রমজীবীরা সার দিয়া দাঁড়াইয়া যেমন একের স্কন্ধ হইতে অপরের স্কন্ধে ইষ্টক চালান দেয়, ধাতুর ভিতরকার শ্রেণীবদ্ধ অণুগুলিও সেইপ্রকারে বিদ্যুৎ-পরিচালন করিয়া থাকে।

তরলপদার্থে বিদ্যুৎপরিচালনের ব্যাপা-রটা কিছু স্বতন্ত্ররকমের। ধাতবপদার্থে ইলেক্ট্রন্‌গুলি যেমন ধাতুর অণুতে বিদ্যুৎ চালিয়া দিয়াই মুক্তি পায়; এখানে সেপ্রকার হয় না। তরলপদার্থের কোন দুই অংশে ব্যাটারির তার সংলগ্ন রাখিলে, তারের এক প্রান্ত হইতে ইলেক্ট্রন্‌প্রবাহ বাহির হইয়া অপর প্রান্তের অভিমুখে ছুটিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রন্‌গুলি সেই তরল-পদার্থের কতক কতক অণুকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কোনপ্রকার ভার না চাপা-ইলে ঘোড়া খুব দৌড়িয়া চলিতে পারে, কিন্তু গুরুভার পৃষ্ঠে পড়িলেই তাহার গতি আপনা হইতেই মন্থর হইয়া আসে। এই-প্রকার কারণে ধাতু বা বায়ুহীন স্থানের বিদ্যুতের বেগের তুলনায় তরলপদার্থের ভিতরকার বিদ্যুতের বেগ অনেক কম হইতে দেখা যায়।

কেম্ব্রিজের বৈজ্ঞানিকগণ আর একটি বিশেষধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা দেখিয়াছেন,—ইলেক্ট্রনের প্রবাহ হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করিলে বা কোন পদার্থদ্বারা ইলেক্ট্রনের গতি বাধা পাইলে পার্শ্বস্থ ঈথর আলোড়িত হইয়া যে একপ্রকার ক্ষুদ্র

তরঙ্গের উৎপত্তি করে, তাহাই আলোকাদি-বিকিরণের মূলকারণ। আলোক যে, ঈথরতরঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা বহুদিন হইতে জানিয়া আসিতেছি, কিন্তু কিপ্রকারে সেই ঈথরতরঙ্গের উৎপত্তি, তাহা আমাদের জানা ছিল না। এখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অনুমান করিতেছেন, —সম্ভবত ইলেক্ট্রনের গতির আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ঈথরে যে তরঙ্গ জন্মায়, তাহাই আলোকোৎপত্তির একমাত্র কারণ।

রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক জড়পদার্থের অনুসন্ধান করিলে অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, লৌহতাম্র ইত্যাদি অনেকগুলি মূলজড়ের উল্লেখ দেখা যায়। বিজ্ঞানের মতে ঐ কয়েকটি মূলপদার্থের সংযোগেই জগতের সকল জিনিষই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত এই প্রাচীন সিদ্ধান্তটির কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু ইলেক্ট্রনের আবিষ্কারে ইহারো সত্যতার উপর অনেকেরই সন্দেহ দেখা যাইতেছে। কয়েকজন খ্যাতনামা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—ইলেক্ট্রনই একমাত্র মৌলিকজড়। আমরা প্রবন্ধান্তরে জড়তত্ত্বসম্বন্ধীয় এই নূতন কথাটির বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

প্রত্যাবর্ত্তন।

আমি এসেছি আবার।
লও মাগো, লও কোলে, কবে গিয়েছিনু চ'লে,
আবার এসেছি ফিরে চরণে তোমার।
নগ্ন ইষ্টকের স্তূপ, তারি মাগো কত রূপ,
খুঁজি নাই সৌধশোভা দুখিনী মাতার ;
আমি এসেছি আবার।

২

কোথা সেই পুণ্যধূলি, ল'ব আজি শিরে তুলি',
সেই 'শিশু'তরুতল শৈশববিহার।
সেই শেফালীর শাখে, কত ফুল ফুটে থাকে,
—পুরাতন স্মৃতি জাগে আজো গন্ধে তার।
আমি এসেছি আবার।

৩

পিকমুখে সেই গীত আজো করে পুলকিত
ফাগুনে উতলা বায়ু বহে অনিবার;
তেমনি মধ্যাহ্নবেলা, পথে করে 'হোরি'-খেলা
বুকে মুখে ধূলা ছুড়ে না করে বিচার!
আমি এসেছি আবার।

৪

সেই পুরাতন বট, তেমনি নদীর তট,
তেমনি অলসে খেয়া করে পারাপার;
তেমনি স্নাতক ঘাটে, বালকে সাঁতার কাটে,—
উতলা করিয়া জল করে তোলপাড়;
আমি এসেছি আবার।

৫

একদা তরুণ প্রাহ— বাহিরিনু উদ্‌ভ্রান্ত—
লইয়া বিদায় মাগো, চরণে তোমার!
দূরে দীপ্ত ভবিষ্যৎ দেখিনু চিত্রিতবৎ—
দেশে দেশে ভ্রমিলাম বহি দুঃখভার;
আমি এসেছি আবার!

৬

বিশ্বজনতার মাঝে সংসার ডাকিল কাজে,
গেল দিন, গেল মাস, গেল বর্ষ আর!
স্মরি' তব স্নেহমুখ পাইতাম কত দুখ,
পরাণ উঠিত কাঁদি করি হাহাকার!
আমি এসেছি আবার।

৭

অপরিচিতের মত, ঘুরিনু বিদেশে কত,
কাটিল কত-না দিন,—আশা-নিরাশার!
বুকে কত ক্ষতচিহ্ন কে দেখিবে তোমা ভিন্ন,
কে ফেলিবে মোর দুখে স্নেহঅশ্রুধার!
আমি এসেছি আবার।

৮

তোমার কল্যাণস্পর্শ আবার আনিবে হর্ষ,
ঘুচিবে হৃদয়মাঝে বিরহ-আঁধার।
তোমার আনন্দছবি, তোমার আকাশ, রবি
আবার করিবে মাগো, পুলকসঞ্চার।
আমি এসেছি আবার।

৯

তোমার বাতাস এসে প্রাণ ল'বে মোর কেশে,
সর্ব্বাঙ্গে বুলাবে কর আলোক তোমার;
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ সম সে যে নিত্য নিরুপম,
তেমনি অক্ষয় আর তেমনি উদার।
আমি এসেছি আবার।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

৪

ভীষণ গুহা।

এই সকল গুহাগহ্বর, পৌরাণিক সমস্ত দেবতাদিগের নামেই উৎসর্গীকৃত; কিন্তু যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার প্রায় অধিকাংশই মৃত্যুর দেবতা শিবের নামে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বকালে, যাহাদের চিত্তে নানাপ্রকার ভীষণ ও বিরাট্ কল্পনার উদয় হইত, সেই সব মনুষ্য কত কত শতাব্দী ধরিয়া অতীব আগ্রহসহকারে পর্ব্বতের প্রস্তরপাষাণ খুঁদিয়া এই সমস্ত গুহাগহ্বর প্রস্তুত করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধযুগের, কতকগুলি ব্রাহ্মণযুগের এবং কতকগুলি আরো প্রাচীন জৈনরাজাদের আমলের। সভ্যতার বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া, বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া; এই সকল আশ্চর্য্য খননকার্য্য অব্যাহতে ও ধারাবাহিকরূপে ভারতীয়-তক্ষণশিল্পিগণ-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লেখক, সেই মাস্‌উদিনামক একজন আরব এইরূপ বলেন:—প্রায় একসহস্র খৃষ্টাব্দে এই সকল গুহার অতীব মাহাত্ম্য ছিল;

ভারতবর্ষের সকল দিক্ হইতেই অসংখ্য যাত্রী এখানে ক্রমাগত আসিয়া উপস্থিত হইত।

এক্ষণে এই সকল গুহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে চতুর্দ্দিকস্থ রুক্ষ-শুষ্ক প্রদেশটি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই মৃতকল্প প্রদেশের অভ্যন্তরে এই গুহাগুলি কতকাল হইতে এইরূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় ও নিস্তব্ধতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ নাই।

অধুনা এই সকল গুহায় উপনীত হইতে হইলে, একটা ছোটখাটো মরুভূমি অতিক্রম করিতে হয়; এই ভূমির বর্ণ মৃগচর্ম্মের ন্যায়; ইহা সমুদ্রতটস্থ সৈকতভূমির ন্যায় সমতল; কেবল একএকটি নিঃসঙ্গ পর্ব্বত ইতস্তত সমুত্থিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতগুলা যেন একটু বেশিরকম মানানসই; মাথায়-মাথায় সব একসমান;—দেখিতে কারাগারের ন্যায়—বৃহৎ দুর্গনগরের ন্যায়।

আজ আমি ভারতীয় শকটে করিয়া প্রখর রৌদ্রে এই বিজন প্রদেশ অতিক্রম করিলাম। যাত্রাপথের দুই ধারে মরা গাছগুলা খুঁটির মত সারি-সারি পোঁতা রহিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে একটা মৃতনগরের উপচ্ছায়া পার হইয়া গেলাম—যাহা পূর্ব্বে দৌলতাবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যেখানে নির্ব্বাসিত হইয়া, তিনশত বৎসর হইল, গঙ্গোলের শেখ-সুলতান ইহলীলা সংবরণ করেন। পুরাকালে চিত্রসমূহে, 'ব্যাবেলের টাওয়ার' যেরূপ দেখা যায়—তাহার সহিত অনেকটা এই মৃতনগরের সাদৃশ্য দূর হইতে উপলব্ধি হয়। ইহা একটি নগরগিরি,—একটি মন্দিরদুর্গ, একটি বৃহৎ শৈলখণ্ড—যাহা হইতে পূর্ব্বকালীন মনুষ্যেরা ইহাকে খুঁদিয়া-কাটিয়া বাহির করিয়াছে;—যাহাতে ইমারতের মালমসলা প্রয়োগ করিয়াছে,—যাহার আপাদমস্তক একটু মানানসই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে বালুরাশি-সমুত্থিত মিশরীয় পিরামিড্ অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়। ইহার কাছাকাছি শতশত সমাধিমন্দির ভগ্নদশাপন্ন হইয়া মাটীর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। কত সূচ্যগ্রচূড়াবহুল দন্তুর প্রাকারাবলী পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। গঙ্গোলের ন্যায় এখানেও লৌহশলাকাবৃত ভাঁজওয়ালা ভীষণ জোড়া-কপাটের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে জনপ্রাণী নাই;—কেবলি নিস্তব্ধতা, ভগ্নাবশেষ, আর ইতস্তত শুষ্কতরুসমূহ বিরাজমান; বটবৃক্ষগুলা কঙ্কালসার,—উহার শাখাপ্রশাখা হইতে দীর্ঘ কেশগুচ্ছের ন্যায় শিকড় নামিয়াছে। আবার আমরা সেইরূপ ভাঁজ-কপাটের দরজা দিয়া বাহির হইলাম,—সেইরূপই অকেজো ও সেইরূপই ভীষণ-বর্ম্মে আবৃত।

পূর্ব্বদিকে উচ্চ শৈলভূমি দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া উপরে উঠিতে হইল। আমাদের মন্দগামী শকটের পিছনে-পিছনে আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। এখন সূর্য্যাস্তের সময়। মেঘের অভাবে দেশ মৃতকল্প,—তথাপি সূর্য্যাস্তের সেই একই অপরিবর্ত্তনীয়

আরক্তিম ভাস্বর-মহিমা। আমরাও যেমন উপরে উঠিলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই দৌলতাবাদ—ধ্বজচূড়া-প্রাকার-মন্দির-সমন্বিত সেই ভীষণ দৌলতাবাদ যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া খাড়া হইয়া উঠিল; মুক্ত আকাশে, দেবকিরীটের স্থায় অস্তভানুর কিরণচ্ছটার মধ্যে, দৌলতাবাদের অবয়বরেখা ফুটিয়া উঠিল। এদিকে সেই নিস্তব্ধ অসীম লোহিত ক্ষেত্রভূমিতে যেন আগুন জলিতেছে বলিয়া বোধ হইল, সেখানে জীবনের নিদর্শনমাত্র নাই।

এই উচ্চ শৈলভূমির উপর আরো একটা ধ্বংসাবশেষ আমাদের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল;—"রজাস্" নামক একটা অত্যন্ত-মুসলমানী-ধরণের নগর;—"পোড়ো" মস্জিদ্ ও সরু-সরু ভগ্ন ধ্বজস্তম্ভে আচ্ছন্ন। উহার প্রাকারাবলীর সন্নিকটে রাশিরাশি সমাধি-গম্বুজ সন্ধ্যার আলোকে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাত্রি যখন আসন্ন, সেই সময়ে এই সব প্রাণশূন্ত রাজপথের ধারে-ধারে উষ্ণীষধারী কতকগুলি লোক পাথরের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। এই দৃঢ়ব্রত বৃদ্ধগণ এই নগরের শেষ-অধিবাসী; শুধু এই সব মস্জিদের মাহাত্ম্যে বাঁধিয়েই উহারা এখানে "মাটী কাম্‌ড়াইয়া" পড়িয়া আছে।

তাহার পর প্রায় একঘণ্টাকাল আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না—কেবল সেই একঘেয়ে শ্যামল শৈলরাশি—সায়াহ্নের মহা-নিস্তব্ধতার মধ্যে সম্মুখে প্রসারিত।...

পরে হঠাৎ এমন-একটা আশ্চর্য্য পদার্থ—অসম্ভব পদার্থ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—যাহা দেখিয়া এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, প্রথম মুহূর্ত্তে মনোমধ্যে যেন একটু ভয়ের উদয় হয়। সমুদ্র! সমুদ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত, অথচ আমি মধ্য-ভারতে নিজামের রাজ্যে রহিয়াছি! অধিত্যকাভূমির উপর একটা কুঠারখনিত বৃহৎ গহ্বর—সেইখানেই যেন সমস্ত সেই "তরঙ্গিত অসীম" পূর্ণমহিমায় প্রসারিত। বিস্তীর্ণ শৈলভূমির উপর হইতে নিম্নস্থ অধিত্যকাভূমি আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। এই উচ্চ শৈলভূমির ধার দিয়া আমাদের যাত্রাপথ। এই সময়ে নিম্নদেশ হইতে একটা প্রবল বাতাস উঠিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল; এ বাতাসটা তেমন গরম নহে—যেন কতকটা খোলা-সমুদ্রের হাওয়া।...

এই শৈলভূমির পরপারে হাজাপোড়া গুঁড়া-মাটীর যে শুষ্কক্ষেত্র প্রসারিত—সেইখানেই এই বাতাস ধূলা-বালির ঢেউ উঠাইয়া সমুদ্রের মত সফেন তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

তা ছাড়া, আমরা আমাদের যাত্রাপথের শেষসীমায় সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখনো গুহার * লেশমাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই গুহাগুলা আমাদের নিম্নে—ঐ বিষাদময় কল্পিত-সমুদ্রতটের ধারে-ধারে—বিস্তীর্ণ শৈলভূমি কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; এবং ঐ জলহীন সমুদ্রের সম্মুখেই এই ভীষণ গুহাগুলা মুখব্যাদান করিয়া আছে।

* এলোরার গুহা।

এখন রাত্রি, আকাশে তারা জ্বলিতেছে; আমার শকট একটা ক্ষুদ্র পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া থামিল। আমার আতিথ্যকারী—পলিতকেশ দুইজন বৃদ্ধ ভারতবাসী আমার অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভৃত্যগণকে—যাহারা "আলতামি" করিয়া নিকটস্থ মাঠে বেড়াইতেছিল—উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন।

আজ রাত্রে আমাকে শিবের গুহায় লইয়া যাইতে কেহই সম্মত হইল না। তাহারা বলিল, আজ রাত্রিটা অপেক্ষা করিয়া কাল দিনে গেলেই ভাল হয়। অবশেষে একজন ছাগপালক রাখাল কিছু অর্থের লোভে আমাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। আমরা সঙ্গে একটা হাত-ল্যাণ্ঠান্ লইয়া যাত্রা করিলাম। নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশপথে যাইবার সময় ল্যাণ্ঠান্‌টা জ্বালাইতে হইবে।

আজিকার রাত্রি চন্দ্রহীন, কিন্তু বেশ স্বচ্ছ পরিষ্কার; চক্ষু অন্ধকারে একটু অভ্যস্ত হইলেই, এই রাত্রিকালেও বেশ দেখা যাইবে। এখন সেই সাগরচ্ছন্নবেশী নিম্নক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। প্রায় ৬৭ শত-গজ-পরিমাণ একটা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। কুঠারাহত খোদিত শৈলগণ যেন মর্ম্মান্তিক যাতনায় অভিভূত। এখানকার সকল পদার্থেরই ন্যায়—"ক্যাক্‌টাস্"-গাছগুলাও শুষ্কশীর্ণ, কিন্তু তবু এখনো খাড়া হইয়া আছে। ইহার শুষ্ক-কঠিন শাখাগুলা ডালওয়ালা ঝাড়ের বড়-বড় মোমবাতির মত দেখিতে হইয়াছে।

যাহা উপর হইতে সমুদ্রতট বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই তটরেখা অনুসরণ করিয়া যখন চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সেই নীচে, অন্ধকার যেন আরো ঘনাইয়া আসিল। উচ্চ শৈলভূমির আড়ালে যেখানে ছায়া পড়িয়াছে, সেই শৈলভূমির পাদদেশে এই কল্পিত সমুদ্রটি অবস্থিত। রাত্রির প্রারম্ভে যে-একটা জোরবাতাস উঠিয়াছিল, তাহা এখন শান্ত হইয়াছে। এখন কোথাও আর সাড়াশব্দ নাই। এই স্থানটির কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য!

পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে গুহার প্রবেশপথগুলা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এই গুহার মুখ চারিদিক্‌কার অন্ধকার হইতে আরো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গুহাগুলা এত প্রকাণ্ড যে, উহা মানুষের রচনা বলিয়া মনে হয় না—আবার এতটা মানানসই যে, নৈসর্গিক পদার্থ বলিয়াও বোধ হয় না।...

আমরা একটুও না থামিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সেই পথপ্রদর্শক একটু ইতস্তত করিতেছিল; কিন্তু একটু পরেই কি জানি কি ভাবিয়া, একটা মুখ-বাঁকানি দিয়া, আমাদের সহিত আবার চলিতে লাগিল। বোধ করি, যেখানে আমাদিগকে লইয়া যাইবে মনে করিয়াছিল, সেইখানে যাইতে তাহার মনে দেবতাদির ভয় কিংবা এমনি-একটা সাদাসিধা ভয়ের উদয় হইয়াছিল। এখানকার এক-একটা স্থান যে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী ভয়ানক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখের ভাবে মনে হইতেছিল, সে যেন আমাকে এইরূপ বলিতেছে—"না, আর

বেশীদূরে গিয়া কাজ নাই—এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।" কিন্তু পরে সে আমার সহিত শৈলখলিত প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া,—ক্যাক্‌টাস্‌-গাছের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহামুখে প্রবেশ করিল। এখনি এই স্থানটি আমার নিকট ভীষণ-সুন্দর বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, পথপ্রদর্শক আমাকে যে-স্থানটি দেখাইতে সাহস করিতেছে না, তাহার কাছে ইহা কিছুই নয়।

ঘোড়সওয়ারদিগের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় মুক্তাকাশ বৃহৎ প্রাঙ্গণসমূহ সেই সব প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ হইতে—সেই আদিমকালের পর্ব্বত হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। উহার দেয়াল এত উচ্চ যে, মনে হয় যেন এখনি মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে। দেয়ালের গায়ে,—মোটা-মোটা খাটো থামের চার-থাক্ বারণ্ডা-দালান উপর্য্যুপরি স্থাপিত। এই দালানের বরাবর ধারে-ধারে অমানুষিক-দেহপ্রমাণ সারি-সারি দেবমূর্ত্তি,—যেন নাট্যালয়ে বৃহত্তর অভিনয়ে কতকগুলা লোক অসাড় ও স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রির অন্ধকারে সমস্তই কালো দেখাইতেছে। এই সব দালানের মাথার উপর তারকাখচিত আকাশ ভিন্ন আর-কিছুই নাই। তারার এই অস্পষ্ট তরল আলোকে আমরা সেই বিরাট্ মূর্ত্তিগুলা দেখিলাম। উহারা যেন দর্শকের ন্যায় আমাদের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এইরূপ এক-এক-সার গুহা যে কত রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এইরূপ প্রত্যেক গুহার সার,—কোন বিশেষ সময়কার লোকদিগের সমবেত উদ্যম ও প্রভূত শ্রমের ফল।

আমার পথপ্রদর্শক ছাগপালক প্রথমে ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই সব ভয়ানক স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশ তাহার সাহস জন্মিল। এক্ষণে ঘোর-অন্ধকার একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় সে তাহার হাতল্যাণ্ঠান্‌টা জ্বালিল। আর এখন আমাদের মাথার উপর আকাশের তারা নাই—তাহার স্থানে পর্ব্বতের স্থূল প্রস্তররাশি প্রসারিত। ইহা একটা ঢাকাপথ—দুই ধারের প্রাচীরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই গুহা "গথিক্ ক্যাথিড্রালের" মধ্য-দালান-মণ্ডপের মত উচ্চ ও গভীর। মসৃণ দেয়ালের গায়ে পশু-পক্ষীর মূর্ত্তির অনুকরণে উৎকীর্ণ একপ্রকার ছোট-ছোট খিলান রহিয়াছে। গুহার ভিতরে গিয়া মনে হয়, যেন একটা বিরাট্-কায় জন্তুর দেহের শূন্যগর্ভ খোলের মধ্যে রহিয়াছি। এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ল্যাণ্ঠান্‌টা এমন মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল যে, কিছুই প্রায় দেখা যাইতেছিল না। এই দীর্ঘ দালানের মধ্যে মনে হইল, যেন জনপ্রাণী নাই। কিন্তু গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটা আকৃতি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল;—২০ কি ৩০ ফীট্ উচ্চ একটি নিঃসঙ্গ বিগ্রহ সিংহাসনে আসীন; পশ্চাৎ হইতে তাহার ছায়া মণ্ডপের খিলান-ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং সেই ছায়া আমাদের ল্যাণ্ঠানের চলন্ত আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত স্থানটির ন্যায় এই বিগ্রহও সেই-একই শ্যামল প্রস্তরে নির্ম্মিত;

কিন্তু তাহার বিরাট্ দেহ লাল-রঙে রঞ্জিত। বড়-বড় শাদা চোখ;—কালো-কালো চোখের তারা যেন আমাদের দিকে অবনত; মনে হয়, যেন তাহার নৈশ শান্তির ব্যাঘাত হওয়ায় একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার নিস্তব্ধতা এরূপ মুখর যে, আমাদের কথা শেষ হইয়া গেলেও, আমাদের কণ্ঠস্বরের অনুরণন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। বিগ্রহের একদৃষ্টি-চাহনিতে আমরা যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। যাই হোক্, আমার পথপ্রদর্শক ছাগপালকটির এখন আর কোন ভয় নাই; সে এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, এই সকল প্রস্তরবিগ্রহ, যেমন দিবসে, তেমনি রাত্রিকালেও অচল, স্থির। গুহা হইতে বাহির হইয়া তাহার ল্যাণ্ঠান্ নিবিয়া গেলে, সে ইচ্ছা করিয়া আবার ফিরিয়া চলিল; আমি বুঝিলাম, আগে সে-জিনিষের কাছে যাইতে সাহস করিতেছিল না, এখন আমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইতে চাহে। যে বালুকারাশি সমুদ্রের সৈকতবেলাভূমিকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই বালুকারাশির উপর দিয়া আমরা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম;—শৈলভূমির রেখা অনুসরণ না করিয়া এবার তাহার উল্টা-দিকে চলিলাম। সেই স° প্রবেশপথের সম্মুখে আর থামিলাম না। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই তাহার রহস্যভেদ করিয়াছি।

যখন আমরা শেষসীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমার পথপ্রদর্শক আবার তাহার ল্যাণ্ঠান্ জালিল এবং জালিয়া একটু পিছু হটিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, যেখানে আমরা যাইতেছি, সে স্থানটা খুব অন্ধকার।

সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রবেশপথটি অধিকতর ভীষণ। কারণ, এইমাত্র যে বিগ্রহগুলি দেখিয়া আসিলাম, তাহাদের ন্যায় এই দ্বারদেশের মূর্ত্তিগুলা শান্তচিত্ত নহে—পরন্তু যেন রোষের আবেশে ও কষ্টযাতনায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকাইয়া ফেলিয়াছে; এই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে এত কম দেখা যায় যে, কোন্ মূর্ত্তিগুলি পাথর কাটিয়া গঠিত এবং কোন্গুলিই বা পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এই গণ্ডশৈলগুলাও, এই অতিভারাক্রান্ত পাষাণস্তম্ভগুলাও যেন অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িয়াছে; যেন তীব্র যাতনায় উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। আমরা এখন শিবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত;—সেই শিব,—যিনি মৃত্যুর দেবতা, সংহারের জন্যই যিনি সংহার করিয়া থাকেন, সংহারেই যাঁহার আনন্দ।

এই দ্বারদেশের নিস্তব্ধতায় কি-যেন-একটা বিশেষত্ব আছে—একটা বিশেষ-প্রকারের ভীষণতা আছে। এই গণ্ডশৈল-সমূহ, এই সব মানবাকার বিরাট্মূর্ত্তি, এই সব প্রস্তরীভূত মূর্ত্তিমান্ কষ্টগুলা, এই সব রুদ্ধশ্বাস সাক্ষাৎ যন্ত্রণাগুলা—দশ শতাব্দী হইতে এই মহানিস্তব্ধতার মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে;—এ সেই নিস্তব্ধতা, যাহা একটু নিশ্বাসপাতেই মুখরিত হইয়া উঠে,—যে নিস্তব্ধতার মধ্যে আপনার পদশব্দ শুনিয়া বিচলিত হইতে হয় এবং আপনার প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাস যেন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

এখানে আর সমস্তই প্রত্যাশা করিতে-ছিলাম, কিন্তু কোন শব্দ শুনিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু গুহার প্রথম মণ্ডপটিতে যেই আমরা পদার্পণ করিয়াছি, অম্‌নি হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হইয়া সমস্ত স্থান কাঁপিয়া উঠিল। ঘড়ির ঘুম-ভাঙানো ঘণ্টাটির কলকাটি স্পর্শ করিলে হঠাৎ যেরূপ বাজিয়া উঠে, সেইরূপ একটা শব্দ এক সেকেণ্ডের মধ্যে গুহার গভীরতম দেশ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। যাহারা উপরের প্রস্তররাশির মধ্যে ঘুমাইতেছিল,—চীল, পেচক, শকুনি প্রভৃতি সেই সব শিকারী পাখী জাগিয়া উঠিয়া পাখার ঝাপ্‌টা দিতেছিল,—পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছিল। ইহা তাহারই শব্দ। এই সমস্ত সমবেত-ধ্বনি গুহার স্বাভাবিক-মুখরতা-প্রভাবে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া অতিরিক্তপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। পরে ক্রমশ প্রশমিত হইয়া শব্দটা দূরে চলিয়া গেল,—থামিয়া গেল। আবার সেই ঘোর নিস্তব্ধতা।...

এই স্তম্ভপরিবেষ্টিত গম্বুজ-আচ্ছাদিত মণ্ডপটি হইতে বাহির হইয়াই মাথার উপর আবার তারা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই তারাগুলা আকাশের ফাঁকে মাঝে-মাঝে দেখা যাইতেছে—যেন একটা গহ্বরের গভীরদেশ হইতে দৃষ্ট হইতেছে। এখন আমরা কতকগুলা মুক্তাকাশ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। একটা সমগ্র পর্ব্বতের আধখানা তুলিয়া-ফেলিয়া এই প্রাঙ্গণগুলা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হইতে যে প্রস্তর বাহির হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই একটা নগর নির্ম্মিত হইতে পারে। এই প্রাঙ্গণগুলার বিশেষত্ব এই যে, উহার দেয়াল ২০০ফীট্ উচ্চ এবং উহার গায়ে থাকে-থাকে কতকগুলি বারণ্ডা-দালান উপর্য্যুপরি স্থাপিত এবং অসংখ্য বিগ্রহ যুদ্ধোদ্যত সৈন্যের ন্যায় সারি-সারি সজ্জিত। এই সব প্রাঙ্গণপ্রাচীর ভারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া ভীষণভাবে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই প্রাচীর এক-একটা অখণ্ড কঠিন প্রস্তর-খণ্ড নির্ম্মিত; উহার আপাদমস্তক কোথাও একটি ফাট্ নাই, চীর নাই। প্রাঙ্গণের এই দেয়ালগুলা খুব ঝুঁকিয়া থাকায় গুহার আকার ধারণ করিয়াছে, এবং এরূপ ভীষণ, যেন আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত।

ওদিক্‌কার কতকগুলা প্রাঙ্গণ একেবারে খালি। কিন্তু এই প্রাঙ্গণগুলা বিরাট্ পদার্থ-সমূহে আচ্ছন্ন,—ক্রমসঙ্কীর্ণ চতুষ্কোণ স্তম্ভমন্দির (obelisk), পীঠের উপর স্থাপিত হস্তী, মন্দিরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ, দেবালয় প্রভৃতি। এখন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি। এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র দীপটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানকার সমগ্র নক্সা, কল্পনাটি যে কি, তাহা এখন নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। এখন চতুর্দ্দিকে কেবল প্রাচুর্য্য ও ভীষণতাই লক্ষিত হইতেছে। যাইতে যাইতে কোথাও বা প্রস্তরে-অঙ্কিত একটা বৃহৎ শবমূর্ত্তি, কোথাও বা কোন নরকঙ্কালের অথবা দৈত্যের মুখে অঙ্কিত বিকট হাস্যরেখা মুহূর্ত্তকাল বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া আবার তখনি সেই বিশৃঙ্খল পদার্থরাশির মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে।

প্রথমে আমরা শুধু কতকগুলি নিঃসঙ্গ হস্তী দেখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, কতকগুলা হস্তী দল বাঁধিয়া সারি-সারি দণ্ডায়মান, তাহাদের শুঁড়গুলা নীচের দিকে ঝুলিয়া আছে। আরো কতপ্রকার জীবজন্তু হাতপা খিঁচাইয়া মরণকে যেন ভ্যাংচাইতেছে। ইহাদের মধ্যে এই হাতীরাই শান্তমূর্ত্তি। মধ্যস্থলে অখণ্ড-প্রস্তরের যে তিনটি বৃহৎ মন্দির—এই হস্তীরা সেই মন্দির পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই সকল মন্দির ও গুহার চতুর্দ্দিকে সেই যে ভীষণ দেয়ালগুলা—এই উভয়ের মধ্য দিয়া একপ্রকার চক্রাকার পথে আমরা চলিতে লাগিলাম। মধ্যে-মধ্যে তারা দেখা যাইতেছে। তারাগুলা এত দূরবর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বে আমার কখন মনে হয় নাই। সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে জড়াজড়ি-জাপ্‌টাজাপ্‌টি, দৈত্যদানবের যুদ্ধ ভীষণ মৈথুন, মনুষ্যদেহের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়াছড়ি। উহাদের মধ্যে কাহারো অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তবু পরস্পরকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া আছে। এখানে শিব, শিব, ক্রমাগতই শিব। শিব—যাঁহার ভূষণ মুণ্ড-মালা; শিব—যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া আবার সংহার করিতেছেন; শিব—যিনি দশদিকেই সমানভাবে সংহার করিতে পারিবেন বলিয়া বহুবাহু হইয়াছেন; শিব—যাঁহার মুখে মর্ম্মান্তিক প্রচ্ছন্ন উপহাসের কুটিল রেখা; শিব—যিনি পরে বিনাশ করিবেন বলিয়াই এখন নির্দ্দয়রূপে সন্তান উৎপাদন করিতেছেন; শিব—যিনি ধ্বংসাবশেষের উপর, ছিন্নমূল বাহুসমূহের উপর, ছিন্নভিন্ন অস্থিরাশির উপর হুঙ্কার ছাড়িয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন; শিব—যিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃতবালিকাকে পদদলিত করিয়া উন্মত্ত-আনন্দে হাস্য করিতেছেন এবং তাঁহার পদাঘাতে ঐ সব শবমুণ্ড হইতে মস্তিষ্ক উছলিয়া পড়িতেছে। আমাদের ল্যাণ্ঠানের আলো নীচের দিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, শুধু নিম্নস্থ ভীষণ দৃশ্যগুলার মধ্যে কোন-কোনটা একএকবার প্রকাশ পাইয়া আবার তখনি অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে। স্থানে-স্থানে এইসব মূর্ত্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—বহু-শতাব্দীর ঘর্ষণ-স্পর্শনে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটা-কিছু দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রই অন্ধকার যেন তাহার উপর একটা-তুলি বুলাইয়া দেয় এবং তখনি উহা সেই চঞ্চল তমোরাশির মধ্যে কোথায় যেন ছুটিয়া পলায়—শৈলরাশির সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কোথায় গিয়া থামিল বুঝা যায় না। তখন এইরূপ মনে হয়, যেন সমস্ত পর্ব্বতটা—তার হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত—কেবল কতকগুলা অস্পষ্ট ভীষণ আকৃতিতে সমাচ্ছন্ন; সমস্তই যেন বিলাস ও বিনাশের দৃশ্যে পরিপূর্ণ।

মধ্যস্থলের মন্দিরগুলি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া হস্তিগণ সারি-সারি দণ্ডায়মান; ইহাদের যেরূপ শান্তভাব, তাহাতে এ স্থানের পক্ষে ইহাদিগকে "বেসুরো" ও "বেখাপ্পা" বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই মন্দিরগুলির অপর পার্শ্বে গিয়া দেখিলাম, উহাদেরি সমান-উচ্চ আর কতকগুলা হস্তী অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে যুঝাযুঝি ও যন্ত্রণার ভাবভঙ্গী প্রকটিত করিতেছে; কতকগুলা বাঘ ও কতকগুলা

করিত জীবজন্তু এই হস্তীদিগকে চাপিয়া ধরিয়াছে অথবা উহাদের উদরে দংষ্ট্রাঘাত করিতেছে। একে ত উহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগে দেয়ালের ভার চাপিয়া থাকায় উহারা যেন অর্দ্ধনিষ্পেষিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে আবার পরস্পরের মধ্যে প্রাণপণে যুদ্ধ চলিতেছে। এই পাশটাতেই গুহার প্রাচীর—সেই আদিম ভূস্তরের পাষাণরাশি—সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই প্রাচীরের দশ কিংবা বিশ ফিট্ উচ্চে অত্রত্য অসংখ্য মূর্ত্তিগুলার প্রথম রেখাপাত আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীরের সমস্ত তলদেশটা স্ফীত উদরের ন্যায় মসৃণ; স্থানে-স্থানে যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে—এই ফুলোগুলা দেখিলে মনে হয় যেন খুব তল্‌তলে নরম; এই স্ফীত প্রস্তররাশি মনে হয় যেন কালো ঘূর্ণিজলের পার্শ্বদেশ—মনে হয় যেন অত্রত্য ইমারৎ-আদি হইতে "বানডাকা"র মত স্ফীত জলরাশির একটা প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, আর যেন সমস্ত ইমারৎ এখনি ভাঙিয়া পড়িবে এবং আমরা সকলেই তাহাতে চাপা পড়িয়া যাইব।...

অখণ্ডপ্রস্তরের যে মন্দিরগুলা হস্তিপৃষ্ঠের উপর সংস্থাপিত এবং যাহা খোদিত পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত—তৎসমস্তই আমরা প্রদক্ষিণ করিলাম। এখন কেবল বাকি উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা; কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক একটু ইতস্তত করিতেছে—কল্যকার সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিতেছে।'

যে সিঁড়ি দিয়া ঐ সকল মন্দিরে প্রবেশ করা যায়, ঐ সিঁড়ির ধাপগুলা ভাঙিয়া-চুরিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে;—নগ্নপদের অবিরত গতায়াতে মসৃণ হইয়া এরূপ পিছল হইয়াছে যে, বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

না ভাবিয়া-চিন্তিয়া, কেবলমাত্র স্বাভাবিক সংস্কারের বশে, আমরা নিস্তব্ধভাবে অতি সাবধানে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু ছোটখাটো কোন-একটা পাথর যেই নড়িয়া উঠে,—কোন-একটা নুড়ি যেই গড়াইয়া যায়, অম্‌নি উহার শব্দে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে, আর আমরাও অম্‌নি থম্‌কিয়া দাঁড়াই। এখন আমাদের চতুর্দ্দিকে বিবিধ ভীষণদৃশ্যের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতেছে। কোথাও কোন শিব বিবিধপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছেন; কোথাও কোন শিব কুঞ্চিত হইয়া আছেন; কোথাও কোন শিব স্বীয় শীর্ণ-শরীরকে ধনুকের মত বাঁকাইয়াছেন; কোথাও কোন শিব স্বীয় মাংসলবক্ষ ফুলাইয়া আছেন;—কোথাও জননক্রিয়ায় বিহ্বল, কোথাও হননক্রিয়ায় উন্মত্ত।

এই ঘন-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় সঙ্গে কোন অস্ত্র লই নাই, একগাছি ছড়িও লই নাই, লওয়া আবশ্যকও মনে করি নাই। কোন মনুষ্য কিংবা হিংস্রপশুকর্ত্তৃক আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া একবার মনেও হয় নাই। তথাপি, কে জানে কেন, আমিও পথপ্রদর্শক ছাগপালকের ন্যায় ভয়ে ক্রমশ অভিভূত হইয়া পড়িলাম;—একপ্রকার "অন্ধকেরে" "কিম্ভূত-কিমাকার" ভয়—যে ভয়ের কোন নাম নাই—যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না।

যে সকল ভীষণদৃশ্য চারিদিকে প্রসারিত—তাহারই কোন চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—সাঙ্কেতিক নিষ্ঠুর ব্যাপারসমূহের একটা চরম আতিশয্য,

—এইবার মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিব, মনে করিতেছিলাম। কিন্তু না,—এখানকার সমস্ত পদার্থেরই সহজ শান্তভাব। ঠিক যেন মরণত্রাসের পর মহাশান্তি আসিয়া মৃত্যুর পরপারে আমাকে অভিবাদন করিল। এখানে মনুষ্য কিংবা পশুর কোন প্রতিকৃতি নাই; একটি মূর্ত্তি নাই; যুঝাযুঝির দৃশ্য নাই; মুখভঙ্গীর রেখামাত্র নাই; কিছুই নাই। কেবল একটা শূন্য দেবালয়; তাহাতে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিরাজমান। কেবল এখানকার করাল শব্দমুখরতা বাহিরের অপেক্ষাও বেশী। একটু কথা কহিলে কিংবা পায়ের শব্দ হইলে চতুর্দ্দিক্ ভয়ানক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। তা ছাড়া, বাস্তবপক্ষে এখানে এমন কিছুই নাই, যাহাতে ভয় হইতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পাখীগুলার কালো পাখার নাড়াচাড়াও নাই। এই সব চৌকোণা থাম—যাহা খিলানছাদের সহিত একই অখণ্ডপ্রস্তরে গঠিত—এই সব থামের অলঙ্কারগুলি নিতান্ত সাদাসিধা ও কঠোর-ধরণের। আড়াআড়িভাবে স্থাপিত কতকগুলি রেখাই উহাদের প্রধান অলঙ্কার।

দারুণ ভগ্নাবস্থা ও সহস্রবর্ষব্যাপী জরাজীর্ণতা সত্ত্বেও এ স্থানটি এখনো পুণ্যতীর্থরূপে বিরাজমান। প্রবেশমাত্রই এই ভাবটি যেন সহসা অন্তরে জাগিয়া উঠে। এখানে আসিয়া যে ভয়ের উদয় হয়, সে ভয়ও ধর্ম্মভাবসংশ্লিষ্ট। মন্দিরের দেয়ালগুলা মশাল ও প্রদীপের ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে। কুট্টিমের সান্ চক্‌চক্ করিতেছে ও “তেলচুকচুকে” হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, সময়ে-সময়ে এখানে বহুল জনতা হইয়া থাকে। অন্য যুগের লোকেরা, যে পর্ব্বতে মহাদেবের জন্য গুহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, মহাদেব এখনো সে পর্ব্বতটিকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। এই পুরাতন দেবালয়ের মধ্যে এখনো যেন একটা প্রাণ রহিয়াছে।

যে তিনটি দালান, যে তিনটি দেবালয় একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে অবস্থিত—ইহারা একই অখণ্ডপ্রস্তরে গঠিত। শেষেরটির পুণ্যমাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাই, ইহার মধ্যে প্রায় কেহই প্রবেশ করিতে পায় না। অন্য ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের এইরূপ স্থানে আমি পূর্ব্বে কখনই প্রবেশ করিতে পাই নাই।

এখানেও আমি মনে করিয়াছিলাম, কি-না-জানি ভয়ানক দৃশ্য দেখিব। কিন্তু এখানেও সেরূপ দৃশ্য প্রায় কিছুই নাই।

কিন্তু এখানে একটি ক্ষুদ্র জিনিষ দেখিলাম, যাহা বাহিরের সমস্ত ভীষণ পদার্থ অপেক্ষাও বিস্ময় উৎপাদন করে, চিত্তকে আকুল করে, সমস্ত স্থানটিকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। বেদির ক্ষয়িত প্রস্তরের উপর চক্‌চকে মর্ম্মরপাথরের একটা ছোট কালো নুড়ি,—দীর্ঘডিম্বাকৃতি—খাড়া হইয়া রহিয়াছে; তাহার প্রত্যেক পার্শ্বে, বেদির উপর, সেই সব শৈবচিহ্ন উৎকীর্ণ রহিয়াছে, যাহা শৈবগণ প্রতিদিন প্রভাতে স্বকীয় ললাটে ভস্ম দিয়া অঙ্কিত করে। চারিধারের সমস্ত পদার্থ ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে। দেবালয়ের যে সব কুলুঙ্গিতে পুণ্যদীপ রক্ষিত হয়, সেই সব কুলুঙ্গিতে একপ্রকার কালো ঘন ঝুল জমিয়া গিয়াছে।

দীপের পোড়া সলিতাগুলা—যাহা সরাইয়া ফেলিতে কেহই সাহস করে না—দীপ হইতে ঝরিয়া-ঝরিয়া কুলুঙ্গির ভূমিকে তৈলাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানকার সমস্তই দীন-হীন-মলিন;—সমস্তই সেই ভীষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিদর্শন।

এই কালো মুড়িটিই সকলের কেন্দ্রস্থল; অলৌকিকশ্রমসাধ্য এই সব খনন ও খোদন কার্য্যের ইহাই একমাত্র হেতু ও মূলকারণ। কোন-এক দেবতা কেবল সংহার করিবার জন্যই ক্রমাগত জীব উৎপাদন করিতেছেন—এই ভাবটি পূর্ব্বতন ভারতবাসিগণ সংহতভাবে ও বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য যে সাঙ্কেতিক চিহ্নের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অতীব অপূর্ব্ব। ইহাই শিবলিঙ্গ; ইহা জননক্রিয়ার সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ। কিন্তু এইপ্রকার জননে মরণেরই উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এই ভীষণ গুহাগহ্বর হইতে ফিরিয়া-গিয়া যেখানে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, সেই পান্থশালা হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম,—যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, তাহা ক্ষীণরেখায় আমার সমক্ষে প্রসারিত। একপ্রকার কুজ্ঝটিকার ন্যায়, ধূলার অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হওয়ায়, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই স্থানটি একটু নীলাভ ও বাষ্পবৎ অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু সূর্য্যোদয় হইবামাত্র একটা বিস্তীর্ণ লোহিতক্ষেত্র আমার সমক্ষে প্রসারিত হইল;—শুষ্কবায়ুর প্রভাবে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে; আর, ইতস্তত কতকগুলা মরাগাছ দেখা যাইতেছে।

এই প্রখর দিবালোকে সেই সব শিবমন্দির দেখিবার জন্য পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম। যাহা দেখিয়াছি বলিয়া এখন স্মরণ হইতেছে, তাহা বাস্তবিক সেইরূপ কি না, আমায় একবার পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। এইবার আমি একাকীই নীচে নামিলাম; আমি এখন পথ চিনি; সেই সব শ্যামল শৈলরাশির মধ্য দিয়া, সেইসব শুষ্ক উচ্চ "ক্যাক্‌টাস্"—যাহা হল্‌দে-রঙের পুরাতন মোমবাতির মত একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে—সেই সব ক্যাক্‌টাস্‌গাছের মধ্য দিয়া চলিলাম।

এখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয়, তবু এই সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে আমার রগ্ যেন পুড়িয়া যাইতেছে বোধ হইল। এই দুর্বৃত্ত সর্ব্বসংহারী প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভাবেই প্রতিদিন ভারতভূমির উপর মৃত্যুর ছায়া ক্রমশই প্রসারিত হইতেছে।...ছড়ি-হাতে তিনজন লোক,—গরুর পাল সঙ্গে নাই, অথচ দেখিতে রাখালের মত—ক্ষেত্রভূমি হইতে উপরে উঠিয়া আমাকে নতভাবে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল; এরূপ শীর্ণকায় মনুষ্য আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বড়-বড় চোখ—জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, ঘোর রক্তবর্ণ। নিশ্চয়ই উহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ হইতে আসিতেছে,—যাহার ঠিক দ্বারদেশে আমি এখন উপনীত হইয়াছি। শতসহস্র ছোট-ছোট চারাগাছ,—যাহা পূর্ব্বে স্থানে-স্থানে পর্ব্বতের গায়ে যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিত, তাহা এখন প্রাণশূন্য—এখন যেন জমাট-পশমের মত দেখিতে হইয়াছে।

কিন্তু এখানকার জীবজন্তরা—যেরূপ

চিরকাল করিয়া থাকে—সেইরূপ এখনো পরস্পরের সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে। মাটীর উপর ছোট-ছোট পাখীদের মৃতদেহ পড়িয়া আছে,—চীলেরা উহাদিগকে কাটিয়া খণ্ডখণ্ড করিয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, মোটামোটা লোভী মাকড়সা শেষাবশিষ্ট প্রজাপতিদিগকে—ফড়িংদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্ত তন্তুজাল বিস্তার করিয়াছে। নিকটস্থ জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় এই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ মিনিটে-মিনিটে যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মার্ত্তণ্ডের মহিমা শিবের মহিমারই ন্যায় দারুণ অশিব।...আজ প্রাতে শিবের ভীষণ মন্দিরে অবতরণ করিয়া শিবকে মনে-মনে চিন্তা করিতেছিলাম;—ইনি সেই দেবতা, যিনি জীব সৃষ্টি করিতেছেন এবং সৃষ্টি করিয়া আবার সংহার করিতেছেন! এইবার আমি ব্রাহ্মণদের ধরণে শিবকে বেশ কল্পনা করিতে পারিয়াছি! সেই দেবতা, যিনি একপ্রকার প্রচ্ছন্ন উপহাসের সহিত উন্মত্তভাবে মনুষ্য ও পশুদিগের বংশবৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সেই প্রত্যেক-জাতীয় জীবের জন্ত সাংঘাতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত একএকটা শত্রুরও সৃষ্টি করিয়াছেন! কি অশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কতপ্রকার কৌশলসহকারে তিনি দংষ্ট্রা, নখর, শিং, ক্ষুধা, ব্যাধি, সর্প ও মক্ষিকার বিষ প্রস্তত করিয়াছেন! যেখানে মৎস্যগণ ভাসিয়া বেড়ায়, সেই পুষ্করিণীর উপরিস্থ মাছধরা পাখীদের ঠোঁট তিনি ছুঁচাল ও তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন; মানুষের জন্ত তিনি নানাপ্রকার রোগ, অবসাদ, জরা-বার্দ্ধক্য পূর্ব্ব হইতেই চুপুচুপি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন; প্রত্যেকেরই রক্তমাংসের মধ্যে তিনি মর্ম্মন্তুদ চৈতন্যলোপী সুতীক্ষ্ণ প্রেমের কাঁটা প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন; সকলের জন্যই তিনি অসংখ্য ছোটখাটো দুঃখ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; স্বচ্ছ নদীর জলেও তিনি শতসহস্র অদৃশ্য ঘাতক রাখিয়া দিয়াছেন;—ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কীটের বীজ সেই জলে নিহিত করিয়াছেন;—যখনই সেই জল কেহ পান করিতে যাইবে, অমনি তাহারা তাহার অন্ত্রভক্ষণে উদ্যত হইবে।... "আত্মাকে উন্নত করিবার নিমিত্তই দুঃখ-যন্ত্রণার সৃষ্টি।" ভাল, তাহাই যেন হইল; কিন্তু আমাদের অবোধ শিশুসন্তানেরা যে একটা বিশেষ রোগে (যে রোগটি বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্ত উদ্ভাবিত) রুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বিষয়ে কি বক্তব্য?...তা ছাড়া, আমি কত হতভাগ্য ক্ষুদ্র পশুদিগের ভয়-বিস্ফারিত নয়নে তীব্র যাতনা, নিষ্ফল প্রার্থনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।...আর, ছোট-ছোট পাখীগুলা যে নির্ব্বোধ-ব্যাধগণকর্ত্তৃক শস্ত্রাঘাতে নিহত হয়, তাহাও কি উহাদের আত্মার উন্নতির জন্ত? মাকড়সারা বায়ুস্থিত ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে শোষণ করিয়া যে উদরস্থ করে, সে-সম্বন্ধেই বা কি বক্তব্য?...এই সমস্ত অনন্ত নিষ্ঠুরতা যুগযুগান্তরব্যাপী জীব-আবর্ত্তের উপর প্রসারিত। বিধাতার প্রতি এরূপ তিরস্কার নিতান্ত অযথা নহে; সর্ব্বকালের সকল লোকেই এই কথা বলিয়া আসিতেছে—ইহার আলোচনা করিতেছে; কিন্তু শিবের গুহার মধ্যে পুনর্ব্বার অবতরণ করিয়া

এ কথা আজ যেমন আমার মনে দারুণ সত্যরূপে প্রতিভাত হইল, এমন আর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। অথচ আমি একজন সুখী পুরুষ; সুখস্বচ্ছন্দে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে; দুর্ভিক্ষ আমার নিকট সহজে পৌঁছিতে পারে না; বিনাশের অপর কোন হেতুও আমার নিকট আপাতত উপস্থিত নাই; বড়-জোর আমি এখন—মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হইতে অথবা শুষ্কতৃণাচ্ছন্ন কৃষ্ণচক্রধারী কেউটে-সাপের দংশন হইতে আমার বিনাশের আশঙ্কা করিতে পারি। তা ছাড়া, আমার আশঙ্কার বিষয় এখন আর কিছুই নাই।...

যখন আমি নীচের সেই বালুকা ও ধূলার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম—সেইখানে ডাহিনে ফিরিয়া কয়েকমিনিটের মধ্যেই আবার সেই "হাঁ-করা" প্রকাণ্ড গুহাদ্বারের সম্মুখে উপনীত হইলাম।

আজ প্রাতে এই ভীষণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোন ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। চীল, শকুনি কিংবা বাজ, যাহারা মন্দিরের ভিতর-ছাদে বাসা করিয়া থাকে, তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই শিকারে বাহির হইয়াছে। এখন চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। বিগত দ্বিপ্রহর রাত্রির নিস্তব্ধতার ন্যায় এ নিস্তব্ধতা তত ভীষণ নহে।

স্তম্ভমন্দিরসমূহের পরেই,—হস্তিপৃষ্ঠ-পরিধৃত অখণ্ডপ্রস্তরখোদিত সেই সব দেবালয় গুহার গভীরদেশে খাড়া হইয়া আছে; অসংখ্য-মূর্ত্তি-উৎকীর্ণ গুহার দেয়াল-গুলা দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু উদীয়মান সূর্য্যের আলোকে এ সমস্ত আর তত বিরাট্—তত অতি-মানুষিক বলিয়া বোধ হইল না; সৃষ্টির যিনি দেবতা, তাঁহার বাসস্থানের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ভীষণ কিংবা যথেষ্ট অলৌকিক বলিয়া মনে হইল না। এই সমস্ত যে জাতির যে-সময়কার হস্তরচনা, সে জাতির তখনো শৈশবদশা উত্তীর্ণ হয় নাই; সুতরাং জীবনের যে কি অপরিমেয় ভীষণতা, সে সময়ে উহারা যথেষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; অথবা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহার উপযুক্ত সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। একে ত তমসাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাহাতে আবার ল্যাণ্ঠানে ভাল আলো হইতেছিল না—এই অবস্থায় গতকল্য এখানে আসিয়া আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, সেই ধারণার অনুরূপ আজ এখানে কিছুই দেখিতেছি না।

অবশ্য সমস্ত পদার্থেরই যে চূড়ান্ত ভগ্নদশা, তাহা আজ প্রভাতের আলোকে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে। ভাঙা থাম, থামের মাথাল, মূর্ত্তিদের মুণ্ড, মূর্ত্তিদের ভগ্নদেহ—এই সমস্তের উপর দিয়া শুধু যে শতশত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে; তা ছাড়া, সেই বিজয়ী মুসলমানদিগের আমলে,—যাহারা ঈশ্বরকে ভিন্ন নামে অভিহিত করে, সেই ধর্ম্মোন্মত্ত মনুষ্যেরা অন্য স্থানের শিবমন্দিরের ন্যায় এই শিব-মন্দিরগুলির প্রতিও আক্রমণ করিয়াছিল।

গতকল্য সেই গভীর রাত্রে, যাহা আমি সন্দেহ পর্য্যন্ত করি নাই, এখন তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি;—পূর্ব্বে এই সমস্ত পদার্থে রং মাখানো ছিল। এই সব এক-ঝোঁকা

শৈলসমূহের মাঝো-আঁধারে যে সকল অসংখ্য অখণ্ডমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—চারিধারে যে সকল বিচিত্র-অঙ্গভঙ্গি-বিশিষ্ট মূর্ত্তিদিগের ভগ্ন অবয়বাদি দেখিতে পাওয়া যায়—সে-সমস্তে এখনো একটু ফিঁকে সবুজের পোঁচ রহিয়াছে;—কতকটা যেন শবের রং। পক্ষান্তরে, উহাদের বাসস্থানের গভীরদেশে শুষ্ক শোণিতের ন্যায় একটু লাল রহিয়া গিয়াছে।

মধ্যস্থলের অখণ্ড প্রস্তরখোদিত মন্দিরগুলিও পূর্ব্বকালে মিশ্রবর্ণ ছিল। প্রাচীন মিশরের থেবিস্ ও মেম্‌ফিস্ নগরের গৃহাদিতে যেরূপ সূক্ষ্ম বর্ণভেদ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বিচিত্র মিশ্রবর্ণ এখানকার মন্দিরাদিতে এখনো রহিয়া গিয়াছে;—শাদা, লাল, গেরুয়া-হল্‌দে।

আজ প্রাতে আমি একাই উপরে উঠিব, এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। আমার পথপ্রদর্শক সেই ছাগপালক যতই মূর্খ-বর্ব্বর হউক না কেন, তবু সে চিন্তাধর্ম্মী মনুষ্য। সে আমার সঙ্গে থাকিলে শিবের সহিত মুখোমুখী করিয়া আলাপ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম,—মন্দিরের অভ্যন্তরে এখনো সেইরূপ নিস্তব্ধতা। কিন্তু খিলান-ছাদের নীচে আর একটু বেশী আলো পাইব বলিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। এখন সূর্য্যোদয়; ইহারই মধ্যে বাহিরের লোহিত ক্ষেত্রভূমিতে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাহিরের এই প্রখর উজ্জ্বল আলোক সত্ত্বেও এখানে ঘোর অন্ধকার। উপরিস্থ গুরুভার পাষাণরাশির তলদেশে এখনো যেন একটু নিশার শৈত্য কারাবদ্ধ হইয়া আছে। মন্দিরের যে অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহারই পশ্চাদ্ভাগে—যেখানকার দেয়ালগুলা বহুশতাব্দী হইতে মশালের ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে—সেখানে অনন্ত অন্ধকারে পরিবেষ্টিত সেই দেবতার তীব্র উপহাস-ব্যঞ্জক মুখচ্ছবি বিরাজমান—যিনি জন্ম-মৃত্যুর দেবতা;—সেই কৃষ্ণবর্ণ উপলখণ্ড—সেই প্রস্তরখোদিত শিবালঙ্গ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গদর্শন।

সোনার বাংলা।

বালার্ককিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনশৃঙ্গ যাঁহার কিরীট, তরঙ্গায়িত নীরনিধি যাঁহার মেখলা, সুচিত্রিত রাজব্যাঘ্র যাঁহার বাহন, ভাগিরথী-পদ্মাবতীব্রহ্মপুত্রসলিলসেকে যিনি সর্ব্বদা অভিষিক্তা, সেই শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসবিনী আমাদের মাতৃভূমি। তিনিই আমাদের সোনার বাংলা। তাঁহার জলে সোনা, স্থলে সোনা, ফলে সোনা। তাঁহার অঞ্জলি-পরিমাণ জল ছিটাইয়া দাও, দেখিবে সোনা ফলিবে; অর্দ্ধহস্ত ভূমি কর্ষণ কর, দেখিবে সোনা ফলিবে; বৃক্ষে বৃক্ষে চাহিয়া দেখ—সোনা ফলিয়া রহিয়াছে। আবার তাঁহার গৃহে গৃহে সোনা ফলিত, ব্রাহ্মণবিধবার হস্ত হইতে তন্তুবায়ের তন্ত্রে পর্য্যন্ত সোনা ফলিয়া থাকিত। তাই মা আমাদের অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া যুগযুগান্তর হইতে সমগ্র জগতে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। জগতের আদিম অবস্থায় যখন মানবসভ্যতার প্রভাতভপন ভারতবর্ষে স্বর্ণকিরণ বিকিরণ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই দুইএকটি ছটা ক্রমে ক্রমে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে নিপতিত হইয়া তাহাকে স্বর্ণভূমি করিয়া তুলে। আর্য্যসভ্যতার কৃষিবাণিজ্যবিজ্ঞান বঙ্গের উর্ব্বরভূমিতে সোনা ফলাইতে আরম্ভ করে। তাই মা আমাদের ক্রমে ক্রমে স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়া সোনার বাংলা হইয়া উঠিয়াছিলেন ও ধনধান্যপরিপূর্ণা হইয়া সন্তানগণের মস্তকে নিয়ত কল্যাণবর্ষণ করিতেন। এই সোনার বাংলার সোনার রঙের ধান্যরাশি ভারতের বহুস্থানের তৃপ্তিবৃত্তি করিয়া বৃহৎকায় জলযানে দেশ-দেশান্তরে, দ্বীপদ্বীপান্তরে নীত হইত;—গ্রীক্‌ ও রোমক-সভ্যতাদীপ্ত ইউরোপ পর্য্যন্তও ধাবিত হইয়াছিল। ইহার গর্ভজাত লবণ-রাশি বহুদেশের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার সাথী হইত। ফলমূলও সুরুচির উদ্রেক করিত। এই সোনার বাংলার সুচিক্কণ বস্ত্রপুঞ্জ ভারতের লজ্জানিবারণ করিয়া নানা দেশের লজ্জানিবারণ করিতে করিতে ইউরোপীয় মহিলার অঙ্গ-আবরণে নিযুক্ত হইত। সভ্যজগৎ তাহার কারুকার্য্যে মোহিত হইয়া যাইত। বিলাসিনী রোমক মহিলাগণ এই সুচিক্কণ বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া আপনাদের রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেন। ইহারই স্বর্ণবর্ণের রেশম ও রেশমী বস্ত্র সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করিত। এশিয়ার সর্ব্বত্র ও ইউরোপে তাহার আদরের সীমা ছিল না। যে সোনার বাংলা একদিন

সমগ্রজগতে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়াছে, আজ তাহার সর্ব্বত্র অন্নের হাহাকার উঠিয়াছে! আজ তাহার সন্তানগণ নগ্ন কায় ঢাকিবার জন্ত বিদেশীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! কেন আজ সোনার বাংলার এ দুর্দ্দশা ঘটিল? কেন আজ তাহার গৃহে গৃহে শ্মশানের ছায়া ঘনীভূত হইতেছে? কেন আজ তাহার সন্তানগণ কঙ্কালাবশেষ হইয়া প্রেতরাজ্যের অধিবাসীর ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে? কোথায় তাহার সে স্বাস্থ্য?—কোথায় তাহার সে সম্পদ্?—কোথায় তাহার সে কল্যাণ? তাহার স্বর্ণকান্তি কে কালিমামণ্ডিত করিল? জানি না, ভগবানের কোন্ অভিশাপে তাহার এরূপ দুর্গতি ঘটিল? ভগবানের যে অভিশাপ থাকে, থাকুক, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ কারণ ইংরেজবণিকের আসুরিক স্বার্থপরতা! এই সোনার বাংলা পূর্ব্বেই বা কেমন ছিল, আর ইংরেজবণিক্ই বা কেমন করিয়া ইহাকে ছারখার করিল, আমরা সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বৈদিককাল হইতে এই বঙ্গভূমির অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। ঐতরেয় আরণ্যক প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। * যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ এক্ষণে সোনার বাংলা বলিয়া পরিচিত, বঙ্গই তাহার প্রধান অংশ ছিল। তাহার সন্নিহিত পুণ্ড্র, অঙ্গ প্রভৃতির কিয়দংশ এক্ষণে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। বৈদিকগ্রন্থে সেই সমস্ত স্থানেরও উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মনুসংহিতায়ও বঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।† তাহার পর রামায়ণের সময় হইতে ইহাকে প্রকৃত সোনার বাংলা বলিয়া জানিতে পারা যায়। সেই সময়ে বঙ্গভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।‡ মহাভারতের সময় ইহা একটি বিস্তৃত জনপদ হইয়া উঠে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞকালে বঙ্গাধিপতি সমুদ্রসেন ভীমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গ বা বর্ত্তমান উত্তর-উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন।§ তাহার পর বিষ্ণু, গরুড়, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণেও

---

* "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা মগধাশ্চেরপাদাস্তান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র" ইতি।
ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১

† "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।" মনু।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টির জন্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ কৈকেয়ি! যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি॥"
রা, অযো, ১০স, ৩৭।৩৮

§ "ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥"
মহা, সভা, ৩০।২২—২৪

ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার নামকরণেরও বিবরণ দৃষ্ট হয়।*

ইহার পর বৈদেশিকগণের বিবরণ হইতে সোনার বাংলার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক্ পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় বঙ্গরাজ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গাঙ্গারিডি বা গণকরের উল্লেখ আছে। এই গাঙ্গারিডি বা গণকরদেশ গঙ্গার পশ্চিমে 'ব'দ্বীপের শীর্ষভাগে অবস্থিত ছিল। মুর্শিদাবাদজেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগে অদ্যাপি গ্যাঙ্গারিডি ও গণকর নামে দুইখানি গ্রাম বিদ্যমান আছে। এরিয়ান্, কটডুপানগরের নিকটস্থ আমিষ্টিস্নদীর উল্লেখ করিয়াছেন, এই কটডুপা কটদ্বীপ বা কাটোয়া ও আমিষ্টস্ই অজাবতী বা অজয়। টলেমি 'ব'দ্বীপের বিশেষরূপ বিবরণই প্রদান করিয়াছেন।† এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীক্‌দিগের নিকট সোনার বাংলা বিশেষরূপেই পরিজ্ঞাত ছিল। তাহার পর যখন ইউরোপভূখণ্ড রোমকসভ্যতায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই প্রাচ্যদেশের পণ্যদ্রব্যে তাহার বিলাসভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রোমকবণিক্‌গণের ভারতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে রোমের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন।‡ এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে যে সকল মস্লিন্, রেশম ও রেশমী বস্ত্র নীত হইত, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত হইত। রোমকমহিলাগণ সেই সমস্ত সূচিক্কণ মস্লিনের অন্তরাল হইতে আপনাদের অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ করিতেন।§ প্রসিদ্ধ রোমক-

"স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥"
মহা, বন, ১১৪ অ।

* "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥"
মহা, আদি ১০৩ অ।

† "Ptolemy's description of the Delta is by no means a bad one". * * * "He begins with the western branch." (Wilford)

‡ "But if the commerce with India became a source of fortune, to the industrious trader, and an important branch of revenue to the government, the introduction of the products of the east also leaded to stimulate and increase the already excessive luxury which prevailed at Rome.

Pliny states the balance against Rome of trade with the East at a hundred millions Sesterces or 1, 041, 666 pounds sterling." (Researches concerning the Lands &c, of Ancient and Modern India.)

§ "Pliny when speaking of muslin, terms it, "a dress, under whose slight veil our women contrive to shew their shapes to the public." (Researches concerning the Lands, Theology, Learning, Commerce &c. of Ancient and Modern India by Q Craufurd)

লেখক প্লিনি বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠবন্দর সপ্তগ্রামের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। *

যে সময়ে চীনপরিব্রাজকগণ ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা সোনার বাংলায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধনধান্যপরিপূর্ণ দেখিয়াছিলেন। ভারতাগত প্রথম চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ বাঙ্‌লার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তি বা তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও তথায় বণিক্‌গণের সমাগম দেখিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তি হইতে তিনি বাণিজ্যযানে আরোহণ করিয়া সিংহলযাত্রা করেন। † সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্-সিয়ং বাঙ্‌লার নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা বঙ্গভূমি, সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিম মুর্শিদাবাদ ও তাম্রলিপ্তি বা মেদিনীপুর প্রদেশে আগমন করিয়া অনেকদিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে আমাদের সোনার বাংলা 'সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা'ই ছিলেন। ইহার অধিবাসিগণ স্বর্গীয় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কৃষিবাণিজ্যে তাহাদের মাতৃভূমিকে স্বর্ণ-প্রসবিনী করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তথায় নানাপ্রকার শস্য জন্মিত। হিউয়েন্-সিয়ং তথাকার পনসফলের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও অধিবাসিগণ বিদ্যোৎসাহী ছিল। ‡ সমতটের বর্ণনায় তাহাকে উর্ব্বর, শস্যপরিপূর্ণ ও ফুলফলে সুশোভিত বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি তাহার জল-বায়ুকে কোমল ও অধিবাসিগণের ব্যবহারকে মনোজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কষ্টসহিষ্ণু, খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসিগণ বিদ্যার সমাদর করিত। § তাম্রলিপ্তির বর্ণনায় লিখিত আছে যে, উক্ত দেশও উর্ব্বর ও অপর্য্যাপ্ত ফলফুল উৎপাদন করিত। বায়ু উষ্ণ, অধিবাসিগণ ক্ষিপ্র, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। ‖ হিউয়েন্‌সিয়ং এইখান হইতে

* 'Satgon, the royal emporium of Bengal from the "time of Pliny." (Long)

† "From this (Champa , continuing to go eastwards nearly fifty yojans, we arrive at the kingdom of Tamralipti. Here it is the river empties itself into the sea. * * * He then shipped himself on board a great merchant vessel. Putting to sea, they proceeded in a south-westerly direction, and catching the first fair wind of the winter season (i. e. of the N. E. monsoon) they sailed for fourteen days." (Fa Hian)

‡ "The soil is flat and loamy, and rich in all kinds of grain-produce. The *Panasa* (*Pan-na-so*) fruit, though plentiful, is highly esteemed. * * * The climate (of *this country*) is temperate, the people esteem learning." (Beal's Buddist Records Vol II.)

§ "It is regularly cultivated, and is rich in crops, and the flowers and fruits grow everywhere. The climate is soft and the habits of the people agreeable. The men are hardy by nature, small of stature and of black complexion ; they are fond of learning, and exercise themselves diligently in the acquirement of it." (Beal)

‖ "The ground is low and rich ; it is regularly cultivated, and produces flowers and fruits in abundance. The temperature is hot. The manners of the people are quick and hasty. The men are hardy and brave." (Beal)

অর্ণবপোতে সিংহলযাত্রা করেন। কর্ণসুবর্ণের বিবরণে তাহাকে উর্ব্বর ও পুষ্পশালী বলিয়া জানা যায়। লোকের ব্যবহার নম্র ও মনোজ্ঞ, জলবায়ুও তৃপ্তিকর। অধিবাসিগণ বিদ্যার সমাদর করিত। * হিউয়েন্‌সিয়ঙের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের সোনার বাংলা ফলশস্যপরিপূর্ণ হইয়া সুস্বকায় ও বিদ্যোৎসাহী সন্তানের মাতৃভূমিরূপে বিরাজ করিত।

হিউয়েন্‌সিয়ঙের আগমনের পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষ উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের প্রতাপ ও বিদ্যোৎসাহিতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সে আলোকে এই সুদূর বঙ্গভূমিও দৃষ্টির অন্তর্ভূত হইয়াছিল। সেইজন্য কালিদাস ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কালিদাস বঙ্গের অধিবাসিগণকে নৌযুদ্ধকুশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। + বরাহমিহিরও বঙ্গ ও উপবঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও প্রাচীন লোকের নিকট আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গনামেই অভিহিত হইতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বাঙ্‌লানাম ধারণ করিয়া সাধারণের পরিচিত হইয়া উঠেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা প্রথম বাঙ্‌লানামের উল্লেখ দেখিতে পাই। দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয়নামক স্থানের শিলালিপিতে প্রথমে এই বাঙ্‌লাদেশের উল্লেখ দেখা যায়। রাজেন্দ্র চোলদেব তথাকার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিরুমলয়ে আপনার গৌরব খোদিত করিয়াছেন। § তাহার পর হইতে আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গনাম পরিত্যাগ করিয়া বাঙলানাম ধারণ করিয়াছিলেন। সেই ফুলফলসুশোভিতা, শস্যশ্যামলা মাতাকে আমরা সোনার বাংলা বলিয়া থাকি।

ক্রমে যখন মুসলমান গৌরব ও প্রতিভা সুদূর ইউরোপখণ্ড হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, সেই সময়ে বঙ্গভূমি মুসলমানপরিব্রাজকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। মুসলমানগণকর্ত্তৃক ভারতবিজয় আরব্ধ হইলে বঙ্গদেশও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুলেমান আমাদের সোনার বাংলায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহার বাণিজ্যগৌরবের

হিউয়েন্‌সিয়ঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, তিনি তাম্রলিপ্তি হইতে কর্ণসুবর্ণে গমন করেন। কিন্তু সিউকী বা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, তিনি তথা হইতে সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন।

* The land lies low and is loamy. It is regularly cultivated, and produces an abundance of flowers, with valuables numerous and various. The climate is agreeable; the manners of the people honest and amiable. They love learning exceedingly, and apply themselves to it with earnestness." (Beal)

† "বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।" (রঘুবংশম্)

‡ "আগ্নেয্যাং দিশি কোশলকলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গজঠরাঙ্গাঃ।" (বৃহৎসংহিতা)

§ "Vangaladesa, where the rain does not last (long), and from which Govinda Chandra, having lost his fortune, fled." (South Indian Inscriptions.)

বিষয়ও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।* ইবুন্‌বাটুটানামক একজন মুসলমানপরিব্রাজক অনেক পরে এ দেশে আগমন করেন, তিনি ইহাকে অত্যন্ত শস্যসুলভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।† বৈদেশিকগণের বিবরণ যতই আলোচনা করা যায়, ততই আমাদের মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরাকাল হইতে স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি বৈদেশিকগণের চক্ষে স্বর্ণকিরণ প্রতিফলিত করিয়া আসিতেছেন। ফলফুলে সুশোভিনী মা আমাদের কৃষিবাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া জগতের নিকট সগৌরবে আদৃত হইতেন। তাঁহার সন্তানগণ জ্যোৎস্নাচুম্বিতসৈকতশালিনদীমালিনী শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির সেবায় আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিত। কৃষিবাণিজ্যেও তাঁহাকে গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মা তাহাদিগকে পবিত্র ও তৃপ্তিকর জলবায়ু প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সাহসী, কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু করিয়াছিলেন। মাতৃসেবার সহিত তাহারা বিদ্যারও আরাধনা করিত। চীনপরিব্রাজকগণ তাহাদের জ্ঞানগরিমার বিষয় ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারাও যেমন মাতৃসেবা করিত, মাতাও তাহাদিগকে তেমনই সুখসম্পদ্ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের সেই সন্তানোচিত মাতৃসেবায় মাতা প্রকৃত সোনার বাংলা হইয়াছিলেন, তাই সোনার বাংলার গৌরব দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বঙ্গভূমিতে মুসলমানবিজয়নিশান প্রোথিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ কিন্তু তাহার পর হইতে শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুরাজন্যগণের অধীনই ছিল। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমান-আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। মুসলমানগণ বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে বাস করিয়া হিন্দুসাধারণের প্রতিবেশী হইয়া উঠেন। উভয়ের জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য অনেকদিন পর্য্যন্ত উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে এক দেশে, এক-গ্রামে, এক পল্লীতে বসবাস করিয়া উভয়ের বিদ্বেষভাব অন্তর্হিত হইয়া উভয়েই সোনার বাংলার সন্তান হইয়া উঠে। উভয়েই মাতৃসেবায় প্রবৃত্ত হয়। উভয়েই কৃষিবাণিজ্যে মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা করিয়া তুলে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সন্তানের সেবায় মাতার সমৃদ্ধি দিনদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নানাপ্রকার শিল্পে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার গৌরব

* During the time of the Arab invasion of India (8th century of the Christian era), Sulaiman came to this country. An Account of his travels is given in the Bulletin of the Geographical Society of Paris (P. 263.). His account of the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arrakan. (Proceedings of the Asiatic Society for December 1868. P. C. Ghosha's note)

† "I sailed for Bengal which is an extensive and plentiful country. I never saw a country in which provisions were so cheap. (Ibn-Batutu)

দেশবিদেশে বিঘোষিত হয়। বঙ্গদেশ হইতে বণিক্গণ সোনার বাঙ্লার দ্রব্যসম্ভার-গ্রহণের জন্ত অসংখ্য অর্ণবযান লইয়া তাহার প্রধান বন্দরসমূহে সমাগত হইত। ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র, এশিয়ার বহুদেশে, এমন কি সুদূর ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত ইহার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ প্রেরিত হইত।

সোনার বাংলার এই গৌরবের কথা শুনিয়া দূরদূরান্তর হইতে বৈদেশিকগণ তাহার দর্শনাভিলাষে উপস্থিত হইতেন। অনেক বৈদেশিকের গ্রন্থে আমাদের বঙ্গভূমি প্রকৃত সোনার বাংলারূপেই চিত্রিত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালীয় পরিব্রাজক মার্কপোলো এশিয়ার নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গরাজ্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বাঙালীজাতি ও বাঙ্লাভাষার উল্লেখ করিয়া ইহার কৃষিবাণিজ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গভূমিতে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে তূলা জন্মিত ও তাহার সমৃদ্ধ বাণিজ্য হইত। জটামাংসী, আদা, ইক্ষু প্রভৃতি অনেক দ্রব্য বঙ্গভূমিতে উৎপন্ন হইত। ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে বণিক্গণ তাহাদের বাণিজ্যের জন্ত সমাগত হইত।* এইরূপে মার্কপোলোর গ্রন্থ হইতে বাঙ্লাসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনপরিব্রাজক মাহু বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সোনার গাঁ, বাঙ্লা † প্রভৃতি অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশে নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হইত। গম, তিল, নানাজাতি কলায়, চিনা, আদা, সর্ষপ, পলাণ্ডু, গাঁজা, বার্ত্তাকু, কাঁঠাল, আম্র, দাড়িম্ব, ইক্ষু, গুড়, চিনি, কদলী ও নানাপ্রকার ফলোৎপাদনের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নারিকেল ও তণ্ডুলজাত মদ্য, তাড়ী ও কাঁজী ও পাঁচছয়প্রকার মস্লিনের কথা তাঁহার বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। মাহু বলেন যে, বঙ্গদেশের

* "The province of Bengala is situated on the southern confines of India, * * * * It has its peculiar language. The people are worshippers of idols, and amongst them there are teachers, at the head of schools for instruction in the principles of their idolatrous religion and of necromancy, whose doctrine prevails, amongst all ranks, including the nobles and chiefs of the country. Oxen are found here almost as tall as elephants, but not equal to them in bulk. The inhabitants live upon flesh, milk, and rice, of which they have abundance. Much cotton is grown in the country, and trade flourishes. Spikenard, galingal, ginger, sugar, and many sorts of drugs are amongst the productions of the soil; to purchase which the merchants from various parts of India resort there." (Bohn's Marcho Polo.)

† এই বাঙ্লানগর অনেক পরিব্রাজকের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্বসম্বন্ধে বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ ইহাকে কাল্পনিক নগর বলেন, কেহ বা গৌড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কেহ বা ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, জলপ্লাবনে উক্ত নগরের ধ্বংস হয়।

অধিবাসিগণ রেশমী রুমাল, সোনালী-কাজকরা টুপী, চিত্রিত মাটীর বাসন, গামলা, পাত্র, সারলৌহ, বন্দুক, ছুরী, কাঁচী ও বৃক্ষত্বগ্‌জাত মৃগচর্ম্মের ন্যায় চিক্কণ শ্বেতবর্ণের একপ্রকার কাগজ ব্যবহার করিত।* উক্ত শতাব্দীতে নিকলি কোণ্টি এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলার অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।† ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারথেমা নামে একজন ইতালীয় পরিব্রাজক বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিও সোনার বাংলার সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভারথেমা বলেন যে, এখানে অপর্য্যাপ্ত শস্য ও সর্ব্বপ্রকার মাংস প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন অপর্য্যাপ্ত চিনি, আদা ও তুলা জন্মিত। পৃথিবীর কোন দেশে এই সমস্ত দ্রব্য এত অধিকপরিমাণে পাওয়া যাইত না। ভারথেমা এখানে অনেক ধনশালী বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর পঞ্চাশখানি জাহাজ সূতী ও রেশমী বস্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়া বঙ্গদেশ হইতে বহুস্থানে গমন করিত। ভারথেমা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নামোল্লেখও করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বস্ত্র তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশে ও ভারতের সর্ব্বত্র নীত হইত। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে অনেক জহরতব্যবসায়ী বণিকের সমাগম হইত।‡

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে পর্টুগীজগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ইহার অধিবাসিগণের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হয়। এই সময়ে সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার নিম্নস্থ নদীপ্রবাহ রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তাহার অবস্থা দিনদিন হীন হইয়া পড়ে। পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর করিয়া তুলে। ক্রমে সপ্তগ্রামের পরিবর্ত্তে হুগলী

* "Among the products of the country may be named, wheat, sesamum, all kinds of pulse, millet, ginger, mustard, onions, hemp, brinjals, the jack fruit, mangoes, pomegrandes, sugarcane, granulated sugar, white sugar, plantains and various fruits ; there are four kinds of wines, the coconut, rice, tarry and kadjang ; five or six kinds of cotton fabrics (muslins). They used silk handkerchiefs and caps, embroidered with gold, painted ware, basins, cups, steel, guns, knives, scissors, a white paper from the bark of a tree smooth and glossy like a deer's skin. (Mahuon's account of the kingdom of Bengal, 1405.)

† "In the 15th century, Nicoli Conti sailed up the Ganges and passed by a city named *Cernove*, which was on the river. This city, he mentions, was then in a flourishing state. (Proceedings of the Asiatic Society for Dec. 1868.)

‡ "This country abounds more in grain, flesh of every kind, in great quantity of sugar, also of ginger, and of great abundance of cotton, than any country in the world. And here there are the richest merchants I ever met with. Fifty ships are laden every year in this place with cotton and silk stuffs, which stuffs are these, that is to say, *bairam, namone, lizati, ciantar, douzer*, and *sinabaff*. These same stuffs go through all Turkey, through Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethopia and through all India. There are also here very great merchants in jewels, which came from other countries." (The Travels of Ludovico di Varthema.)

তাহার স্থানে বন্দরে পরিণত হয়। পর্টুগীজেরা যে যে স্থানে বাণিজ্যোপলক্ষে বাস করিয়াছিল, সেই সেই স্থানকে তাহারা ব্যাণ্ডেল বা বন্দর নামে অভিহিত করিত। অদ্যাপি হুগলী ও চট্টগ্রামের নিকট ব্যাণ্ডেলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। পর্টুগীজগণের সময়ে বঙ্গদেশের মানচিত্র ইউরোপে প্রচারিত হয়। ডি ব্যারো ইহার বিবরণসহ মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার মানচিত্রে এশিয়ার সমস্ত প্রদেশের উল্লেখ থাকিলেও বঙ্গদেশেরও উল্লেখ বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডি ব্যারোর মানচিত্রে বাঙ্গলার অনেক নগরের নির্দ্দেশ আছে, তাহার শ্রেষ্ঠবন্দর সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামেরও উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের বিবরণে বাঙ্গলার বাণিজ্যের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।* পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামকে পোর্টো গ্রাণ্ডি বা বৃহৎ বন্দর ও সপ্তগ্রামকে পোর্টো পেকিনো বা ক্ষুদ্রবন্দর নামে অভিহিত করিত। সময়ে সময়ে হুগলী ও পিপলী পোর্ট পেকিনো নামে কথিত হইত। ১৫৭০ খৃঃ অব্দে ফ্রেডারিক নামে একজন ইউরোপীয় বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।† ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে প্রথম ইংরেজপরিব্রাজক র‍্যাল্ফ্ ফিচ্ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ফিচ্ বাঙ্গলার বহুস্থানের কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমীবস্ত্রের প্রাচুর্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। টাঁড়া, কুচবিহার, হিজলী, বাক্‌লা, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমীবস্ত্রের বিষয় তাঁহার বিবরণে দৃষ্ট হয়। ফিচের বিবরণে সোনার গাঁয়ের মস্‌লিনের উল্লেখ আছে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজলীর একপ্রকার তৃণ হইতে রেশমীবস্ত্রের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। এতদ্ভিন্ন অপর্য্যাপ্তপরিমাণে ধান্য-চাউলের উৎপত্তি ও বাণিজ্যের কথা তাঁহার বিবরণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তগ্রাম প্রভৃতির যে বাজারের বিষয় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সেই সমস্ত বাজারে অনেক দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী হইত।‡

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও

* "Its (Ganges) first mouth, which is on the west, is called Satigam, from a city of that name situated in its streams, where our people carry on their mercantile transactions. The other, which is on the east, comes out very near another and more famous port called Chatigam, which is frequented by most of the merchants who arrive at and depart from this kingdom." (De Barro)

† "Frederike, who travelled in Bengal in 1570 and visited Satigam, mentions that in it merchants gather themselves together for their trade." (Hunter.)

‡ "*Tonda*—Great trade and trafique is here of cotton, and cloth of cotton.

Country of Couche—Here they have much silke and muske, and cloth made of cotton.

Heegili—In this place is very much rice, and cloth made of cotton, and great store of cloth which is made of grasse, which they call yeram, it is like a silke.

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভূমির অবস্থা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়। সেই সময়ে বাঙ্‌লায় পাঠানরাজত্বের অবসান হওয়ায়, বঙ্গভূমি বাঙালীগণেরই শাসনাধীনে আইসে। বিশেষত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বার-ভূঁইয়ার অধীনে থাকায় তত্তৎপ্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বার ভূঁইয়ার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই জাতিই ছিল। ইঁহাদের মধ্যে অনেক-পরিমাণে সৌহার্দ্দও ছিল। এই সময়ে রাল্‌ফ্ ফিচ্ বঙ্গভূমিতে আগমন করেন, তিনি কোন কোন ভূঁইয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর জেসুইট্ পাদরী-গণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ফার্ণাণ্ডেজ, সোসা, ফনসেকা ও বাউস্ নামে চারিজন পাদরী ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উপস্থিত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত এতদ্দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূঁইয়াদিগের ও বঙ্গদেশের অবস্থা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণ লইয়া ডুজারিক নামে একজন ফরাসী ঐতিহাসিক স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্‌লার বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডুজারিকের গ্রন্থ ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।* তাহার পর সামুয়েল্ পার্শা নামে ইংরেজগ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্‌লার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রদান করেন। পার্শার গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের সোনার বাংলায় তৎ-কালে ধান্য, গম, চিনি, আদা, লঙ্কা, তুলা ও রেশম অপর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিত এবং সনদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকপরিমাণে লবণের রপ্তানী হইত। † পার্শার গ্রন্থ ১৬২৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে পর্টুগীজগণের অনুসরণ করিয়া ওলন্দাজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে আগত হয়। তাহারা চুঁচুড়া, বরাহনগর, কালিকা-পুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কুঠীস্থাপন করে।

Bacola—This country is very great and plentiful, and hath store of Rice, much cotton cloth, and cloth of silke.

Serecpore—Great store of cotton cloth is made here.

Sinnergon—There is best and finest cloth made of cotton that is in all India. * * * Great store of cotton cloth goeth from hence, and much Rice, wherewith they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacco, Sumatra, and many other places.

Satigam—Satigam is a faire citie for a citie of the Moores, and very plentiful of all things. Here in Bengala they have every day in one place or other a great market which they call Chandeun, and they have many great boats which they call peneas, wherewith they go from place to place and buy Rice and many other things; theire boats have 24 or 26 oares to roame them, they be great of burthen, but have no coverture." (I. H. Ryley's Ralph Fitch.)

* লেখকের সম্পাদিত প্রতাপাদিত্য (যন্ত্রস্থ) গ্রন্থে এই সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে।

† "It is plentiful in Rice, Wheat, Sugar, Ginger, Longpepper, Cotton and Silke.

* * * * *

Three hundredth ships are yearly laden from hence with salt." (Purcha His Pilgrims. Book V. P. 513.)

ইহাদের পর ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ এতদ্দেশে উপস্থিত হয়। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

ইউরোপীয় বণিকগণ ক্রমে বঙ্গভূমিতে বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইলে অনেক ইউরোপীয় পরিব্রাজক বঙ্গদেশে আগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্সিস্ পাইরার্ড নামে একজন ইউরোপীয় এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভূমিকে স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাকে অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে ধান্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গোয়া, মালাবার, সুমাত্রা ও মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে নীত হইত। বঙ্গভূমি মাতার ন্যায় ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীদিগকে অন্নবিতরণ করিতেন। অসংখ্য জাহাজ ঐ সমস্ত দ্রব্যবহনের জন্য প্রতিদিন বঙ্গভূমিতে আগমন করিত। এই বঙ্গভূমিতে নানাপ্রকার পশু জন্মগ্রহণ করিত, এবং তাহাদের মাংস সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। কেবল দুগ্ধ-ঘৃত ব্যবহার করিয়া লোকে তথায় জীবনধারণ করিতে পারিত। বঙ্গবাসিগণ নানাপ্রকার শতরঞ্চ বয়ন করিত। ইহাতে নানাপ্রকার ফল জন্মিত, যথা—জামীর, লেবু, কমলা, দাড়িম, আনারস, লঙ্কা। ইক্ষু অপর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিত। তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে নীত হইত। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইত। তুলা এত অধিকপরিমাণে জন্মিত যে, উহার অধিবাসিগণের পরিধেয়বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া তাহার পর বহুলপরিমাণে তুলা ও বস্ত্র নানাস্থানে নীত হইত। এতদ্ব্যতীত রেশম ও রেশমীবস্ত্রও অনেকপরিমাণে হইত। এই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সূতী ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত, ও সূচীকার্য্য প্রভৃতি সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারিত। এরূপ শিল্পকার্য্য অন্যত্র দৃষ্ট হইত না। এই সমস্ত বস্ত্র এত সূক্ষ্ম হইত যে, কেহ তাহা পরিধান করিলে তাহাকে নগ্ন বা বস্ত্রপরিহিত বলিয়া বুঝা যাইত না। বঙ্গবাসিগণ চীনবাসীর ন্যায় গৃহসজ্জার উপকরণ ও বাসনাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিত। রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যাদি হইত। এই সমস্ত দ্রব্যের বাণিজ্যের বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।*

* "The country is healthy and temperate, and so wondrous fertile that one lives there for almost nothing ; and there is such a quantity of rice, that besides supplying the whole country, it is exported to all parts of India, as well to Goa and Malabar as to Sumatra, the Malaccas, and all the islands of Sunda, to all of which lands Bengal is a very nursing mother, who supplies them with their entire subsistence and food. Thus, one sees arrive there every day an infinite number of vessels from all parts of India for these provinces. * * *

The country is well supplied with animals, such as oxen, cows, and sheep ; flesh is accordingly very cheap, let alone milk-foods and butter, whereof they have such an abundance that they supply the rest of India ; and pile carpets of various kinds, which they weave with great skill. There are many good fruits,—not however, cocos or bananas, plenty of citrons, limes, oranges, pomegrantes, cujus, pineapple, ginger, long-

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ্ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে 'সার্ টমাস্ রো'কে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রো ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও বাঙ্লার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, এবং তাহার প্রধান-নগর রাজমহল ও ঢাকা ও পোর্ট গ্রাণ্ডি, পোর্ট পেকিনো, পিপলী ও সাতগাঁ প্রভৃতি বন্দরের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।*

বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীপরিব্রাজক বার্ণিয়ে ও টাভার্নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। উভয়েই বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তাহার বিশেষরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বার্ণিয়ে বঙ্গভূমিকে প্রকৃত সোনার বাংলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মিশর চিরদিন হইতে জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যশালী ও শস্যপূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশই সেই প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এই দেশে অপর্য্যাপ্ত-

pepper, of which, in the green state they make a great variety of preserves, as also of lemons and oranges. The country abounds with sugar-cane, which they eat green; or else make into excellent sugar, for a cargo to their ships, the like not being made in any part of India except in Cambaye and the other countries of the Mogor adjacent to Bengal. * * * *

There is likewise exported from Bengal much scented oils, got from a certain grain, and divers flowers, these are used by all the Indians after bathing to rub their bodies withal. Cotton is so plentiful, that after providing for the uses and clothing of the natives, and besides exporting the raw material, they make such a quantity of cotton cloths, and so excellently woven, that these articles are exported, and thence only, to all India, but chiefly to the parts of Sunda. Likewise there plenty of silk, as well that of silkworm as of the silk (herb) which is of the brightest yellow colour, and brighter than silk itself, of this make many stuffs of divers colours, and export them to all ports. The inhabitants both men and women, are wondrously adroit in all manufactures, such as of cotton cloth, and silks, and in needle work, such as embroideries, which are worked so skilfully, down to the smallest stitches, that nothing prettier is to be seen anywhere. Some of these cottons and silks are so fine that it is difficult to say whether a person so attired be clothed or nude. Many other kinds of work, such as furniture and vessels, are constructed with extraordinary delicacy, which, if brought here, would be said to come from China.

In this country is made a large quantity of small black and red pottery, like the finest and most delicate *terre sigille*, in this they do a great trade, chiefly in *gorgoulettas*, and drinking-vessels and other utensils" (The Voyage of Francis Pyrard of Luval.)

* "Bengala—A mightie kingdome inclosing the westside of the Bay on the North, and windeth Southwesterly, is bordereth on Cormondell, and the chiefe cities are Rajmehell and Dekaka, there are many havens, as Port Grand, Port Pequina, traded by the Portugals, Philipatan, Satigam, it containeth divers Provinces, as that of Purp and Patan." (Sir Thomas Roe.)

পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহার নিকটস্থ ও দূরস্থ দেশসমূহে তাহা নীত হইয়া থাকে। গঙ্গার দ্বারা পাটনা পর্য্যন্ত ও সমুদ্রের দ্বারা মছলীপত্তন ও করমণ্ডল উপকূলের অনেক স্থানে ইহার রপ্তানী হয়। তদ্ভিন্ন সিংহল, মালদ্বীপ ও অন্যান্য রাজ্যেও নীত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় অনেক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা গোলকুণ্ডা, কর্ণাট, এবং মোচা ও বসরা হইতে আরব ও মেসপটেমিয়া ও বন্দর আব্বাস হইতে পারস্যদেশে নীত হয়। এখানে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। পটুর্গীজগণই তাহা বিশেষরূপে প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবসায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহারা আমার, শতমূল বা অনন্ত-মূল, আম, আনারস, হরীতকী, লেবু ও আতার মোরব্বা প্রস্তুত করে। বাঙ্গলায় গমও উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইউরোপীয় জাহাজের অধিবাসিগণ তদ্দ্বারা আপনাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তণ্ডুল, তিনচারিপ্রকার উদ্ভিজ্জ, ঘৃত প্রভৃতি নিত্য খাদ্যদ্রব্য অতি সুলভমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক টাকায় বিংশতি বা ততোধিক কুক্কুট পাওয়া যায়। রাজহাঁস ও পাতিহাঁসও সুলভমূল্যে বিক্রীত হয়। ছাগ, মেষ ও শূকরাদিও যথেষ্টপরিমাণে পাওয়া যায়। পটুর্গীজগণ সাধারণত শূকরমাংসে জীবন-ধারণ করে, লবণাক্ত শূকরমাংসও ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাহাজের আরোহিগণ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাজা ও লবণাক্ত মৎস্য অপর্য্যাপ্তপরিমাণে পাওয়া যায়। এক কথায় বাঙ্গলা জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ। এইজন্য পটুর্গীজ, ফিরিঙ্গী ও অন্যান্য খৃষ্টানগণ ওলন্দাজগণকর্ত্তৃক তাহা-দের উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই শস্যপূর্ণ রাজ্যে বাস করিয়াছে। বাঙ্গলার বহুমূল্য নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বৈদেশিক বণিক্‌গণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চিনি ব্যতীত এতদ্দেশে এত অধিকপরিমাণে তূলা ও রেশম উৎপন্ন হয় যে, ইহাকে ভারতবর্ষ, তাহার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ, এমন কি ইউরোপের তূলা ও রেশমের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। ইহার শ্বেত ও রঞ্জিত, স্থূল ও সূক্ষ্ম, নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। ওলন্দাজগণ নানাস্থানে, বিশেষত জাপান ও ইউরোপে, ইহাদের রপ্তানী করে। ইংরেজ, পটুর্গীজ এবং দেশীয় ব্যবসায়িগণও বহুলপরিমাণে এই সমস্ত বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া থাকে। রেশম ও রেশমী বস্ত্রসম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। সুদূর লাহোর ও কাবুল পর্য্যন্ত সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের ও অন্যান্য রাজ্যের জন্য কত পরিমাণে কার্পাসবস্ত্র নীত হইত, তাহা বিবেচনারও অতীত। রেশম তাদৃশ চিক্কণ না হইলেও মূল্য অতি সুলভ। তাহাদিগকে বাছিয়া বুনিতে পারিলে তদ্দ্বারা সুন্দর বস্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইতে পারে। ওলন্দাজেরা কাশীমবাজারে ইহার জন্য সাত-আট শত দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিক্‌গণও সেইরূপ অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত করে। বাঙ্গলার যথেষ্টপরিমাণে সোরাও উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যতীত বাঙ্গলায় বহুলপরিমাণে লাক্ষা, অহিফেন, মোম,

মৃগনাভি, লঙ্কামরিচ প্রভৃতি জন্মে। তদ্ভিন্ন ইহা হইতে অনেকপরিমাণে ঘৃত সমুদ্রপথে নানাদেশে নীত হয়। বার্ণিয়ে সোনার বাংলার সৌন্দর্য্যের কথাও বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়তীরে বিস্তৃত বহুসংখ্যক খাল ও অগণ্য-অধিবাসি-পরিপূর্ণ গ্রাম ও নগর এবং ধান্য, ইক্ষু, সর্ষপ, তিল, তুঁত প্রভৃতি নানাবিধ শস্য ও উদ্ভিজ্জে শোভিত প্রান্তরসমূহ ইহাকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া রাখিয়াছিল। তদ্ভিন্ন সহস্রখালবেষ্টিত, অরণ্যসুশোভিত ও আনারসাদি-নানাবিধ-ফলপরিপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জও ইহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিত। *

* "Egypt has been represented in every age as the finest and most fruitful country in the world, and even modern writers deny that there is any other land so peculiarly favoured by nature ; but the knowledge I have acquired of Bengal during two visits paid to the kingdom, inclines me te believe that the pre-eminence ascribed to Egypt is rather due to Bengal. The latter country produces rice in such abundance that it supplies not only the neighbouring but remote states. It is carried up the Ganges as far as Patna, and exported by sea to Muslipatam and many other ports on the coast of Coromondel. It is also sent to foreign kingdoms, principally to the island of Ceylon and the Maldives. Bengal abounds likewise in sugar with which it supplies the kingdoms of Golconda and the Carnatic, where very little is grown. Arabia and Mesopotamia, through the towns of Mokha and Bussora, and even Persia, by way of Bender-Abbassy. Bengal likewise is celebrated for its sweatmeats, especially in places inhabited by Portuguese, who are skilful in the art of preparing them, and with whom they are on article of considerable trade. Among other fruits, they preserve large citrons, such as we have in Europe, a certain delicate root about the length of Sarsa parilla, amba and pine-apples, two common fruits of India, small mirobolam plums, which are excellent ; lemons and ginger.

Bengal, it is true, yields not so much wheat as Egypt ; but if this be a defect, it is attributale to the inhabitants, who live a great deal more upon rice than the Egyptians and seldom taste bread. Nevertheless, wheat is cultivated in sufficient quantity for the consumption of the country, and for the making of excellent and cheap sea biscuits, with which the crews of European ships, English, Dutch and Portuguese, are supplied. The three or four sorts of vegetables which, together with rice and butter, form the chief aliment of the common people, are purchased for the merest trifle, and for a single rupee twenty or more good fowls may be brought. Geese and ducks are proportionably cheap. There are also geats and sheep in abundance ; and pigs are obtained at so low a price that the Portuguese, settled in the country, live almost entirely upon pork. This meat is salted at a cheap rate by the Dutch and English, for the supply of their respective vessels. Fish of every species, whether fresh or salt, is in the same profusion.

In a word, Bengal abounds with every necessary of life ; and it is this abundance that has induced so many Portuguese, half-castes, and other Christians, driven from their different settlements by the Dutch, to seek an asylum in this fertile kingdom. * * * In regard to valuable commodities of a nature to attract foreign merchants, I am acquainted with no country where so great a variety is found. Besides

বার্ণিয়ের স্থায় টাভার্নিয়েও বাঙ্লার অনেক পণ্যদ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথমত ইহার রেশমের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার অন্তর্গত কাশীমবাজার হইতে বিশহাজার গাঁইট রেশমের রপ্তানী হয়। ওলন্দাজগণ ছয়সাতহাজার গাঁইট চালান দিয়া থাকে, তাতারদেশীয় ও অন্যান্য বণিকেরাও ইহার ব্যবসায় করিয়া থাকে। এই সমস্ত রেশম গুজরাট, আমেদাবাদ ও সুরাট প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয় এবং এতদ্দেশে তদ্দ্বারা বস্ত্রাদিও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কাশীম-

the sugar I have spoken of, and which may be placed in the list of valuable commodities, there is in Bengal such a quantity of cotton and silks, that the kingdom may be called the common storehouse for those two kinds of merchandise, not of Hindostan only, but of all the neighbouring kingdoms, and even of Europe. I have been sometimes amazed at the vast quantity of cotton cloths, of every sort, fine and coarse, white and coloured, which the Dutch alone export to different places, especially to Japan and Europe. The English, the Portuguese and the native merchants deal also in these articles to a considerable extent. The same may be said of the silks and silk stuffs of all sorts. It is not possible to conceive the quantity drawn every year from Bengal for the supply of the whole of the Mogul Empire, as far as Lahore and Cabul, and generally of all those foreign nations to which the cotton cloths are sent. The silks are not certainly so fine as those of Persia, Syria, Said and Baruth, but they are of a much lower price ; and I know from indisputable authority, that, if they were well selected and wrought with care, they might be manufactured into most beautiful stuffs. The Dutch have sometimes seven or eight hundred natives employed in their silk factory at Kassem-Bazar. The English and other merchants employ likewise a great number. Bengal is also the principal emporium for saltpetre. * * * Lastly, it is from this fruitful kingdom that the best gum-lac, opium, wax, civet, long pepper and various drugs, are obtained ; and butter which may appear to you an inconsiderable article, is in such plenty, that although it be a bulky article to export, yet it is sent by sea to numberless places. * * *

In describing the beauty of Bengal, it should be remarked that throughout a country extending nearly an hundred leagues in length, on both banks of the Ganges, from Raja-Mahil to the sea, is an endless number of canals, cut from that river with immense labour, for the conveyance of merchandise and of the water itself, which is reputed by the Indians to be superior to any in the world. These canals are lined on both sides with towns and villages, thickly peopled with pagans ; and with extensive fields of rice, sugar, corn and other species of vegetables, mustard, sesame for oil, and small mulberry trees, two or three French feet in height, for the food of silkworms. But the most striking and peculiar beauty of Bengal is the innumerable islands filling the vast space between the two banks of the Ganges, in some places six or seven days' journey asunder. These islands vary in size, but are all extremely fertile, surrounded with wood, and abounding in fruit trees, and pineapples, and covered with verdure ; a thousand canals run through them, stretching beyond the sight, and resembling long walks arched with trees." (Bernier's Travels in the Mogul Empire.)

বাজারের রেশম সাধারণত পীতাভ, কিন্তু কাশীমবাজারবাসিগণ তাহাকে শ্বেতবর্ণও করিয়া থাকে। ওলন্দাজেরা সেই সমস্ত রেশম হুগলী পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া জাহাজে বোঝাই করে। বঙ্গদেশে শাদা কার্পাস-থানও প্রস্তুত হয়। এখান হইতে নীলেরও রপ্তানী হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে লাক্ষাও জন্মে। তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। এখান হইতে অনেকপরিমাণ চিনির রপ্তানী হইয়া থাকে। হুগলী, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাহার বাণিজ্য হয়।*

বার্ণিয়ে ও টাভার্নিয়েরর বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ইউরোপীয়-গণের মধ্যে ওলন্দাজগণই বঙ্গদেশে অধিক-পরিমাণে বাণিজ্যকার্য্যে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তৎকালে ইংরেজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌গণও এতদ্দেশের সহিত বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজদিগের বাণিজ্য-কার্য্যের বিষয় ও তাঁহাদের দ্বারা কিরূপে এতদ্দেশের বাণিজ্যের স্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। ইংরেজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের বহু-সংখ্যক বাণিজ্যজাহাজ বঙ্গদেশে আগমন করিত এবং তাহা পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া দেশবিদেশে প্রেরিত হইত। এই সমস্ত জাহাজের আরোহিগণ বঙ্গদেশের যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে টমাস্ বাউরী-নামক একজন কাপ্তেনের বর্ণনা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। বাউরী ১৬৬৯ হইতে ৭৯ পর্য্যন্ত এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

---

* "Kasembasar, a village in the kingdom of Bengala, sends abroad every year two and twenty-thousand bales of silk ; every bale weighing a hundred pound. The two and twenty bales make two millions and two-hundred-thousands pound, at sixteen ounces to the pound. The Hollanders usually carry away six or seven-thousand bales, and would carry away more, did not the merchants of Tartary, and the Mogul's empire oppose them ; for they buy up as much as the Hollander ; the rest the natives keep it to make their stuffs. This silk is all brought into the kingdom of Guzerat, the greatest part whereof comes to Amadabad and to Surat, where it is wrought up. * * The raw silk of Kasembasar yellowish, as are all the raw silks that come from Persia and Sicily; but the natives of Kasembasar have a way to whiten it, with a lye made of the ashes of a tree which they call Adam's fig-tree ; it as white as the Palestine-silk. The Hollanders send away all their merchandise which they fetch out of Bengala, by water, through a great canal that runs from Kasembasar into Ganges, for fifteen leagues together ; from whence it is as far by water down the Ganges to Ouguely, where they laid their ships. * * * White Calicuts come partly from Agra, and about Lahore, part from Bengala. * * * There comes indigo also from Bengala which the Holland-Company transports for Muslipatan. * * * Gum-luke for the most part comes from Pegu ; yet there is some also brought from Bengala, where it is very dear, by reason the natives fetch that lively scarlet colour out of it, with which they paint their Calicuts. * * * Powdered sugar is brought in great quantities out of the kingdom of Bengala ; It causes also a veay great trade at Ougueli, Patna, Daca and other places." (Tavernier's Travels in India.)

বাউরী বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময় বাঙ্গালা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা ও তাঁহার শাখানদীসমূহের তীরবর্ত্তী গ্রাম ও শস্যশ্যামল ভূমিতে ইক্ষু, কার্পাস, লাক্ষা, মধু, মোম, ঘৃত, তৈল, ধান্য, বুট প্রভৃতি অনেক পণ্যদ্রব্য জন্মিত। ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্টুগীজগণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাহাজসমূহ এই সমস্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ভারতের নানাস্থানে, পারস্য, আরব, চীন ও দক্ষিণসমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করিত। এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য ব্যতীত নানাপ্রকার কার্পাস-নির্ম্মিত থান ও ছিট, রুমাল, রেশম, রেশমী-বস্ত্র, অহিফেন, মৃগনাভি, লঙ্কা প্রভৃতি দ্রব্যও উৎপন্ন হইত। নবাব সায়েস্তাখাঁ এবং বণিক্‌গণ ঢাকা, বালেশ্বর, পিপলী প্রভৃতি স্থান হইতে বিংশতি পালের জাহাজ বাণিজ্যার্থে সিংহল, টেনাসরিম প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতেন। তাহারা হস্তী আনয়ন করিত ও মালদ্বীপ হইতে কড়ি প্রভৃতি আনিত। বাউরী কাশীমবাজারকে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার আড়ঙে সর্ব্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী হইত বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।*

* "This kingdom (Bengala) is now become most famous and Flourishinge. , First for the great River of Ganges and the many large and faire arms thereof, upon the banks of which are seated many faire Villages, delicate groves and fruitful lands, affording great plenty of sugar, cottons, Lucca, honey, beeswax, butter, oyles, Rice, Gramme, with many other beneficial commodities to satisfie this and many other kingdoms. Many both great and small ships, both English, Dutch, and Portugals doe annually resort to lode and transport sundry commodities hence, and great commerce goeth on into most parts of accompt in India, Persia, Arabia, China and South Seas. * *

This kingdom most plentifully doth abound with the before mentioned commodities, as also Callicoes of sundry sorts, Rommals, raw and wrought silks, opium (the best in India), Muske in codd and out of it, Long Pepper, and severall sorts of druggs which cometh it to be soe admirable well populated and effected by the best European travellers.

The Nabob and some Merchants here (Dacca) and in Balasore and Piple have about 20 saile of ships of considerable burthen, that annually trade to sea, some to Ceylone, some to Tanassarree. Those fetch elephants, and the rest, 6 or 7 yearly, goe to the 12000 Islands called Maldiva to fetch coweries and cayre, and most commonly doe make very profitable voyage. * * *

Cossumbazar —A very famous and pleasant town, famous in many respects, first and chiefely for its great commerce and plenty of very rich Merchants, the onley market-place in this kingdome for all commodities made and vended therein, whence it received this name, Cossum signifienge the husband or chiefe, and Bazar a market." (A Geographical Account of countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679. By Thomas Bowrey.) বাউরীসাহেব কাশীমবাজারকে খসমবাজার মনে করিয়া তাহার খসম অর্থাৎ স্বামী অর্থ করিয়াছেন।

এইরূপে বঙ্গভূমি বহু প্রাচীনকাল হইতে ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য-গৌরবে প্রকৃত সোনার বাংলারূপেই পরিচিত ছিল। স্বাধীন হিন্দুনরপতিগণের রাজত্বাবসান হইলেও বঙ্গভূমিতে অন্নের হাহাকার পড়িয়া যায় নাই। মুসল্মান-রাজত্বকালেও সোনার বাংলার মস্তকে অশেষ কল্যাণ বর্ষিত হইত। নবাব সায়েস্তাখাঁ ও সুজাউদ্দীনের সময় টাকায় ৮মণ ও মুর্শিদকুলীখাঁর সময় টাকায় ৪মণ চাউল বিক্রীত হইত। তখনও ইহার শিল্প-বাণিজ্যগৌরব সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিত। ইহার হিন্দু অধিবাসিগণের বাসভবনের অদূরে মুসল্মান-গণ বসবাস করিয়া সানন্দমনে কালযাপন করিত। ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রথম কিছুকাল উভয়-জাতির হৃদয়ে নানা তরঙ্গের উদয় করিয়া-ছিল বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা শান্তভাব আনয়ন করে। উভয়জাতির নানা সম্প্রদায় আপনাপন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়া লইত। এই উভয় জাতির হস্তপ্রসূত অসংখ্য পণ্যদ্রব্য অর্ণবযানে দেশবিদেশে নীত হইত। সর্ব্বাপেক্ষা কার্পাসসূত্র ও বস্ত্র বয়ন ইহার প্রধান শিল্পকার্য্য ছিল। ইহার জন্য কৃষকপরিবার হইতে তন্তুবায় ও ব্রাহ্মণ পরিবার পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কৃষকেরা ইহার চাষে, তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়নে, আর অন্যান্য জাতি ইহার সূত্রকর্ত্তনে নিযুক্ত হইত। প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থের ভবনে কার্পাসবস্ত্রবয়নরূপ মহাযজ্ঞের জন্য অনবিচ্ছিন্ন আয়োজন হইত। অন্যান্য দ্রব্যেরও কৃষি ও শিল্পে ইহার অধি-বাসিগণ মনোযোগ দিত। তাই বঙ্গভূমি শস্যশ্যামলা ও শিল্পবাণিজ্যগৌরবে গরীয়সী হইয়া সোনার বাংলারূপে দেশবিদেশে পরিচিত ছিল। ইহার প্রত্যেক গ্রামে স্বাস্থ্যের কল্যাণকরী ছায়া বিস্তৃত হইত। শ্যামল বৃক্ষরাজির তলে বসিয়া পল্লীবাসিগণ শারীরিক পরিশ্রমে আপনাদের জীবিকার উপায় করিত। বর্ত্তমান সময়ের বাঙালীর ন্যায় তাহারা শীর্ণদেহ ও কঙ্কালাবশেষ ছিল না। তাহাদের বাহুতে অপরিসীম শক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা সে বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছে। একদিন তাহারা আপনাদের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য পাঠান, মোগল ও ফিরিঙ্গীর সহিত অসিযুদ্ধ ও অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিল। ইহা কাহিনী নহে, ইতিহাস। মুসল্মান ও পাশ্চাত্য লেখকগণ বাঙ্লার এই বাহুবলের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের ইংরেজ-শাসনকর্ত্তৃগণ বাঙালীর যে বৃথা অপবাদ দিয়া জগতের সমক্ষে তাহাদিগকে হেয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, ইতিহাস সে কথা স্বীকার করে না। বাঙালীর এরূপ অধঃপতন ভারতে ইংরেজের শাসন-নীতি। যে বাঙালীগণ স্বর্গীয় স্বাস্থ্যে বলশালী হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হইত না, আজ তাহারা কঙ্কালাবশেষ, প্রেতমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহার প্রত্যেক পল্লীতে শান্তিদেবী বিরাজ করিতেন, যাহার প্রতি গৃহ হইতে এককালে রামায়ণ, চণ্ডী

ও কীর্ত্তনের আনন্দগীতি অনন্ত আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য উত্থিত হইত, আজ তাহা শৃগালপেচকের ধ্বনিতে মুখরিত। যাহার পল্লীললনাগণ স্বদেশী বস্ত্রের অন্তরাল হইতে আপনাদের লাবণ্যবিকাশ করিয়া দেবীমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেন, আজ বিদেশীবস্ত্রে তাঁহারা আপনাদের কর্কশকায় আবরণ করিবার জন্য ব্যগ্র! যাহার প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে হাস্যমুখ অধিবাসিগণ স্বস্ব জাতি ও সম্প্রদায়ানুমোদিত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিত, এক্ষণে তাহার সর্ব্বত্র, উদরান্নের সংস্থানের জন্য হাহাকারের রোল উঠিতেছে! আজ জীবনসংগ্রামে সকলেই আহত। কোথায় সে স্বাস্থ্য, কোথায় সে শান্তি, কোথায় সে কল্যাণ! আজ সোনার বাংলা শশ্মানভূমি! কেন এমন হইল, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

৫

দুর্ভিক্ষের গান।

গ্রামের প্রবেশপথে রাস্তার চৌমাথায় কতকগুলি শিশু—কতকগুলি ক্ষুদ্র নর-কঙ্কাল বলিলেও হয়—দুই হাতে আপনাদের উদর ধরিয়া একটা-কি গান গাহিতেছে, অথবা চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে। উহাদের উদর ভিতরদিকে ভয়ানক ঢুকিয়া গিয়াছে; চামড়ার খালি বোতলের মত কুঁচ্‌কিয়া চুপ্‌সিয়া গিয়াছে; বড় বড় চক্ষু;—কেন এত দুঃখযন্ত্রণা সহিতে হইতেছে ভাবিয়াই যেন বিস্ময়বিস্ফারিত।

এই গানের পূর্ণ প্রচণ্ডতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হয়, রাজস্থানে যাইতে হয়—যেখানে, শুধু এক-মুষ্টি চাউলের অভাবে শতসহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই গুহা হইতে সেই সব স্থান প্রায় দেড়শতক্রোশ দূরে।

এই প্রদেশে,—মৃত বন, মৃত জঙ্গল, সমস্তই মৃত।' যে বৃষ্টি পূর্ব্বে আরবসাগর হইতে প্রেরিত হইত, কিয়ৎবৎসর হইতে তাহার অভাব হইয়াছে, অথবা উহা ভিন্নপথে চলিয়া গিয়াছে;—বেলুচিস্থানের মরুভূমির উপর নিরর্থক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্রোত-স্বিনীতে জল নাই; নদী শুকাইয়া গিয়াছে; তরুলতা আর হরিৎ পরিচ্ছদ ধারণ করে না।

আমি এখন রৎলাম ও ইন্দোরের রাস্তা ধরিয়া রেলপথে দুর্ভিক্ষপ্রদেশে যাইতেছি। এক্ষণে সমস্ত ভারতই লৌহপথে ক্ষতবিক্ষত। যে ট্রেণে যাইতেছি, উহার সমস্ত গাড়িই প্রায়

খালি;—যাত্রীর মধ্যে দুইটিমাত্র ভারত-বাসী।

আমার চোখের নীচে দিয়া—কয়েক-ঘণ্টাকাল—কেবলই বন চলিয়াছে;—ইহা তালীবন নহে; এই সব বনতরু কতকটা আমাদের দেশীয় গাছের মত। বনগুলা যদি এত বড় না হইত, উহার দিগন্তদেশ যদি বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের বন বলিয়া ভ্রম হইতেও পারিত। সুকুমার শাখা, ধূসর শাখা। উহার সাধারণ রং—আমাদের দেশের ডিসেম্বারের "ওক্"-গাছের পাতার মত। আমাদের ফ্রান্স্‌দেশে, শরতের শেষভাগেই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন এপ্রিলমাসে ভারতবর্ষে রহি-য়াছি। গ্রীষ্মদেশসুলভ প্রখর উত্তাপ, অথচ বহির্দৃশ্য শীতদেশের মত। আজ ভ্রমণের এই প্রথমদিবসে, উৎকট দুঃখকষ্টের চিহ্ন এখনো পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ পায় নাই; তবে মনে হয়, প্রকৃতির কি-যেন-একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; সমস্ত দেশ নিরুপায় হইয়া যেন একটা উদাসভাব ধারণ করি-য়াছে; নিঃশেষিতশক্তি কোন গ্রহের যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের য়ুরোপের পিতামহ ভারত—বলা বাহুল্য, এখন ধ্বংসাবশেষের দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় চারিদিকেই সেই সব মৃতনগরের উপচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা শত-শত বৎসর, সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে;—সেই সব নগর, যাহার নাম পর্য্যন্ত এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যাহা এককালে খুব বড় ছিল;—পর্ব্বতাদির উপর রাজমহিমায় অধিষ্ঠিত হইয়া, পাদশায়ী অতলস্পর্শ অবলোকন করিত। তিনক্রোশ দীর্ঘ প্রাকারাবলী, প্রাসাদ ও মন্দিরাদি এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়া কপিবৃন্দ ও ভীষণ সর্পের আবাস হইয়া পড়িয়াছে।...এই সব ভগ্নাবশেষের নিকটে—আমাদের সেকেলে দুর্গপ্রাসাদের চূড়ামন্দির, নগরপালের আবাস-গৃহ, আমাদের সেই সামন্ত-যুগের আর সমস্ত কি ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়!

আমাদের যাত্রাপথের বরাবর ধারে-ধারে একটার পর একটা নগর ও অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই একই জ্বালাময় বায়ুরাশির মধ্যে নিম-জ্জিত। এই উদ্ভিজ্জাবশেষের উপর,—সেই গল্পকাহিনীর প্রাচীন মৃতনগরাদির অস্থি-রাশির উপর—প্রখর সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—ধূলায় মলিন, শীতঋতুসুলভ পাণ্ডুবর্ণ।

পরদিন, অসীম জঙ্গলের মধ্যে জাগ্রত হইলাম। যে প্রথম-গ্রামটিতে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল,—গাড়ির চাকার ঘর্ঘরশব্দ ও লোহালক্কড়ের ঝন্‌ঝনানি থামিবামাত্র, একটা কোলাহল—একটা বিশেষধরণের কোলাহল উঠিল; কিমদ্ভুত, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু শুনিলে শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়া যায়। আবার সেই ভীষণ গান—ইহা আমাকে ছাড়িবে না দেখিতেছি। এইবার দুর্ভিক্ষের দেশে প্রবেশ করা গিয়াছে। কতকগুলা শিশুর কণ্ঠস্বর,—ছুটির সময়ে, ইস্কুলের ছেলেরা যেরূপ কোলাহল করে, কতকটা সেইরূপ—কিন্তু এই কণ্ঠস্বর কেমন-যেন চেরা-চেরা, খ্যান্‌খেনে, অবসন্নপ্রায়;—স্পষ্ট শুনা যায় না।...

আহা! বেচারা শিশুগুলা, ঐখানে ঐ রেলিং-বেড়ার ধারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে এবং উহাদের শুষ্কহস্ত আমাদের দিকে প্রসারিত করিতেছে;—যে অস্থিখণ্ডের শেষপ্রান্ত হইতে হাতটি বাহির হইয়াছে, ঐ অস্থিখণ্ডই উহাদের বাহু! উহাদের শাম্‌লা গায়ের চামড়া পর্দ্দায়-পর্দ্দায় কুঁচ্‌কিয়া গিয়াছে, উহাদের শীর্ণ কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দেখিলে ভয় হয়। উহাদের উদর দেখিলে মনে হয়, যেন একেবারেই অন্ত্রশূন্য—এম্‌নি সমতল। চোখের পাতার উপর, ওষ্ঠের উপর মাছি লাগিয়া রহিয়াছে—শেষাবশিষ্ট আর্দ্রতাটুকু পান করিবে, এই আশায়? উহাদের শ্বাস যেন ফুরাইয়া আসিয়াছে, দেহে যেন আর প্রাণ নাই, তবু চীৎকার করিয়া চীৎকার করিতেছে। উহারা খাইতে চাহে—শুধু একমুঠা খাইতে চাহে। উহারা মনে করিতেছে, যাহারা এমন বড়-বড় গাড়ি চড়িয়া যাইতেছে, অবশ্যই উহারা ধনিলোক হইবে;—অবশ্যই উহারা সদয় হইয়া কিছু আমাদের নিকট ছুঁড়িয়া দিবে।

—"মহারাজ! মহারাজ!" (মহাশয়, মহাশয়)—ঐ সব ক্ষুদ্র কণ্ঠ গানের কম্পিত-স্বরে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে এমন শিশুও আছে, যাহাদের বয়স পূরা ৫বৎসর হইয়াছে কি না, সন্দেহ; তাহারাও "মহারাজ! মহারাজ!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে; উহারাও বেড়া-রেলিংএর মধ্য-দিয়া শীর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত বাহির করিয়া রহিয়াছে।

এই ট্রেণে যাহারা আমার সহযাত্রী, উহারা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর সামান্য-অবস্থার ভারতবাসী। উহাদের যাহা-কিছু সঙ্গে ছিল,—ছুঁড়িয়া-ছুঁড়িয়া উহারা ঐ শিশু-দিগের নিকট ফেলিতেছে;—চাউলপিঠার উচ্ছিষ্টাংশ ও পয়সা। ঐ ক্ষুধিত শিশুরা, পশুদের ন্যায়, পরস্পরকে মাড়াইয়া, হুম্‌ড়ি খাইয়া সেই সমস্তের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ঐ পয়সাগুলা কি উহাদের কাজে আসিবে? তবে কি গ্রামের হাটবাজারে এখনো কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে?—উহা শুধু তাহাদেরি জন্য, যাহাদের কিনিবার সম্বল আছে। আমাদের ট্রেণের পিছনেই ত চাউল-বোঝাই ৪টা মালগাড়ি জোড়া রহিয়াছে এবং প্রতিদিনই এই সব মালগাড়ি যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু এই চাউল উহাদিগকে দেওয়া হইবে না; উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উহা হইতে একমুষ্টি কিংবা দুইচারিটি দানাও দেওয়া হইবে না; উহা তাহাদেরি জন্য, যাহাদের এখনো কিছু অর্থ আছে—যাহারা উহার মূল্য দিতে সমর্থ।

এখনো কিজন্য গাড়ি ছাড়িতেছে না? কিজন্য এই বিষাদতমসাচ্ছন্ন গ্রামের সম্মুখে এতক্ষণ অপেক্ষা করা—যেখানে মিনিটে-মিনিটে ক্ষুধিতের দল আসিয়া জমা হইতেছে এবং সেই দুর্ভিক্ষের লোমহর্ষণ গান অবিরত গাহিতেছে?

চতুর্দ্দিকে, মাটি এত শুষ্ক গুঁড়াগুঁড়া হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহা ধানের ক্ষেত ছিল, এক্ষণে তাহা ভস্মাচ্ছন্ন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ দেখ কতকগুলি রমণী—রমণীর কঙ্কাল বলিলেও হয়—উহাদের স্তন শুষ্কচামড়ার টুক্‌রার মত ঝুলিতেছে। উহারা পূতিগন্ধি ভারী বোঝার

গাঁট মাথায় লইয়া, বিক্রয়ের আশায়, তাড়াতাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আনিয়াছে ;—এ সমস্ত সেই সব গরুর চামড়া—যাহারা অনাহারে মরিয়াছে এবং পরে যাহাদের গাত্র হইতে উহারা ছাল ছাড়াইয়া লইয়াছে। গরুদের খাওয়াইতে পারে না বলিয়া, আধমরা জীবন্ত গরুদের মূল্য চারি-আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। গোমাংস খাইয়া কেহ যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে, তাহারো জো নাই ; কেন না, এই ব্রাহ্মণ্যের দেশে, প্রাণ গেলেও কেহ এ কাজ করিবে না। তবে এই চামড়াগুলা কে ক্রয় করিবে ?—এই সব চর্ম্ম, যাহা হইতে পূতিগন্ধ বাহির হইতেছে এবং যাহাতে ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি আসিয়া বসিতেছে।

আমার কাছে যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই উহাদের নিকট ছুঁড়িয়া দিয়াছি···কি উৎপাত! এখান হইতে গাড়ি কি আর ছাড়িবে না ? ...আহা! ঐ ৩।৪বৎসরের শিশুটির মুখে কি হতাশভাব! উহা অপেক্ষা একটু বয়সে বড় আর একটি শিশু উহার মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে উহার ভিক্ষাসামগ্রীটি ছিনাইয়া লইয়াছে ! ...

এতক্ষণের পর ট্রেন্‌টা ঝাঁকানি দিয়া নড়িয়া উঠিল, চলিতে লাগিল ; সমস্ত কোলাহল ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। আবার আমাদিগকে সেই নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যে আনিয়া ফেলিল।

এ, মরা জঙ্গল। পূর্ব্বে এই জঙ্গল বসন্তকালে জীবজন্তুতে আকীর্ণ হইত ; তৃণাদি, ঝোপ্‌ঝাড় আর হরিদ্বর্ণ ধারণ করে না ; এই ফাল্গুনও রসসঞ্চার করিয়া উদ্ভিজ্জকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর উত্তাপসত্বেও, অরণ্যাদির ন্যায় এই জঙ্গলও শীতের ভাব ধারণ করিয়াছে। শীর্ণকায় হরিণেরা তৃণ খুঁজিয়া না পাইয়া, জলের সন্ধান না পাইয়া, আকুলভাবে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। দূর-দূর ব্যবধানে, কোন একটি শুষ্কগাছের গুঁড়িতে —কোন একটি তরুণ শাখায়,—কোন একটি নিঃসঙ্গ ক্ষুদ্র উপশাখায়—যে-কিছু রস অবশিষ্ট ছিল তাহাই শোষণ করিয়া, তাহা হইতে দুইচারিটি নরম পাতা বাহির হইয়াছে, অথবা একটি বড়-রকমের লাল ফুল, এই মরুদৃশ্যের মাঝখানে, উদাসভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।

যে গ্রামেই ট্রেন্‌ আসিয়া থামে, সেইখানেই এই সব দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধিতের দল রেলিংএর মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। যাহা শুনিতে ভয় হয়, যাহা সর্ব্বত্রই একই ধরণের—সেই চেরা-চেরা আওয়াজের একসুরো গান কোন গ্রামের নিকটে গাড়ি থামিলেই শুনিতে পাওয়া যায়। এবং যখন আমরা সেই তাপদগ্ধ বিজনের মধ্যে—দূরে চলিয়া যাই, তখন দারুণ নৈরাশ্যে উহাদের কণ্ঠস্বর আরো স্ফীত হইয়া আমাদিগকে অনুধাবন করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অহল্যাবাইয়ের পোষ্যপুত্র। *

পতিবিয়োগান্তে মহারাণী অহল্যাবাই স্বয়ং রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। রাজ্যে সুশাসন এবং শৃঙ্খলা স্থাপনকল্পে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদিন মহারাণীর মনে হইল, দেহ ক্ষণভঙ্গুর,—কোন উপযুক্ত প্রজাপালক পুরুষপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করা আবশ্যক। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মহারাণী স্বীয় অনুচরবৃন্দকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, "রাজধানীতে আমাদের স্বজাতি [illegible] হইতে আট বৎসরের যত বালক আছে, সকলকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত কর।"

আজ্ঞা পাইবামাত্র কর্ম্মচারিগণ মহারাণীর কুলজাত নগরস্থ সমস্ত বালককে তাঁহার সম্মুখে লইয়া আসিল। মহারাণী তাহাদিগকে একপংক্তিতে দাঁড় করাইয়া প্রত্যেকের আকৃতির প্রতি বিশেষরূপে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া অবশেষে তুকোনামক বালকের হস্তধারণপূর্ব্বক অনুচরের প্রতি কহিলেন, "এই বালককে অন্তঃপুরে লইয়া যাও এবং রাজমর্য্যাদানুসারে স্নান করাইয়া ও বসনভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর।" তদনন্তর নগরমধ্যে তাঁহার আজ্ঞানুসারে অভিষেকের উৎসবসূচক আনন্দভেরি বাজিয়া উঠিল। নগরবাসীর আনন্দের সীমা রহিল না,—গৃহে গৃহে মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল, রাজধানী বিবিধ মাঙ্গল্যদ্রব্যে সুশোভিত হইল। অবশেষে দরিদ্র-সন্তান "তুকুয়া" স্বয়ং মহারাণীকর্ত্তৃক সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া মহারাজ তুকোজী হোলকর নামে অভিহিত হইলেন।

এই অষ্টমবর্ষীয় বালকের সম্যক্ বিদ্যার্জ্জন এবং ব্রহ্মচর্য্যপালনের নিমিত্ত কুলবান্ নিষ্ঠাবান্ সুবিদ্বান্ বয়োবৃদ্ধ বহু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া মহারাণী তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি স্বীয় বুদ্ধিমতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ মনে করিয়া, এবং লক্ষ লক্ষ প্রজার কল্যাণ ও ধনপ্রাণরক্ষা কেবল সুযোগ্য শাসকের দ্বারাই সম্ভব এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এই বালককে ইহার অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আপনাদের হস্তে অর্পণ করিলাম; যতদিন এই বালক যৌবনাবস্থায় উত্তীর্ণ না হয় এবং যাবৎ আপনাদের অনুমোদনপত্র না পায়, তাবৎ আপনারা নিজপুত্রবৎ ইহার লালন এবং তাড়নের অধিকারী।"

বালকের সেবার্থ পূর্ণবয়স্ক, কায়মনোবাক্যে সদাচারী, সুশীল ও পরিচর্য্যানিপুণ সেবক নিযোজিত হইল। মহারাণী তাহাদিগকে বলিলেন, "আজ তোমাদের সৌভাগ্যের দিন। আজ ঈশ্বর তোমাদের

* স্বামি-বিশ্বেশ্বরানন্দ-কর্ত্তৃক হিন্দিতে রচিত। শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ সেন কর্ত্তৃক অনূদিত।

সুকৃতির ফল তোমাদিগকে দিতেছেন। তোমরা তোমাদের চিরজীবী মহারাজের নিকটবর্ত্তি-সেবক নামে অভিহিত হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলে। ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।”

মহারাণী অহল্যাবাই নিজের যোগ্যতা-দ্বারা তুকোকে ক্ষাত্রধর্ম্মে নিপুণ করিয়া তাঁহার রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিলেন। পুরাকালে অনেকানেক ভারতমহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—যাঁহারা রাজ্যশাসন-কার্য্যে অসাধারণ প্রবীণতা ও দূরদর্শন দেখাইয়াছেন। অহল্যাবাই তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তুকোজী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া মহা-রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ দুইবৎসরকাল উৎকৃষ্ট প্রণালীতে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিবার পর, দেশাটনের ইচ্ছা করিলেন। তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন —“যদি রাজমর্য্যাদানুরূপ চতুরশ্ববাহী শকটে আরোহণ করিয়া, কোষমুক্তখড়্গধারী প্রহরিবর্গে বেষ্টিত হইয়া দেশভ্রমণ করি, তাহা হইলে প্রজাপুঞ্জের যে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার ইচ্ছা আমার আছে, তাহা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।” সুতরাং নিজের অনুপস্থিতিকালে রাজ্যপরিচালনের সমুচিত বন্দোবস্ত করিয়া চারিজন বিশ্বস্ত বিদ্বান্ দেওয়ানের সহিত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বপ্রহরে তিনি যাত্রা করিলেন। প্রথমে রেসিডেণ্টসাহেবের কুঠিতে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “আমি ছদ্মবেশে দেশপর্য্যটনমানসে বাহির হইয়াছি। রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, আর আপনি ত আছেনই, সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নাই। আমাদের পাঁচজনের এই প্রতিকৃতি * লউন। পরন্তু সাধারণে যেন ইহার বিন্দু-বিসর্গও না জানিতে পারে।” এইরূপ দুইচারি কথার পর সাহেবের হস্তমর্দ্দন করিয়া তাঁহারা রওনা হইলেন। সাধারণ যাত্রীদের মত তাঁহারাও একখানি কম্বল, একটি ঘটী ও একগাছি দড়ি স্কন্ধে ঝুলাইয়া সাধারণ্যে মিশিয়া গেলেন।

এই পরিভ্রমণকালে মহারাজ প্রতিদিন পাঁচটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া পথে বাহির হইতেন। তথায় পথিকের সহিত মিলিত হইলে অথবা শস্যক্ষেত্রে শ্রমনিরত কৃষককে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে “রাম রাম” বলিয়া অভিনন্দন করিতেন এবং একত্র তামাকু খাইবার ছলে নিতান্ত প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাহাদের অবস্থা সম্যক্ অবগত হইতেন। এইরূপে প্রজাবর্গের বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও মনোভাবের চিত্রসকল নিজ মানসপটে অঙ্কিত করিয়া ঠিক বেলা এগারটায় বাসায় ফিরিতেন। বাসায় আসিয়া কিছুক্ষণ শ্রমাপনোদনের পর সকলে মিলিয়া হৃষ্টচিত্তে স্নানভোজনাদি দিনকৃত্য সমাপন করিয়া একঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন, পরে নগর-পরিদর্শনে বাহির হইতেন।

নগরে তাম্বলী, মিষ্টান্নকার, মুদি,

* ফোটো প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহারাজের গমনবার্ত্তা সকল স্থানের রাজপুরুষদিগকে জানান আবশ্যক। রাজপুরুষগণের অজ্ঞাতসারে মহারাজের দেশভ্রমণ সরকারবাহাদুরের নীতিবিরুদ্ধ।

বেনিয়া, জহরী, শেঠ প্রভৃতির বিপণিতে প্রবেশ করিয়া সেই সেই স্থানে তিনি স্বেচ্ছানুরূপ তথ্যসংগ্রহ করিতেন। জুয়া-খেলার ঘরে, মদের দোকানে ও অর্দ্ধতন্দ্রাগত মুদ্রিতনয়ন চণ্ডুপায়িগণের আড্ডাতেও ঢুকিয়া পড়িতেন। ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত থাকিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায়বিচার, জজের বিশাল বুদ্ধি ও সূক্ষ্মমীমাংসা এবং উকিলগণের ধারানুক্রমিক যুক্তিযুক্ত বাদানুবাদের বিচিত্র ছটা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সারাদিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া শেষে বাসায় পৌঁছিয়া আহারাদি করিতেন। মহারাজ ও তাঁহার দেওয়ানগণের মধ্যে কেবল এইমাত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত যে, রাত্রির চারিপ্রহরে চারিজন নিদ্রিত-মহারাজের প্রহরিস্বরূপে জাগ্রত থাকিতেন। নহিলে অবশিষ্ট সময়ে না কেহ রাজা, না কেহ দেওয়ান,—সকলেরই কার্য্য-কলাপ সামান্য পথিকেরই মত।

এইরূপে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ নগরে চারি-পাঁচদিন বাস করিয়া, বিবিধ-চরিত্র-পরিদর্শনে নিজের অভিজ্ঞতাবর্দ্ধন ও নানাবিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিয়া, রাজ্যের অনিষ্টাচারী দুর্বৃত্ত-গণের চরিত্র যথাশক্তি দেখিয়া এবং রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিয়া, দুই-বৎসর পরে পুনশ্চ তিনি সিংহাসনে শোভমান হইলেন এবং যথাবিধি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ তুকোজীর এই প্রশংসনীয় পর্য্যটনের ফলে প্রজাকুল কিরূপ লাভবান্ হয়, রাজ্যের সংস্কারকল্পে ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনার্থ তিনি কোন্ কোন্ সুনিয়ম প্রচলন করেন এবং কিরূপ আগ্রহ ও প্রজাপ্রীতির সহিত রাজকার্য্যে দত্তচিত্ত হন, ইত্যাদি বিষয় ঐতিহাসিকগণ বর্ণন করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষ দুইএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় তাঁহার চরিত্রের কিছু আভাস দিব মাত্র।

মহারাজ নিত্য প্রত্যূষে,—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাদেবীর অঙ্কত্যাগ করিতেন। পরে, শৌচাদি-প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে প্রধান 'কর্ম্ম-চারী (মীর মুন্সী) সমভিব্যাহারে, শকটা-রোহণে নগরের বহির্দ্দেশে কোন ময়দানে যাইতেন। রাজ্যের মঙ্গলচিন্তাই তাঁহার অঙ্গরক্ষক থাকিত,—আত্মরক্ষার নিমিত্ত তিনি সৈনিকাদি সঙ্গে লইতেন' না। ময়দানে উপস্থিত হইয়া অশ্বগণকে 'রশ্মিমুক্ত করিবার আদেশ ছিল। সেখানে প্রজ্বলিত দীপালোকে মীর মুন্সীর মুখে তিনি রাজ্য-সংক্রান্ত কাগজপত্র শুনিতে আরম্ভ করিতেন। অবশেষে গগনপটে বালারুণজ্যোতি প্রকাশ পাইলে, কিয়দ্দূর পদব্রজে যাইয়া শকটে আরূঢ় হইতেন এবং মীর মুন্সীর সহিত রাজ্যশাসনাদির কথা আলোচনা করিতে করিতে ও চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে ধীর-গতিতে বেলা আটটার সময় প্রাসাদে পৌঁছিতেন। পথিমধ্যে কেহ যদি তাঁহাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছে, এরূপ লক্ষণ দেখাইত, ধনি দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি অভিমানবর্জ্জিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নান্তে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার কি কিছু বলিবার আছে? যদি থাকে ত নিঃশঙ্ক হইয়া বলিতে পার।"

প্রাসাদে পৌঁছিয়া উহার বহির্দ্দেশেই শকটারূঢ় অবস্থায় দরবার করিতেন;—সেইখানেই প্রজাবর্গের আবেদনপত্রে যথোচিত আদেশ দিতেন। দশটার সময় প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতরে আবার একঘণ্টাকাল দরবার করিতেন। এগারটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত স্নান, ধ্যান ও ভোজনে অতিবাহিত হইত। আহার পর বেলা দুইটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া পুনশ্চ তিনি দরবারে বসিতেন। এই দরবারে রাজকার্য্যের সকল বিভাগের প্রধানগণ, জেলাসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ, বিদেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলী, বিবিধ বিদ্যা ও ললিতকলায় পারদর্শী গুণিজন এবং বণিগ্‌বর্গ নিজ নিজ মর্য্যাদানুরূপ আসন অধিকার করিয়া মহারাজের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেন।

মহারাজ আসিয়া সুবিস্তৃত বৈঠকে উপবিষ্ট জনমণ্ডলীর মধ্যেই বসিতেন। তাঁহার এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রভেদসূচক রাজমর্য্যাদার লক্ষণ কেবল তিনটি বালিশ থাকিত। যে বিভাগের অধ্যক্ষের দিকে মহারাজ মুখ ফিরাইতেন, তৎক্ষণাৎ সেই বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁহাকে কার্য্যবিবরণী শুনাইতে আরম্ভ করিতেন। "ওহে, অমুকদিন অমুকগ্রামের অমুক কৃষক অমুক বিষয়ে যে আবেদন করিয়াছিল, তাহার উপর মন্ত্রিমহাশয় কিরূপ আদেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কাগজপত্র বাহির কর"—এইরূপে মহারাজ প্রত্যেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, বিদেশীদিগকে কুশলজিজ্ঞাসা, সদালাপে সকলের তুষ্টিবিধান, বিদায়ার্থিগণকে বিদায়দান ও অন্যান্য নিত্যকর্ম্ম নিত্য সমাপন করিয়া রাত্রি এগারটার সময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ কেবল তিনচারঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন, অবশিষ্ট বিশঘণ্টা রাজকার্য্যেই ব্যয়িত হইত। রাজ্যের ইষ্টচিন্তাই তাঁহার একমাত্র সুখ ছিল। কোন গ্রামের কোন ক্ষেত্র, কোন আসামীর কোন মোকদ্দমা বা রাজকার্য্যের এমন কোন বিষয়ই ছিল না, যাহা তিনি মনে করিয়া না রাখিতেন।

মহারাজ তুকোজী একদিন হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া বিশেষ জাঁকজমকের সহিত কোন স্থানে যাইতেছিলেন, লোকের ভিড় সরাইতে সরাইতে সিপাহীরা অগ্রগামী হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন এক দরিদ্র বৃদ্ধকে নিতান্ত সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া কহিল, "ওরে বুড়ো, মহারাজের হাতী আস্‌ছে, সরে যা।" শুনিয়া বৃদ্ধ উন্মুখ হইয়া দেখিল। কহিল, "হুঁ, সেই তুকুয়াই ত।" ইতিমধ্যে মহারাজের হস্তী নিকটে আসিয়া পড়িল। তখন সিপাহী বৃদ্ধকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে মহারাজের এই কথাকয়টি শুনিতে পাওয়া গেল, "হাঁ বাবা, আমি সেই তুকুয়াই বটি।"

বাল্যের শিক্ষাপ্রভাবই তুকোজীর ভবিষ্যৎ মহত্বের কারণ হইয়াছিল। অহল্যাবাইএর লালনপালন ও তাড়ন হইতেই তুকোজীর বাল্যলব্ধ সুসংস্কারের উৎপত্তি।

শ্রীঃ—

পাল্‌কী-বেহারার গান। *

মোরা মন্দ মৃদু মন্দ তা'রে
বাহিয়া যাই চলে'।
সে যে গানের হাওয়া লেগে যেন
ফুলের মত দোলে।
সে যে পাখীর মত ছুঁয়ে চলে
স্রোতের ফেনা-'পরে
সে যে স্বপন-দেখা অধর হ'তে
হাসির মত ঝরে।
মোরা সুখের তালে চরণ ফেলে
ধাই গো মোরা গাই,
যেন মালার মাঝে মোতির মত
তাহারে বাহি ভাই।

মোরা মন্দ মৃদু মন্দ তারে
বাহিয়া যাই চলে,
সে যে গানের হিমবিন্দু'পরে
তারার মত দোলে।
সে যে বন্যামুখে উর্ম্মিভালে
রশ্মিসম ফুটে,
সে যে বধূর নত নয়ন হ'তে
অশ্রুসম টুটে।
মোরা মন্দ মৃদু মন্দ মৃদু
ধাই গো মোরা গাই
যেন মালার মাঝে মোতির মত
তাহারে বাহি ভাই।

* হাইদ্রাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর রচিত ইংরেজি কবিতা হইতে অনূদিত।

স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্।

১

যে ভাব ও আদর্শকে আমরা এখন স্বদেশী নামে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহা এদেশে নিতান্তই নূতন। ইতিপূর্ব্বে ইহা আমাদের সমাজে কথনো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। ইংরেজিতে ইহাকে পেট্রিয়টিজম্ বলে। ইংরেজিশিক্ষার প্রেরণায়, পাশ্চাত্য-সাধনার প্রভাবে, ইংরেজশাসনের চাপে এ ভাব ও এ আদর্শ আমাদের মধ্যে জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বস্তু পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না, আমাদের ভাষায় ইহার নাম নাই।

আমাদের সমাজ আছে, সমাজ ছিল; কিন্তু নেশন্ পূর্ব্বে কথনো ছিল না। এই-জন্য আমাদের ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু পেট্রিয়টিজম্ ছিল না। মানবসমাজ যে ছাঁচে ঢালাই হইলে নেশনরূপে গড়িয়া উঠে, বিধাতা আমাদের সমাজকে ইতিপূর্ব্বে সে ছাঁচে কথনো ফেলেন নাই। প্রথম হইতেই, এইজন্য আমাদের সমাজের আদর্শ ও আকার অন্যরূপ ছিল।

য়ুরোপে গ্রীকেরা পেট্রিয়টিজমের আদি-গুরু ছিলেন। গ্রীক্‌সমাজতত্ত্বের মধ্যে এই অপূর্ব্ব দেশচর্য্যের বীজ নিহিত ছিল। আর গ্রীক্ যে চক্ষে সমাজকে দেখিত, যে ভাবে সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিল, যে আদর্শে সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, হিন্দু সেরূপ করে নাই।

গ্রীক্ ও হিন্দু উভয়েই একই বিশাল আর্য্যবংশের বিভিন্ন শাখা। সুতরাং উভয়ের মধ্যেই আর্য্যকুললক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর্য্যের লক্ষণ দুই—এক তাহার তীক্ষ্ণ তত্ত্বদৃষ্টি, দ্বিতীয় তাহার সমদর্শী সমাজগঠন। আর্য্যভাষা ও আর্য্যচিন্তা চিরদিনই আত্মাকে অনাত্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিয়াছে ও বর্ণনা করিয়াছে। আর্য্যসমাজে সেইরূপ চিরদিনই প্রজাশক্তির সংহতিতে রাজশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে। গ্রীক্ ও হিন্দু উভয়ের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এই দ্বিবিধ আর্য্যলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রীক্ ও হিন্দু একই আর্য্যবংশসম্ভূত ও আর্য্যলক্ষণাক্রান্ত হইলেও, উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্যও অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমত হিন্দুর তত্ত্ব-জ্ঞান যে প্রণালীতে বিকশিত হইয়াছে, গ্রীকের তত্ত্বান্বেষণ সে পন্থায় পরিচালিত হয় নাই। হিন্দু বিশিষ্টকে উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিয়া নির্ব্বিশেষভাবে তত্ত্ববস্তুকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। সকল জাগতিক সম্বন্ধকে অলীক বা মায়িক বলিয়া উড়াইয়া-দিয়া, হিন্দু জগদতীত ও মায়াতীত, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যবস্তুর অন্বেষণে গিয়াছে। গ্রীক্ সে পথে যায় নাই। হিন্দু মুখ্যত নির্গুণবাদী, গ্রীক্ মুখ্যত সগুণবাদী। গ্রীক্ জগতের সম্বন্ধকে উপেক্ষা করে নাই, কিন্তু

এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে সকল সম্বন্ধের আধার ও অবলম্বনরূপেই তত্ত্ববস্তুকে পাইতে প্রয়াস করিয়াছে। এইখানেই গ্রীক্ ও হিন্দুর মধ্যে বিশাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া যায়।

এই প্রভেদনিবন্ধনই গ্রীক্ ও হিন্দুর সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে বিশাল পার্থক্যের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীকেরা বিশিষ্টের মধ্যে নির্ব্বিশেষকে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, জগতের সকলপ্রকারের—বস্তুগত, ব্যক্তিগত, ভাবগত, চিন্তাগত—সম্বন্ধকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুর বিবিধ সম্বন্ধের আলোচনা করিতে যাইয়া গ্রীসে জড়বিজ্ঞান প্রাচীনকালেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু জড়কে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিয়া জড়বিজ্ঞানের যাহা-কিছু অবশ্যম্ভাবী বিকাশ এদেশে হইয়াছিল, তাহাও রক্ষা করিতে পারে নাই। গ্রীক্ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে জনসমষ্টির বা সমাজের, প্রজার সঙ্গে প্রজার ও প্রজার সঙ্গে রাজশক্তির যে সকল বিচিত্র সম্বন্ধ, তাহার পরিপক্কতা ও উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায়, অদ্ভুত সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; হিন্দু এই সমুদায় সম্বন্ধকে অবিদ্যাবিষয়ীভূত বলিয়া, সাধনের ও পরমার্থের অন্তরায় ভাবিয়া সর্ব্বদা উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সুতরাং ব্যক্তিগত স্বত্বস্বাধীনতাসংবলিত যে সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতি, তাহার প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে কখনো হয় নাই। অংশের সঙ্গে অংশের ও অংশের সঙ্গে অংশীর, অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের ও অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গীর, এবংবিধ যে সকল সম্বন্ধের সম্যক্ জ্ঞানের উপরে চিত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্করবিদ্যা প্রভৃতির উৎকর্ষ নির্ভর করে; পদের সঙ্গে বাক্যের ও বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, কর্ত্তার সঙ্গে কর্ম্মের, ইত্যাদি যে সকল সম্বন্ধের উপরে ব্যাকরণ ও ন্যায়ের মূলতত্ত্বসকল প্রতিষ্ঠিত;—তৎসমুদায়ই গ্রীসে অত্যাশ্চর্য্য পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গ্রীক্ বিশিষ্টের মধ্যে নির্ব্বিশেষকে, সম্বন্ধের মধ্যে সম্বন্ধীকে, বহুর মধ্যে এককে অন্বেষণ করিতে যাইয়া এই সকল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু অন্যদিকে শুদ্ধ, অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ চৈতন্যবস্তুকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া, জগতের সকল সম্বন্ধ, সকল বিশেষত্ব, সকল বিচিত্রতাকে ঔপাধিক, মায়িক ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে এবং সেই মায়াতীত শুদ্ধ সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার আশায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গ্রীকের সমাজতত্ত্ব, গ্রীকের রাজনীতি, গ্রীকের ললিতকলা প্রভৃতি যেমন মানবীয় সাধনার অমূল্যরত্ন; সেইরূপ হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞানও জগতে আর এক অমূল্যবস্তু। এই উভয়বিধ সাধনারই লক্ষ্য এক,—সেই অদ্বৈত, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দপুরুষ। ঋজুকুটিল বহু পন্থার অনুসরণ করিয়া জীব সেই অনন্তকে লাভ করিতে চায়। গ্রীক্ ও হিন্দু, আর্য্যজাতির এই দুই শাখা, সেই একই বস্তুকে দ্বিবিধভাবে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া জগতে দুই অমূল্য সাধনার সৃষ্টি করিয়াছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুর চক্ষু অদ্বৈতে নিবদ্ধ হইয়া আছে। যে অদ্বৈতের

অন্বেষণে যায়, তাহাকে সকল ভেদ ও সকল বিরোধ বর্জ্জন করিয়া চলিতে হয়। যেখানে মায়াপ্রভাবে ভেদ প্রকাশিত হয়, সেখানে অদ্বৈতের উপাসক এই ভেদের মধ্যেই অভেদ-সাধনের পন্থা খুলিয়া লন। ভেদমাত্রেই অজ্ঞতাপ্রসূত। এই অজ্ঞান অহংজ্ঞান-মূলক। অহংজ্ঞান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকার হইতেই উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানা-বস্থায় এই অহংজ্ঞানকে সংযত ও সংস্কৃত করিবার জন্যই ভেদকে অভেদভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। বিধিনিষেধ ভেদের রাজ্যেই সম্ভব, অভেদ-অবস্থায় বিধিও নাই, নিষেধও নাই—সেখানে সাধক 'পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং শান্তমুপৈতি'—পুণ্য ও পাপ-উভয়ের অতীত হইয়া নিরঞ্জন পরম-শান্তকে লাভ করেন। ভেদকে অতিক্রম করিতে হইলে, ভেদকেই আরো প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিধিনিষেধাত্মক সাধনদ্বারা অহং-জ্ঞান ও বিষয়লালসাকে নিরস্ত করিয়া, পরে ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হইতে হয়। ব্যাবহারিক জগতে হিন্দু এইজন্য ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই উপরে ব্রহ্মসাধনের পূর্ব্ববৃত্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। সাধনার নিম্নস্তরে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হিন্দু ভেদকে স্বীকার করিয়াছে। মূলে সম্ভবত গুণকর্ম্মবিভাগের উপরেই এই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা কুলগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পরিণামে অভেদজ্ঞান-উৎপাদনই এই বর্ণধর্ম্মেরও লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। ফলত যমনিয়মাদি সাধনা ও নিত্যনৈমিত্তিক বিবিধ কর্ম্মাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও, নিম্ন অধিকারীর জন্য, চিত্তশুদ্ধির উপায় বিহিত করিয়াছিল বলিয়াই চরমে অভেদ-আত্মজ্ঞান-লাভের সোপানরূপেই চিরদিন অদ্বৈতসাধকমণ্ডলীকর্ত্তৃকও সমর্থিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই ভেদাত্মক বর্ণাশ্রমই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বা চরম আশ্রম নহে। বর্ণাশ্রম গার্হস্থ্যের অঙ্গীভূত, কিন্তু গার্হস্থ্যের উপরে সন্ন্যাসাশ্রম ও বর্ণধর্ম্মের উপরে সনাতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে আশ্রমে ও সে ধর্ম্মে সর্ব্বজনীন মৈত্রী ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি সাধিত ও আচরিত হইত। সে ধর্ম্মে জাতিও নাই, ব্যক্তিও নাই; ব্রাহ্মণও নাই, চণ্ডালও নাই; উচ্চও নাই, নীচও নাই;—সকলই সমান;—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মময়ং জগৎ। সে ধর্ম্মের সাধ্য অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু; তাহার সাধনা ভেদমূলক অহংবুদ্ধির বিনাশ। মানবসমাজে বিভিন্ন-দেশী, বিভিন্নভাষী, বিভিন্নসম্প্রদায়বদ্ধ মানবসমষ্টির মধ্যে যে ভেদ, যে বিরোধ, যে সংঘর্ষ, যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নেশন্ ও পেট্রিয়টিজম্ ফুটিয়া উঠে, বর্ণাশ্রমে বা সনাতনধর্ম্মে, হিন্দুর সমাজে বা সাধনায়, তাহার জীবনে বা আদর্শে, তাহার সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানাদিতে কুত্রাপি তাহা সম্যক্ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

অতি প্রাচীনযুগে, বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে যখন দীর্ঘ-কালব্যাপী বিরোধ চলিয়াছিল, সে সময়ে অতি সামান্য আকারে এই নেশন্‌ভাব আমাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত

হওয়া যায়। কিন্তু এই সংগ্রামের অবসানে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের প্রতিষ্ঠাতে, বিশেষত বর্ণাশ্রমবিভাগনিবন্ধন, যখন পররাষ্ট্রে ও স্বরাষ্ট্রে, উভয়ত সর্ব্বপ্রকারের তীব্র বিরোধ একরূপ নিরস্ত হইয়া যায়, সেই সময়ে, আমাদের এই প্রাচীন নেশন্‌-ভাবও অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজশাসন, সমাজরক্ষা ও সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য য়ুরোপে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ যে কার্য্য করিয়াছে, আমাদের মধ্যে সে কার্য্য এতাবৎকাল মোটামুটি বর্ণবিভাগ ও আশ্রমধর্ম্মের দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিয়াছে।

এখন হিন্দুসমাজ যে বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে, একদিন তাহা ছিল না। একদিন অনার্য্যাধ্যুষিত ভারতভূমে হিন্দু বা আর্য্যগণ মুষ্টিমেয়মাত্র ছিল। অপরাপর আর্য্য ঔপনিবেশিকের মত ভারতের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ কতকটা পরিমাণে অনার্য্য অধিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া এই ভারতবর্ষে আপনাদের রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু য়ুরোপীয় আর্য্যেরা মার্কিণে, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিলণ্ডে যেরূপভাবে আদিম অধিবাসীদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দু আর্য্য ভারতবর্ষে আপনার উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইয়া কখনো সেরূপ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি যে আর্য্য-অনার্য্য বহুজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা এখন একরূপ সকলেই স্বীকার করেন। এইরূপ সম্মিশ্রণে সর্ব্বত্রই বিরাট্‌ নেশন্‌সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে এই সম্মিশ্রণক্রিয়া যেভাবে সাধিত হয়, অন্যত্র সেভাবে ও সে আদর্শে হইয়াছিল, এরূপ কোনো প্রমাণ নাই। হিন্দু অহিন্দুকে ধর্ম্মের পুটে পাক করিয়া, বর্ণাশ্রমের ছাঁচে ফেলিয়া বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছে। দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দেশে এই প্রণালীতেই হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হিন্দু নেশন্‌ গড়িতে যাইয়া ধর্ম্মের পুট ব্যবহার করিয়াছে; য়ুরোপের আর্য্যেরা রাজনীতির পুট ব্যবহার করিয়াছে। এই কারণে ভারতে ধর্ম্মই সকল ভাব ও সকল আদর্শ ও সকল রসকে আত্মস্থ করিয়া বসিয়াছে, আর য়ুরোপে কার্য্যত পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ সর্ব্বদাই ধর্ম্মেরও উপরে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

বর্ণাশ্রমবিভাগনিবন্ধন হিন্দুর স্বরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বাধীনতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া কখনো কোনো গুরুতর বিপ্লব উৎপাদন করিতে পারে নাই। বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন আমাদের মধ্যে যখন যাহা হইয়াছে, তৎসমুদায়ই প্রায় ধর্ম্মমূলক। বর্ণাশ্রমকে বর্জ্জন করিতে যাইয়াও, বিভিন্ন বৈষ্ণবমতাবলম্বিগণ কখনো ব্যক্তিগত স্বত্বস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মুসলমান আসিয়া যখন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনো এই বর্ণাশ্রমনিবন্ধনই, নূতন রাজশক্তি ও রাজনীতি বিধর্ম্মী ও ম্লেচ্ছাচারী হইয়াও, হিন্দুর চিরাগত ভাব ও আদর্শকে অভিভূত করিতে পারে নাই। রাজা রাজস্ব আদায় করিতেন, রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষা করিতেন, কিন্তু সমাজ নিঃশব্দে আপনার নিয়মে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিত, আপনার আদর্শ আপনি অনুসরণ করিয়া চলিত। শাসনের

তরঙ্গ সমাজপ্রাচীরকে কখনো উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই।

মুসলমানসংস্পর্শে নানকপন্থী, কবিরপন্থী প্রভৃতি যে সকল বর্ণাশ্রমবিরোধী ধর্ম্ম-সংস্কারের অভ্যুদয় হয়, তাহাতেও হিন্দুসমাজের প্রাচীন আদর্শ ও প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। বিশাল সাগরবক্ষে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া-উঠিয়া ইঁহারা সকলেই আবার সেই সাগরগর্ভেই বিলীন হইয়া যান।

ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই সকল পন্থাতেও কখনো সম্যক্‌রূপে সংসার ও পরমার্থের প্রাচীন বিরোধ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সকল ভক্তিপন্থা সগুণবাদী হইলেও একেবারে নির্গুণের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। শাস্ত্রে ও তত্ত্ববিচারে যাহাই থাকুক না কেন, কার্য্যত ও ব্যবহারে এই সকল নূতন পন্থাতেও সন্ন্যাসেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে সংসারধর্ম্ম মলিন হইয়া গেলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তিপন্থা সংসারবিরোধী নহে, সত্য। হিন্দুর ভক্তিপন্থাতে সংসারে কেবল ধর্ম্মকে নহে, কিন্তু ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সকল রসের মধ্যে নিখিল-রসামৃতমূর্ত্তিরূপে ভগবান্‌কে সম্ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া ভক্তিপন্থী হিন্দু সংসারের সকল সম্বন্ধকে উন্নত, পবিত্রীকৃত ও আধ্যাত্মিক-সম্পৎসৌন্দর্য্য-পূর্ণ করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, এমন চেষ্টা জগতের আর কোনো ধর্ম্মে হয় নাই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই চারি রসের মধ্যে ভগবান্‌কে সম্ভোগ ও তাঁহার সেবা করিতে যাইয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সর্ব্বপ্রকারের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধকে ভগবদ্ভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এ আদর্শ, এ সাধনা, জগতের আর কোনো সম্প্রদায়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। আদিতে এ সকল অবতারের সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু ক্রমে দৈনন্দিন জীবনেই সেই অবতারলীলা প্রত্যক্ষ ও অভিনয় করিবার আদর্শ প্রকাশিত হইয়া দাস্য, সখ্য প্রভৃতি সাধনের প্রাচীন অতিপ্রাকৃতত্ব বহুলপরিমাণে বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধসকলের মধ্যে ভগবৎপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। এ সকলই সত্য, আর এইজন্য ভক্তিবাদী-দিগের মধ্যে সংসার এই সন্ন্যাসপ্রধান দেশেও এক অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা সংসারকে মায়ার খেলা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ভাগবতী লীলার রূপেই সংসারের ভজনা করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টির প্রাচীন আদর্শ ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া জীবমাত্রকেই নরনারায়ণের বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নরসেবাকেই ভগবৎসেবা, মানবপ্রেমকেই ভগবৎপ্রেমের প্রতিরূপ-রূপে সাধনা করিয়াছিল।

কিন্তু এ আদর্শও পরিবারের ও সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কদাপি কোনোপ্রকারের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। পাইলে আমাদের মধ্যেও পেট্রিয়-টিজ্‌ম্ ফুটিয়া উঠিতে পারিত, এবং তখন

হিন্দু পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ বা স্বদেশচর্য্যের যে অদ্ভুত ও মনোহর আদর্শ প্রকাশিত করিতে পারিত, গ্রীসে বা রোমে, য়ুরোপে বা মার্কিণে তাহার সন্ধানও এখনো পর্য্যন্ত কেহ প্রাপ্ত হয় নাই।

এ আদর্শ হিন্দুর ভারতে ফুটিয়া উঠে নাই এইজন্য যে, বর্ণবিভাগনিবন্ধন ও আশ্রমধর্ম্মের প্রাবল্যহেতু হিন্দুসমাজে কখনো য়ুরোপীয় সমাজের মত ব্যক্তিগত স্বত্বস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর, প্রয়োজন এবং প্রয়াস হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু অংশাংশী ও অঙ্গাঙ্গী ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ইহার মূল ও ফল উভয়ই। প্রকৃত অংশীকে ছাড়িয়া অংশের প্রতিষ্ঠা নাই, অঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া অঙ্গ কদাপি আপনার সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অংশীর উন্নতিতেই অংশের উন্নতি, অঙ্গীর বিকাশেই অঙ্গের বিকাশ। পরিবারের, গোষ্ঠীর, সবর্ণের উন্নতিতেই এইজন্য সর্ব্বদা তত্তৎপরিবারস্থ বা গোষ্ঠীয় বা তত্তৎবর্ণভুক্ত ব্যক্তির উন্নতি সাধিত হইত; সমাজের মুখ্যদৃষ্টি অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া তাহার পরিবার, তাহার সগোত্র ও সবর্ণের উপরে নিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির বাসনাও এইজন্য তাহার সগোত্র বা সবর্ণের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। মানবের যে মূল প্রকৃতি হইতে য়ুরোপে পেট্রিয়টিজ্‌মের উৎপত্তি হয়, যে স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশচর্য্যার জন্য য়ুরোপ সভ্যসমাজে এতটা প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, আমাদের দেশে, হিন্দুর সমাজে তাহা সগোত্রবাৎসল্যে ও সবর্ণপ্রীতিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আমাদের পরার্থপ্রবৃত্তি যেখানে গোত্রবর্ণ অতিক্রম করিত, সেখানে একেবারে সর্ব্বভূতে গিয়া পড়িয়াছিল,—য়ুরোপ ও মার্কিণের মত স্বজাতি ও স্বদেশকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রীসে সমাজের যে আদর্শ ফুটিয়াছিল, ভারতে তাহা কখনো ফুটিয়া উঠে নাই। প্রাচীনকালে ভারতেও ধর্ম্ম বলিতে সমাজবন্ধন ও সামাজিক জীবনের সনাতন প্রতিষ্ঠাকে নির্দ্দেশ করিত; কিন্তু গ্রীসে ষ্টেট্‌ বলিয়া যে বস্তু গঠিত হইয়াছিল, ভারতের সাধনায় তাহা কখনো গড়িয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতের ধর্ম্ম যেমন সনাতন, গ্রীকের ষ্টেট্‌ সেইরূপ সনাতন বস্তু। ভারত ধর্ম্মের শাসনে, ধর্ম্মের চর্য্যা করিয়া জীবনে সফলতালাভের চেষ্টা করিয়াছে; গ্রীস্‌ ষ্টেটের শাসনে, ষ্টেটের চর্য্যা করিয়া আপনার সমুদায় শক্তিসামর্থ্যের সার্থকতাসম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছে। গ্রীসে ষ্টেট্‌ ধর্ম্মের অন্তর্গত ও ধর্ম্ম ষ্টেটের অন্তর্গত ছিল। এই ষ্টেট্‌ রাজনীতির মূল। ষ্টেটের মধ্যে বিবিধ ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিসকলের পরস্পরের সঙ্গে ও সমষ্টিভাবে ঐ ষ্টেটের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহাই রাজনীতির বিষয়। এই সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া জীবনের সফলতালাভ করিবার চেষ্টা হইতেই গ্রীসে পেট্রিয়টিজ্‌মের জন্ম হয়।

আমাদের দেশে দুএকবার, আধুনিক সময়ে, এই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ স্বল্পবিস্তর জাগ্রত

হইয়াছে। শিখসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়ে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিখেরা প্রথমে ধর্ম্মসম্প্রদায়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, মোগলের উৎপীড়নে ক্রমে এক বিপুলশক্তিশালী নেশন্‌-রূপে গড়িয়া উঠেন। গ্রীকদের যাহা ষ্টেট্‌ ছিল, শিখদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে তাহাই খাল্‌সার আকার ধারণ করে। খাল্‌-সার প্রতি ভক্তি, খাল্‌সার প্রতি বিশ্বাস, খাল্‌সার সেবা, খাল্‌সার জন্য জীবনোৎসর্গ,—এই সকল শিখধর্ম্মের ও শিখ জাতীয়জীবনের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। এই আদর্শের প্রভাবে এক অদ্ভুত-আকারের পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ শিখ-সম্প্রদায়মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মোগলা-ধিকারে গুরুগোবিন্দের জীবনে ও চরিত্রে, পরে ব্রিটিশের অভ্যুত্থানকালে আল্‌বানে, গুজরাটে, চিল্লিনওয়ালায়, এই আদর্শেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু এই শিখ-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সমগ্র দেশ ও দেশ-বাসী সকল জাতি,—সকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই।

মারাঠা-আদর্শ শিখ-আদর্শ অপেক্ষা কথঞ্চিৎ উদারতর ছিল। সমগ্র ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা মারাঠা-নেতৃবর্গের, বিশেষত মারাঠারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজি-মহারাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর রীতিনীতি, হিন্দুজাতির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা এ আদর্শের অস্থিমজ্জাগত ছিল। কিন্তু এখানেও ক্রমে কার্য্যত এই আদর্শ হিন্দুসমাজের অংশবিশেষেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

কি শিখ, কি মারাঠা, কেহই সমগ্র ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে ও বিশাল ও বিভিন্নশাখ ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বজাতীয় বলিয়া বরণ করিয়া, তাহাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন নাই।

শিখ ও মারাঠার অভ্যুদয়ের ইতিহাসের বহির্ভূতে, আমাদিগের মধ্যে ইদানীন্তন যুগে আর কুত্রাপি রাজনীতিক্ষেত্রে কোনো-প্রকারে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় নাই। এইজন্য পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই।

কেবল তাহাই নহে, এখনো অনেকেই আমাদিগকে রাজনীতি বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ সামাজিক জীবনের উন্নতিবিধান করিয়া, জাতীয়জীবনের সফলতা অন্বেষণ করিতে উপদেশ দেন। মুসলমানরাজত্বে হিন্দু-সমাজ যেমন আত্মস্থ হইয়া আপনি আপ-নার সফলতা অন্বেষণ করিতেছিল, এখনো আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। ইংরেজ-রাজত্বেও আমাদিগকে রাজনীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া, রাজার কার্য্যাকার্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ইঁহারা আমা-দিগকে কেবল সামাজিক জীবনের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও সার্থকতার পন্থা অন্বেষণ করিতে বলেন। এ সকল উপদেষ্টা কিন্তু ইংরেজের শক্তি ও প্রভাব কি পরিমাণে যে আমাদিগকে আবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা একবারও তলাইয়া দেখেন না। মুসলমান কর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, ইংরেজ তো সেরূপ থাকে না। মুসলমান কখন-কখন আমাদিগকে জোর করিয়া কল্‌মা পড়াইত সত্য, ইংরেজ সেরূপ করে না, কিন্তু

মুসলমান তাহার শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা আমাদিগের চিত্তকে একেবারে অভিভূত করিবার চেষ্টাও করে নাই;—ইংরেজ এই দেড়শত বৎসরকাল ক্রমাগতই সেই চেষ্টা করিতেছে। মুসলমান আমাদের রাজা ছিল, গুরু হইবার এমন আকাঙ্ক্ষা রাখে নাই। ইংরেজ রাজা তো আছেই, তার উপরে গুরু হইবার জন্তও লালায়িত। মুসলমানরাজত্বে, মুসলমানের প্রভাবে হিন্দুর সমাজমধ্যে যে বিপ্লব হয় নাই, ইংরেজের রাজত্বে, ইংরেজের প্রভাবে তাহা হইয়াছে ও হইতেছে।

কেবল ইংরেজের শিক্ষায় যে এ সকল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে। ইংরেজের শিক্ষা যাহারা পায় নাই, তাহারাও ইংরেজের প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের আইন-আদালত আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের উপরে এমন আঘাত করিয়াছে যে, তাহা আর রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। ইংরেজের ব্যবসাবাণিজ্য, ইংরেজের আমদানী-রপ্তানী, ইংরেজের শাসন-সংরক্ষণ, সকলই আমাদের চিন্তাকে, আমাদের ভাবকে, আমাদের আদর্শকে, আমাদের সামাজিক গঠনকে প্রতিদিন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে। এ অবস্থায় ইংরেজের কার্য্যাকার্য্যের প্রতি উদাসীন হইয়া সামাজিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করা তো দূরের কথা, জীবনরক্ষা করা যায় কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়।

ইংরেজের প্রভাব উপেক্ষা করা যদি অসাধ্য হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্ত তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। ইংরেজ রাজা, আমরা প্রজা। তাহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রাজাপ্রজার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ হইতে যে সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার উপরে আমাদিগের বিবিধপ্রকারের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিতেছে। এই সম্বন্ধকে অগ্রাহ্য করিয়া, এ সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হইয়া চলা সম্ভব নহে; সম্ভব হইলেও মঙ্গলকর হইবে না।

রাজার সঙ্গে প্রজার যে সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই রাজনীতি রচিত হয়। এই রাজনীতিকে বর্জ্জন করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপরও নহে, কল্যাণকরও নহে। এই রাজনীতির আলোচনা, এই রাজনীতির আন্দোলন, এই রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। এই চেষ্টার সফলতার উপরেই আমাদিগের ভবিষ্য কল্যাণ ও স্থিতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

য়ুরোপে রাজনীতিক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজ্‌মের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের মধ্যেও এই ইংরেজরাজনীতিক্ষেত্রেই এই নূতন স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্‌মের অভ্যুদয় হইয়াছে।

শ্রী:—

রাজপ্রসাদ।

১

ছোটলাটসাহেবের পাদরজঃস্পর্শে মুঙ্গের-নগরী আজ স্বামিসমাগমোৎফুল্লা সুন্দরী যুবতীর ন্যায় বিচিত্র বসন ও বিচিত্র ভূষণে নয়নাভিরাম আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রাজপথের নিত্যপ্রকটিত প্রস্তর-কঙ্কালি আজ মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের প্রভূত পরিশ্রমে ক্ষণকালের জন্য সদ্যোনিক্ষিপ্ত মৃত্তিকারাশি এবং তদুপরি বিকীর্ণ লোহিত কঙ্করচূর্ণের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। শিরঃস্পর্শী উদ্ধত ধূলিজাল সলিলনিষেকে আজিকার মত কিছু শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে।

বিচিত্র-পত্ররাজি-বিমণ্ডিত বংশদণ্ড-শিরে ব্রিটনের বিজয়পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইয়া নগরবাসীর প্রবল রাজ-ভক্তির নিদর্শন সুদূরে ঘোষণা করিতেছে!

ভাগীরথীতীরে মণ্ডপতলে দরবার। রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুরের বিচিত্র ভূষণচ্ছটায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কালেক্টরসাহেব ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া সকলকে যথাযোগ্য আসন দেখাইয়া দিতেছেন।

এই বিচিত্র দরবারে বাবু ভভিখন সিং বা বিভীষণ সিং এক বন্ধুর হস্ত ধরিয়া এক-পার্শ্বে চোরের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। বন্ধুর পুনঃপুন অনুরোধসত্ত্বেও স্থানগ্রহণ করিতে সাহস করিতেছিলেন না। বাবুসাহেব নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন; তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় দেড়লক্ষ টাকা এবং তাঁহার বিক্রমও আপন জমিদারীমধ্যে প্রায় শার্দ্দূলপ্রতিম। কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাবুজির অর্থের প্রতি কিছু অতিরিক্ত অনুরাগ থাকায় তিনি আজিও কালেক্টরসাহেবের সঙ্গে আলাপপরিচয় করিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহাকে কেহ চিনিত না।

দরবারদর্শন তাঁহার ভাগ্যে এই প্রথম। আজিও তাঁহার আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কেবল—বন্ধুর অনুরোধ ও ইজ্জতের প্রলোভন এড়াইতে না পারিয়া আজ তাঁহার এই বিপদ্!

লাটসাহেব ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া শালুমণ্ডিত ঘাটের সোপান অতিক্রম করিতেছিলেন। কালেক্টরসাহেব তাঁহার সম্মুখান হওয়ার পূর্ব্বে হাঁকিলেন, "সকলে আপন আপন স্থানে বসিয়া পড়।" বিপন্ন ভভিখন সিং ইতস্তত চাহিতেছিলেন, বন্ধু তাঁহাকে জোর করিয়া একখানা খালি চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে কালেক্টরসাহেব বাবুজির সম্মুখে আসিয়া তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলেন, সিংজী থতমত খাইয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া আভূমি প্রণত হইয়া কালেক্টারসাহেবকে সেলাম করিলেন। কালেক্টরসাহেব আর একবার তাঁহার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কম্পমান ভভিখন

সিং ঘর্ম্মসিক্তদেহে অপরাধীর মত আসনে বসিয়া পড়িলেন।

তার পর চিরপ্রথাক্রমে অভিনন্দনপত্র-পাঠ এবং তাহার উত্তরপ্রদান হইয়া গেলে—লাটসাহেবের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় আরম্ভ হইল। কালেক্টরসাহেব তাঁহার পছন্দসই লোকদের বাছিয়া-বাছিয়া লাটসাহেবের নিকট পরিচিত করিলেন। লাটসাহেব স্মিতমুখে একএকবার ইঁহাদের করস্পর্শ করায় প্রত্যেকে অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সকলই সফল হইল জ্ঞান করিলেন। এই ভাগ্যবানেরা লাটসাহেবের করস্পর্শ-গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া কিছু ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত জনসাধারণের দিকে কটাক্ষ করিতে করিতে নিজ নিজ আসনে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার মধ্যে একজনের গর্ব্বোদ্ধত দৃষ্টি বাবু ভভিখন সিংহের বক্ষে শেলের ন্যায় আঘাত করিল। সেই ব্যক্তি জাতি ও মর্য্যাদায় নিতান্ত হেয় হইলেও বাবু ভভিখন সিংকে আপনার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সিংজি অবশ্য অবজ্ঞা-ভরে তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া-ছিলেন এবং তাহার এই বেয়াদবির জন্য অপমানেরও কিছু বাকী রাখেন নাই। আজ সে বুক ফুলাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিল—রাজদরবারে তাহার আসন ভভিখন সিংহের কত উচ্চে!

সেই দিন বিদীর্য্যমাণবক্ষে বাবু ভভিখন সিং স্বীকার করিলেন, রাজদরবারে সম্মান না পাইলে ধনজন সকলই বৃথা! বন্ধুবরও একবাক্যে এই কথার সমর্থন করিলেন।

২

আজ সপ্তাহকাল হইতে ভভিখন সিংহের বহির্ব্বাটী গ্রহাচার্য্য এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত-কুলের কোলাহলে অহর্নিশ মুখরিত হইয়া আছে। কোন্ সময়ে কোন্ লগ্নে কি উপহার লইয়া বাবুসাহেবের কালেক্টর-বাহাদুরের শ্রীচরণদর্শনে বহির্গত হওয়া কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে কিছুকাল ধরিয়া পরামর্শ চলিল। অনেকপ্রকার শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় মতরাশি বহুরূপ যুক্তি এবং প্রমাণ-প্রয়োগসহকারে নানা বিচিত্র রাগিণীতে সপ্তাহকাল ধরিয়া অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাজেই একদিন সন্ধ্যাকালে হতাশামগ্ন বাবুসাহেব পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনারা কি স্থির করিলেন?" প্রশ্ন উচ্চারিত হইবামাত্র ক্ষুব্ধজলধি যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কারণ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই এতদিন পরস্পরের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, কেহই নিজে কোন-প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

পণ্ডিতগণকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া অগত্যা বাবুসাহেব আপনার অভিমত তাঁহাদের গোচরে আনিলেন। তখন ব্রাহ্মণমহাশয়েরা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বাবুসাহেবের অসাধারণ ধীশক্তি এবং অলোকসামান্য দূরদর্শিতার "তারিফ" করিতে করিতে নীরব সভাতলকে পুনরায় উচ্চকিত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের "সুখনিশি পোহাইল"। সেইদিন রাত্রে "দহি-চুড়া"র

ধ্বংসসাধন এবং যৎকিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সকলকে বাবুসাহেবের গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল।

তখন আয়োজনের ধুম পড়িয়া গেল।

বাবুজির খাস্-ফরমায়েস-মত প্রস্তুত দুই-ঝুড়ি "পুয়া", তদীয় বাগানের বৃহত্তম কদলী-দণ্ড একটি, দুইটি আয়ুহীন ছাগবৎস, ঘৃত একহাঁড়ি এবং কিছু "মেওয়া" লইয়া বাবুসাহেব উষাকালে যাত্রার্থ প্রস্তুত হইলেন।

পুরোহিত আসিয়া কপালে দধির তিলক, হস্তে হরিদ্রাবর্ণ মাঙ্গলিকসূত্র এবং কর্ণপ্রান্তে সংজাজাত যবাঙ্কুর প্রদান করিলেন। পুরমহিলাগণ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুইজন ভাট সমুচ্চ কোলাহলে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল—বাবুসাহেবের সিপাহীদ্বয় সমস্তরাত্রির শ্রমসজ্জিত সূক্ষ্মাগ্র গুম্ফ এবং কর্ণাবলম্বী শ্মশ্রুযুগ ধারণ করিয়া তাঁহার মূর্ত্তিমান্ বিক্রমের রূপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল এবং কাঁসি বাজিয়া উঠিয়া নিদ্রাতুর পল্লীকে জাগরিত করিয়া দিল। নরনারীর জনতায় রাজপথ দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিল। রঘুনাথজি স্মরণ করিয়া বাবুসাহেব শিবিকারোহণ করিলেন।

সেদিন বড়দিনের পূর্ব্বাহ্ণ। কালেক্টর-দম্পতি স্থানীয় সাহেববৃন্দকে ভোজ দিবার একটা মত্‌লব প্রাতঃকাল হইতে আঁটিতেছিলেন,—সুতরাং সেদিন হাতে অন্য কোন কাজ ছিল না। সাহেব কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে বলিয়া যাইতেছিলেন এবং মেমসাহেব সহাস্যমুখে লিখিয়া লইতেছিলেন।—সেই সময়ে স-ভেট এবং স-সিপা বাবু ভভিখন সিং কালেক্টরবাহাদুরের ঘা দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিকট হইবামাত্র বাবুসাহেবের বক্ষস্পন্দন যেন নীর হইয়া গেল—তদীয় সিপাহীদ্বয় তাঁহার বিক্রমের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, উপহারবাহকগণ প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় আপনাপন স্থানে অচল হইয়া রহিল। বাবুসাহেব গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে করজোড় করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন অর্দ্ধঘণ্টাকাল এতদবস্থায় থাকার পর সাহেবের জনৈক চাপরাসীকে ফাটকের দিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নির্ব্বাপিতপ্রায় উৎসাহবহ্নি ধূমায়িত হইতে লাগিল। চাপরাসী নিকটস্থ হইলে বাবুসাহেব কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে বলিলেন, "একবার হুজুরকে সংবাদ দিন যে, তাঁবেদার হাজির।" চাপরাসী গম্ভীরমুখে কহিল, "আভি হুকুম নহি";—বলিয়াই সে প্রস্থানোদ্যত হইল। ভভিখন সিং ব্যাকুল হইয়া তাহার করদ্বয় ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "হুজুর মনে করিলে সবই করিতে পারেন—অনেকদূর হইতে বড় আশা করিয়া আসিয়াছি।" চাপরাসীপ্রভুর মর্য্যাদাবুদ্ধি বড় প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "কেয়া, আপ্‌কো ওয়াস্তে মেরা ইজ্জৎ খোয়ায়েঙ্গে?" কিন্তু বাবুজীর যাত্রা ছিল ভাল। মেমসাহেব দূর হইতে এই রঙ্গ দেখিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। শেষে দয়ার্দ্র হইয়া সাহেবকে বলিলেন, "আহা, লোকটা অনেকক্ষণ ধরিয়া কষ্ট পাইতেছে, উহাকে আসিতে দাও না।"

তখন চাপরাসীকে লক্ষ্য করিয়া সাহেব

লেন, "হিউ চাপরাসী, বাবুকো আনে ও।"

চাপরাসীনন্দনের গভীর মর্য্যাদাবুদ্ধি া তিরোহিত হইল। সে বাবুসাহেবের ক চাহিয়া সাগ্রহে বলিল, "আইয়ে হুজুর, ইয়ে!"

কৃতজ্ঞতাবিহ্বল বাবুজি সাহেবের সম্মু হইয়া একেবারে তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া লেন। সাহেব এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভক্তি-তে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "বৈঠিয়ে বাবু-, বৈঠিয়ে।" মেমসাহেব বাবুসাহেবের , তথা আপ্যায়নপ্রণালী দর্শনে হাস্যদমন ম্ভব বুঝিয়া মুখবিবরে রুমাল পুরিয়া ইতি-র্ব্বই কক্ষান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

সাহেবের আদেশে কথঞ্চিৎ আপনাকে ত করিয়া বাবুসাহেব জানুর উপর ভর া খঞ্জভাব অবলম্বন করিলেন এবং হারবাহকদিগকে ইঙ্গিতে নিকটে আসিতে য়া একে একে উপহারসামগ্রী সাহেবের চরণে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিলেন। হারের প্রকৃতি দেখিয়া কালেক্টর বহুকষ্টে স্যস্রোত সংযত করিবার অভিপ্রায়ে লেন, "ইয়ে সব্ কিস্ ওয়াস্তে?" বুসাহেব আরম্ভ করিলেন, "হুজুর, বেদার—" কিন্তু বক্তব্য শেষ করিতে রিলেন না, উচ্ছ্বসিত ভক্তিস্রোত হার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। তখন তিনি শ্চ কালেক্টরসাহেবের পাদস্পর্শ করিবার ভিপ্রায়ে বাহুপ্রসারণ করিলেন।

বাহুবেষ্টনভীত কালেক্টরসাহেব তাড়াতাড়ি য়া উঠিলেন, "বহুৎ আচ্ছা বাবুসা'ব, হাম্ হুৎ খুস্ হুয়া। আপ কুরসিপর বৈঠিয়ে।"

বাবুসাহেব নিবেদন সমাপ্ত করিয়া এক-পদে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন—কিছুতেই কালেক্টরসাহেবের সম্মুখে আসন-গ্রহণ করিলেন না।

ক্রমে সাহেবের সঙ্গে বাবুসাহেবের পরিচয় হইল। বাবুসাহেবের আয়ের কথা শুনিয়া কালেক্টরসাহেব মনে মনে বলিলেন—"Oh the devil! you avoided subscribing to the waterworks Fund! You shall be thoroughly fleeced."

কালেক্টরসাহেব স্মিতমুখে করমর্দ্দন করিয়া বাবুসাহেবকে বিদায় দিলেন।

বাবুসাহেব সেদিন আনন্দের তাড়নায় ভিক্ষুকদিগের মধ্যে একটাকার "আধেলা"ই বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাহারা তাঁহার নিকট গালি এবং প্রহার ভিন্ন আর কিছুই পায় নাই।

সাহেব সেদিন রাত্রিকালে বাবুসাহেবের ভঙ্গীর অনুকরণ এবং তাঁহার প্রদত্ত "পুয়া" বিতরণ করিয়া নিমন্ত্রিত রমণীবৃন্দের কলকণ্ঠে বহুবার উচ্চহাস্য উদ্রিক্ত করিয়া-ছিলেন—এ কথা বলাই বাহুল্য।

৩

বাবু ভভিখন সিংহের জীবনে আজ এক স্মরণীয় দিন। তাঁহার প্রভূত পরিশ্রম, অমানুষিক তোষামোদ এবং অজস্র অর্থব্যয় আজ সফল হইয়াছে। বাবুজি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার আনন্দ আজ ধরিতেছে না। সদরে গিয়া এই সংবাদপ্রাপ্তিকালে তিনি উল্লাসে ম্যাজি-ষ্ট্রেটের হেড্‌ক্লার্কবাবুর পাদুকাযুগলই মস্তকে

ধারণ করিয়াছিলেন—এম্‌নি তাঁহার উল্লাস।

আজ তাহারই উৎসব। স্বয়ং কালেক্টর-সাহেব আজিকার উৎসবে যোগদান করিবেন—বাবুজির গৃহপ্রাঙ্গণ পবিত্র হইবে।

কালেক্টরসাহেবের আজ আসিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না—তাঁহার উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। জলের কলের জন্য বিশহাজার টাকা এবং মেম-সাহেবের জন্য একটা ব্রেস্‌লেট্‌ ইতিপূর্ব্বেই বাবুসাহেব রাজভক্তির প্রবল প্লাবনে সাহেবের চরণপদ্মে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

আজ তাঁহার আগমনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার জমিদারীর মধ্যে কতকগুলি দোকানদার স্বদেশী দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল। বাবুসাহেব ইতিপূর্ব্বে তাহাদের ডাকাইয়া যথেষ্ট তাড়না করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাগ পড়ে নাই। "সরকারবাহাদুরকে সাথ্‌ লড়াই? শালে লোককো এৎনা হিম্মৎ!" কাজেই বাবু-সাহেব মাজিষ্টরবাহাদুরকে খবর দিয়াছিলেন। মাজিষ্টরসাহেবের আজিকার আগমনের উদ্দেশ্য এই মানবমৃগয়া। তাই আজ তাঁহার আগমনবার্ত্তা কোথাও প্রচারিত হয় নাই—নীরবে সমস্ত আয়োজন চলিতেছিল।

যথাসময়ে মাজিষ্টরবাহাদুর বাবুসাহেবকে কৃতার্থ করিয়া সস্ত্রীক মৌলানগরে পদার্পণ করিলেন। বাবুসাহেব প্রত্যুষ হইতে উপ-বাস করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে সম্মানিত অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার আশালতা ফলপ্রসব করিল।

বাবু ভভিখন সিং ক্রমশ "বিজ্ঞতম" হইয়াছিলেন। সাহেবের আহারাদির জন্য "পুয়ার" উপর নির্ভর না করিয়া এবার কেল্‌নার কোম্পানির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কাজেই আহারাদির এবার কোনই অসুবিধা হইল না। বরং ভোজন এবং ভোজন অপেক্ষাও পানটা কিছু গুরুতর গোছের হইয়া পড়িল।

কাজেই স্বদেশীদমনের জন্য বাহির হইতে সাহেবের তেমন মন সরিতেছিল না। নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তেই সাহেব সস্ত্রীক জুড়ী হাঁকাইয়া রাজপথে বাহির হইলেন। বাবু সাহেব কিছুতেই গাড়ির মধ্যে উঠিলেন না, কোচ্‌মানের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। মেম সাহেব বাবুর অবস্থা দেখিয়া রুমালের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

ক্রমে জুড়ী অপরাধিগণের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবুজি লম্ফ দিয়া পড়িয়া অপরাধী দোকানদারগণকে সনাক্ত করিয়া দিলেন। সাহেব তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা বিদেশী মাল পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী মাল আনাইয়াছ কেন?" তাহারা জিব্‌ কাটিয়া বলিল, "খোদাবন্দ, এৎনা হিম্মৎ কিস্‌কো?"

সাহেব বাবুসাহেবের দিকে চাহিলেন ভভিখন সিং হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "শালে ঝুঠ্‌ কহতে হো? আভি দোকান্‌সে দেশী মাল নিক্‌লে তব্‌?"

পুলিস পূর্ব্ব হইতেই "মোতায়েন" ছিল তৎক্ষণাৎ দোকানের খানাতল্লাসি সুরু করিয়া দিল। সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ হইলেও একখণ্ড দেশীবস্ত্র বাহির হইল না।

সাহেব ক্রুদ্ধভাবে সিংজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেফায়দে তক্‌লিফ্‌ দিয়া।"

বাবুসাহেব লজ্জায় মরিয়া-গিয়া বলিলেন, "কোন দুষমন্‌ ইহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবে।"

সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জোরে জুড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। বাবু ভভিখন উঠিবার অভিপ্রায়ে দুইএক কদম ছুটিয়া হতাশ হইয়া গতি সংযত করিলেন এবং সেই মধ্যাহ্নরৌদ্রে অন্নহীন উদরে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে অতিকষ্টে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন।

গাড়ি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মেমসাহেব বলিলেন—"By what name should these men be called, who are traitors to their own country?"

সাহেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "Scoundrels!"

৪

বাবুসাহেবের অদৃষ্ট বড় মন্দ। "রায় বাহাদুরী" হস্তগত হইবার ঠিক সময়ে সময়ে কালেক্টরবাহাদুর তাঁহার উপর এমন চটিয়া গেলেন! "জয় রামচন্দ্র জি!" সেই স্বদেশীদমনের ঘটনা হইতেই কালেক্টরসাহেব কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার যেদিন তিনি শিকারে আসিবেন বলিয়া সংবাদ দিলেন, সেইদিন বিধাতার লীলায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের পুরাতন পীড়া প্রাণসংশয়কর হইয়া উঠিল।

কাজেই রাজভক্তি এবং পুত্রস্নেহের মধ্যে একটা দারুণ বিরোধ বাধিয়া গেল। পুত্রকে একটু ভাল দেখিয়াই যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির করিতে করিতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে কোনপ্রকার আয়োজনের ব্যবস্থা না দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মুঙ্গের ফিরিয়া গেলেন! পরদিনই বাবুসাহেব আপনার দেওয়ানজির মারফত তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ এবং এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কালেক্টরসাহেবের পাদুকা মস্তকে বহন করিবার লালসা বিজ্ঞাপিত করিয়া এক দীর্ঘপত্র হুজুরসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেব তাঁহার পত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই। তৎপরে বাবুসাহেব স্বয়ং মুঙ্গের গিয়া সাহেবের চাপরাসী, খানসামা, বাবুর্চ্চি—প্রত্যেকের পায়ে ধরিয়া, তাহাদের মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া এবং ইনামের লোভ দেখাইয়া প্রনষ্ট অনুগ্রহ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফল হয় নাই। তাই বাবুজি কম্পমানদেহে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্রোধনিক্ষিপ্ত শক্তিশেলের প্রতীক্ষায় সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কপিশ চক্ষু এবং আরক্তিম গুম্ফ সর্ব্বত্র তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

তাই আজ সহসা লক্ষ্মীসরাই-শিবির হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া বাবুসাহেব আত্মহারা হইলেন। এই আশাতীত অভাবনীয় অনুগ্রহ তাঁহার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া দিল।

প্রিয়সমাগমপ্রয়াসিনী রমণীর ন্যায় তখনই সজ্জারচনার ধুম পড়িয়া গেল। ক্ষৌরকার আসিয়া দুইঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তাঁহার মস্তক এবং গুম্ফের সংস্কারসাধন করিয়া

দিল। কেয়ারি-করা গাছের মত কর্ত্তিত শুন্ফের অপরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া বাবু-সাহেব স্বয়ংই মোহিত হইয়া দন্তবিকাশ করিলেন।

চক্ষে সুর্ম্মা লেপিত হইল, পীতবর্ণ উষ্ণীষ মস্তকের অর্দ্ধপক্ক কেশজাল আবৃত করিয়া দিল, স্বর্ণবলয় করযুগলের শোভা বিস্তার করিল, চরণদ্বয় জরিমণ্ডিত পাদুকার মধ্যে অদৃশ্য হইল, কপালে দধি এবং হরিদ্রার তিলক শুভযাত্রা সূচিত করিল।

পুত্র এখনো সেই দীর্ঘ রোগশয্যায় মুমূর্ষু জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতেছিল। বাবুসাহেব তাহার পরিচর্য্যাসম্বন্ধে কিছু কিছু সারবান্ উপদেশ দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে ক্ষীণকণ্ঠে পুত্র ডাকিল, "বাবুজি!" যাত্রাভঙ্গ-আশঙ্কায় উত্তেজিত বাবুসাহেব অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্র বলিল, "আজ মৎ যাইয়ে বাবুজি, হাম্ মর্ যাঙ্গে।" একবার এই পুত্রের জন্ম কালেক্টরসাহেবকে হারাইতে বসিয়াছিলেন। অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাবু ভভিখন সিং বলিলেন, "জাহান্নমে যাও—"। (অস্পষ্টোচ্চারিত সম্বোধন ভাষায় প্রকাশযোগ্য নহে।)

বলিয়াই বীরদর্পে বাবুসাহেব কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মুমূর্ষু পুত্রের শীর্ণ কপোল বাহিয়া একবিন্দু অশ্রু উপাধানের উপর গড়াইয়া পড়িল। চরণপ্রান্তে উপবিষ্টা সেবানিরতা স্নেহময়ী জননীর চক্ষুতেও অশ্রুর উৎস খুলিয়া গেল।

বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে বাবু ভভিখন সিং শিবিকাবাহকদিগকে ১মাইল দূরে রাখিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক পদব্রজে মাজিষ্ট্রেসাহেবের শিবিরপ্রান্তে উপনীত হইলেন। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক—বিশাল দেহভার বহন করিয়া চরণদ্বয় ব্যথিত হইয়াছিল—মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস গভীর ক্লান্তি সূচনা করিতেছিল।

শিবিরের দ্বারদেশে আসিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কিরূপে কালেক্টর-সাহেবের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিবেন, মনে মনে একবার ভাঁজিয়া লইলেন। ক্ষণকাল পরে চাপরাসী আসিয়া নিঃশব্দে বাবু-সাহেবকে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। ভভিখন সিং প্রবেশ করিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের চরণযুগল জড়াইয়া-ধরিয়া অশ্রুজলে মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়া লইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেববাহাদুরকে অন্য একজন অপরিচিত সাহেবের সঙ্গে রহস্যালাপে নিমগ্ন দেখিয়া এক পদে কর জোড়ে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন মাজিষ্টরসাহেব তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয় ছিলেন, ভভিখন সিং প্রবেশ করিলে একবার মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না। সাহেবের গ[illegible] আর শেষ হয় না। শিবিরে আর দ্বিতী[illegible] আসনও নাই, কাজেই পরিক্লান্ত বাবু সাহেবকে সেই অবস্থায় থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণ সহ্য করিতে হইতেছিল। দুইঘণ্টাকা[illegible] এইরূপ অবস্থায় থাকার পর অপরিচি[illegible] সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভভিখন সি[illegible] এইবার সাধ মিটাইয়া পদযুগল ধরিবা বাসনাকে চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাই[illegible] আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সহসা সাহেবে[illegible]

ভ্রুকুটিকুটিল রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। সাহেব পরুষকণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "কেয়া বাবুসা'ব, আপ্ এয়সা বড়া আদ্‌মি হো গয়ে, কি কালেক্টরসাহেবকে হুকুম তামিল কর্‌নেমে আপ্‌কো লেহাজ্ মালুম হোতা ?"

ভীত, চকিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভভিখন সিং সাষ্টাঙ্গে কালেক্টরের চরণতলে পতিত হইলেন, তাঁহার মুখ দিয়া "হুজুর, তাঁবেদার —" ব্যতীত আর কোন বাক্য নির্গত হইল না। বলপূর্ব্বক পদদ্বয় সরাইয়া লওয়ার অবসরে কালেক্টরসাহেবের লৌহমণ্ডিত বুটাগ্র বাবুসাহেবের ললাট স্পর্শ করিয়া তাহাকে রুধিরাক্ত করিয়া দিল। কালেক্টর-সাহেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "কোন্ হ্যায়, চাপরাসী, শূয়ারকো কান্ পকড়্‌কে নিকাল্ দেও।" বলিয়াই কালেক্টরসাহেব অন্য দ্বার দিয়া শিবিরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চাপরাসী ভভিখন সিংহের অনেক "ইনাম" পরিপাক করিয়াছিল—কর্ণটা আর স্পর্শ করিল না, হাত ধরিয়া তাঁহাকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল।

তখন মর্ম্মাহত ভভিখন সিং উষ্ণীষ খুলিয়া কপালের রুধির এবং নয়নের অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিদীর্য্যমাণহৃদয়ে ধীরে ধীরে শিবিকায় ফিরিয়া আসিলেন। এমন অপমানিত তিনি জীবনে হন নাই।

গৃহের নিকটে আসিবামাত্র ক্রন্দনের রোল তাঁহার শ্রুতি স্পর্শ করিল। সাশ্রুনেত্রে দেওয়ানজি আসিয়া সংবাদ দিলেন, অর্দ্ধঘণ্টা হইল, বাবুয়াজি স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

"হায় রামচন্দ্র !" বলিয়া বাবু ভভিখন সিং ধূলির উপর বসিয়া পড়িলেন। চাকরেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল।

* * * *

তার পর ভভিখন সিং একমাসের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। মধ্যম-পুত্রের হস্তে জমিদারীর ভারার্পণ করার পর তিনি একদিন প্রাতঃকালে সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

এতদিনে বাবু ভভিখন সিং বুঝিলেন যে, কালেক্টরসাহেবের বুটমণ্ডিত শ্রীচরণ অপেক্ষা "ব্রজবিহারী"র সুকোমল আরক্তিম পাদপদ্ম বহুগুণে নিরাপদ্ এবং শান্তিপ্রদ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

অক্ষর।

দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি।

আমাদের অক্ষর কিপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার স্থিরীকরণ জন্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহু চেষ্টা করিয়াছেন এবং কেহ এক মত, কেহ অন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, আমাদের অক্ষর আমাদের দেশেই সমুৎপন্ন; আর কেহ বলেন, উহা ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত। শেষোক্ত

সম্প্রদায়ের মতে ইহা ফিনিশীয় ও আরমীয় ভাষা হইতে সমাগত এবং উক্ত ফিনিশীয় ও আরমীয় অক্ষর মিশরদেশীয় বস্তুচিত্রাক্ষর হইতে সমুদ্ভূত। মানবজাতির একটি স্বভাব এই যে, যাবতীয় বস্তু বা ব্যাপারে এক মূলে লইয়া যাইতে চাহে, বহুত্বের একত্বসাধন করিতে চাহে। এই বৃত্তির বশে য়ুরোপীয় অনেক পণ্ডিত এদেশের প্রচলিত অক্ষর-সকলকে প্রকারান্তরে মিশরদেশীয় বস্তু-চিত্রাক্ষরে লইয়া যাইতে চাহেন। তাঁহাদের মতামতসঙ্কলন এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সকলেই বলে এবং আমরাও স্বীকার করি যে, অক্ষরসৃষ্টি বস্তুচিত্র হইতেই হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল দেশের অক্ষর যে এক বস্তু হইতে কল্পিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বস্তুর চিত্রদ্বারা ভিন্নভিন্নপ্রকার অক্ষরের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব। মূকেরা পুরুষ বলিতে কেহ শ্মশ্রু কেহ বা গুম্ফ দেখাইতে পারে। সকলেই যে এক বস্তুদ্বারা ভাবপ্রকাশ করিবে, তাহার কোন কারণ নাই। দেবনাগরী এবং সাধারণ প্রচলিত বঙ্গাক্ষর, উভয়ই এক-প্রকারবস্তুচিত্রোৎপন্ন, তাহাদের সহিত মিশরাদি দেশের বর্ণমালার কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। মিশরদেশীয় একবিংশতি চিত্রাক্ষরের মধ্যে একটি অক্ষরের সহিতও দেবনাগরী কিংবা বঙ্গাক্ষরের ঐক্য নাই। যদি তদ্দেশীয় অক্ষর হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইত, তবে কোন একটি অক্ষরেরও কিঞ্চিন্মাত্র ঐক্য না থাকার কারণ ছিল না। আমাদের বোধ হয়, মনুষ্যকলেবরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে এ দেশের কতকগুলি অক্ষর কল্পিত হইয়াছে। এই অনুমানের সমর্থন একটি মানবদেহের প্রতিকৃতি নি[illegible] প্রদর্শন করিতেছি। এস্থলে স্মরণ রাখি[illegible] হইবে যে, কোন বস্তুচিত্র হইতে যে অ[illegible] কল্পিত হয়, তাহা সেই বস্তুর অবিকল [illegible] হয় না। কারণ যাহারা লিখিবে, তা[illegible] সকলেই যে চিত্রকর হইবে, এরূপ আশা [illegible] যায় না; আর চিত্রকর হইলেও যদি এ[illegible] অক্ষর লিখিতে কোন একটি বস্তুর অবি[illegible] চিত্র করিতে হয়, তবে এত সময় আব[illegible] হয় যে, সেরূপ করিয়া লেখা কার্য্যত অস[illegible] বস্তুচিত্রাক্ষরে কোন একটি বস্তুর আ[illegible] মাত্র পাওয়া যায়। অতএব নিম্নে যে [illegible] প্রদর্শন করিতেছি, তাহা একটি মনুষ্যদে[illegible] আভাসমাত্র, কেহ যেন ইহাতে এ[illegible] অবিকল মানবদেহের সুঠাম মূর্ত্তি দেখি[illegible] আশা না করেন।
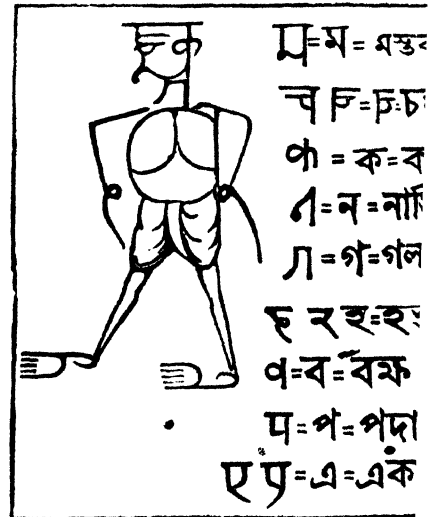
এই চিত্রে চ-অক্ষর কল্পনা ক[illegible] প্রথম ভাবিতে হয়, একটি মনুষ্যকে [illegible] দিক্ হইতে দেখিলে তাহার বা[illegible]

বামার্দ্ধমাত্র দেখা যায়, আর দক্ষিণদিক্ হইতে দেখিলে দক্ষিণচক্ষুর দক্ষিণার্দ্ধ দৃষ্ট হয়। এইজন্য দেবনাগরীতে 'চ'র বক্রাংশ তাহার উর্দ্ধরেখার বামদিকে এবং বাঙ্‌লাতে দক্ষিণদিকে হয়, অর্থাৎ উভয়তই চক্ষু হইতে 'চ' কল্পিত;—কেহ বা বামদিক্, কেহ বা দক্ষিণদিক্ করিয়া লেখে, এইমাত্র প্রভেদ।

(২) ह (হ)-অক্ষরটিও সেইরূপ। ইহার মাত্রা এবং মাত্রার সঙ্গে যোগ করিবার জন্য যে উর্দ্ধরেখাটুকু আছে, তাহা ত্যাগ করিলে (৩) ह থাকে, ইহাই প্রকৃত অক্ষর। তাহাকে বামদিক্ করিয়া লিখিলে (৪) হ এইরূপ হয়, তাহাই বাঙ্‌লা হ। যেমন চক্ষু হইতে চ কেহ দক্ষিণ, কেহ বাম দিক্ হইতে লেখে, সেইপ্রকার হস্ত * হইতে হ, তাহা দেবনাগরীতে দক্ষিণদিকের এবং বাঙ্‌লাতে বামদিকের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করে, মূলত দুইটি অক্ষরই এক।

অন্যান্য অক্ষরও যে বস্তুচিত্রোৎপন্ন, তাহার আভাস তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাহাতে কোন কোন অক্ষরের যে আকৃতি বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

আ।—"আকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময়ং প্রিয়ে।"

বাস্তবিক একপ্রকার সামুদ্রিক শঙ্খ আছে, যাহার আকৃতির সহিত আকারের কতক মিল হয়।

ই।—"ইকারং পরমানন্দসুগন্ধকুসুমচ্ছবিম্।"

এ স্থলে কি কুসুম, তাহা বলা হয় নাই। কিন্তু বোধ হয়, কোন বিশেষ কুসুমের আকৃতি স্মরণ করিয়াই এই বর্ণনা করা হইয়াছে।

উ।—"পীতচম্পকসঙ্কাশম্।"

ঋ।—"রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ঋকারং প্রণমাম্যহম্।"

ক।—"অঙ্কুশাকারা।"

এই বর্ণের আকৃতি ঠিক অঙ্কুশের মত।

ট।—"কোটিবিদ্যুল্লতাকার।"

ঢ।—"ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত এবং রক্তবিদ্যুল্লতাকার।"

উল্লিখিত বর্ণনাদ্বারা অন্তত ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তন্ত্রশাস্ত্রকারগণ এই সকল বর্ণকে বিশেষ বিশেষ বস্তুচিত্রাকৃতি বলিয়া জানিতেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের অক্ষরের সহিত যে বিদেশীয় কোন কোন অক্ষরের ঐক্য দেখা যায়, তাহার কারণ কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, পুরাতন বিদেশীয় অক্ষর যাহা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে মিশরীয় বস্তুচিত্রাক্ষর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহার বয়স খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর। ইহার কোন অক্ষরের সহিত দেবনাগর কিংবা বঙ্গাক্ষরের কিছুমাত্র মিল নাই। † বাহ্লীক বা উত্তর অশোকাক্ষর, কেল্ডিয়ার উত্তর সেমিটিক্ অক্ষর, তুরস্কবংশীয় রাজা কনিষ্কের অক্ষর এবং জেন্দ বা পারসীক অক্ষর, ইহাদের সহিতও উক্ত উভয়প্রকার অক্ষরের কোন একটির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। কেবল ফিনিশীয় এবং

* "দোর্দোচা বাহুজো বাহুঃ পাণির্হস্তে করস্তথা।" ইতি ধনঞ্জয়ঃ।

† 'ভারতী' পত্রিকা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০ দ্রষ্টব্য।

মিশরের আরমীয় অক্ষরের সহিত আমাদের যে দুইচারিটি অক্ষরের কিঞ্চিন্মাত্র ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—

ফিনিশীয় অক্ষরের সহিত উক্ত অক্ষরের চারিপাঁচটির একতা দৃষ্ট হয় কেন?

খৃঃ পূঃ ৯০০ অব্দের নিনেভার ফিনিশীয় অক্ষরমধ্যে ব, ব, গ, দ। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দের ইজ-রেলের ফিনিশীয় অক্ষরমধ্যে ব, গ, দ, ট, ক। খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দের আরমীয় অক্ষরমধ্যে গ, দ, ট, ক। খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দের কার্থেজের ফিনিশীয় অক্ষরমধ্যে ব, গ, দ, ক, র।

এই কয়টি অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিয়াই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ফিনিশীয় ও আরমীয় অক্ষর হইতে দেবনাগর অক্ষরের উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্যের কোন প্রকৃত কারণও থাকিতে পারে, অথবা ইহা নিষ্কারণ আকস্মিক ঘটনাও হইতে পারে। এই প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদর্শিত হইবে যে, দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষর উল্লিখিত খৃঃ পূঃ ৯০০ অব্দাপেক্ষা প্রাচীন; সুতরাং ঐ কয়টি অক্ষরের বাণিজ্যসূত্রে এ দেশ হইতে ফিনিশীয় বর্ণমালায় প্রবেশও অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু এইপ্রকার অনুমান করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্নপ্রকার বস্তুচিত্র হইতে পৃথক্‌ভাবে অক্ষরসকল কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে ঘটনা-ক্রমে দুইচারিটি অক্ষর বিভিন্ন দেশে এক বস্তু হইতে কল্পিত হওয়া অসম্ভব নহে, বরং তাহা সম্ভবই বলা যায়।

ভাষা যেমন সাহিত্যিক এবং কথিত ভেদে দ্বিবিধ, অক্ষরও তেমনি সাহিত্যিক আকার এবং সাধারণ প্রচলিত আকার ভে
দ্বিবিধ। ইহারা উভয়েই বস্তুত এক, কে
আকারে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন! সাহিত্যি
আকার চিরস্থায়ী, তাহার পরিবর্ত্তন হই
পারে না। কারণ পরিবর্ত্তন হইলে পুরা
গ্রন্থসকল কালক্রমে অবোধ্য হইয়া পা
এইজন্য ভাষার নেতাগণ সাহিত্যের ভ
এবং সাহিত্যের অক্ষরকে অতি সাবধ
রক্ষা করেন; কিন্তু চলিত ভাষা ও অক্ষ
আকার ক্রমে মূল হইতে স্খলিত হই
থাকে। প্রথমাবস্থায় সাহিত্যের অক্ষর
সাধারণ অক্ষর একই থাকে এবং কিছু
উভয়েই আপনাপন ভাবে কথি
রূপান্তরিত হইতে থাকে। তৎপরে য
ভাষার নেতাগণ সাহিত্যের অক্ষরকে প
বর্ত্তনের স্রোত হইতে রক্ষা করা বি
প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তখন হই
তাহা স্থিরভাব ধারণ করে, কিন্তু সাধা
অক্ষর পূর্ব্ববৎ পরিবর্ত্তনস্রোতেই ভাস
থাকে, তাহাতেই চলিতাক্ষর সাহিত্যা
হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নাকার হইয়া পড়ে
সাহিত্যিক ভাষার সহিত কথিত ভাষা
ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। সাহিত্যের ভাষা
অক্ষর উভয়ই কিছু পরিবর্ত্তনের স্রো
ভাসিয়া পরে স্থিরভাব ধারণ করে। হয়
পারে, ঐ স্থিরভাবের পূর্ব্বে কোন এক
অক্ষর স্থানভেদে বা সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভি
আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সাহি
তাহার একটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অ
সাহিত্য সেই শব্দ বা অক্ষরটিকে যে সাম্প
দায়িক আকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ত
পেক্ষা অন্য সম্প্রদায়ের প্রচলিত কথিতভা

বং বর্ণমালাতে সেই শব্দ বা অক্ষরটি মূলের ইত অধিক ঐক্য রাখিয়াছিল, এবং কালে গুভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বা হয় নাই; ই সকল শব্দ বা অক্ষরকে সাহিত্যের াষা ও অক্ষর হইতে উৎপন্ন বলা যায় না; ার যে সকল শব্দ বা অক্ষর উক্ত স্থিরভাব র্য্যন্ত সাহিত্যের সহিত এক থাকিয়া পরে রিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই সাহিত্যের ভাষা বা অক্ষর হইতে উৎপন্ন বলা ায়। আমাদের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত বং সাহিত্যের অক্ষর দেবনাগরী, বাঙ্‌লা াষা ও অক্ষর তাহাদের সাধারণ চলিত াকার। এই দুই আকারের মধ্যে একটিকে পূর্ণভাবে অন্যের অগ্রবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু সাধারণতঃ চলিতভাষা এবং চলিত অক্ষর যে সাহিত্যিক ভাষা এবং সাহিত্যিক অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ সাহিত্যিক স্থিরভাবকেই ভাষার পূর্ণাবস্থা বলা যায়, এবং সেই অবস্থায় সাহিত্যিক ভাষা বা অক্ষরের এবং সেই প্রচলিত ভাষা বা অক্ষরের যে ভাব ছিল, আধুনিক চলিত ভাষা এবং অক্ষর তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে।

দেবনাগর এবং বাঙ্‌লার মধ্যে একটিকে পূর্ণভাবে অন্যের অগ্রবর্ত্তী বলা যায় না, সাধারণভাবে বাঙ্‌লাকে দেবনাগরী হইতে উৎপন্ন বলিতে হয়।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

রূপান্তর।

বসন্ত-আবেগ-শ্রান্ত প্রান্তরের ‘পরে
নীরবে নামিল সন্ধ্যা; পুরবীর স্বরে
সকল মুখর ভাষা দিল মৌন করি।
শান্ত বনচ্ছবি; চন্দ্র-কিরণ-পাপড়ি
সহসা খুলিল নভে; স্বপ্নসম সব
ঘেরিয়া ধরিল মোরে নিবিড় নীরব।
জানি না তখন কার প্রেম-আলিঙ্গনে
ছিলাম মগন! তার নয়নের কোণে
আমার সকল ব্যর্থ বিরহের তান
লভিল পুলকভরে চির-অবসান!
প্রভাতে ভাঙিল ঘুম বিহঙ্গের গানে;
মেলিয়া নয়ন মোর হেরি ঊর্দ্ধপানে
নব জাগরণে ভরি’ আকাশের বুক
সেই বাহু সুকোমল সেই হাসিমুখ।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁতের কথা।

বিগত ফাল্গুনমাসের বঙ্গদর্শনে "তাঁতসম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রকাশিত হইয়াছে; উক্ত-প্রবন্ধসম্বন্ধে আমরাও কয়েকটি কথা বলিতে চাই। প্রবন্ধলেখকের মতের কোন কোন স্থলে আমাদের মতের ঐক্য থাকিলেও নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে আমরা তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারিলাম না।

আমরা বলি, "তাঁতেই ভাত নহে, হা-ভাতও নহে।" ইহাতে এমন কিছু নাই যে, হাত দিলেই প্রভূত অর্থোপার্জ্জন হইবে। পক্ষান্তরে, সমুচিত অধ্যবসায় এবং উত্তম ব্যবসায়বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলে ইহাতে মাসিক ২০।২৫টাকা আয় না হইতে পারে, এ কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। তবে অধীর হইলে চলিবে না, এই কার্য্যে রীতিমত শিক্ষা এবং সাধনা চাই। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অশিক্ষিত জোলাতাঁতীর হাতে থাকিলেও বয়নশিল্পটি নিতান্ত খেলার বিষয় নহে; রাত্রিরাত্রি হাত দিলেই ইহাতে ওস্তাদ হওয়া যায় না এবং আমাদের দেশী হ্যাণ্ডলুম্‌কে "কল" বলিলেও ইহা এমন কল নহে যে, স্প্রীং বা কোন চাকা ঘুরাইলেই আপনা হইতেই কল চলিবে,—ইহাতে কারিকরের যথেষ্ট খাটুনি এবং শিল্পচাতুর্য্য আবশ্যক। যুবকেরা যতই কেন পণ্ডিত হউন না, ২।৩মাসমধ্যেই এই শিল্পটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা এবং যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম হইবার আশা করা নিতান্ত ভ্রান্তি এবং অধীরতার পরিচায়ক। আমার জনৈক বন্ধু নিজে কাপড় বুনিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমায় লিখিয়াছেন যে, "৩০।৩৫টাকায় কলের তাঁত পাওয়া যাবে, আর তাতে প্রতিদিন তিন-চারখানা কাপড় হবে শুনে মনে করেছিলেম যে, আপিস থেকে আস্‌ব, দড়ি ধরে' টান্‌ব বা চাকা ঘুরাব, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাপড় হ'য়ে যবে। এখন দেখ্‌ছি, কেবল স্বর্গের স্বপ্ন দেখ্‌লে হয় না, ইহার সিঁড়ি ভাঙাই দুষ্কর।" কাপড়বুনানিসম্বন্ধে বন্ধুর মত অনেকেরই ঐরূপ ধারণা ছিল, এখন কাজে হাত দিয়া অনেকেই কিন্তু চকিত হইতেছেন আমরা বলি, ইহাতে চকিত, ভীত বা পশ্চাৎপদ হইবার কিছু নাই। প্রভূত অর্থব্যয়ে শরীরপাত করিয়া ১০।১২বৎসরের পরিশ্রমের পর দুইএকটি পাস্ করিয়াও অনেকে ১৫।২০টাকা রোজগারের উপায় করিতে পারিতেছেন না; আর তাঁতের বেলায় কি একটি বৎসর বিলম্ব সহিবে না? বরং ৩।৪মাস শিক্ষার পর হইতে ইহাতে কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে থাকিবে। যাঁহারা তাঁতকে "আলাদীনের প্রদীপ" মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে "হতাশ" হওয়া, "পলায়ন" করা বিচিত্র নহে; তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, "No rose without thorns"। হয় তো কেহ কেহ বলিবেন যে, একবৎসর পরেই যদি তাঁতে ২০।২৫টাকা মাসিক আয় হইত, তবে তাঁতীরা জাতিব্যবসায় ছাড়িয়া ৫।৭টাকা বেতনে

চাকুরী করিত না। ইহার উত্তর দুইটি গ্রাম্য-কথা—(১) "অতিলোভে তাঁতী নষ্ট, (২) "তাঁতীর পরণে নেংটি আর জোলার গায়ে গেম্‌টি" (wrapper)।' অন্য কারণ এই যে, তাঁতীর শ্রমবিভাগ নাই। ব্যবসায়বুদ্ধির তারতম্যে যে উক্ত উভয় দলের অবস্থার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তাহা জোলা ও তাঁতীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলেই সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে জোলা তাঁতীর অন্ন উঠিল, অসাধারণ প্রতিযোগিতার সংঘর্ষণে চলনসই আটপৌরে কাপড়ের ব্যবসায় বন্ধ হইল, তখন তাঁতীরা বিলাতে মিহিসূতার কাপড় জন্মে না দেখিয়া এবং ১॥০টাকার সূতার দ্বারা ৬৲টাকা মূল্যের একজোড়া ধুতি বুনিয়া ৪॥০টাকা লাভ করিবে, এই বুদ্ধিতে মিহিসূতার কাজ ধরিল; আর তাহার জোগাড়ের সমস্ত অংশগুলি স্বহস্তে পরিপাটিরূপে প্রস্তুত করিতে লাগিল; কিন্তু ইহার মজুরী অতিরিক্ত, কাজেই ইহাদের ব্যবসায় টিকিল না। পক্ষান্তরে, জোলারা ১॥০টাকা মূল্যের মোটা সূতায় ২৲টাকা মূল্যের মোটা-চাদর বা ছিট্‌ করিল। মোটা কাজ এবং তাহার জোগান স্ত্রীপুত্রদের দ্বারা বা অল্প-বেতনের লোকের দ্বারা চলিতে থাকায় দিন ১।৪খান পর্য্যন্ত ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল, কাজেই তাহাদের কারবার ভালই চলিল। কুষ্টিয়া ও পাবনা অঞ্চলের জোলারা নানাপ্রকার ছিট্‌, রেপার, বিছানার চাদর এবং "ছেওটা" নামে একপ্রকার মুসলমানের পরিধেয় কাপড় প্রস্তুত করে। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, খুব ভালরূপ কাজ চলিলে জোগানখরচ বাদ দিলেও মাসিক ২৩৲টাকা আয় হইতে পারে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কাজ করিলে এবং পশম-তসর ইত্যাদি মিশাইয়া কাজ করিতে পারিলে ইহার অপেক্ষা বেশী আয় হয়। মৎপ্রণীত "বস্ত্রবয়নশিক্ষা" পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।*

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক লিখিয়াছেন যে, "সুনিপুণ তাঁতিশিক্ষকও শ্রীরামপুরের তাঁতে আটঘণ্টার পরিশ্রমে প্রমাণ মাঝারী ধুতি একখানির বেশী কিছুতেই নামাইতে পারিতেছে না।" আমরা ঐরূপ তাঁতীকে সুনিপুণ বলিতে পারি না। দৈনিক দুইজোড়া-তিনজোড়া কাপড় বুনানি হওয়া মিথ্যা কথা বটে, কিন্তু আমাদের এখানে সুনিপুণ কারিকর দৈনিক ১জোড়া কাপড় (৪০ নং সূতার ৪৫ইঞ্চি বহরের ১০ হাত লম্বা) অপেক্ষা ২।২½ হাত বেশী বুনানি করিতেছে। কুষ্টিয়ায় যে একটি Factory হইয়াছে, সেখানে যে-কেহ আসিলে ইহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে যেরূপ সূতার দর, তাহাতে জোগানখরচ দিয়া কেবলমাত্র কাপড়বুনানিতে বিশেষ লাভ থাকিবে না। কি প্রণালীতে কাজ করিলে এই তাঁতের কাজে লাভ হইতে পারিবে, তাহার একটি হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

দেশীয় হস্তচালিত তাঁতের মাসিক আয়ের মোটামুটি হিসাব।

---

* ঐই পুস্তক আগামী বৈশাখে মজুমদার লাইব্রেরীতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিবে। কয়েকখানি ছবি এপর্য্যন্ত প্রস্তুত না হওয়ায় পুস্তকখানির প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে।

১ জোড়া ৪০ নং ধুতি প্রস্তুত করিতে ৩ মোড়া সূতা, প্রতি মোড়া ।৵০ আনা হিসাবে ১৵০
মাড় ইত্যাদি ... ... ⁄০
রঙ্গীন সূতার জন্য অতিরিক্ত ৵০
জোগানখরচ (প্রতি জোড়ার খরচ গড়ে) ... ... ।⁄০
১॥৵০

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া পর্য্যন্ত কাপড় বুনানি হয়। নূনকল্পে ৪ জোড়ার সূতার বর্ত্তমান নিয়মে পাট করিতে ৪ দিন বা ৫ দিন লাগিতে পারে। পল্লিগ্রামে কারিকরের বাড়ীতে সূতা দিলে মোড়া প্রতি ৴১০।৴১৫ খরচে সূতা পাট হয়। তদভাবে ৪।৫ টাকা বেতনে কারিকরের বালক ও পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে ৭॥০ টাকা হিসাবে বেতন ধরিলাম।

প্রতি জোড়া কাপড় ২৲ টাকা (আমাদের এখানে ২।০ বিক্রয় হইতেছে)। ২৲ টাকায় বিক্রয় হইলে জোড়া প্রতি ।৵০ আনা অর্থাৎ মাসিক ১১॥০।১২ টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু পাকা কারিকর না হইলে দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না।

দৈনিক ৩খান প্রমাণ রেপার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তিনখান রেপার প্রস্তুত করিতে ৪ মোড়া সূতা লাগে, প্রতি মোড়ার দ ৵॥০ আনা হিসাবে ... ২৲
সূতার অতিরিক্ত রং এবং মাড়খরচ ... ... ।৵০
৭ জোড়া রেপার এক চড়নে হয়, তাহার জোগানে ৫ দিন লাগে, সে হিসাবে ... ... ।১০
২॥৵১০

প্রতি জোড়া রেপার ২॥০ হিসাবে বিক্রয় হইলে তিনখানার দাম ৴৭।০, তাহা হইলে দৈনিক ১⁄১০ পয়সা অর্থাৎ মাসিক ৩২৮⁄০ আনা আয় হইতে পারে। উল্লিখিত নিয়মে বস্ত্র ও রেপার বুনানির গড় ধরিলে মাসিক ২২॥০।২৩ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু অনবরত বুনানি সমানভাবে চলে না এবং কারিকরকেও জোগানের কাজ দেখিয়া লইতে হয়। সেজন্য উক্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম দাঁড়াইবে। রেপার ৩।৪ মাসের বেশী কাটতি হয় না বলিয়া কারিকরেরা ঐরূপ আয় করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে।

প্রবন্ধলেখক বলেন, তাঁতের "পাঠশালা" খুলিয়া অনর্থক ছাত্রগণকে প্রলুব্ধ করা হইতেছে। কিন্তু ভদ্রসন্তানদের পক্ষে ইহা আদৌ উপযোগী হইবে না, বরং বেশি বেতন দিয়া তাঁতীদের দ্বারা ছোট ছোট কারখানা খোলাই ভাল, সেজন্য আরব্ধ পদ্ধতির "মূলেই ভুল।" আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে কিন্তু মূলে কোন ভুল দেখিতে পাইতেছি না। আমরা "পাঠশালা" খুলিয়া ছাত্রগণকে প্রলুব্ধ করিবার অপরাধে দুষ্ট হইয়াছি বলিয়া, দোষক্ষালনের জন্য যে ঐরূপ বলিতেছি, তাহা নহে। আমরাও ছোট ছোট কারখানা (Hand-loom) খুলিবার আবশ্যকতা বিশেষ অনুভব করিতেছি এবং তজ্জন্য চেষ্টাও হইতেছে। কেবলমাত্র মূলধন হইলেই যে ব্যবসায় হয়, এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

ব্যবসায়শিক্ষা একটি পৃথক্ জিনিষ। তিমত ব্যবসায়জ্ঞান (Business training) না লইয়া কোন কারবারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার নিষ্ফলতা অবশ্যম্ভাবী। "চিনি ন্মে ইক্ষুদণ্ডে মূলে কিম্বা ফলে"—এইরূপ নভিজ্ঞতা লইয়া যিনি কাজে প্রবৃত্ত হইবেন, াহার মত লোকের আদৌ কার্য্যে প্রবৃত্ত না ওয়াই বরং দেশের কল্যাণকর। কারানা খুলিয়া লাল বাতি জ্বালাইয়া দেশের লাককে চমকাইয়া দেওয়া অপেক্ষা আদৌ া খোলা বরং ভাল। আমরা স্বীকার রি যে, তাঁতশিক্ষা দিবার যে শিক্ষাগারগুলি হইয়াছে, তাহা আদৌ "পাঠশালা"পদাচ্য হইবারও যোগ্য নহে, কিন্তু তাই বলিয়া সগুলি অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে না। সগুলিকে রীতিমত শিক্ষাগারে পরিণত রার বিশেষ দরকার। এই পাঠশালায় ফলানান শিখান হউক বা না হউক, বর্ণপরিয়টা হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। ইহা খের মত না হইয়া রীতিমত বিদ্যালয়হিসাবে গঠিত হইলে ইহার দ্বারা প্রকৃত কাজ হইবে। জাতীয়ধনভাণ্ডারকর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত এ বিষয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাঁহারাও ঐরূপ ত্রুটি ও আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

দ্বিতীয় কথা, "তাঁতীকে বেশী মজুরী দিয়া এই কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে" বর্ত্তমান অবস্থায় কারখানা যে বেশী লাভজনক হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। ...মত তাঁতীরা বুনিতে জানিলেও ব্যবসায়বুদ্ধিবিরহিত এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য। বস্ত্রবুনানির মধ্যে এইরূপ কাজের ভাগ বেশী যে, বুঝিয়া লইতে না জানিলে কারিকরেরা যথেষ্ট ফাঁকি দিতে পারে। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁতী রাখিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁতীদের কার্য্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে ঐরূপ লিখিতেছেন। অথচ রীতিমত কাজ করিলে যে লাভ হয় না বা কারিকরেরা ব্যক্তিগত হিসাবে লাভ করিতেছে না, তাহাও ঠিক নহে; যেহেতু মাসিক ১৭।১৮টাকা বেতন দিতে স্বীকার করিলেও সুনিপুণ কারিকর পাওয়া যাইতেছে না।

ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেক তাঁতী তৈয়ার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প চিরদিনই "সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী"র মধ্যে থাকিয়া যাইবে। তাঁতীদের "সনাতন পদ্ধতি" ঘুচিবে না বা তাহাদের মধ্যে বাণিজ্যানুমোদিত পন্থা প্রচলিত হইবে না। অতি অল্পদিন ইহাতে ভদ্রলোকের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় নানাস্থানে নানারূপ-সুকৌশল-সম্পন্ন যন্ত্রাদি আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনোযোগ দিয়া কাজ শিখিলে ভদ্রসন্তানেরা অল্পদিনের মধ্যেই প্রচলিত কার্য্যপ্রণালী শিখিয়া লইতে পারিবেন, আর ঐরূপ শিক্ষালাভের পর তাঁহারা মূলধন লইয়া নিজেরা কারখানা খুলিলে বা কারখানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলে কারখানাগুলি ক্রমে লাভজনক হইয়া উঠিবে। অনেকে জাপানী বা বিলাতী তাঁত লইয়াই কারখানা খুলিবার পক্ষপাতী, কিন্তু বোম্বের Indian Textile Journal বলেন, জাপানীতাঁত একটু বিগড়াইলে আর সাধারণ কারিকর তাহা চালাইতে পারিবে না—

"It is quite beyond the ordinary weaver to deal with, when it gets, in the least degree out of order." আমাদের বোধ হয়, বিলাতী তাঁতেরও ঐরূপ গতি। এইজন্য আমরা জটিল কলকারখানা-যুক্ত মূল্যবান্ তাঁত লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করা সঙ্গত মনে করি না।

আমাদের বয়নবিদ্যালয়ে তাঁতশিক্ষাসংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয়। তাহাতে দেখা গিয়াছে, সুনিপুণ তাঁতিশিক্ষক যে কাজটি ৫ মিনিটে করিয়াছে, তাহা প্রথম ছাত্র একমাসের মধ্যেই উক্ত প্রকারে ৫½ মিনিটে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বালকটি ভদ্রবংশীয় যুবক।

বিশেষত ঐরূপ বিলাতী বা জাপানী তাঁত পল্লিগ্রামে নিরাপদ্ মনে করি না; —তবে কারখানাবিবেচনায় ২।১টি রাখা যাইতে পারে। সুবন্দোবস্তের সঙ্গে কাজ চালাইলে দেশীয় তাঁতের কারখানা (Hand-loom) যে লাভজনক হইবে, ইহা আমাদের ধ্রুববিশ্বাস। বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু বস্ত্র সুলভ করিতে হইলে কেবল কারখানা খুলিলেই হইবে না, সূতা প্রস্তুত করিবার ও কার্পাস-উৎপাদনের ব্যবস্থা করা চাই এবং কাপড়ের বাজারটি জোলাতাঁতীর হাত হইতে প্রকৃত ব্যবসায়ীর হাতে লইতে হইবে। নচেৎ গ্রাহক বেশী দেখিয়া দাম চড়াইলে সে ব্যবসায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

পাট-করা সূতা পাইলে ভদ্রপরিবারের মধ্যে তাঁতের প্রচলন হইতে পারে, এই প্রস্তাবটি মন্দ নহে; কিন্তু ঐপ্রকা[র] weaving made easy করিয়া দিলে যে আমাদের মত সৌখীন গৃহস্থের বাড়ী[তে] উহার চলন হইবে, এ আশা নিতা[ন্ত] কম। পাট-করা সূতা (warp) বস্ত্রবয়নে[র] প্রধান উপাদান, আমাদের দেশের জ[ল]বায়ুতে উহা বেশীদিন ভাল থাকে [না] এবং উহা একটু খারাপ হইয়া গেলে কাপ[ড়] বুনানি—বিশেষত সৌখীন শিক্ষার্থীর পক্ষে অচল হইবে। ত্রিপুরা ও আসাম অঞ্চ[লে] ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতেও তাঁতের কাজ আ[জও] চলিতেছে;—ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত পরিবা[রের] স্ত্রীলোকেরা কোমরে একরূপ ছোট তাঁ[ত] বাঁধিয়া কাপড় বুনিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা[রা] সূতার পাটও নিজেরাই করেন।

"ঠকঠকী তাঁতে কেবল ধুতিই বোনা হ[য়] কিন্তু দেশের লোক শুধু ধুতির দ্বারা অ[ঙ্গ] আচ্ছাদন করে না, অন্যবিধ কাপড়চোপড় আবশ্যক"—উক্ত প্রবন্ধলেখকের এ[ই] উক্তিতে আমরা বিস্মিত হইলাম। ঠকঠ[ক] তাঁতে কেবল ধুতি বোনা হয়, এ কথা প্রব[ন্ধ]লেখক কোথায় পাইলেন! ইহাতে ছি[ট], রেপার, চাদর, মোটা চাদর, তোয়া[লে] প্রভৃতি নানারকম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে।

ব্যক্তিগত মতামতের উপর একান্তমাত্র নির্ভর না করিয়া ভদ্রবংশীয় যুবকগণ যদি অ[ন্ততঃ] ৬মাসকাল এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, ত[বে] আশা করি, তাঁহাদের আর হতাশ হইবার বে[শী] কারণ থাকিবে না, পরন্তু নবাবিষ্কৃত যন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে পূর্ব্বকথিত আয় অপেক্ষা অ[নেক] কিছু বেশী লাভ হইবে দেখিতে পাইবেন।

শ্রীবামাচরণ বসু*

* কুষ্টিয়া ও শিলাইদহ ঠাকুরবাবুদের বস্ত্রবয়নবিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।